মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা)

১৪শ বর্ষ—১ম খণ্ড

(ফাল্গুন ১৩২৮—শ্রাবণ ১৩২৯)

সম্পাদক—

মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়
ও
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ, বার-এট্-ল

কলিকাতা
১৪-এ রামতনু বসুর লেন, “মানসী প্রেস হইতে
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৩২৯

যাণ্মাসিক সূচী

(ফাল্গুন ১৩২৮ শ্রাবণ ১৩২৯)

বিষয়-সূচী

অন্তিম-শয্যায় (কবিতা)—
শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু ৫২০
অগ্রকুমার (উপন্যাস)—
শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায় ৩৩, ১৩০, ২৩৮, ৩০২, ৩৯৯, ৫০১
"আমার দেখা লোক"—
৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় ৫৫১
আর্য্যাবর্ত্তে—শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য ৭২
আলোচনা "রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে বস্তুপন্থা"
অধ্যাপক শ্রীসুখরঞ্জন রায় এম-এ ১৭৮
ও শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায় ৩৭২
আশ্চর্য্য সফল স্বপ্ন—
শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া ১৯৩
ইতিহাস—অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ২০৯, ২৯২
এপ্রিল ফুল (গল্প)—
শ্রীসুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায় বি-এল ৩৭৪
কাণপুরে দুইদিন—
শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এ ৫১৫
কাশ্মীর ভ্রমণ (সচিত্র)—
শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় এম-এ, বি-এল ৪৩, ১৬৯, ৩৩৬
খদ্দর (কবিতা)—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪৩৯
খেয়া শেষে (কবিতা)—
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ১৯৯
গৌতমাশ্রম—
শ্রীহরিপদ ঘোষ ৪৪৭
গ্রন্থ-সমালোচনা—
শ্রীরাখালরাজ রায় এম-এ ৯৫
শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায় ২৮৮
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার ৪৭৮
শ্রীদীননাথ সান্যাল বি এ, এম বি, রায়বাহাদুর ৫৬৭
সম্পাদকীয় ২৮৮
চরকার গান (কবিতা)—
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ৯৫
চিত্রকলা—"চিত্রামোদী" ৫৩৪
চিরমুক্তি (গল্প)—
শ্রীমতী সূর্য্যমুখী দেবী ৩২৯
চিরন্তন ব্যথা (কবিতা)—
শ্রীমতী অমিয়া দেবী ৪২৩
জৈনযুগের মথুরা (সচিত্র)—
শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত ৪৫৭
দাবী (কবিতা)—
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ৯৪
দারার দুরদৃষ্ট (সচিত্র)—
মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায় ২৮৩, ৫৫৪
দুঃখবাদ—
শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার এম-এ, বি-এল ৯
দুঃস্থা জননী (কবিতা)—
শ্রীকালিদাস বি-এ ৩১৪
নবীনচন্দ্রের কাব্যে সুভদ্রা চরিত্র—
শ্রীমতী সরোজবাসিনী গুপ্তা ১
নানা দেশের অঙ্গরাগ—
শ্রীহরগোপাল দাসকুণ্ডু ১১৭

নারীর কথা—
শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সরকার বিএ ১২২
নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়—
শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু বিএ ২৮৯
নূতন হাওয়া (চিত্রময়)—
শ্রীকালীপ্রসন্ন পাইন ৪৩৭
নৈরাশ্যে (কবিতা)—
শ্রীকালিদাস রায় বিএ ৪৪০
পুলিসের গল্প—শ্রীবীরেশ্বর সেন
গৌহাটীর কথা ২৬, ১৮০, ২৭৫, ৩৫০
শিবসাগর ও জোড়হাট ৪৮৮
পুষির ডায়েরি (গল্প)—
শ্রীমতী গিরিবালা দেবী ৬২৪
পূজারিণী (কবিতা)—
শ্রীকালিদাস রায় বি-এ ৪৪০
পৌরাণিক ভূগোল—
শ্রীরাখালরাজ রায় এম-এ ২০০
প্রতীক্ষা (গল্প)—
শ্রীমতী গিরিবালা দেবী ৬৫
প্রথম স্রেনরাজ ও তাঁহার সময়—
শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায় ৩৮১
প্রবাসীর পত্র—
স্তর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম-এ, ডি-এল,
সি-আই-ই, সুরিরত্ন ৭, ১৬১, ৩২১, ৫২১
প্রাণের সাড়া (গল্প)—
শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল বি-এ ৪৪৯
প্রেত-তত্ত্ব—
শ্রীলোকেন্দ্রনাথ গুহ বি-এ ৪৭০
বসন্ত-হিন্দোল (কবিতা)—
অধ্যাপক শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ এম-এ ২২৪
বসন্তের স্বপ্ন—
শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ ৩১
বাঙ্গালী কোন্ জাতি—
শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু বি-এ ৪০৫
বিবাহ বিড়ম্বনা—
শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ২২৫
বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে সুপ্রথা—
শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত ২৫৯, ৩০৯
বৈদেশিকী (সচিত্র)—
শ্রীগৌরহরি সেন ৫৩
ভারতীয় জীবনে ইস্‌লামের শিক্ষা—
শ্রীমুনীন্দ্রনাথ রায় এম-এ, বি এল ৪৪১
ভারতীয় পবিত্রাজক—
শ্রীফণীনাথ বসু বি-এ ৪৮১
ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের উত্থান ও পতন (সচিত্র)—
অধ্যাপক শ্রীকালীপদ মিত্র এম-এ ৩৮৫, ৫০৮
ভাষাহীন (কবিতা)—
অধ্যাপক শ্রীপবিমলকুমার ঘোষ এম-এ ৯১
মতভেদ—
শ্রীশশধর রায় এম-এ, বি-এল ১০৯, ২৪৭, ৩৭৭
মনের মানুষ (উপন্যাস)—
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ, বার-এট্-ল
৭৭, ২৬৭, ৩৫৮, ৪৭২, ৫৬০
ময়মনসিংহে আনন্দমঠ (সচিত্র)—
শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায় এম-এ, বিদ্যানন্দ ৪১৪
মাঝির গান (কবিতা)—
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ৩২০
মাতৃপূজা (কবিতা)—
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি এ ৪৩২
৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় (সচিত্র)—
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযাদবেশ্বর
তর্করত্ন কবিসম্রাট ৩৯২
"মেবার পতন"-এর সমস্যা ও মীমাংসা—
শ্রীঅনন্তলাল সান্যাল ৪১৭
রবীন্দ্রনাথের ছন্দ
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪৯২
রাজমার চরিত-কথা
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৯

শিবপূজা ও ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার—
অধ্যাপক শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় এম-এ, জ্যোতি- ৮৬, ১১৯
শেষরক্ষা (গল্প)—
শ্রীমতী কিরণবালা দেবী ২১৭
শোকের জ্বালা (কবিতা)—
শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ ৪৩৭
সতীত্ব বনাম মনুষ্যত্ব—
শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বিএ, কবিরঞ্জন ৯৭
সরলার আত্মকাহিনী (গল্প)—
শ্রীমধুসূদন আচার্য্য ১৪৫
সাহিত্য-সমাচার— ৯৬, ১৯২, ৩৮৪, ৪৭৯, ৫৬৮
সাঁওতাল পুরাণ -
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ ১৯৩
সুবোধ (কবিতা)—
শ্রীকালিদাস রায় বি-এ ৩৫৭
সূফী ধর্ম্ম -
শ্রীবিমলকান্তি মুখপাধ্যায় ৩৯৬
সেকালের পল্লীচিত্র —,
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ ১৬, ২৩৩, ৩৩৫, ৪৪৩
সেবার মূল্য (গল্প) —
শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল বি-এ ২৫৩
স্বরলিপি—"প্রতাপ সিংহ"-এর গান (সচিত্র) —
শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা
সুখের কথা বোলো না আর ৯২
বসিয়া বিজন বনে ১৮৯
বাঁধি যত মন ২৬৫
ও গো জানিস ত তোরা বল ৩৩৪, ৪৬৭
প্রেম যে মাথা বিষে ৫৩৮
স্বার্থত্যাগী (গল্প)—
শ্রীভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল ৫২৯
হাঁরাণী (গল্প)—
শ্রীনবনীধর মিত্র ৪৪৩
হিন্দুসমাজে নারীর স্থান— শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ৪৮৩
হিমাচল (কবিতা) – শ্রীমতী অমিয়া দেবী ১১৩
হেমচন্দ্র (সচিত্র) – শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম এ ১৮৪,৩৪৭, ৫৪০

লেখক-সূচী

শ্রীঅনন্তলাল সান্যাল
"মেবার পতন"এর সমস্যা ও মীমাংসা ৪১৭
শ্রীমতী অমিয়া দেবী
হিমাচল (কবিতা) ১১৩
চিরন্তর ব্যথা ঐ
অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
ইতিহাস ২০৯, ২৯২
শ্রীকালিদাস রায় বি-এ
সুবোধ (কবিতা) ৩৫৭
নৈরাশ্যে ঐ ৪৪০
পূজারিণী ঐ ৪৪০
অধ্যাপক শ্রীকালীপদ মিত্র এম-এ
ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের উত্থান ও পতন (সচিত্র) ৩৮৫, ৫০৮
শ্রীকালীপ্রসন্ন পাইন
নূতন হাওয়া (চিত্রময়) ৪৩৭
শ্রীমতী কিরণবালা দেবী
শেষরক্ষা (গল্প) ২১৭
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ
দাবী (কবিতা) ৯৪
খেয়া শেষে ঐ ১৯৯
মাঝির ব্যথা ঐ ৩২০
মাতৃপূজা ঐ ৪৩২

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী
প্রতীক্ষা (গল্প) ৬৫
পুষির ডায়েরি ঐ ৪২৭
শ্রীগৌরহরি সেন
বৈদেশিকী (সচিত্র) ৫৩
শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়
হিন্দুসমাজে নারীর স্থান ৪৮৩
"চিত্রামোদী"—চিত্রকলা ৫৩৪
মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়
ধান্নার ছুবদৃষ্ট (সচিত্র) ২৮৩, ৫৫৪
শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
বিবাহ বিড়ম্বনা ২২৫
শ্রীদীননাথ সান্যাল বি-এ, এম-বি, রায় বাহাদুর
গ্রন্থ-সমালোচনা ৫৬৭
স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম এ, ডি-এল, সি-আই ই স্যরিরত্ন
প্রবাসীর পত্র ৫৭, ১৬১, ৩২১, ৫২১
শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার এম-এ, বি-এল—
ছুঃখবাদ ৯
শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম এ—
বসন্তের স্বপ্ন ৩১
শ্রীনবনীধর মিত্র হারাণী (গল্প) ৪৩৩
শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু
অন্তিম-শয্যায় (কবিতা) ৫২০
শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায় এম এ, বিদ্যানন্দ
ময়মনসিংহে আনন্দমঠ (সচিত্র) ৫১৪
অধ্যাপক শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ এম-এ
ভাষাহীন (কবিতা) ৯১
বসন্ত হিন্দোল ঐ ২২৪
শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত
বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে মথুরা ২৫৯, ৩০৯
বৈদিকযুগের মথুরা (সচিত্র) ৪৫৭
শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় এম এ, বি এল
কাশ্মীর ভ্রমণ (সচিত্র) ৪৩, ১৬৯, ৩৩৬
শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল বি এ
সেবার মূল্য (গল্প) [illegible]
প্রাণের সাড়া ঐ ৪৪৯
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ, বার এট ল
মনের মানুষ (উপন্যাস) ৭৭, ২৬৭, ৩৫৮, ৪৭২, ৫৬০
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ
সেকালের পল্লীচিত্র ১৬, ২৩৩, ৩১৫, ৪৪৩
শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু বি এ
নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় ২৮৯
বাঙ্গালী কোন্ জাতি ৪০৫
ভারতীয় পরিব্রাজক ৪৮১
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
চরকার গান (কবিতা) ৯৫
খদ্দর ঐ ৪৩৯
রবীন্দ্রনাথের ছন্দ ৪৯২
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ
সাঁওতাল পুরাণ ১৯৩
শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়
গ্রন্থ-সমালোচনা ২৮৮
আলোচনা—"রবীন্দ্রনাথ ও বস্তুপন্থা" ৩৭২
প্রথম সেনরাজ ও তাঁহার সময় ৩৮১
সূফী ধর্ম্ম ৩৯১
শ্রীবীরেশ্বর সেন—পুলিসের গল্প
গৌহাটীর কথা ২৬, ১৮০, ২৭৫, ৩৫০
শিবসাগর ও জোড়হাট ৪৮৮
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
রাজিয়ার চরিত কথা ১৩৯
অধ্যাপক শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় এম এ, জ্যোতির্ভূষণ
লিঙ্গপূজা ও ভারতীয় [illegible] বিস্তার ৮৬, ১১৯
শ্রীভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায় [illegible] বি এল
স্বার্থত্যাগী (গল্প) ৫২৯
শ্রীমধুসূদন আচার্য্য
[illegible] আত্মকাহিনী (গল্প) ১৪৫

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়
[illegible] (উপন্যাস) ৩৩, ১৩০, ২৩৮, ৩০২
৩৯৯, ৫০১
শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম এ,
হেমচন্দ্র (সচিত্র) ১৮৪, ৩৪৭, ৫৪০
৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় "আমার দেখা লোক" ৫৫১
শ্রীমুনীন্দ্রনাথ রায় এম এ বি এল
ভারতীয় জীবনে ইস্‌লামের শিক্ষা ৪৪১
শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা—স্বরলিপি
"প্রতাপসিংহ"এর গান—
সুখের কথা বোলো না আর ৯২
বসিয়া বিজন বনে ১৮৯
বাঁধি যত মন ২৬৫
ওগো জানিস ত তোরা বল ৩৩৪, ৪৬৭
প্রেম যে মাখা বিষে ৫৩৮
শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ, কবিরঞ্জন
সতীত্ব বনাম মনুষ্যত্ব ৯৭
শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি এ কাণপুরে দুইদিন ৫১৫
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন কবিসম্রাট্‌
৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় (সচিত্র) ৩৯২
শ্রীরাখালরাজ রায় এম এ
গ্রন্থ সমালোচনা ৯৫
পৌরাণিক ভূগোল ২০০
শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি এ
আর্য্যাবর্ত্তে ৭২
শ্রীলোকেন্দ্রনাথ গুহ বি এ
প্রেত তত্ত্ব ৪৭০
শ্রীশশধর রায় এম এ, বি এল
মতভেদ ১০৯, ২৪৭, ৩৭৬
শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া
আশ্চর্য্য সফল স্বপ্ন ১১৩
শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সরকার বি এ
নারীর কথা ১২২
শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ
শোকের জ্বালা (কবিতা) ৪৩৮
সম্পাদকীয়—
সাহিত্য সমাচার ৯৬, ১৯২, ৩৮৪, ৪৭৯, ৫৬৮
গ্রন্থ সমালোচনা ২৮৮
শ্রীমতী সরোজবাসিনী গুপ্তা
নবীনচন্দ্রের কাব্যে সুভদ্রা-চরিত্র ১
অধ্যাপক শ্রীসুখরঞ্জন রায় এম এ
আলোচনা—"রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে রূপপন্থা"
১৭৮
শ্রীসুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায় বি-এল
এপ্রিল ফুল (গল্প) ৩৭৪
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম এ, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার
গ্রন্থ-সমালোচনা ৪৭৮
শ্রীমতী সূর্য্যমুখী দেবী
চির মুক্তি (গল্প) ৩২৯
শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু
নানাদেশের অঙ্গরাগ ১১৭
শ্রীহরিপদ ঘোষ
গৌতমাশ্রম ৪৪৭

চিত্র (পূর্ণপৃষ্ঠা)

পঞ্চশর (রঙীন)—শ্রীজিতেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯২ পৃষ্ঠার সম্মুখে
ফুলরাণী—শ্রীজ্ঞানদাকান্ত দাসগুপ্ত
২২৮ পৃষ্ঠার সম্মুখে
বিরহোৎকন্ঠিতা ঐ ঐ মুখপত্র
মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা ঐ 〃 —শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
৩৮৪ পৃষ্ঠার সম্মুখে
শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা ৩৩৭ পৃঃ
সন্ধ্যায় শিবার্চ্চনা (রঙীন)—শ্রীজিতেন্দ্রমোহন
বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮০ পৃষ্ঠার সম্মুখে
সেতার-বাদিনী (রঙীন) —শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
৯৬ পৃষ্ঠার সম্মুখে

বিরহোৎকণ্ঠিতা

(চিত্রকর—শ্রীজ্ঞানদাকান্ত দাশ গুপ্ত)

MANASI PRESS.
CALCUTTA.

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

১৪শ বর্ষ
১ম খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩২৮

১ম খণ্ড
১ম সংখ্যা

নবীনচন্দ্রের কাব্যে সুভদ্রা-চরিত্র

(বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে পদক পুরস্কার প্রাপ্ত)

কবিবর নবীনচন্দ্র তাঁহার সুবিখ্যাত কাব্য "রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র" ও "প্রভাসে" সুভদ্রার চরিত্র আঁকিয়াছেন। তাঁহার নব নব উন্মেষশালিনী শক্তি ও লীলায়িত কল্পনা স্বাভাবিক সুন্দর সুভদ্রা-চিত্র নব সৌন্দর্য্যের সম্পদে ও মহিমার গভীরতায় আরও বেশী সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে।

নবীনচন্দ্রের উল্লিখিত কাব্যত্রয়ের জন্মাবধি আজ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সম্বন্ধে বহু সমালোচনা চলিয়া আসিতেছে। বলা বাহুল্য যে, এই সমালোচনাগুলির সবই কাব্যত্রয়ের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে হয় নাই। পাখী আপনি গায় আপনার আনন্দে, ফুল আপনি ফুটিয়া সুবাস বিলায় আপনার আনন্দে। পাখী বা ফুল কখনও খতাইয়া দেখে না যে, গানের ঝঙ্কারে বা সুবাস ও শোভায় মানুষের কতখানি লাভ লোকসান। কবিও তেমনি আপনার সৃজনী শক্তির প্রেরণায়, আনন্দের অসম্বরণীয় আবেগে কাব্য রচনা করেন। যে কাব্য কে কিভাবে গ্রহণ করিবে, তাহা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক মনে করেন না। কবি শ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষক হইলেও, লোকের রুচি দেখিয়া কাব্য রচনা করেন না, লোকের রুচিই গড়িয়া তোলেন। লোকের রুচি গড়িয়া তোলেন বটে, কিন্তু সকল লোকের রুচি সমান করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারেন না। আর, সব লোকগুলা যদি সমান হইয়া যায়, তবে বিশ্বসৃষ্টির বৈচিত্র্যই কোথায় থাকিবে?

নবীনচন্দ্রের অঙ্কিত নারীচিত্রগুলি শুধু সুভোগ্য নয়, শ্রদ্ধার জিনিষও বটে। তিনি প্রায় সর্ব্বত্রই সসম্ভ্রম শ্রদ্ধার সহিত নারীচিত্র আঁকিয়াছেন। তিনি সমস্ত অন্তরের সহিতই বলিয়াছেন, "প্রেমের পবিত্রক্ষেত্র রমণীহৃদয়।"

আজকালকার কোন কোন সমালোচকের ফ্যাসান এই যে, একজনকে হীন প্রতিপন্ন করিবার ব্যর্থ প্রয়াস দেখাইয়া অন্যকে উচ্চ আসন প্রদান করা। আর একদল সমালোচক আছেন, সুন্দর ও নূতনের অসৌন্দর্য্য বাহির করিবার চেষ্টা করাই তাঁহাদের চিরন্তন অভ্যাস। এই দুইদল সমালোচকের পাল্লায় পড়িয়াও

নবীনচন্দ্রের সুভদ্রা-চরিত্রের অম্লান অপরাজের সৌন্দর্য্য বঙ্গবাণীর মন্দিরে উজ্জ্বল দীপশিখার মত জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে।

"রৈবতকে" সুভদ্রা চরিত্রের উন্মেষ, "কুরুক্ষেত্রে" বিকাশ এবং "প্রভাসে" পূর্ণ পরিণতি। অর্জ্জুন নাগ-শ্রেষ্ঠ চন্দ্রচূড়কে যুদ্ধে বধ করিয়াছিলেন। মরণাহত চন্দ্রচূড়ের মুখে তাঁহার নিজের এবং অনাথা শিশুকন্যার করুণ কাহিনী শুনিয়া অর্জ্জুনের চিত্ত অনুতাপ ও করুণায় ভরিয়া গেল। চন্দ্রচূড়ের কন্যাকে খুঁজিয়া তাহাকে পিতৃস্নেহে গ্রহণ করিতে পারিলে চন্দ্রচূড়-বধ অপরাধের খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে বলিয়া অর্জ্জুনের মনে হইল। সেই পিতৃহারা শিশুকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্যই তরুণ বীর দেশভ্রমণে বাহির হইলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি প্রভাসে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া রৈবতকে চলিলেন। রৈবতকে যাইবার পূর্ব্বে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ব্যাসকে প্রণাম করিবার জন্য তপোবনে গেলেন। এই তপোবনে কোন ঋষি-কন্যার মুখে সুভদ্রার নাম ও স্নেহের কথা শুনিয়া অর্জ্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুভদ্রা কে ?" কৃষ্ণ উত্তর করিলেন,

"আমার ভগিনী,
সারণের সহোদরা, প্রাণের অধিক
আমি ভালবাসি তারে। স্নেহে ভরা মুখ
তার, স্নেহে ভরা বুক ; স্নেহ সুধারাশি
ভদ্রার ঈষৎ হাস্যে পড়ে ছড়াইয়া।
পরিবারে পরিচিতে সর্ব্বত্র সমান ;
পালিত বনের পশু, বিহঙ্গ নিচয়ে,
উ[illegible]কুসুমে ; সদা সেই স্নেহামৃত
বরষে আমার ভদ্রা সহস্র ধারায়।
যেইখানে রোগী, শোকী, ভদ্রা সেইখানে
মূর্ত্তিমতী শান্তিরূপা। অশ্রু যেইখানে
সেখানে ভদ্রার কর। যেখানে শুকায়
পুষ্পবৃক্ষ, পুষ্পলতা, আছে সেইখানে
সলিল রূপিণী ভদ্রা। ডাকিছে যেখানে
অনাহারে পশুপক্ষী, দরিদ্র, ভিক্ষুক,
সেইখানে অন্নপূর্ণা সুভদ্রা আমার।
যথায় পুষ্পিত তরু [illegible] উদ্যান
প্রকৃতির উপাসিকা সুভদ্রা সেখানে
বসি আত্মহারা সুখে। যথা পক্ষিগণ
বসি তরুডালে গায় সায়াহ্ন কাকলী,
ভদ্রা আত্মহারা তথা।"

* * *

আপনি সাদরে তারে পড়ায়েছি আমি ;
শিখায়েছি অস্ত্রবিদ্যা, সঙ্গীত সুন্দর.
কিন্তু কি যে উদাসীন হৃদয় তাহার
বলিতে না পারি। ভদ্রা বাজাইছে বীণা,
আলাপি রাগিণী—বীণা হইল নীরব,
রহিল বসিয়া ভদ্রা শূন্যে নিরখিয়া,—
শেষতালে আত্মহারা চিত্রিতার মত !
সংসারের স্বার্থ-ছায়া, কুটিলতা-দাগ,
নাহি পায় স্থান পার্থ, তাহার হৃদয়ে,
নির্ম্মল সরল সেই দয়ার সাগরে।
চির উদাসিনী ভদ্রা ; দরিদ্রে দেখিলে
খুলে দিবে আপনার অঙ্গের ভূষণ
গোপনেতে। বড় সাধ আশ্রম দর্শন ;
আসিলে আশ্রমে, করে যায় সর্ব্ব অঙ্গ
আভরণহীন। যদি কর তিরস্কার,
সতত সজল দুই প্রশস্ত নয়ন
স্থাপিয়া তোমার মুখে রহিবে চাহিয়া
নিরুত্তরে। সেই দৃষ্টি নহে সংসারের,
নহে বালিকার, তাহা নহে মানবীর।"

কৃষ্ণের এই কথায় আমরা বুঝিতে পারি, কিশোরী কুমারী সুভদ্রা ভারতের পূর্ণ আদর্শপুরুষ গীতা-প্রবক্তা কৃষ্ণের মহৎ উদার শিক্ষার মূর্ত্তিমতী সফলতা। কৃষ্ণের মুখে সুভদ্রার যে পরিচয় আমরা প্রথম পাইয়াছি, "রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র" ও "প্রভাসের" সর্গে সর্গে সেই পরিচয় ক্রমেই নিবিড়, স্পষ্ট ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।

অর্জ্জুন তৎকালে রূপে, গুণে, বীরত্বে, কুমারী

[illegible] প্রার্থনীয় ছিলেন। এই অর্জ্জুনকে দেখিয়া, তাঁহার অন্তর বাহিরের পরিচয় পাইয়া সুভদ্রা তাঁহার অনুরাগিণী হইলেন। তাঁহার হৃদয়ের মৌন প্রেম তাঁহার অঙ্কিত অর্জ্জুন চিত্রে যেন অপূর্ব্ব ঝঙ্কারময় হইয়া অর্জ্জুনকেও একান্ত মুগ্ধ করিয়া তুলিল। সুভদ্রার প্রেম সমুদ্রের মত গভীর ছিল; তাঁহার নিষ্কাম গভীর প্রেমও বাহিরের মিলন প্রয়াসী ছিল না। তিনি ভালবাসিয়াই তৃপ্ত থাকিতে পারিতেন। কুমারী ব্রতোৎসবে যাইয়া করুণাময়ী সুভদ্রা আহত পাখীর বেদনায় আর্দ্র হইয়া তাহার সেবায় রত হইলেন। এই সময় স্নেহময়ী সখী সুলোচনার সঙ্গে প্রেম সম্বন্ধে তাঁহার অনেক কথা হইল। অনেক কথার পর তিনি সুলোচনাকে বলিয়াছিলেন, "হৃদয়ের মিলনই সত্য মিলন, দেহের মিলন নয়। প্রেমের বিস্তারই বিবাহের উদ্দেশ্য, প্রাণের বাণিজ্য নয়।"

কৈশোরের স্বাভাবিক চাঞ্চল্য সুভদ্রা চরিত্রের শান্ত গভীরতার মধ্যে একটুখানি আলোড়নও সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তাঁহার অন্তরতলের চঞ্চলতার স্থান ধীরতা ও উচ্চতাই দখল করিয়া ফেলিয়াছিল। সেই ধীরতা ও উচ্চতার সঙ্গে নিখিল বিশ্ববাসীর প্রতি গাঢ় মমত্ব বোধ এবং অগাধ করুণার অপূর্ব্ব মিলন সাধিত হইয়াছিল। মানুষ এক জীবনেই কতবার জন্ম মৃত্যুর ভিতর দিয়া চলে। মৃত্যুকে যদি শুধু পরিবর্ত্তন মানিয়া লই, তবে বালক মরিয়া যুবা হয়, যুবা মরিয়া প্রৌঢ় হয়, প্রৌঢ় মরিয়া বৃদ্ধ হয়। মানুষের জীবনে বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি নব জন্মের মতই নব চেতনা, নব উপলব্ধি ও নব অবস্থা দান করে। বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় যখন তাহার অতীত বাল্যের চপলতা ও অতীত যৌবনের উদ্দাম উল্লাস আবেশের কথা ভাবে, তখন নিজেই গভীর বিস্ময়ে অবাক হইয়া যায়। এই যে কালধর্ম্ম বা বয়োধর্ম্ম, তাহাও সুভদ্রার চিত্তের গভীরতার মধ্যে তলাইয়া গিয়াছিল। তারুণ্য নরনারীর মন প্রেমাস্পদের প্রতি এমন একাগ্র করিয়া রাখিতে চায় যে, অন্য কিছু ভাবিয়া দেখিবার আর অবকাশ দেয় না। সেই বিপুল শক্তিমান তারুণ্যও নত হইয়া সুভদ্রার সংযমের কাছে পরাজয় মানিয়াছিল। সুভদ্রার একান্তবাঞ্ছিত অর্জ্জুন যখন তাঁহার প্রেম-নিবেদন করিয়া, ক্ষত্রিয় বীরের রীতি অনুসারে সুভদ্রাকে 'হরণ' করিবার কথা বলিলেন, তখন সুভদ্রা বলিলেন,

"জানি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। কিন্তু বীরমণি,
নররক্তে রৈবতক করিয়া রঞ্জিত,—
যাদবের রক্ত প্রভু, রক্ত সুভদ্রার।
নরপ্রাণ মম প্রাণ—নারায়ণ প্রাণ,
কি ধর্ম্ম সাধিবে বল নরমুণ্ড মালা
পরায়ে গলায় প্রভু, তব সুভদ্রার?
নারায়ণ! এই ছিল অদৃষ্টে তাহার?"

অর্জ্জুন-প্রাপ্তির লোভও সুভদ্রাকে বিশ্বজনীন ধর্ম্মের সীমারেখা হইতে একচুল বাহিরে আনিতে পারে নাই। জন্ম হইতে তাহার জীবনখানি যেন বিশ্বের প্রীতি ও কল্যাণ যজ্ঞের আহুতি হইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। সুভদ্রার অভিপ্রায় ও ভালবাসার আভাস পাইয়া সত্যভামা সুভদ্রাকে অর্জ্জুনের করে অর্পণ করিয়া তাহার বিচ্ছেদ ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই বিয়োগ বেদনার মধ্যেও

সুভদ্রার মুখ স্থির, প্রশান্ত, গম্ভীর,
নাহি সুখ দুঃখ-রেখা; বহিছে নয়নে
দুই স্রোতে প্রীতি ধারা; ভাসিছে নয়নে
কোমলতা, কাতরতা, স্নেহের উচ্ছ্বাস!

তিনি বলিলেন,

"দিদি, তোমাদের আমি; আমরা সকলে-
নারায়ণ পদাশ্রিতা। অনন্ত জগৎ
যে চরণ সমাশ্রিত, আমরা বল্লরী,
জগতের প্রাণ সহ আমাদের প্রাণ
গাঁথা সেই পদমূলে। দিদি, আমাদের
অবিচ্ছেদ সে মিলন, অনন্ত সে প্রেম।"

সুভদ্রার নির্ম্মল বুদ্ধি আত্মার ভূমাকে সর্ব্বদাই অনুভব করিত; তাই তাঁহার প্রত্যেক কর্ম্ম ও বাণী অন্তরের আভাস দান করিত।

সত্যভামার উৎসাহ ও কৃষ্ণের আদেশের ইঙ্গিত পাইয়া অর্জ্জুন সুভদ্রা 'হরণ' করিলেন। সংবাদ পাইয়া যাদবেরা অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশ্য অর্জ্জুন সুভদ্রার ইচ্ছা অনুসারে যাদবদিগকে অনাহত রাখিয়া 'অরক্ত রণ'ই করিতে লাগিলেন। দারুক যাদবের ভৃত্য। কাযেই সে সুভদ্রাহরণে অর্জ্জুনের রথ চালাইতে রাজি হইল না। তখন তেজস্বিনী সুভদ্রা ক্ষত্রিয় নারীর ধর্ম্ম পালনের জন্ত নিজের হাতেই রথের রশ্মি তুলিয়া লইলেন। কৃষ্ণশিষ্য সুভদ্রার সারথ্যের কৌশল অদ্ভুত! যাদব-অস্ত্রে আহত হইয়া অর্জ্জুন যখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তখন স্বয়ং সুভদ্রা যাদবের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম ও সম্ভ্রম অক্ষুন্ন রাখিলেন। বলরামের ইচ্ছা ছিল না যে, অর্জ্জুন সুভদ্রাকে বিবাহ করেন। অবশেষে অর্জ্জুনের অনুপম বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া এবং সুভদ্রার ঐকান্তিক ইচ্ছা বুঝিয়া নিজেই অর্জ্জুনকে সুভদ্রা সম্প্রদান করিলেন।

"রৈবতকের" তরুণী কুমারী সুভদ্রা "কুরুক্ষেত্রে" আদর্শ জননী, আদর্শ গৃহিণী। "কুরুক্ষেত্রে" আমরা প্রথমেই সুভদ্রার সেবারতা মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে পাই। তিনি প্রায় সারাদিন সারারাত্রি কুরুক্ষেত্রের ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঔষধ ও চিকিৎসক সহ আর্ত্ত আহতের সেবা করিতেন। একদিন এমনিভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্তিভরে শিবিরে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার চির-সঙ্গিনী সুলোচনা বলিলেন, "অপরিমিত পরিশ্রমে তোমার দেহ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। 'মড়ার ওপর মরিয়া' তুমি কি সুখ পাও জানি না।" সুভদ্রা বলিলেন, "এর চেয়ে আর কি সুখ আছে? সেবাই যে নারীর ধর্ম্ম।" সুলোচনা বলিলেন, "মানিলাম, সেবা নারীর ধর্ম্ম। কিন্তু শত্রুদের সেবা কেন? দুর্জ্জনের দুঃখে দুঃখিত কেন? বিপক্ষ সৈন্তের সেবা করা কেন?" সুভদ্রা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "শত্রু! শত্রু কি মানুষ নহে লো আমার মত—

রক্ত মাংস নাহি কি তাহার?
তোমার আমার প্রাণ নহে কি শত্রুর প্রাণ?
এক জল'ভের জলাধার।

* * *

শত্রু! এক ভগবান সর্ব্বদেহে অধিষ্ঠান,
সর্ব্বময় এক অদ্বিতীয়।

* 0 *

যেই জন পুণ্যবান, কে না তারে বাসে ভাল?
তাহাতে মহত্ব কিবা আর?
পাপীরে যে ভালবাসে আমি ভালবাসি তারে,
সেই জন প্রেম অবতার।
না দিদি! আমরা নারী বিশ্বজননীর ছবি,
আমাদের শত্রু মিত্র নাই।
বরিষার ধারা মত অজস্র জননী প্রেম
সর্ব্বত্র ঢালিয়া চলে যাই।
মিত্রকে যে ভালবাসে সকাম সে ভালবাসা,
সে ত ক্ষুদ্র ব্যবসায় ছার।
শত্রু মিত্র তরে যার সমভাবে কাঁদে প্রাণ
সেই জন দেবতা আমার!
জনক জননী মুখ শিশুর ক্ষুদ্র জগৎ,
শিশু কিছু নাহি জানে আর।
ক্রমে বাড়ে পরিসর, কিশোর কিশোরী দেখে
ভ্রাতাভগ্নী পূর্ণ এ সংসার।
পতি পত্নী প্রেম রঙ্গে যৌবনে ছুটে তরঙ্গে,
আলিঙ্গিয়া ভূতল গগন।
ক্রমে সন্তানের স্নেহ দেখায় অনন্ত মুখ,
পুণ্য তীর্থ সাগর সঙ্গম!
প্রেম ধর্ম্ম এই দিদি, কাজি কৃষ্ণার্জ্জুন মত
দেখিতাম সকল সংসার।
মাতৃস্নেহে পূর্ণ বুকে আজি দেখিতেছি সব
অভিমন্যু উত্তরা আমার!
পিতা মাতা, ভগ্নী ভ্রাতা, পতি পুত্র, মহাবিশ্বে,
এই প্রেম তৃপ্তি নাহি পায়।"

অনন্ত এ বিশ্ব ছাড়ি কি যে গো অনন্ত আছে,
"প্রেম-সিন্ধু সেই দিকে ধায়।"

গীতার নিষ্কাম ধর্ম্ম সুভদ্রার মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার এই অমৃতময়ী বাণী কৌতুকময়ী সুলোচনাকে স্তব্ধ করিয়া রাখিল। ইহার পর উত্তরা ও অভিমন্যু সম্বন্ধে সুভদ্রার কিছু কথা হইল। সেই কথাগুলির মধ্যেও সুভদ্রার মাতৃস্নেহের স্নিগ্ধতা পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যায়। এই কথাবার্ত্তার মধ্যে ব্যাসশিষ্যের ছদ্মবেশে শৈলজা গীতা লইয়া আসিয়া পড়িলেন। বহুকাল পরে ছদ্মবেশিনী শৈলজাকে দেখিয়া—

সেই কণ্ঠ, সেই ভাষা, ত্রিতন্ত্রীর সে মূর্চ্ছনা
স্মৃতির কি সঙ্গীত অতীত,
যেন সুভদ্রার কাণে, যেন সুভদ্রার প্রাণে,
বাজিল মধুর স্বপ্নগীত।

শৈলজা চলিয়া গেলে সুলোচনা বলিলেন, "এই ছদ্ম ঋষি নিশ্চয়ই শৈলজা।" তাহা শুনিয়াও সুভদ্রা 'নীরব চিত্র মত' রহিলেন। তিনি জানিতেন, শৈলজা অর্জ্জুনকে ভালবাসেন। কিন্তু জানিতেন না যে, শৈলজা সেই ভালবাসাকে রূপান্তর দানের জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার তপস্যা সার্থক হইয়াছিল। স্বামীর অনুরাগিণী নারীর প্রতি স্ত্রীর বিদ্বেষভাব খুব স্বাভাবিক। কিন্তু সুভদ্রা যথার্থ প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছিলেন, বিদ্বেষ তাঁহাতে থাকিতে পারে না। তাই স্বামীর জীবন রক্ষাকর্ত্রী বিপদের সাহায্য-কারিণী শৈলজার কণ্ঠ শুনিয়া 'মধুর স্বপ্নগীত' বলিয়াই তাঁহার মনে হইল। তা ছাড়া, শৈলজার জন্য সর্ব্বদাই তিনি অন্তরে স্নেহার্দ্র বেদনা বহন করিতেছেন।

"কুরুক্ষেত্রের" চতুর্থ সর্গে সুভদ্রা ও অভিমন্যুতে গীতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আছে। সুভদ্রা ছেলেকে গীতার মর্ম্ম বুঝাইলেন। এই আলোচনায় সুভদ্রার জ্ঞান ও শিক্ষার বিস্তার যে কতখানি তাহা বুঝা যায়।

কুরুক্ষেত্রে সব রকমের আর্ত্ত-সেবাই ছিল সুভদ্রার শ্রেষ্ঠতম ব্রত। তিনি মমতাময়ী মা, তাঁহার সেবায় মরণোন্মুখ শত্রু মিত্র উভয় সৈন্যই শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিত। তাঁহার স্পর্শে ভীষ্মের শর-শয্যা 'পুষ্পশয্যা' হইয়াছিল। আহত সেবা করিয়া ফিরিবার পথে একদিন তিনি জরৎকারুকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার সেবায় জরৎকারুর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে সে সুভদ্রার পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,

"এমন পবিত্র স্বর্গে অনার্য্য বনবাসিনী
নাহি জানি কোন পুণ্যে করিনু শয়ন।
এই দয়া, এই সুখ, ইন্দ্রাণীর স্বপ্ন-শয্যা,
এই অঙ্ক, আমি নাহি ভুলিব কখন।
তুমি তো মানবী নহ, অপরিচিতায় হায়!
এই দয়া, এই স্নেহ মানবের নহে।
নহে রূপ মানবীর, মানবীর প্রাণে হায়
কোথা এইরূপ দয়া মন্দাকিনী বহে?"
"সেকি কথা?"—কহে ভদ্রা, "মূর্চ্ছিতা আমায় পথে
পাইলে ভগিনি! তুমি যেতে কি ফেলিয়া?
একটি হরিণী হায়! এরূপে পড়িয়া পথে
দেখিলে কি তব বুক পড়েনা ভাঙ্গিয়া?"
"পড়ে, কিন্তু আমি নারী, অনার্য্যা, আমার ছায়া
মাড়ালেও মহাপাপ হয় যে আর্য্যার।"
"না, বোন! অনার্য্য আর্য্য"—কহিতে লাগিলা ভদ্রা,
"একই পিতার পুত্র কন্যা সমুদয়।
এক রক্ত এক মাংস, এক প্রাণ সকলের
এক আত্মা; এক জল, ভিন্ন জলাশয়।
স্থান-ভেদে, কাল ভেদে, কর্ম্মভেদে জন্মে জন্মে,
কোথায় পঙ্কিল জল, কোথায় নির্ম্মল।
সঞ্চারিয়া জ্ঞানালোক এই মলিনতা কর্ম্মে
কর অপনীত, হবে যে জল সে জল।"

ভদ্রার স্নেহশীতল স্পর্শে জরৎকারুর সমস্ত জীবনের সঞ্চিত ব্যথা ও উত্তেজনার জলন্ত জ্বালা কিছু সময়ের জন্য একেবারে জুড়াইয়া গেল। সুভদ্রার সংস্পর্শে দুঃখ বেদনা পলাইয়া যাইত। বিশ্বের সুখকে একান্ত নিজস্ব বোধে যিনি বলিতে পারেন,

"জগতের সুখনীতি, সুখনীতি আমাদের,
মানবের সুখ, সুখ তোমার আমার।
সেই মহা সুখস্রোতে যাই তুমি আমি ভাসি,
পাইব অনন্ত সিন্ধু, সুখ পারাবার।"

তাহার স্পর্শে কি দুঃখ থাকিতে পারে?

"কুরুক্ষেত্রের" ত্রয়োদশ সর্গে গৃহের সন্ন্যাসিনী সুভদ্রার সহিত বনের তপস্বিনী শৈলজার মিলন। সেই মিলন ও আলাপেও সুভদ্রার অগাধ স্নেহের পূর্ণ অভিব্যক্তি। শৈলজার সহিত সুভদ্রার সুখতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে অনেক কথা হইল। এই তত্ত্বালোচনা সুভদ্রার উন্নত জ্ঞানের পরিচায়ক। অভিমন্যুকে হীনভাবে হত্যা করিবার গোপন পরামর্শ শুনিয়াই শৈলজা সুভদ্রার কাছে আসিয়াছিলেন, মা এ কথা শুনিলে ছেলেকে কিছুতেই যুদ্ধে পাঠাইবেন না। কিন্তু সুভদ্রা যে আদর্শ মা। তিনি একমাত্র ছেলের জীবন অপেক্ষা তাহার ধর্ম্মকে বড় জানিয়া বলিলেন,

"ধর্ম্ম যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম সনাতন,
জান শৈল। ধর্ম্মযুদ্ধে করিয়া বারণ
কুমারে, কেমনে ধর্ম্মে হইবে পতিতা
পার্থের রমণী, অভিমন্যুর জননী?
হইবে পতিতা আহা! কৃষ্ণের ভাগিনী?"

পরদিন দ্রোণাচার্য্যের প্রতিদ্বন্দ্বী পাণ্ডব সেনাপতি হইয়া যুদ্ধ যাত্রাকালে অভিমন্যু মাকে প্রণাম করিতে আসিল। পুত্রের সৌভাগ্যে মায়ের চোখ হইতে "আনন্দাশ্রু" বহিতে লাগিল, হৃদয়-চাঞ্চল্যের একটি রেখাও মায়ের মুখে দেখা গেল না। আজ যে অভিমন্যু মরণের লীলাভূমে যাইতেছেন, সুভদ্রা তাহা জানিতেন, কিন্তু ধর্ম্মকে তিনি তদপেক্ষাও বেশী ভাবিতেন, তাই অম্লান মুখে, অবিচলিত ধীর কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিয়া ছেলেকে যুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন। সেইদিনকার যুদ্ধের মহা পরিণাম ক্ষেত্রে সুভদ্রার শিক্ষা ও সাধনার চরম পরীক্ষা হইয়া গেল। অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া অভিমন্যু অন্যায় যুদ্ধে হত হইলেন। প্রলয়ের মত এই প্রচণ্ড শোক পাণ্ডব পক্ষের প্রত্যেকের বক্ষ বিধ্বস্ত করিল। পুত্র-প্রাণা স্নেহ-গর্ব্বিতা সুলোচনা অভিমন্যুর মৃতদেহ দেখিয়াই যে মূর্চ্ছিতা হইলেন, সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না। এই মহাশোকের ভীষণ ঝঞ্ঝাও সুভদ্রার হৃদয়ের অতল শান্তি-সমুদ্র কম্পিত বা ক্ষুব্ধ করিতে পারিল না।

কেবল দুইটি নেত্র শুষ্ক, বিস্ফারিত,
এই মহাশোক ক্ষেত্রে; কেবল অচল
এই মহাশোক ক্ষেত্রে একটি হৃদয়;
সেই নেত্র, সেই বুক, মাতা সুভদ্রার।
চাপি মৃত-পুত্র-মুখ মায়ের হৃদয়ে
দুই করে, বিস্ফারিত নেত্রে প্রীতিময়,
যোগস্থা জননী চাহি আকাশের পানে,
আদর্শ-বীরত্ব বক্ষে প্রীতির প্রতিমা!

কাব্য হিসাবে "কুরুক্ষেত্র" অতি উৎকৃষ্ট কাব্য। বিশেষতঃ অভিমন্যু বধের ও তৎপরের করুণ-রসার্দ্র ছবিখানি কবি এমনি প্রাণস্পর্শী করিয়া আঁকিয়াছেন যে, পড়িতে পড়িতে পাঠকের অশ্রু অসম্বরণীয় হইয়া উঠে। ধ্যানমগ্নার মত স্তব্ধ নির্ব্বাক সুভদ্রার পানে চাহিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, "সুভদ্রে, আমাদের শোক নাই। তোমার পুত্র যে গতি লাভ করিয়াছে, কোন্ মাতার পুত্র তাহা করে? আমরা সকলে মিলিয়া যে ব্রত সাধন করিতেছি, অভিমন্যু আজ একা তাহা সাধন করিল। তাহার জীবন-ব্রত সফল, অধর্ম্ম হত হইয়া পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। প্রেমপূর্ণ স্বরে বিশ্বমানবের মঙ্গল-গীতি গাও।"

এতক্ষণে জননীর বহিল নয়নে দুই
নিরমল বারিধারা; নহে শোক জল,
আনন্দাশ্রু ভকতির আলোকে উজ্জ্বল।
"দয়াময়! নাহি শোক"—বাজিল ত্রিতন্ত্রী যেন
ভকতির পরশনে করুণা হিল্লোলে,
"দয়াময়! নাহি শোক, সাধিল তোমার কর্ম্ম
পুত্র যার, তার শোক নাহি ধরাতলে।

ক্ষত্রিয়ের গুরু দ্রোণ, ভুজবলে তাঁর পণ
ষোল বৎসরের শিশু লঙ্ঘিল যাহার,
সেই বীর-জননীর শোক কি আবার ?
ক্ষত্রিয়ের শিরোমণি সপ্তরথী একরথে
ষোল বৎসরের শিশু জিনিল যাহার,
সেই বীর-জননীর শোক কি আবার ?
সম্মিলিত সপ্তরথী সম্মুখি ভীষণাহবে
এই শর-শয্যা শেষে হইল যাহার,
তার জননীর শোক সম্ভবে কি আর ?
ক্ষুদ্র লতা হুরবল, প্রসবি বৃহৎ ফল
তাপিত মানব প্রাণ করে সুশীতল ;
তব পদাশ্রিতা লতা পুণ্যবতী ভদ্রা তথা
প্রসবিয়া অভিমন্যু এই মহাফল,
সাধিয়াছে যদি দেব ! মানব মঙ্গল,
লতার ত এই সুখ ; পূর্ণ সুভদ্রার বুক
মাতৃপ্রেমে, পাদপদ্মে লও উপহার
সেই প্রেম, সুভদ্রার শোক কি আবার ?
সমগ্র মানব জাতি আজি অভিমন্যু সম,
আজি অভিমন্যু মম বিশ্বচরাচর।
এক নর-পুত্র মম হারাইয়া, লভিয়াছি
আজি কি মহান্ পুত্র অনন্ত অমর !
বড় ভাগ্যবান পুত্র, তাহার নিয়তি পূর্ণ !
অপূর্ণ নিয়তি আছে এখনো ভদ্রার,—
ধরাতলে কৃষ্ণনাম হয়নি প্রচার।
অনন্ত অমর পুত্রে আনন্দে লইয়া বুকে
এইরূপে শিখাইব নাম নিরমল ;
কর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এরূপে করিয়া রণ
শিখাইব সাধিবারে মানব মঙ্গল।"

যাহারা অধর্ম্ম যুদ্ধে অভিমন্যুকে নিহত করিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধেও এতটুকু বিদ্বেষ বা বিরাগ সুভদ্রার ছিল না। পুত্রের মৃত্যুতে জগতের মহা কল্যাণ হইল, নির্ম্মম যুদ্ধ শেষ হইল, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হইল, এইটাই তিনি সবচেয়ে বড় ও সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন। গৈরিকধারিণী সুভদ্রা পুত্রের শ্মশানে শোকার্ত্ত অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,

"পবিত্রিত, বিগলিত, তরলিত প্রেমনীর
এইরূপে আমাদের হইল কঠিন প্রাণ,
জুড়াতে জগৎ প্রাণ, বিলাইতে কৃষ্ণ নাম।
সুলোচনা-মাতৃপ্রেম, অভিমন্যু আত্মদান,
নব ধর্ম্মরাজ্যভিত্তি, চূড়া তার কৃষ্ণনাম।
সাঙ্গ বীরব্রত, লও ধর্ম্মব্রত শ্রেষ্ঠতর,
মাখি পুত্রভস্ম বুকে হও কর্ম্মে অগ্রসর।
পুত্রের সুযোগ্য মাতা, পুত্রের সুযোগ্য পিতা
হইব আমরা, যবে হইবে ধরা প্লাবিতা
এই নব ধর্ম্মামৃতে ; দুঃখ রহিবে না আর
জগতের, হবে ধরা সুখশান্তি পারাবার।
শুনিতে শুনিতে যেন বিশ্বকণ্ঠে কৃষ্ণনাম,
একই চিতায় লভি পতি পত্নী নিরবাণ।"

এইখানেই আমরা বিশ্ব-কল্যাণ-ধ্যানরতা বিশ্ব-জননীর প্রতিমা সুভদ্রাকে প্রণাম করিয়া "কুরুক্ষেত্র" হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

"প্রভাসে" আমরা দেখি, সন্ন্যাসিনী সুভদ্রা অন্নপূর্ণার মত স্বামী সহ কখন আশ্রমে, কখন গৃহে, কখন, বা উৎসব ক্ষেত্রে জনে জনে কৃষ্ণ-নামামৃত বিলাইতেছেন। এই বিতরণের মধ্যেও এক বিন্দু উচ্ছ্বাস বা চাঞ্চল্য ছিল না, তখনও "সুভদ্রার বক্ষ শান্তি শতদল।" যদুকুল ধ্বংস হইল, সংবাদ পাইয়া অর্জ্জুন সুভদ্রাকে লইয়া প্রভাস যাত্রা করিলেন। সারাপথে ব্যাকুল অস্থির অর্জ্জুন আর্ত্তকণ্ঠে কেবলি কৃষ্ণের তিরোধান আশঙ্কা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভদ্রার্জ্জুন উভয়ের কাছেই কৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ও বাঞ্ছিত ছিলেন। স্বামীর আকুলতা দেখিয়া—

শান্তকণ্ঠে স্থির
কহিলেন ভদ্রাদেবী, "শোকে অভিভূত
হইও না এইরূপে ! হায়, যাদবের
অনাথ শিশুর, আর নারী অনাথার
রয়েছে রক্ষণ ভার করেতে তোমার।"

এই কথায় অর্জ্জুন প্রবোধ মানিতে পারিলেন না। বলিলেন,

হউক যাদব ধ্বংস, ধ্বংস চরাচর,
নাহি দুঃখ। নারায়ণ—প্রাণসখা মম
আছেন কুশলে বল? বল একবার
পারিব সে পদাম্বুজ ধরিতে হৃদয়ে,
জুড়াইতে হৃদয়ের এই হাহাকার?"
"একি ভ্রান্তি প্রাণনাথ!"—উত্তরিলা দেবী
শান্ত স্থির কণ্ঠে, "যিনি মঙ্গল-নিদান
জগতের, যিনি সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল,
সম্ভবে কি অমঙ্গল তাঁহার কখন?
মঙ্গল ও অমঙ্গল, সুখ দুঃখ আর,
জন্ম মৃত্যু, শোক শান্তি লীলামাত্র তাঁর;
অনন্ত মঙ্গল পূর্ণ নিয়তি তাহার।
না থাকিলে অমঙ্গল, মঙ্গল কখন
বুঝিত কি ক্ষুদ্র নর? বুঝিত কি সুখ,
না থাকিত দুঃখ যদি? মৃত্যু না থাকিলে,
পারিত কি বহিতে এ জীবনের ভার?
আবির্ভাব তিরোভাব স্বয়ং তাঁহার
না থাকিলে ভক্তিস্রোত বহিত উজান,
ধর্ম্মের উন্নতি চক্র হইত অচল।
হইত অচল জীব-চক্র উন্নতির
দুঃখ, মৃত্যু, অমঙ্গল না থাকিত যদি।
কর শোক পরিহার! নিয়তি তাঁহার
সুমঙ্গল বিশ্বব্যাপী পালিবেন তিনি,
সুদর্শন নীতি চক্রে পালিবে জগৎ,
পালিব আমরা ক্ষুদ্র চক্রে আপনার
সেই মহাচক্র গর্ভে। ততোধিক আর
ক্ষুদ্র নর আমাদের নাহি অধিকার।
যতদিন ভক্তি প্রেম থাকিবে হৃদয়ে,
তাঁহার চরণাম্বুজ প্রেম সরোবরে
ভাসিবে সতত। প্রেমে চির অধিষ্ঠান
প্রেম বৃন্দাবনে প্রেমময় ভগবান।"

চলিতে চলিতে পথে তাঁহারা বুকে পাষাণ চাপা মরণোন্মুখ দুর্ব্বাসাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। "দূর হও পাপীয়সি!" বলিয়া দুর্ব্বাসা যখন গর্জ্জিয়া উঠিলেন, তখন দুর্ব্বাসার

লইয়া মস্তক অঙ্কে, বারি সুশীতল
আবার দিলেন ভদ্রা বিকৃত বদনে।

কিন্তু তাহাতে দুর্ব্বাসার ক্রোধশান্তি হইল না। তিনি 'দুরাচার', 'পাপীয়সি' সম্ভাষণে ভদ্রার্জ্জুনকে আপ্যায়িত করিয়া অভিশাপে ভস্ম করিতে চাহিলেন। সুভদ্রার ধৈর্য্য তাহাতেও অবিচলই রহিল।

কহিলেন ভদ্রাদেবী কণ্ঠে করুণার,
"কর ভস্ম আমাদের ইচ্ছা হয় দেব!
কেমনে যাইব চলি ফেলিয়া তোমায়
এমন সময়ে হায়! দেও অনুমতি
সেবিব চরণ প্রভু! হও শান্ত স্থির,
পাবে শান্তি, সুমধুর গাও কৃষ্ণ নাম!"

এই কথায় দুর্ব্বাসা ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। কিন্তু অবশেষে পরশমণি সুভদ্রার পরশে কৃষ্ণনামের স্বাদ ও শান্তি লইয়াই দুর্ব্বাসাকে মরিতে হইল।

প্রভাস পৌঁছিয়া ভদ্রার্জ্জুন ধ্বংসের ভয়াল দৃশ্য দেখিলেন। মহাশোকে অর্জ্জুনের করুণার পারাবার উদ্বেলিত হইল। তিনি অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু

সুভদ্রার মহাশোক শান্তির সাগরে ধীরে—
হইল বিলীন। নেত্রে ছল ছল প্রেমনীরে।

আবার তাঁহারা কৃষ্ণের সন্ধানে ছুটিলেন। পথে শৈলজা ও প্রেমোন্মত্ত বাসুকিকে দেখিতে পাইলেন। এইখানে তাঁহার উন্মাদ সর্ব্বগ্রাসী কৃষ্ণ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ তিরোধানের দুঃসহ বেদনাও ভুলিয়া গেলেন।

"প্রভাসে" আর একটিবারমাত্র আমরা সুভদ্রার দেখা পাই, তাহা মহা তপস্বিনী শৈলজার তিরোধানের সময়। শৈলজা আবাল্য সন্ন্যাসিনী সুভদ্রার হৃদয়ে কতখানি স্থান দখল করিয়াছিলেন, তাহা কবির দু' একটি কথায় খুব স্পষ্ট বুঝিতে পারি!

ধীরে শান্তি-সন্ধ্যা শৈল মুদিল নয়ন।
মা! মা!" কাঁদি ধনঞ্জয় মূচ্ছিত পড়িলা বুকে,
পড়িতেছিলেন ধীরে ভদ্রা মুরছিত,
কহিলেন দ্বৈপায়ন, "সুভদ্রে, সম্বর শোক,
তব করে ধর্ম্মরাজ্য রয়েছে স্থাপিত।
সুপ্ত-উত্থিতার মত সুভদ্রা তুলিলা শির,
রহিলা চাহিয়া স্থির শৈল মুখ পানে।"

অভিমন্যুর মৃত্যুতেও সুদ্রাকে মূর্চ্ছাতুরা দেখা যায় নাই।

পুরাণ ও ইতিহাসের উপাদান লইয়া নবীনচন্দ্রের প্রতিভা যে সুভদ্রা-প্রতিমা গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা আদর্শের উচ্চতা ও পরিপূর্ণতায় অপূর্ব্ব সুন্দর। সুভদ্রা চরিত্রের সকল সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া অন্যকে বুঝাইবার মত শক্তি না থাকিলেও, যখনই নবীনচন্দ্রের সুভদ্রার কথা ভাবি, তখনি আনন্দে বিস্ময়ে মুগ্ধ ও স্তব্ধ হইয়া যাই।

শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্তা।

দুঃখবাদ

১। পাশ্চাত্য সুখ ও দুঃখবাদ।

সংসার যে দুঃখময় ইহা ভারতবর্ষীয় তত্ত্বচিন্তার মন্বন্তর-প্রাচীন সিদ্ধান্ত। এবং এই সিদ্ধান্ত উপলক্ষে আমরা বহু যুগ ধরিয়া যে কাঁদাকাটা করিয়া আসিয়াছি, তাহার প্রতিধ্বনি আজও সর্ব্বত্র মিলাইয়া যায় নাই। এবং এই দুঃখবাদের সমস্ত সার্থকতা শুধু যে আমাদের যুগান্তব্যাপী কাঁদুনির মধ্যেই নিহিত, তাহা নহে। ইতিহাসের দিক হইতে দেখিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইবে, এ দেশের ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের যাহা মোক্ষ ও নির্ব্বাণবাদ তাহা এই জগৎ-দুঃখবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কারণ, স্বর্গে ও মর্ত্তে, কোথাও সত্য ও :পারমার্থিক সুখ নাই বলিয়াই, সুখ ও দুঃখের অতীত মোক্ষ নির্ব্বাণ আমাদের "পরম পুরুষার্থ" বলিয়া বিহিত হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু তা বলিয়া, পুরাতন যুগের এই দুঃখবাদ, বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা ও রুচি অনুসারে, আমাদেরও যে মনঃপূত হইবে এমন আশা খুব কম। কেন না, কল্পিত স্বর্গরাজ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এই প্রত্যক্ষ মর্ত্ত্যলোকের চতুঃসীমার মধ্যেই কোথাও যে প্রকৃত সুখ নাই এমন কথা আমরা অনেকেই সহজে মানিতে প্রস্তুত নহি। বিশেষতঃ, পশ্চিম সমুদ্রপারের অধুনাতন বাঁশীতে The Pleasures of Life নামক বিচিত্র সঙ্গীতের যে উন্মাদয়িত্রী রাগিণী সংমূর্চ্ছিত হইতেছে, তাহার দুর্ণিবার উন্মাদনায় আমরা সকলেই অল্প বিস্তর পর্য্যাকুল ও বিপর্য্যস্ত। তাহাতে, এমন সময়ে প্রাচ্য দুঃখবাদের কাঁসর বাদ্য যে ভাল লাগিবে ইহা কখনই আশা করা যায় না। কিন্তু উপায় নাই। এই কাঁসর বাদ্যকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই যে হেতু এই কাঁসীর সুরেই আমাদের পুরাতন ধর্ম্ম ও.কর্ম্ম-জীবনের ঢাকঢোল বাজিয়াছিল। এবং শুধু সেই জন্যই নহে, অন্য কারণেও আমাদের দেশের প্রাচীন দুঃখবাদের আলোচনার আবশ্যক দাঁড়াইয়াছে। সমুদ্রপারের যে মোহন বংশীর পরিব্যাপ্ত মূর্চ্ছনায় আমরা এতই উতলা হইয়া পড়িতেছি, সেই মূর্চ্ছনার মধ্যেই কি জানি কোথায়, একটা ফাটা বাঁশীর বেসুরা আওয়াজ আছে, যাহা এখন ক্বচিৎ পাশ্চাত্য কর্ণেও রূঢ় বলিয়া লাগিতেছে। এবং সেই জন্যই কদাচিৎ এমন সন্দেহও উপস্থিত হইতেছে, কি জানি, হয়ত বা নবীন সভ্যতার এই বিচিত্র সুখ-সঙ্গৎ, বিধাতার চরম ঐকতান বাদনের সহিত এক-তান-

লয়ে গ্রথিত নহে। সে জন্যও কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিয়া বিপরীত ও বিরুদ্ধ তানলয়ে গ্রথিত প্রাচ্য দুঃখবাদের সংবাদ লওয়া প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উপস্থিত এই প্রবন্ধে সেই সংবাদ পাঠ করিতে আমরা যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা করিব।

কিন্তু বর্ত্তমান যুগের ইউরোপেও এক নব্যতম দুঃখবাদ দর্শনাকাশে সমুদিত হইয়াছে। যে মহামনার লোকোত্তর প্রতিভা ভেদ করিয়া পাশ্চাত্য জগতের এই নবীন দুঃখবাদ জাগ্রত হইয়াছে, তাঁহার নাম Arthur Schopenhauer। তাঁহার pessimism-তন্ত্রের বিচিত্র হেতুবাদ যদিও অনেক স্থলে এক মৌলিক ও স্বয়ংস্বাধীন হেতুবাদ, তত্রাচ ভারতবর্ষীয় দর্শনের সঙ্গে যাঁহাদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তাঁহারা অনায়াসেই দেখিতে পাইবেন যে Schopenhauer যেন ভারতবর্ষীয় দুঃখবাদেরই এক অভিনব সংস্করণ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার কারণ অন্য কিছুই নহে, বর্ত্তমান ইউরোপের "স্কলারদের" মধ্যে Schopenhauerই হইতেছেন একমাত্র দার্শনিক, যাঁহার জাতীয় অভিমান ও ইউরোপীয় অহঙ্কারের কঠিন আবরণকে ভেদ করিয়া, উপনিষদের অগ্নিমন্ত্র সকলের উত্তাপ, তাঁহার অন্তঃকরণের মর্ম্মস্থানকেও উত্তপ্ত করিতে পারিয়াছিল। সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ হইয়াও, তিনি তর্জ্জমার মধ্য দিয়া যে উপনিষৎ পাঠ করিয়াছিলেন—তাহা শুধুই উদ্ধত সমালোচনার জন্য নহে, কিংবা প্রচ্ছন্নভাবে খৃষ্টধর্ম্মের মহিমা সংস্থাপনের জন্য নহে। এবং সেই জন্যই খৃষ্টীয় জগতের মাঝখানে দাঁড়াইয়া Schopenhauer অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারিয়াছিলেন—

"In the whole world there is no study so elevating, so beneficial, as that of the Upanishads. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death."

জগতের পক্ষে ইহা পরম দুর্ভাগ্য যে Schopenhauer ভারতীয় ব্রহ্ম-বিদ্যার বিষয় কথঞ্চিৎ অবগত হইলেও, ব্রহ্ম-সাধনায় একান্তই অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাহা না হইলে তাঁহার অসামান্য প্রতিভা, প্রাচ্য ব্রহ্মবিদ্যার অপরাহত সত্যালোকের দ্বারা বর্ত্তমান নবীন সভ্যতার এক অভিনব পথ নির্দ্দেশ করিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু সে যাহাই হউক, Schopenhauerর প্রবর্ত্তিত দুঃখবাদ আমাদের এই নগণ্য আলোচনায় কোনই কাযে লাগিবে না। কারণ পাশ্চাত্য 'বিজুলী-বাতি' যতই সমুজ্জ্বল হউক, এ দেশের দর্শনবাদকে এ দেশের মাটীর প্রদীপের মিটমিটে আলোতেই পাঠ করিতে আমরা পূর্ব্ব হইতে প্রতিশ্রুত।

২। ভারতবর্ষে দুঃখবাদের প্রসর।

যজ্ঞপ্রধান বৈদিকযুগে এই দুঃখবাদের প্রসর কতদুর ছিল তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কিন্তু ইহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য, যে যুগ সুখময় স্বর্গলোককেই সার করিয়াছিল, সে যুগ যে স্বর্গের ও মর্ত্তের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সুখ মাত্রকেই "হেয়" জ্ঞান করিয়াছিল, ইহা কখনই সম্ভব নহে। এবং বোধ করি সেই জন্যই, উত্তরকালে গীতা প্রভৃতি মোক্ষশাস্ত্র, স্বর্গপর বেদবাদ ও অপবর্গপর মুক্তিবাদের মধ্যে একটা আভ্যন্তরীণ বিরোধ অনুভব করিয়াছিল।

কিন্তু জ্ঞান-প্রধান উপনিষৎ-যুগে ভারতবর্ষীয় তত্ত্বচিন্তার চিত্তপটে জগৎ-দুঃখবাদের বিশাল ছায়া ক্রমশই ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ"—সৎ-সম্পন্ন অশরীর আত্মাকে কোনই প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করে না। এবং উপনিষদের পাঠক দেখিতে পাইবেন, সেই জন্য ঋষিগণ এই প্রিয় ও অপ্রিয় লক্ষণযুক্ত সংসারকে "হেয়" অবিদ্যাপক্ষে নিক্ষেপ করিয়া, এক প্রিয় ও অপ্রিয়ের অতীত "অমৃতত্ত্ব"কে ক্রমশঃ বড় করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। সেই অমৃতত্ত্বের মধ্যে সুখ ও আনন্দের কতটা ন্যায্য স্থান আছে সে বিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, স্বরূপে অবস্থিত মুক্ত আত্মার 'অমৃত' দশায় স্বরূপ কি হইতে পারে, ইহা লইয়া প্রাচীন বেদান্তাচার্য্যগণের মধ্যেও তুমুল মতভেদ উপ-

স্থিত হইয়াছিল।—"ব্রাহ্মেণ জৈমিনিঃ" (বেঃ দঃ—৪।৪।৫)—জৈমিনি বলেন মুক্তাত্মা যখন স্বরূপে অবস্থিত হয়েন, তখন সত্যকাম সত্যসংকল্প প্রভৃতি ব্রাহ্মভাবেই অবস্থিত হয়েন। "চিতি ঔড়ুলোমিঃ" (৪।৪।৬)—ঔড়ুলোমি মুনি বলেন, উপনিষদের মতে মুক্তাত্মা চিন্মাত্র স্বরূপে অবস্থান করেন (সাংখ্য মত)। "অভাবং বাদরিঃ" (৪।৪।১০)—বাদরির মতে উপনিষৎ মুক্তাত্মাকে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি বিরহিত অভাব-রূপেই নির্দ্দেশ করিতেছেন। "ভাবং জৈমিনিঃ" (৪।৪।১১)—জৈমিনি বলেন, না তাহা নহে—উপনিষৎ মুক্ত আত্মাকে ভাবরূপেই নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই সকল বিভিন্ন উপনিষদ্-ব্যাখ্যার মধ্যে অমৃতোপগত আত্মার চরম আনন্দ সম্ভোগের বিধান ন্যায়তঃ কোথাও যে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে নাই ইহা বলা যায় না। অন্ততঃ আমরা দেখিতে পাই, ঔড়ুলোমি মুনির ন্যায় সাংখ্যও মুক্তাত্মার চিদ্রূপ মাত্র প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া, আত্মার চরম আনন্দরূপতা অস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন—ন্যায়ানুসারে (logically) একই সত্তার চিদ্রূপ ও আনন্দরূপ সিদ্ধ হইতে পারে না (সাং দঃ—৫।৬৬)। সেখানে পরমানন্দের প্রাপ্তি নহে, চরম দুঃখের নিবৃত্তি মাত্রেরই অবকাশ হইয়াছিল।

বেদান্তবাদের ভাব ও অভাব রূপতার তর্ক পাঠ করিলে পাঠকের মনে সহজেই বুদ্ধদেবের মোক্ষ নির্ব্বাণের কথা উঠিবে। ভগবান বুদ্ধ সংসারকে একান্ত ও অত্যন্ত পক্ষে দুঃখময় বলিয়া জানিয়াছিলেন বলিয়াই, নির্ব্বাণ তাঁহার সুখ দুঃখের অতীত এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে অবস্থা অস্তি-ও-নহে নাস্তি-ও-নহে,—তাহা সর্ব্ববিধ অস্তি নাস্তির অতীত এক "চতুষ্কোটী বিনির্ম্মুক্ত" অনির্ব্বচনীয় অবস্থা বা 'নির্ব্বাণ'। কিন্তু বুদ্ধবাদের পূর্ব্বাধিকারী বেদান্ত নহে, সাংখ্য। এবং এই সাংখ্যের মধ্যেই জগৎ-দুঃখ-বাদের সমস্ত যুক্তি সবিস্তারে সমাহিত হইয়াছে। এবং সেই যুক্তির মর্ম্মবাণী পাঠ করিতে পারিলেই বুঝা যাইবে এ দেশের দুঃখের বেদনা কোনখানে বিষম বাজিয়াছিল।

৩। দুঃখের নিদানতত্ত্ব।

এতৎ প্রসঙ্গে, প্রথমেই ইহা অবশ্য মনে রাখিতে হইবে, সংসার-দুঃখবাদের মর্ম্ম ইহা নহে যে, সুখানুভব বলিয়া কোন অনুভবই জগতে নাই। দুঃখরূপে অনুভূত বিষয় ইহাতে পৃথক ও স্বতন্ত্র, সুখ বলিয়াও কোন কিছু বিষয় যে আছে ইহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। সুখদুঃখের বিভিন্ন অনুভব জীব মাত্রেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ অনুভব। এবং সেই অনুভব কোনও দর্শনবাদের দ্বারা অপাস্ত হইবার নহে। রসগোল্লা নামক সরস পদার্থটি রসনোপরি সন্নিবিষ্ট হইলে আমাদের যে প্রত্যক্ষ অনুভবটি হয়, তাহা যে পৃষ্ঠপ্রদেশে সঘন চপেটিকা প্রয়োগজনিত অনুভব হইতে বিভিন্ন, ইহা জানিতে হইলে কোনও পাঠশালাতেই পড়া লইতে হয় না। ইহা জানিবার জন্য মনুষ্য মাত্রেরই এক 'অশিক্ষিত পটুত্ব' আছে। সেই জন্য যাঁহারা নাকি, সমালোচনা স্থলে নাসিকাগ্র সঙ্কোচন পূর্ব্বক বলিয়া থাকেন—"হিন্দু দর্শন" সুখ দুঃখের বিভিন্ন অনুভবকে অপলাপ করিয়া কোনও এক অসম্ভব জগৎ-দুঃখ-বাদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল—তাঁহাদের প্রলাপবাক্যের কোনই অর্থ নাই। অন্ততঃ আমরা এমন কোনই "হিন্দু দর্শনের" বিষয় অবগত নহি, যাহার মধ্যে সুখ ও সুখ, "অনুকূল বেদনীয়" ও "প্রতিকূল বেদনীয়" বিভিন্ন প্রত্যয় বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। ভারতবর্ষীয় pessimism-সমালোচনার ভোঁতা শলাকা এ অসম্ভব স্থানে চালাইলে এ দেশের দুঃখবাদের কোন ব্যথাই শিহরিয়া উঠে না। সে ব্যথা অন্যত্র।

সুখ,—সুখাত্মক ও অনুকূল বেদনীয় অনুভব হইলেও, তাহা যে সকল অবস্থায় ও সর্ব্বত্র জীবনিবহের পক্ষে বিহিত হইতেছে না—ইহা হইতেছে সর্ব্ববাদিসম্মত ভূয়োদর্শনসিদ্ধ একটি তথ্য। এবং উপস্থিত সুখ পরিহারের এই যে বিধান, ইহাই দেশবিদেশের দর্শনশাস্ত্রে "প্রজ্ঞা", "বিবেক" প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এবং এই প্রজ্ঞা ও বিবেকের চরমপরিণাম-প্রাপ্ত পাহাড়ে আছাড় খাইয়া আমাদের

প্লাবন সুখের নৌকা খান্‌খান্ হইয়া গিয়াছিল।

উপস্থিত সুখ পরিত্যাগ করার এই বিধান যদিও প্রজ্ঞা প্রভৃতি দার্শনিক মর্য্যাদাসম্পন্ন উচ্চ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, কিন্তু দার্শনিক জগতেও দেখা যায় যে সেই প্রজ্ঞার (Prudence) অধিকারী শুধুই মানুষ নহে। আমরা সকলেই জানি, ঘুঘু নামে এক পক্ষিজাতীয় জীব আছে, যাহার ফাঁদে পা দিয়া উপস্থিত ভোজনসুখ হইতে বিরত হইবার "প্রজ্ঞার" অভাব প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। এবং মনুষ্যজাতির মধ্যেও অবশ্য এমন "ঘুঘু" যথেষ্ট পাওয়া যায়, যাহারা চার্ব্বাকের স্পষ্ট অনুশাসন সত্বেও, কেবল অধম হইতেও অধম উত্তমর্ণের দৌরাত্ম্যে, ঋণ করিয়া ঘি খাইতে ইচ্ছা করে না।

কেন, এবং কোন হেতু বশতঃ, উপস্থিত সুখও জীবের পক্ষে কদাচিৎ পরিত্যজ্য হইয়া থাকে, ইহার তথ্যানুসন্ধানে 'ইউটিলিটি' দর্শনের আশ্রয় অবলম্বন করিলে, ভারতবর্ষীয় প্রজ্ঞা-বাদেরও যে কোন মর্ম্ম উদ্ঘাটিত হইতে পারে, এমন দুরাশা আমরা কখনই করি না। কেন না বেন্‌থাম্ ও মিলের প্রজ্ঞা-দর্শন, সুখ দুঃখের আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাণ করিবার জন্য যে এক কল্পিত মানসিক তুলাদণ্ড স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, ঠিক্ সেই স্বীকৃত তুলাদণ্ডেই যে আমাদেরও সুখ দুঃখের ওজন হইয়াছিল, এমন প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। এবং সে প্রমাণ যদি নাই পাওয়া যায়, সেজন্য একেবারেই হতাশ হইয়া পড়িবার কোনই কারণ নাই। কারণ সেই কল্পিত বেন্‌থামী মানসিক তুলাদণ্ডের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ওদেশেরই উন্নত মনস্তত্ত্ববিদ্যা ক্রমশঃই সন্দিহান হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। যথা—"The study of animal behaviour has led us to see that the utilitarian theory of motives was false: The animal world has also its martyrs without any nice calculation of balance of pleasure over pain, or uushakeable belief in heavenly rewards or hellish punishments." * অতএব এমন সন্দিগ্ধ সাক্ষীর প্রমাণ বলেও যদি আমাদের অস্তিম প্রজ্ঞাবাদ নাই সাব্যস্ত হইয়া থাকে, তবে সে জন্য আপশোষ করিবার কোনই বিশেষ কারণ নাই।

সুখ ও দুঃখ সমষ্টির অপেক্ষিক গুরুত্ব ওজনে কদাচিৎ কখন দুঃখের পাল্লা ভারি হইয়া পড়ে বলিয়াই দুঃখকে এ দেশের বিজ্ঞেরা "হেয়" বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন নাই। কিন্তু দুঃখ,—দুঃখ বলিয়াই,—বিনা ওজনে ও বিনা তুলনায় সমালোচনে,—কোনরূপ জের জমা খরচের হিসাব নিকাসের অপেক্ষা না রাখিয়াই,—স্বতঃ ও স্বভাবতই দুঃখ আমাদের হেয় ও পরিত্যজ্য রূপে বিহিত হইয়াছে। সুখও সেইরূপ স্বতঃই জীবের পক্ষে উপাদেয়রূপে বিহিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সুখ দুঃখ অনুভবের মধ্যে এমন এক মৌলিক প্রভেদ আছে, যাহার জন্য সুখানুরাগ হইতে দুঃখদ্বেষ স্বভাবতঃই বলবত্তর। সুখ স্বভাবতঃ এমন কোন জিনিস নহে,—যাহা না হইলে কোন মতেই আমাদের চলে না। তাহা অনেকটা সখের জিনিস, হইলেও চলে না হইলেও চলে। কিন্তু দুঃখের কুশাঙ্কুরের দ্বারাও আমাদের অন্তরাত্মা আহত হইয়া থাকে। সেই জন্য সকলেই সুখের চেয়ে স্বস্তিকে ভালবাসে। এবং স্বস্তি কোনও ভাবাত্মক সুখবোধ না হইলেও, তাহা দুঃখের অভাবজনিত এক নিরুদ্বিগ্ন প্রত্যয় বটে। এবং ঠিক্ সেই জন্যই, কখন কখন বহুসুখের মধ্যগত তুচ্ছ দুঃখও আমাদিগকে প্রপীড়িত করিয়া থাকে। একটি গল্প আছে,—কদাচিৎ কোন এক সুকুমারী রাজকন্যা, সাত পুরু গদীর উপর শুইয়াও সারা রাত ছট্‌ফট্ করিয়াছিলেন। ঐ গদীর মধ্যে কোথায় একগাছি চুল ছিল, যাহার দুঃখময় কর্কশ রূঢ়তা, শয্যাতলের সমস্ত কোমলত্বাকে ভেদ করিয়া, রাজকন্যার কোমল অঙ্গে সারা রাতই বাজিয়াছিল। তেমনি আমাদের মধ্যে যে চৈতন্যময়ী রাজকন্যা বাস করিতেছেন, তিনি দুঃখের রেখাঘাতেও পীড়িত হন।

---

* Mc.Dougall's Psycholgy, p. 148.

দুঃখের ছিটা ফোঁটা লাগিলেও তাঁহার সমস্ত রাজভোগ তিক্ত হইয়া যায়। সাংখ্যের দর্শনকার, জীবের সুখ দুঃখ অনুভবের এই সূক্ষ্ম বিভিন্নতা প্রণিধান পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—"যথা দুঃখাৎ ক্লেশঃ পুরুষস্য ন তথা সুখাৎ অভিলাষঃ।" (৬।৬)—জ্ঞানময় পুরুষের দুঃখ হইতে যথাবিধ ক্লেশ, সুখ হইতে তথাবিধ অভিলাষ নহে। অর্থাৎ স্বভাবতঃই, সুখাভিলাষ হইতে দুঃখদ্বেষ বলবত্তর। সুখ ও দুঃখসত্তার এই বিহিত স্বরূপ অবধারণ করিয়া, প্রাচ্য তত্ত্বচিন্তকগণ তাহাকেই যথার্থ সুখ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, যে সুখ দুঃখলেশের দ্বারাও অভিস্পৃষ্ট নহে,—যে সুখের অনুসঙ্গী দুঃখ কিছুই নাই। কিন্তু এমন বিশুদ্ধ সুখ জগতে নাই। এবং সেই জন্য "কুত্রাপি কোঽপি সুখী, ন" (সাং দঃ ৬।৭)—কুত্রাপি বা কাহাকেও বা যে সুখী বলিয়া বোধ হয়, সেও সুখী নহে। কারণ, এই অতি বিরল সংখ্যক তথাকথিত সুখীদের যে সুখ—"তদপি দুঃখশবলাৎ, দুঃখপক্ষে নিক্ষিপন্তে বিবেচকাঃ" (৬।৮)।—তাহাও দুঃখের সহিত মিশ্রিত সুখ বলিয়া, বিবেচকগণ তাহাকেও দুঃখ পক্ষেই নিক্ষেপ করেন।

৪। পাতঞ্জলের দুঃখসূত্র।

সর্ব্ববিধ বিষয়সুখের সহিত দুঃখ কিরূপে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত ইহা দেখাইবার জন্য ভগবান পতঞ্জলি এক ইহলোক-পরলোক-ব্যাপী আলোচনার অবতারণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইতে চাহিয়াছিলেন, জগতে এমন কিছুই নাই, যা হইতে পারে না,—যাহা কোন না কোন প্রকারে মহৎ দুঃখের দ্বারা আক্রান্ত নহে। সমস্ত বিষয়সুখই ইহজন্মের ও জন্মান্তরীণ দুঃখের দ্বারা অনুবিদ্ধ। এদেশের দুঃখবাদ প্রণিধান করিতে হইলে পাতঞ্জলের দুঃখসূত্র বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক।

সূত্রের প্রথম অংশ হইয়াছে—"পরিণাম-তাপ-সংস্কার-দুঃখৈঃ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ"—সমস্তই বিবেকীর পক্ষে, দুঃখ, কারণ সমস্ত বিষয়, (১) পরিণাম-দুঃখ, (২) তাপ-দুঃখ ও (৩) সংস্কারদুঃখদ্বারা সংভিন্ন। ভাষ্যকার এই ত্রিবিধ দুঃখকে, ইহজন্ম ও জন্মান্তর দুই পক্ষেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ :—

(১) পরিণাম দুঃখ।—ব্যাস বলিতেছেন—"ভোগের মধ্যে ইন্দ্রিয় সকলের তৃপ্তিবশতঃ যে উপশান্তি তাহা সুখ। এবং ইন্দ্রিয় সকলের লোলতা বশতঃ যে উপশান্তি তাহা দুঃখ। কিন্তু ভোগাভ্যাসের দ্বারা (আপাতমাত্র উপশান্তি সুখ লাভ হইলেও) তৃষ্ণা ক্ষয় হয় না। ভোগাভ্যাসের পরে পুনর্ব্বার বিষয়রাগ অভিবর্দ্ধিত হয়। ইহাই ইন্দ্রিয় সকলের কৌশল।"—অর্থাৎ—

> ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

কাম কখনই কাম্য বিষয় উপভোগের দ্বারা প্রশমিত হয় না। ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হুতাশনের ন্যায় তাহা পুনর্ব্বার অভিবর্দ্ধিত হয়। এইরূপে বিবৃদ্ধ কামনা ও প্রবলীভূত বিষয়ানুরাগ, কিরূপে মহৎ দুঃখকে পরিণামে উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় তৎসম্বন্ধে ভাষ্য বলিতেছেন—"তস্মাৎ অনুপায়ঃ সুখস্য ভোগাভ্যাস ইতি, সঃ খলু বৃশ্চিকবিষভীত ইব আশীবিষেণ দষ্টঃ সঃ সুখার্থী বিষয়ানুসেবিত মহতি দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন ইতি"—অর্থাৎ সুখের ভোগাভ্যাস বশতঃ অনুপায় সুখার্থী, বৃশ্চিকবিষে ভীত হইয়া মোহ-প্রযুক্ত সর্পদংশন লাভ করিয়া থাকে। বিষয়ানুবাসিত জীব সুখের সন্ধানে ভ্রাম্যমান হইয়া মহৎ দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণও বিষয়ানুধ্যায়ীর এইরূপ "বুদ্ধিনাশ" ও "বিনাশের" কথা বলিয়াছিলেন। ইহা বিষয়সুখের ইহজন্মের পরিণাম-দুঃখ।

বিষয়সুখের জন্মান্তরীণ পরিণাম দুঃখ যে কি ইহা বুঝিতে হইলে, আমাদের কর্ম্মবাদের মূল কথাগুলি একবার স্মরণ করিয়া লওয়া প্রয়োজন। আমরা দেখিয়াছি যে রাগদ্বেষাদি "পঞ্চপর্ব্বা" অবিদ্যাই হইতেছে সংসার গতির মূল কারণ। এবং রাগদ্বেষাদি অবিদ্যা প্রণোদিত হইয়া জীব শরীর বাক্য ও মনের দ্বারা যে কোন পাপ ও পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে,

তাহার ফলে "কর্ম্মাশয়" সঞ্চিত হয়। সাংখ্যেরা এই কর্ম্মাশয়ের অন্য এক নাম দেন "ধর্ম্মাধর্ম্ম।" ধর্ম্মাধর্ম্ম তাঁহাদের মতে বুদ্ধির এক প্রকার 'ভাব' এবং জীবের লিঙ্গদেহ এই সকল 'ভাবের' দ্বারা গঠিত হইয়া জন্মান্তরে কর্ম্মোচিত যোনিলাভ করে। যোগেরা এই কথাই একটু অন্যরকম করিয়া বলেন। তাঁহারা বলেন, চিত্তস্থিত কর্ম্ম সকলের "আশয়" হইতেই জন্মান্তরীণ "বাসনার" অভিব্যক্তি হয়। তাঁহাদের মতে চিত্ত হইতেছে অনাদি জন্মের অনাদি বাসনার আধার স্বরূপ। তাহাতে অগণিত জন্মের, অসংখ্য পশুপক্ষী প্রভৃতি জাতির বাসনা নিদ্রিত ও বিস্মৃত রূপে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। এক জন্মের "আশয়" সকল নিমিত্ত মাত্র হইয়া পরজন্মে আশয়ানুরূপ "বাসনাকে" জাগ্রত করিয়া দেয়। তাহাতেই কচিৎ পূর্ব্বজন্মের মানবচিত্ত, কর্ম্মবশে মার্জ্জার জন্মের বাসনাকে লাভ করিয়া থাকে। এবং সেই মার্জ্জার জন্মের যে বিচিত্র সুখ দুঃখ ভোগ হয়, তাহা পূর্ব্বজন্মের হিংসা ও অহিংসামূলক পাপ ও পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা বিহিত হয়। পূর্ব্বজন্মের পাপ কর্ম্মের ফলে কোন বিড়াল নিয়মিত তিন সন্ধ্যা যষ্টিপ্রহারজনিত দুঃখ ভোগ করে; এবং কোন বিড়াল বা প্রাক্তন পুণ্য বলে, পতিপুত্রহীনা বিধবার পোষ্যপুত্র হইয়া অপরিমিত দুগ্ধ ও মৎস্য ভোজনের পরমানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হয়। আমাদের কর্ম্মবাদের এই হইল মোটামুটি ব্যবস্থা। এবং এই ব্যবস্থা অনুসারেও বিষয়-সুখ জন্মান্তরে পরিণাম দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। তাহা এইরূপঃ—

"রাগানুবিদ্ধ সুখানুভবের দ্বারা রাগজ কর্ম্মাশয় উপচিত হয়। এবং সুখানুভব কালে মোহভাব এবং দুঃখের প্রতি দ্বেষ-বুদ্ধিও বিদ্যমান থাকে। সেই জন্য তাহা হইতে মোহজ ও দ্বেষজ কর্ম্মাশয়ও উপচিত হয়।" অবিদ্যা জনিত এই সকল কর্ম্মাশয় কিরূপে হিংসা ও অহিংসা সংযোগে পরজন্মে সুখদুঃখ ভোগের কারণ হইয়া থাকে, ইহা দেখাইবার জন্য ব্যাসদেব পঞ্চশিখ মুনির এই বচন উদ্ধার করিয়াছেন—"ন অনুপহত্য ভূতানি উপভোগঃ সম্ভবতীতি হিংসাকৃতোঽপি শারীর কর্ম্মাশয়ঃ"—ভূত সকলকে (কোন না কোন প্রকারে) উপঘাত না করিয়া কোনই উপভোগ সম্ভব নহে। অতএব উপভোগ হইতে, শরীর কর্ম্ম দ্বারা অর্জ্জিত হিংসাকৃত কর্ম্মাশয়ও সঞ্চিত হয়।—এই সকল পাপ কর্ম্মাশয়ই জন্মান্তরে দুঃখরূপ ফলকে উৎপন্ন করিয়া থাকে। তাহাই জন্মান্তরীণ পরিণাম দুঃখ।

(২) **তাপদুঃখ**—ক্রোধ ও দ্বেষের উত্তাপ জনিত যে দুঃখ তাহারই নাম তাপ-দুঃখ। সুখার্থী, সুখের পরিপন্থী বিষয় ও ব্যক্তির প্রতি স্বতঃই ক্রোধ ও দ্বেষপরায়ণ হইয়া সর্ব্বদাই তাপদুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। এবং সেই তাপদুঃখ প্রণোদিত হইয়া জীব হিংসা ও অহিংসা কর্ম্মেও প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তাহা হইতে তাহার পাপ পুণ্যের সঞ্চয় হয়। তাহা হইতে তাহার জন্মান্তরে সুখ দুঃখ লাভ ঘটে। আবার তাহা হইতে তাপদুঃখ উৎপন্ন হয়। এইরূপে তাপদুঃখ ক্রমেই বাড়িয়া চলে।

(৩) **সংস্কার দুঃখ**—ইহা সম্বন্ধে ভোজরাজ বলিয়াছেন—"অভিমত ও অনভিমত বিষয় সন্নিধানে যথাক্রমে সুখ সংবিৎ ও দুঃখ সংবিৎ উপজাত হয়। এই উভয়বিধ উপজায়মান সংবিৎ স্বক্ষেত্রে (মনঃক্ষেত্রে) তথাবিধ সংস্কারের আরম্ভ করে। সেই সংস্কার হইতে পুনশ্চ তথাবিধ সংবিতের অনুভব হয়। এইরূপে অপরিমিত সংস্কারোৎপত্তি দ্বারা সমস্ত বিষয়সুখ দুঃখরূপেই প্রতীয়মান হয়, কারণ সমস্ত বিষয়ই দুঃখদ্বারা অনুবিদ্ধ।" জন্মান্তরে এই সকল সংস্কার-অঙ্কিত "আশয়"ই সেই জন্মের "বাসনা"কে উদ্রিক্ত করে। এবং সেই বাসনাবশে জীব আবার শুভাশুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। তাহা হইতে আবার সুখ দুঃখের সংস্কার ও আশয় উৎপন্ন হয়। তাহাতে, "এবম্ অনাদি দুঃখস্রোতঃ বিপ্রসৃতম্ প্রতিকূলাত্মকাৎ যোগিনমেব উদ্বেজয়তি, কস্মাৎ, অক্ষিপাত্র কল্পো হি বিদ্বান্ ইতি"—এইরূপে অনাদি বিপ্রসৃত দুঃখস্রোত প্রতিকূলভাবে যোগিজনকেই উদ্বেজিত করে, অন্যকে করে না, কারণ বিদ্বান

ব্যক্তিরাই অক্ষিপাত্র সদৃশ। ঊর্ণাতন্তু চক্ষের পক্ষে পীড়াপ্রদ হইলেও অন্য গাত্রের পক্ষে পীড়াপ্রদ নহে।

এই হইল দুঃখসূত্রের পূর্ব্বার্দ্ধের যুক্তি। উত্তরার্দ্ধে পতঞ্জলি সুখ ও দুঃখ সত্তার উপাদান ও বৃত্তি নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক বলিতেছেন —"গুণবৃত্তি বিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ"—গুণ সকলের পরস্পর বিরোধ হইতেও বিবেকীর পক্ষে সমস্তই দুঃখ। গুণ হইতেছে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এবং তাহারা যে প্রত্যয় উৎপন্ন করে তাহাই তাহাদের "বৃত্তি।" ত্রিগুণের সেই বৃত্তি হইতেছে সুখ, দুঃখ ও মোহ। বুদ্ধি বা চিত্তসত্তা হইতেছে এই ত্রিগুণ উপাদানে নির্ম্মিত একটি দ্রব্য, এবং তাহাতে ত্রিগুণ সকল সমস্ত সময়েই সহ-অবস্থিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি কোন সময়ে এই ত্রিগুণ সকলের বৃত্তিবশতঃ আমাদের সুখানুভব হয়, কখন বা দুঃখানুভব হয়। তাহার কারণ হইতেছে এই। যদিও গুণ-সকল, সকল সময়েই সহ অবস্থান করিতেছে, তথাপি এই গুণ সকলের মধ্যে এক "বিমর্দ্দ ক্রিয়া" (mutual struggle) সর্ব্বদাই চলিয়াছে। এবং সেই বিমর্দ্দন ও বিরোধ হেতু গুণ সকলের বৈষম্য উপস্থিত হইতেছে। তাহাতে কোন গুণ বড় ও উৎকট হইয়া উঠিতেছে, কোন গুণ ছোট ও অনুৎকট হইয়া যাইতেছে। এইরূপ গুণ-বৈষম্যের মধ্যে সত্ত্বের উৎকট অবস্থায়, আমাদের সুখ অনুভব হয় এবং রজঃ উৎকট হইলে দুঃখানুভব হইয়া থাকে। কিন্তু চিত্ত-সত্তা অতিশয় ক্ষিপ্র-পরিণামী, কোন গুণই তাহাতে একভাবে স্থির থাকিতে সমর্থ নহে। চিত্তে কোন গুণ প্রবল হইলেই অন্য গুণ তাহাকে পরাভব করিতে ধাবমান হয়। সাংখ্য-কারিকা বলিয়াছেন—"গুণ সকল পরস্পরকে আশ্রয় করিতেছে, পরস্পরকে অভিভব করিতেছে, এবং পরস্পর মিথুন ভাবে অবস্থিত হইতেছে।" চলধর্ম্মী ত্রিগুণের ইহাই হইতেছে স্বধর্ম্ম ও কার্য্যবিধি। এবং সেই কার্য্যবিধি অনুসারে তাহাদের যে "বৃত্তি", তাহাও সর্ব্বদাই চঞ্চল বৃত্তি। সত্ত্ব-বৃত্তি সুখ যেমন প্রবল হইতেছে, তমোবৃত্তি মোহ তাহাকে অমনি আচ্ছন্ন করিতে চাহিতেছে, এবং প্রবলীভূত মোহ রজোবৃত্তি দুঃখের মধ্যে আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে। অথচ গুণ ও বৃত্তির এই পরস্পর বিরোধের মধ্যে, কোন গুণই বিনাশ লাভ করিতেছে না। প্রবল গুণের সহিত দুর্ব্বল গুণও সহাবস্থিত হইতেছে, উৎকট সুখের সহিত অনুৎকট দুঃখও এক সঙ্গেই অবস্থান করিতেছে। তাহাতে সর্ব্ববিধ সুখই দুঃখের দ্বারা অবশ্যই আক্রান্ত হইতে বাধ্য হইতেছে। এইরূপ চঞ্চল দুঃখ বিমিশ্র সুখকে বিবেকীগণ দুঃখ বলিয়াই গণ্য করিয়া থাকেন।

এই প্রসঙ্গে যোগাচার্য্যগণ একটি প্রসিদ্ধ 'সংবাদ' পাঠ করিয়া থাকেন। আমরা সেই সংবাদের দ্বারাই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। জৈগীষব্য নামে এক মহাযোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি যোগবলে জাতি-স্মর হইয়া, নরক, তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদি যোনিতে দশ মহাসৃষ্টির মধ্যে যে যে জন্মলাভ করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিতে পারিতেন। আচ্য নামে এক সূক্ষ্মদেহী যোগী কদাচিৎ জৈগীষব্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"হে মহাত্মন্, আপনি নরক তির্য্যগাদি হইতে দেব, মনুষ্যাদি যোনিতে জন্মলাভ করিয়া যে যে সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছেন, তাহার মধ্যে সুখ দুঃখের কোনটি অধিক অনুভব করিয়াছেন ?" উত্তরে জৈগীষব্য বলিলেন—"আমি দশ মহাসর্গের মধ্যে অগণিত জন্মে যে কিছু অনুভব করিয়াছি, তাহা সমস্তই এখন দুঃখ বলিয়াই জানিতেছি। কারণ, বুদ্ধিসত্তার যাহা ধর্ম্ম তাহা ত্রিগুণ এবং ত্রিগুণের যাহা প্রত্যয় তাহা হেয় পক্ষেই ন্যস্ত।"

কিন্তু আরাম-কেদারায় শয়িত আমাদেরও যে এই অত্যন্ত-দুঃখবাদ সহ্য হইবে, এমন আশা আমরা গোড়া হইতেই করি নাই।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার।

সেকালের পল্লীচিত্র

৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে পল্লীজীবন কিরূপ ছিল এই প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব। একখানি সুদূর গণ্ডগ্রামের কথা বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। অন্যান্য গ্রামের কিঞ্চিৎ ন্যূনাতিরিক্ত তারতম্য মাত্র পরিলক্ষিত হইবে।

গ্রামের সাধারণ অবস্থা।

গ্রামে প্রায় দুই তিন সহস্র লোকের বসতি ছিল। ভট্টাচার্য্য, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বংশের ব্রাহ্মণগণ, ঘোষ, বসু, মিত্র, সিংহ প্রভৃতি প্রায় সকল শ্রেণীর কায়স্থ, কামার, কুমার, ধোপা, বৈষ্ণব, নাপিত, যুগী, ময়রা, গোয়ালা, কৈবর্ত্ত স্বর্ণকার, হাড়ী, বাগ্দী, দুলে, পোদ, চুমুরি, মালাকর, ছুতার, মুচি প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোক বাস করিত। সকলেই স্ব স্ব ব্যবসায়োৎপন্ন অর্থে স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ব্রাহ্মণ অধিবাসীর মধ্যে প্রায়ই সকলে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন; এক ঘর পাশ্চাত্য বৈদিকের বাস ছিল। রাঢ়ীয়দিগের মধ্যে কয়েক ঘর কুলীন ব্রাহ্মণ, শূদ্রযাজক ছিলেন না এবং কায়স্থদিগের বাটীতে পক্কান্ন ভোজন ও ফলাহার করিতেন না। তিন চারি ঘর রাঢ়ীয়, আর উল্লিখিত বৈদিক ব্রাহ্মণগণ কায়স্থদিগের বাটীতে যাজকতা করিতেন, কিন্তু ভোজন করিতেন না। অবশিষ্ট অকুলীন ব্রাহ্মণগণ দেবল ব্রাহ্মণের কার্য্য এবং কায়স্থ ও নবশাখদিগের বাটীতে ফলাহার করিতেন। কোন বৈদ্যের বাস ঐ গ্রামে ছিল না। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে এক ঘর বৈদ্যের বাস ছিল। সাধারণ শ্রেণীর অধিবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ রাজমিস্ত্রী, ঘরামি ও কাঠুরিয়ার কায করিত।

যাঁহারা ভদ্রলোক, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দরিদ্র ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের ১০।১২ বিঘা জমি, পুকুরের মাছ, বাগানের তরকারী, ঘরের গাভীর দুগ্ধ ছিল বলিয়া কাহারও গ্রাসাচ্ছাদনের কোন কষ্ট হইত না। অনেকে ভাল চাকুরে এবং একজন সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল ছিলেন। কেহ কেহবা গ্রামেই গোমস্তাগিরি বা মুহুরীগিরি, কেহবা বিদেশে নায়েবী কার্য্য করিতেন। তদ্ব্যতীত অনেকেই নিজ নিজ বাসভবনে থাকিয়া অনায়াস-লব্ধ দ্রব্যাদিতে সন্তুষ্ট চিত্তে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। গ্রামে ডাক্তার, কবিরাজ, ও বাঙ্গলা বিদ্যালয় ছিল। ব্রাহ্মণগণ মধ্যে কিছু কিছু সংস্কৃত চর্চ্চা ছিল; যাঁহারা উহার মধ্যে সংস্কৃতে কিছু পারদর্শী ছিলেন, তাঁহাদের নিকট ব্রাহ্মণবালকগণ সংস্কৃত শিক্ষা করিত এবং দশকর্ম্মোপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া যাজন ক্রিয়া সম্পাদন করিত। গ্রামে অনেকগুলি বড় বড় পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকা ছিল; তাহার জল স্বচ্ছ, নির্ম্মল ও সুপেয় ছিল। গ্রামের মধ্যে কাহারও কোন বিশেষ আধিব্যাধি ছিল না। মুদি ও ময়রার অনেকগুলি দোকান ও একটি ভাল বাজার ছিল। প্রত্যহ প্রাতে বাজার বসিত ও সপ্তাহে দুই দিন বৈকালে হাট হইত। বাজারে ও হাটে গ্রামের ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী নানা স্থানের মৎস্য, তরকারী, ফলমূল, চাউল, ডাল বস্ত্রাদি বিক্রয়ের জন্য আসিত। ঐ বাজারে ২।৩ খানি মুদির, ২।৩ খানি ময়রার, ৩।৪ খানি কাপড়ের, একখানি সূতার ও একখানি দরজীর দোকান স্থায়ীভাবে ছিল। বাজারে, হাটে পার্শ্ববর্ত্তী ২।৩ ক্রোশ দূরস্থিত গ্রামের লোক আসিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিয়া লইয়া যাইত। তথায় বিস্তর লোকসমাগম হইত। ক্রয় বিক্রয় কার্য্য প্রচুররূপে হওয়ায় বিক্রেতা বেশ লাভবান হইত; এমন কি ঐ বিক্রয়লব্ধ অর্থে অনেকে পাকা বাড়ী তৈয়ার করিয়াছে এবং অনেকে জমা জমি ক্রয় করিয়াছে।

ভদ্রলোকদিগের মধ্যে অনেকের চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত দোতালা বাড়ী, ৺পূজার দালান ও তৎসংলগ্ন বৈঠকখানা, অতিথিশালা ও অন্যান্য লোকের থাকিবার

স্নান এবং অন্দর মহলের পার্শ্বেই খিড়কী পুষ্করিণী ছিল। ঘোষেদের পূজার দালান তখন তদঞ্চলে সুপ্রসিদ্ধ ছিল এখন ভগ্নাবস্থাতেও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। বহির্ভাগে গোহালবাড়ী, শাক সব্জী ও ফুলের বাগান। এ ছাড়া তাঁহাদের নানাবিধ ফলের বাগান ও মৎস্যপূর্ণ সুবৃহৎ পুষ্করিণী ছিল। কাহারও কাহারও একতালা বাড়ী ও খড়ুয়া চণ্ডীমণ্ডপ, গোহালঘর, তৎপার্শ্বেই শাক সব্জী, ফল ও ফুলের বাগান ছিল। সকলেরই নিজের ঢেঁকিশালা থাকিত। ব্রাহ্মণ বাড়ী চরকা চলিত। সিংহ মহাশয়েরা গ্রামের জমিদার, তাঁহাদের ভদ্রাসন বাটীর চারিদিকে গড় কাটা। উহার ভিতরে সূত্রধর, মালাকর, চুহরি, গোয়ালা, কৈবর্ত্ত, যুগী প্রভৃতির বাস ছিল। তাহার ভিতরেই শিব মন্দির ও মধুসূদনের একতালা বাড়ী। মধুসূদনেরই হাটবাজার। ঐ হাটবাজার হইতেই দেবসেবা চলিত এবং সেবায়েত ব্রাহ্মণদের সংসার চলিত। ঘোষ মহাশয়েরাও বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পরিবার। ইঁহাদের ১৮।১৯ ঘর একত্রে বাস অধিকাংশেরই দোতালা পাকাবাড়ী। ইঁহাদের বাস; ভবন এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে ডাকাইতরা প্রবেশ করিয়াও কিছু করিতে না পারিয়া ফিরিয়া যাইত। মিত্র ও বসু পরিবারেরাও অনেকে একত্রে বাস করিতেন।

যাহারা ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের কাহারও কাহারও দ্বিতল বাড়ী ও জমিজমা ছিল; ঐ জমিজমার উৎপন্নে এবং যাজন ক্রিয়া, দুর্গোৎসবাদির আয়ে তাঁহারা সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেন। যাঁহাদের জমিজমা অত্যল্প, তাঁহারাও কোন ক্রমে কষ্ট পাইতেন না। ব্রাহ্মণদের প্রত্যেকের ঘরে চরকা ছিল। বাড়ীর আশে পাশে কার্পাস গাছ থাকিত; বাড়ীর মেয়েরা তাহাতা পৈতা তৈয়ারী করিতেন।

গ্রামে গাঁজা গুলির দোকান ও ২।৩ ঘর বেশ্যালয় ছিল। মদের দোকান ছিল না। তখন গ্রামে প্রতি বৎসরেই ২।৩ খানা বারোয়ারী পূজা হইত এবং তদুপলক্ষে গোবিন্দ অধিকারী, ব্রজরায় প্রভৃতি দলের যাত্রাগান হইত। তখন দ্রব্যাদি বড়ই সুলভ ছিল। ১৸০।২৲ টাকা করিয়া চাউলের মণ, ১০। ১০॥০ টাকা করিয়া, খাঁটি সরিষার তৈলের মণ, টাকায় ষোল সের করিয়া খাঁটি দুগ্ধ, আটসের উৎকৃষ্ট ছানা। বহুকাল হইতে বাজারের গায়ে পুলিস ছিল। পরে পোষ্ট আফিস স্থাপিত হইয়াছে। অনেক দিন হইল পুলিস এ গ্রাম হইতে উঠিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামে গিয়াছে।

৬০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রামে ২।৪টি পাঠশালা ছিল। হরিশ ঘোষ নামক একজন লোক নিজ বাটীতে গুরুগিরি করিতেন। ছাত্র সংখ্যা ৩০।৪০জন ছিল, উহার মধ্যে একজন সর্দ্দার পড়ো থাকিত; সে ছাত্রদিগের পরিদেবনা করিত। গুরু মহাশয় সর্ব্বোপরি কর্ত্তা ছিলেন।

পাঠশালা প্রাতে ১০।১১টা ও বৈকালে ৩টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পাঠশালা বসিত। প্রাতে পড়োদিগের উপস্থিত হইবার সময়মত হাত-ছড়ির নিয়ম ছিল—অর্থাৎ ছাত্রদিগের পাঠশালায় উপস্থিত হইবার ক্রম অনুসারে ছড়ি বা বেত্র দ্বারা একাদিক্রমে হাতের চাটুতে আঘাত করা হইত; আর যে ছাত্র প্রথম উপস্থিত হইত, সে শূন্য অর্থাৎ ছড়ি বা বেতের গুঁতা মাত্র পাইত। ইহাই দৈনিক Attendance Roll ছিল। সর্দ্দার পড়োর উপরে এই কার্য্যের ভার ছিল; যাহার প্রতি যেরূপ জোরে আঘাত করিতে হইবে সে সেইরূপ করিত; স্থূল কথা, যে যত বিলম্বে উপস্থিত হইত, সে তত অধিক সংখ্যায় ও জোরে আঘাত পাইত। এক একজনের হাতের চাটু লাল হইয়া যাইত, ক্রন্দন না করিয়া থাকিতে পারিত না। কোন বালক কামাই করিলে সর্দ্দার পড়ো ও ২।৪জন পড়ো উহার বাটীতে উপস্থিত হইত; সে পীড়িত না হইলে, তাহাকে ধরিয়া আনা হইত এবং পাঠশালায় গুরু মহাশয় নিজে উহার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতেন। কোন বালক দুষ্টামী করিয়া পাঠশালায় না আসিতে চাহিলে, কিংবা কোথাও লুকাইয়া থাকিলে তাহাকে ধরিয়া, তাহার কোন ওজর না শুনিয়া, পড়ুয়ারা উহার হাতে পায়ে ধরিয়া আড়কোলা করিয়া পাঠশালায়

আনিয়া উপস্থিত করিত। এরূপ দুষ্ট ও অন্ত প্রকার গুরুতর দোষী ছেলেকে গুরু মহাশয় জলবিছুটি দ্বারা শাসন করিতেন। জল বিছুটি জিনিষটা কি তাহা বোধ হয় এখনকার ছেলেরা জ্ঞাত নহে। উহা এই—বিছুটি নামে একটা গুল্ম জাতীয় বুনোগাছ পাড়াগাঁয়ে যথেষ্ট জন্মে; উহার পাতায় ও গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোমবৎ পদার্থ থাকে, তাহা গায়ে লাগিলেই জ্বালা করে, চুলকায় ও চর্ম্ম ফুলিয়া যায়। জলযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিলে তাহাতে উহার গুণাধিক্য হয়। পাঠশালায় আরও কয়েক প্রকার ছাত্র-শাসন-প্রণালী প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে দুইটী উল্লেখযোগ্য। (১) "গোপাল নাড়ু" ইহার অর্থ বালককে হামার মত চারি হাত পায়ে অবস্থাপিত করিয়া, তাহার বাম বা দক্ষিণ হাতের চাটুতে একখানি ইঁট বা একটি ঢেলা নির্দ্ধারিতকাল পর্য্যন্ত রাখা; বালক অশক্ত হইলে বা ঐ ভার ফেলিয়া দিলে, সর্দ্দার পোড়ো বা গুরু মহাশয় তখন তাহাকে বেত্রাঘাত করিতেন। (২) এক পায়ে দাঁড় করান; ছাত্রের দোষ বিশেষে তাহাকে এক পা ভূমি হইতে কিছু ঊর্দ্ধে উঠাইয়া, নিজের এক কাণ ধরিয়া, নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত সোজাভাবে দাঁড়াইতে হইত। ইতিমধ্যে যদি বালক ভূমিতে পা ফেলিত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বেত্রাঘাত দ্বারা সে অপরাধের শাসন হইত। পাঠশালার পড়োয়া গুরু মহাশয় ও সর্দ্দার পড়োকে নানাবিধ দ্রব্য বাটী হইতে প্রকাশ্যভাবে বা লুকাইয়া আনিয়া উপহার দিত। তন্মধ্যে শশা, কলা, লাউ, কুমড়া, নারিকেল, দোক্তা, গুড়ুক তামাক উল্লেখ করা যাইতে পারে। ছাত্রেরা গুরু মহাশয়ের অনেক ফাই ফরমাইশ খাটিত। হরিশ গুরুমহাশয়ের পরিজন কেহ ছিল না। পাঠশালার ছেলেরা তাঁহার বাজার করিয়া আনিত, ঘর ঝাঁটান ও অন্যান্য সামান্য সামান্য গৃহকর্ম্মও করিয়া দিত। তাঁহার বাটীর সম্মুখের বাগানখানি কোদলাইয়া দিত। সর্দ্দার পড়ো বা গুরু মহাশয়ের অনুমতি না লইয়া কেহ শৌচ, প্রস্রাব করিতে যাইতে পারিত না; ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইলে বেত্রাঘাত উহার প্রতিকার ছিল।

পাঠশালায় প্রথমে তালপাতায়, পরে কলাপাতায়, তৎপরে দেশী কাগজে পড়োয়া লিখিত। স্লেট তখন তত প্রচলিত ছিল না। কাঠের তক্তি উহার স্থানে ব্যবহৃত হইত। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সকল ছাত্রেরা দাঁড়াইয়া কড়াঙ্কে, শটকে (শতকিয়া) উচ্চৈঃস্বরে সর্দ্দার পড়োর আবৃত্তির অনুসরণ করিত; কোন কোন ছাত্র কেবল শেষ অংশ, যেমন কড়া বা গণ্ডা, বলিত ও এই ফাঁকি পড়িয়া আপনাকে আপনি ফাঁকি দিত। পুস্তকের মধ্যে, শিশুবোধ ও চাণক্যশ্লোকের অনুবাদ পড়ান ও সংস্কৃত চাণক্যশ্লোক মুখস্থ করান হইত। অঙ্ক—যোগ, বিয়োগ, ত্রৈরাশিক, ডাইনে ভাঙ্গা, বাঁয়ে ভাঙ্গা, সুদকসা কাঠাকালি, বিঘাকালী এবং শুভঙ্করী অঙ্ক শেখান হইত। সর্দ্দার পোড়ো গোমস্তা বা মুহুরীগিরি কর্ম্ম লইয়া চলিয়া গেলে উহার স্থানে আর একজন উপযুক্ত পড়োকে সর্দ্দার পড়ো করিয়া নিযুক্ত করা হইত। ছুটি ক্বচিৎ কখন পর্ব্বোপলক্ষে হইত। পরীক্ষা বা পারিতোষিক বিতরণের নিয়ম ছিল না। অন্যান্য পাঠশালার নিয়মও প্রায় এইরূপ; তবে ছাত্র শাসনের তারতম্য কোথাও কোথাও ছিল। ছাত্রদের বেতন /০, ৵০ আনা ছিল। দুঃখীর ছেলে বিনা বেতনেও পড়িত; কোন কোন ছোটলোকের ছেলেরাও পাঠশালায় পড়িত; মুসলমান ছাত্র বিরল ছিল। গুরু মহাশয়দিগের শাসনে কোন বালকের কর্ত্তৃপক্ষ কখন কোন বাধা দিতেন না বা কোন আপত্তি করিতেন নাই।

হার্ডিঞ্জস্কুল
মধ্যইংরাজী বা
এণ্ট্রান্স স্কুল।

এই পাঠশালা থাকিতে থাকিতে গ্রামে প্রথম হার্ডিঞ্জ স্কুল স্থাপিত হয়। সেখানে গ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বালকেরা পড়িত। স্কুল চলিবার পরে পাঠশালাগুলি ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া গেল। ছাত্রের বেতন বেতন মাসিক /০ আনা করিয়া ছিল। এইরূপে মাসে সর্ব্বশুদ্ধ ৪, ৫, ৬ টাকা পর্য্যন্ত বেতন আদায় হইয়া গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হইত। তৎপরিবর্ত্তে

শিক্ষকের বেতন ও অন্যান্য খরচের জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রায় প্রতিমাসে ৩০ টাকা সাহায্য স্বরূপ পাঠাইয়া দিতেন। প্রথম প্রথম এই স্কুল হইতে বয়স্ক ছাত্রেরা পণ্ডিত মহাশয়ের সার্টিফিকেট লইয়া ইনস্পেক্টর এইচ উড্রো সাহেবের নিকট গেলে, কোন সার্কেল স্কুলের পণ্ডিত হইত। পরে হুগলীতে নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হইলে, ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া ছাত্রদের পরীক্ষা লইতেন। বাচনিক পরীক্ষোত্তীর্ণ সেই সকল ছাত্রেরা ৩ টাকা বৃত্তি পাইয়া নর্ম্মাল স্কুলে পড়িয়া ঐরূপ পণ্ডিত হইত। এক একজন পণ্ডিত ২।৩ ক্রোশ ব্যবধানের ২।৩টি স্কুলের পণ্ডিতি করিতেন; তাঁহাদের বেতন মাসিক ১৫ টাকা ছিল। ইহার কিছুদিন পরে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়। গ্রামের স্কুলেই ঐ পরীক্ষা ২।৩ দিন ধরিয়া গৃহীত হইত। গ্রামের ভদ্রলোকেরা ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টরকে ঐ কার্য্যে সহায়তা করিতেন। পরীক্ষার কয়েক দিন পরে ফল জানা যাইত। দুই একটি ছাত্র ঐ বৃত্তি (মাসিক ৪ টাকা) পাইয়া কেহ হুগলী, কেহ কলিকাতায় হেয়ার সাহেবের স্কুলে পড়িতে আসিত। দুঃখের বিষয় স্কুলে বা গ্রামের আর কোথাও ইংরাজী পড়িবার কোন সুবিধা ছিল না। কখন কখন দুই পাঁচ মাসের জন্য একজন মাষ্টারের নিকট ২।১০ জন বালক কাহারও বাটীতে ইংরাজী পড়িত। মাষ্টার গ্রামের লোকই হইতেন। বিদেশ হইতে বাটী আসিয়া ইংরাজী ক্ষুদ্র পাঠশালার মত করিয়া বালকদিগকে পড়াইতেন। খুব প্রাতে ও বৈকালে স্কুলের ছুটীর পরে এই ইংরাজী পাঠশালা বসিত। ছাত্রের বেতন মাসিক ।০ আনা মাত্র ছিল; তাহাও সকলে নিয়মিতরূপে দিতে পারিত না; কাজেই বেশীদিন এই ইংরাজী পড়ার সুবিধা হইত না। ইংরাজী পাঠশালা উঠিয়া যাইত।

হার্ডিঞ্জ স্কুলের বেশ উন্নতি হইতে না হইতেই দেশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইল। ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ কমিতে লাগিল। উপযুক্ত ছাত্রাভাবে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা সকল বৎসর ঘটিত না। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে একটি মধ্য-ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হওয়ায়, ক্রমে এই গ্রামের স্কুলের অবনতি ও নূতন স্কুলের উন্নতি হইতে লাগিল। এই দেখিয়া গ্রামস্থ লোকেরা হার্ডিঞ্জ স্কুলের পরিবর্ত্তে মধ্য-ইংরাজী স্কুল স্থাপিত করিলেন। গবর্ণমেণ্ট আর তত টাকা সাহায্য করিলেন না। গ্রামের লোকের চাঁদা ও ছাত্রদিগের বেতনের উপরে স্কুলের জীবন নির্ভর করিল। ক্রমে ঐ মধ্য ইংরাজী স্কুলকে এণ্ট্রান্স স্কুলে পরিণত করা হইল; অবশ্য ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর ও সব ডিবিজনাল অফিসারের অনুগ্রহ ও চেষ্টা ভিন্ন তাহা সফল হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট হইতে যথাসম্ভব সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ঐরূপ স্কুলের নিয়মানুসারে, উপর্য্যুপরি তিন বৎসর একটি ছাত্রও স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারায়, গবর্ণমেণ্টের দেয় স্কুলের চাঁদা বন্ধ হইল। তাহার ফলে এণ্ট্রান্স স্কুলটি উঠিয়া গেল, তৎসঙ্গে পূর্ব্বের হার্ডিঞ্জ স্কুলের পুনর্জীবনেরও কোন সম্ভাবনা থাকিল না। স্কুলের অনেক ছাত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া চলিয়া গেল। ইহার পরে কিছুদিন গ্রামের লোকের চাঁদা ও অল্পসংখ্যক ছাত্রদত্ত বেতনের দ্বারা কিছুদিন স্কুলটি খাড়া থাকিবার পরে, ছাত্রের অভাবে ও চাঁদার অভাবে উহাও এককালে উঠিয়া গিয়াছে। যে গণ্ডগ্রামে শতাধিক ছাত্র স্কুলে পড়িতেছিল, ম্যালেরিয়ার প্রকোপে গ্রাম উৎসন্ন হওয়ায় তথায় ১২ জন ছাত্রও পড়িতে থাকিল না। অবশ্য গ্রামের কোন কোন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরা কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে বাস করিয়া আপনাদের সন্তান সন্ততিগণকে লেখাপড়া শিখাইয়া আসিতেছেন। ইদানীং উক্ত গ্রামের অধিবাসী লোকের বালকগণ কেহই লেখাপড়া শিখিতে পাইতেছে না। পাঠশালার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও কোথাও নাই। ঐ গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কোন চেষ্টা কখনও হয় নাই। সুতরাং গ্রামস্থ বালিকারা কখনই শিক্ষার কোন স্বাদ এযাবৎকাল পায় নাই। তখন অন্য স্থান হইতে যে সকল মেয়ে বধূরূপে গ্রামে আসিত, তাহাদের মধ্যে লেখাপড়া

যাঁরা কেহ থাকিলে তাহাদের নিকট হইতে গ্রামের বালিকারা ও বয়স্থারা যদি কিছু লিখিতে পড়িতে শিখিত তাহাই যথেষ্ট হইত।

টোল।

এই গ্রামে সামান্য দুইখানি টোল ছিল। ২।৪টি করিয়া ছাত্র মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, অমরকোষ এবং নব্য স্মৃতি অধ্যয়ন করিত। গ্রামের লোকের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি ঐ দুই স্থান হইতে লওয়া হইত। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে এক জন্মান্ধ ব্রাহ্মণ অধ্যাপক ছিলেন; তিনি আশ্চার্য্যরূপে শাস্ত্রাভ্যাস করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে আপন পিতার নিকট মুগ্ধবোধ ও অমরকোষ পড়িয়া, ভট্টপল্লীতে কোন অধ্যাপকের আশ্রয় লয়েন। তিনি দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে নিজ বাটীতে থাকিতে ও খাইতে দিয়া কাব্য ও স্মৃতিশাস্ত্র পড়াইতেন। ছাত্রের অপূর্ব্ব স্মরণশক্তি ছিল; তিনি অধ্যাপকের নিকট পাঠ লইয়া, এবং সতীর্থের নিকট দুই একবার শুনিয়াই তাহা কণ্ঠস্থ করিতে পারিতেন। তদ্ভিন্ন অন্য ছাত্রের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ শ্রবণ করিয়া তাহাও মুখস্থ করিয়া ফেলিতেন। সময়ে সময়ে ভিন্ন শাস্ত্রপাঠী ছাত্র অধ্যাপকের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর করিতে না পারিলে, ঐ অন্ধছাত্র তাহার সদুত্তর করিতেন; ইহাতে অধ্যাপক চমৎকৃত ও আনন্দে আপ্লুত হইতেন। এইরূপে কিছুকাল ঐ টোলে ও অন্যান্য কিছু কিছু শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করতঃ নিজ বাটীতে আসিয়া টোল করিয়াছিলেন। এবং তথায় ব্যাকরণ ও কাব্যাদির অধ্যাপনা করিতেন। বহুদিন ঐরূপ অধ্যাপকতা করিয়া পরে কালগ্রাসে পতিত হন। আর উক্ত গ্রামস্থ টোলও কালক্রমে অধ্যাপকদিগের মৃত্যুতে অনেক দিন হইতে উঠিয়া গিয়াছে। অধুনা গ্রামের দুরবস্থা এতদূর হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গ্রামে আদৌ নাই। কোন ব্যবস্থা বা যাত্রিক দিন দেখিয়া দিবারও কেহ নাই। যাহা করে পঞ্জিকা।

চিকিৎসা ও ম্যালেরিয়া।

৫৫ বৎসর পূর্ব্বে—অর্থাৎ গ্রামে যখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হয় নাই তখন—গ্রামের লোকের জ্বর ও পেটের দোষ ইত্যাদি পীড়া হইলে কবিরাজী চিকিৎসা হইত। গ্রামে একজন মাত্র বৈষ্ণব জাতীয় লোক, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের একজন নাপিত ও অন্য একজন বৈদ্যজাতীয় চিকিৎসক চিকিৎসা করিতেন। ইঁহাদের চিকিৎসায় রোগ আরোগ্য না হইলে অন্যস্থান হইতে বড় বৈদ্যকে ডাকা হইত।

তখন কবিরাজী চিকিৎসা অতি সুলভ ছিল। প্রথমে কবিরাজকে প্রণামী একটি আধুলি বা একটি টাকা দিলে, তিনি প্রত্যহ একবার বা দুইবারও রোগী দেখিতে আসিতেন এবং ঔষধও নিজের কৌটা হইতে দিতেন। রোগ আরোগ্য হইলে বিদায় বলিয়া আর একটি টাকা এবং কোথাও কোথাও একটা তৈজস বা একখানি বস্ত্র পাইতেন। বড় মানুষের পীড়া আরোগ্য হইলে বনাত শাল লাভ ঘটিত। দূরবর্ত্তী স্থান হইতে বড় কবিরাজ আসিলে তাঁহার পাল্কীভাড়া ও দর্শনী ৪।৫ টাকা দিতে হইত। সেকালে কবিরাজী চিকিৎসায় কোথাও কোথাও বিষপ্রয়োগও করিতে দেখা যাইত। কোন কোন হাতুড়ে বৈদ্যের বিষঘটিত ঔষধ প্রয়োগই প্রধান অবলম্বন ছিল; বিষবড়ি, সূচিকাভরণ, বাট ও তেঁতুলে বড়ি উহাদের প্রধান ঔষধ ছিল। বিষ চিকিৎসার পরে আর কোন চিকিৎসা চলিত না। চিকিৎসার প্রথম হইতেই ডাবের জল, মিছরির পানা, তেঁতুল গোলা, আমানি, পরে অন্ন দধি দুগ্ধাদি রোগীকে দেওয়া হইত। শেষে যাহারা বাঁচিয়া উঠিত, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ জ্বর ত্যাগ হইলে ফুলিয়া পড়িত; তখন পুনরায় বৈদ্যের আশ্রয় লইতে হইত। কেহ বাঁচিত, কেহ বা মরিয়া যাইত। পরাণ বসুর নাস প্রয়োগ অসারের সাররূপে ব্যবহৃত হইত; ইহাতেও সুত করা খুব বেশী ছিল; নস্য দিলেই ত ঠাণ্ডা জলে স্নান করান হইত। তাহার ফলে ধাতু এরূপ পরিবর্ত্তিত হইত যে আর তাহার জ্বরজ্বালা হইত না; হইলে তাহার শীতল জলে স্নান করা কখন বন্ধ হইত না; ঐ স্নানের জন্য কোনও ক্ষতি হইত না।

গ্রামের একজন খোঁড়া নাপিত অস্ত্রচিকিৎসা করিত। তাহার চিকিৎসায় খুব সুখ্যাতি ছিল। Bleeding lancet হাতের আঙ্গুলের ভিতর লুকাইয়া লইয়া সে দেখি দেখি করিয়া চকিতের মধ্যে রোগীর অজ্ঞাতে অস্ত্র করিয়া দিত। এরূপ অস্ত্রচিকিৎসা করিয়া সে কখনও কখনও যে বিপদগ্রস্ত ও অখ্যাতি লাভ না করিত তাহাও নহে।

গ্রামে ম্যালেরিয়া দেখা দিলে প্রথমে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে ডাক্তার পাল্‌কী করিয়া চিকিৎসা করিতে আসিতেন। তাঁহার দর্শনী ও পাল্‌কী ভাড়া প্রত্যেক বারে ৪।৫ টাকা লাগিত; ঔষধের মূল্য স্বতন্ত্র লাগিত। পরে গ্রামেই ডাক্তার হইয়াছিল। কদাচিৎ বড় মানুষের বাড়ী, নিকটবর্ত্তী সহর হইতে ভাল ডাক্তার পরামর্শ জন্য আনা হইত। এই সময় হইতে কুইনাইন ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। ম্যালোরিয়ার প্রাদুর্ভাবে ক্রমে ক্রমে গ্রাম উজাড় হইয়া এক্ষণে উহা শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা নিজ নিজ বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র স্বাস্থ্যকর স্থানে ছিলেন, তাঁহারা ও তাঁহাদের বংশধরেরা জীবিত আছেন। গ্রামে এক্ষণে যাঁহারা বস বাস করিতেছেন তাঁহারা কেহই স্বাস্থ্যবান নহেন; প্রত্যুত অনেকেই ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট, শ্রীহীন, প্লীহা ও যকৃতের চিরসেবাপরায়ণ হইয়া অকালমৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে এক সময়ে দশ বার বৎসর ধরিয়া ভদ্রলোকের মধ্যে কাহারও গৃহে সন্তান সন্ততি হওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; পরে উহা কিছু কিছু হইতেছিল, কিন্তু তাহারা দীর্ঘায়ু হইত না। অনেক বংশ একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে লোকসংখ্যা দুই আনা অংশ আছে কি না সন্দেহ।

ভদ্র গৃহকর্ত্তৃগণ প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। গ্রামস্থ ভদ্রলোকদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) যাঁহারা সম্ভ্রান্ত—যাঁহাদের জমিদারী, তালুক বা বিস্তৃত জমাজমি আছে। (২) যাঁহাদের জমিদারী বা তালুক নাই, কেবল বিস্তৃত জমাজমি আছে। (৩) যাঁহাদের কেবলমাত্র ২০।২৫ বিঘা জমি আছে।

গৃহকর্ত্তৃগণের কার্য্য।

প্রথম শ্রেণীর লোকের নায়েব, গোমস্তা, মুহুরি, তৈনিতি, দ্বারবান প্রভৃতি কর্ম্মচারী থাকিত; ঐ কর্ম্মচারীর দ্বারা তাঁহাদের বিষয় সম্পত্তির কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। গৃহকার্য্যের জন্য অবস্থানুরূপ দাস দাসী থাকিত। সকলের পাইখানা ছিল না। যাঁহাদের পাইখানা ছিল না, তাহারা বাড়ী বাহিরে বনের ভিতরে বা বাগানের ভিতরে শৌচকার্য্য সম্পন্ন করিত। যাঁহাদের পাইখানা ছিল, তাহারা প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত করিয়া বাহির বাটীতে আসিলে, চাকর তামাক সাজিয়া আনিয়া দিত। তামাক খাওয়া, খোসগল্প করা ও কর্ম্মচারিগণের সহিত বৈষয়িক কথোপকথন, প্রজার ও গ্রামস্থ ভদ্রাভদ্র লোকের কথাবার্ত্তা শ্রবণ ও তাহাদের বিবাদ বিসংবাদ মিটান, যে প্রজা সাধারণ শ্রেণীর খাতক, খাজনাদি বা কর্জ্জ টাকা বা ধান্য তাগাদা স্বত্বেও দিতেছে না, তাহাদিগকে ডাকাইয়া তাহা আদায়ের ব্যবস্থা করা তাঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। জমিদারী প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে মহাজনী তেজারতি কাবও ছিল; তাঁহারা প্রজা ও অন্যান্য ভদ্রাভদ্র লোককে টাকা বা ধান্য, কেহ বা টাকা ও ধান্য দুইই কর্জ্জ দিতেন। তজ্জন্য তাঁহারা প্রতি টাকায় মাসিক আধ আনা ও ধান্যের 'দেড়া বাড়ী' পাইতেন; অর্থাৎ খাতককে বৎসরের শেষে মহাজনকে আসল ও তাহার অর্দ্ধেক ধান্য বাড়তীর স্বরূপে দিতে হইত। নিজ নিজ জমিদারীতে তাঁহাদের ধান্যের গোলা ছিল। প্রজার বিবাদ মিটাইলে ও প্রজা যথাসময়ে খাজনা দিতে না পারিলে, তাহাদের নিকট হইতে জরিমানা আদায় হইত, ও কর্ম্মচারিগণও দু'পয়সা পাইত। দলাদলির কথাও ঐ সময়ে খুব সতেজে চলিত। অমুক আমার বাড়ী আসে না, অমুক আমার অবাধ্য, অমুক দুবেলা দুমুঠা ভাত স্বচ্ছন্দে খাইতেছে, কাহারও দ্বারস্থ হয় না—তাহাকে জব্দ করিতে হইবে; হয় তাহার

বাড়ী খাওয়া দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে, না হয়, দেওয়ানী বা ফৌজদারী একটা মোকর্দ্দমা তাহার বিরুদ্ধে খাড়া করিতে হইবে। এই সকল পরামর্শ ও যুক্তি তাঁহাদের মাথায় রাতদিন ঘুরিয়া বেড়াইত। আবার অন্যদিকে যাহারা সর্ব্বদা তাহার বাড়ী আসিয়া তাহার সহিত খোসগল্প করিত, তাহার প্রত্যেক কথায় সায় দিত, তাহার বিপক্ষপক্ষের নিন্দাবাদ করিয়া তাহার মন যোগাইত, তিনি তাহার গোলাম হইতেন। তাহাদের আজ পিতৃমাতৃদায়, আজ কন্যাদায়, আজ ঘরে চাউল নাই, আজ ঘরে কুটুম্ব আসিয়াছে, এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যে তিনি তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। এইরূপ কথাবার্ত্তায়, মন্ত্রণায়, সাহায্যদানে, জরিমানা আদায়ে ও মুহুর্মুহু তামাক সেবনে প্রায় বেলা দুই প্রহর হইত।

যাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর, তাঁহাদের জমাজমির সঙ্গে তেজারতি ও মহাজনী কারবার ছিল। তাঁহাদের মধ্যে ২।১ জন ছাড়া কেহই গোমস্তা বা মুহুরি রাখিতেন না। প্রাতঃকালেই প্রজাদের ও খাতকদের বাড়ী গিয়া টাকা ও ধান্য তাগাদা করিয়া আসিতেন। ধান্য নিজের বাড়ীর ভিতরের ও বাহিরের গোলায় বোঝাই হইত। এইরূপে কেহ কেহ ২।৩টি, কেহ কেহ বা ৭।৮টি গোলা করিয়া গিয়াছেন।

যাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীর, তাঁহারা নিজের জমি কতক ভাগে বিলি করিতেন, কতক নিজে কৃষাণ ও হালগরু রাখিয়া চাষ করিতেন। তাঁহারা প্রাতঃকালে উঠিয়া কৃষাণকে সঙ্গে লইয়া, কৃষাণ তখনও না আসিলে তাহার বাড়ী গিয়া জন মজুর ডাকাইয়া, সকলকে লইয়া নিজের জমির আইলে গিয়া উপস্থিত হইতেন। প্রয়োজনীয় কার্য্য সমাধানান্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিতেন; আসিবার সময় কলা, লাউ ডাঁটা, মুগা, বেগুন, শাক প্রভৃতি যাহার কাছে যাহা পাইতেন, লইয়া আসিতেন। ইঁহাদের প্রায় সকলেরই একটি বা দুইটি করিয়া গোলা ছিল; তাহাতে কাহারও সম্বৎসরের কাহারও ২।৩ বৎসরের খোরাকী ধান্য সঞ্চিত থাকিত।

সকল শ্রেণীর ভদ্রলোকেরই দ্বিপ্রহরের সময়ে স্নানাহার করিতেন। আহারের সময়ে কর্ত্রী ঠাকুরাণী আসিয়া গৃহকর্ত্তার কাছে বসিয়া, তাঁহার আহার দেখিতেন ও পাখায় বাতাস করিতেন। পুত্রবধূ পরিবেষণ করিতেন। বধূদের মধ্যে কে কি ব্যঞ্জন রাধিয়াছেন, কর্ত্রীঠাকুরাণী তাহা বলিয়া দিতেন। কর্ত্তার প্রসন্ন মুখে হাসি দেখিলেই, বধূগণ কৃতার্থ হইতেন। কর্ত্তার আহার হইয়া গেলেই পরিবারস্থ আর আর সকলের আহার হইত। কর্ত্রীঠাকুরাণী উহাদেরও আহারাদি পর্য্যাবেক্ষণ করিতেন, এবং যাহার যাহা প্রয়োজন হইত, তিনি স্বহস্তে তাহা দিয়া তাহাদিগকে পরিতোষের সহিত আহার করাইয়া, তবে নিজে আহারে বসিতেন। তখন বধূগণ বা অপর রমণীগণ, তাঁহার কাছে বসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে করিতে খাওয়াইয়া নিশ্চিন্ত হইতেন।

কর্ত্তারা আহারের পরে একটু নিদ্রা ও বিশ্রাম লাভের পর, বৈঠকখানায় বসিয়া তাস, পাশা বা দাবা খেলিতেন। কখনও বা সকলে মিলিয়া কখনও বা একা একা মহাভারতাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। বৈকালে আবার বৈষয়িক ও সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন। পরে কিছু মিষ্টান্ন, (নাড়ু বা চন্দ্রপুলি) চালভাজা, চিঁড়েভাজা বা মুড়ি জলযোগ করিয়া, বাহিরে আসিয়া সকলের সহিত মেলামেশা করিতেন; কখনও বা বাটীর বাহিরে রাস্তার প্রশস্ত সুনির্ম্মিত সাঁকোর উপরে তাঁহাদের বৈঠক বসিত ও মুহুর্মুহু তামাক চলিত। সন্ধ্যার পরে সায়ংকৃত্য সমাপন করিয়া রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত গান বাজনা, গল্প গুজব প্রভৃতিতে সময় যাপন করিতেন। গ্রামের যুগী ও মুচিরা যে কাপড় তৈয়ার করিত, তাহাই তাঁহাদের পরিধেয় ছিল। ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুরের কাপড় খুব কম লোকেই ব্যবহার করিত। তখন জুতার পরিবর্ত্তে খড়ম ব্যবহৃত হইত। কোথাও যাইতে হইলে উড়ানি, পিরাণ ও নাগরা জুতার দরকার হইত।

প্রাচীনা ভদ্র গৃহিণীগণ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যা হইতে

দ্বারে জল ও উঠানে গোবর ছড়া দিয়া আহ্নিক কার্য্য করিতেন। সকলের বাসভবনের পার্শ্বেই নানা তরিতরকারী ও ফুলের গাছ থাকিত—ফুল তুলিতে তাঁহাদিগকে কষ্ট করিয়া দূরে যাইতে হইত না। প্রায় বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তাঁহারা আহ্নিক করিতেন। তাহার পরে তাঁহারা দেবসেবা, পতিপুত্র, পৌত্র, পৌত্রী, দুহিতা, দৌহিত্রী বধূগণের ও ভৃত্যাদির আহারাদি পরিদর্শন ও অভ্যাগত অতিথি সেবায় ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহারা সকলকে খাওয়াইয়া তবে নিজে আহার করিতেন। আহারান্তে রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতির পাঠ শুনিতেন। মেয়েরা লেখাপড়া জানিতেন না; তবে কেহ কেহ ঐ সকল ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠোপযোগী লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। এমন কি তন্মধ্যে কেহ কেহ পড়িতে পারিতেন, লিখিতে পারিতেন না। যেখানে জ্ঞাতিবর্গের বা প্রাতিবেশীদিগের সংখ্যা বেশী, সেখানে ২.৩ স্থানে ঐরূপ রামায়ণ ও মহাভারতাদি পাঠ হইত। যিনি উঁহাদের মধ্যে বর্ষীয়সী, পড়িতে জানেন না, তাঁহার বাড়ীতেই সকলে আসিয়া একত্র হইতেন। সন্ধ্যার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত এইরূপ রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী, দাশুরায়ের পাঁচালী প্রভৃতি পাঠ চলিত। সময়ে সময়ে বাড়ীর ছেলেরা ইহাতে যোগ দিত ও গ্রন্থ পাঠ করিত। জামাই কুটুম্ব আসিলে তাহা দেখাশুনা ও গৃহস্থের সহায়তা করা তাঁহাদের কার্য্য ছিল। সন্ধ্যার সময়ে সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করিয়া মালা জপ করিতেন ও দেব সেবায় মনোনিবেশ করিতেন। ইঁহারা সময়ে সময়ে বাড়ীতে কথকতা দিতেন; তদুপলক্ষে তথায় বিস্তর নরনারীর সমাগম হইত। সকলেই বিশেষ আগ্রহ ও মনোযোগের সহিত তাহা শুনিতেন।

প্রৌঢ়া ও যুবতী

যাঁহারা প্রৌঢ়া, ছেলেমেয়ের মা, ও যাঁহারা যুবতী, তাঁহারা প্রত্যূষে উঠিয়া ঘর দ্বার প্রাঙ্গণ ঝাঁট দিয়া ও রন্ধন গৃহ পরিষ্কার করিয়া, খিড়কীর পুকুরে বাসন মাজিতেন এবং তাহা শেষ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে স্নানকার্য্য সমাপন করতঃ মৃণ্ময় কলস বা পিতলের ঘড়া করিয়া পুকুর হইতে জল তুলিয়া আনিয়া, রন্ধনাদির উদ্যোগ করিতেন। কেহও বা বালকদিগকে এড়া ভাত রাঁধিয়া দিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতেন। প্রায় বেলা ৯টার সময় বাজার বসিত। বাজার হইতে প্রয়োজনীয় তরকারী ও মৎস্য আসিলেই রন্ধন কার্য্য আরম্ভ হইত। দোহাল আসিয়া দুধ দুহিয়া দিয়া গেলেই দুধ জ্বাল দেওয়া হইত, তখন শিশুরা তাহা খাইত। দোহাল না আসিলে বা না থাকিলে কোথাও বা গোয়ালারা দুধ যোগান দিত। যাঁহারা সম্ভ্রান্ত ও অবস্থাপন্ন, যাঁহাদের দাস দাসী থাকিত, তাঁহাদের ঐ সকল গৃহকার্য্য করিতে হইত না, দাসীই ঐ সকল কার্য্য করিত। চাকর বাজার করিয়া দিয়া, দোহালের সঙ্গে গাভী দোহন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, রন্ধনোপযোগী কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিত ও কাষ্ঠের বোঝা ফেলিয়া, হাতে বা কচুর পাতার ঠোঙ্গায়, বা নারিকেল মালায় তৈল লইয়া, তাহা অভ্যঙ্গ মর্দ্দন করিয়া স্নান করিতে যাইত। রন্ধন ও আহারাদি কার্য্য শেষ করিয়া রমণীরা শিশুদের জন্য দুগ্ধ পৃথক রাখিয়া শভাপূর্ণ দুগ্ধ উনানে চড়াইয়া, খিড়কীর ঘাটে গিয়া আচমনাদি কার্য্য শেষ করিতেন। সেই সময়ে খিড়কীর ঘাটে জ্ঞাতি ও প্রতিবেশীদিগের মেয়ে মজলিস বসিত। বর্ষীয়সী বর্ষীয়সীর সহিত, মধ্যবয়স্কা মধ্যবস্কার সহিত, যুবতী যুবতীর সহিত, বধূ বধূর সহিত নিজ নিজ সুখ দুঃখ ভাল মন্দ পরনিন্দা পরচর্চ্চা, গহনা কাপড় প্রভৃতি নানা বিষয়ক কথোপকথন করিতেন। মজলিস ভাঙ্গিলেই বাড়ী আসিয়া শিশু সন্তানদিগকে দুগ্ধ খাওয়াইয়া, স্তন্যপান করাইয়া কেহ বা নিদ্রা দিতেন, কেহ বা কাটনা কাটা, কাঁথা সেলাই, ঘুনসী ও মাথার চুলের দড়ি বোনা প্রভৃতি নানা প্রকার শিল্প কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। অপরাহ্নে রন্ধনগৃহে গিয়া দুগ্ধের কড়া নামাইয়া তাহা হইতে মোটা সর পৃথক করিয়া রাখিয়া দিতেন, তাহা হইতে সুন্দর ঘৃত প্রস্তুত হইত। সময়ে সময়ে মুড়ি, চালভাজা, খই

মুড়কি, ও নারিকেলের সন্দেশ প্রভৃতি তৈয়ার করা হইত। পরে ঘর ঝাঁট, শয্যা তৈয়ার ও প্রদীপ জ্বালান হইত। সন্ধ্যা হইলে প্রদীপ জ্বালিয়া তুলসীতলায় ও ঠাকুর ঘরে উহা রক্ষা করিয়া, তথায় প্রণাম করিয়া, দ্বারে জল দিয়া, গৃহে ধূপ ধুনা জ্বালাইয়া, শাঁখ বাজাইয়া মঙ্গলকার্য্য শেষ করিয়া রন্ধন গৃহে প্রবেশ করিতেন। সংসারের সকল কার্য্যেই তাঁহারা প্রৌঢ়াদিগকে সাহায্য করিতেন। দিবাভাগে স্বামী-সন্দর্শন তখন ঘটিয়া উঠিত না। রাত্রিতে রন্ধন কার্য্য প্রায় রাত্রি ৯টার মধ্যেই শেষ হইত; রাত্রিতেও সকলে আহার করিতেন, কেহ কেহ রুটী খাইতেন। রাত্রিতে তুষ, ও কুচা ঘুঁটে দিয়া মালসা সাজাইয়া তাহাতে আগুন দিয়া, সেই মালসা শয়ন গৃহের বাহিরে রাখা হইত। তাহা হইতে শিশুদের দুধ গরম হইত ও প্রয়োজন হইলে গন্ধক সংলগ্ন পাকাটি দিয়া প্রদীপ জ্বালান হইত। চকমকি ও সোলা ব্যবহৃত হইত। তখন সকলেই সরিষার তৈল দিয়া প্রদীপ জ্বালিতেন। শীতকালে বড়ি, গ্রীষ্মকালে আমসী প্রস্তুত করা, বসন্তকালে কুলচুর, পাকা তেতুল কাটা, আমসত্ত্ব দেওয়া প্রাচীনা ও প্রৌঢ়াদের একটা কায ছিল। তাঁহারা সম্বৎসরের প্রয়োজনোপযোগী ও কুটুম্বদিগকে দিবার জন্ম নানাপ্রকার বড়ি ও আমসত্ত্ব তৈয়ার করিতেন। বৈশাখ মাসে কাসুন্দী কোটার খুব ধুম ছিল। নিজ নিজ ঢেঁকিতে তাহা কোটা হইত। বৈশাখ মাসে ঠাকুর ঘরে ও সকলের বাড়ীতে বৈকালী দেওয়ার ধুম পড়িত। বালিকারা বৈশাখমাসে পুণ্যপুকুর, কার্ত্তিক মাসে যম পুকুর, অগ্রহায়ণ মাসে সেজোতি ব্রত করিত।

একান্নবর্ত্তীপরিবার

তখনও একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা একবারে লোপ পায় নাই। যাঁহারা পৃথক হইয়া ছিলেন, তাহাদের মধ্যেও সদ্ভাব, সম্প্রীতি ও সহানুভূতি বর্ত্তমান ছিল। বিপদে আপদে সময়ে অসময়ে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতেন।

সঞ্চয়।

গ্রামের প্রত্যেক ভদ্রঘরেই তাহাদের অবস্থানুরূপ চাউল বা ধান্য সঞ্চিত থাকিত। প্রায় সকলের ঘরেই চাষের বা খাজনার ধানের চাউল, সম্বৎসরের খাওয়া, দেবসেবা, অতিথি সেবার জন্ম নিজ নিজ ঢেঁকিতে ধান ভাঙ্গাইয়া বা চাল্‌কিদিগকে ধান্য দিয়া তৈয়ার করান থাকিত। তাহার উপরে মুড়ির চাউল, খই ও চিঁড়ার জন্ম ধান্য ঘরে সঞ্চিত থাকিত। যখন নূতন ডাইল কলাই ও তেঁতুল উৎপন্ন হইত, তখন প্রায় সমস্ত গৃহস্থই সম্বৎসরের খরচের জন্ম তাহা তাঁহাদের ঘরে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। নূতন আলুর সময়ে বিস্তর আলু কিনিতেন। এতদ্ব্যতীত নারিকেল ও গুড়ের অভাব ছিল না। আমি দেখিয়াছি কাহারও কাহারও বাড়ীতে গাড়ী গাড়ী খেজুরের গুড়, তাহাদের জমিদারী হইতে আসিত। গৃহিণীরা সেই গুড় দুঃস্থ জ্ঞাতি, প্রতিবেশী ও ব্রাহ্মণ বাড়ীতে যাহা দিবার, দিয়া ঘরে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন এবং কেহ কেহ ঐ গুড় হইতে চিনি তৈয়ার করিয়াও রাখিতেন। তাঁহাদের ঘরে অনেক দিনের পুরাতন গুড়, পুরাতন তেঁতুল ও পুরাতন ঘৃত সঞ্চিত থাকিত—তাহা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইত। যাঁহারা অবস্থাপন্ন ও সম্ভ্রান্ত তাঁহারা জামাই কুটুম্বের জন্য পেস্তা, বাদাম, কিসমিস প্রভৃতি মেওয়াফল, কিছু ফুলেল তৈল ও গোলাপজল সর্ব্বদাই ঘরে সঞ্চয় রাখিতেন। নিজের বাড়ীতে বা অপর কাহারও বাড়ীতে জামাই কুটুম্ব আসিলে তাহা খরচ হইত।

৺ঠাকুর।

অনেক ভদ্রলোকের ঘরেই নারায়ণ ও প্রতিষ্ঠিত শিব আছেন। প্রত্যহ দুইবেলা তাঁহাদের পূজা হইত। তজ্জন্য ব্রাহ্মণ নিযুক্ত থাকিতেন; তাঁহারাই পুরুষানুক্রমে সেই কায করিতেন। তাহাতে তাঁহাদের সংসারযাত্রা একরূপ চলিয়া যাইত।

তখন কি ভদ্র, কি অভদ্র, সকলেরই দেব দ্বিজে ভক্তি ছিল। দোল, দুর্গোৎসব, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, কথকতা, ভাগবতাদি পাঠ, নানাবিধ ব্রতাচরণ তীর্থ ভ্রমণ, অতিথি সেবা, নানা উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ ও

ধর্ম্মকর্ম্ম ও বস্ত্রালঙ্কার

স্বজাতি কায়স্থাদির ভোজন, দুঃস্থের অভাব ও দুঃখ মোচন প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যে বিশেষ শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল। বিশেষতঃ ভদ্র রমণীদের যেন উহা জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, ঐ সকল কার্য্য করিতে না পারিলে তাঁহারা বড়ই ক্ষুণ্ণ হইতেন, তাঁহাদের জীবন যেন বৃথায় গেল ইহাই তাঁহাদের মনে হইত। রমণীদের মধ্যে বস্ত্রালঙ্কারে বড় একটা মন ছিল না; কিসে ভাশুর, দেবর প্রভৃতিকে লইয়া স্বচ্ছন্দ ভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া ঐ সকল ধর্ম্মকর্ম্ম সাধন করিবেন, ইহাই তাঁহাদের জীবনের ব্রত ছিল। আমার পিতামহ তখন কলিকাতায় ভাল চাকরী করিতেন। বাড়ীতে তাঁহার কয়েকজন সহোদর ভ্রাতা ও এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও তাহাদের স্ত্রী ও পুত্রকন্যা ছিলেন। সকলেই একান্নে ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতারা কোন কায করিতেন না। তখনকার পথঘাট এমন ছিল না, সর্ব্বদা বাড়ী আসিতে পারিতেন না। বৎসরের মধ্যে দুই একবার বাড়ী আসিতেন। বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া হইত, অনেক সময়ে তখনও তিনি উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না; তাঁহার ভ্রাতারাই ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন। একবার তিনি কলিকাতায় একটি বাড়ী ক্রয়ের বায়না করিয়া, দেশে আসিয়া তাঁহার স্ত্রীকে বলেন। পিতামহী দেবী, "আমার ভাশুর দেবরেরা, কি ভাবিবেন, আমাকে গালাগালি দিবেন" ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাকে উহা ক্রয় করিতে বিশেষরূপে নিষেধ করেন। পিতামহের আর বাড়ী কেনা হইল না। আমার পিতামহী নিজের গহনা বিক্রয় করিয়া পুষ্করিণী খনন ও প্রতিষ্ঠা করেন। তাহা তাঁহার নিজের, তবু তাঁহার দেবর ভাশুর ও তাহাদের পুত্রগণকে, আহ্লাদের সহিত ভাগ দিয়া গিয়াছেন। আমার পিতামহের মৃত্যুর সময়ে তাঁহার পুত্রগণ নাবালক ছিলেন; তবু তিনি নিজের গহনা বিক্রয় মৃত করিয়া স্বামীর দানসাগর শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তখন অধিকাংশ স্ত্রীলোকদের মধ্যে বস্ত্রালঙ্কারে তত মন ছিল না। স্বামী আদর করিয়া যাহা দিতেন, তাহাই তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতেন। বস্ত্রালঙ্কারের জন্য তাহারা স্বামীকে এক দিনের জন্যও পীড়াপীড়ি করিতেন না। সম্ভ্রান্ত ঘরের যুবতীগণ তখন বাঁউড়ী বাউটি ও চুড়ী সুট সোণার গহনা ব্যবহার করিতেন।

তখন ঢাকাই কাপড়ের বড় আদর ছিল। পরিস্কার মিহি, জরীর ফুল দেওয়া ঢাকাই কাপড় তখনকার ধনী গৃহের অঙ্গনাদিগের অঙ্গশোভা করিত। তাহা পল্লীগ্রামের কচিৎ কাহারও ঘরে থাকিত। ৺বঙ্কিম বাবু তখনকার যুবতীগণের যে চিত্র দিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"পূর্ব্বকালের যুবতীগণের নাম করিতে গেলে, আগে শাঁখা, শাড়ী ও সিন্দুর কৌটা মনে পড়িবে; বাঁকমলের সুঠাম হাত উপরে, মনসা পেড়ে শাড়ীর রাঙ্গা পাড় আসিয়া পড়িয়াছে। হাতে পৈঁছা কঙ্কণ, এবং শঙ্খ (যাহার জুটিল বাউটি নামে সোণার শঙ্খ) * * * কপালে কলা বৌয়ের মত সিন্দুরের রেখা, নাকে চন্দ্রমণ্ডলের মৃত নথ; দাঁতে অমাবস্যার নিশি এবং মস্তকের ঠিক মধ্যভাগে পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় তুঙ্গ কবরী-শিখর।"

তখনকার গহনার ছড়া যাহা যুবতীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহা হইতে বুঝা যাইবে তখন কি কি গহনা ব্যবহৃত হইত, এবং তাহা দেখিলেই বোধ হইবে রুচির কি পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে। ছড়াটি নিম্নে লিখিয়া দিলাম।

ওহে কান্ত একান্ত মনে করি বাসনা,
পরিবারে আভরণ, শুন ওহে প্রাণধন,
স্বর্ণকারে গড়িবারে দাও স্বর্ণ গহনা।
গড়াও গড়াও জড়োয়া সিঁতি, ঝালরেতে দিয়ে মোতি,
না করি ঠাট্টা, কহি দিতে ঝাপটা
বাঁধা কেশে ফুল বিনা সাজেনা।
হয়ে সুমতি, দিও প্রজাপতি,
পিন্ চিরুণী নইলে হবে না।

ভুই কয় দিয়ে কাটা ডাইমন,
নথের মুক্তা হয় যেন পাকা দানা।
কাণবালা, কর্ণফুল, এয়ারিং চৌদানী দুল,
ন-নরি চিক্, গড়ে যেন ঠিক্।
বলি আর, দিও দড়া হার
কণ্ঠমালা দিতে যেন ভুলে যেয়োনা।
তাবিজ বাজু যশমেতে, দশে যেন যশে তাতে,
ভাল করে বলো তারে গড়িবারে মরদানা।
কিসের অপ্রতুল, দিতে নারিকেল ফুল
মাছিদানা, ছারপোকা, যেন ভুলো না।
ওহে তোমায় বলি, দিতে লবঙ্গ কলি,
পরে দিও যবদানা।
বাউটি পৈঁছে, বাঁধা নোয়া,
আংটি হয় যেন হীরা দেওয়া
ওহে হীরা শুনে যেন ভয় পেয়োনা।
দেবে দশ তোলা, রবে সব তোলা,
ওহে জলে কিছু পড়বে না।
হস্তে দিও রতন চোক, কহি দিতে চাবি থোক্
হয়ো ধীর, দিও চাবি জিঞ্জির,
মোটা গোট এক ছড়া বিনা চন্দ্রহারে সাজে না।
গুজরি পঞ্চমে, দিও ক্রমে ক্রমে
পাইজোরের ঘুমুর দিতে ভুলো না।
দিও চরণপদ্ম, হয়ো আমার বাধ্য,
গোল গোল মল দিতে যেন গোল করোনা।
দিও রাইটিং বাক্স, তাতে রাখব গহনার বাক্স,
কিন্তু তার চাবি কাকেও দেব না।
হবে পরিপাটি, দিও বারাণসী শাটী,
চাইলাম বারাণসী বলে, যেওনা ঢাকাই দিতে ভুলে
একশত দুইশত দাম নইলে কাপড় নিওনা।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

পুলিসের গল্প

১। গৌহাটীর কথা

কামাখ্যা।

আমি যৌবনের আরম্ভ হইতেই আমার প্রাত্যহিক কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া রাখি। পুলিসে যখন যাহা করিতাম তাহাও আমার নিজস্ব ডায়েরিতে লিখিয়া রাখিতাম। কিন্তু এই গল্পগুলি লিখিতে আরম্ভ করিবার পর দেখিলাম যে তাহা সমস্তই হারাইয়া গিয়াছে। কত ঘটনার কথা যে ভুলিয়া গিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। যাহা মনে আছে তাহাও আনুপূর্ব্বিক লিখিতে পারিব কি না সন্দেহ। স্থান ও লোকের নাম বোধ হয় প্রায়ই মনে পড়িবে না। পাঠকগণ দয়া এই সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

আমি বড়পেটায় এক বৎসর থাকিবার পর গৌহাটিতে বদলি হইয়া বড় আনন্দিত হইলাম। বড়পেটা কামরূপের মহকুমা মাত্র, কিন্তু গৌহাটিই প্রকৃত কামরূপ। কামরূপ নামটা সম্পূর্ণ সার্থক। কেননা কামরূপ শব্দের অর্থ সুন্দর, কাম (সুশ্রী) রূপ যাহার। বিশ্লেষণ করিয়া সৌন্দর্য্য বুঝাইয়া দিবার ক্ষমতা আমার নাই; আমি কেবল এই মাত্র জানি যে আমার দৃষ্টিতে গৌহাটী বড়ই সুন্দর। অল্প স্থানের মধ্যে একটা নগর, একটা পর্ব্বত, একটা প্রকাণ্ড নদী এবং সেই নদীমধ্যস্থ ছোট বড় পার্ব্বত্য দ্বীপের সমাবেশেই এই সৌন্দর্য্য সৃষ্ট হইয়াছে। পর্ব্বতের নাম নীলাচল। লোকে সাধারণত কামাখ্যা পর্ব্বত বলিয়া থাকে। কিন্তু

স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগকে নীলাচল বলিতেই শুনিয়াছি। গৌহাটির পার্শ্বদেশ দ্রব রৌপ্যাভ স্বচ্ছসলিল বিশালকায় ব্রহ্মপুত্র দ্বারা বিধৌত। নগর ও নীলাচলের মধ্যে পঙ্কিলতোয়া ভরলু নামে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী ব্রহ্মপুত্রে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার জল অপেয় ও অস্বাস্থ্যকর। গৌহাটির সম্মুখে নদীমধ্য হইতে কতকগুলি পাহাড় মাথা বাহির করিয়া রহিয়াছে। ইহার বড়টীর নাম উমানন্দ। ছোট দুইটির মধ্যে একটির নাম উর্ব্বশী, অপরটির নাম মেনকা। উর্ব্বশী ও মেনকা নাম্নী দুই অপ্সরা রূপ দেখাইয়া উমানন্দ শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; তাহারা এই পাপের ফলে শিবের অভিশাপে পাষাণ হইয়া রহিয়াছে। উমানন্দ দ্বীপ দেখিতে বড় সুশ্রী। সেখানে পূর্ব্বে অনেক ময়ূর থাকিত বলিয়া ইংরেজেরা তাহার নাম রাখিয়াছেন পীকক্ আইলাণ্ড—অর্থাৎ ময়ূর দ্বীপ। আমি কিন্তু সেখানে ময়ূর দেখি নাই। আমি যে চারি বৎসর গৌহাটিতে ছিলাম তখন উমানন্দ দ্বীপে একটা উল্লুক ছিল। তাহার হুকু হুকু রবে গৌহাটিরও বায়ু সর্ব্বদা মুখর থাকিত। উমানন্দে একটি বড় মন্দির আছে, সেখানে প্রত্যহ নিয়মিতরূপে হরগৌরীর পূজা হয়।

গৌহাটিতে রাজকার্য্যে অবস্থাপিত হইবার পূর্ব্বে আমি দুইবার সেখানে গিয়াছিলাম। প্রথমবারেই তথাকার পুলিস সব ইন্‌স্পেক্টর কামিনীকুমার ঘোষ কামাখ্যা দেখাইবার জন্য আমাকে একজন পাণ্ডা ঠিক করিয়া দিলেন। পাণ্ডার নাম ভবানীচরণ শর্ম্মা, বয়স ৩২।৩৩ হইবে। গৌরবর্ণ, সুশ্রী এবং সংস্কৃতে সুশিক্ষিত। আমি সেই সমবয়স্ক ব্যক্তিকে প্রদর্শকরূপে পাইয়া আহ্লাদিত হইলাম। আমি প্রথমেই তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে আমি তীর্থ বলিয়া কামাখ্যা দেখিতে আসি নাই, সুতরাং কোন স্থানে পূজাও দিব না, প্রণামও করিব না। ভবানীচরণ তাহাতেই সম্মত হইলেন। প্রাতঃকালে তাঁহার সহিত গৌহাটি হইতে যাত্রা করিলাম। তথা হইতে কামাখ্যা প্রায় দুই মাইল দূরে। প্রায় ৭টার সময়ে পর্ব্বতের পাদদেশে পঁহুছিলাম। সেখান হইতে শিখরদেশে আরোহণ করিতে বোধ হয় এক ঘণ্টা লাগিয়াছিল। তখন জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাস। উঠিতে উঠিতে শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। কামাখ্যা মন্দিরের নিকটবর্ত্তী যখন হইলাম, তখন বিশেষ ক্লান্ত হইলাম। সেই সময়ে ভবানীচরণ বলিলেন, "এখানে একটু দাঁড়াইয়া একবার গৌহাটির দিকে তাকাইয়া দেখুন দেখি।" তাঁহার কথা শুনিয়া, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা যেন স্বর্গের এক বিশাল চিত্র। অতবড় নদী ব্রহ্মপুত্রটাকে চারি পাঁচ হাত পরিসর একটা ছোট খালের মত দেখাইতেছিল। নৌকাগুলি দেখাইতেছিল যেন কলমের এক একটি ড্যাশ। নদীতে সামান্য স্রোত থাকিলে, অথবা বাতাসের অল্পমাত্র ঢেউ উঠিলেও নদীতীরস্থ লোক নদীমধ্যে বৃক্ষ পর্ব্বতাদির প্রতিবিম্ব দেখিতে পায় না। কিন্তু পর্ব্বতের উপরে দাঁড়াইলে দূরত্বের জন্য স্রোত বা তরঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয় না বলিয়া, প্রবল বায়ুর সময়েও নদীবক্ষে সমস্ত বস্তুর নিশ্চল প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। যখন এই সৌন্দর্য্যময় দৃশ্য দেখিতেছিলাম, তখন ভবানীচরণ পাণ্ডা হাস্যমুখে এক একদিকে তাকাইয়া, সেদিকের সৌন্দর্য্যপূর্ণ কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। শ্লোকগুলির ভাষা অতি সুগম ছিল, সমস্তই বুঝিতে পারিলাম। শ্লোক শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই বর্ণিত বস্তু দেখিয়া প্রত্যেকেরই উপভোগ যেন দ্বিগুণ হইল।

তাহার পর তাঁহার সঙ্গে মন্দিরে মন্দিরে বেড়াইতে লাগিলাম। কামাখ্যা কালী, তারা, ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি সমস্ত দেবতার মন্দিরই দেখিলাম। কামাখ্যা মন্দিরের নিকটে পঁহুছিলেই দলে দলে বালিকারা আসিয়া পয়সা চাহিতে লাগিল। আমি এক একজনকে একটি করিয়া পয়সা দিতে গেলাম দেখিয়া পাণ্ডা বলিলেন, "আপনি ওরূপ করিয়া বিতরণ করিলে দশ পোনের টাকায়ও কুলাইতে পারিবেন না। কুমারীদিগকে তাহা দিতে ইচ্ছা করেন তাহা আমার হাতে

দিন, আমি তাহাদিগকে ভাগ করিয়া দিব।" আমি তাঁহার হাতে একটা টাকা দিলাম।

কামাখ্যা মন্দিরের নিকটে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে, তাহার নাম সৌভাগ্যকুণ্ড। তাহার জল পঙ্কিল ও দুর্গন্ধ। শত শত বালক ও যুবক তাহাতে নামিয়া জলক্রীড়া করিতেছিল। কামাখ্যাবাসীর এবং কামাখ্যা তীর্থযাত্রীর এমনই দুর্ভাগ্য যে, এই সৌভাগ্যকুণ্ডের জলটা যে ঘোরতর অশুদ্ধ ও অপবিত্র হইয়া গিয়াছে তাহা তাহাদের বুঝিবার ক্ষমতা নাই।

পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ স্থান ভুবনেশ্বরীর মন্দির। সেখানে গিয়া একজন বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে দেখিলাম। তাঁহার বয়স তখন আশীর অধিক। কিন্তু তখনও তাঁহার শরীর বিলক্ষণ সবল ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক। তিনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং পূর্ব্বাশ্রমের কথা—জাতি, নিবাস, নাম প্রভৃতির সংবাদ কাহাকেও বলেন না এবং কেহ তাঁহাকে সে বিষয়ে প্রশ্নও করে না। তবে তাঁহার সম্বন্ধে একটু অস্পষ্ট ধ্বনি এই শুনিয়াছি যে, তিনি সিপাহী বিদ্রোহ-সংসৃষ্ট একজন পলায়িত অপরাধী।

বেলা ১টা পর্য্যন্ত ভবানীচরণের সঙ্গে নানাস্থান দেখিয়া, অবশেষে তাঁহারই আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কামাখ্যা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। ভবানীচরণকে যৎকিঞ্চিৎ যাহা দিলাম তিনি তাহাতেই সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। কামাখ্যার পাণ্ডাদিগের এইটিই বিশেষত্ব, তাঁহারা অল্পে সন্তুষ্ট হন। তাঁহাদের ব্যবহারে মিথ্যা কপটতা নাই। তাঁহাদের বাড়ীতে বাঙ্গালীর বাড়ীর মত উৎকৃষ্ট রন্ধন হয়।

ইহার পরও কয়েকবার ভবানীচরণের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কিন্তু দুই তিন বৎসরের মধ্যে সেই সৌম্যমূর্ত্তি সচ্চরিত্র এবং প্রফুল্লমুখ যুবকের আয়ুশেষ হইল।

দ্বিতীয়বার কামাখ্যায় গিয়াছিলাম চীফ কমিশনর কটন সাহেবের সঙ্গে। তখন আমি গৌহাটির ইন্স্পেক্টর, সুতরাং চীফ কমিশনরের সঙ্গে থাকিতে বাধ্য ছিলাম। শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই অবগত আছেন যে কটন সাহেব একজন সুবিদ্বান্ লোক ছিলেন। সুতরাং তাঁহার অনুসন্ধিৎসাও অবশ্যই প্রবল এবং তিনি কামাখ্যা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিবেন এই আশঙ্কা করিয়া কামাখ্যার ইতিহাসটা তিন চারি ঘণ্টায় যতদূর সম্ভব পড়িয়া লইলাম। অনেক তথ্য উকীল রামদাস ব্রহ্ম মহাশয়ের কাছে মুখে মুখে শুনিয়া লইলাম। ইতিহাসে রামদাস বাবুর বিশেষ দখল ছিল। তাঁহার মুখে যাহা শুনিলাম এবং নিজে পড়িয়া যাহা জানিলাম, তাহা সমস্তই কাযে লাগিল। কটন সাহেব প্রথমে ডেপুটী কমিশনর সাহেবকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার উত্তর সন্তোষজনক না হওয়ায়, একজন ডেপুটির দিকে তাকাইলেন। তিনিও সকল কথা বলিতে পারিলেন না দেখিয়া, আমি আহূত না হইয়াও সমস্ত উত্তর ঠিক ঠিক দিতে লাগিলাম। অবশেষে তিনি এবং সঙ্গের অনেক সাহেব ছিন্নমস্তার ছবির নিকটে একত্র হইয়া তাহার পৌরাণিক বার্ত্তা জানিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল প্রকাশ করিলেন। আমি অন্নদামঙ্গলে ছিন্নমস্তা সম্বন্ধে বহুকাল পূর্ব্বে যাহা পড়িয়াছিলাম তাহাই বলিয়া দিলাম। শিবের শ্বশুর দক্ষ এক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে শিবকে নিমন্ত্রণ করেন নাই; শিবানী কিন্তু পিতৃভবনে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। শিব তাহাতে আপত্তি করিলেন; ইহাতে শিবকে ভয় দেখাইয়া দক্ষালয়ে যাইবার অনুমতি আদায় করিবার জন্য শিবানী নানা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিলেন—প্রথমে কালী মূর্ত্তি, পরে তারা ইত্যাদির পর সর্ব্বশেষে ছিন্নমস্তার মূর্ত্তি দেখিয়া শিব ভীত হইয়া শিবানীকে পিত্রালয়ে যাইবার অনুমতি দিলেন। সাহেবেরা গল্পটা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন।

কথায় কথায় কালাপাহাড়ের নাম উঠিল। কটন সাহেব বলিলেন, তিনি বাঙ্গলার ইতিহাস পড়িয়াছেন, কিন্তু কালাপাহাড়ের নামটা পান নাই। কালাপাহাড়ের ঐতিহাসিক বিবরণ আমার যাহা মনে ছিল তাহা

বলিয়া দিলাম। কষ্টন সাহেব যে কালাপাহাড়ের সংবাদটা জানেন না ইহাতে বিস্ময় বোধ হইল।

পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসীর বীরত্বব্যঞ্জক আকৃতি দেখিয়া কটন সাহেবও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আমি আরও একবার কামাখ্যায় গিয়াছিলাম। কোন রাজকার্য্য উপলক্ষ্যে নহে, কিন্তু চারি পাঁচজন বন্ধুর সহিত একত্র হইয়া, ভবানীচরণ পাণ্ডার ভ্রাতা হরিচরণ পাণ্ডার বাড়ীতে আহার করিবার জন্য। প্রাতঃকালেই পর্ব্বতে পঁহুছিলাম। পাণ্ডার বাড়ীতে রন্ধন আরম্ভ হইল। আমরা প্রত্যেকে দুই তিনটা করিয়া ডাবের জল খাইয়া, পর্ব্বতের লোকালয় ছাড়িয়া নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, লোকালয় হইতে এক মাইল দেড় মাইল দূরে সেই গভীর বন মধ্যেও ছোট ছোট মন্দির এবং মানুষের বাসোপযোগী গুহা আছে। তাহার কোন কোনটা দেখিয়া বোধ হইল তাহাতে দুই একজন লোক প্রায়ই বাস করে। বেলা ৯।১০টার সময়ে আমরা বন ভ্রমণ করিয়া পাণ্ডার বাড়ীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জানিলাম যে, আরও তিন চারি ঘণ্টার পরে আহার্য্য প্রস্তুত হইবে। এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে দূরবর্ত্তী একটা বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে। পাণ্ডা অতি বিমর্ষভাবে বলিলেন, "আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত। আমাদের বাড়ী সকল পরস্পর সংলগ্নপ্রায়। পাহাড়ে এমন জল নাই যাহা দিয়া আগুন নিবান যাইতে পারে। যে ঝরণা আছে তাহার জল আমাদের পান, পাক ও স্নানের জন্যও প্রচুর নহে।" ইহা শুনিয়া আমরা সকলেই ভীত হইয়া কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। রন্ধন বন্ধ হইল। গৃহস্থেরা সকলেই নিজ নিজ গৃহ হইতে বিছানা বাক্স বাসন ইত্যাদি যথাসাধ্য বাহির করিতে লাগিলেন। আমি সঙ্গিগণ সহ হরিচরণের সাহায্য করিতে লাগিলাম। অতি নিকটস্থ গৃহ হইতে অগ্নি ও ধূমোদ্গম হইতেছে দেখিয়া আমি পাণ্ডার ঘর কয়েকখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চেষ্টা করার প্রস্তাব করিলাম। ইহাতে সকলেরই সম্মতি হইল। সকলেই ঘরের চাল ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলাম। অতি কষ্টে একখানি চালা মাত্র টানিয়া নীচে ফেলিলে, তখন শরীরে আগুনের উত্তাপ লাগিতে লাগিল। তখন সমস্ত চেষ্টা বিফল দেখিয়া সেস্থান ত্যাগ করিতে গিয়া দেখি যে, আমাদের চারিদিকেই আগুন। এতক্ষণে আমরা ভীত হইলাম। বাড়ীর কাছে এক ঝোপ বাঁশ ছিল। সেই ঝোপের মধ্য দিয়া কোন মতে গলিয়া বাহির হইয়া পলায়ন করিলাম। সকলেই কিছু না কিছু অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়াছিলাম। অগ্নিমধ্য হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম যেন খাণ্ডব দাহন হইতেছে। বড় একখানা ঘর জ্বলিয়া প্রায় সমস্তই খসিয়া পড়িতেছিল। আমরা সেই ঘরের কাছে বসিলাম। হঠাৎ দেখিলাম সেই অগ্নিরাশির মধ্য হইতে একজন লোক আমাদের দিকে আসিতেছে। আমি তাহাকে চিনিতে পারিলাম না, কিন্তু তিনি বাহির হইয়াই বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্টর বাবু একেবারে পুড়িয়া গিয়াছি।" আমরা তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া কলাপাতার বিছানা করিয়া শয়ন করাইলাম। তখন তাঁহার উভয় পদতল দিয়া রক্ত পড়িতেছিল। তিনি হরিচরণ পাণ্ডার অতি নিকট সম্পর্কীয়। বহু আত্মীয় স্বজন সমবেত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। আমি ডাক্তারের জন্য গৌহাটিতে দুইজন কনষ্টেবল পাঠাইলাম। কিন্তু ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বেই লোকটির মৃত্যু হইল। পরে সংবাদ পাইলাম যে সেইরূপে আর পাঁচ ছয় জন লোকেরও সেই অগ্নিদাহে মৃত্যু হইয়াছে। একজন টাকার মায়া ত্যাগ করিতে না পারিয়া ঘরের বাহির হন নাই। একটি বৃদ্ধা নারীরও সেই কারণে মৃত্যু হইয়াছিল। এই হৃদয়-বিদারক ঘটনা দেখিয়া সন্ধ্যার পর আমরা গৌহাটিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। ইহার পর আর কামাখ্যায় গিয়াছি কি না মনে পড়িতেছে না।

কেহ কেহ কামাখ্যা না লিখিয়া কামাক্ষা এবং কেহ কেহ কামেক্ষা লিখিয়া থাকেন। কামাখ্যা—কাম+আখ্যা। কামাক্ষা—কাম+অক্ষি। কামেক্ষা—কাম+ঈক্ষ। তিনটায় অর্থসঙ্গতি হয়।

তান্ত্রিকেরা কামাখ্যাকে মহাতীর্থ করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন যে দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণত্যাগ করিলে শিব তাঁহার মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিলেন; বিষ্ণু দেহটা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। তাহারই এক খণ্ড কামাখ্যায় পড়িয়া উহাকে মহাতীর্থে পরিণত করিয়াছে। অম্বুবাচীর সময়ে কামাখ্যায় বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

মহাভারতে ও বিষ্ণুপুরাণে প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামে এক নগরের উল্লেখ আছে। নরক নামক এক রাজা সেখানে রাজত্ব করিতেন। তিনি অসুর ছিলেন এবং দেবতাদিগের প্রতি নানারূপে অত্যাচার করিতেন। তিনি ষোলশত দেবকন্যা ধরিয়া আনিয়া কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ নরককে নিহত করিয়া সেই দেবকন্যাদিগকে উদ্ধার করিয়া পত্নীত্বে গ্রহণ করিলেন। নরকের পুত্র ভগদত্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাগ্‌জ্যোতিষ নগর যে কোথায় তাহা পুরাণ পাঠ করিয়া বুঝা যায় না।

দুই একখানা অভিধানে দেখিয়াছি যে কামরূপকেই প্রাগ্‌জ্যোতিষ বলে। আমার কিন্তু এই কথাটায় সন্দেহ হয়। ভারতের পশ্চিম প্রান্তস্থিত দ্বারকা হইতে কৃষ্ণ যে আসামে গিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ হয়। আমার যতদূর স্মরণ হইতেছে, আসামের ইতিহাসলেখক মহাপ্রাজ্ঞ গেইট সাহেবও কথাটা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই। কৃষ্ণ যে আসামের কেবল গৌহাটি পর্য্যন্তই আসিয়াছিলেন ইহা বলিয়াই জনশ্রুতি মৌনাবলম্বন করে নাই। কৃষ্ণ নাকি রুক্মিণীকে বিবাহ করিবার জন্য ভারতবর্ষের পূর্ব্বোত্তর প্রান্ত সদীয়া পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। কৃষ্ণের এক পৌত্র অনিরুদ্ধকে তেজপুরের বাণ রাজা কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে কৃষ্ণ বলরাম উভয়েই তেজপুরে গিয়াছিলেন। এই সমস্ত জনশ্রুতির মহাভারত ও পুরাণগুলির সহিত সঙ্গতি হয় না; সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ অলীক, ইহা আমি বিশেষ হেতু প্রদর্শন করিয়া, প্রবন্ধান্তরে প্রমাণ করিব। কিন্তু গৌহাটি যে প্রাগ্‌জ্যোতিষ নহে ইহার প্রমাণ অদ্যাপি সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

গৌহাটির আর একটা হাস্যকর জনশ্রুতির কথা বলিতেছি। পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসকালে নাকি কুন্তীর সহিত গৌহাটি পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, এবং সেখানে গিয়া নাকি কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন যে, তাঁহার আর একবার বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইহা শুনিয়া যুধিষ্ঠির স্থির করিলেন যে, যেস্থানে কুন্তীর সদৃশ বৃদ্ধা নারীরও বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয়, সে স্থান বাসের অযোগ্য। এই সিদ্ধান্ত করিয়া পাণ্ডবেরা পশ্চিমাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই জনশ্রুতিটা কামরূপের পক্ষে উপকারপ্রদ নহে।

বঙ্গদেশেও কামরূপ সম্বন্ধে এক হাস্যকর জনশ্রুতি ছিল, তাহা এই যে, বিদেশের পুরুষ কামরূপে গেলে ভেড়া হইয়া যায়। কিম্বদন্তীটা রূপকভাবে বাস্তবিকই সত্য। আমিও এইরূপ "ভেড়া" অনেক দেখিয়াছি। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা দিন দিনই কমিয়া যাইতেছে।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

বসন্তের স্বপ্ন

২৮শে জানুয়ারী—১৯১৫--বৃহস্পতিবার।

ইয়োরোপের মহাসমরের ঘন কামান গর্জ্জনে ভয় পাইয়া ও বারুদের ধূমে চোখে মুখে পথ না দেখিয়াই হউক, অথবা অতি বার্দ্ধক্যের অথর্ব্বতা প্রযুক্তই হউক, বিধাতার বন্দোবস্তে এবার ভারী গোলমাল দেখা যাইতেছে। মাঘের আজ ১১ই কি ১২ই হইবে, কিন্তু এর মধ্যেই কোকিল পাপিয়া আসিয়া কুঞ্জকাননে দিব্য মজলিস জমাইয়া লইয়াছে! বাসার ঠিক দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে এক বিশাল আমের গাছ—সারা শীতকাল সে আমাদের বাসাকে ফাঁকি দিয়া রোদ পোহাইয়াছে—আর টুপটাপ করিয়া পাতা খসাইয়াছে। তাহার সে অত্যাচার নীরবে সহ্য করা গেছে, কিন্তু এখন যে তাহার জ্বালায় অস্থির। সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, যত রাজ্যের পাখীদের সভা তাহার উপর জমিয়াই আছে। কোকিল কলাপে কবি বর্ণিত বিরহ ব্যথার কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, কিন্তু কাণেরও ত একটা সহন-ক্ষমতার সীমা আছে! শুনিয়া শুনিয়া পঞ্চম তান এবং অন্যান্য সমশ্রেণীর তানগুলার উপর যে শ্রদ্ধা বজায় রাখা ক্রমেই কঠিন হইয়া পড়িতেছে! এই হোমিওপ্যাথির যুগে এমন উত্তম জিনিসের অজস্র বর্ষণ অপব্যয় ভিন্ন আর কিছু নহে—ডাইলিউসন করিয়া সমস্ত সহরময় ছড়াইয়া দিতে পারিলে কাজ দেখিতে পারে।

মাঘে নাকি বাঘ কাঁপে। কিসে? শীতে? না গরমে? ব্যাঘ্র কম্পমান হউক আর না হউক, মানুষ যে এখনই দ্রুত ঘর্ম্মাপ্লুত ও বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে তাহা তো দেখিতেই পাইতেছি। মধ্যে মধ্যে দুই একটা হাওয়া আসে বটে যাহা গায়ে লাগিলেই মনে হয়, এই এসেছে গো, অগ্রদূত মলয় এসেছে। একেবারে বসন্তলক্ষ্মীর সুরভি অঞ্চল স্পর্শ করিয়া আসিয়াছে! কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই একটা রুদ্র মূর্ত্তি ইতর ঘূর্ণি, খড়কুটা উড়াইয়া, গায়ে ধূলা বালি মাখিয়া, হা হা করিয়া হাসিয়া সমস্তকে উপহাস করিয়া ছোটলোকের মত মাটিতে গড়াইতে গড়াইতে চলিয়া যায়, আর মনে হয় বসন্ত, মলয়, কুসুমিত উপবন, পঞ্চম তান, সব অলীক। এগুলি বিক্রমাদিত্যের কালে হয়ত ছিল—কিন্তু কামান গর্জ্জনে এখন কোকিল পাপিয়ার সুরতালবোধ বিগড়াইয়া গিয়াছে এবং চিমনির কালিমা লিপ্ত ফুৎকারে মলয় অনিল বিলুপ্ত।

* * * *

আজ প্রথম বসন্তের বাতাস গায়ে লাগিল। বসন্তের বিরহ-বোধটা কাল্পনিক নহে। আজ সত্যই একটা কিছুকে বুকে চাপিয়া ধরিতে ভারী ইচ্ছা করিতেছিল। শরীর যেন হাল্কা হইয়া গিয়াছে, দিকে দিকে বনে বনে উন্মাদ হইয়া ছুটিতে ইচ্ছা করিতেছে। হোরির আনন্দ যেন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি—

"সকল দেহ মন মম বীণা সম সাজে।"

বসন্তের আনন্দ উন্মাদন কতকটা নেশার মত, বিরহটাও অনেকটা দৈহিক ও পার্থিব। বর্ষার বিরহের আশ্চর্য্য পারগামীতার সহিত, অথবা শরতের আনন্দের বিমলতার সহিত ইহার তুলনা হয় না। বসন্তে মনে হইতেছে, যাহাকে ভালবাসি তাহাকে সমস্ত রকমে পূর্ণ প্রমত্ত অবসাদহীন উপভোগ করিতে পারিলে, তাহাতে বৈদ্যুতিক আনন্দ পাইলে, জ্যোৎস্না রজনীতে বিকসিত কুসুমসুরভি বায়, ভ্রমর গুঞ্জিত কুঞ্জে তাহার হাত ধরিয়া বেড়াইতে পারিলে, তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বুকের শূন্যতা পুরাইতে পারিলে, যেন পূর্ণ তৃপ্তি হইবে। বর্ষায় আমি মানসীকে চাহিনা, আমি তাহার বিরহে কাঁদিতে চাহি, একান্তে নির্জ্জনে বসিয়া অজস্র অশ্রুজলে ধরণী ভাসাইয়া দিতে চাহি।

আমি কেবল কাঁদতে চাই, আর অনুভব করিতে চাহি, আমার কেহ নাই, কেহ আমাকে চাহে না, আমি চির বঞ্চিত ; যে আমার বলিয়া বিশ্বাস ছিল, আজ সেও আমার নহে ; আমি দিয়াছি, কিন্তু প্রতিদান পাই নাই। সান্ত্বনা ? আমি সান্ত্বনা চাহি না, আমি দুঃখকেই বুকে পুষিতে চাই, দুঃখের অমৃতলেহনে আত্মার অপূর্ব্ব পরিতৃপ্তি হইতেছে, তাহাই আমার লক্ষ্য। মিলন ? বর্ষায় মিলন কম্পমান বীণার তারের সহিত অঙ্গুলির মিলন-স্পর্শমাত্র সমস্ত সঙ্গীত নিস্তব্ধ।

শরতের আনন্দ শান্ত আত্মহারা নৃত্যপরায়ণ, কিন্তু উন্মাদন নহে। মানসীর হাতে হাত রাখিয়া ছাদের উপর শেফালী গাছের তলায় বসিয়া শেফালীর গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে চাঁদের দিকে চাহিয়া সারারাত কাটাইয়া দেওয়া যায়।

মনে হয়—"অজেয় কি মহাশান্তি,কি মধু সায়র মাঝে
বিশ্ব নিমগন।"
মনে হয়—"জ্যোছনাতে ঝরে পড়ে নবনী।"
আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মনে হয়—
"সারা নিশি জাগব নাকি ?
একটুখানি অন্যভাবে ঘুম গেলে যে রাত পোহাবে
কখন যাবে প্রভাত হয়ে
জ্যোছ্‌না মোরে দিবে ফাঁকি,
সারা নিশি জাগ্‌ব নাকি ?"
তাই বিভোর হইয়া—
"চাই যেদিকে, চেয়েই থাকি !"

বসন্ত বছরে দুইবার আসে, একবার শরতে,একবার বসন্তে। যে কবি লক্ষ্মীপূর্ণিমায় লক্ষ্মীপুজা, রাস পূর্ণিমায় রাস, ও দোল পূর্ণিমায় ফাগ উৎসবের ব্যবস্থা দেশে চালাইয়াছিলেন, তিনি মহাকবি, তাঁহাকে প্রণাম করি।

কিন্তু এ কি করিয়াছি ? দু' দশ হাজার বছরের কারবারী প্রত্নতাত্ত্বিককে বসন্তের আবির্ভাবরূপ তুচ্ছ বাৎসরিক উপসর্গের খবর লইয়া খেলো হইতে নাই, তাহা একবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এখনই শুভানুধ্যায়ী বন্ধুগণ হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া পড়িয়া চোখ রাঙ্গাইতে থাকিবেন।

* * *

সজনে গাছের আর সবুর সহিতেছে না ! উহার শুভ্র আনন্দ যেন পুঞ্জে পুঞ্জে উথলিয়া উঠিতেছে ! বস্তুতান্ত্রিক বলিতেছেন, কবে তো সজনে খাড়া, যা পয়সায় পাঁচটা করিয়া কিনিতে পাওয়া যায়, তার আবার এত আড়ম্বর ! এই পাগল কি তা শোনে ? সে হাসিয়াই আকুল ! কাছাকাছি দুই পাঁচটা গম্ভীর মূর্ত্তি আমগাছেও তাহার হাসির ঢেউ গিয়া লাগিয়াছে ; তাহারাও এই অকেজো ছ্যাবলার হাসি দেখিয়া আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিতেছে না। আর বিষম পাগল আমার এই মন ! দারিদ্র্যের তাড়নায় সুবোধ বালকের মত আসিয়া একখানা "পাঠ্য পুস্তক" রচনা করিতে বসিয়াছিলাম ; আশা, দু' দশখানা কাটিলে দু-পাঁচটা পয়সা আসিবে। তা ঐ সজনে গাছের পাগলামী দেখিয়া আমার মধ্যের পাগলটি দিব্য নাচিতে নাচিতে বাহির হইয়া আসিল। গরীব মানুষের যে ঐ "দলে" মিশিয়া বহিয়া যাওয়া নিষেধ তাহা কি আর উহাকে বুঝানো যায় ? সে সজনে গাছের সঙ্গে যাইয়া দিব্য আলাপ জুড়িয়া দিল,—বেশ ভাই বেশ, বেশ হাসিতেছে। সুখে থাক, আনন্দে থাক। তোমাকে দেখিয়া কুলোকের চোখ টাটাক্‌, আমি তোমার চারিদিকে একবার হাত তালি দিয়া নৃত্য করিব। হাঃ হাঃ হাঃ।

পাগল-মনের পাগলামীর বাঁধ একবার ভাঙ্গিয়া গেলে আর তাহাকে পায় কে ? সে বিশ্বশুদ্ধ মিতালি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ওখানে ছাগশিশু ঢু মারিয়া মারিয়া মায়ের দুধ খাইতেছে। পাগল অসঙ্কোচে তাহার গলা ধরিয়া আদর করিয়া, তাহারই মত দুই ঢু মারিয়া দুই টান দুধ খাইয়া লইল। এক কুক্কুরীর পিছনে গুটি ছয় সাত শাবক ছুটিতেছিল, তাহাদের দলে মিশিয়া কাহাকেও কোলে, কাহাকেও কাঁধে

করিয়া, কাহাকেও চুমা দিয়া আদর করিয়া আসিল। দুইটি শিশু একটি কমলা লেবু লইয়া মারামারি করিতেছিল; পাগল যাইয়া তাহাদের ছাড়াইয়া দিল, লেবু দুই ভাগে দুই জনের হাতে দিল, মুখ মুছাইয়া দিল, চোখ মুছাইয়া দিল, প্রাণ ঢালিয়া আশীর্ব্বাদ করিল—সুখে থাক, বাঁচিয়া থাক। রাস্তায় যাইতে যাইতে দুই ধারের গাছপালা তাহাকে ডাকিয়া কথা বলিতে লাগিল। পেয়ারা গাছ বলিল—ওরে পাগল, যাচ্ছিস কোথায়? আয় না! পাগল তাহার কাছে গেল, গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—সুখে থাক, সুখে থাক। কুলগাছ পাগলের মাথায় টপ করিয়া একটি পাকা কুল ফেলিয়া বলিল—ওরে পাগলা যাচ্ছিস কোথায়? কুল খেয়ে যা! পাগল টুপ করিয়া কুল মুখে পুরিয়া বলিল—এই যে খাচ্ছি, আর একটা দাও না ভাই। চলেছি আনন্দাভিযানে। পাগল খামকা গাহিল, অকারণে কাঁদিল, অনর্থক নাচিল, বৃথা বৃথা হাসিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল, এমন সময় পাগ্লাগারদের দূত আসিয়া হাজির।

"আরে মশাই, এ কচ্ছেন কি? প্রকৃতটা দেখা হয়েছে!"

তাইত।——

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

অশ্রুকুমার

(উপন্যাস)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

যদুর কীর্ত্তি।

অশ্রুকুমারের মাতা যখন শিয়ালদহে ডেপুটী বাবুর বাটীতে চিত্রদর্শনে নিযুক্ত ছিলেন, অশ্রুকুমার যখন মাতাকে অপরিচিত চিত্রগুলির পরিচয় প্রদান করিতেছিল, সেই সময় ভবানীপুরে হরিহরপুরের "জমীদার" বাটীতে কেদারনাথ গাত্রহরিদ্রার দ্রব্যাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতেছিল। যদুর হাতে দশখানি একশত টাকার নোট গণিয়া দিয়া কেদারনাথ কহিল, "দেখ যদু, আমাদের হাতে টাকা এখন বড়ই কম পড়ে গিয়েছে। এই এক হাজার টাকাতেই গাত্রহরিদ্রার খরচটা চালিয়ে নিতে হবে।" বলিয়া কেদারনাথ পকেট হইতে একটা ফর্দ্দ বাহির করিয়া যদুর হাতে দিল।

যদুর স্বরূপ বর্ণনায় আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাহার মুখবিবর প্রায় কখনও হাস্যরসে কলুষিত হইত না; এবং সেই মুখবিবর হইতে অতি অল্পসংখ্যক বাক্যই বহির্গত হইত। কিন্তু আজ সাত আট দিন ধরিয়া তাহার কি হইয়াছিল ভগবানই জানেন, সে হাস্যহীন মুখকে আরও বিমর্ষ করিয়া রাখিয়াছিল, এবং বাক্য-কথন প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। কেদারনাথের হস্ত হইতে প্রথমে নোটগুলি, পরে ফর্দ্দটি নীরবে গ্রহণ করিয়া, সে ফর্দ্দটা একবার নীরবে পাঠ করিয়া কহিল, "এ সব জিনিষ হাজার টাকাতেই হবে। কিন্তু এতে মাছ, দই, সন্দেশ, ক্ষীর হবে না।"

কেদারনাথ যদুর অতিরিক্ত বিষণ্ণতা লক্ষ্য করিল না। সে কহিল, "তেল, সন্দেশ, ক্ষীর, দই, মাছ, তরকারি এ সবের ব্যবস্থা তোমাকে কিছুই করতে হবে না। সে সকল ব্যবস্থা আমরা কাল রাত্রে করে রেখেছি। ঐ সব জিনিষের বায়না দেবার জন্যে, কাল সন্ধ্যাবেলা আমরা বিধুভূষণ গোস্বামীকে দু'শ টাকা দিয়েছি; আর

বলে দিয়েছি যে বাকী টাকা জিনিষ গেলে পরে দেব।”

যদু কেদারনাথের কথার কোনও উত্তর দিল না; নোট কয়েকখানা ও ফর্দ্দটা আপনার চাপকানের পকেটে রাখিয়া নীরবে চলিয়া গেল। যাইবার সময় সে তাহার দৃঢ়বদ্ধ দন্তগুলি নিষ্পেষিত করিল; তাহার ক্ষুদ্র চক্ষুর্দ্বয়, দুইটা অগ্নিগোলকের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল; তাহার কুঞ্চিত ললাটে একটা কৃষ্ণছায়া পতিত হইল।

কিন্তু কেদারনাথ তাহার এই ভাব লক্ষ্য করিল না। সে নিজ কৃষ্ণশ্মশ্রুতে আপন মনে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভাবিতে লাগিল যে, এইবার তাহার কৌশলজাল গুটাইবার সময় হইয়াছে; এইবার উহা গুটাইতে পারিলেই দুই কোটি টাকা দুই তিন দিন মধ্যে তাহার হস্তগত হইবে। দুই কোটি টাকা! দুই কোটি টাকাতে কত হাস্যময়ী রমণীর মধুময় প্রেম ক্রয় করিতে পারা যাইবে। দুই কোটি টাকার পদতলে কত কত সুখ্যাতি আসিয়া প্রণত হইয়া পড়িবে। দুই কোটি টাকার ঔজ্জ্বল্যে তাহার দেহলাবণ্য কত বাড়িয়া যাইবে; তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি সূর্য্যরশ্মিস্নাত তরবারির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে! দুই কোটি টাকাতে কত শত চিরাকাঙ্ক্ষিত বাসনা পূর্ণ হইবে। কেদারনাথ বাসনা সাগরে অহরহ ভাসিতেছিল। বাসনার বিচিত্র তরঙ্গে তাহার মনোমরাল অহরহ নৃত্য করিতেছিল।

হায় মানুষের বাসনা! চিরকাল তাহা বাসনাই থাকিয়া যায়—তাহা কখনও পূর্ণ হয় না! মানুষ যাহা চায়, বিধাতা যদি তাহাই প্রদান করিতেন, তাহা হইলে, এতদিন কি আমাদের এই পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকিত? তাহা হইলে স্বর্গ কি দেবতাগণের আবাসভূমি থাকিত? তাহা হইলে বিধাতা নিজেই বিলুপ্ত হইয়া যাইতেন;—কেননা বিধাতৃত্ব না পাইলে, মানবের বাসনা কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিত না।

কেদারনাথ কিছুকাল সুখস্বপ্নে অতিবাহিত করিয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল, এবং পুণ্যময়ী মাতাঠাকুরাণীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, কোন্ কোন্ দাসদাসী কিরূপ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, ডেপুটী বাবুর বাটীতে গাত্রহরিদ্রা বহন করিবে। স্থির হইল যে দাসীগণের পরিধানে তসর শাড়ী, বাম হাতে অনন্ত ও গলায় বিছাহার থাকিবে; আর ভৃত্যগণের মাথায় হরিদ্রা রঙের পাগড়ী, পরিধানে হরিদ্রা রঙের বস্ত্র, এবং গায়ে লাল বনাতের আচকান থাকিবে; আর দ্বারবানেরা ভাল জরির পোষাক পরিয়া যাইবে। এই সকল সজ্জা কোথায় ভাড়ায় পাওয়া যাইবে কেদারনাথ আগেই তাহার অনুসন্ধান লইয়াছিল। এক্ষণে সে ঐ সকল দ্রব্য আনয়নের জন্য লোক পাঠাইয়া দিল।

গাত্রহরিদ্রা ও আনুসঙ্গিক দ্রব্যাদি পাঠাইবার বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া, কেদারনাথ আনন্দচিত্তে স্নানাহার সম্পন্ন করিল; এবং দিবাবসানের পূর্ব্বে গাত্রহরিদ্রার সমস্ত দ্রব্য বাটীতে সংগৃহীত হইবে, এই বিশ্বাসে বক্ষ স্ফীত করিয়া, তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে, দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামলাভ জন্য আপন শয়নকক্ষে মন্থরগমনে প্রবেশ করিল।

কেদারনাথের পর, অঘোরনাথ ও সুধীরনাথ একত্রে আহার করিল। জ্যেষ্ঠের অনুকরণে, অঘোরনাথ বিশ্রামজন্য আপন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল; এবং সেখানে একখানা উপন্যাস হস্তে লইয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। সুধীরনাথের ধমনীতে যৌবনের তপ্ত রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল; তাহার বিশ্রাম আবশ্যক ছিল না। সে কিছু হুইস্কি পান করিয়া, এবং পকেটে একটি হুইস্কির ফ্লাস্ক লইয়া মধ্যাহ্ন-বিহারে বাহির হইল।

কিন্তু অল্পকাল মধ্যে মহাভয়ের কৃষ্ণছায়া আপন মুখমণ্ডলে মণ্ডিত করিয়া সুধীরনাথ গৃহে প্রত্যাগত হইল। এবং অতি শীঘ্র কেদারনাথের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া, তাহার দিবানিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইয়া ভয়ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, “এই—বড়দাদা, এই—শীঘ্র ওঠ। এই—সব মাটী।”

কেদারনাথ ভ্রাতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া শয্যায় উঠিয়া

বসিল। আপন কৃষ্ণশ্মশ্রুতে হাত বুলাইয়া, একবার হাই তুলিয়া, তিনটি তুড়ি দিয়া, ভ্রাতার ভয়বিস্ফারিত লোচন লক্ষ্য করিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্নচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল "ব্যাপার কি ? কি হয়েছে ?"

সুধীরনাথ কহিল, "এই—যদুকে—এই—পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছে।"

পার্শ্বের ঘরে অঘোরনাথ শুইয়া উপন্যাস পাঠ করিতেছিল। সুধীরের কথাটা তাহার কাণে গেল। সে তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া কেদারনাথের কক্ষে আসিয়া কহিল, "কেন ?"

সুধীরনাথ কহিল, "আমি—এই—পাড়ায় শুনে এলাম, যে—এই—অপরাধটা নাকি—এই যদু আপনিই—এই—স্বীকার করেছে।"

কেদারনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কি অপরাধ স্বীকার করলে ? এমন বোকাও ত কখন দেখিনি ;—অপরাধ স্বীকার করাতে গিয়ে পুলিশের দশ হাত জিভ বেরিয়ে পড়ত।"

সুধীরনাথ কহিল, "পুলিশের কাছে—এই—যদু—এই—স্বীকার করেছে, যে সে—এই দুটো লোককে খুন করেছে।"

কেদারনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "বল কি ? একেবারে খুন করেছে ?"

সুধীরনাথ কহিল, "হাঁ, শুনলাম—এই—পুরুষটার —এই মাথাটা—এই—গর্দ্দান থেকে—এই—একেবারে এই—আলাদা হয়ে গেছে। আর—এই—মাগীটার নরম বুকে—এই—চক্‌চকে ছোরাখানা একেবারে—এই—আধ হাত ঢুকে গেছে।"

কেদার জিজ্ঞাসা করিল, "এই পুরুষ আর এই মেয়েমানুষ কে ?"

সুধীরনাথ কহিল, "যদুর একটা—এই—মেয়েমানুষ ছিল,—তুমি ত—এই—জান বড় দাদা।"

কেদারনাথ কহিল, "হাঁ হাঁ, জানি। একটা কালো আধ-বয়সী মেয়েমানুষকে পরিবার বলে' নিজের বাসাবাড়ীতে রেখেছিল।"

সুধীরনাথ কহিল, "যদু—এই—সেই মাগীরই—এই—বুকে—এই আধ হাত ছোরা—বসিয়ে দিয়েছে।"

অঘোরনাথ কহিল, "বাবা। একেই বলে, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ। যদুর এই কাযটাতে, বড়দা, আমাদের কিন্তু সর্ব্বনাশ হবে! আমাদের সব মতলব উইধরা বাঁশের মত একেবারে মাটী হয়ে যাবে।"

কেদারনাথ কহিল, "একটু বুদ্ধি খেলাতে পারলে, আমরা সব সামলে নিতে পারব। কেন, যদু খুন করেছে, আমাদের কি ? কোনও জমীদারের ম্যানেজার কি আপনার স্ত্রীকে খুন করে না ? কোনও ম্যানেজারের স্ত্রী কি কুলটা হয় না ? যদু যদি তার কুলটা কালো স্ত্রীকে রাগের মাথায় খুন করে থাকে, তাতে আমাদের দোষ কি ?"

সুধীরনাথ কহিল, "তুমি তাকে—এই—বোধহয়, দেখনি, বড় দাদা। মাগীটা—এই—কালোই হ'ক—আর—এই—বুড়োই হ'ক—এই—দেখতে কিন্তু—এই—মন্দ ছিল না। বেশ, নরম নরম—এই—চেহারাটা ছিল।"

অঘোরনাথ কহিল, "বাবা! সে যখন মরেছে, তখন আর তার রূপের সুখ্যাতি করে দরকার কি ? সে ত আর তোমার এই সুখ্যাতি শুনতে পাবে না।—বাবা! কথায় বলে, মরা গরুতে ঘাস খায় না।"

কেদারনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, যদু যে পুরুষটাকে খুন করেছে বলছ, সে লোকটা কে ? সে কি আমাদের জানা লোক ?"

সুধীরনাথ কহিল, "এই—জানা লোক বই কি! শুনলাম,—এই—আমাদের সেই বিধুভূষণ গোস্বামী ঠাকুর—এই—মাগীর ঘরে—এই ধরা পড়ে। যদু—এই —ক'দিন আগে থেকেই—এই—সন্দেহ করছিল। আজ —এই—ওৎপেতে—এই—রান্নাঘরে বসে ছিল। আজ যাই—এই গোঁসাই ঠাকুর—এই—হরিনাম করতে করতে—এই—মাগীর ঘরে ঢুকছে, অমনই যদু—

এই—একখানা—এই—চকচকে ছোরা নিয়ে—এই—ধ'রে ঢুকে—এই—গোস্বামী ঠাকুরের—এই—তুলসীর মালা পরা গলায়—এই—এক কোপ।"

কেদারনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "সুধীর ভাই, তুমি ঠিক জান যে বিধুভূষণ গোস্বামী একবারে মারা গেছে?"

সুধীরনাথ কহিল, "ব্যস্, সেই এক কোপেই—এই—কুঁপোকাৎ!"

কেদারনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কার কাছে, কোথায়, কখন এই ঘটনা জানতে পারলে তা আমাকে আগাগোড়া বল। তোমার কাছে সব খবর পেলে, আমি স্থির করতে পারব, বুদ্ধিটা কি রকম খাটাতে হবে।"

সুধীরনাথ কহিল, "আমি—এই—খাওয়া-দাওয়ার পর,—এই—সেই পাড়ায় একখটুানি—এই—বেড়াতে গিয়াছিলাম। এই—বদুর—এই—বাড়ীর দরজার কাছে গিয়ে—এই—দেখি, এই—লোকে—এই—লোকারণ্য! আর বাড়ীর—এই—দরজায় দু'জন—এই—কনষ্টেবল—এই—পাহারা দিচ্ছে! আর বদুর ঝি মাগী—এই—যা যা—এই—ঘটেছিল, তার—এই—পরিচয় দিচ্ছে। সেই ঝির মুখে, আর পাড়ার—এই—অন্যান্য লোকের মুখে, আমি—এই—আগাগোড়া খবরটা—এই—জানতে পেরেছি।"

কেদারনাথ বলিল, "এই গাত্রহরিদ্রার দ্রব্যাদি কেনবার সমস্ত ভারই যে, আমি বিধুভূষণ গোস্বামীকে আর বদুকে দিয়েছিলাম। এর জন্যে তাদের হাতে টাকাও দিয়েছিলাম! কিন্তু একজন মারা গেল, আর এক জন পুলিশের হাতে আটক পড়ল। জিনিষ খরিদ হল না, আর টাকাটাও তাদের হাতে থেকে গেল; ঐ টাকা যে কখনও ফেরৎ পাব সে আশাও নেই। বিধুভূষণকে কাল সন্ধ্যার সময় দু'শ টাকা দিয়েছিলাম; আর আজ সকালে বদুকে হাজার টাকা দিয়েছি।"

সুধীরনাথ বিস্মিত হইয়া কহিল, "এই—হাজার টাকা! এই—দু'শ টাকা! শুনলাম, আজ—এই—খুন করবার আগে, বদু—এই—তার ঝি মাগীকে—এই—হাজার টাকা দিয়েছে;...দশখানা—এই—একশ টাকার নোট!"

কেদারনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, ঝি মাগীকে টাকা দিলে কেন?"

সুধীরনাথ কহিল, "শুনলাম, এই—ঝি মাগীই নাকি, এই—গোঁসাই ঠাকুরের—এই আসা যাওয়ার কথা—এই—বদুকে—এই—খবর দিয়েছিল। তাই, ধরিয়ে দেবার জন্যে—এই—হাজার টাকা এই বক্‌সিস্ দিয়েছে। আরও—এই—একটা মজার কথা শোন, বড়দা। শুনলাম,—এই গোঁসাই ঠাকুরও নাকি—এই—কাল ঝির কাছে—এই ধরা পড়ায়, ঝি মাগীর—এই—মুখ বন্ধ করবার জন্যে—এই—কাল রাত্রে তাকে—এই—দু'শ টাকা—এই ঘুষ দিয়েছিল। ঝি মাগী—এই বজ্জাৎ মাগী—গোঁসাই ঠাকুরের—এই—ঘুষটা—এই—রাত্রের মধ্যে—এই—হজম করে, আজ সকল কথা—এই—বদুকে বলে দিল। আর—এই বদুর কাছ থেকে—এই—হাজার টাকা নিয়ে তার পর এই—বদুকেই ধরিয়ে দেবার জন্যে—এই—ছুটে থানায় গিয়ে—এই খুনের খবরটা দিয়ে এল।"

কেদারনাথ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, "আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, ঐ বার শ টাকাই আমাদের টাকা; সবই ঝি মাগী পেয়েছে।"

অঘোরনাথ কহিল, "বাবা! কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় কই।"

কেদারনাথ কহিল, "কিন্তু আবার এই বার'শ টাকা ঘর থেকে বার করতে না পারলে, কাল আর গায়ে হলুদ পাঠান চলবে না। তার পর, আরও একটা মহামুস্কিল আছে! এই অল্প সময় মধ্যে এই সব কায করে কে? নানা প্রকার জিনিষ বাজারে বাঁজারে ঘুরে সুবিধামত কেনা সহজ ব্যাপার নয়! এ সব বিষয়ে বদু খুব হুঁসিয়ার লোক ছিল; কিন্তু সে ত এখন পুলিশের হাতে বন্দী। তার কাছে আমাদের আর কোন আশাই নেই; অথচ, এই সকল কায

করবার জন্মে সে ছাড়া আমাদের আর অন্য লোক নেই।"

সুধীরনাথ বলিল, "কেন—এই—বড়দা নিজেই ত এই—জিনিসগুলো—এই কিনে আনতে পার। এ কি আর এই—শক্ত কায?"

কেদারনাথ কহিল, "শোন, আমাদের কারও দ্বারা এ কায হবে না। তবু গায়ে হলুদটা কাল পাঠাতেই হবে। তা পাঠাতে না পারলে, বিয়েটা আরও পেছিয়ে দিতে হয়। কিন্তু বিয়েটা পেছিয়ে দিতে হলে আমাদের ধুমধামের খরচগুলো আরও কিছুদিন চালাতে হয়। আমরা যে ভাবে হরিহরপুরের জমীদারের চালে চলে আসছি, সেভাবে আরও কিছুদিন চলতে হলে, আরও টাকা চাই। আমার হাতে যে টাকা আছে, তাতে এখন এই গায়ে হলুদের খরচই সংকুলান হবে না। তার উপর বিয়ের রাতের খরচ আছে, বৌভাতের খরচ আছে। কি করা যায়? এই সময় যদু নিজে হাজার টাকা নষ্ট করায়, আবার আর একজনকে মেরে আরও দুশত টাকা নষ্ট করায়. আর খুনখুনী কাণ্ডটা করায়, শেষে দেখছি বড়ই অসুবিধা ভোগ করতে হল।"

সুধীরনাথ কহিল, "যদি—এই খুনটা—এই বিয়ের পরেই করত, তা হলে, আমাদেরও—এই অসুবিধা হত না,—আর সেও—এই—একহাজার টাকার বদলে—এই আমাদের সর্ত্তমত একবারে—এই—দশ হাজার টাকা পেত। এখন—এই—আমাদের—এই—ন'হাজার টাকা লাভ।"

কেদারনাথ কহিল, "লাভ ত পরে হবে ভাই; এখন কার্য্যটা কি করে উদ্ধার করতে পারব, তারই একটা সুবুদ্ধি বার করতে হবে। বুদ্ধি খরচ করতে না পারলে কিছুই হয় না।"

অঘোরনাথ কহিল; "এক কায করলে হয় না বড়দাদা? ডেপুটী বাবুকে একখানা চিঠি লিখে, গায়ে হলুদের দিনটা একদিন পেছিয়ে দাও। বিয়ের দিন পালটাবার দরকার নেই; ধার্য্যদিনেই বিয়ে হবে। বিয়েটা যেমন করে হোক যথাসময়ে দিতেই হবে;—বাবা! যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।"

কেদারনাথ কহিল, "তুমি ঠিক বলেছ অঘোর ভাই। চিঠি লিখে গায়ে হলুদের দিনটা পেছিয়ে দেওয়া সৎযুক্তির কথা বটে। চিঠিখানা লিখে দরোয়ানের হাতে এখনই ডেপুটি বাবুর কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। কিন্তু গায়ে হলুদের জিনিসগুলো কাকে দিয়ে পারদ করাই? এ ছাড়া, আরও কিছু টাকা চাই তাই বা কোথা থেকে সংগ্রহ করি?"

সুধীরনাথ কহিল, "একদিন ত—এই—সময় পাওয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে—এই—জিনিষ কেনবার আর—এই টাকা যোগাড় করবার—এই—একটা কিছু বুদ্ধি—এই—ঠিক করে নিতে পারা যাবে।"

কেদারনাথ কহিল, "একটা বুদ্ধি খেলাতেই হবে।"

অঘোরনাথ কহিল, "এই টাকা সম্বন্ধে আমি তোমাকে একটা সৎপরামর্শ দিতে পারি। গায়ে হলুদের জিনিসগুলো তুমি কিছুই নগদ টাকায় কিনো না; সব ধারে কিনো। এখন লোকে আমাদিকে হরিহরপুরের জমীদার বলে বেশ চিনেছে, এখন কেউ আমাদিকে ধারে জিনিষ দিতে আপত্তি করবে না। বাবা! চেনা বামুনের পৈতার দরকার করে না।"

কেদারনাথ আনন্দিত হইয়া কহিল, "হাঁ, এ একটা সৎপরামর্শ বটে। এতে আমাদের হাতে এখনও যে টাকাটা আছে, তা বেঁচে যাবে। এখন একটু বুদ্ধি খেলাতে পারলেই আমরা সকল দিক সামলে নিতে পারব। এখন এস, ডেপুটী বাবুকে চিঠিখানা লেখা যাক। চিঠিখানা একটু কৌশলপূর্ব্বক লিখতে হবে।"

চিঠি লেখা হইল। তাহা সুগন্ধি ও বিচিত্র আবরণে পুরিয়া, এক সুসজ্জিত দ্বারবানের দ্বারা ডেপুটী বাবুর নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তাহার পর কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া কেদারনাথ কহিল, "দেখ অঘোর ভাই, আমি মনে করছি যে বাজার সরকারকে

সঙ্গে নিয়ে আমি নিজের গায়ে হলুদের জিনিষগুলো সংগ্রহ করব।"

অঘোরনাথ কহিল, "তুমি জিনিস কিনবে?—এ যেন মশা মারতে কামান পাতা।"

কেদারনাথ কহিল, "আমার যে যেতেই হবে, ভাই। তা না হলে ত ধারে জিনিষ কেনার সুবিধা হবে না।"

এই সকল যুক্তির পর, ভ্রাতাগণ নিশ্চিন্তমনে আপন আপন কক্ষে যাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

একখানি পুরাতন পত্র।

বাহিরে হেমন্তের নীল নির্ম্মল আকাশ মধ্যাহ্ন সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোকে স্বর্গবাসী তেত্রিশ কোটি দেবতারি হাস্যের ন্যায়, অনন্ত প্রফুল্লতায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল; নিম্নে রাস্তায় পথিকগণ রৌদ্রালোকে যেন রৌপ্যমণ্ডিত হইয়া, আপনার দেহের কৃষ্ণ ছায়াকে পদদলিত করিয়া চলিয়াছিল। গৃহমধ্যে কতকটা রৌদ্র প্রবেশলাভ করিয়া সৌদামিনীর স্নানসিক্ত কৃষ্ণ কেশে পতিত হইয়া, অনন্ত নীল আকাশের প্রফুল্লতা লইয়া প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। সৌদামিনী আপন শয়নকক্ষে মেঝের উপর বসিয়া, আপনার স্নানসিক্ত চুলগুলি শুষ্ক করিতেছিল; আর তাহার মাতার পেটক মধ্যে প্রাপ্ত পত্রগুলি নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিতেছিল। কতকগুলি পত্র সে পূর্ব্বদিনই দ্বিপ্রহরে পাঠ করিয়াছিল; আজ অবশিষ্ট পত্রগুলি পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। পত্রগুলি পাঠ করিয়া, সে তাহার মাতা, পিতা, পিতামহ ও খুল্লতাত সম্বন্ধে অনেক কথা অবগত হইল। তাহাতে তাহার পিতা মাতার প্রতি এবং পিতৃবংশের প্রতি শ্রদ্ধা অনেক বাড়িয়া গেল; তাহাতে তাহার জীবনের একটা অজানিত অংশ অনেক স্পষ্ট হইয়া উঠিল। পত্রের পর পত্রগুলি পাঠ করিয়া, সে সযত্নে উহা গুছাইয়া রাখিতে লাগিল—পূজক যেন দেবপূজার জন্য পুষ্পস্তবক রচনা করিতে লাগিল; জীবনী লেখক যেন জীবনী লিখিবার জন্য মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ করিতে লাগিল।

ঐ সকল পত্র মধ্যে সৌদামিনী হঠাৎ একখানি অপ্রত্যাশিত পত্র প্রাপ্ত হইল। এই পত্রখানি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া সৌদামিনীর আহ্লাদের আর সীমা রহিল না;—সূর্য্যালোকিত আকাশের সমস্ত প্রফুল্লতা যেন তাহার অন্তর মধ্যে প্রবেশ করিল। ঐ পত্রখানি কলিকাতা হইতে তাহার পিতা, তাহার জন্মের অনেক পূর্ব্বে, পাবনায় তাহার মাতাকে লিখিয়াছিলেন। তাহাতে মৃত্যুসংবাদ ও দুঃখের কথা ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে আরও এমন একটা সংবাদ ছিল, যাহা নিশ্চয়ই সৌদামিনীর মনের অভিলাষ পূর্ণ করিবার সহায়তা করিবে—তাহার দাদামহাশয়কে পত্রখানা দেখাইতে পারিলে, তিনি অশ্রুকুমারের সহিত তাহার বিবাহ দিতে বাধ্য হইবেন।

পত্রখানা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।—

১২নং হরি পণ্ডিতের ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৯৮।

প্রিয়তমাসু,

তুমি আমার আদর ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে, অশৌচকালে আশীর্ব্বাদ করিতে নাই; কিন্তু তুমি আমার স্ত্রী, তুমি সব সময়েই আমার আশীর্ব্বাদের পাত্রী, তাই আশীর্ব্বাদ করিলাম।

গতকল্য শ্রীযুক্ত শ্বশুর মহাশয়কে যে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম, তাহাতে তুমি জানিতে পারিয়াছ যে আমি জন্মের মত পিতৃহীন হইয়াছি। গত বৎসর মাতৃহীন হইয়াছিলাম; যে কষ্ট গিয়াছিল তাহা তুমি জান। কিন্তু তখনও আমাদের মাথার উপর একজন সহায় ছিলেন। আজ আমরা সম্পূর্ণ সহায়হীন হইয়াছি; নাবিকহীন পোতের মত শোকের সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছি। শোকের ভারে আর সংসারের কাযের ভারে অস্থির হইয়া পড়িয়াছি; বাবা এত কায কিরূপে

নির্ব্বাহ করিতেন, তাহা, বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

তুমি এখনও বালিকা মাত্র; তথাপি তুমি এখন আমার কাছে থাকিলে, বোধ হয় আমার কাযের অনেকটা ভার গ্রহণ করিতে পারিতে; সম্ভবত তোমাকে দেখিলে মনে অনেকটা বল পাইতাম।

আগামী ২৩শে অগ্রহায়ণ অশৌচান্ত হইবে। ২৪শে অগ্রহায়ণ আদ্যশ্রাদ্ধ। এখন হইতে তাহার উদ্যোগ চলিতেছে। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে, তোমার এখানে আসা দরকার। এখান হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া, এবং অন্যান্য উদ্যোগ করিয়া, আমরা ২০শে অগ্রহায়ণ কোটালিগ্রামে যাইব; সেই খানেই শ্রাদ্ধ হইবে; কলিকাতার বাড়ীতে স্থান সংকুলান হইবে না; আর এখানে শ্রাদ্ধ করিলে দেশের লোক অসন্তুষ্ট হইবে। তুমি ১৯শে অগ্রহায়ণ যদি কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিতে পার, তাহা হইলে আমাদের সুবিধা হয়। যাহা হউক এসম্বন্ধে আমি পূজনীয় শ্বশুর মহাশয়কে পৃথক পত্র লিখিলাম; তিনি যাহা ভাল হয় করিবেন। আমি নিজে তোমাকে আনিতে যাইলেই ভাল হইত; কিন্তু তাহার উপায় নাই।

বাবা মৃত্যুকালে আমাদের প্রতি একটা আদেশ করিয়াছেন। সে আদেশটা কি, তাহা যত শীঘ্র তুমি জানিতে পার, ততই ভাল। এজন্য এই পত্রেই তাহা বলিলাম।

রঙ্গণঘাটের জমীদার ভুবনেশ্বর বাবুকে তোমার মনে আছে। তিনি অনেকবার আমাদের এই কলিকাতার বাটীতে আসিয়াছেন; কোটালিগ্রামেও গিয়াছেন। তুমি হয়ত কতবার তাঁহাকে দেখিয়াছ। তাঁহার মত, বাবার আর কেহ বন্ধু নাই। তিনি বাবার জন্য সর্ব্বস্ব দিতে পারিতেন। বাবাও তাঁহার জন্য সর্ব্বস্ব দিতে পারিতেন। তিনি ও বাবা, বরাবর একত্রে একই স্কুলে ও একই কলেজে পড়িয়াছিলেন। বাবা অনেকবার রঙ্গণঘাটে যাইয়া, অনেকদিন ধরিয়া তাঁহার সহিত একত্র বাস করিতেন। বাবার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন; তাঁহার মৃত্যুর পর কাঁদিতে কাঁদিতে দেশে ফিরিয়াছেন।

বাবা তাঁহার মৃত্যুর দিন, তাঁহার মৃত্যুর মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে, তাঁহাকে ও আমাদিগকে ডাকিয়া, আমাদের প্রতি আদেশ করিয়াছেন যে, ভুবনেশ্বর বাবুর পুত্র কন্যা হইলে, কৌলিন্য প্রথা অমান্য করিয়াও, তাহাদের সহিত আমাদের কন্যাপুত্রের বিবাহ দিতে হইবে। এইরূপে দুই বন্ধুর ঐকান্তিক বন্ধুত্ব বিবাহবন্ধনে পুরুষানুক্রমে অচ্ছেদ্য হইয়া যাইবে। ভগবান না করুন, কিন্তু আমার পুত্রকন্যার বিবাহ হইবার পূর্ব্বেই যদি আমার মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে তুমি যেন এই আদেশ কখনও অমান্য করিও না; চিরকাল এই আদেশ স্মরণ রাখিও। মনে রাখিও, ইহা আমার চিরপূজ্য পিতার শেষ আদেশ। এ আদেশ লঙ্ঘন করিলে, আমাদের কখনও মঙ্গল হইবে না।

শ্রাদ্ধের ফর্দ্দ করিতে, শ্রাদ্ধের খরচ জন্য তহশীলদারদের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিতে, আর শ্রাদ্ধের আবশ্যক দ্রব্য ক্রয় করিতে আমি এত ব্যস্ত আছি যে, আজ আর তোমাকে দীর্ঘ পত্র লিখিয়া বাটির অন্যান্য খবর দিতে পারলাম না।

বধূমাতাকে আনিবার জন্য কৃষ্ণচন্দ্র আজ সকালে বর্দ্ধমানে গিয়াছে; আগামী কল্য সকালের গাড়ীতে ফিরিবার কথা আছে। সে ও আমি দুইজনই শারীরিক ভাল আছি। ভরসা করি, তোমরাও ভাল আছ।

তোমার বাবাকে পৃথক পত্র দিলাম; আমি জানি, তুমি তাহা অবশ্যই পাঠ করিতে পাইবে; এ জন্য তাঁহাকে কি লিখিয়াছি, তাহা আর তোমাকে বলিলাম না। ইতি

তোমার চিরপ্রেমাকাঙ্ক্ষী
হেমচন্দ্র।

এই পত্রখানা পাঠ করিয়া সৌদামিনী কিয়ৎকাল নীরবে বসিয়া রহিল। এই পুরাতন পত্রের প্রত্যেক কথাটি যেন জীবন্ত হইয়া, তাহার হৃদয়মধ্যে একটা

ঘাত প্রতিঘাতের সৃষ্টি করিল। তাহার ঠাকুরদাদার মৃত্যুকালের শেষ আদেশ!—তাহা ত সে লঙ্ঘন করিতে চাহে না। তাহার পিতা তাহার জন্মের পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন যে সে আদেশ লঙ্ঘন করিলে, তাঁহাদের মঙ্গল হইবে না।—না, তাহা ত সে লঙ্ঘন করিতে চাহে না। যাঁহার জন্য, তাহার ঠাকুরদাদা মহাশয় সর্ব্বস্ব দিতে পারিতেন, তাঁহার পুত্রের জন্য সে কি সর্ব্বস্ব দিতে পারিবে না?—পারিবে বইকি! ঠাকুরদাদার আদেশ শুনিবার আগেই সে যে তাঁহাকে তাহার সর্ব্বস্ব দান করিয়া ফেলিয়াছে। এখন তাহার দাদামহাশয়কে এই পত্রখানা দেখাইতে পারিলেই তাহার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধিলাভ করিবে। তাহার দাদামশায়, তাহার ঠাকুর দাদা মহাশয়ের মৃত্যুকালের আদেশ অমান্য করিয়া কখনই তাহার পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কায করিতে পারিবেন না। তাহার দাদামহাশয় যেমন করিয়া হউক, হরিহরপুরের জমীদারের সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়া দিবেন। আজ তাহাদের বাড়ী হইতে গাত্র হরিদ্রা আসিবার কথা ছিল; কোনও কারণবশত আয়ে নাই; ভালই হইয়াছে। গাত্র হরিদ্রা আসিবার পূর্ব্বে তাহার দাদামহাশয় যদি এই পত্রখানা দেখেন, তাহা হইলে তিনি আজই এমন ব্যবস্থা করিতে পারিবেন যাহাতে কাল আর উহা আসিবে না। তাহা আসিলে, সৌদামিনী লজ্জায় মরিয়া যাইবে। ঐ ঘৃণ্য দ্রব্য স্পর্শ করা দূরে থাকুক, তাহা দর্শন করিলেই তাহার হৃদয় বিকল হইয়া যাইবে।

যে পত্রখানা তাহাকে এই মহা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে, তাহা সে পুনরায় আপনার ক্রোড়ে সস্নেহে উঠাইয়া লইল।

উত্তর দিক হইতে মৃদু বায়ু গবাক্ষ পথে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রভাকর-করোজ্জ্বল কেশজাল লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। জানালার বাহিরে পার্শ্ববর্ত্তী বাটীর ছাদে কতকগুলি চটক রৌদ্রালোকে উড়িতেছিল; যেন উড্ডীয়মান পুষ্প সকল আপন ইচ্ছায় মধ্যাহ্ন সূর্য্যের পূজা করিতেছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহছাদের একাংশ, রৌদ্রস্নাত হইয়া যেন মণিময় স্বর্ণমুকুটের মত জ্বলিতেছিল। দূরে একটা বৃক্ষের চুড়ায় যেন স্বর্গ হইতে স্বর্ণময় পুষ্পের বৃষ্টি হইতেছিল। সৌদামিনী দেখিল যে তাহার হৃদয়ের প্রফুল্লতায় যেন সমস্ত পৃথিবী প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

প্রফুল্ল হৃদয়ে পত্রখানি লইয়া সৌদামিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। সে জানিত তাহার দাদা মহাশয়, তাহার বিবাহোপলক্ষে পনের দিনের ছুটী লইয়াছিলেন এবং বহির্বাটীর বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া সংবাদ-পত্র পাঠ করিতেছিলেন। দাদামহাশয়ে নিকটে যাইয়া, পত্রখানি দেখাইবার জন্য সে ধীরে ধীরে নিম্নতলে নামিয়া আসিল। বৈঠকখানা ঘরের দ্বারে আসিয়া, সে ভিতরে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল যে সেখানে ডেপুটীবাবু একাকী নাই। তাঁহার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে বসিয়া, অশ্রুকুমার সম্মুখে একখানা পুস্তক খুলিয়া কি লিখিতেছে। সৌদামিনী লজ্জাভারে এমন প্রপীড়িতা হইয়া পড়িল যে সে আর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে সাহসী হইল না; পরন্তু সেই পত্রে যে কথা লিখিত ছিল, তাহা লইয়া, অশ্রুকুমারের শ্রবণগোচরে, তাহার দাদা মহাশয়ের সহিত আলোচনা করা চলে না। সুতরাং সেই সময়, সে পত্রখানি তাহার দাদামহাশয়কে দেখাইতে পারিল না। অপর কোনও সময়ে, অশ্রুকুমারের অসাক্ষাতে সে উহা তাহার দাদামহাশয়কে দেখাইবে, ইহা মনে করিয়া সে ভিতর বাটীতে ফিরিয়া আসিল।

কক্ষদ্বারে সৌদামিনীর আগমন, বা তথা হইতে তাহার প্রত্যাগমন, সংবাদপত্র পাঠে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া, ডেপুটীবাবু লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। কিন্তু অশ্রুকুমার তাহা দেখিয়াছিল।

সৌদামিনী ভিতরবাটীতে প্রত্যাগমন করিবার অল্পকাল পরে, অশ্রুকুমার কোন একটা প্রয়োজনে তাহার মাতার নিকট বাটীর ভিতর আসিয়াছিল। বহির্বাটীতে প্রত্যাগমনের পথে, সে এক কক্ষদ্বারে সৌদামিনীকে

দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সৌদামিনী, তুমি একটু আগে ঘারবাড়ীতে গিয়েছিলে কেন? আর কেনই বা তোমার দাদামহাশয়ের সঙ্গে দেখা না করেই ফিরে এলে?"

সৌদামিনী এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবে? সে কিছুকাল নীরবে আনত আননে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বিনম্র মুখে অরুণ-রাগ ফুটিয়া উঠিল।

অশ্রুকুমার প্রার্থনাপূর্ণ কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করিল, "আমাকে বলবে না, সৌদামিনী?"

অশ্রুকুমারকে বলিবে না, এমন কোন কথা ত সৌদামিনীর হৃদয়মধ্যে স্থান লাভ করিতে পারে না। সে ধীরে ধীরে কহিল, "একখানা পুরানো চিঠি, দাদামশায়কে দেখাবার জন্যে গিয়েছিলাম।"

অশ্রুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "তা, দেখালে না কেন? কার চিঠি?"

সৌদামিনী একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "আমার বাবার চিঠি।"

অশ্রুকুমার বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবার চিঠি? তা তুমি কেমন ক'রে পেলে?"

সৌদামিনী কহিল, "বাবা কুড়ি বছর আগে, ঐ চিঠিখানা আমার মাকে লিখেছিলেন।"

অশ্রুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "এত কাল পরে, তুমি সে চিঠি কোথায় পেলে?"

সৌদামিনী পত্রপ্রাপ্তির ইতিহাস বলিল।

অশ্রুকুমারের চিত্ত একটা ক্ষীণ আশার আলোকে কিছু আলোকিত হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, ঐ পত্রে কি সৌদামিনীর দাদামহাশয়ের শেষ ইচ্ছার কথাটা লিখিত আছে? সে আশান্বিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তাতে কি লেখা আছে, সৌদামিনী? তুমি কি তা আমাকে বলবে না?"

অশ্রুকুমারকে তাহা বলিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু সৌদামিনী বিষম লজ্জার বাধা অতিক্রম করিতে পারিল না। সদ্যঃস্ফুট কোকনদ-প্রভায় তাহার কপোলতল রক্তিমপ্রভ হইয়া উঠিল। একটা বিষম আবেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। সে নিম্নবক্ত্রে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

শরীরিণী দামিনীদীপ্তির ন্যায়, তাহার ব্রীড়ানিপীড়িত অবয়বের উজ্জ্বল-মধুর শোভা দেখিয়া, অশ্রুকুমার কিৎকাল মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল। ভাবিল, সুকর্ম্মা যেন স্বর্গের সমস্ত সুষমা পুঞ্জীভূত করিয়া, তাহার নয়নবিনোদন জন্য এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি গড়িয়াছেন। ভাবিল, কোটি কোটি কমলের কমনীয়তা বুঝি এই কোমলাঙ্গীর অঙ্গে অঙ্গে সঞ্চারিত হইয়াছে। ভাবিল, এই দেহগঠনে বুঝি বা মৈনাকমথিত সমস্ত অমৃত ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। ভাবিল, পৃথিবীতে এই অতুলনীয়ার তুলনা আছে কি? আপনার উদ্বেলিত চিত্তকে কিঞ্চিৎ শান্ত করিয়া অশ্রুকুমার মিনতির স্বরে সৌদামিনীকে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "চিঠিখানায় এমন কি কথা লেখা আছে, সৌদামিনী, যা তুমি আমাকে বলতে পারছ না?"

সৌদামিনী লজ্জালসিত কটাক্ষে অশ্রুকুমারকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "চিঠিখানায় যা লেখা আছে তা আমি মুখে বলতে পারব না। বরং আমি সেটা তোমাকে দেব, তুমি নিজে পড়ে দেখো।—এনে দিচ্ছি।"—বলিয়া সৌদামিনী চলিয়া গেল।

অশ্রুকুমার অপেক্ষা করিল। এই অল্পকাল মধ্যে, কত আশার কত শান্ত অনিল, কত নিরাশার কত ঝঞ্ঝা-ঝটিকা তাহার হৃদয় মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে? প্রেমিক ব্যতীত, কে আশার স্বর্গে তত উর্দ্ধে উঠিতে পারে? প্রেমিক ব্যতীত, কে নিরাশার সাগরে তত নিম্নে নিমগ্ন হইতে পারে? একবার আশার উজ্জ্বল আলোকে হৃদয় আলোকিত হইয়া উঠিতেছিল, পরক্ষণে নিরাশার অন্ধকারে তাহা আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছিল। একবার মনে হইতেছিল, বুঝি বা ঐ পুরাতন পত্রের পাল তুলিয়া, প্রেমসাগরে তাহার জীবন-তরী ভাসবে; আবার ভাবিতেছিল, সেই পত্রের সারি সারি অক্ষরগুলি, দুর্গপ্রাচীরের প্রস্তরস্তরের ন্যায়, তাহার ও সৌদামিনীর জীবনের মধ্যে অভেদ্য

আশার সৃষ্টি করিবে। এই আশা ও নিরাশার মধ্যে দোদুল্যমান হৃদয় লইয়া সে সৌদামিনীকে আপনার নিকট পুনরাগতা দেখিল। দেখিয়া সে কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কই চিঠি? এনেছ কি?"

সৌদামিনী কহিল, "এনেছি, এই নাও।"

অশ্রুকুমার তাহার কম্পিত হস্ত প্রসারিত করিয়া, পত্রখানা সৌদামিনীর কম্পিত হস্ত হইতে গ্রহণ করিল। আবরণ হইতে তাহা উন্মুক্ত করিয়া, অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তাহা পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পত্র পাঠান্তে, সে প্রফুল্ল মুখে সৌদামিনীকে কি প্রশ্ন করিতে গেল। কিন্তু সৌদামিনী কোথায়? সে তখন লজ্জাসংকোচে আপনাকে সম্পূর্ণ সংকুচিত করিয়া কোথায় কক্ষান্তরে লুকাইয়াছিল; অশ্রুকুমার তাহার কোনও সন্ধানই পাইল না।

সৌদামিনীর জন্য কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া, অশ্রুকুমার যখন তাহাকে আর পুনরাগতা দেখিল না, তখন, পত্রখানা কিরূপে সৌদামিনীকে প্রত্যর্পণ করিবে, সে তাহা চিন্তা করিতে লাগিল। আজ অন্য সময়, কিংবা আগামী কল্য প্রভাতে সৌদামিনীর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইলে, সে উহা তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে পারিত। কিন্তু সৌদামিনী পত্রখানা শীঘ্র তাহার দাদা মহাশয়কে দেখাইতে চায়; আর তিনি যত শীঘ্র উহা দেখেন, ততই মঙ্গল। সুতরাং পত্রখানা প্রত্যর্পণ করিতে কালবিলম্ব করা চলিবে না। অশ্রুকুমার ভাবিল, যদি সে উহা তাহার মাতার হস্তে প্রদান করে, তাহা হইলে, তিনি উহা সত্বর সৌদামিনীকে পৌছাইয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু না, ইহাতে একটা বাধা আছে। মাতাঠাকুরাণীর নিকট ঐ পত্র পাইলে, সৌদামিনী বুঝিবে, সে যে আমাকে ঐ পত্র পড়িতে দিয়াছিল, তাহা মাতা ঠাকুরাণী জানিতে পারিয়াছেন। ইহা বুঝিয়া, সে আরও লজ্জিত হইয়া পড়িবে—এই পত্র আমাকে পড়িতে দেওয়া, তাহার লজ্জার কারণ নহে কি? তবে কি উপায়ে. উহা শীঘ্র সৌদামিনীর নিকট পাঠান যায়? সৌদামিনীর বৃদ্ধা ঝি উঠানে কি কায করিতেছিল; উহাকে ডাকিয়া পত্রখানা দিলে, সে উহা শীঘ্র সৌদামিনীকে দিতে পারে। কিন্তু বৃদ্ধা হয়ত পত্রখানাকে একটা সন্দেহের চক্ষে দেখিবে; হয়ত তাহার সহিত সৌদামিনির পত্র-ব্যবহারের একটা কাহিনী রচনা করিয়া, উহা জন সমাজে প্রচার করিবে। তখন অনন্যোপায় হইয়া অশ্রুকুমার ভাবিল যে, সৌদামিনী নানা কার্য্যের জন্য সর্ব্বদা তাহার শয়ন কক্ষে যাইয়া থাকে; হয়ত অল্পকাল মধ্যেই সহস্তে তাহার শয্যা রচনা করিবার জন্য সে ঐ কক্ষে প্রবেশ করিবে। অতএব পত্রখানা শয্যার পার্শ্বে টেবিলের উপর রাখিয়া আসিলে, সে উহা সহজে ও অল্পকাল মধ্যে প্রাপ্ত হইবে। অশ্রুকুমার তাহাই করিল,—উপরে উঠিয়া আপন শয়ন কক্ষে পত্রখানা রাখিয়া আসিল।

তাহার পর, সে নিম্নে বহির্বাটীতে আসিয়া, আবার পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তখন মন আর তাহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইল না; উচ্ছৃঙ্খল হইয়া, চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আচ্ছা, সৌদামিনী কি সত্যই তাহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছে? সে কি সত্যই ঐ পত্রখানা তাহার দাদামহাশয়কে দেখাইয়া হরিহরপুরের জমীদারের সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়া দিতে চায়? আচ্ছা, ডেপুটি-বাবু ঐ পত্রখানা পাঠ করিয়া কি করিবেন? ঐ পত্র অমান্য করিয়া, সৌদামিনীকে অন্য পাত্রে সমর্পণ করা তাঁহার পক্ষে সহজ হইবে না; হয়ত সৌদামিনীই তাহা হইতে দিবে না;—তাহা না হইলে, সে তাড়াতাড়ি এই পত্রখানা তাঁহাকে দেখাইতে যাইত না। আহা! কি আনন্দ! অশ্রুকুমারের পিতার অভিলাষ পূর্ণ হইবে! অশ্রুকুমার সৌদামিনীর ন্যায় পত্নী পাইবে। অশ্রুকুমারের হৃদয়নিকুঞ্জ যেন সহস্র রাগরাগিণীতে নিনাদিত হইয়া উঠিল! সেই নিকুঞ্জে, সেই রাগরাগিণীর তালে তালে আশা মোহিনীমূর্ত্তিতে নৃত্য করিতে লাগিল!

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

কাশ্মীর-ভ্রমণ

৪ঠা অক্টোবর—সমস্ত ভারতবর্ষে পর্য্যটন করিয়াও ভ্রমণ-পিয়াসা নিবৃত্ত হয় নাই, তাই এবারে ৺রী পূজার অবকাশে ভূস্বর্গ কাশ্মীর ভ্রমণ করিবার সংকল্প পূর্ব্ব হইতেই করিয়াছি। দেখি আমার এ আজন্ম-সৌন্দর্য্যপিপাসু অন্তঃকরণ ইহাতে তৃপ্ত হয় কি না।

আমার একটী আত্মীয় 'প' বাবু শ্রীনগরে থাকেন, পূর্ব্বেই পত্র লেখায় তিনি আমাকে সাদরে তাঁহার নিকট আহ্বান করিয়াছেন। অক্টোবর মাসে যাইতেছি, সেখানে বেজায় শীত হইবে। সুতরাং সঙ্গে সকল রকমের শীত-বস্ত্রাদি আমার চামড়ার বাক্স ও হোল্ড-অলে বোঝাই করিয়া পূর্ব্বাহ্নেই প্রস্তুত হইয়া থাকিলাম।

পথে দিল্লীতে আত্মীয় 'ন' বাবুর বাসায় দুইদিন বাস ও বিশ্রাম করিব। পাঞ্জাব মেইলে না যাইয়া ১২-৩০এর এক্সপ্রেসে যাওয়াই স্থির করিলাম। এ ট্রেণে ভিড় হইবে না, এবং যদিও ১২ ঘণ্টা বেশী যাইতে হইবে, তথাপি রাত্রি ২টার স্থলে ৬-৩০ মিনিট দিনের আলোতে দিল্লী পৌঁছতে পারিব এই সুবিধা।

ইণ্টার ক্লাশের টিকিট কিনিয়া, উঠিতে গিয়া দেখি, যে ভিড়ের ভয় করিতেছিলাম তাহা বেশ পুরা মাত্রাতেই আছে। মনকে সান্ত্বনা দিলাম যে অধিকাংশ যাত্রীই বাঙ্গলা মুলুকে নামিয়া যাইবে, তারপর বেশ আরাম করিয়া শুইতে পাইব। ট্রেণ ছাড়িয়া দিলে, কে কোথায় যাইবেন জিজ্ঞাসা করিয়া মনটা পরিষ্কার করিয়া লইব স্থির করিলাম। সামনের বেঞ্চে কয়েকটী ভদ্র বৈরাগী এবং একটী বয়স্থা মাতাজী ছিলেন, জিজ্ঞাসায় জানিলাম তাঁহারা বৃন্দাবন যাইবেন। ৫।৬ টী পাঞ্জাবী ভদ্রলোক অপর পার্শ্বে ছিলেন, তাঁহারা যাইবেন—"লাহোর।" আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না—হয়ত শুনিব—"পেসাওয়ার।" হতাশ হইয়া এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। একটী বাঙ্গালী বালক দাঁড়াইয়া ছিল, ডাকিয়া বসাইলাম,—সে নিকটেই অর্থাৎ 'এলাহাবাদ' যাইবে।

প্রতি ষ্টেশনেই লোক উঠিতে লাগিল। অবশেষে সমস্ত তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী কোন বাধা বিঘ্ন না মানিয়া কামরা বোঝাই করিয়া ফেলিল। বহু রাত্রে একটু কাক-নিদ্রার আয়োজন করিয়াছি (অবশ্য বসিয়াই) অমনি এক বিকট চিৎকার শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। দেখি, কামরার ভিতর প্রায় ২৫।৩০ জন কুলী শ্রেণীর লোক ঢুকিয়া পড়িয়াছে এবং এক রেলের জমাদার দরজার সামনে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে উৎসাহ দিতেছে। রক্তমাংসের শরীরে আর সহ্য হইল না। ভীষণ চীৎকারে জমাদারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম—"What the d—l do you mean by this rascally conduct ?" আরও ২।৪ টি বুলি, আর অমনি জমাদার মহাশয় তাঁহার সমস্ত আদমী নামাইয়া লইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। বাকী রাতটুকু আর বিশেষ কোন উপদ্রব হইল না।

৫ই অক্টোবর—প্রায় ৭ টায় ট্রেণ মোগল-সরাই পৌঁছিল। এই মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী খানায় গদি আঁটা নাই বলিয়া দলে দলে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী আসিয়া ইহাতে উঠিতে লাগিল। কথা কাটাকাটি হইতে হাতাহাতি হইবার উপক্রম। অবশেষে মির্জ্জাপুরে আসিয়া রণে ভঙ্গ দিতে হইল—আর এক-খানা গদিযুক্ত গাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়া অপেক্ষাকৃত শান্তি পাওয়া গেল। এ দেশীয় লোক গদি না থাকিলে সে গাড়ীকে থার্ডক্লাশ বলিয়াই ধরিয়া লয়।

১১টায় এলাহাবাদে কিছু 'হিন্দু খাসীর গরম মাংস' ও 'ফুলকা' সহযোগে মধ্যাহ্নভোজন শেষ করা গেল। তাহার পূর্ব্বে ফ্লাস্কের জলে কাকস্নান সারিয়া লইয়া-

ছিলাম। মধ্যাহ্নটা বড় গরম বোধ হইতেছিল। এ পরিচিত রাস্তা আর দেখিবার কৌতূহল ছিল না। তাই রাত্রির ঘুমের কাযটা এই সময়েই সারিয়া লইলাম।

রাত্রে 'এটোয়া' হইতে কিছু আহার যোগাড় করিব বলিয়া বসিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের ট্রেণ আসিবার পূর্ব্বেই একখানি Troops special আসিয়া সমস্তই শেষ করিয়াছে। সঙ্গে সামান্ত রুটী মাখন ও কলা ছিল, তাহাতেই উদর পূর্ত্তি করিতে হইল।

৬ই অক্টোবর—রাত্রিটা কাটিল মন্দ নয়। সকালবেলা দিল্লী পৌছিয়া, 'ন' বাবুর বাসায় 'চা' পান করিয়া শরীর সুস্থ হইল। দিল্লী আমার পরিচিত এবং আমার 'ভারত প্রদক্ষিণে' এ বিষয় যথেষ্ট লিখিয়াছি, সুতরাং এখানে আর কিছুই লিখিব না।

৭ই ও ৮ই অক্টোবর এই দুই দিন এইখানেই বিশ্রাম করিয়া অসুস্থ শরীরটাকে সুস্থ করিয়া লইলাম। ৭ই সন্ধ্যায় হঠাৎ এক পূর্ব্বপরিচিত ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি বলিলেন, "আপনি দিল্লীতে আসিয়াছেন, আমাদের পূজা দেখিয়া যাইবেন।" পরদিন সকালবেলা ফতেপুরীর পাশে ধর্ম্মশালায় পূজা দেখিতে গেলাম। এই সুদূর প্রবাসেও বাঙ্গালীরা বারোয়ারী করিয়া শারদীয়া পূজা করিতেছেন। থিয়েটার ইত্যাদি উৎসবেরও আয়োজন হইয়াছে। প্রতিমা কাশীধাম হইতে আসিয়া থাকে। আজ সপ্তমী পূজা। এই দূরদেশে বাঙ্গালী জীবনের একমাত্র আনন্দোৎসব দেখিয়া অশান্ত মন কতকটা শান্ত হইল।

রাত্রি ৮টার জি, আই, পি, মেলে রাওলপিণ্ডি রওনা হইলাম। আবার ইন্টার ক্লাসের টিকিট। লাহোরে গিয়া গাড়ী বদলাইতে হইবে। যথেষ্ট ভিড় ছিল, উঠিতেই দুইটি ভদ্রলোক বাধা দিলেন। এক বেঞ্চিতে তাঁহারা দুইজন মাত্র ছিলেন, এবং বাকী যায়গাটুকু 'বিস্তারা' ইত্যাদি দ্বারা অবরোধ করিয়াছিলেন। আমার উর্দ্দুতে যে দখল আছে তাহাতে কুলাইল না। 'ন' বাবু সঙ্গে ছিলেন, তিনি বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক কথা বুঝিতেই পারিলাম না, তবে প্রথমে অনুনয়ে ফল হইল না—আমিও যোগ দিতে পারিলাম না। তার পর যখন বন্ধু অনুনয়ের পরিবর্ত্তে যুদ্ধোদ্যম করিলেন, তখন আমিও যোগ দিতে পারিলাম, কারণ এখানে আর উর্দ্দু জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই। দুই মিনিটের মধ্যে তাঁহারা নামিয়া পড়িলেন। আমি মনে করিলাম পুলিস ডাকিতে যাইতেছেন, কিন্তু আসিল কুলী। তাঁহারা বেশ একটা "অর্ডালি-রিট্রীট্" করিয়া মান রক্ষা করিলেন। এই জয়লাভের ফলে আর কোন যাত্রী আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত করিতে সাহসী হইল না।

৯ই অক্টোবর—সকাল বেলা লাহোর পৌছিয়া শুনিলাম যে ডাক গাড়ীতে ইন্টার ক্লাস নাই, তাহাতে যাইতে পারিব না। অগত্যা দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাওয়াই স্থির করিলাম। Some have greatness thrust upon them" মহাকবির এই বাক্য মনে পড়িতে লাগিল। মুটিয়া হাঁকিল "আঠ আনা"। আমি রাজী না হওয়ায় সে মাল ছাড়িয়া রওনা হইল। ধমকাইয়া বলিলাম, "নম্বর দেখলাও"—অমনি কাঁপুনী আরম্ভ। গার্ড সাহেবকে বলিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় ঢুকিয়া পড়িলাম। এমন সময় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া একটি ছাত্র যুবক আসিয়া আমাকে অভিবাদন করিয়া বলিল যে, আমাকে সে অমৃতসর কংগ্রেসে দেখিয়াছে, এবং সেখানে সে ভলন্টিয়ার ছিল। আজ তাহার বাড়ী (পিণ্ডি) যাইতেই হইবে, তাহার তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট, সে আমার ভৃত্য বলিয়া যাইতে চায়। অস্বীকার করিতে পারিলাম না। গার্ডকে Servant শব্দ না বলিয়া attendant বলিয়া দিলাম।

লাহোর পর্য্যন্ত পূর্ব্বে আসিয়াছি, ইহার পর হইতে সমস্তই নূতন। দুই ধারেই সেই মরুভূমির মত দেশ। গ্রামগুলি বোধ হয় যেন পুড়িয়া গিয়াছে। ট্রেণে বহুলোক উঠা নামা করিতেছে—তাহারা উচ্চে কেহই ৬ ফুটের কম নয়। আর যেন পাঞ্জাবী

চেহারা নাই। অধিকাংশই বলিতে গেলে কাবুলী-ওয়ালার মত।

আহারের কোনই উপায় দেখিতেছি না। সঙ্গে কিছুই নাই। একে ডাক গাড়ী, কোন ষ্টেশনেই বড় দাঁড়ায় না। অবশেষে 'উজিরাবাদ' হইতে ২টি কাশ্মীরি সেও, পুরী ও মিঠাই জিলিপি লইয়া জঠরানলে আহুতি দিবার চেষ্টা করা গেল। পুরীর সহিত তরকারী বিলাতী কুমড়ার আচারের মত, লাগিল মন্দ নয়।

মাঝে মাঝে নদী পার হইতেছি, কিন্তু সমস্তই প্রায় ফল্গুর মত। মরুভূমির তৃষিত বক্ষে তাহারা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মাঠে মেয়ে পুরুষ উভয়েই কায করিতেছে, কিন্তু কৈ রংটা তো তেমন শ্বেতাভ বোধ হইতেছে না। বেলা ১২টায় দূরে অস্পষ্ট অনুন্নত পাহাড়ের রেখা দেখা গেল।

লালামুসা জংসন সাগর-সমতল হইতে প্রায় ৮৫০ ফিট উচ্চ। এখন ট্রেণ ক্রমেই উপরে উঠিতেছে। দুইখানা এঞ্জিন ট্রেণখানিকে টানিতেছে। সম্মুখে পাহাড়ের রেখা ক্রমেই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে।

এখন পাহাড়ের উপরের গাছগুলিও একটু একটু দেখা যাইতেছে। রাস্তার দুই পাশেই বাবলা গাছের সারি। ছোট বড় অনেক উট দাঁড়াইয়া কাঁটাশুদ্ধ তাহারই ডাল বেশ আরামের সহিত চিবাইতেছে। কোন বন্ধু বাবলা গাছের ডালের উপর উটের আকর্ষণটাকে, পুরুষের বিবাহ ইচ্ছার সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে নিজের মতামত প্রকাশ করিয়া নব-বিবাহিত পাঠক-পাঠিকাবর্গের বিরক্তিভাজন হইতে ইচ্ছা করি না।

চারিদিকে বালুকাস্তূপের ন্যায় ছোট ছোট টিলা বিস্তৃত বাবলার অরণ্যে পরিপূর্ণ। দৃশ্যাবলী কেমন যেন একটা অমানুষিক গোছের বলিয়া বোধ হইতেছে। ঝেলম্ ষ্টেশনে প্রায়শূন্য ঝেলম্ নদী এক দীর্ঘ সেতুর উপর দিয়া পার হইলাম। এইখানে আমার কামরা খালি হইয়া গেল, এবং আমিও একেশ্বর হইয়া, কাশ্মীরের সেওগুলির সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিলাম। বাস্তবিক এই আপেলগুলি বেশ সরস ও মিষ্ট।

ট্রেণ ক্রমাগত উপরে উঠিতেছে এবং বালুকাস্তূপ ক্রমে প্রস্তর স্তূপে পরিণত হইতেছে। এখন স্তরে স্তরে অনুন্নত পর্ব্বতমালা দেখা যাইতেছে। ক্রমেই কাশ্মীরের নিকটে আসিতেছি, কিন্তু কাশ্মীরী চেহারা দেখিতেছি না। পাহাড়ের গায়েই 'টারকী' ষ্টেশনে ট্রেণ দাঁড়াইল না। ছোট ছোট বাড়ীগুলি পাহাড়ের পাদদেশে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে।

ট্রেণ বাম দিকে অনুন্নত পাহাড়ের গা দিয়া চলিতে চলিতে দুইটী টানেল্ পার হইয়া গেল। ডানদিকে আরও নিচু পোড়ামাটীর রংএর মত পাহাড়। আমরা সাগর-সমতল হইতে ১৫০০ ফিট উচ্চে উঠিয়াছি। গুজর খাঁ ষ্টেশনে একটু চা-রুটী খাইয়া লইলাম। আর ২।৩ শত ফুট উঠিয়া ৩০।৩২ মাইল গেলেই রাওলপিণ্ডি—সংক্ষেপে 'পিণ্ডি'। এখনও শীত বোধ করিতেছি না। মাঝে মাঝে কোন ষ্টেশনে বেশ সুন্দর লোক দেখিতেছি, বোধ হয় ইহারা কাশ্মীরের হইবে।

পাহাড় আর নাই। দূরে ছোট ছোট টিলা। লাইনের পাশেই সম্রাট শের সাহের কীর্ত্তি গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড—এ রাস্তা কি ফুরাইবে না?

দূরে স্তরে স্তরে ক্রমোন্নত পর্ব্বতমালা দেখা যাইতেছে। একটা শুষ্কপ্রায় গিরিনির্ঝরিণীর উপরের পোল দিয়া অতি সন্তর্পণে ট্রেণ পার হইল। যদি ভাঙ্গিয়া যায় তবে ৩।৪ শত ফিট নিচে প্রস্তরময় নদীগর্ভে পড়িয়া ভূস্বর্গের পরিবর্ত্তে "আসল" স্বর্গ গমনের পথ, পরিষ্কার হইয়া যাইবে। ডানদিকে এক বিরাট প্রাকারের মত কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতরেখা স্পষ্ট হইয়া উঠিল। ঐ দুরতিক্রম্য দুর্গপ্রাকারের মধ্যেই বুঝি সেই স্বর্ণভূমি সমস্ত জগতের লোলুপ দৃষ্টি হইতে আপনাকে রক্ষা করিতেছে। পিণ্ডি আর ৩ মাইল মাত্র। অট্টালিকাগুলি বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। দুই পাশে অনেক ছাগল চরিতেছে। সবগুলিই লোমশ।

ছিলাম, কিন্তু পরে দেখিলাম সহজে গাড়ী ছাড়িল না। চালককে জিজ্ঞাসা করিলাম যে কেন সে অযথা রাস্তায় দেরী করিয়া এই বস্তিতে থামাইল? সে কোন উত্তর দেওয়াও আবশ্যক বোধ করিল না। রাগে, দুঃখে, অপমানে মরিয়া গেলাম। কিন্তু কোন উপায় নাই।

অ্যাডভেঞ্চরটা পুরামাত্রাতেই হইবে। উভয়ে এক দোকানদারের নিকট হইতে একটা কামরা বন্দোবস্ত করিয়া ২ খানা চারপাই বিছাইয়া লইলাম। শরীর ও মন অবসন্ন ছিল, কিছুই খাইব না বলিলাম। এই দুর্গম পর্ব্বত কন্দরে বিপদে বেষ্টিত হইয়া আজ স্রোতে গা ঢালিয়া দিলাম। সহযাত্রী ইতিমধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে খাদ্য দ্রব্য অভক্ষ্য,—ফাঁকি দিয়া পয়সা লইয়াছে। রাত্রিযোগে আক্রমণ করিয়া সমস্ত কাড়িয়া না লইলেই যথেষ্ট। ভাবিয়া ফল নাই, শুইয়া পড়িলাম। ৫ মিনিটে গভীর নিদ্রা।

১১ই অক্টোবর—৫-৩০ তে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। নির্জ্জন বিরাট পর্ব্বতগাত্রে ক্ষুদ্র একটি কক্ষে আমরা দুই জন। তবুও সহযাত্রী ছিল, তাহা না হইলে একাই কাটাইতে হইত। বাহিরে আসিয়া দেখি, তখনও অন্ধকারে পর্ব্বতশৃঙ্গগুলি দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া আছে এবং ক্রমে অস্পষ্টতর হইয়া দূর দূরান্তরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এক বিরাট মহান গম্ভীরতা বিরাজমান।

৬-৩০, গাড়ী ছাড়িল। বাম দিকে উচ্চ পর্ব্বত, ডানদিকে খদ, তাহার পরেই অগণিত পর্ব্বতশৃঙ্গ। সকলের শেষের পাহাড়ের মাথা হঠাৎ রাঙা হইয়া উঠিল। আর কি ভুল হয়? সূর্য্যোদয় হইতেছে। গাড়ী হু হু করিয়া নামিতেছে। 'কোহালা' আর ১৯ মাইল মাত্র। একখানা রূপার থালা যেন পাহাড়ের মাথার উপর দিয়া উঁকি মারিতেছে। একদল গরুর গাড়ী রাস্তা বন্ধ করিয়াছে, এই সুযোগে সূর্য্যোদয় দেখিয়া লইলাম। যাঁহারা দার্জ্জিলিংএ গিয়াছেন, তাঁহারা জানেন পর্ব্বতরাজ্যে সূর্য্যোদয় দৃশ্য কত রমণীয়।

অনেক নামিয়া আসিয়াছি। কি দুর্গম পথ! বিপদের সম্ভাবনা পুরামাত্রায়। এখন ঝেলম্ পরিষ্কার দেখা যাইতেছে, এবং তাহার কলধ্বনও শুনা যাইতেছে। কোহালা আর মাত্র ৪ মাইল। মারী ঠিক পর্ব্বতের মাথায়, আর কোহালা অপর পার্শ্বে ঝেলমের কূলে। ৭-৫৫ এ কোহালা পৌছিলাম।

গাড়ী থামিলে ডাকবাংলাতে চা-পানের জন্য গেলাম। এ ডাক বাংলা আমাদের দেশের হইলেও, এখানে আমরা পর। আগে সাহেব, তার পর আমরা। ইহার পর হইতে কাশ্মীর মহারাজের মুলুক।—দেখা যাইবে সেখানে কি ব্যবস্থা।

একটি সেতু দিয়া নদী পার হইয়া কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। সেতুর মুখে আবার ।৵০ আনা ট্যাক্স আদায় হইল। পার হইয়া গাড়ী থামিল। এখান হইতে শ্রীনগর ১৩২ মাইল। ভূস্বর্গের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছি। এখানে সমস্ত মাল পত্রের হিসাব লেখাইয়া দিতে হইল। পণ্ডিতজী উর্দ্দুতে তাহা লিখিয়া লইলেন। হিন্দু সনের তারিখ দিলেন।

বামদিকে ঝেলম্ আর ডান দিকে পর্ব্বত। গাড়ী ভীষণ গর্জ্জনে স্বর্গের অভিমুখে ছুটিয়া চলিল। ঝেলমের ধার দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গাড়ী চলিতে চলিতে একটি ক্ষুদ্র টানেল পার দিয়া গেলাম। আরও একটি টানেল পার হইয়া ৭ মাইল একটি বস্তির নিকট গাড়ী একেবারে চক্রাকারে ঘুরিয়া আবার নদীগর্ভে নামিয়া আসিল।

আমরা নদীর ধার দিয়া চলিতেছি। আশে পাশে পাকা ধান কাটিতেছে। দুরন্ত স্রোতে একটি লোক একখানা তক্তার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পা দিয়া দাঁড় টানিবার মত করিয়া নদী পার হইতেছে। কাপড় খানা খুলিয়া মাথায় বাঁধিয়াছে।

একটি ডাক বাংলা পার হইয়া পুলিশ ষ্টেশনের নিকট গাড়ী দাঁড়াইল। আরও দু ব্যক্তি গাড়ীতে উঠিয়া বসিল—ইহারা পুলিশের লোক—কাযেই এ হিন্দু রাজ্যেও ইহারাই প্রভু।

রাস্তায় ২-৪টি লোক ছাগল চরাইতেছে। মাঝে মাঝে সেতুর উপর দিয়া ক্ষুদ্র ঝোরা পার হইয়া

যাইতেছি। ১৭ মাইলে টানেল—এবার একটু বড় রকমের। রাস্তায় বালক বালিকা যাহাদিগকে দেখিতেছি, সকলেই অতি নিম্নশ্রেণীর, কিন্তু বেশ সুশ্রী।

প্রায় ১২টায় ডোমেল পৌছিয়া গাড়ী থামিল। এখানে কাশ্মীর প্রবেশের জন্য Customs শুল্ক দিতে হয়। বামদিকে একটি সেতু।

Custmoms officer আমার পরিচয় লইয়া বলিলেন, "আপনি ভদ্রলোক, আপনার ট্রাঙ্ক খুলিতে চাহি না। কেবল কি কি জিনিস আছে তাহার একটা ফর্দ্দ দিন।"

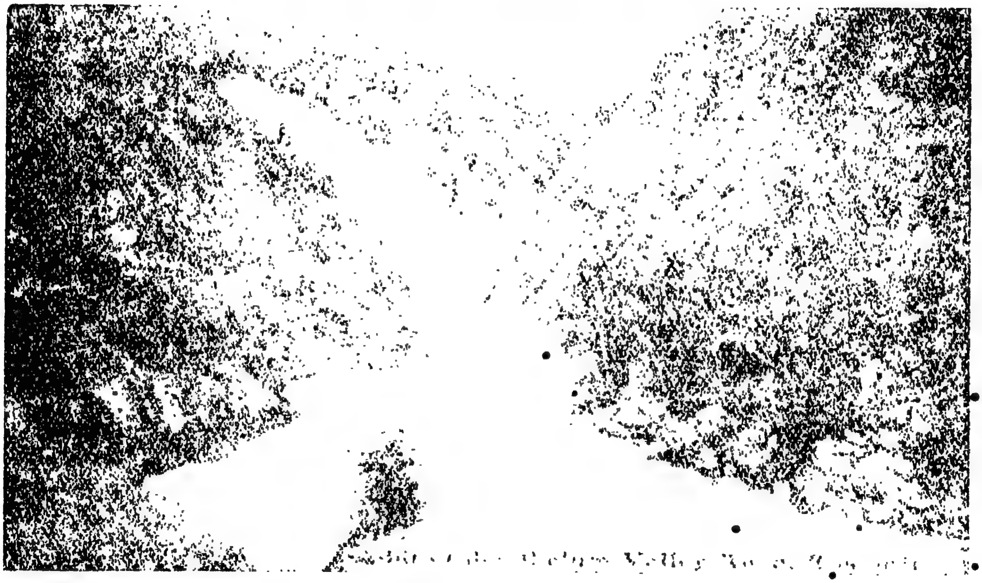

ঝেলম ভ্যালি কাট রোড

আমি এক ফর্দ্দ দিলাম। যে সমস্ত জিনিষ আমার আত্মীয়ের জন্য লইয়া যাইতেছি, তাহার উপর চৌদ্দ আনা শুল্ক দিতে হইল। আর ছয় আনা ট্যাক্স।

১৫ মিনিট পরে গাড়ী ছাড়িল। পরের ষ্টেশনে আহারাদি হইবে। কালও একরূপ অনাহার গিয়াছে। স্নান করিতে পারিলেও হইত।

ঝেলম্ পাশেই আছে, তবে মাঝে মাঝে একটু লুকোচুরী খেলিতেছে। এক ঝরণার পাশে গাড়ী দাঁড়াইয়া এঞ্জিনে জল দিয়া লইল।

গার্ড ডাকবাঙ্গলা লাট সাহেব আসিবেন বলিয়া বিশেষরূপে সজ্জিত হইয়াছে। এখানে গাড়ী থামিল। আহারান্বেষণে ডাকবাঙ্গলাতে ঢুকিয়া দেখিলাম, কয়েকটি সাহেব ও মেম চা পান করিতেছেন। অনুসন্ধানে জানিলাম, হিন্দুদের পৃথক বন্দোবস্ত সে ডাক বাঙ্গলার পিছন দিকে এবং তাহা স্বর্গের তুলনায় নরক। পরিচারককে ভাত রাঁধিতে হুকুম দিয়া একখানা অর্দ্ধভগ্ন চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম।

এই ডাকবাংলাটির অবস্থান অতি সুন্দর। আমি বসিয়াই নদীর অপর পার 'অম্বর চুম্বিত ভাল হিমাচল' দেখিতেছি, আর ভাবিতেছি যে এমন উপভোগ্য যাত্রাটি এক জুয়াচোর মোটরওয়ালার হাতে পড়িয়া নষ্ট হইয়া গেল। দুইটি উনুনে রান্না হইতেছিল। কি হইতেছে জানি না, আমি বারান্দায় বসিয়া চারিদিকের মহান পর্ব্বতরাজী দেখিতেছি। এমন সময় সহকারী চালক আসিয়া তাগাদা আরম্ভ করিল; আহার হউক বা না হউক সে গাড়ী ছাড়িয়া দিবে। আমি তখন মরিয়া হইয়াছি। বলিয়া দিলাম, না খাইয়া যাইব না।

মাংস ও অনেক তরকারী রান্না হইয়াছিল। আমি

কোনরূপে নাকে মুখে গুঁজিয়া উঠিয়া পড়িলাম। আসিয়া দেখি তখনও চালক প্রবরের আহার হয় নাই। থামকা আমাকে উৎপীড়ন করিয়া এমন কাশ্মীরী রান্নাটা উপভোগ করিতে দিল না।

৩৯ মাইলে উপরে উঠিতে লাগিলাম; আবার ৪০ মাইলে প্রবলবেগে নীচে নামিয়া আসিলাম। ৪৫ মাইলে এক বিরাট ঝোরা পার হইতেই, পুলিশ প্রভু চালককে ১৲ টাকা বকসিস দিয়া কৃতার্থ করিয়া নামিয়া গেলেন।

রাস্তার অপর পার্শ্বে লাট সাহেবের জন্য তাঁবু পড়িয়াছে পতাকাদি দ্বারা স্থানটি সুসজ্জিত হইয়াছে। স্থানটির নাম উরি। উরি একটি বিশিষ্ট স্থান। দোকান পশার আছে। দৃশ্যাবলী ক্রমেই সুন্দর হইতে সুন্দরতর হইতেছে। এইখান হইতেই প্রকৃত কাশ্মীর আরম্ভ। ২।১টি দেবশিশুও দেখা যাইতেছে—কিন্তু বড় অপরিষ্কার।

অপর পারে একখানা ডাকের লাল লরি খদে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া রহিয়াছে। আরোহীদের সম্ভবত মৃত্যু হইয়াছে। আমরা সেখানে পৌছিয়া দেখিলাম লরি চুর্ণ হইয়া গিয়াছে, তবে লোকজন কেহ নাই। সম্ভবত তাহাদিগকে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে। অন্য লোক না থাকলেও চালক তো ছিলই।

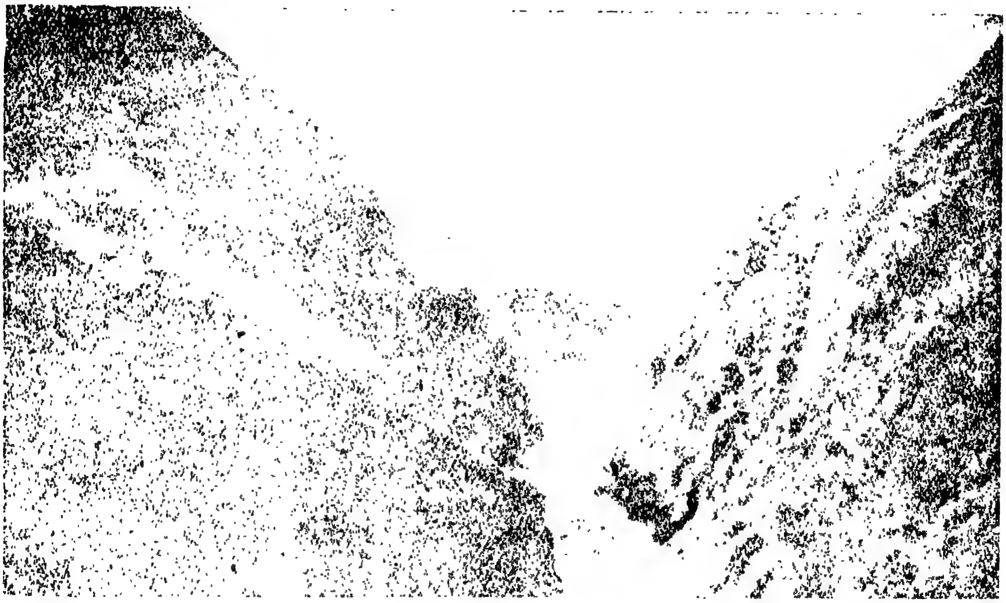

ঝেলম ভ্যালি কার্ট রোড

৬০ মাইল আসিয়াছি। এখন দুই দিকেই গেরী মাটি রংএর পাহাড়। একটু যাইতেই, বাঁদিকে নদীর অপর পারের ক্ষেতে গরু ছাগল চরিতেছে। যেখানে অপ্রশস্ত উপত্যকা, সেইখানেই একটু চাষবাস, বাকী সবই পাহাড়। ৭০ মাইলে আবার লখ [illegible] Halt”—গাড়ী থামিল। এটি Medical examination camp—যাইবামাত্র ডাক্তার আমাকে বসিতে চেয়ার দিলেন। আর সকলের হাত দেখিলেন, কিন্তু আমাকে ভদ্রভাবে শুধু নাম জিজ্ঞাসা করিয়াই বিদায় দিলেন।

সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে। স্বর্গ এখনও বহু দূরে রামপুরে আসিয়া গাড়ী থামিয়া গেল। ডাকবাংলার হাতায় গাড়ী দাঁড়াইলে, খুঁজিয়া তাহার পাশেই "হিন্দু কিচেন" বাহির করিলাম। কাশ্মীর মহারাজের এ একটি কীর্ত্তি। প্রতি ডাক

বাংলার পাশেই হিন্দুদের থাকিবার জন্য স্বতন্ত্র গাড়ী ও পৃথক বন্দোবস্ত। যদিও ডাকবাংলার তুলনায় এ কিছুই নয়, তথাপি মেজেতে সতরঞ্চ বিছানো আছে। ২।১ খানা চেয়ার টেবিল ও বৈদ্যুতিক আলোরও বন্দোবস্ত আছে।

এস্থানটিও অতি রমণীয়। চারিদিকেই উচ্চ পর্ব্বত, আর নিম্নেই খরস্রোতা ঝেলাম উন্মাদিনীর মত সাগর সঙ্গমে ছুটিয়াছে। একাকী এ সমস্ত সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার নয়। আজ বিজয়া। মনে করিয়াছিলাম শ্রীনগর পৌছিয়া অন্তত একজন আত্মীয়কেও বাঙ্গালীর এই আনন্দদিনে আলিঙ্গন করিতে পারিব, কিন্তু তাহা ত ঘটিয়া উঠিল না।

বসিয়া বিজয়ার সম্ভাষণ লিখিতেছি, এমন সময় পণ্ডিতজী একখানি পিতলের থালায় গরম 'ফুলকা' এবং এক বাটিতে মাংস আনিয়া টেবিলের উপর বসাইয়া দিলেন। লকড়ি জিনিষটা বাঙ্গলার বাহিরে আর বড় কোথাও দেখিতে পাই না। বিপ্রবরের সেই দেবভোগ্য আহার্য্যের সহিত ইহার প্রভেদ যথেষ্ট। রাত্রি ১২-৩০শে ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি যে বহু ছারপোকা আক্রমণ করিয়াছে। এই শীতে এত ছারপোকা, না জানি গরমে কি হয়। নিম্নেই ঝেলমের কলনাদ, আর সমস্ত নিস্তব্ধ।

১২ই অক্টোবর—৬টায় ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি সহযাত্রী ডাকিতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া সমস্ত বাঁধিয়া ফেলিলাম। পণ্ডিতজী বসিয়া বারান্দার উপর নির্ব্বিবাদে তামাকু সেবন করিতেছিলেন ও ক্রমাগত কাসিতেছিলেন।

পর্ব্বতরন্ধ্রের মধ্য দিয়া ঝেলম বাহির হইতেছে

প্রভাতের আলোকে স্থানটি দেখিয়া লইলাম। অল্প পরিসর খানিকটা যায়গা ছাড়া আর চারিদিকেই উচ্চ পর্ব্বত থাক। ২।১টী শৃঙ্গে সূর্য্যকিরণ পড়িয়াছে, আরগুলি এখনও অন্ধকার। পাহাড়ের গায়ে ঝাউ গাছের সারি। ছবি তুলিবার উপযুক্ত বটে। রামপুর হইতে বরমুলা পর্য্যন্ত স্থান কাশ্মীরের মধ্যে, শ্রীনগর অপেক্ষাও উঁচু এবং এখানে শীতও বেশী। ওভারকোট চাপাইয়াও শীত যাইতেছে না। সকাল বেলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাত অবশ হইয়া আসিতেছে। ৭-১০ এ গাড়ী ছাড়িল।

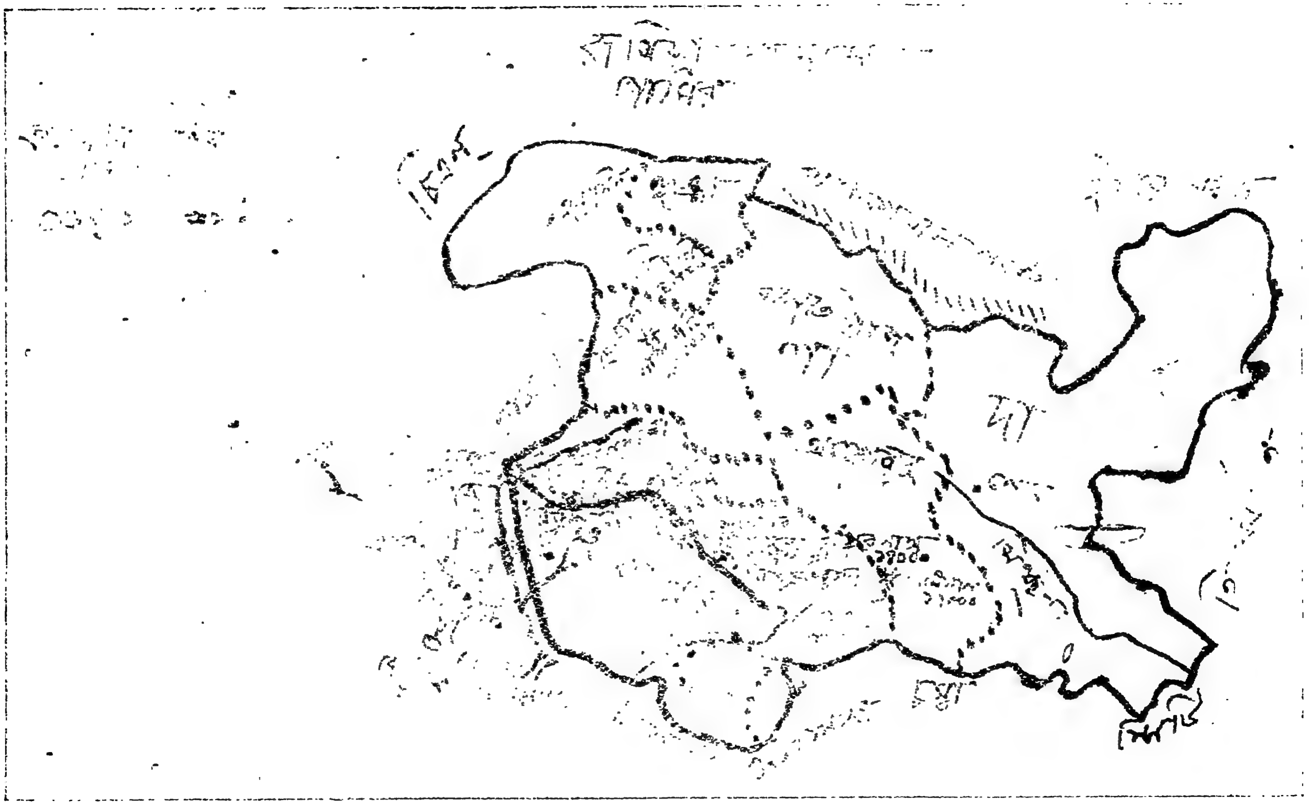

কি সুন্দর দৃশ্যাবলী। উপত্যকা ক্রমেই প্রশস্ত হইতেছে। সমস্ত রাস্তার আশে পাশে ঝরণা। একস্থানে একখানি ঘরের নিচে দিয়া বেগে ঝরণায় জল বাহির হইতেছে, আর তাহারই বেগে ময়দার কল চলিতেছে।

ক্ষীণ কলেবরা ঝেলম্ ক্রমে পৃথুলা হইয়া উঠিতেছে। প্রায় ১১০ মাইলে আমরা একটু বিস্তৃত উপত্যকায় পৌছিলাম। বরমূলা আর অল্প দূরে।

বহু টঙ্গা আসিতেছে। রাস্তায় বেজায় ধূলি, কিন্তু তাহা সাদা। পথের পাশের গাছগুলি পর্য্যন্ত সাদা হইয়া গিয়াছে। বরমূলার নিকটেই পর্ব্বত রন্ধ্রের মধ্য দিয়া ঝেলম্ লাফাইয়া বাহির হইতেছে। এই রন্ধ্র পার হইতেই নদী বক্ষে ২।১ খানি আল ডিঙ্গি দেখা যাইতে লাগিল।

৮-১৫ তে বরমূলা পৌছিতেই আবার বড় বড় অক্ষরে Halt দেখিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। এটা Export checking office, সুতরাং আমাদিগকে বেগ পাইতে হইল না। বাজারের মধ্যে আসিয়া গাড়ী থামিল। বহু অনুসন্ধানেও হিন্দুর দোকান পাইলাম না। অগত্যা ‘রাম’ ‘রহিমের’ প্রভেদ লোপ করিতে হইল। লরিতে ৬টী প্রাণী ছিলাম, এখানে ৭টী হইলাম, ইহার মধ্যে ৬ জনই মুসলমান। ফলত কাশ্মীরে হিন্দু ও মুসলমানের অনুপাত প্রায় ঐরূপই। বরমূলা অতি সুন্দর স্থান, কিন্তু বাজারটা বড় অপরিচ্ছন্ন।

এখন ফুলের বাহার নাই, কিন্তু গাছের বাহারও দেখিবার মত। প্রান্তর ক্রমে বিস্তৃত হইতেছে। রাস্তার দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ সফেদা (poplar) বৃক্ষ শ্রেণী। শীত কাটিতেছে না। একটু দূরে ডানদিকে পাহাড়ের মাথা বরফে সাদা হইয়া গিয়াছে। ডানদিকের সমস্ত পাহাড়ই বরফ, কিন্তু বাঁ দিকে দূরের পাহাড়েও বরফ নাই।

১০-১০ পত্তনে পৌছিলাম। শ্রীনগর আর ১৭ মাইল মাত্র। এ দুরন্ত শীতে আর মোটর ভাল লাগিতেছে না। বাতাস ছুঁচের মত বিঁধিতেছে।

বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্য দিয়া ভীষণ বেগে গাড়ী ছুটিতেছে। পর্ব্বতশ্রেণী দূরে সরিয়া গিয়াছে। মাঠে ধান কাটিয়া বাঙ্গলা দেশেরই মত স্তুপাকারে রাখিয়াছে। আর ঝেলমের দর্শন নাই। গাছের বাহার দেখিবার মত, যেন নিপুণ শিল্পী সমস্ত সাজাইয়া রাখিয়াছে। শ্রীনগর আর ১২ মাইল। ডান দিকে একটী রাস্তা গিয়াছে, লেখা রহিয়াছে To Gulmurg।

১১-১৫ মিনিটে শ্রীনগর সহরে পৌছিলাম। হাঁ, স্বর্গই বটে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়।

বৈদেশিকী

ভাসমান তুষার-শৈল।

ডিসেম্বর মাসের "World's Work" পত্রে প্রকাশিত "The location of icebergs" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক বলিয়াছেন যে, সমুদ্রে ভাসমান তুষার-শৈলের সঙ্ঘাতে এ পর্য্যন্ত কত জাহাজ নষ্ট হইয়াছে ও কত লোকের প্রাণবিয়োগ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ১৯১২ সালে "Titanic" নামক প্রকাণ্ড জাহাজ ঐ প্রকারে ধ্বংসিত হইয়া ১৬৩৫ জন আরোহীর মানবলীলা সমাপ্ত হয়। "কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনী," "বঙ্গ সাহিত্যের এক পৃষ্ঠা", "সপ্তপর্ণী", "কবি রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। তুষার-শৈলের আক্রমণ হইতে জাহাজ বাঁচাইতে হইলে আঁকা-বাঁকা পথে চলিতে হয়, তাহাতে

অসহ্য বিলম্ব হয় এবং কয়লার জন্য বিস্তর টাকা খরচ হয়। সেই জন্য নাবিকদিগকে বাধ্য হইয়া সোজা অথচ বিপদ-সঙ্কুল পথেই জাহাজ চালাইতে হয়। (“In order to reduce the very heavy expenses on board transatlantic liners, and their enormous consumption of coal, the undoubted tendency is to follow the most dangerous route.”)।

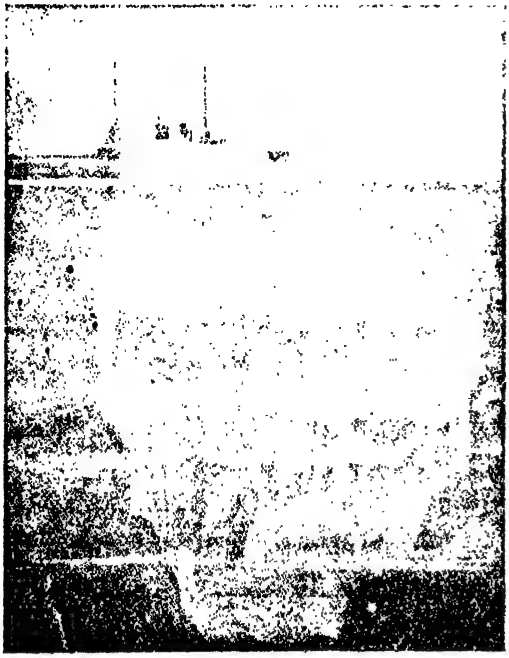

১। ভাসমান তুষার-শৈল

গ্রীনলাণ্ড, আইসলাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চল হইতে দক্ষিণে Azores দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত তুষার-শৈল ভাসিয়া আসে। ইহার খানিকটা মাত্র জলের উপরে থাকে। ১ নং চিত্রে তাহার প্রতিকৃতি দেওয়া হইল।

বহুকাল ধরিয়া বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা তুষার-শৈলের সংঘর্ষণ হইতে জাহাজ রক্ষার উপায় নির্ণয় করিতেছেন, কিন্তু পূরামাত্রায় সফল হন নাই। এতকাল পরে তাঁহাদের আশা-লতা পল্লবিত হইয়াছে। ১৯২০ সালে M. A. Larigaldie নামক একজন ফরাসী, নিউফাউণ্ডলাণ্ডের উত্তরে গিয়া, কতকগুলি পরীক্ষা করেন। তাহার ফলে এক প্রকার ক্ষেপণী-মুকুর (parabolic mirror) আবিষ্কৃত হইয়াছে। ২ নং চিত্রে উহার প্রতিকৃতি দেওয়া হইল।

চক্রবালের সহিত সমান্তরাল মেরুদণ্ডের চারিদিকে এই দর্পণ ঘোরান যায়। ইহাকে জাহাজের ডগার কাছে রাখা হয়। তুষার-শৈল হইতে এক প্রকার মেটে-লাল কিরণ বাহির হয় ; তাহা চক্ষে দেখা যায় না—বৈজ্ঞানিকের ভাষায় ইহা infra-red rays। উক্ত দর্পণে ঐ কিরণ প্রতিফলিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী ব্যাটারিতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করে। ঐ শক্তি প্রভাবে উক্ত ব্যাটারি সংলগ্ন টেলিফোন বাজিয়া উঠে ও জাহাজের লোক সতর্ক হয়। (“The invisible rays of the ice-berg, transformed into

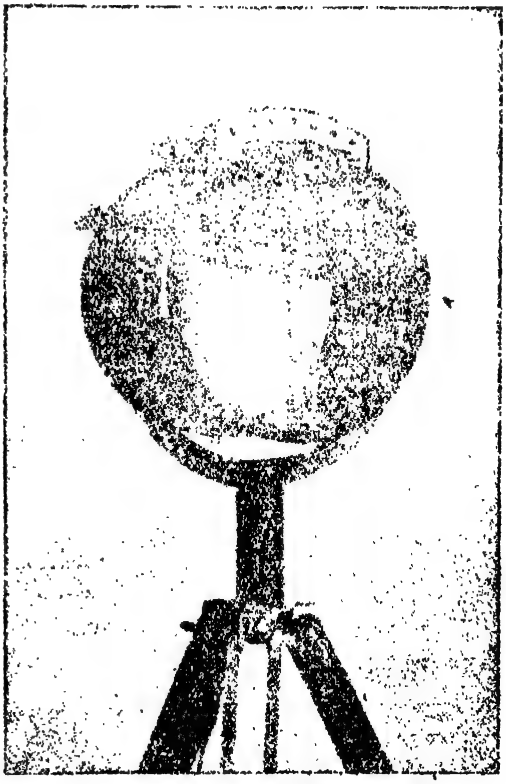

২। ল্যারিগ্যাল্ডি সাহেবের আবিষ্কৃত ক্ষেপণী-মুকুর

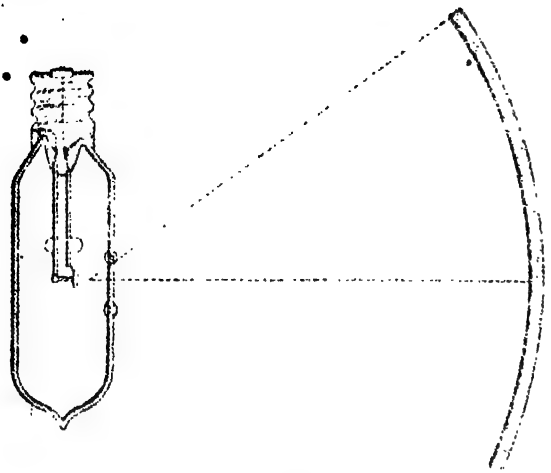

৩। থার্ম্মো ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারি

audible sound, are easily detected by the man with the telephone receiver.")।

যে প্রকার ব্যাটারিতে তুষার-শৈলের মেটে-লাল অদৃশ্য কিরণ, মুকুরে প্রতিফলিত হইয়া, বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, একটী প্ল্যাটিনামের চাকতি, দুইটী নিকেলের দণ্ড এবং একটী Tellurium এর স্ফটিক, তাহার প্রধান উপাদান। ৩ নং চিত্রে তাহার প্রতিকৃতি দেওয়া হইল।

বলশেভিষ্ট উৎপাত।

ডিসেম্বর মাসের "World's Work" পত্রে "The Bolshevist Threat to India" শীর্ষক প্রবন্ধে, Sirdar Ikbal Ali Shah লিখিয়াছেন যে, ইংরাজ গভর্মেণ্ট সতর্ক না হইলে, বলশেভিষ্ট উৎপাতের ঢেউ শীঘ্র ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিবে। পরপৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্রে মধ্য এসিয়ার যে মানচিত্র দেওয়া হইল, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, তুর্কিস্থান ও পারস্য হইতে তিনটী রাস্তা দিয়া ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত হওয়া যায়:—

(১) বোখারা হইতে টার্মেজ দিয়া চিত্রলে; (২) হিরাট হইতে কাবুল দিয়া পেশোয়ারে; এবং (৩) ফারা হইতে কান্দাহার দিয়া কোয়েটায়।

তুর্কিস্থানের অন্তর্গত টাস্‌কেণ্ড, সমরকেণ্ড ও বোখারা নগরত্রয়ে এবং আফগানিস্থানের অন্তর্গত হিরাটে, বলশেভিষ্ট সম্প্রদায়ের বড় বড় আড্ডা আছে। কাস্পিয়ান সাগর তীরস্থ Krasnovodsk নগর হইতে রেলপথে হিরাটে আসা খুব সহজ। হিরাট হইতে কাবুল দিয়া পেশোয়ার পর্য্যন্ত এবং কান্দাহার দিয়া কোয়েটা পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা আছে। লেখক তুর্কিস্থানে ভ্রমণকালে দেখিয়াছিলেন যে ক্রমাগত বন্দুক ও কামান তৈয়ারি হইতেছে, অনবরত সৈন্য সংগ্রহ করা হইতেছে, সমরকেণ্ড অঞ্চল হইতে মস্কো (Moscow) নগরে নিরন্তর কেরোসিন তৈল পাঠান হইতেছে, খিভা (Khiva), বোখারা প্রভৃতি প্রদেশে মটর গাড়ি ও মটর লরির সংখ্যা অজস্র বাড়ান হইতেছে এবং কাস্পিয়ান সমুদ্র হইতে চীনের পশ্চিম ও আফগানিস্থানের উত্তরপ্রান্ত পর্য্যন্ত রেলওয়ে লাইন পাতা হইতেছে। ভারতবর্ষে লঙ্কাকাণ্ড বাধাইবার ইহা সূচনা। ("Cautious inquiries made me positive that ……all this was directed towards assisting the unrest in India")। মধ্য এসিয়ার রেলপথে, মস্কো নগরের "Oriental Institute" হইতে দলে দলে বলশেভিষ্ট প্রচারক যাওয়া-আসা করে। তাহাদের সঙ্গে পুস্তিকা প্রচারের জন্য ছাপাখানা, তারহীন টেলিগ্রাফের সরঞ্জাম, Cinematograph প্রভৃতি অনেক জিনিষ থাকে। ধনীরা নির্ধনের রক্ত শোষণ করিতেছে, গভর্মেণ্ট মানে প্রজাপীড়নের প্রকাণ্ড যন্ত্র, অনবরত এই সকল মত প্রচার করিয়া, তাহারা রুসিয়া ও মধ্য এসিয়ার নিরক্ষর দরিদ্র লোকদিগকে খেপাইয়া তুলিয়াছে।

শ্রীগৌরহরি সেন।

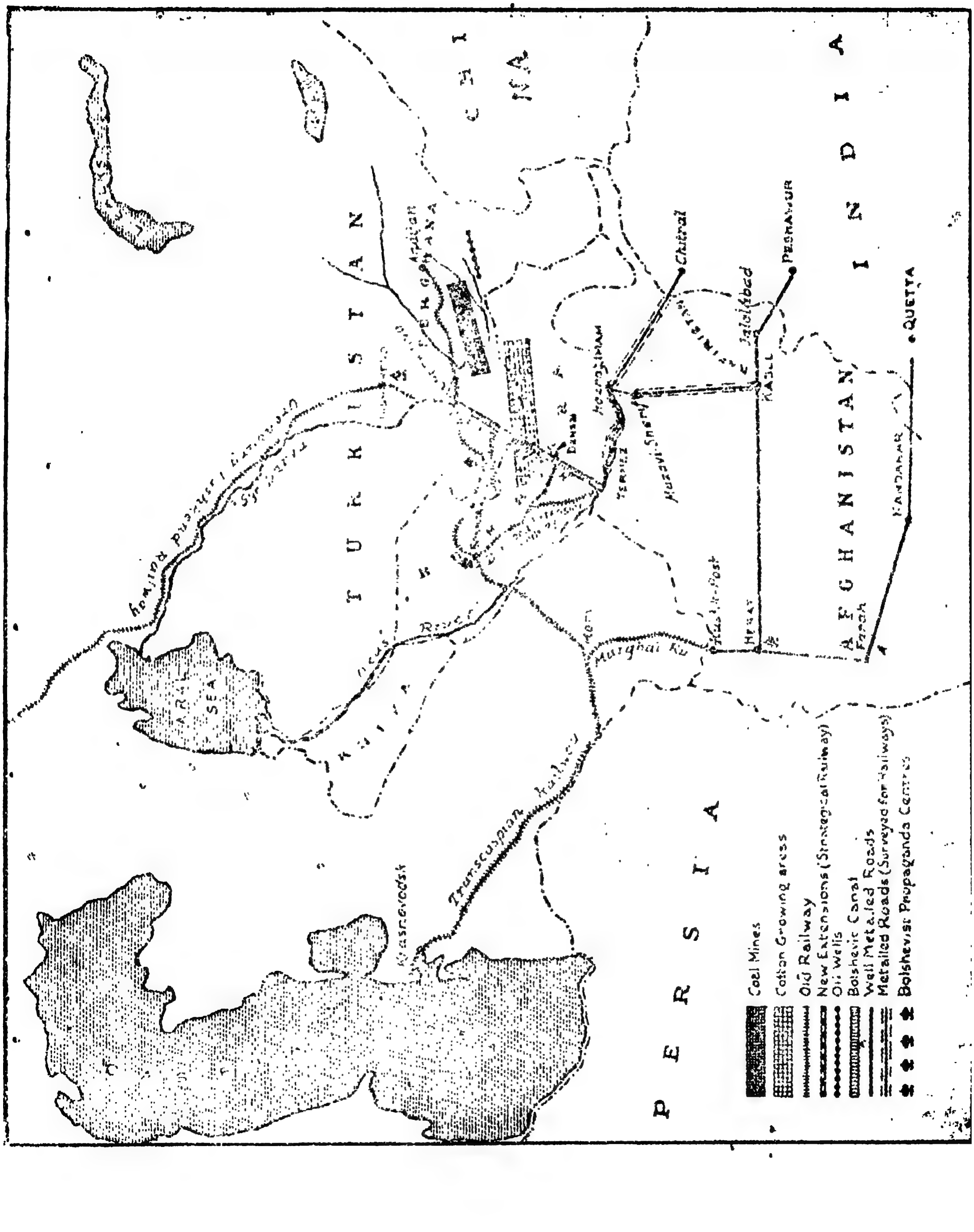
PERSIA
TURKISTAN
AFGHANISTAN
INDIA
CHINA
ARAL SEA
Orenburg Railway
Syr Darya
Oxus River
Transcaspian Railway
Krasnovodsk
Murghab Ru.
Kushk Post
Herat
Farah
Kandahar
Quetta
Kabul
Jalalabad
Peshawar
Chitral
Mazar-i-Sharif
Termez
Khanabad
Fergana
Andijan
Tashkent
Coal Mines
Cotton Growing areas
Old Railway
New Extensions (Strategical Railway)
Oil Wells
Bolshevic Canal
Well Metalled Roads
Metalled Roads (Surveyed for Railways)
Bolshevist Propaganda Centres

প্রবাসীর পত্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি

যত উত্তরে যাওয়া যাইতেছে, বেলা আরও বাড়িতেছে, সন্ধ্যা আটটার সময় "গন্‌গনে" রৌদ্র এবং রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত বেশ দিনের আলো রহিয়াছে। এদিকে রাত্রি ৩।৪টায় ভোরের আলো দেখা দেয়। নরওয়ে, সুইডেন গিয়া মধ্যরাত্রে সূর্য্যদর্শনের এই উপযোগী সময়; তাহা এবারেও দেখা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। অতএব দশটা রাত্রের আলোতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। রাত্রি একটার সময় সূর্য্যালোক ভোগ হইল না। শীত ত নাই, মাঝে মাঝে গরমও বোধ হইতেছে।

যদিও কাজের ভিড় খুব, তবু সময়ে সময়ে এই দীর্ঘ দিবস কাটান দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এক মাস হোটেলে হোটেলে কাটাইয়া জীবন্ত জীবনের স্বাদ যেন ভুলিয়া গিয়াছি। ভারতীয় ছাত্র এ দেশে আসিয়া বাসাবাড়ীতেই হউক, আর হষ্টেলেই হউক, থাকিলেই কর্ম্ম ও অধ্যয়নের অবসরে যে এইরূপেই বিপদগ্রস্ত হয় তাহা বিচিত্র কি?

হোটেলে অভাব কিছুরই নাই। রাজার হালে বাস, দাস দাসী সর্ব্বদাই সেবায় নিযুক্ত, সাজসজ্জার যথেষ্ট প্রাচুর্য্য ও শোভা। দাম যেমন ঘাড় ভাঙ্গিয়া আদায় করে, সেবাও করে সেইরূপ। কিন্তু হোটেলের ঐশ্বর্য্য ভোগ ত ভাল লাগিতেছে না। এবং কোনও ভদ্র পরিবারের অন্তর্গত হইয়া বাস করিবার অবসর পাইলে বোধ হয় জীবন এত স্বাদহীন মনে হইত না। তাহা এ অবস্থায় অসম্ভব।

পৃথিবীর যেখানে যেখানে তুলার চাষ, কারবার কিংবা সুতার কাজ হয়, সেই সকল দেশের প্রতিনিধিগণের এক বিরাট কংগ্রেস এখানে হইতেছে। কুড়িটি দেশ হইতে লোক আসিয়াছে। তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য আজ এখানকার লর্ড মেয়র টাউন হলে পার্টী দিলেন। আমাদেরও নিমন্ত্রণ ছিল। লর্ড ও লেডী এমেট, স্যার জেকব বেহার্ণস ব্রাদার্সের প্রধান অংশীদার প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইল এবং কমিটির কাজ ও ভারতীয় ছাত্রগণের শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে বিলাতী সাহায্যের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কথা অনেকই হইল। তুলা ও সুতার কারবার সংসৃষ্ট কোন কোন লোকের সাক্ষ্যও কমিটিতে লওয়া হইয়াছে। কেহ আমাদের পক্ষে, কেহ বিপক্ষে। ভারতীয় ছাত্র এখানে শিল্প বাণিজ্য শিক্ষা করিয়া তাহাদের অন্নে ধুলা দিবে, ইহা অনেক ইংরাজ চাহে না। যাহারা সাহায্য করিতে চাহে, শ্রমজীবিদল তাহাদের যথেষ্ট বাধা দেয় ও বিপন্ন করে। কথায় কথায় এখন ধর্ম্মঘট। কালা আদমী কলে কাজ করিতে শিখিতে আসিলে সাদা কুলী ধর্ম্মঘট করিবে, এরূপ ভয় সর্ব্বদা দেখাইতেছে। অতএব আমাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে গিয়া এই সকল তুলা ও সুতার মহাজন বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা।

১৯শে জুন, রবিবার—

লণ্ডনে গিয়া কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণের সহিত সাক্ষাৎ করার কল্পনা ত্যাগ করিতে হইল। কারণ, কমিটির কাজ যে ভাবে চলিতেছে, তাহাতে একদিনের জন্যও স্থান ত্যাগ করা সম্ভব বা উচিত মনে হইতেছে না। শুক্রবার কার্য্যের পর ভারতীয় ছাত্রদিগের অভ্যর্থনা সভা ছিল। তাহাতে ম্যাঞ্চেষ্টারে উপস্থিত অধিকাংশ ভারতীয় ছাত্র ও অন্যান্য ভারতবাসীও উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তায় জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক পরিষ্কার হইয়া আসিল। লর্ড লিটন ভারতীয় ছাত্রদিগের সহিত মিশিয়া ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বিশেষভাবে আমাদের কাজের সহায়তা করিতেছেন।

ইংরাজ সাক্ষীদিগের সাক্ষ্যের বিপক্ষে অনেক কথা এই সকল অভ্যর্থনা-সমিতির সাহায্যে ও স্বতন্ত্র আলাপে বাহির হইয়া পড়িতেছে।

শনিবার সমস্ত দিন তাহাদের সঙ্গে সহর দেখিয়া বেড়ান হইল, পরে হোটেলে লইয়া গিয়া তাহাদিগকে জলযোগ করাইলাম। প্রাণ খুলিয়া তাহারা অনেক ভিতরের কথা বলিল।

এখানকার রাইল্যাণ্ড লাইব্রেরী লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম ছাড়া কোন লাইব্রেরী অপেক্ষা ছোট নহে। মাত্র বাড়ী তৈয়ারী করিতেই বোধ হয় কুড়ি লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে। "তাঁতীর সর্দ্দার" ধনকুবের রাইল্যাণ্ড এখানকার বণিকগণের রাজা ছিলেন। তাঁহার স্মরণার্থ তাঁহার স্ত্রী এই লাইব্রেরী দান করিয়াছেন। পুরাতন সংস্কৃত ও আরব্য ভাষায় লিখিত পুঁথি অনেক আছে। লাইব্রেরী হর্ম্ম্য গির্জ্জার ধরণে নির্ম্মিত। দুই দিকের Stained Glass Windowতে নানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের প্রতিমূর্ত্তি সুন্দর ভাবে চিত্রিত রহিয়াছে।

আর্ট গ্যালারি ও হুইলটী গ্যালারি নামে দুই প্রসিদ্ধ চিত্রশালাও দেখিতে গেলাম। বহুতর উৎকৃষ্ট চিত্র রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ চিত্রকর টার্ণার ও ওয়াট্‌সের প্রসিদ্ধ চিত্রগুলির স্কেচ্‌ হুইলটী গ্যালারিতে আছে। কয়েকটি বাঙ্গালী ছাত্রের বাসা বেড়াইয়া ও তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া, ভাইস চ্যান্সেলার মায়ার্কের বাটীতে চা খাইবার নিমন্ত্রণে গেলাম। তাঁহার সহিত পুরাতন কথা অনেক হইল। গতবারে যাঁহাদের দেখিয়াছিলাম, যাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম, তাঁহাদের অনেকে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। Cambridge Trinity College-এর অধ্যক্ষ বট্‌লার, Oxford Jesus Collegeএর অধ্যক্ষ Sir John Rees, Birmingham Ladies Collegeএর Miss Sidgewick বহু যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা আর নাই। Oxford Magadalene কলেজের Professor Cooksar ও Birmingham Ladies Collegeএর Miss Fry কর্ম্মত্যাগ করিয়া কর্ম্মান্তরে নিযুক্ত। স্যর অলিভার লজও কর্ম্মত্যাগ করিয়া কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। কলিকাতার ছোট আদালতের জোন্‌স্‌ সাহেবও অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। তিনিও পরলোকগত।

আজ রবিবার আমাদের কমিটীর মিস্‌ ব্রুক্‌স্‌ ও তাঁহার বন্ধু মিস স্যাণ্ডারসনের নিমন্ত্রণে ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে ষ্টকপোর্ট (Stockport) হইয়া Disley বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ট্রামওয়ে ও মোটর বসে প্রায় ১২ মাইল যাইতে হইয়াছিল। Derbyshire, Lancashire, Cheshire এই তিন জেলায় মাঝামাঝি যায়গায় এই সুন্দর Heath ও Mooreland। পায়ে হাঁটিয়া পাহাড় উপত্যকা উপর নীচে প্রায় ৩।৪ মাইল বেড়াইতে পরম আনন্দ ও উৎসাহ মনে হইল। কখনও পায়ে হাঁটিয়া গ্রামে চাষার বাড়ী গয়লার বাড়ী বেড়ান হয় নাই। কার্পেটের মত পুরু নরম ও মাঝে মাঝে নানা রঙ্গের ফুলে ভরা ঘাসের উপর বেড়াইতে আনন্দই নূতন ধরণের। অল্প অল্প বৃষ্টিতে ঠাণ্ডা বেশ আনিয়াছে। কিন্তু কষ্ট বিশেষ নাই।

সেদিন লর্ড লিটন "পার্লামেণ্ট প্রথা" সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা বলিলেন—সময়ে সময়ে যে সকল নীচ প্রথা অবলম্বন করিয়া ইলেক্‌শনে কৃতকার্য্য হইতে হয়, তাহার গল্প শুনিলাম। রাজনৈতিক ব্যাপারে কৃতিত্বের জন্যও যদি এই সকল নীচ প্রথা অবলম্বন করিতে হয়, তাহা হইলে সে কৃতিত্বে প্রয়োজন নাই।

আমাদের দেশের টোল ও সংস্কৃত শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে লর্ড লিটনের সঙ্গে অনেক কথা হইল। জ্যাঠামহাশয় প্রসন্নকুমার ও ছোট কাকা রাজকুমারের কথাও অনেক হইল। শিক্ষা জগতে তাঁহারা উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, এ কথা এখানকার শিক্ষিত লোক জানে ও স্বীকার করে।

কমিটির কার্য্যপ্রণালী সংক্রান্তও অনেক প্রয়োজনীয় কথা হইল। আমি প্রথম অধিবেশনে যে মন্তব্য দাখিল করিয়াছিলাম, তাহা লর্ড লিটন "Remarkable document" বলিয়া তারিফ করিলেন এবং সমস্ত

কার্য্যই সেই মত হইতেছে এবং হইবে বলিলেন। আমার মন্তব্য সংবাদপত্রে পাঠান আমার উচিত হয় না। বোধ হয় সেই মন্তব্য অনুসারে কমিটিরই নামে সংবাদপত্রে শীঘ্র কমিটির প্রথার কথা প্রকাশিত হইবে।

গত বারে যাঁহাদের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল এবং যাঁহারা ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সেণ্ট-অ্যাণ্ড্রুজের ভাইস্ চ্যান্সেলার ডোনাল্‌ড্‌সন ও এডিনবরার ভাইসচ্যান্সেলার টর্ন্যার অন্যতম। এই সকল মহা মনস্বিগণের সহিত আলাপ-সুখে আপ্যায়িত হইয়াছিলাম। এবার সে শ্রেণীর লোক অল্প দেখিতেছি; যেমন যাইতেছে, তেমন আর হইতেছে না। সর্ব্বত্রই ইহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কোথাও কোথাও ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। গত বারে ম্যাঞ্চেষ্টারে ভাইস চ্যান্সেলার হপ্‌কিন্সনকে দেখিয়াছিলাম, এবারকার ভাইস চ্যান্সেলার মায়ার্স তাঁহার অপেক্ষা উচ্চদরের লোক। স্যার আলফ্রেড হফ্‌কিন্‌সন্‌ বম্বে ইউনিভার্সিটীকে উপদেশ দিবার জন্য গিয়াছিলেন, পারিশ্রমিকে বোধ হয় পঞ্চাশ হাজার টাকা লইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উপযুক্ত কোন উপদেশই দিতে পারেন নাই। বরং স্যর মাইকেল স্যাড্‌লার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে যে উপদেশ দিয়াছেন, বম্বে তাহার ফললাভ করিয়াছে।

লিভারপুল, ২০শে জুন সোমবার—

বৈকালের গাড়ীতে Manchester হইতে রওয়ানা হইলাম। ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে লিভারপুল পর্য্যন্ত যে খাল কাটা হইয়াছে, তাহাতে বড় বড় জাহাজ পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে পারে। Mersey নদী লিভারপুলের কাছে খুব চওড়া বটে; কিন্তু Manchesterএর কাছে নিতান্ত কম চওড়া। তাহাতে জাহাজ দূরে থাউক, বড় নৌকা যাতায়াতও কঠিন। কিন্তু Manchesterএর মত এত বড় কারবারের জায়গায় শুধু রেলগাড়ীর ভরসায় থাকিলে ব্যবসায় চলিতে পারে না বলিয়া, প্রায় সুয়েজ খালের মত এই প্রকাণ্ড খালের সৃষ্টি হইয়াছে। উঁচু নীচু জমি সমান করিয়া লইবার জন্য অনেকগুলি Lockএর সাহায্যে খালে যাতায়াতের সুবিধা করিয়া লইতে হইয়াছে।

বাঙ্গালাদেশে গ্র্যাণ্ড ক্যানাল খনন উপলক্ষে বিস্তর কাজ হইবে, অথচ আমাদের Canal ও Irrigation Engineering শিক্ষার বিশেষ কোন চেষ্টাই নাই। মান্দ্রাজ অঞ্চলেও ডক ও হারবার নির্ম্মাণ জন্য বিরাট আয়োজন হইতেছে। মান্দ্রাজ, বম্বে, বাঙ্গালা, সকল জায়গায় Fisheries আছে। মাছের চাষ ও সমুদ্র সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যবসায়ের যথেষ্ট অবসর রহিয়াছে এবং তজ্জন্য সরকারী টাকাও খরচ হইতেছে, অথচ রীতিমত শিক্ষিত লোকের অভাবে সে বিষয়ে চেষ্টা ও ব্যয় কোন কাজেই লাগিতেছে না। এই লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্, ক্যানাল, Harbour Engineering ও Oceanography শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল ব্যবস্থা আছে, অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহা নাই। অতএব যাহাতে এই বৎসরেই সরকার হইতে খরচা দিয়া আমাদের দেশ হইতে ভাল ছেলেদের পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়, এবং নূতন ষ্টেট স্কলারসিপ দেওয়া হয়, তাহার চেষ্টার জন্য আমি কমিটিকে ও লর্ড লিটনকে বিশেষ ভাবে জেদ করিলাম। এ বৎসর নূতন স্কলারসিপ সৃষ্টি যদি নিতান্ত না হইতে পারে, তবে পুরাতন স্কলারসিপ এই সকল বিদ্যার চর্চ্চার জন্য ব্যবহৃত হউক, ইহাও অন্যতর প্রস্তাবরূপে উপস্থিত করিলাম। কমিটির মন্তব্য এখনই এ সম্বন্ধে হইতে পারে না; কিন্তু সেক্রেটারী অব ষ্টেট ইচ্ছা করিলে ইহা করিতে পারেন, একথাও জেদ করিয়া বলাতে লর্ড লিটন সে বিষয়ে স্বীকৃত হইয়া মিষ্টার মণ্টেগুর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আজই লণ্ডন গেলেন। আমার প্রস্তাবে এ কার্য্য হইলে কৃতিত্বের দাবীর আকাঙ্ক্ষা আমি করি না। কার্য্যটা হইলেই মঙ্গল। এই বৎসর চেষ্টা করিলে তিন বৎসরে ছাত্রেরা শিক্ষিত হইয়া কাজের উপযোগী হইতে পারিবে। কমিটির দ্বারা অন্য কোন কাজও যদি না

হয়, শুধু এই কয়েক বিষয়ে যদি কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়, তাহা হইলেও অনেক ফল হইল মনে করিতে হইবে। ইংরাজ ছাত্রেরা এই সকল বিষয় শিখিয়া আমাদের দেশে বড় চাকরী পাইবে, আর আমাদের কেহ এখানে আসিয়া তাহা শিখিয়া কাজে লাগাইতে পাইবে না, ইহা বড়ই ক্ষোভের কথা। লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে জেরা করিবার সময় আমি জোরের সহিত বলিলাম যে, যদি তাঁহারা এ সকল বিষয়ে আমাদের ছাত্রদিগকে না শেখান, তাহা হইলে আমরাও জেদ করিব, তাঁহাদের ইংরাজ ছাত্রেরাও ভারতবর্ষে স্থান পাইবে না। কারখানাওয়ালারা যদি আমাদের ছাত্রদিগকে সাহায্য না করেন, তাহাদের সঙ্গে আমাদের গভর্ণমেণ্ট কিংবা প্রজা-সাধারণের কোন সম্পর্ক থাকিবেনা, এমন কথাও বলিতে বাধ্য হইলাম। ফলে হয়ত কাজ কতক হইলেও হইতে পারে।

সাক্ষ্য গ্রহণের পর বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত যে সকল কলকারখানা আছে, তাহা দেখা হইল। দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও কল কারখানার বৃদ্ধি সম্বন্ধে যাঁহারা বিরোধী, তাঁহারা একবার এ সকল বিরাট ব্যাপার নিজেদের চক্ষে দেখিয়া গেলে ভাল হয়। আমাদের দেশে এসব বিষয়ে কি সামান্য চেষ্টা করিতেছি, তাহা ভাবিয়া দুঃখ ও লজ্জা হয়। আমাদের কমিটি এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

বৈকালে মার্সি নদীর বক্ষে ষ্টিমার করিয়া বেড়াইয়া দেখিলাম, কয়লা-কুলীর ধর্ম্মঘটে বড় বড় জাহাজ বসিয়া আছে। সহর শ্রীহীন, কাজকর্ম্ম সব বন্ধ। তবু জনস্রোত আমোদস্রোত কিছু কম নাই।

Rodney Street এ Gladstone যে বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া, যে নূতন Cathedral নির্ম্মাণ হইতেছে, তাহা দেখিতে গেলাম। স্থানের গৌরব ও শ্রী বাড়িয়াছে বলিয়া মাঞ্চেষ্টারের মত এখানেও নূতন Bishop সৃষ্টি হইয়াছে। সাধারণের চাঁদায় প্রকাণ্ড পাথরের গির্জ্জা তৈয়ারী হইয়াছে। শিল্প চাতুর্য্য বিশেষ প্রশংসাযোগ্য নহে।

লিবারপুলের স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের অধ্যক্ষ প্রফেসর কেরি বেশ অনুকূল সাক্ষ্য দিলেন। ম্যালেরিয়া মশক সংবাদের সহিত ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব চিকিৎসক স্যার ডোনাল্ড রসের নাম বিশেষ সংসৃষ্ট। তিনি পূর্ব্বে এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। লণ্ডনেও ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিন সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু খালাসীমহলের সাহায্যেই ইঁহারা "ভারতীয়" ব্যাধির তত্ত্বনির্ণয়ের অবকাশ পান। ভারতবর্ষেও সম্প্রতি এই শ্রেণীর চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। স্যার লেনার্ড রজার্স তাহার সহিত বিশেষ সংসৃষ্ট ছিলেন। অর্থাভাবে ও লোকের অভাবে তাহার কাজ কলিকাতায় ভাল চলিতেছে না। এ বিদ্যার বিশেষ পরিচালনা ভারতবর্ষেই বিশেষ সম্ভব। তবে লিভারপুল ও লণ্ডনে বিশিষ্ট পণ্ডিতগণের নিকট বিজ্ঞান-সম্মত প্রথা শিক্ষা করিয়া, আলোচনা অংশ ভারতবর্ষে বিশেষ ভাবে হইতে পারে, একথা অধ্যক্ষ কেরি স্বীকার করিয়াছেন।

সাক্ষ্য শেষ হইবার পর বিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন অংশ অধ্যক্ষ কেরি অত্যন্ত যত্নের সহিত দেখাইলেন। আমাদের স্বাক্ষর তাঁহার লাইব্রেরীর পুস্তকে লইলেন। মিউজিয়ম দেখাইলেন। কলিকাতার ডাক্তার করুণা চট্টোপাধ্যায় নিমতৈল সাহায্যে কুষ্ঠরোগের যে নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার কোনও সংবাদ তিনি রাখেন না—নিমের নাম পর্য্যন্ত শোনেন নাই; অথচ বিলাতে বসিয়া ভারতীয় বিশেষ রোগের নির্ণয় ও চিকিৎসা-প্রণালী স্থির করিতেছেন।

লিভারপুলের প্রধান দর্শনীয় স্থানগুলি তাড়াতাড়ি দেখিয়া লইতে হইল। পিক্‌টন রিডিং রুম সাধারণ পাঠাগার, তৎসংলগ্ন প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ও মিউজিয়ম আছে। তাহার পাশেই ওয়াকার পিক্‌চার্ গ্যালারী। সেখানে নূতন পুরাতন অনেক সুন্দর প্রসিদ্ধ ছবি আছে। মেলিয়াস ইজাবেলা তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। মোলয়াসের কার্পেণ্টার শপ নামক প্রসিদ্ধ ছবিখানি তিন লক্ষ টাকা দিয়া অষ্ট্রেলিয়ার কোন ধনকুবের

কিনিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে বলিয়া ইংরাজ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। চাঁদা করিয়া এই টাকা তুলিয়া যাহাতে দেশ হইতে এই ছবি বাহিরে যাইতে না পারে, তাহার চেষ্টা করিতেছে। ইহারই নাম যথার্থ দেশানুরাগ ও যথার্থ শিল্পানুরাগ। মেলিয়স, লেইটন, পইন্টার, গিডোরেনি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিত্রকরের ছবি এখানে আছে।

লীড্‌স্‌, ২৪শে জুন, শুক্রবার—

স্যর মাইকেল স্যাডলার এখানকার ভাইস্‌ চ্যান্সেলার। পূর্ব্বের পরিচয় ও ভারতবর্ষের পরিচয়ে বিশেষ আপ্যায়িত ও যথেষ্ট আত্মীয়তা করিলেন। এখানে অধ্যাপকগণ ভারতীয় ছাত্রগণকে যথেষ্ট যত্ন করেন, সেই জন্য এখানে ছাত্রদিগের বিশেষ কোনও অভাব অভিযোগ নাই। পবিত্র দত্ত নামে একজন বাঙ্গালী অধ্যাপক এখানে ছাত্র ছিলেন; এখন অধ্যাপক হইয়া সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিতেছেন। পরিচিত অনেকে এখানকার ছাত্র ও ছাত্রী। সহর হইতে তিন মাইল দূরে পুরুষ ও মহিলার জন্য স্বতন্ত্র হষ্টেল দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। গ্রামের শান্ত সুন্দর দৃশ্যের মধ্যে ইউনিভার্‌সিটির নূতন বাড়ী হইবে, তাহার আয়োজন হইতেছে। খৃষ্টীয় ষোল শত শতাব্দীর প্রাচীন সুন্দর এক চকমিলান বাড়ীতে আপাততঃ হষ্টেল রহিয়াছে। তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া, নূতন বাড়ী হইবে—ঠিক বাড়ী নয়, একটা রীতিমত বিশ্ববিদ্যালয়ের সহর স্থাপিত হইবে। ভারতবর্ষে এসকল ব্যবস্থা সম্ভব নয়; কারণ, রাজা প্রজা সকলেই অমনোযোগী। কাজেই কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। কেবল কথা-কাটাকাটি চলিতেছে।

এখানে প্রোফেসর পার্কিনস ও প্রোফেসর কোহেন "কলার কেমিষ্ট্রী" সম্বন্ধে অতি মূল্যবান সাক্ষ্য দিলেন। আমার জেরায় অনেক প্রয়োজনীয় কথা তাঁহারা বলিতে বাধ্য হইলেন। তাহাতে লর্ড লিটন বিশেষ সন্তুষ্ট। ভারতবর্ষের রঙসম্ভারের মধ্যে তাহার স্বাভাবিক বর্ণবৈভব বড় কম নহে। রাজপুতানা, কাশী, মাদুরা প্রভৃতি স্থানে-যে সকল রংএর প্রচলন আছে, তৎসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক কোন চর্চ্চাই হইতেছে না। বরং তাহা ঘুচিয়া গিয়া যাহাতে বিদেশী রংএর ব্যবসায় বাড়ে, তাহারই চেষ্টা হইতেছে। এ বিষয়ে ভারতবর্ষে করিবার যথেষ্ট কাজ আছে। কলার থেরাপিউটিক্স অর্থাৎ চিকিৎসা শাস্ত্রে বর্ণবিভেদ প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান চিকিৎসকগণের নিজস্ব বিদ্যা ছিল। প্রোফেসর কোহেন সে বিষয়ে কিছু চর্চ্চা করিতেছেন শুনিয়া তাঁহাকে এ বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিলাম। ইঁহারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, বসন্ত চিকিৎসায় লাল রংএর প্রচলন আমাদের দেশে বহু পূর্ব্বে ছিল। আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকেরাও বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া তাহা গ্রহণ করিতেছেন। এই সকল বিষয়েও বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন এবং লীড্‌সের ন্যায় স্থানে তাহা সম্ভব।

লর্ড লিটন ট্রাষ্ট হাউস বলিয়া এক শ্রেণীর হোটেল-কোম্পানির ডিরেক্টারদিগের সভাপতি। ইঁহারা হোটেলে মদ্যপানটা কম করিয়া হোটেলগুলির উন্নতি-সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। লীড্‌সের হোটেল, অক্সফোর্ডের হোটেল ও বার্ম্মিংহামের হোটেল এই শ্রেণীর। দুঃখের বিষয় যে, মদ খাওয়া কমাইবার চেষ্টার জন্য এই শ্রেণীর হোটেলগুলি লোকপ্রিয় নয় এবং কাজেই এগুলির দুর্দ্দশা। সাধু চেষ্টা বিফল হইবার ও এই হোটেলগুলি এমন জঘন্য হইবার কারণই এই।

এডিনবরা, ২৫শে, জুনশনিবার—

বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে, ইয়র্কের এত নিকটে আসিয়া জগৎপ্রসিদ্ধ ইয়র্ক ক্যাথিড্রাল দেখিয়া যাইব। কিন্তু রেলের গোলমালে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। অগত্যা সরাসর এডিবরা রওয়ানা হইতে হইল।

ট্রেণ হইতে ইয়র্ক কেথিড্রাল খুব নিকটে দেখা গেল, তাহাতেই এ যাত্রা সন্তুষ্ট হইতে হইল। প্রকাণ্ড গির্জ্জা, শিল্পচাতুর্য্য অপূর্ব্ব। পথে ডর্হ্যাম কেলওড্রাথ

দেখা গেল। তাহাও ইয়র্কের ধরণেই গঠিত, তবে তত সুন্দর বোধ হইল না। ডর্হামে কেথিড্রালের নীচেই একটা পুরাতন ক্যাসল দেখা গেল; পথে আরও দুই একটা এই শ্রেণীর ওমরাহদিগের বহু-পুরাতন দুর্গ বা প্রাসাদ দেখা গেল। Durham, New Castle, Berwick, Tweed Mouth, Prestonpans প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানের ভিতর দিয়া ট্রেণ আসিল। স্কটল্যাণ্ড হইতে টুইড্ নদী ইংলণ্ডকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া, স্কটদিগের , নাম "টুইড্ নদীর পরপারবাসী"। এই নদীর সীমানা-পারেই স্কট ও ইংরাজদিগের বরাবর লড়াই ঝগড়া চলিয়াছিল। ক্রমওয়েলের সময়ে Dunbar-এর প্রসিদ্ধ যুদ্ধ হয়। টুইড্ নদী বেশ প্রশস্ত। নিউ ক্যাসেলের নীচে টাইন নদীও বেশ প্রশস্ত। টাইন নদীর উপর নিউ-ক্যাসেল এই পরিচয় দিবার জন্যই সহরের নাম "নিউ ক্যাসল অন টাইন"। এখানে কয়লা খুব ভাল ও সস্তা। "তৈলাক্ত মাথায় তেল মাখান" প্রবাদের মত ইংরাজদিগের মধ্যে তাই চল্‌তি প্রবাদ আছে—To bring coal to New Castle. নিউক্যাসেলের মত কয়লার জন্য প্রসিদ্ধ জায়গায় কেহ যদি বাহির হইতে কয়লা আনিয়া ব্যবসার চেষ্টা করে, তাহা যেমন নির্ব্বোধের কাজ হইবে, সেইরূপ অন্য নির্ব্বুদ্ধিতাকে বিদ্রূপ করিবার জন্য এই প্রবাদের সৃষ্টি। কিন্তু কয়লাকুলীর ধর্ম্মঘট আজ প্রায় তিন মাস চলিতেছে। এখন এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, কেহ একমুঠা কয়লা বাহির হইতে নিউ-ক্যাসেলকে দিতে পারিলে সহর ধন্য হয়। সময়ে সময়ে তেলা মাথার তেলও শুখাইয়া যায়, ইহা মানুষের মনে থাকে না। মাঝে মাঝে এই মহাসত্য এইরূপে মনে পড়া মন্দ নয়।

কাল লীড্সে অসম্ভব রকম গরম হইয়াছিল। তাপ ৮২ ডিগ্রী হইয়াছিল। ইয়র্কেও কাল উত্তাপ ৯০ ডিগ্রী ছিল। আজ তাহা অপেক্ষাও যেন গরম বোধ হইতেছে। পথে যথেষ্ট কষ্টও হইতেছে। গ্রীষ্মকালে ট্রেণে মধুপুর যাইতেছি মনে হইতেছে। ভিতরের গেঞ্জি বেনিয়ান সব খুলিয়া ফেলিয়া পোঁটলা বাঁধিতে হইয়াছে। জিনিস-পত্র সেক্রেটারীদিগের জিম্বা করিয়া দিয়া শুধুহাতে ইয়র্কে যাইব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু পথে নিজের গায়ের জামা পর্য্যন্ত খুলিয়া নূতন করিয়া পোঁটলা বাঁধিতে হইল। পোঁটলা ইচ্ছা করিয়া ফেলিয়া পালাইলেও এরূপে আবার কোথা হইতে আসিয়া জোটে। গায়ের ময়লা জড় করিয়াও আমরা পোঁটলার সৃষ্টি করি।

২৬শে জুন, রবিবার

কাল যেমন ভয়ানক গরম গিয়াছে, আজ তেমনি ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। কাল ট্রেণে গরম গেঞ্জি ছাড়িয়া তবে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম, আর আজ গরম গেঞ্জি পরিয়া বাহির হই নাই বলিয়া কষ্ট হইতেছিল। আবার ঘরে গিয়া গরম গেঞ্জি বেনিয়ান পরিয়া তবে বাহির হইতে পারিয়াছি। এদেশের ঠাণ্ডা গরমের এমনই বৈচিত্র্য। এডিনবরাতেই বাঙ্গালী ছাত্রেরা অক্টোবর মাসের প্রথমে দারুণ শীতে বড় কষ্ট পায়। আরও উত্তর সেণ্টয়্যাণ্ড্রুজ ও এবার্ডিনে আরও অধিক শীত বলিয়া অনেকে সেখানে যাইতে আদৌ ইচ্ছা করে না। কিন্তু সে সব জায়গায় পড়াশুনাও ভাল হয়, খরচও কম পড়ে।

আর্থার্স সীট ও এডিনবরা ক্যাসেল গতবারে দেখা হইয়াছিল, আজ ভ্রমণকালে চিনিয়া লইতে বিলম্ব হইল না। স্যার ওয়ালটার স্কট ও তাঁহার প্রিয় কুকুরের শ্বেত পাথরের মূর্ত্তি বড়ই চমৎকার। তাহার উপরে যে মন্দির রচিত হইয়াছে, তাহাও বড় সুন্দর। এডিনবরার ন্যায় সুন্দর সহর এদিকে বড় অধিক নাই। এখানকার প্রিন্সেস ষ্ট্রীটই প্রধান রাস্তা। স্কটদিগের মতে এমন সুন্দর রাস্তা নাকি পৃথিবীতে আর নাই। অপর রাস্তাগুলিও বেশ সুন্দর, বাড়ী ঘর দ্বার বাগান—মোটের উপর সহরটাই খুব পরিষ্কার। ছোট বড় বিস্তর সুন্দর গির্জ্জা আছে। তাহার মধ্যে কেথিড্রাল সেণ্ট জাইল্‌স্ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর। তাহারই পশ্চাতে পুরাতন পার্লামেণ্ট হাউস, বিখ্যাত

ধর্ম্মপ্রচারক নক্সের সমাধি ও দ্বিতীয় চাল্সের মূর্ত্তি। সম্মুখে ডিউক অব বক্লুর মূর্ত্তি।

এডিনবরার বাহিরের পাহাড়, ক্ষেত, পথ ঘাটও অতি সুন্দর। এদিকে Pentland Hills অপর দিকে Firth of Forth Estuary বা সমুদ্রের শাখা। Leith, Portobello প্রভৃতি ছোট ছোট সহরের মাঝখান দিয়া Firth of Forthএর পাশ দিয়া পাহাড়ের কখন তলা, কখন উপর দিয়া বেড়াইতে বড় আনন্দ বোধ হইল। কমিটির প্রধান সেক্রেটারী হাওয়ার্থ সাহেব সঙ্গে ছিলেন। তিনি অতি সজ্জন ও পণ্ডিত। Oxford Greats পাশ করিয়া এডুকেশন বোর্ডে কর্ম্ম করিতেছেন। আমাদের বিশেষ ভক্তি ও স্নেহ সহকারে যথার্থ সেবা ও যত্ন করিতেছেন। সকল জায়গার সকল খবর তন্ন তন্ন করিয়া দিতেছেন ও আনন্দের সহিত সমস্ত ব্যবস্থা করিতেছেন। পথে Dugald Stewart College, Donaldson Hospital প্রভৃতি শিক্ষালয় দেখা হইল। Firth of Forthএ জার্ম্মাণদিগের সাবমেরিন হইতে রক্ষার জন্য যে সব ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহাও দেখা গেল। ছোট ছোট যুদ্ধের জাহাজ এখানে সর্ব্বদাই থাকে, বড় যুদ্ধের জাহাজ থাকিবারও ব্যবস্থা হইতেছে। এষ্টুয়ারির পরপারেই ফাইফ।

গতবারে হোলিরুড ক্যাসেল দেখা হয় নাই, মেরামতের জন্য বন্ধ ছিল। এবার মেরামতের পর বেশ দেখা গেল। কুইন মেরীর অকীর্ত্তির স্থান, রিজিওকে খুন করিবার স্থান, এ সকল ইতিহাসে মার্কামারা হইয়া রহিয়াছে। হোলিরুড প্রাসাদেও পিত্তল ও কাষ্ঠের ফলকে এ সকল কীর্ত্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। বাড়ীটি ছোট, চকমিলান উঠান, তিন দিকে এখনও মহারাজ মহারাণী আসিলে বাসের ব্যবস্থা আছে। অপরদিকের মহলে ইতিহাসের কীর্ত্তি অকীর্ত্তির প্রদর্শনী—পুরাতন রাজারাণীদিগের প্রতিমূর্ত্তি, আসবাব ইত্যাদি সংগৃহীত আছে। ইহার মধ্যে সকলের অপেক্ষা দেখিবার জিনিস পুরাতন রয়েল চ্যাপেল। অতি সুন্দর গঠনের প্রাচীন ধরণের গির্জ্জা—ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—খিলান কাটিয়াছে—দেওয়াল পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। ইহারই মেরামত হওয়া উচিত ছিল। সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপ একটি নূতন লোহার ফটক আধুনিক প্রণালীতে নির্ম্মিত হইয়াছে। আমার মনে হইল, পুরাতন প্রণালীতে হইলেই বেশ মানানসই হইত।

এই হোলিরুড প্রাসাদের পাশেই আর্থার্স সীট ও আর্থার্স ক্র্যাগ নামে ছোট পাহাড়। সার ওয়াল্টার স্কট বাল্যকালে এইখানে তন্ময় হইয়া উপন্যাস-পাঠে নিযুক্ত থাকিতেন বলিয়া সাহিত্যে ইহা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তাঁহার Heart of Midlothian উপন্যাস উল্লিখিত Jimmy Lird's Cottage এইখানে।

হোলিরুড হইতে এডিনবরা ক্যাসেল পর্য্যন্ত এক মাইল পথ হাঁটিয়া গেলাম। পাথর-বাঁধান রাস্তা। দুইধারে পুরাতন বাড়ী। ইহারই নাম হিষ্টোরিক্যাল মাইল। অপর নাম হাই ষ্ট্রীট। স্কটের গ্রন্থে উল্লিখিত অনেক স্থান এই রাস্তার উপরেই আছে। অ্যাডামস্মিথ ও জন নক্সের বাড়ীও ইহার উপর। বস্‌ওয়েল্‌স্ কোর্ট নামেও একটি বাড়ী আছে। জন নক্সের বাড়ীর গায়ে Theus, Devas, God গ্রীক, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় ভগবানের নাম পাথরে খোদা আছে। মনে হয়, ধর্ম্মসমন্বয়ের চেষ্টা এই প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজকের মনে হয়ত এই ভাবে উদয় হইয়াছিল।

সকালে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রবার্ট লুই ষ্টিভেন্সনের জন্মস্থান সোয়ানষ্টোন দেখা হইয়াছিল। একদিনে এত স্মরণীয় মহাত্মার আসন দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম।

ফার্থ অব ফোর্থের উপরে যে অদ্ভুত লৌহসেতু আছে, তাহাও দেখিয়া আসিলাম। বড় বড় জাহাজ অক্লেশে এই পুলের নীচে দিয়া যাইতে পারে। ৫১০০০ টন ইস্পাত দিয়া প্রত্যহ ৫০০০ লোক সাত বৎসর পরিশ্রম করিয়া এই পুল নির্ম্মাণ করিয়াছে। জল হইতে পুলটি ৩৬১ ফুট উচ্চ। দৈর্ঘ্যে দেড় মাইল—সে এক বিরাট ব্যাপার।

রাস্তার স্থানে স্থানে মহা ভিড়—যাহার যাহা ইচ্ছা বক্তৃতা করিতেছে। পুলিশের ধর পাকড় নাই। ধর

পাকড় দূরে থাক্, আজ সংবাদ এই যে, প্রধান রাজমন্ত্রী আইরিশ বিদ্রোহীদিগের সর্দ্দার ডি ভ্যালেরার সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন ; যাহা হয় করিয়া আইরিশ হাঙ্গামা মিটিলেই দেশের মঙ্গল।

বোধ হয় প্রায় এক শত চ্যারাবাঙ্কে লোক আমোদ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহা ছাড়া মোটর, বাস্, ট্রামেও লোকে লোকারণ্য। রাস্তায় চলিবার যো নাই। এডিনবরা ক্যাসেল হইতে নামিবার সময় "Gentle Shephard"এর কবি "Ramsay"র বাড়ী দেখিলাম। Sir Walter Scott তাঁহার Abbot এবং Heart of Midlothian উপন্যাসে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই সকল স্থানকে সাহিত্যপ্রসিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

সোমবার ২৭ শে জুন—

বেলা ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত সাক্ষীর জবানবন্দী চলিল। যে সকল ভারতীয় ছাত্র জবানবন্দী দিল, কিংবা স্বতন্ত্র কথাবার্ত্তা কহিল, তাহাদের অধিকাংশের মন কেমন তীব্র বিরক্তিতে ভরা দেখিলাম। ছাত্র-জীবনে তাহারা এইরূপে অসন্তোষ ভার বহিয়া নিজেদের ভবিষ্যৎজীবন কিসে পরিণত করিবে, তাহা বোঝা কঠিন। ভাইস্ চ্যান্সেলর সার অ্যালফ্রেড ইউইং সেনেট হাউসে আমাদের সহিত আলাপ-পরিচয়ের জন্য বিস্তর লোককে বৈকালে চা খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। প্রকাণ্ড লাইব্রেরী-ঘরে বহু ভারতীয় ছাত্র, অধ্যাপক ও বিদুষী মহিলার সমাগম হইয়াছিল। ডাক্তার বারবারের সহিত গতবার আলাপ হইবার সুবিধা হয় নাই। অ্যাবার্ডিনের স্যর জর্জ্জ অ্যাডাম স্মিথ তাঁহার নামে পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন। পরে আমি কাশী-জ্ঞানবাপীর-চিত্র সমেত কৃষ্টমাস কার্ড পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহার স্ত্রী আমাকে দেখিবার জন্য ও আমার সহিত আলাপ করিবার জন্য বহুদিনের পুরাতন সেই কৃষ্টমাস কার্ড খানি লইয়া আজ এই চা-পান-সভায় আসিয়াছিলেন এবং নিজে খুঁজিয়া আলাপ করিলেন। এই অভাবনীয় আত্মীয়তায় কি আনন্দ হইল, বলিতে পারি না। তাঁহার স্বামী ডাক্তার বারবারকে ডাকিয়া আনিয়া আলাপ করাইলেন। এই শ্রেণীর উদারপ্রাণ ভারতহিতৈষী পণ্ডিতের ক্রমশই হ্রাস হইতেছে।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামে ছাত্রদিগের সভায় গিয়া তাহাদের সঙ্গে স্বতন্ত্র ভাবে অনেক কথবোর্ত্তা কহিলাম। তাহাদের সেই বিরক্তি ও বিদ্রোহ ভাব দূর করিবার অনেক চেষ্টা করিলাম। কতকটা ফল লাভও হইল বোধ হয়। তাহাদের অভাব-অভিযোগ অবশ্যই কিছু আছে, কিন্তু সে গুলা মনে মনে এত বাড়াইয়া লইয়াছে ও তজ্জন্য নিজেদের জীবন এত তিক্ত ও বিষময় করিয়া ফেলিয়াছে যে, তাহার ফলে তাহাদের নিজেদেরই দারুণ ক্ষতি হইতেছে। এ অবস্থায় যদি কোন রকমে ব্যতিক্রম ঘটান যায়, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি। ফলে কি হইবে জানি না।

ছাত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে সমবেত ভাবে অশান্তি ও অসন্তোষের ভাব থাকিলেও, তাহারা ব্যক্তিগত ভাবে যথেষ্ট সম্মান ও আত্মীয়তা দেখাইতেছে। ইহাতে বোধ হয় যে, তাহাদের যে সকল অভাব ও অভিযোগ আছে, তাহা দূর করিবার পক্ষে কমিটির নিকট তাহারা বিশেষ কিছু প্রত্যাশা করে না ও কমিটীর সহিত বিশেষ সংস্রব রাখিতে চাহে না। কিন্তু আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তার পর, বিশেষ লর্ড লিটনের অমায়িক ও সহৃদয় ব্যবহারে তাহাদের সে অসন্তোষ ভাব কতকাংশে তিরোহিত হইয়াছে মনে হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

প্রতীক্ষা

(গল্প)

"মঞ্জরী তোর হারিয়ে যায়নি মা. সে বিশ্বের মেয়েদের মধ্যে মিশে রয়েছে। চোখের জল মুছে ফেল তুলসী।"

মার সান্ত্বনা বাক্যে আমার অসীম শোকাগ্নির সুতীব্র জ্বালা অনেকটা জুড়াইয়া গেল। একমাত্র প্রাণাধিকা কন্যাকে চিরজন্মের মত হারাইয়া ভাষাহীন বিপুল বেদনা ভারে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাই—জনকোলাহল-মুখর নগরের আবিলতা হইতে একটু শান্তির আশায় আশাতুরা হইয়া আমার জন্মভূমির স্নিগ্ধ শীতল ক্রোড়ে বহুবর্ষের পর ফিরিয়া আসিয়াছি। এ পল্লী-মায়ের পুণ্য অঙ্গন, আমার বাল্যের লীলাক্ষেত্র, কৈশোরের মধুবৃন্দাবন। সুদীর্ঘ বারো বৎসর পূর্ব্বে ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত, শিশিরসিক্ত শেফালীগুচ্ছের মত এখান হইতেই মঞ্জুকে বক্ষে পাইয়াছিলাম। ঐ অল্প পরিসর গ্রামে ক্ষুদ্র নদীর সুস্বাদু সলিলে, উহারই মন্দ সমীরণে মঞ্জরীর মুকুলিত জীবনের প্রথম বিকাশ হইয়াছিল। চির অন্ধকার যবনিকার অন্তরালে অনন্ত কালের জন্য মঞ্জু আমার চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে। বিধাতা বিরচিত অতি অসাধারণ বেদনা পরিপূর্ণ তাহার শেষ স্মৃতিই আমার এ দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি হৃদয়ের একমাত্র ক্ষীণ প্রস্রবণ।—মেঘাচ্ছন্ন অন্তরাকাশে শরতের স্বচ্ছ অরুণালোক।

"চুপ করে বসে রইলি কেন তুলসী, জগৎই যে শোকে তাপে ভরা,—ভগবানের সকল দানই মাথা পেতে নিতে হয়।"

"আমি যে নিতেই চাই মা, কিন্তু পারি কৈ! এগার বছরের মেয়েকে তার মা'র কোল থেকে ছিনিয়ে একবছর ধরে' বন্ধ করে রেখে হত্যার কথাটা ভুলতে যে পারি না। ফুলশয্যার তত্ত্বের ক্রটী সর্ব্বস্ব বিকিয়ে সংশোধন করতে পারিনি; সে যে 'মা মা' করেই চলে গেছে।"

মা'র চক্ষে অশ্রু ভরিয়া আসিল। কিয়ৎক্ষণ পর বস্ত্রাঞ্চলে নয়নজল মুছিয়া কহিলেন, "তারা এক বছর তাকে শুধু তোদের কাছে আস্‌তেই দেয় নি—তা ছাড়া আর কোন কষ্টের কথা ত শোনা যায় নি। অনেক-সংসারে বৌয়ের উপর ওর চেয়ে অনেক বেশী অত্যাচার হয় তুলসী। এখন এসব কথা থাক্ মা, তুই বাড়ীতেই গা হাত পা ধুয়ে, কাপড় ছেড়ে কিছু খাবি চল, পথের কষ্টে মুখ খানি যে শুকিয়ে গেছে।"

বলিলাম, "এত কাছে নদী রেখে তোলাজলে গা ধুতে ভাল লাগবে না! ক্ষিধে তেষ্টা আমার একটুও পায়নি মা, তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না। আমি নদী থেকে স্নান করে এসে, তার পর খাব।"

স্নানার্থে নদীকূলে আসিয়া দেখিলাম, সেই অতীত দিনের মত আজও সব তেমনি দেদীপ্যমান। প্রকৃতি হাস্যময়ী, শোভাময়ী, করুণাময়ী—তাহার কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই! ক্ষুদ্রকায়া স্রোতস্বতী-তীরে সেই স্তবকাবনম্র অগণিত অশোক তরু। তাহারই সন্নিধানে বিহগসঙ্গীত-মুখর কুসুমকুঞ্জ এবং দুগ্ধ-ধবলিত কাশপুষ্পগুচ্ছের বিচিত্র আন্দোলন—আজও তেমনি রহিয়াছে। তখন আসন্ন সন্ধ্যা চারিদিকে ঘনাইয়া আসিয়াছে; রাখালেরা গোচারণ শেষে ধেনু লইয়া ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে। চন্দ্রদেব তরঙ্গিত নদীবক্ষে সৌন্দর্য্যের হাট বসাইয়া আপনার গৌরবে আপনি অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। আমি তন্ময় হইয়া নিভৃত নদীসৈকতে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যার সেই মৌন সৌন্দর্য্য অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিতে লাগিলাম।

কিয়ৎকাল পর কলসী ভরিবার শব্দে ঘাড় ফিরাই-

ন্তেই দেখিলাম, একটি কৃশকায়া কিশোরী বধূ অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিয়া বৃহৎ পিতলের কলসীতে জল ভরিতেছে। কাছে গিয়া বলিলাম, "এত বড় কলসী নিয়ে ঘাটে এসেচ কেন মা, তুমি ছেলেমানুষ, এটা কি নিতে পারবে ?"

কিশোরী কথা কহিল না। পূর্ণ কুম্ভ পায়ের নিকটে নামাইয়া, ঘোমটার মধ্য হইতে সজল কাজল নয়নের শান্ত দৃষ্টি আমার দিকে মেলিয়া দিল। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে সে চক্ষের অব্যক্ত, নীরব ভাষা আমার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল। এক বছর পূর্ব্বে মাতৃবক্ষ হইতে শেষ বিদায়ক্ষণে অশ্রুলোচনা মঞ্জু আমার এম্‌নি দৃষ্টিই বুঝি তাহার মায়ের দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল। এ অপরিচিতা বধূ মঞ্জরী অপেক্ষা বয়োধিকা এবং মঞ্জু অপেক্ষা উজ্জ্বলবর্ণা—কিন্তু ইহার মুখের গড়ন, চোখের স্নিগ্ধদৃষ্টি, সর্ব্বোপরি শরীরের কৃশতা মঞ্জুরই অনুরূপ। নিমেষের মধ্যেই আমার সুপ্ত স্নেহ-সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আমি তাহাকে আমার পিপাসিত বক্ষের নিকটে টানিয়া লইয়া মুখের ঘোমটা সরাইয়া দিয়া বলিলাম, "আমার কাছে তোমার লজ্জা কি মা, আমিও এই গাঁয়েরই মেয়ে। প্রায় তোমার বয়সীই একটি মেয়ে আমার ছিল, তাকে হারিয়ে অনেক কালের পর এখানে ফিরে এসেছি। 'তুমি আমার সঙ্গে কথা বল মা।"

সকরুণ স্বরে বিস্মিতা কিশোরী উত্তর করিল, "আহা, মেয়েটি আপনার মারা গেছে ?—তার কি হ'য়েছিল ?"

পরদুঃখে বিগলিত সকরুণ কণ্ঠের মূর্চ্ছনাও যেন মঞ্জরীর মতই। ক্ষণকাল পূর্ব্বে আমার পুণ্যময়ী স্নেহময়ী মা সত্যই বলিয়াছিলেন, "মঞ্জরী বিশ্বের মেয়েদের মধ্যে মিশে রয়েছে।"

বলিলাম, "একমাস হল সে চলে গেচে। ফুলশয্যার তত্ত্ব কুটুম্বদের অমনোনীত হওয়াই তার ব্যারামের কারণ। থাক্ সে কথা। তোমার নাম কি বাছা, তুমি কাদের বাড়ীর বৌ, তোমার বাবা মা সব আছেন ত ?"

"আমার কেউ নেই। ছেলেবেলায় বাবা মারা যান, সাত বছর বয়সের সময় মা মারা যান। মামারা হালদারদের বাড়ী আমার বিয়ে দিয়েছেন। আমার নাম সন্ধ্যা ; আমার মা ঠিক আপনার মতনই ছিলেন, আজ আপনাকে দেখে তাঁর কথাই আমার মনে হচ্ছে।" সন্ধ্যা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মুখ অবনত করিল।

"আমাকে দেখে তোমার মার কথা মনে হচ্ছে সন্ধ্যা ? আমিও যে তোমার মধ্যেই আমার হারাণো মেয়েটির দেখা পেয়েছি। আজ থেকে আমি তোমার মা হলাম—তুমি আমার মেয়ে হলে, মা।"—বলিয়া সন্ধ্যার ললাটে স্নেহচুম্বন করিলাম। সে ভূমিষ্ঠ হইয়া আমার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল। তাহার মস্তকে হাত দিয়া নীরবে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলাম, "শ্বশুরবাড়ীর সকলে তোমায় স্নেহ যত্ন করেন সন্ধ্যা ? এখানে তোমার কে কে আছেন ?"

ম্লান মুখে সন্ধ্যা বলিল, "শাশুড়ী আর ননদ আছেন। আমি বড় অলক্ষণা মা, বাপের কুল শেষ করে, শ্বশুর ঘরে পা দিতেই শ্বশুর মারা গেলেন। ননদ বিধবা হল। এমন লক্ষ্মীছাড়াকে কেউ কি কখনও ভালবাসতে পারে ?"

ভগবানের কঠোর ন্যায়-দণ্ডের আঘাত পাইয়া তাহার জন্য দুর্ব্বল মানবকে নিমিত্তের ভাগী করা অনেক স্থানেই শুনিয়াছি বটে, কিন্তু আজ সন্ধ্যার কয়েকটি কথাতেই বুঝিলাম, তাহাকে কত বেশী সহিতে হয়। মুখে কোন কথাই বলিতে পারিলাম না। মনে মনে বলিলাম, "কে তোমাকে অলক্ষণা বলিয়া আঘাত করে মা ? বিশ্ববন্দিতা লক্ষ্মী যাহার অবয়বে নিজের অবয়বের সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি আঁকিয়া দিয়াছেন, কে তাহাকে অলক্ষ্মী বলে ? পল্লীর মরুভূমি আজও যে শ্যামলতায় আচ্ছাদিত রহিয়াছে, সে যে পল্লীর বধূর জন্যই। তোদেরই পুণ্যে তোদেরই হৃদয়নিহিত স্নিগ্ধ মাধুর্য্যধু

ধ্বংসাবশেষ পল্লী এখনও সমুজ্জ্বল, এখনও গৌরবান্বিত।

আমাকে নীরবে চিন্তামগ্ন দেখিয়া সন্ধ্যা পূর্ণ কুম্ভ কক্ষে তুলিয়া বলিল, "রাত হয়ে যাচ্চে—এখন আমি যাই মা। অনেকবার আমায় ঘাটে আসতে হয় রোজ আপনার সঙ্গে দেখা হবে।"

বলিলাম, "হালদারবাড়ী আমাদের বাড়ী থেকে বেশী দূর নয়; আমিও তোমায় দেখতে যাব সন্ধ্যা।"

"না মা, আপনি আর সেখানে যাবেন না। সেখানে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে পাব না। এই ঘাটেই আবার দেখা হবে।"—বলিয়া দ্রুতপদক্ষেপে আঁকাবাঁকা পথ দিয়া সন্ধ্যা অদৃশ্য হইল।

২

"হ্যাঁগা বাছা, আমাদের জিতুর বৌ যখন তখন ঘাটে এসে তোমার কাছে এত কি কথা কয় বল ত? আমার আর মার নিন্দা ছাড়া ও আবাগীর মুখে অন্য কথা নেই। বৌ নয়ত মিন্‌মিনে ডাইনী, ঘোমটার নীচে খেমটা নাচে।"

সন্ধ্যার রায়বাঘিনী ননদ রঙ্গমণির রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখিয়া ও সুধাময় কথা শুনিয়া মনের মধ্যে আমার আশঙ্কার ঝড় বহিতেছিল। পক্ষ-কাল হইল এই ঘাটের পথে ঝাউবনের নিভৃত ছায়ায় সন্ধ্যার সহিত আমার সুখ দুঃখের অনেক কথাই হইয়া গিয়াছে। স্নেহহারা অনাদৃতা বালিকা তাহার পাতানো মায়ের প্রাণের নিগূঢ় ব্যথা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া, মঞ্জরীর অভাবজনিত দগ্ধ হৃদয়ের অবর্ণনীয় জ্বালা কথঞ্চিৎ উপশমিত করিয়াছে। এখন আর সে শুধু আমার নিকটে প্রতিবেশীগৃহের বধূ নহে। আমার স্নেহমমতার রাজ্যে মঞ্জরীর স্থানে তাহারই আসনে সন্ধ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। তাহার ভাল মন্দ, শুভ অশুভের অংশ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছি। দিবসের প্রায় অধিকাংশ সময় সন্ধ্যার ঘাটের কাযেই অতিবাহিত হয়। যদিও তাহাদের সংসারের অবস্থা শোচনীয় নয়, তথাপি রঙ্গমণি ও তাহার উপযুক্ত গর্ভধারিণী বৌকে একটু আরাম দিয়া ঝি চাকর রাখিতে প্রস্তুত নহে। গরুর জাব মাখিবার জল, সংসারের প্রয়োজনীয় জল বহন করা এবং ক্ষারের কাপড় কাচা, বাসন মাজা সমস্তই তাহাকে নদীর ঘাটেই সম্পন্ন করিতে হয়। আমিও সন্ধ্যার ম্লান মধুর মুখখানি দেখিবার আশায় বনপথে বসিয়া থাকি। কিন্তু ইহা যে তাহার শাশুড়ী ও ননদিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে এটা আমার ধারণার বাহিরেই ছিল। আজ রঙ্গমণির কথায় আমি চমকিয়া উঠিলাম। একটু ভালবাসিয়া কাছে ডাকিয়া সন্ধ্যার লাঞ্ছনার বোঝা আরও বৃদ্ধি করিলাম ভাবিয়া মন আমার ম্রিয়মাণ হইল। এখন সন্ধ্যা আমার নিকটে সম্বন্ধ বর্জ্জিতা অনাত্মীয়া নহে—সে যে আমার হারানো মাণিক মঞ্জরী।

"সরল মনে জিজ্ঞাসা করতে এলেম, তা কথার উত্তরটাও দিলে না। বৌর কথাই বুঝি সত্যিকার ভেবে নিয়েছ? তুমি এখন বিদেশে থাক, তোমায় বিদেশী লোক বল্লেই হয়। ও কোন আক্কেলে লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে তোমার কাছে শাশুড়ী ননদের নিন্দা করতে আসে?"

বলিলাম, "সন্ধ্যা তোমাদের কোন নিন্দার কথাই বলে না রঙ্গ; আমি শোকে তাপে বিবশা—তোমাদের কথা দিয়ে আমার দরকার কি? আমার মেয়ের মত তোমাদের বৌর চেহারা, তাই ডেকে দুটো কথা বলি। তার কোন দোষ নেই।"

রঙ্গ আমার মুখের সম্মুখে হাত নাড়িয়া ভাঙ্গা গলায় ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "আহা দোষ কি আছে, সব গুণ? ওই ন্যাকা ন্যাকা মুখখানা দেখে মানুষ ভুলে যায় গো। ওর নাম কি রূপ? ওযে সিমুল ফুল; গুণের ধরি ছাতি; রূপের মারি নাথি। জিতুকে তুক্ করে ভুলিয়ে নিয়েছে। তুমি বাছা দুদিনের জন্যে এসেছ, তোমাকেও তুক করেছে। একেবারে আস্ত ডাইনী।"

রঙ্গকে প্রসন্ন করিবার আশায়, কথা ঘুরাইয়া

উত্তর দিলাম, "দুদিনে কি মানুষ চেনা যায় মা? তোমাদের বৌয়ের এত গুণ এখন জানতে পারলাম। এইবার সাবধান হব।"

"তোমায় কষ্ট করে সাবধান হতে হবে না বাছা; ঘাটে পথে গল্প করে বেড়ানোর সুখ আজ থেকেই বুঝিয়ে দেব।"—বলিয়া হেলিয়া দুলিয়া বাহু নাড়া দিয়া রঙ্গমণি প্রস্থান করিল। আমি বিমূঢ়ার ন্যায় স্তব্ধ হইয়া তাহার কথাগুলির ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার জন্য একটা অজ্ঞানিত চিন্তার উচ্ছ্বাসে আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু অধিকক্ষণ আমাকে চিন্তা করিতে হইল না। প্রতিদিনের মত নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমার পরিচিত মূর্ত্তিখানি পথের পাশে দেখা গেল; কিন্তু আজ সে একাকী নয়। পশ্চাতে রঙ্গমণি—মুখে তাহার বিদ্রূপপূর্ণ ঈষৎ হাসি।

জল লইয়া ফিরিবার সময় সন্ধ্যা সচকিত বিষাদময় দৃষ্টি আমার দিকে নিক্ষেপ করিয়া নীরবে চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার সেই অসীম বেদনাভরা চক্ষুর অব্যক্ত ভাষা আমার অন্তস্তলে বিষাক্ত তীরের ফলার মত বিদ্ধ হইতেছিল। হায় মা, কেন আমার বক্ষপুটের নিবিড় ছায়ায় তোকে ঢাকিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলাম? যাহার পূর্ণিমার ষোলকলা চন্দ্র রাহুগ্রস্ত, তাহার আবার তৃতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্রের প্রতি লোভ কেন? বসন্তের গন্ধামোদিত সমীরণে হিল্লোলিত কুসুমকুঞ্জ" যাহার নিকটে চিরদিনের তরে শুষ্ক সাহারায় পরিণত হইয়াছে, সে আবার ক্ষুদ্র বনফুল অঞ্চলে বাঁধিবার সাধ করে কেন? মহাপারাবার হারাইয়া গিরি নির্ঝরিণীর স্বল্প ধারায় হৃদয় প্রাণ সুশীতল করিবার ব্যগ্রতায় তোর একমাত্র শান্তির স্থল, স্বাধীনভাবে জুড়াইবার পথে কঠিন শিলা নিক্ষেপ করিয়া তোর গমনাগমনের পথ বন্ধ করিলাম। সন্ধ্যা মা আমার; কি উপায়ে তোর সমস্ত চিত্তক্ষোভ মুছাইয়া দিব?

৩

"রঙ্গ, দু'দিন হল তোমাদের বৌকে দেখি না কেন? আজ তুমিই জল নিতে এসেছ। আহা,—তুমি বিধবা মানুষ; শরীরও ভাল নয়, তোমার কি এত পরিশ্রম সহ্য হয়?"

দুই দিন সন্ধ্যাকে না দেখিয়া প্রাণ আমার আকুল হইয়া উঠিয়াছিল; তাই ঘাটে আগতা রঙ্গমণির নিকট হইতে তাহার সংবাদ জানিবার জন্য আমাকে ছলনারই আশ্রয় লইতে হইল। ছলনা না করিলে নারীর উপায় কি? তাহার যে অনেক কায।

আমার কথা শুনিয়া রঙ্গমণির রুক্ষ মুখ আনন্দে সরস হইল। প্রফুল্ল স্বরে সে বলিল, "ঠিক্ বলেছ বাছা, আমার কি এত পরিশ্রম সহ্য হয়? খাই কি—দু'টো আলোচালের ভাত একটু ঘি, আর গাইয়ের বাঁটের দুধটুকু; আনাজ পাতি মুখেও তুলতে পারি না। অরুচি—ঘোর অরুচি। আর এক বেলা ত ফল মূল খেয়েই কাটাই। এতে কি শরীরে বল থাকে? গতরখাকী তা'ত বুঝবে না। পরশু ক'খানা ক্ষারের কাপড় কেচে, আর তিন কুড়ি ধান ভেনে—ননীর পুঁতুল অষ্ট অঙ্গ ছেড়ে দিয়েছেন। একটু গা' গরম হয়েছে কি না হয়েছে, পেটের ব্যথায় অধৈর্য্য হয়ে উঠেছেন। মা বুড়ো মানুষ—আমারই কর্ম্মভোগ।"

সন্ধ্যার পীড়ার সংবাদে উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইলাম। ব্যারাম যে কতদূর সাংঘাতিক হইয়াছে তাহা বুঝিতে আমার বিন্দুমাত্রও বিলম্ব হইল না। কিন্তু বাহিরে মনোভাব প্রকাশ না করিয়া সহজ ভাবেই বলিলাম, "তাই ত, তোমার বড় মুস্কিল হয়েছে রঙ্গ, এমন বৌ কোথায় দেখিনি। বৌ যে এত ঢং করছে, জিতুর কি শীগ্গির বাড়ী আসবার কথা আছে?"

"হ্যাঁ গো, ঠিক বলেছ; তোমরা লিখনে পড়নে মেয়ে, অনেক কথাই জান্তে পার। কথাই যখন তুল্লে, তখন দেখ না সে আসবে কবে।"—বলিয়া রঙ্গ অঞ্চল হইতে সদ্যপ্রাপ্ত খামে ভরা একখানা চিঠি আমার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিল।

আমি সেখানার উপর বিস্মিত নয়ন লুকাইয়া অধোবদনে বসিয়া রহিলাম। অন্যের অজ্ঞাতসারে তাহার গোপনীয় চিঠি খুলিয়া পাঠ করা ইহা যে কল্পনায়ও ভাবিতে পারি নাই। আর সে অন্য কাহারও নয়, আমারই কন্যাস্থানীয়া সন্ধ্যার স্বামীর প্রেমপত্র।

আমার দ্বিধা ভাবটুকু পিসীর নিকটে বোধ হয় অপ্রকাশ রহিল না। তিনি সোৎসাহে বলিলেন, "বসে রইলে কেন; খুলে ফেল,—কেউ টের পাবে না। কত দিন কত চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিই—কে তার খবর নেয়?"

ওহরি আজ তবে এ নূতন নহে; এটা নিত্য ঘটনারই অঙ্গীভূত! চিঠি খানা হাতে লইয়া ভাবিলাম, না খুলিয়াই এখানা ফেরত দিই; কিন্তু রঙ্গর নিকটে ইহা ফেরত দিলে চিঠির যে কি পরিণাম হইবে তাহাই স্মরণ করিয়া ফিরাইয়া দিতে পারিলাম না। সন্ধ্যা আমার হয়ত কত বিনিদ্র রজনী, অলস মধ্যাহ্ন ইহারই প্রতীক্ষায় অতিবাহিত করিয়াছে। কত প্রভাতে কত সন্ধ্যায় ইহারই আশাপথ চাহিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছে। আবার এ বাঞ্ছিত বস্তুর অদর্শনে সেই সুন্দর নির্ম্মল কপোলে বেদনায় তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়াছে। সন্ধ্যাকে একটু আনন্দ দিতে একটু শান্তি দিতে যদি ভগবানের ন্যায়বিচারে আমার অপরাধ হয়—তাহা আমি স্বেচ্ছায় মাথায় তুলিয়া লইব।

ধীরে ধীরে চিঠিখানা খুলিলাম, কিন্তু পড়িব কি; পত্রের প্রতি কথায়, প্রতি অক্ষরে প্রতি রেখায় গভীর প্রেম প্রীতির নির্ম্মল প্রস্রবণ উছলিয়া উঠিতেছে। বিরহের আকুল অশ্রু, মিলনের উচ্ছ্বসিত পিপাসা কত কথায় কত ভাবে প্রকাশ হইতেছে। চিঠির উপসংহারে জিতু লিখিয়াছে, "আমি একটি চাকুরী নিয়ে পাটনায় যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে বাসা ঠিক করে তোমায় নিয়ে যাব সন্ধ্যা। হৃদয়ের রত্ন আমার, আর একটি মাস তুমি আমায় প্রতীক্ষা কর। তোমার দরিদ্র স্বামী তোমাকে মণিমুক্তায় সাজাতে না পারলেও, তার অসীম প্রেমের সমুদ্রে জন্মদুঃখিনী সন্ধ্যাকে ডুবিয়ে রাখতে পারবে।" আনন্দে আমার চক্ষে জল আসিল। সন্ধ্যা দুঃখিনী নয়; সে এক অমূল্য রত্নের অধিশ্বরী।

"বড় করে পড় না বাছা, কি লেখা আছে শুনি।"

"জিতুর হাতের লেখা বড্ড জড়ানো, পড়তেই পারছি না।" বলিয়া মিছামিছি কয়েকটি কথা রঙ্গকে পড়িয়া শুনাইলাম। রঙ্গ হাত বাড়াইয়া বলিল, "দাও পত্তর খানা ছিঁড়ে ফেলি।" কৌশলে খামের মধ্য হইতে চিঠি খানা কাপড়ের ভিতর লুকাইয়া, শুধু খামখানি শত খণ্ডে ছিঁড়িয়া ঝোঁপের পাশে ফেলিয়া দিয়া বলিলাম, "আমিই ছিঁড়ে ফেল্লাম। এসব চিঠিপত্র লেখা একেলে ঢং আমারও চক্ষের বিষ।"

হৃষ্টান্তকরণে রঙ্গমণি প্রস্থান করিল। আমার হৃদয়ের অনির্ব্বচনীয় চঞ্চলতা ক্রমেই উচ্ছলিত হইতেছিল। সন্ধ্যার রোগ-শয্যাপার্শ্বে ছুটিয়া যাইবার ব্যগ্রতা আমাকে অধীর করিয়া তুলিল। সমস্ত রাত্রি উদ্বেগে কাটাইয়া প্রভাতে আর আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। নিজের অজ্ঞাতসারে সন্ধ্যাকে কত বেশী ভাল বাসিয়াছিলাম, আজ তাহার নিদর্শন পাইলাম।

ভয়ে ভয়ে অপরাধীর মত সন্ধ্যাদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া ডাকিলাম, "রঙ্গ, দিদি কোথায়?" গোয়ালের সম্মুখ হইতে রঙ্গ উত্তর দিল, "মা ঝি চাকর ঠিক করতে পাড়ায় গেচে, আমি গোয়াল মুক্ত করছি। বস বাছা, গতরখাকীর জন্যে কি নিশ্চিন্ত মনে মানুষের সঙ্গে দুটো কথা বলবার যো আছে!"

"ঠিক কথা রঙ্গ, এখন কি আর এত ঝক্কি তোমার ভাল লাগে? বৌ কোন ঘরে আছে? একবার দেখলেই রোগ বুঝতে পারব।"

রঙ্গ অঙ্গুলি তুলিয়া বধূর শয়ন গৃহ দেখাইয়া দিল।

ছিন্ন মলিন শয্যাতলে বৃন্তচ্যুত কুসুমকলির মত সন্ধ্যা আমার পড়িয়া ছিল। তাহার মাথার দিকের ক্ষুদ্র গবাক্ষ পথ দিয়া প্রভাতের স্নিগ্ধ রৌদ্ররশ্মি এলাইত রুক্ষ চুলগুলির উপর নিপতিত হইয়া সেগুলি স্বর্ণচ্ছটায় আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিল। মুখ

খানি নিশাবসানের ম্লান চন্দ্রমার মত তেমনি মলিন, তেমনিই প্রভাহীন। আমি কোনরূপে চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া তাহার লুণ্ঠিত মস্তকটি কোলের উপর তুলিয়া আস্তে আস্তে ডাকিলাম, "সন্ধ্যা মা, আমি এসেচি।"

চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত করিয়া শীর্ণ দুর্ব্বল বাহু দুটি দিয়া আমাকে বেষ্টন করিয়া, পুলকিত ক্ষীণ স্বরে বলিল, "মা, এসেচ ? আমার খুব কষ্ট হচ্চে, আমি আর বাঁচব না। যতক্ষণ বেঁচে থাকি—তুমি আমায় একলা ফেলে চলে যেওনা মা।"

"ছি ওকথা বলে না; তুমি ভাল হয়ে যাবে লক্ষ্মী মেয়ে। তোমায় ফেলে আমি কোথায়ও যাব মা মণি। জিতু আর এক মাস পর তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাবে, সে চিঠি লিখেছে।"—বলিয়া আমার হৃদয়ে সঞ্চিত অপার স্নেহ ঢালিয়া সন্ধ্যার ললাট চুম্বন করিলাম।

আমার সম্মুখে স্বামীর চিঠি পড়িতে পাছে সে লজ্জাসুলভ করে ভাবিয়া, চিঠি প্রাপ্তির আমূল ইতিহাসটা শুনাইয়া, চিঠিখানা তাহার নিকটে রাখিয়া আমি সেখান হইতে উঠিয়া আসিলাম।

কিয়ৎকাল পর চাহিয়া দেখি, সেই মরণোন্মুখ আভাশূর্ণ বদন আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়াছে। সন্ধ্যার মুদ্রিত পদ্মের উপর সূর্য্যের শেষ কিরণরেখা প্রতিফলিত হইয়াছে।

৪

"দিদি তোমার বৌয়ের বড় অসুখ, ডাক্তার ডাক্‌তে হয়।"

দিদি আমারদিকে তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পঞ্চমস্বরে উত্তর দিলেন, "ডাক্তার ডাক্‌বার পয়সা আঁচলে নিয়ে পা' ছড়িয়ে কান্‌ছিলো। ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান। ওসব ঠাট্ এখানে খাটবে না; একটু জ্বর হ'য়েচে তাই পেটের ব্যথার অছিলা করে পয়সা খরচ করাবেন, মনের সুখে শুয়ে থাক্‌বেন, আমায় তেমন বোকা পান নি।"

সন্ধ্যার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর কথায় আমার ত চক্ষু স্থির। সেখান হইতে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া রঙ্গকে গিয়া ধরিলাম, "বৌর সত্যি সত্যিই অসুখ হ'য়েছে, কাউকে ডেকে দেখাতে হয়। তোমাদের বৌ বোধ হয় বাঁচবে না।"

"না বাঁচে: নাই বাঁচবে; তাতে হ'য়েছে কি ? ভাইয়ের আবার বিয়ে দেব; আবার টাকা পাব, গয়না পাব; কত কি পাব—'ভাগ্যিবানে বৌ মরে, বছরে বছরে বিয়ে করে।' একটা মেয়ে মানুষের প্রাণ তার আবার মূল্য কি !"

রঙ্গর কথায় আমার মুখে কোন উত্তরই আসিল না। আমি ব্যথিত হইয়া মনে মনে বলিলাম, "ওগো মায়ের জাত, তোমরা ত্রিদিবের মন্দাকিনী কূল হইতে পথভ্রষ্ট হইয়া নরকের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছ। তোমাদের নারীত্ব তোমাদের মাতৃত্ব কি মহানিদ্রায় সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে! ওগো জাগো, এ মায়া ঘুম হইতে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া চাহিয়া দেখ, তোমাদের স্থান কত উর্দ্ধে। তোমরা জননী, তোমরা ভগিনী; তোমরাই সহধর্ম্মিণী এবং স্নেহনির্ঝরিণী দুহিতা; এ কথা ভুলিয়া গিয়া নারীর প্রাণ মূল্যহীন হেয় অবজ্ঞেয় করিয়া তুলিতেছ কেন ? আপনার মান আপনি না রাখিলে অপরে কি রাখিতে পারে ?'

সন্ধ্যার পীড়া বৃদ্ধি দেখিয়া অগত্যা মার নিকট হইতে টাকা আনিয়া ডাক্তার ডাকিলাম। কিন্তু ডাক্তার বাবু তাহার সম্বন্ধে একটা মৌখিক আশার কথাও আমাকে বলিতে পারিলেন না। আকার ইঙ্গিতে তাহার চরম অবস্থাটাই আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। এরূপ গুরুতর ব্যারাম লইয়া সে যে কেমন করিয়া এতদিন নীরবে ছিল, বিজ্ঞ ডাক্তার বারবার সেই কথারই আলোচনা করিতে লাগিলেন। আমি বুঝিলাম অপরিসীম ধৈর্য্যশালিনী কিশোরী কি বিপুল শক্তির সহিত নিজের সঙ্গে অহরহ সংগ্রাম করিয়া আজ পরাস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

দুইটি দিন ও রাত্রি সন্ধ্যাকে ঔষধ দিয়া মালিস দিয়া এবং 'সেক' করিয়া জানিতে পারিলাম সমস্তই বৃথা।

মরণপথের যাত্রী পরপারের সন্তাপহারা শান্তি-নিকেতনের উজ্জ্বল দীপশিখার দর্শন পাইয়াছে।

সেদিন গভীর রাত্রে জগৎ যখন মহা নিদ্রায় মগ্ন। লোকের কোলাহল, নদীর কলধ্বনি, বিহঙ্গের ললিত ঝঙ্কার, তরুর মর্ম্মর সবই যেন থামিয়া আসিতে ছিল। কোন ঝিল্লীরবপূর্ণ তৃণভূমি হইতে শুধু কাহার অস্ফুট ক্রন্দন শব্দ ও দীর্ঘনিশ্বাস আমার কর্ণের মধ্য দিয়া অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল। আমার কোলের উপর হইতে ধীরে ধীরে নয়ন মেলিয়া ছিন্নতন্ত্রী বীণাস্বরের মত, মরণাহত পাখীর শেষ সঙ্গীতের মত সন্ধ্যা অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, "মা, এখন আমার সব যন্ত্রণাই কমে আসছে, খুব ঘুম পাচ্ছে, ঘুমুলে কিন্তু—"

তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া বলিলাম, "ঘুম পাচ্ছে ঘুমাও; তাতে কিন্তু কেন মা?"

"এ ঘুম যদি আমার আর না ভাঙ্গে—তিনি যে আমাকে 'প্রতীক্ষা' করতে বলেছেন।"

দুই বিন্দু অশ্রু সন্ধ্যার হিমাচ্ছন্ন গণ্ডে ঝরিয়া পড়িল। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনাবেগ কষ্টে দমন করিয়া মায়ামুগ্ধাকে বলিলাম, "তুমি আরামে আমার বুকের মধ্যে ঘুমিয়ে থাক মঞ্জু। ঘুম যদি নাই ভাঙ্গে, তাতে দুঃখ কি মা; এ দুঃখ ব্যথা ভরা জগতের পরপারে ভগবানের চরণপ্রান্তে বসে তুমি স্বামীর প্রতীক্ষা করো; সেইখানে তোমাদের অনন্ত মিলন হবে।" সন্ধ্যার বিবর্ণ মুখে শান্তির ছায়া পরিস্ফুট হইল। সে স্বপ্নাবিষ্টের মত ঘুমাইয়া পড়িল।

কিয়ৎক্ষণ পর সন্ধ্যার শাশুড়ী, ননদিনী ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "হ্যাগা, বৌ যে অনেকক্ষণ কথা বল্‌ছে না কি? তুমি ত শকুনির মত মড়া আগলে বসে আছ, শেষকালে আমাদের ঘরখানা নষ্ট করো না। এস মা ধরাধরি করে উঠানে বের করে রাখি, বেশী দেরী ত নেই ডাক্তার বাবুই বলে গেছেন।"

ঘৃণায় দুঃখে আমার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল; তথাপি কথা বলিতে হইল। বলিলাম, "একটা মানুষের প্রাণের চেয়ে তোমাদের ঘরের মায়াই বেশী হয়েছে? ভারী এক খড়ের মেটে ঘর! আজ জিতুর ব্যারাম হলে কি করতে; এমনি করতে কি পারতে? বাছার প্রাণ থাকতেই বর্ষায় ভেজা উঠানে আমি তাকে নিয়ে যেতে দেব না।"

মা ও মেয়ে উচ্চ চিৎকারে পাড়া সচকিত করিয়া কহিল, "উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন! মামীমার মা, তার আবার বড় যা, আমাদের বৌ আমরা জ্যান্ত বের করি? মরা বের করি তাতে তোমার কি বাপু? ছেলেতে আর বৌতে সমান করছেন! ষাঠ, বালাই জিতুর কেন অসুখ হতে যাবে? যত চোখখাকীদেরই যে যেখানে আছে ব্যারামে পড়ে মরুক, তখন পরের চরকায় তেল দেওয়া বেরিয়ে যাবে। এখন ভাল চাও ত ঘরে থেকে বের করতে দাও, নইলে ঘরের দাম ফেল।"

আমার শেষ সম্বল হাতের চুড়ি কগাছা যাহা মঞ্জরীকেও দিতে পারি নাই, তাহাই খুলিয়া পাষাণীদের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া ঘৃণিত স্বরে বলিলাম, "তোমাদের ঘরের দামের চেয়ে এর দাম বেশী হবে; এখন একে একটু শান্তিতে মরতে দাও।"

দুঃখের রজনীর অবসানে হাস্য ভরা উল্লাসভরা মধুর প্রভাত ফিরিয়া আসিল। বিশ্ব নিদ্রা হইতে সহসা জাগ্রত হইয়া চারিদিকে কলরব তুলিল। কুলায়ে কুলায়ে পাখীরা গাহিয়া উঠিল। গ্রামের নিষ্কর্ম্মা যুবকের দল সখের থিয়েটার করিয়া—

"ফুটিতে পারিত গো ফুটিল না সে।
মরমে মরে গেল, মুকুলে ঝরে গেল,
প্রাণভরা আশা সমাধি পাশে।

গাহিতে গাহিতে গৃহে ফিরিল। কুঞ্জে কুঞ্জে ফুল-ফুল আঁখি মেলিয়া মন্দ সমীরণকে অভিনন্দিত করিল। কিন্তু হায়, একটি নির্ম্মল সুবাসপূরিত ফুল আজ আর প্রভাত-পবনে আঁখি মেলিল না। মঞ্জরীর শোকানল আরও প্রবল তেজে প্রজ্জ্বলিত করিয়া আমারই বুকের উপর ক্ষুদ্র সন্ধ্যামণি ঝড়িয়া পড়িল।

শ্রীগিরিবালা দেবী।

আর্য্যাবর্ত্তে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রৌদ্রকরোজ্জ্বল রাজপথে যখন বাহির হইলাম, তখন দেখিলাম বেদনায় "চরণ চলিতে নাহি চাহে!" বন্ধুবর হরগোপালবাবু অপেক্ষাকৃত স্থূলকায় এবং খর্ব্বাকৃতি। হ্যাট্-কোটের গুণই হউক বা দোষই হউক, উহারা অঙ্গে উঠিলেই নিতান্ত নিরীহ মানুষকেও একটু চঞ্চল করিয়া তোলে। বন্ধুবর বুঝি তাই অতি ক্ষিপ্র চরণে উদ্যানটিকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি অতি কষ্টে তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছি দেখিয়া তিনি কাতর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন। তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য কহিলাম—"আমার কিছুই কষ্ট হচ্ছে না, আপনি এগিয়ে চলুন—আমি সঙ্গে সঙ্গে আছি।"

উদ্যানবাটিকা হইতে প্রায় অর্দ্ধমাইল আসিবার পর পথের বামপার্শ্বে দেখিলাম একটা বৃহৎ স্তূপ, এবং তাহারই শিরে অষ্টকোণ বিশিষ্ট একটী কক্ষ। ইহারই আধুনিক নাম "চৌখণ্ডি স্তূপ।" কে, কি কারণে এই স্তূপটাকে "চৌখণ্ডী" নামে পরিচিত করিয়াছে তাহা জানি না। অধিক দিনের কথা নহে, ১০ বৎসর পূর্ব্বেও কেহ জানিত না যে শোভাসম্পদহীন এই উচ্চ স্তূপ বহুদিন গত একান্ত বিস্মৃত একটী অতি পবিত্র যুগের সহিত, তুলনায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক, সম্রাট আকবরের যুগের সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া অনন্ত কাল-সমুদ্রের মগ্নশৈলোপরি ঝটিকাবিক্ষুব্ধ বজ্রদগ্ধ আলোক-স্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কালের সহিত কালকে বাঁধিয়া, স্মৃতির সহিত স্মৃতিকে গ্রথিত করিয়া এই অনাড়ম্বর জীর্ণ ভগ্ন দীর্ঘ স্মৃতিস্তম্ভ যে পর্যটকের কৌতূহল জাগ্রত করিবার জন্য মুক্ত প্রান্তর মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহা প্রত্নতাত্ত্বিক ওর্‌টেল সাহেব ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম আবিষ্কার করিয়া যশস্বী হইয়াছে।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জেনারেল কানিংহাম স্তূপ মধ্যে একটী বৃহৎ কূপ খনন করিয়া দেখিয়াছিলেন যে উহার গর্ভে স্মারকচিহ্ন কিছুই নাই। পরে ওর্‌টেল সাহেব স্তূপের নিম্নস্থান খনন করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন জানা গেল যে স্তূপটী পর পর তিনটী সমচতুষ্কোণ চত্বরে গঠিত হইয়াছিল। প্রত্যেক চত্বর প্রস্থে ও উচ্চতায় ৮ হাতের কম ছিল না। স্তূপের ইষ্টকগুলি কর্দ্দম সহযোগে গ্রথিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু চত্বরগুলির নিম্নে ক্ষুদ্রায়তন সারি সারি কক্ষ বা cells বর্ত্তমান ছিল। চত্বরের বহির্ভাগের কুলুঙ্গগুলি এক সময়ে নানাবিধ মূর্ত্তিতে সুশোভিত থাকিত। চত্বরের উপরে উঠিবার জন্য যে সোপানশ্রেণী ছিল তাহাদের সংলগ্ন প্রাচীর গাত্রও এক সময়ে আর্য্য মূর্ত্তিশিল্পের সৌষ্ঠবসম্পন্ন নিদর্শন বহন করিত। আজিও সারনাথের শিল্পশালায় দুইটী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়—উহারা এক সময়ে এই প্রাচীরগাত্রের শোভাবর্দ্ধন করিত। এ মূর্ত্ত দুইটী দেব দেবীর নহে—যোদ্ধ পুরুষের। দুইজন বীর যোদ্ধা অদ্ভুতাকৃতি বাহনে আরোহণ করিয়া সমরাঙ্গনে চলিয়াছেন। বাহনের চরণ ও দেহ সিংহের ন্যায় এবং চক্রচঞ্চু ও বিশাল বক্ষ ঈগলপক্ষীর ন্যায়! এই কাল্পনিক-বাহনকে কেহ কেহ Leoggryph নামে পরিচিত করিয়াছেন। কোন্ জাতির শিল্পী কোন্ আদর্শ স্মরণ করিয়া এইরূপ বাহনের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না।

'চৌখণ্ডী' দেখিয়া বহুদিনের একটী প্রাচীন কাহিনী মনে পড়িয়া গেল। "ইহাসনে শুষ্যতে মে শরীরং" বলিয়া কপিলাবস্তুর কৃতপ্রতিজ্ঞ রাজসন্ন্যাসী যে দিন তপঃসাধন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তেমন দিন ভারতে বেশী আসে নাই। দুরন্ত মারকে জয় করিয়া তিনি মানবের মহামুক্তি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কহিলেন—

অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং
গহকারকং গবেসন্তো দুঃখাজাতি পুণপ্পুণং।
গহকারক! দিট্‌ঠোহসি, পুণ গেহং নকাহসি
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখিতং।
বিসঙ্খারগতঃ চিত্তং তণ্‌হানং খয়মজ্ঝগা।

Many a house of life
Hath held me—seeking ever him who wrought
These prisons of the senses, sorrow-fraught;
Sore was my ceaseless strife!
But now,
Thou builder of this Tabernacle—Thou!
I know Thee! Never shalt thou build again
These walls of Pain,
Nor raise the Roof-tree of Deceits, nor lay
Fresh Rafters on the clay;
Broken thy House is, and the Ridge-Pole split!
Delusion fashioned it!
Safe pass I thence—Deliverance to obtain—
["The Light of Asia"—Arnold.]

যে দিন তাঁহার শ্রীমুখ হইতে এই সত্য প্রচারিত হইল, সে দিন দেবগণ আনন্দে জয়গান করিতে লাগিলেন। ক্রমে অষ্টম সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইল—ভগবান বুদ্ধ কিরিয়ামুচল হইতে অজপাল-ন্যগ্রোধের মূলে আগমন করিলেন। চারিদিক নির্জ্জন—জন মানবের চিহ্ন পর্য্যন্তও তথায় ছিল না। ছিলেন শুধু ভগবান বুদ্ধ এবং তাঁহার হৃদয় মন পূর্ণ করিয়া তপন অপেক্ষাও উজ্জ্বল, অগ্নি অপেক্ষাও তীব্র সেই এক মহা সত্য—যাহার সন্ধানে আসিয়া তথাগত রাজ্যধন, বিলাস-সম্ভোগ সমস্তই ত্যাগ করিয়াছিলেন। সে মহাসত্য অর্দ্ধপৃথিবীকে আত্মনির্ভরশীল হইতে শিক্ষা দিয়াছিল—তাহা জলদনির্ঘোষে কহিয়াছিল—দৈবং কুরু পৌরুষ-মাত্মশক্ত্যা। তুমিই তোমার নির্ভর দণ্ড—তোমার অন্ধকার পথের উজ্জ্বল দীপশিখা তোমার মুক্তির একমাত্র কাণ্ডারী। সাধন কর—বাসনা ত্যাগ কর—আমিত্বকে বিস্মৃত হও—তোমার সকল দুঃখ দূর হইবে—তোমার আত্মা পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যাইবে। সুখসম্ভোগের স্পৃহা—অহঙ্কার ও দাম্ভিকতার প্রতি আসক্তিই তোমার আত্মা বা self—উহাকে মুক্ত কর মুক্ত কর। সংসারে দুঃখ ভিন্ন সুখ নাই—জ্বালা ভিন্ন শান্তি নাই—এমন কোন মহাশক্তি নাই যাহা তোমাকে সেই দুঃখ ও দহনের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে। তোমার নিজের দিকে চাহিয়া দেখ—নিজের ভিতর হইতে সেই শক্তি সংগ্রহ কর যাহা তোমাকে নির্ব্বাণের পথে লইয়া যাইবে।

তথাগত ভাবিতে লাগিলেন এ মহবাক্য কি ধরার মানুষে হৃদয়ে ধরিতে পারিবে? বিলাস সম্ভার যাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে—বাসনা-কামনা যাহাকে আকুল করিতেছে—রিপুগণ যাহাকে লৌহ অপেক্ষাও কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধিয়াছে—মুক্তিলাভের উপায়গুলি কি সে কখনও আয়ত্ত করিতে পারিবে? নানা চিন্তার পর তথাগত স্থির করিলেন, কাজ নাই প্রচার করিয়া—যাহা মনুষ্যজাতির বোধগম্য নহে তাহা প্রচার করিতে যাইয়া কেবল পণ্ডশ্রম হইবে। তৃষ্ণা ও ঘৃণা যাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, সত্য তাহাকে দেখা দেয় না—সংসার যাহার চারিদিক মেঘের মত ঘিরিয়া আছে, নির্ব্বাণ কাহাকে বলে সে কিরূপে তাহা বুঝিবে? প্রবুদ্ধ যিনি, তিনি যাহাকে পরমমুক্তি বলিয়া জানেন, সংসারের মানুষ মনে করিবে তাহাই নিঃশেষে ধ্বংস মাত্র। এ সত্য প্রচার করিব না।

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা দেখিলেন সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত—বুদ্ধ যদি মহাসত্য প্রচার না করেন তাহা হইলে জগতের উপায় কি হইবে? "নস্‌সতিবত ভো লোকো—বিনস্‌সতিবত ভো লোকো"—সকলই যে তাহা হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া

করযোড়ে বুদ্ধদেবকে কহিলেন,—"প্রভো দয়া করুন—যাহারা মুক্তির জন্য আকুলি বিকুলি করিতেছে—যাহারা জ্বালায় জর্জ্জরিত হইতেছে, যাহারা চিরদুঃখের নাগপাশে বদ্ধ হইয়া আছে তাহাদের করুনা করুন—আপনার মহাসত্য প্রচার করুন।"

ভগবান তখন ধ্যানস্তিমিত নয়নে দেখিলেন যে এখনও পৃথিবীতে এমন অনেকে আছেন যাঁহাদের মন সংসারের আবর্জ্জে পূর্ণরূপে পতিত নহে—যাহাদের হৃদয় সত্য গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। তখন তিনি কহিলেন—"সত্য মন্ত্র লাভ করিবার জন্য যাহাদের কর্ণ প্রস্তুত রহিয়াছে, মুক্তির দ্বার তাহাদিগের জন্য মুক্ত—তাহারা এই নবধর্ম্মের উপর বিশ্বাস স্থাপন করুক।"

Thereupon
The master cast his vision forth on flesh,
Saw who should hear and who must
wait to hear,
As the keen sun gilding the lotus leaves
Seeth which buds will open to his beams
And which are not yet risen from
their roots ;
Then spake, divinely smiling,
"Yea ! I preach !
Whoso will listen, let him learn
the Law."
["The Light of Asia"—Arnold]

সহম্পতি ব্রহ্মা বুঝিলেন, তথাগত ধর্ম্মপ্রচার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি সহর্ষে স্বর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আবার স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল।

তখন বুদ্ধদেব ভাবিতে লাগিলেন—আমি প্রথমে কাহার নিকট সত্য প্রচার করিব ? যাঁহাদিগের নিকট প্রথম দীক্ষা লাভ করিয়াছিলাম, তাঁহারা ত ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। কিছুক্ষণ চিন্তার পর তাঁহার মনে হইল, আমার পঞ্চশিষ্য ত এখনও জীবিতই আছে। উরুবিল্বে আমার অরণ্যবাসকালে এই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগের নিকট কত উপকার লাভ করিয়াছি—বহুপকারা খো মে পঞ্চবগ্গিয়া ভিক্খু—তাঁহাদিগের নিকটেই প্রথমে এই সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিব।

শাক্যসিংহ যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন আরাদ এবং উদ্রক নামে দুইজন সুবিখ্যাত ঋষি বাস করিতেন। মহারাজ বিম্বিসারের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি ঋষিদ্বয়ের নিকট আগমন করিলেন এবং আত্মা ও কর্ম্মের বন্ধন সম্বন্ধে নানা তত্ত্বকথা শ্রবণ করিলেন। তিনি যথাশক্তি সাধনায় নিযুক্ত হইলেন। মন্ত্রশক্তির উপর নির্ভর করিয়া শুদ্ধ মনে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন এবং আত্মাকে জয় করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিলেন। ঐরূপে কিছুকাল গেল, কিন্তু রাজ তপস্বীর হৃদয় শান্তিলাভ করিতে পারিল না। তিনি দেখিলেন, যাহা চাই তাহা পাইতেছি না—যেন কোন এক ঘুর্ণ্যাবর্ত্তে পড়িয়া কেবলই ঘুরিয়া মরিতেছি। তিনি গুরুদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—মানুষ যে নিগড়াবদ্ধ হইয়া আছে, মুক্তিলাভ করিতে পারিতেছে না, তাহার কারণ এই যে তাহারা আপনাকে ভুলিতে পারিতেছে না, আমিত্ব দূর করিতে পারিতেছে না। আমি কত বৃহৎ, আমি কত মহৎ—অমুক অসাধারণ ব্যাপার আমিই ঘটাইয়াছি সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা করিয়াই মানুষ আপনাকে বন্ধনের উপর কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ করে। কেহ কি অগ্নি হইতে তাহার তাপকে পৃথক করিতে পারে ? আমরা অগ্নি ও উত্তাপকে পৃথক্ রূপে ভাবি বটে, সে শুধু চিন্তার ধারা মাত্র—নতুবা বস্তু হইতে তাহার গুণকে পৃথক্ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। আমা হইতে আমিত্ব পৃথক এ ধারণা শুধু চিন্তাতেই স্থানলাভ করিতে পারে—তাহা সত্য নহে—সুতরাং আত্মার সন্ধানে ফিরয়া যদি মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে চাই, তাহা হইলে শুধু বিপথেই যাত্রা করা হইবে, মুক্তিলাভ ঘটিবে না।"

কাপিল সাংখ্য দর্শন এবং বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মনীতি অনেক অংশে একরূপ। কপিল ও বুদ্ধ উভয়েই নিরীশ্বরবাদী। উভয়েই বিবেচনা করেন যে সংসারে কেবল দুঃখ—সুখ নাই। কিরূপে সেই

দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ ঘটিবে—কিরূপে মানুষ নিরবিচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করিতে পাইবে—যেমন কপিলের তেমনি ভগবান বুদ্ধের উভয়েরই একমাত্র সাধনার বিষয়—নিবৃত্তিই অত্যন্ত পুরুষার্থ। সংসারে যে একেবারেই সুখ নাই ইহা সাংখ্যের মত নহে—সুখ আছে তবে উহা অতি অল্প, উহা দুঃখের সহিত এরূপ ভাবে মিশ্রিত রহিয়াছে যে তাহাকে সুখ না বলিয়া দুঃখই বলা চলে। ভারত যে বৈরাগী, ভারত যে অদৃষ্টবাদী এই সাংখ্যই তাহার মূল। সেই বৈরাগ্য প্রাবল্যের ফল, বর্ত্তমান হিন্দু চরিত্র। যে কার্য্যপরতন্ত্রতার অভাব আমাদিগের প্রধান লক্ষণ বলিয়া বিদেশীয়েরা নির্দ্দেশ করেন, তাহা সেই বৈরাগ্যের সাধারণতা মাত্র। যে অদৃষ্টবাদিত্ব আমাদিগের দ্বিতীয় প্রধান লক্ষণ, তাহা সাংখ্যজাত বৈরাগ্যের ভিন্ন মূর্ত্তি মাত্র। এই বৈরাগ্যসাধারণতা এবং অদৃষ্টবাদিত্বের কৃপাতেই ভারতবর্ষীয়দিগের অসীম বাহুবল সত্ত্বেও আর্য্যভূমি মুসলমানপদানত হইয়াছিল। সেই জন্য অদ্যাপি ভারতবর্ষ পরাধীন। সেই জন্যই বহুকাল হইতে এ দেশে সমাজোন্নতি মন্দ হইয়া শেষে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। আবার সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ লইয়া তন্ত্রের সৃষ্টি। সেই তান্ত্রিক কাণ্ডে দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে। সেই তন্ত্রের কৃপায় বিক্রমপুরে বসিয়া নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ঠাকুর অপরিমিত মদিরা উদরস্থ করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিলাম বলিয়া, পরম পরিতোষ লাভ করিতেছেন।"

অতি শুভক্ষণে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল; অতি শুভক্ষণে ভগবান তথাগত কহিয়াছিলেন, যদি সাধনা কর, এমন শক্তি পাইবে যে নিজেই নিজের বন্ধন শৃঙ্খল মোচন করিয়া পরিনির্ব্বাণ লাভ করিতে পারিবে। আর কেহই—আর কিছুই তোমাকে সে মুক্তি দান করিতে পারিবে না। যদি নিজে দীপ জ্বালিতে না পার, আর কেহ তাহা জ্বালাইয়া দিবে না—যদি নিজে পথ চিনিতে না পার, তবে আর কেহ তোমাকে সে পথ দেখাইয়া দিবে না। সেই জন্যই ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত মধ্যে যে সময়টি সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র এবং সৌষ্ঠবলক্ষণযুক্ত সেই সময়টিতেই বৌদ্ধধর্ম্ম এই ভারতভূমির প্রধান ধর্ম্ম ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম আত্মশক্তির উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে কহে—পাশ্চাত্য সভ্যতাও কহে জ্ঞানেই শক্তি। কিন্তু হিন্দু সভ্যতা বলে জ্ঞানেই মুক্তি। পাশ্চাত্য জগৎ তাই শক্তিলাভ করিয়াছে—আমরা মুক্তির পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছি তাহা বিশেষরূপে ভাবিবার বিষয়। পাশ্চাত্যেরা ইহকালকে জয় করিয়া বিরাট হইয়াছে; আমরা ইহকালের নিকট ত পরাজয়লাভ করিয়াছিই—পারত্রিকের ফলাফলও ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সেখানে জয় পরাজয় শুধু তর্কের দ্বারাই মীমাংসা করিতে হয়। উহার অন্য মানদণ্ড নাই।

আত্মশক্তির একনিষ্ঠ সাধক, বিশ্বমানবের সহজ ধর্ম্মনিয়ন্তা রাজতপস্বী তাঁহার প্রথম গুরুদ্বয়ের সহিত মুক্তির পথ সম্বন্ধে নানা আলোচনা করিয়া যখন তৃপ্ত হইলেন না—যখন শোণিতসিক্ত বজ্রবেদী তাঁহার হৃদয়ে বেদনার তীব্র শলাকা বিদ্ধ করিতে লাগিল, তখন তিনি কহিলেন—"রক্ত নহে, ফুল।"

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলিক বাদিনং।

অর্থাৎ—

"অক্রোধে জিনিবে ক্রোধে,
অসাধুতা, সাধু আচরণে,
অসত্য জিনিবে সত্যে,
কদর্য্যে করিবে বশ ধনে।"

আজ যে রাজনৈতিক আন্দোলনে ভারতবর্ষ টলমল করিতেছে, এই মহামন্ত্রেই তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবার আয়োজন চলিতেছে।

আরাদ এবং উদ্রককে পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধদেব তাই মতান্তরে সত্যের সন্ধানে চলিলেন। পৃথিবীবিখ্যাত উরুবিল্বর মহাকাননে সে সত্য তাঁহাকে মূর্ত্তি লইয়া দেখা দিল। তিনি সহর্ষে কহিলেন—পাইয়াছি, পাইয়াছি—পুনঃ পুনঃ বড় দুঃখ সহিয়া তবে তোমাকে পাইয়াছি। তাঁহার প্রবুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে শিষ্য-

দিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় নাই। তাহারা এতদিন যে গুরুদেবের মুখের দিকে চাহিয়া মুক্তির আশায় অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা যখন দেখিল, গুরুদেব আর উপবাস ও কৃচ্ছ্রসাধন করেন না—তিনি নন্দের পায়স ও পিষ্টক ভক্ষণ করিতেছেন, তখন তাহারা ভাবিল সিদ্ধার্থের ধর্ম্মতৃষ্ণা নিশ্চিতই লুপ্ত হইয়াছে, তিনি নিশ্চয়ই ধর্ম্মপথ পরিহার করিয়া আবার সুখ লালসায় ব্যস্ত হইতেছেন—আর এস্থানে থাকা নহে। পঞ্চ শিষ্য তখনই বুদ্ধদেবকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। করুণাসাগর বুদ্ধের হৃদয় ব্যথিত হইল বটে, কিন্তু তিনি শিষ্যদিগকে কিছু না বলিয়া, গভীর তত্ত্বচিন্তায় নিযুক্ত হইলেন এবং একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ স্থির করিল—সিদ্ধার্থ আবার সুখের সন্ধানে চলিয়াছেন।

বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পর সিদ্ধার্থ যখন ৪৯ দিবস ধরিয়া নির্জ্জনে মুক্তির সুখ ভোগ করিতেছিলেন, সেই সময় তপুস্‌স এবং ভল্লিক নামক দুই জন ব্যবসায়ীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাহারা দেখিল সম্মুখে এক বিরাট পুরুষসিংহ উপস্থিত। তাঁহার দেহ হইতে এক পবিত্র জ্যোতিঃনির্গত হইতেছে, তাঁহার চরণরেণু স্পর্শে যেন ধরা পবিত্র হইয়া নবীন জীবন লাভ করিতেছে। তাহারা ভক্তিভরে প্রণত হইয়া কহিল, "ভগবান্, আমরা আপনাকেই আশ্রয় করিলাম—আপনার ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিলাম।" ইঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে বুদ্ধদেবের প্রথম শিষ্য। পূর্ব্ববর্ণিত সহম্পতি ব্রহ্মার আগমন ইহার পরে ঘটিয়াছিল বলিয়া কথিত হয়।

ব্রহ্মার অনুরোধে ধর্ম্মপ্রচার করিতে প্রস্তুত হইয়া তথাগত চিন্তা করিতে লাগিলেন—কাহাকে এই সত্যের সন্ধান প্রদান করিব? সহসা তাঁহার সেই "পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু" দিগের কথা স্মরণ হইল। তাহারা যে বহুদিন পর্য্যন্ত তথাগতের শরণাপন্ন থাকিয়া, শেষে চিত্তভ্রমের জন্যই সত্যপথ পরিহার করিয়াছিল। "নির্ব্বাণং পরমং সুখম্"—সে কি তিনি সর্ব্বপ্রথমে তাহাদিগকে না দিয়া থাকিতে পারেন? তাহারা ভ্রান্ত ও গুরু-ত্যাগী বলিয়া কি তিনি তাহাদিগের উপর রাগ করিতে পারে? তিনি যে তখন হৃদয়ে হৃদয়ে জানিয়াছেন—"নত্থি রাগসমো অগ্‌গি নত্থি দোস সমো কলি"—রাগের সমান অগ্নি নাই, হিংসার ন্যায় পাপ নাই। শিষ্যদিগের সন্ধানে তথাগত তখন সারনাথের দিকে অগ্রসর হইলেন!

তাহার পর কত শত বর্ষ অতীত হইয়াছে। যে সত্য একদিন ভারতের গৃহে গৃহে প্রচারিত হইয়াছিল, ভারতের বাহিরেও যাহা একদিন বৃহত্তর ভারতবর্ষ রচনা করিয়াছিল, কালে তাহা ভারতভূমে আর থাকিবার স্থান পাইল না—সিংহল, নেপাল, তিব্বত, চীন, ব্রহ্ম, শ্যাম ক্রমে তাহাকে আশ্রয় দিল, ক্রমে তাহার আলোকে সভ্যতা ও সমাজ গঠন করিয়া তুলিল—এই বজ্রদগ্ধ চৌখণ্ডীর সন্নিকটেই সর্ব্বপ্রথমে সেই মহাসত্য প্রচারিত হইয়া কৌণ্ডিন্যাদি পঞ্চশিষ্যের মুক্তির পথ মুক্ত করিয়াছিল—বিশ্বমানবের দুঃখ দূর করিবার মহামন্ত্র একদিন এই অধুনা অখ্যাত চৌখণ্ডীর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানেই জয়গর্ব্বে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক মার্সাল সাহেব মত প্রচার করিয়াছিলেন। সেই মহাতীর্থের সম্মুখে দাঁড়াইলে কাহার হৃদয় না আবেগে চঞ্চল হইয়া উঠে!

ঠিক কোন্ স্থানে অর্দ্ধ পৃথিবীর মহাগুরুর সহিত তাঁহার প্রথম পঞ্চশিষ্যের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল তাহা জানা যায় না। সেই মহামিলনকে স্মরণ করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে কোন দিন কেহ কোন স্মরণচিহ্ন রচনা করিয়াছিল কিনা তাহার প্রমাণ নাই। চৌখণ্ডী স্তূপ যে সেই ব্যাপারের স্মৃতিচিহ্ন নহে এরূপও কোন প্রমাণ নাই। ইহা অষ্টকোণ বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কেন যে চৌখণ্ডী নামে পরিচিত তাহা বলিতে পারি না। সম্রাট হুমায়ুঁ একবার সারনাথ দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তাহারই স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ সম্রাট আকবর কর্ত্তৃক যে কক্ষটী স্তূপ শীর্ষে রচিত হইয়াছিল আজিও তাহা বর্ত্তমান রহিয়াছে। ওয়টেল

সাহেব মাপিয়া দেখিয়াছেন যে এক সময়ে স্তূপের দৈর্ঘ ২০০ ফিটের কম ছিল না! এখন চূড়া সহ, উহা মাত্র ৮২ ফিটে পর্য্যবসিত হইয়াছে। চূড়ায় উঠিলে চতুর্দ্দিকের ঘন বৃক্ষরাজি ও বিস্তৃত প্রান্তর অতি সুন্দর দেখায়। উত্তরে "ধামেক স্তূপ" ও দক্ষিণে কাশীর "বেণীমাধবের ধ্বজা" পটে অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় নয়নে ভাসে। সম্রাট্ আরাঞ্জেবের কাশীর মসজেদের দুইটী মিনার, এ স্থান হইতে একটী বলিয়া মনে হয়।

স্তূপ শীর্ষের কক্ষ বা টাউয়ারের উত্তরদিকের দ্বারের শিরোভাগে পারস্য ভাষায় উৎকীর্ণ একটি লিপি আছে। তাহা হইতে জানা যায়—সপ্ত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হুমায়ুঁ যিনি এখন স্বর্গে বাস করিতেছেন, একদিন কৃপাপরবশ হইয়া এই স্থানে আসিয়া বসিয়াছিলেন এবং তাঁহার জ্যোতিতে তপনের জ্যোতি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল; সেই কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার পুত্র ও চিরদাস আকবর এই স্থানে নীলগগনস্পর্শী একটি উচ্চ কক্ষ (Tower) নির্ম্মাণ করিতে সঙ্কল্প করেন। ৯৯৬ হিজরিতে এই সুদৃশ্য কক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছে।

স্তূপের পদতলে কিঞ্চিৎ দূরে ইষ্টক নির্ম্মিত একটি বেদী আছে। বেদীর উপর পতাকা উড়িতেছে দেখিলাম। ইহা আধুনিক কালে নির্ম্মিত হইয়াছে। শুনিলাম গ্রাম্য লোকেরা ভূত প্রশমনার্থ এই স্থানে ছাগবলি দিয়া থাকে। দেখিয়া মনে হইল, কালের কি অপরিসীম শক্তি! যে স্তূপ একদিন অহিংসা পরমোধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ পুরোহিতের সম্মানার্থ বহু আড়ম্বরে বিরচিত হইয়াছিল, যাহার চরণ মূলে বসিয়া একদিন কত দিগ্‌দেশের ভিক্ষু ও শ্রমণগণ ভক্তিভরে উচ্চারণ করিয়াছেন—"অক্রোধেন জিনে কোধং"—কোকিলকণ্ঠে জয়দেব যাঁহার জয়ধ্বনি করিয়া একদিন গম্ভীরে মধুরে গাহিয়াছিলেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং।
কেশব ধৃত বুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে ॥

—আজ কি না সেই স্তূপেরই চরণতল ছাগশিশুর তপ্ত শোণিতে নিত্য সিক্ত হইতেছে!

ক্রমশঃ

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

মনের মানুষ

(উপন্যাস)

একবিংশ পরিচ্ছেদ

স্বপ্ন না সত্য?

পরদিন চক্ষু খুলিয়া কুঞ্জ দেখিল, জানালার ফাঁক দিয়া ভোরের আলো প্রবেশ করিতেছে। দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলিয়া সে উঠিয়া বসিল। শয্যা হইতে নামিয়া, দ্বার খুলিয়া বাহির বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু চক্ষু দুইটি তখনও নিদ্রাভারে এমনি পীড়িত যে, আরও খানিক ঘুমাইবার ইচ্ছাকে সে দমন করিতে পারিল না। সুতরাং টলিতে টলিতে আবার বিছানায় আসিয়া গা ঢালিয়া দিল।

পুনরায় যখন কুঞ্জলালের চেতনা হইল, তখন চক্ষু খুলিয়া দেখিল, বাহিরে রৌদ্র উঠিয়াছে, বেলা হইয়া গিয়াছে। একটি হাই তুলিয়া, তিনবার তুড়ি দিয়া জড়িত কণ্ঠে হাঁকিল—"কেষ্টা, তামাক দে।"

"আজ্ঞে যাই"—বলিয়া কেষ্টা বাহির হইতে উত্তর

দিল। কুঞ্জলাল চিত হইয়া চক্ষু মুদিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিল।

এই সময়ে তাহার নগ্নবক্ষে একটি মশক দংশন করিল। "শা—" বলিয়া নিজবক্ষে এক চপেটাঘাত করিয়া, মশা মরিল কি না দেখিবার জন্য, পাণিতল ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া চক্ষু চাহিল। দেখিল, রক্তাক্ত দেহ মৃত মশকটি তাহার চক্ষু হইতে কিছু দূরে নিশ্চলভাবে শূন্যে ঝুলিতেছে! হাতটি নাড়িয়া দেখিল, মশাটিও সঙ্গে সঙ্গে দুলিতেছে; কিন্তু হাত কৈ? তখন হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল, আজ প্রভাতে যে আমার অদৃশ্য হইবার কথা ছিল, তাহাই হইলাম নাকি? নিদ্রাবেশ তাহার চক্ষু হইতে একেবারে ছুটিয়া গেল। বাম হস্তটি তুলিল, তাহাও অদৃশ্য। উঠিয়া বসিয়া, চক্ষু নত করিয়া দেখিল, নিজ বক্ষ, উরুদেশ, পদদ্বয় কিছুই দেখা যাইতেছে না। তখন এক লম্ফে বিছানা হইতে নামিয়া, কিছু দূরে দেওয়ালে টাঙ্গানো আর্শিখানির নিকট গিয়া দাঁড়াইল,—আর্শির মধ্যে বিপরীতদিকের দেওয়ালের প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কিছুই নাই। তখন কুঞ্জলাল আনন্দের আবেগে বলিয়া উঠিল—"জয় মা কালী! সিদ্ধ হয়েছি—অদৃশ্য হয়েছি!"—বলিয়া আবার বিছানায় আসিয়া বসিল।

বসিয়া ভাবিতে লাগিল—"বাবাজী সিদ্ধ পুরুষ সন্দেহ নেই!—বাঃ বাঃ—অঞ্জনের কি চমৎকার গুণ! এতবড় সাড়ে তিনহাত মানুষটা একেবারে অদৃশ্য!—আমি নিজেই আমায় দেখতে পাচ্চিনে! সে ত হল, কিন্তু আজ যে ভোরের গাড়ীতে আমার কলকাতা যাওয়ার কথা ছিল, গাড়ী ত মিস করলাম! উঃ, কি ঘুমটাই ঘুমিয়েছি। মন্ত্রপূত সেই মোদক খেয়ে আর অঞ্জন চোখে কাজল দিয়ে শুলাম, সারারাত একবার ঘুম ভাঙ্গলো না! বেল ১২টায় আগে ত আর গাড়ী নেই—আড়াইটের সময় কলকাতায় পৌছবে। তিনটি দিন মাত্র ত সময়; এরি মধ্যে যা কিছু করে নিতে পারি। তার প্রায় একটা দিন ত দেখছি মাঠেই মারা গেল! ছি ছি—ঘুমিয়ে সব মাটি করে ফেল্লাম! দেখি, আড়াই দিনে এখন কতটা কি করতে পারি!"

এই সময় কেষ্টা বামহস্তে সদ্যজলসিক্ত হুঁকা, দক্ষিণ হস্তে কলিকা লইয়া তাহাতে ফুৎকার দিতে দিতে প্রবেশ করিল। প্রভুর শয্যার পানে চাহিয়া দেখিয়া, "কৈ, বাবু কৈ? মুখ হাত ধুতে বেরিয়ে গেলেন না কি?" বলিয়া হুঁকাটি বৈঠকে বসাইয়া, বারান্দায় বাহির হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। পরে ফিরিয়া আসিয়া, হুঁকার মাথা হইতে কলিকাটি উঠাইয়া লইয়া, ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া হস্তকৌশলে ধূমপান করিতে লাগিল। দেখিয়া কুঞ্জলালের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। "হারামজাদা!—আমার সাক্ষাতেই"—কথাগুলি তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, কিন্তু সে সামলাইয়া লইল। মনে মনে হাসিয়া, ধূমপানরত ভৃত্যের পানে চাহিয়া রহিল।

কেষ্টা মনের সুখে অনেকক্ষণ ধূমপান করিয়া, শেষে একটি লম্বা টান দিয়া, ফুঃ ফুঃ করিয়া মুখ হইতে ধূম নিঃসরণান্তে কলিকাটি হুঁকায় বসাইয়া রাখিল। পরে দর্পণের নিকট গিয়া, কুঞ্জলালের চিরুণী লইয়া মাথাটা বেশ করিয়া আঁচড়াইয়া লইল। বাহির হইয়া আর একবার এদিক ওদিক দেখিয়া আসিয়া, দেওয়ালে টাঙ্গানো কোটের পকেটে হাত দিয়া, একটি সিগারেটের বাক্স বাহির করিয়া তাহা হইতে দুইটি সিগারেট অপহরণ করিল। অবশেষে, "যাই—গাই দোয়া হল কি না দেখি গে।"—বলিয়া, বাহির হইয়া গেল।

কুঞ্জলাল তখন হুঁকা তুলিয়া লইল। কয়েকটান টানিয়া, হুঁকা রাখিয়া বিরক্তিভরে বলিল, "নাঃ—বেটা একেবারে পুড়িয়ে ফেলেছে, কিচ্ছু নেই। অদৃশ্য হওয়ার অসুবিধেও আছে দেখছি।" বিছানা হইতে নামিয়া একটি সিগারেট ধরাইয়া সে বাহির হইয়া গেল। বাগানে প্রবেশ করিয়া, পুষ্করিণীর নির্জ্জন ঘাটে মুখাদি ধৌত করিয়া আসিল। পরে বাড়ী ফিরিয়া বস্ত্রাদি লইয়া, গঙ্গাস্নান করিতে বাহির হইল।

বাড়ী হইতে গঙ্গার ঘাট প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে। যাইতে যাইতে পথে কত পরিচিত লোককে দেখিল,

কিন্তু বলা বাহুল্য, তাহারা কেহই কুঞ্জলালকে কোনও প্রকার সম্ভাষণ করিল না।

স্নান করিতে করিতে কুঞ্জলালের মনে হইল, বাড়ী গিয়া চারিটি ভাত খাইয়া ত বাহির হইতে হইবে; কিন্তু কেহই ত আমাকে দেখিতে পাইবে না, ভাত চাহিলে তাহারা মনে করিবে কি? হয়ত আমাকে ভূত মনে করিয়া ভয় পাইয়া চীৎকার করিবে—ঘোর গোল বাধাইবে। তবে এখন উপায়? খাইব কি? অদৃশ্য হইয়া লাভ ত খুব! আমার তামাক ছিলিমটা কেষ্টা বেটা নিঃশেষে ভস্মসাৎ করিয়া দিয়া 'বৌনি' করিল। মুখ হাত ধুইয়া আসিয়া একটু চা খাওয়া অভ্যাস—তাহাও অদৃষ্টে জুটিল না। দুটি ভাত খাইয়া যে বাহির হইব, তাহারও কোনও ভরসা দেখিতেছি না। ভাল আপদ! তখন হঠাৎ তাহার স্মরণ হইল, বাজারের মধ্যে দিয়া আসিতে দেখিয়াছে হরি ময়রার দোকানে গামলা ভরা বড় বড় পান্তুয়া রসে হাবুডুবু খাইতেছে; স্থির করিল, তাহাই গোটাকতক বাড়ী লইয়া গেলেই চলিবে। দামও লাগিবে না—কি মজা!

স্নান সমাপনান্তে বাজারের পথে কুঞ্জলাল বাড়ী ফিরিতে লাগিল। দোকানের নিকটে আসিয়া দেখিল, ময়রা বুড়া ভিতরদিকে বসিয়া কি করিতেছে, তাহার দশ এগারো বৎসর বয়স্ক ভাগিনেয়টা দোকানদারের আসনে বসিয়া শালপাতার ঠোঙা নির্ম্মাণ করিতেছে। কয়েকজন খরিদ্দার সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। কুঞ্জ দূরে দাঁড়াইল—কাহারও গায়ে গা না ঠেকিয়া যায়। সে লোকগুলি সন্দেশ লইয়া চলিয়া গেলে, কুঞ্জলাল নিকটবর্ত্তী হইয়া, উভয় হস্ত গামলায় ডুবাইয়া গোটা দশ পান্তুয়া থাবা ভরিয়া তুলিয়া, রস গলিবার জন্য ক্ষণকাল ধরিয়া রহিল। পরে হাত দুটিতে দুই একবার ঝাঁকানি দিয়া, পশ্চাৎ ফিরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

সেই মুহূর্ত্তে বালকটা চীৎকার করিয়া উঠিল—"ও মামা, পান্তুয়া পালালো—পান্তুয়া পালালো—শীগ্‌গির এস।"

শুনিয়াই কুঞ্জলালের মনে পড়িয়া গেল, বাবাজী বলিয়াছিলেন, হস্তলগ্ন কোনও দ্রব্যকে অদৃশ্য করিতে হইলে বীজমন্ত্রটি একবার জপ করিয়া, 'অদৃশ্য হউক' মনে মনে এইরূপ ইচ্ছা করিতে হইবে; ইচ্ছামাত্র জিনিষটিও লোকলোচনের অদৃশ্য হইয়া যাইবে। সুতরাং সে তৎক্ষণাৎ সেই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিল, এবং দোকানে কি মজাটা হয় দেখিবার জন্য তফাতে দাঁড়াইল।

বালকের চীৎকারে তাহার মাতুল আসিয়া বলিল, "কিরে, কি হয়েছে?"

বালক বলিল, "মামা, কতকগুলো পান্তুয়া পালাচ্ছে!"

"পান্তুয়া পালাচ্ছে কি রে?"

"ঐ যে, কৈ আর ত দেখতে পাচ্ছিনে।"

মামা বলিল, "কি বলছিস, পাগল হয়েছিস নাকি?"

"না মামা, পাগল কেন হব? আমি স্বচক্ষে দেখলাম যে! গোটা আষ্টেক দশ পান্তুয়া, গামলা থেকে তড়াক করে নাপিয়ে উঠলো; উঠে খানিক নাচলে; নেচে, উড়তে উড়তে ঐ দিকে চলে যাচ্ছিল। কৈ, আর ত দেখতে পাচ্ছিনে!"

ময়রা প্রায় অর্দ্ধ মিনিটকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর "হতভাগা পাজি! আমার সঙ্গে ইয়ার্কি!"—বলিয়া বালকের গালে ঠাস করিয়া এক চড় কষাইয়া দিল।

বালক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "আমি নিজের চক্ষে দেখলাম যে! অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ!"

মামা ভেঙাইয়া বলিল, "নিজের চক্ষে দেখলি, পান্তুয়া নাফিয়ে উঠে নাচতে নাচতে উড়ে গেল! গাঁজা টাজা কিছু খেয়েছিস না কি?"—বলিয়া আর এক চড়।

বালক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "গাঁজা খাব কেন? আমি কি গাঁজা খাই? নিজের চক্ষে দেখলাম! পিত্যয় না হয়, ঐ দেখ না, আস্তায় এখনও অস পড়ে নয়েছে।"

হরি ময়রা ঝুঁকিয়া দেখিল, দোকানের নিম্নেই খানিকটা স্থান রসে ভিজিয়া রহিয়াছে—এবং সেখান হইতে কিছুদূর অবধি রাস্তার ধূলার উপর যেন রসের ছড়া দেওয়া। দেখিয়া ময়রা দোকান হইতে নামিল, এবং ঝুঁকিয়া দাগগুলা পরীক্ষা করিয়া বলিল, "রসই ত বটে!" রসের চিহ্ন অনুসরণ করিতে করিতে ময়রা এইদিকে আসিতেছে দেখিয়া, কুঞ্জলাল তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল। যাইতে যাইতে মনে তাহার দুঃখ হইতে লাগিল—আহা, আমারই জন্যে ছোঁড়াটা বিনাদোষে মার খেলে।

পান্তুয়া হস্তে কুঞ্জলাল গৃহে পৌঁছিয়া দেখিল, তাহার শয়নকক্ষের যে দ্বার বহির্ব্বাটীতে খুলিয়াছে, তাহাতে তালা বন্ধ। দেখিয়া সে অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিল, "এই মাটী!" তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, অন্তঃপুরাভিমুখী দ্বারটি খোলাই আছে। ধীরে ধীরে দ্বারের নিকট গিয়া উঁকি দিয়া দেখিল, ভিতরে কেহ নাই। এই সময়ে কেষ্টা ভৃত্যের গলা শুনিল, "না মা, আমারই শুন্‌তে ভুল হয়েছিল। বাবুকে সব জায়গাতেই ত খুঁজে এলাম, কোথাও ত দেখ্‌তে পেলাম না।"

গৃহিণী বলিলেন, "আমি ত তোকে আগেই বলেছিলাম, ভোরের গাড়ীতে তার কলকাতায় যাবার কথা ছিল, তাই গিয়ে থাক্‌বে। তুই বল্লি না মা, বেলা ৭টার সময় বাবু তামাক চাইলেন। সেই কথা শুনেই ত আমার সন্দেহ হল।"

কেষ্টা বলিল, "আমারই বোধ হয় ওটা শোনবার ভুল হয়েছিল মা। ডিস্পেন্সারি ঘর খুলে ঝাট দিচ্ছিলাম, ঠিক মনে হল যেন বাবুর গলা শুন্‌লাম—কেষ্টা তামাক দে। তামাক সেজে নিয়ে গিয়ে কিন্তু বাবুকে আর দেখতে পাইনি।"

গৃহিণী বলিলেন, "তুই স্বপন দেখেছিলি!"

কুঞ্জ তখন নিশ্চিন্ত লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। পান্তুয়াগুলি একটা পাত্রে রাখিয়া, হাত ধুইয়া ভিজা কাপড় গামছা লুকাইয়া ফেলিল। নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া, একটা সিগারেট ধরাইয়া কলিকাতা যাওয়া সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিল। বিছানা বাক্স এসব কিছুই লইয়া যাওয়া চলিবে না। অদৃশ্য আরোহী কুলি ডাকিব, গাড়ী ভাড়া করিবে কি করিয়া? রাত্রে শয়ন—গ্রীষ্মকাল, যেখানে খুসী শুইয়া রাত কাটাইতে পারা যাইবে। আহার—ছুটি ভাত জুটিবার কোনও আশা নাই; বাজারের খাবার এবং ফলমূল খাইয়া কাটাইতে হইবে। স্নান জন্য একখানা দ্বিতীয় বস্ত্র চাই বটে—স্নানটি প্রত্যহ না করিলে প্রাণ ত বাঁচিবে না। আর, আসল কার্য্যের জন্য একটা থলিয়া লইয়া যাইতে হইবে। টাকা মোহর—এ সবের পানে নজর করিলে চলিবে না, অল্পেই ভারি হইয়া উঠিবে। হীরা চুনি পান্না মোতি জহরৎ—এই সবই বেশী লইতে হইবে—এবং দশ টাকার নোট। থলি এখন হঠাৎ পাওয়া যায় কোথা? বালিসের ওয়াড় একটা খুলিয়া লইয়া গেলে হয় না? কিন্তু কিন্তু উহা ত মজবুদ হইবে না, অধিক জিনিষ ভরিলে ত ছিড়িয়া যাইতে পারে। তার চেয়ে বরং একটা ব্যাগ—তাও আবার চামড়ার ব্যাগ হইলে চলিবে না—কারণ বাবাজী বলিয়াছেন, চামড়ার জিনিষ অপবিত্র, তাহা মন্ত্রপ্রভাবে অদৃশ্য হইবে না। চিনাবাজারে ক্যাম্বিসের ব্যাগ বিক্রয় হয়, তাই প্রথমে একটা সংগ্রহ করিতে হইবে।

এই সময় কিছু দূরে রক্ষিত পান্তুয়াগুলির প্রতি কুঞ্জলালের নজর পড়িল—সেগুলি দিব্য দেখা যাইতেছে। "এই সর্ব্বনাশ করলে!"—বলিয়া কুঞ্জ তাড়াতাড়ি তক্তপোষ হইতে নামিয়া, পাত্রটি হাতে তুলিয়া লইয়া আবার মন্ত্রোচ্চারণ করিল, সেগুলি অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন ভাবিল, আমার হস্তচ্যুত হইলেই অদৃশ্য জিনিষ পুনরায় দৃশ্যমান হইবে, এও ত মহা মুস্কিলের কথা! কেহ যদি এ ঘরে আসিয়া পান্তুয়াগুলি ওখানে দেখিতে পাইত! এগুলা শেষ করিয়াই ফেলি।

সে তখন সেইখানে দাঁড়াইয়া পান্তুয়া ভোজন আরম্ভ করিয়া দিল। ভোজনান্তে কলসী হইতে জল গড়াইয়া

পান করিয়া, হাত মুখ ধুইয়া গেলাসটী রাখিয়াছে, এমন সময় কিরণ সেই কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার হস্তে তালা চাবি—তাহা টেবিলের উপর রাখিয়া, ঘরের চারিদিকে চাহিতে লাগিল। কুঞ্জ এক কোণে দাঁড়াইয়া, বালিকা কি করে তাহাই দেখিতে লাগিল।

কিরণ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, প্রথমে তক্তপোষের নিকট গেল। বিছানাটি ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া, বালিসগুলির ওয়াড় সমান করিয়া দিয়া, শেষে তোষক শতরঞ্চ শুদ্ধ সমস্ত বিছানা গুটাইয়া মাথার কাছে জমা করিল। তাহার পর, টেবিলের কাছে আসিয়া জিনিষপত্রগুলি গুছাইয়া রাখিল। আলনার কাছে গিয়া জামা কাপড়গুলি পাড়িয়া ভাঁজ করিতে লাগিল; বোধ হয় এগুলি এখানে রাখিবে না, ভিতর বাড়ীতে লইয়া যাইবে। ভাঁজকরা জামা কাপড়গুলি টেবিলের উপর রাখিয়া, দেওয়ালে যেখানে কুঞ্জলালের বাঁধানো ফোটোগ্রাফখানি টাঙ্গানো ছিল, সেই দিকে চাহিয়া রহিল। নিকটে গিয়া ফোটোগ্রাফটি পাড়িতে চেষ্টা করিল, কিন্তু নাগাল পাইল না। চেয়ার টানিয়া লইয়া গিয়া তাহাতে উঠিয়া ছবিখানি পাড়িল। ছবির ফ্রেমে অনেকদিনের ধুলা জমিয়াছিল. প্রথমে বেশ করিয়া তাহা ঝাড়িয়া ফেলিল। তাহার পর, কাচখানির উপর হাই দিয়া, নিজ আঁচল ঘষিয়া তাহা পরিষ্কার করিতে লাগিল। কুঞ্জ বালিকার কার্য্য কলাপ ভাল করিয়া দেখিবার অভিপ্রায়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তাহার খুব কাছে গিয়া দাঁড়াইল। কাচখানি বেশ পরিষ্কার হইলে, কিরণ ছবিখানির প্রতি চাহিয়া রহিল। মাঝে মাঝে শঙ্কিত নেত্রে মুক্তদ্বারে পানে চাহে, আবার ছবিখানি দেখে। কিছুক্ষণ এই রূপে কাটিলে, কিরণ মস্তক অবনত করিয়া, ছবিতে যেখানে পা দুখানি সেইখানে মাথা ঠেকাইল। তাহার পর ছবিখানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। আবার তাহা তুলিয়া, সেখানি দেখিতে লাগিল। তাহার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, চেয়ারে উঠিয়া, যথাস্থানে সেটি টাঙ্গাইয়া রাখিল।

চেয়ার পূর্ব্বস্থানে রাখিয়া কিরণ সেই ভাঁজকরা জামা কাপড়গুলি বগলে করিয়া, তালাচাবি হাতে লইল। কুঞ্জ বুঝিল, এইবার বাহির হইয়া দ্বারে তালা বন্ধ করিবে—তৎপূর্ব্বেই আমার বাহির হইয়া পড়া প্রয়োজন। সুতরাং সে ক্ষিপ্রপদে দ্বারপথে বাহির হইয়া উঠানে দাঁড়াইল। কিরণও বাহির হইল; তালাটি চৌকাঠের উপর রাখিয়া, কাপড়গুলি লইয়া বড় ঘরের দিকে চলিয়া গেল। সেগুলি রাখিয়া ফিরিয়া আসিয়া, দ্বারে শিকল টানিয়া তালা বন্ধ করিয়া দিল।

কেষ্টা ভৃত্য এই সময় একটা পিতলের 'ঘড়ায় পানীয় গঙ্গাজল লইয়া অঙ্গনে প্রবেশ করিল। কিরণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেষ্টো, মাসিমা কতদূর ?"

কেষ্টা বলিল, "তাঁর চান হয়ে গেছে, এলেন বলে।"

"আচ্ছা, তুমি ততক্ষণ কয়লা ধরিয়ে ফেল; আমিও নাইবার যোগাড় দেখি।" বলিয়া কিরণ ভাণ্ডার ঘরের দিকে চলিল। পান্তুয়া খাইয়া অবধি পাণ খাইবার জন্ত কুঞ্জলালের একটা লালসা জন্মিয়াছিল; ডাবরে যদি সাজা পাণ থাকে তবে লইবে, এই অভিপ্রায়ে কুঞ্জও কিরণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভাণ্ডার ঘরে গেল।

কুলুঙ্গি হইতে কিরণ তেলের বাটি, চিরুণী প্রভৃতি যখন পাড়িতেছিল, সেই অবকাশে কুঞ্জলাল পাণের ডাবরে হাত পূরিল। অন্তান্ত দিন এই সময় ডাবরে সাজা পাণ থাকে, কুঞ্জকে চা দিবার সময়ই কিরণ গোটাকতক পাণ সাজিয়া রাখে। আজ আর কাহার জন্ত সাজিবে ? সুতরাং সাজা পাণ তাহাতে একটিও নাই। অগত্যা সুপারি ও অন্তান্ত মশলা কিছু লইয়া কুঞ্জ মুখে ফেলিয়া দিল।

পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, কিরণ মেঝের উপর তেলের বাটি ও চিরুণী রাখিয়া, চুল খুলিতে বসিয়াছে। ইচ্ছা হইল বলে, "কিরণ, আগে দুটো পাণ সেজে দে, তার পর তেলহাত করিস।"—কিন্তু তাহা বলিলেই ত চক্ষুস্থির। সুতরাং সে মশলা চিবাইতে চিবাইতে

ক্ষুণ্ণ মনে সেস্থান ত্যাগ করিল, এবং গৃহের বাহির হইয়া ষ্টেশনের অভিমুখে পা চালাইয়া দিল।

বাজারের মধ্য দিয়াই ষ্টেশনে যাইবার পথ। পূর্ব্বোক্ত ময়রার দোকানের নিকটে আসিয়া, কুঞ্জলাল দাঁড়াইল। দেখিল, সেই পান্তুয়ার গামলা অর্দ্ধেকটা খালি হইয়া গিয়াছে—খরিদ্দারে লইয়া গিয়াছে। দাঁড়াইয়া সে ভাবিতে লাগিল, "দশ দশটা পান্তুয়া—পাঁচ আনা পয়সার মাল—একদম ফাঁকি দিয়েই খেলাম! এ ত, যাকে চুরি বলে, অবিকল তাই, তবে ধরার উপায় নেই এই যা! নাঃ, কাযটা অন্যায়ই হয়েছে।" ভাবিয়া পকেট হইতে দুইটা চৌকা দুয়ানি এবং একটা এক আনী বাহির করিয়া, হরি ময়রা যেখানে বসিয়া সন্দেশ বেচিতেছিল, সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া দিল। নিকেল খণ্ডগুলি পতনের টক্ টক্ শব্দে ময়রা চকিত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিল এবং সেগুলি কুড়াইয়া ছাপ্পরের দিকে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে হাঁকিল—"হেরো—হেরো!"

"কি মামা"—বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বালক হারাধন বাহির হইয়া আসিল।

দাঁত মুখ খিচাইয়া মোদক জিজ্ঞাসা করিল, "পয়সা চুরি করে কোথায় রেখেছিলি?"

হেরো বলিল, "পয়সা? কিসের পয়সা?"

মোদক ভেঙাইয়া বলিল, "কিসের পয়সা? ন্যাকা! বিক্রির পয়সা আবার কিসের পয়সা! পয়সা চুরি করে' ঐ চালের বাতায় গুঁজে রেখেছিলি?"

বালক ভীতকণ্ঠে বলিল, "না আমি পয়সা চুরিও করিনি, চালের বাতায় গুঁজেও রাখিনি।"

"তবে টপ্ টপ্ করে পড়ল কেন? এই ত্থাখ, দুটো দোয়ানী একটা এক আনী!"—বলিয়া বালকের কর্ণ ধারণ করিল।

বালক কান্নার সুরে এ অপবাদের ঘোর প্রতিবাদ করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদয় হইল না। ক্রুদ্ধ মাতুল তাহার গালে ঠাস ঠাস করিয়া দুই তিন চড় কষাইয়া দিল। বালক তারস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। কুঞ্জলাল প্রথমাবধি আপন মনে হাসিতেছিল; কিন্তু নিরপরাধ বালকের উপর এই প্রহার দেখিয়া, তাহার মনটা খারাপ হইয়া গেল। মাতুল বলিতে লাগিল, "ফের যদি কখনও চুরি করিস, তবে মেরে তোর হাড় এক জায়গায় মাস একজায়গায় করে দেবো পাজি নচ্ছার উল্লুক শূয়ার।"

কুঞ্জলাল ধীর গতিতে তথা হইতে প্রস্থান করিল। মনকে এই বলিয়া বুঝাইল, ছেলেটা নিশ্চয়ই আর পাঁচবার চুরি করিয়াছে, আজিকার এ প্রহারটা, খুব সম্ভব তাহার বকেয়া পাওনা মাত্র।

যথাসময়ে কুঞ্জ ষ্টেশনে পৌছিল। কলিকাতাগামী গাড়ীখানি প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া দাঁড়াইলে সে দেখিল, তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণীতে খুব ভিড়, দ্বিতীয় শ্রেণীরও উভয় কামরায় লোক আছে, তবে দুই তিনজন করিয়া মাত্র। প্রথম শ্রেণী একবারে খালি। একবার মনে করিল, উহাতেই ওঠা যাক্। আবার ভাবিল, অদৃশ্য হস্তে গাড়ীর দরজা খোলা ও বন্ধ করিবার সময় যদি কেহ দেখে ত মুস্কিল হইবে। এই সময় দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন মাড়োয়ারি আরোহী দ্বার খুলিয়া লোটা হাতে করিয়া নামিয়া পড়িল এবং "পানি পাঁড়ে পানি পাঁড়ে" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কুঞ্জ এই সুযোগে গাড়ীতে উঠিয়া পড়িয়া, ঐকখানি খালি বেঞ্চিতে এক পাশে স্থান গ্রহণ করিল।

গাড়ী ছাড়িলে তাহার মনে হইল, "এই রকম বিনা টিকিটে রেল কোম্পানিকে ফাঁকি দিয়ে যাচ্চি, এটা কি ভাল হচ্চে? তা, রেল কোম্পানির ক্ষতিই বা কি? আমি না চড়লে কি তার এক ছটাক কয়লা কম পুড়ত? না একজন কর্ম্মচারীকে মাইনে এক পয়সা কম দিলে চলত? যদি কারু কিছু ক্ষতি না করে, নিজের কিছু সুবিধে আমি করে নিতে পারি, তাতে অন্যায়টা কি হয়?"

আড়াই দিনে কি প্রণালীতে কার্য্য করিয়া কুঞ্জ বড়লোক হইবে, অতঃপর সেই চিন্তায় ব্যাপৃত হইল। কিন্তু মনটা কিছুতেই প্রসন্ন হইতেছিল না।

"বড়লোক হব, সেও ত পরের জিনিস অপহরণ করে? ছি ছি!—শেষকালে কি চৌর্য্যবৃত্তি—পরের সর্ব্বনাশ!"

অনেকক্ষণ অদৃশ্য ম্লান মুখে বসিয়া কুঞ্জ এই বিষয়ে নানা চিন্তা করিল। অবশেষে মীমাংসা হইল, এই রেলে চড়ার প্রিন্সিপলেই কায করিতে হইবে। যাহার অপরিমিত আছে, তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র লইব। পুকুরের জল দুই এক কলসী কম হইলে, যেমন জানিতে পারা যায় না—যাহার লইব, সেও সেইরূপ জানিতেও পারিবে না যে তাহার গিয়াছে। পরের অনিষ্ট না করিয়া নিজে যদি লাভবান হইতে পারি, তাহাতে তেমন অধর্ম্ম হইবে না,—সেই চেষ্টা করিতে হইবে।

এইরূপ স্থির করিয়া মন একটু সুস্থ হইলে, বাড়ীর কথা সে ভাবিতে লাগিল—বিশেষ কিরণের কথা,—যাত্রার পূর্ব্বে কিরণের আচরণ যাহা দেখিয়া আসিয়াছিল, সেই কথা। এ অবস্থায়, "পরের অনিষ্ট না করিয়া" নিজে বড়লোক হইলেও, কিরণকে ভাসাইয়া দিয়া ইন্দুকে বিবাহ করা কি উচিত হইবে? আবার এদিকে ইন্দু যদি সেই বাল্যপ্রেম আজিও হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখিয়া থাকে, তবে কিরণকে বিবাহ করিলে কি মহা বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে না? হাঁ হাঁ—সেইটাই ত প্রধান অনুসন্ধানের বিষয়,—সেই অনুসন্ধানের জন্যই ত অদৃশ্য হইয়া কলিকাতায় যাইতেছি, টাকা লুটিবার জন্য ত নয়! ঠিক ঠিক—এ কথাটা এতক্ষণ কেন আমার মনে পড়ে নাই। না না—আমি একটা চোর বদমায়েস নহি—আমি ভাল লোক, ভদ্রলোক।"—কুঞ্জলালের আত্মগ্লানি এইরূপে বিদূরিত হইয়া ক্রমে, তাহার চিত্ত-প্রসাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতায়।

বেলা আড়াইটার সময় ট্রেণ হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিল। অন্য আরোহী দুইজনের পশ্চাৎ কুঞ্জ প্ল্যাটফর্ম্মে নামিল। বৈশাখের রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। কয়েকখানা ঠিকাগাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল। এক ব্যক্তি আসিয়া পটলডাঙ্গা যাইবার জন্য একখানি গাড়ী ভাড়া করিল; কুঞ্জ আস্তে আস্তে সেই গাড়ীর পশ্চাৎ দিকে সহিসের পা-দানে গিয়া বসিয়া পড়িল—ইচ্ছা, বড়বাজারে নামিয়া যাইবে।

বড়বাজারের মধ্যে গিয়া ভিড়ের জন্য গাড়ীটা দাঁড়াইতেই, কুঞ্জলাল নামিয়া পড়িল। নিকটেই একটা বড় মোকিম বা রত্নবিক্রেতার দোকান ছিল, দ্বারে বন্দুক ঘাড়ে করিয়া সিপাহী দাঁড়াইয়া আছে। কুঞ্জ নিঃশব্দে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। বড় বড় গ্লাসকেসের ভিতর রাশি রাশি স্বর্ণালঙ্কার রহিয়াছে, কিন্তু চাবি বন্ধ—ছুঁইবার যো নাই। হীরা, মোতি, পান্না—এ সব জিনিষ কোথায় আছে তাহা কুঞ্জ দেখিতে পাইল না। অপেক্ষা করিল—খরিদ্দার আসুক, গ্লাসকেস খোলা হইলে, দুই একটা জিনিষ তুলিয়া লইবে। দোকানের প্রধান কর্ম্মচারী যেখানে বসিয়া আছেন, সেখানে গিয়া দেখিল, কাগজ ও খাতাপত্রই আছে, অপহরণের উপযুক্ত কিছুই নাই। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর, দুইজন খরিদ্দার আসিয়া একটা জড়োয়া নেকলেস চাহিল। একজন কর্ম্মচারী খরিদ্দারদিগকে লইয়া, একটা গ্লাস কেস খুলিল। চাবি খুলিবার জন্য কর্ম্মচারী গ্লাসকেসের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ছিল; কুঞ্জ একটা প্রান্তে, কোণের কাছে দাঁড়াইল। গ্লাসকেসের ডালা উঠিবামাত্র, কুঞ্জ তাহার মধ্যে হাত ভরিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ভেলভেটের কেসশুদ্ধ একটা জড়োয়া সাঁথি উঠাইয়া লইল।

ইতিপূর্ব্বে সে স্থির করিয়াছিল একস্থান হইতে অধিক দ্রব্য লইবে না; কিন্তু এই দোকানের চাকচিক্যময় দ্রব্যসম্ভার দেখিয়া লোভবশতঃ সে অপেক্ষা করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অন্য এক খরিদ্দার আসিয়া, হীরার আংটি দেখিতে চাহিল। একটা গ্লাসকেসের মধ্যে অনেক আংটি রহিয়াছে কুঞ্জ ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছিল; সে ধীরে ধীরে গিয়া সেই গ্লাসকেসের প্রান্তভাগে দাঁড়াইল। কর্ম্মচারী সেই গ্লাসকেস খুলিতেই, কুঞ্জ

হাত ঢুকাইয়া বাক্সশুদ্ধ চারিটি আংটি পূর্ব্বোক্ত বিধানে বাহির করিয়া লইল। সেগুলি পকেট রাখিয়া তাহার মনে হইল, আর না, একস্থানে যথেষ্ট হইয়াছে, এইবার সরিয়া পড়া যাউক। কিন্তু লোভ তাহাকে সেস্থান পরিত্যাগ করিতে দিল না। দোকানের মধ্যে সে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে একজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রধান কর্ম্মচারী দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং "মহারাজা সাহেব" বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। দোকানের মালিক স্বয়ং দ্বিতল হইতে নামিয়া আসিয়া মহারাজকে অভিবাদন করিলেন। মহারাজ ভাল একছড়া মোতির মালা দেখিতে চাহিলেন। রত্নবণিক তাঁহাকে বসাইয়া, স্বয়ং গিয়া লোহার সিন্দুক খুলিয়া, ১০।১২টা বাক্স আনিয়া, সেগুলি খুলিয়া একে একে মহারাজকে দেখাইতে লাগিলেন। কতকগুলি দেখিয়া, "মামুলি" বলিয়া মহারাজ ঠেলিয়া রাখিলেন। বণিক তখন অন্যান্য বাক্স আনিবার জন্য গেলেন। যেগুলি দেখা হইয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে সুবিধামত একটা বাক্স কুঞ্জ উঠাইয়া লইল। কিন্তু মন্ত্রোচ্চারণ সত্ত্বেও সে বাক্সটা দৃশ্যমানই রহিয়া গেল! দেখিয়া কুঞ্জ সভয়ে সেটি হাত হইতে ছাড়িয়া দিল, বাক্সটি মেঝের উপর পড়িল। কুঞ্জ চাহিয়া দেখিল, উহার কেসটি সাধারণ মখমলে মণ্ডিত নহে, মরক্কো চামড়ায় প্রস্তুত।

বাক্স পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান কর্ম্মচারী বলিয়া উঠিল—"আ-হাঃ" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া বাক্স কুড়াইয়া লইল। মহারাজ বলিলেন, "ক্যা তাজ্জব! বকস্ উছ্‌লা কেঁও?"

প্রধান কর্ম্মচারী সবিস্ময়ে বলিল, "উছ্‌লা?"

মহারাজ বলিলেন, "জরুর উছ্‌লা, হাম আপনা আঁখসে দেখা।"

একটা সোরগোল উপস্থিত হইল, অন্যান্য কর্ম্মচারীরা ছুটিয়া আসিল। কুঞ্জ, পাছে কেহ তাহার পা মাড়াইয়া দেয়, এই ভয়ে একটু সরিয়া দাঁড়াইল। সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "কি হইয়াছে?"

গোলমাল শুনিয়া দোকানের মালিক, লোহার সিন্দুক বন্ধ করিয়া ছুটিয়া আসিলেন। কর্ম্মচারী বলিল, "আমি মনে করিয়াছিলাম, বাক্সটি টেবিলের অত্যন্ত ধারে রাখা হইয়াছিল বলিয়া পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু মহারাজ বাহাদুর বলিতেছেন, বাক্সটি লাফাইয়া পড়িয়াছে।"

মহারাজ বলিলেন, "আমি সেই সময় ঐ বাক্সটির পানে চাহিয়া ছিলাম। ধারে রাখা ছিল না। বাক্সটি স্বয়ং লাফাইয়া নীচে পড়িয়াছে।

রত্নবণিক নিজ কর্ম্মচারীর কথাই বিশ্বাস করিলেন, বুঝিলেন, মহারাজের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়াছে। কিন্তু তিনি বুদ্ধিমান, সে কথা প্রকাশ না করিয়া, মুক্তামালাটি বাক্স হইতে বাহির করিয়া গভীর মনোযোগের সহিত তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহারাজ বলিলেন, "মোকিম সাহেব, মুক্তা লাফায় ইহা আমি এই প্রথম দেখিলাম। আপনি কখনও দেখিয়াছেন?"

সুচতুর রত্নবণিক মনোমধ্যে কি একটা ভাবিয়া লইলেন। পরে সবিনয়ে বলিলেন, "না হুজুর, এ তাঁবেদারও কখনও দেখে নাই, তবে শুনিয়াছে বটে।"

"আপনি কি শুনিয়াছেন?"

"শুনিয়াছি যে এক প্রকার অতি উচ্চশ্রেণীর মুক্তা আছে, দেখিতে তেমন সুদৃশ্য নয়, মহার্ঘ বলিয়াও মনে হয় না, কিন্তু গুণে অসাধারণ—তাহারা 'জিন্দা' অর্থাৎ জীবিত মুক্তা। রত্নবণিকদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে এরূপ একটা প্রবাদও প্রচলিত আছে বটে; কিন্তু আমি কখনও জিন্দা মুক্তা দেখি নাই, অপর কেহ দেখিয়াছে এরূপ শুনিও নাই। এতদিন এটা আমরা অলীক কথা বলিয়াই মনে করিতাম। কিন্তু হুজুর যখন বলিতেছেন—"

মহারাজ বলিলেন, "আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি মোকিম সাহেব! এই ত বাক্সটি রহিয়াছে, ঠিক এই রকম করিয়া" (মহারাজ বাক্স হস্তে লইয়া দেখাইলেন) "ঠিক এই রকম করিয়া বাক্স প্রথমে লাফাইয়া উঠে

উঠিল। তাহার পর, এই ভাবে পড়িয়া গেল।”—বলিয়া মহারাজও বাক্স খুলিয়া মুক্তাগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। শেষে বাক্সটি রাখিয়া বলিলেন, “এ’ত ভারি আশ্চর্য্য ব্যাপার। কিন্তু এরূপ লাফাইয়া পড়িয়া গেল কেন?”

রত্নবণিক সবিনয়ে বলিল, “তাহার কারণ ত হুজুর খুবই স্পষ্ট। আপনি উহাদের দেখিয়া, নাপছন্দ করিয়া, মামুলি বলিয়া ঠেলিয়া রাখিলেন, তাই অভিমানে ওরা মাটীতে পড়িল।”

মহারাজ বাহাদুর কথাটা শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, “আচ্ছা, এই ছড়াটিই আমি লইব। ইহার মূল্য কত মোকিম সাহেব?”

মোকিম অবনত বদনে একটু হাসা করিয়া, মুখ তুলিয়া করযোড়ে কহিল, “জিন্দা মুক্তা, ইহারা অমূল্য। তবে হুজুর মেহেরবানী করিয়া বখ্‌সিস যাহা ফরমায়েস করেন।”

মহারাজ বলিলেন, “দশ হাজার পাইলে বোধ করি তুমি খুসী হও?”

“হেঁ হেঁ” করিয়া হাসিয়া, মোকিম মাথাটি নীচু করিয়া রহিলেন।

মহারাজ তাহার ভাব দেখিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, পনেরো হাজার পাইলে খুসী হও ত?”

মোকিম করযোড়ে কহিল, “হুজুর, ও মুক্তামালা ত আপনারই। তবে আমরা গরীব, হুজুরের দ্বারাই পরবস্তি হইয়া থাকি, সেইটা খেয়াল-মবারকে থাকিলেই ধন্য হই।”

মহারাজ বলিলেন, “আচ্ছা, বিশ হাজার পাইবে। আর কথা কহিও না। কাল আমার কোঠীতে যাইও, টাকা লইয়া আসিও।”—বলিয়া মহারাজ বাক্সটি পকেটে লইয়া, উঠিলেন। মোকিম ও তাহার কর্ম্মচারীরা গিয়া সেলাম করিতে করিতে তাঁহাকে মোটর গাড়ীতে উঠাইয়া দিল।

কুঞ্জ, সকলের পশ্চাতে আসিয়া গাড়ীবারান্দায় দাঁড়াইল। মহারাজের দিকে চাহিয়া মনে মনে হাসিয়া বলিল, “নিয়ে যাও তোমার জিন্দা মুক্তা। আর ও লাফাচ্ছে না কিন্তু—ইহজনমে না।”

রাজার মোটর চলিয়া গেল। কুঞ্জ, রত্নবণিকের হাস্যপ্রফুল্ল মুখমণ্ডলের পানে চাহিয়া আপন মনে বলিল, “এই আংটি ফাংটি নিয়ে তোমার যা লোকসান করেছিলাম, তার চার ডবল তোমায় পাইয়ে দিলাম—তুমি আমায় শাপ দিও না দাদা!”

কুঞ্জ আর ভিতরে না গিয়া রাস্তায় নামিল। তাহার বড় ক্ষুধা বোধ হইতেছিল। পঠদ্দশায় উপভুক্ত দীনু ময়রার স্পঞ্জ রসগোল্লার কথা স্মরণ হইবামাত্র, সে পূর্ব্বাভিমুখে পদচালনা করিল।

ময়রার দোকানে পৌঁছিয়া দেখিল, খরিদ্দারের এত ভীড় যে গামলা হইতে রসগোল্লা তুলিতে গেলে অন্য মানুষের গায়ে গা ঠেকিয়া যায়। খানিক অপেক্ষা করিয়া, সেখান হইতে সে প্রস্থান করিল। অন্য এক দোকান হইতে কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিয়া, গোলদীঘির ধারে গিয়া বসিয়া, মুখ হাত ধুইয়া, আহার ও জলপান করিয়া একটু সুস্থ বোধ করিল।

গোলদীঘি হইতে বাহির হইয়া, সম্মুখে সেনেট হল দেখিয়া ভাবিল, রাত্রে আসিয়া ইহারই বারান্দায় শয়ন করিয়া থাকিলে মন্দ হয় না। কিন্তু শুধু মাটীতে শুইব কি করিয়া? হ্যাঁ, ঠিক হইয়াছে। দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিঙের বারান্দায় দ্বারবানদের বসিবার বেঞ্চি থাকে, সেই বেঞ্চি খান দুই একত্র করিয়া তাহার উপর শুইলেই চলিবে। রাত্রি ১০টা ১১টার সময় আসিয়া শয়ন করিব। কিন্তু এখন দিনের আলোয় দেখিয়া রাখা ভাল।

এই ভাবিয়া কুঞ্জ দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিঙে প্রবেশ করিল। দেখিল বেঞ্চি আছে বটে। কিন্তু নীচে মশা ধরিবে—দ্বিতলে বা ত্রিতলে যদি শুইবার সুবিধা থাকে, দেখিবার জন্য সে সিঁড়ি দিয়া ত্রিতলে উঠিয়া গেল।

দেখিল, ঘরে ঘরে ল-কলেজের ছাত্রগণ, অধ্যাপকের নিকট বক্তৃতা শুনিতেছে। দুই একটা ঘরে প্রবেশ করিয়া একটু শুনিল, কিন্তু আইনের বক্তৃতা তাহার

ভাল লাগিল না। দ্বিতলে নামিয়া এক স্থানে গিয়া দেখিল, দ্বারে পর্দ্দা ফেলা রহিয়াছে, বাহিরে চাপরাশি বসিয়া আছে। কৌতূহল বশতঃ সেই কক্ষের পর্দ্দা সামান্য মাত্র সরাইয়া প্রবেশ করিয়া দেখিল, য়ুনিভার্সিটির একজন উচ্চ কর্ম্মচারী টেবিলের উপর থাকবন্দি ছাপা কাগজ লইয়া বসিয়া আছেন, বড় বড় খামে থাক থাক কাগজ ভরিতেছেন, মেঝের উপর দপ্তরী জ্বলন্ত মোমবাতি লইয়া বসিয়া সেই খাম সকল শিলমোহর করিতেছে। নিকটে গিয়া কুঞ্জ দেখিল, সেগুলি ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র—কলিকাতার যে সকল কলেজে পরীক্ষার্থীদিগের আসন হইয়াছে, সেই সেই স্থানে প্রশ্নপত্রগুলি আগামী কল্য পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। দেখিয়া কুঞ্জলাল চলিয়া যাইতেছিল; কিন্তু সহসা তাহার মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি আসিল। য়ুনিভার্সিটি তাহার মত ভাল ছেলেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে পাস করিয়াছিল এই জন্য য়ুনিভার্সিটির উপর তাহার অত্যন্ত রাগ ছিল। ভাবিল, এই সুযোগে য়ুনিভার্সিটিকে কিঞ্চিৎ জব্দ করা যাউক। টেবিলের প্রান্তভাগ হইতে এক গোছা প্রশ্নপত্র মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক উঠাইয়া লইয়া, সে নিঃশব্দে প্রস্থান করিল।

বাহির হইয়া গোলদীঘির আশে পাশে ছাত্রাবাসগুলির কয়েকটিতে প্রবেশ করিয়া, নির্জ্জন ঘর দেখিয়া দেখিয়া, ছাত্রগণের বহি খাতার নিকট ২।৪খানি করিয়া প্রশ্নপত্র রাখিয়া দিল। পরে একটি দৈনিক সংবাদপত্রের আফিসে গিয়া, খানকতক প্রশ্নপত্র সম্পাদকীয় টেবিলের উপর ফেলিয়া চলিয়া আসিল।

সন্ধ্যা আগত দেখিয়া ভাবিল, এখন কোথায় যাই, কি করি? স্মরণ হইল, সার্কুলার রোডে ডাক্তার সাহেবের বাড়ী যাইতে হইবে যে! সেই জন্যই ত অদৃশ্য ভাবে কলিকাতায় আসা। আসল কথাই ভুলিয়া যাইতেছিলাম—নাঃ, বড়লোক হইবার উপক্রমেই আমার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।

কুঞ্জ তখন বড় রাস্তায় গিয়া ট্র্যামের অপেক্ষায় দাঁড়াইল। ট্র্যাম আসিতেছে, কিন্তু এ সময় লোকে ভর্ত্তি। সুতরাং ট্র্যামে ওঠার সুবিধা হইল না। ক্লান্ত দেহে ধীর মন্থর গতিতে সাবধানে সে ডাক্তার সাহেবের বাসভবনের দিকে চলিল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

লিঙ্গপূজা ও ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবাসিগণ শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এই পূজা চিরকাল একমাত্র ভারতবর্ষেই আবদ্ধ ছিল না। অতি প্রাচীন কালে পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। চীন, জাপান, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে লিঙ্গপূজা সম্বন্ধীয় আচার ব্যবহারের এখনও সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে নাই। আফ্রিকা ও আমেরিকার অসভ্য জাতিগণের মধ্যেও এই পূজা এক সময়ে অতি প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল, আর তাহার প্রভাব অদ্যাপি যথেষ্ট পরিমাণে ইহাদিগের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। আসিরিয়া, যুডিয়া সিরিয়া, এসিয়া মাইনর, ব্যাবিলন প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন কালে এই পূজার বিশেষ প্রচলন ছিল, ইহা বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে জানা যায়। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে বাবিলনের ভূগর্ভ হইতে কতকগুলি লিঙ্গমূর্ত্তি উত্তোলিত হইয়াছিল; ভারতীয় শিবলিঙ্গের সহিত ইহাদের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রাচীন ইজিপ্ট অর্থাৎ মিশ্র-

দেশের বিভিন্ন স্থানে Khem (ক্ষেম ?), Horus (হর ?) Osiris (ঈশ্বর ?), Sebek (শিবক ?), Seb (শিব ?) ও Sarapis বা Serapis (সর্পেশ ?) নামক বিভিন্ন দেবতার, অথবা বিভিন্ন নামধারী একই দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল। অধিকাংশ স্থলেই ঐ সকল দেবতার পূজার সম্পর্কে লিঙ্গমূর্ত্তির পূজা, ও কোন কোন স্থলে সর্প ও ব্যাঘ্রের পূজা হইত। আজও ইজিপ্টের কীর্ত্তিস্তম্ভগুলির মধ্যে অনেক লিঙ্গমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে ইউরোপেরও প্রায় সর্ব্বত্র লিঙ্গপূজার প্রচলন ছিল। এই মহাদেশ হইতে লিঙ্গপূজার নির্ব্বাসন করিতে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণকে বিষম বেগ পাইতে হইয়াছে। কিন্তু দুই সহস্র বৎসরের প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও ইউরোপে আজিও লিঙ্গপূজা সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে নাই। গ্রীসদেশে Viza (Capital of the Thracian kings) নামক নগরীতে এখনও লিঙ্গপূজা সংক্রান্ত আচারাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।* উল্লিখিত অনুষ্ঠান সকল গ্রীকদেশীয় খ্রীষ্টানগণ কর্ত্তৃক আচরিত হয়। ইহাদের সহিত 'জিপসি'গণও যোগদান করিয়া থাকে। এই জিপসি জাতি অতি প্রাচীনকালে ভারতবাসী ছিল। এই জাতি কোনও স্মরণাতীত কালে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহারা এখনও যে ভাষায় কথা কহে তাহা ভারতবর্ষীয় ভাষা। (স্থানান্তরে Gipsies and the spread of Indian culture নামক ইংরাজি প্রবন্ধে এই জিপসিগণ সম্বন্ধে আমি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।) আয়র্লণ্ড দেশের অনেক স্থলে, বিশেষতঃ গির্জ্জার মধ্যে, অনেক লিঙ্গমূর্ত্তি আজিও রক্ষিত রহিয়াছে। এই সকল মূর্ত্তিকে তদ্দেশীয় লোকে Sheila-na gig (শিবলিঙ্গ ?) কহে। ইটালি দেশে বহুশতাব্দী ধরিয়া লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল। ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের বহুস্থান হইতে মৃত্তিকা খননের ফলে ভূগর্ভ হইতে অনেক লিঙ্গমূর্ত্তি উত্তোলিত হইয়াছে। যে যে স্থানে ঐ সকল মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, সে সকল স্থানে অতি প্রাচীনকালে রোমীয়গণের দুর্গ ও উপনিবেশ ছিল। ইহা হইতে অনুমান করা চলে, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে সম্ভবতঃ রোমীয়গণ কর্ত্তৃক লিঙ্গপূজার প্রচলন হইয়াছিল। জর্ম্মনি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেও লিঙ্গপূজার অতি প্রচলন ছিল, ইহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

Bacche, Bacchus বা Dionysius নামক গ্রীক্ দেবতার পূজার উপলক্ষে ইউরোপে সর্ব্বপ্রথম লিঙ্গপূজার প্রচার হয়। এশিয়া মাইনরের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ Phrygia ও Lydia প্রদেশে এই Bacchus দেবতার পূজা অতি সমাদরের সহিত সম্পাদিত হইত। শেষোক্ত স্থান সকলে এই দেবতাকে Sabagius (শবশায়ী ?) Bagaios (বকেশ ?) নামে অভিহিত করা হইত। গ্রীসের অনেক স্থলে অসংখ্য মশালের আলোকে উজ্জ্বলীকৃত মন্দিরমধ্যে মদ্যপানে উন্মত্তপ্রায় নরনারীগণের উচ্ছৃঙ্খল নৃত্যের সহিত নিশীথকালে এই দেবতার পূজার উৎসব (Orgies) সম্পাদিত হইত। এই পূজার সম্পর্কে স্থানে স্থানে বিষম বীভৎস আচার ও গুপ্ত ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান হইত। জন্তুগণের মধ্যে বৃষ, ব্যাঘ্র ও ছাগ এই দেবতার প্রিয়পাত্র ছিল। ইহার হস্তে thyrsus (ত্রিশূল ?) নামে একটি দণ্ড ও পানপাত্র থাকিত, আর মস্তকদেশে বৃষের শৃঙ্গ নির্ম্মিত শিঙ্গা (horn of plenty) বিলম্বিত থাকিত। এই Bacchus দেবতা ও তাহার প্রতীক (symbol) রূপে পরিগণিত লিঙ্গমূর্ত্তি—এই উভয়ের পূজার নিয়মাদি কতকগুলি গুপ্ত পুস্তকে লিখিত ছিল। এই পুস্তকগুলিকে Sibylline books নামে অভিহিত করা হইত। Sibylline শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে। প্রবাদটী এই—Sibylla নামে এক বৃদ্ধা ৯ খণ্ডে বিভক্ত একখানা পদ্যগ্রন্থ রাজা টারকুইনাস্ প্রিস্কাস্‌কে বিষম উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিতে চাহে। রাজা এই প্রস্তাবে অসম্মত হন। বৃদ্ধা তখন চলিয়া যায়। তাহার পর সে নয়-

---

* Encyclopædia of Ethics গ্রন্থে "Phallism" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

খানি পুস্তকের মধ্যে তিনখানা পোড়াইয়া ফেলে। অবশিষ্ট ছয়খানা পুস্তক সে পুনর্ব্বার রাজার নিকট পূর্ব্বপ্রার্থিত মূল্যে বিক্রয় করিতে চাহে। রাজা এবারও তাহার প্রস্তাবে অসম্মত হন। বৃদ্ধা তখন পুনর্ব্বার চলিয়া যায় এবং আরও তিনখানা পুস্তক পোড়াইয়া ফেলে। তাহার পর অবশিষ্ট পুস্তক তিনখানি লইয়া সে পুনর্ব্বার রাজার নিকট উপস্থিত হয় ও উহাদের পরিবর্ত্তে পুনর্ব্বার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট মূল্য প্রার্থনা করে। বৃদ্ধার এই অদ্ভুত ব্যবহারে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রাজা পুস্তক তিনখানি বৃদ্ধার প্রার্থিত মূল্যেই ক্রয় করেন। রোমীয়গণ এই পুস্তকগুলির অত্যন্ত সমাদর করিত। এক্ষণে ঐ পুস্তকগুলি লুপ্ত হইয়াছে। কথিত আছে যে ঐ পুস্তকগুলির মধ্যে রোমের ভবিষ্যৎ ইতিহাস প্রভৃতি নানা প্রকার বিস্ময়জনক ব্যাপার লিখিত ছিল। পূর্ব্বোল্লিখিতা বৃদ্ধার নামানুসারে পুস্তকগুলিকে "সিবিলাইন" বলা হইত। কিন্তু গল্পটী এক্ষণে অলীক ও ভিত্তিহীন বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে—পূর্ব্বোল্লিখিত 'সিবল্লা' নাম্নী বৃদ্ধার নাম হইতে ঐ পুস্তকগুলির নামকরণ হইয়াছিল. ইহা এক্ষণে কেহই বিশ্বাস করে না। সিবিলাইন শব্দের ব্যুৎপত্তি তাহা হইলে কিরূপে হইল? শিবলিঙ্গ শব্দের সহিত এই শিবলাইন শব্দের কোনও সম্পর্ক থাকিতে পারে কি না তাহা আমরা অতঃপর বিবেচনা করিব।

বর্ত্তমান তিব্বত ও ভূটানেও লিঙ্গপূজার প্রভাব সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। অনেকেই জানেন যে বৌদ্ধ লামাগণের ন্যায় জপক্রিয়াশীল জাতি এখন পৃথিবীতে আর নাই; ইহারা প্রায় সকল সময়েই একটী উপচক্র ঘুরাইতে ঘুরাইতে জপ করিতে থাকে। যে মন্ত্রে জপ করা হয় তাহা এই—ওঁ মণিপদ্মে হুঁং। এই মন্ত্রের সহিত শিবলিঙ্গপূজার সম্পূর্ণ সংযোগ রহিয়াছে—তন্ত্রের ভাষায় মণি অর্থে শিবলিঙ্গ আর পদ্ম অর্থে গৌরীপট্ট. বুঝায়। তিব্বত ও ভূটানের অধিবাসিগণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত শৈবধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমাবেশ রহিয়া গিয়াছে। যাঁহারা দার্জিলিং গিয়াছেন তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন যে মহাকাল মন্দিরে দুইজন পুরোহিত থাকেন—একজন নেপালী ব্রাহ্মণ, আর একজন ভুটিয়া বৌদ্ধ। নেপালী ব্রাহ্মণটী যেমন সংস্কৃত মন্ত্রের সাহায্যে মহাদেবের পূজা করিয়া থাকেন, ভুটিয়াটী তেমনি ভুটিয়া ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া একত্রই সেই একই দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া দার্জিলিংএর নিকটবর্ত্তী একটা বৌদ্ধবিহারের মধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে ইহা অনেকেই জানেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি বৌদ্ধপ্রধান জাপানেও লিঙ্গপূজার অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল। জাপানে শিন্তো ধর্ম্ম নামে একটা ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। লিঙ্গপূজা এই শিন্তোধর্ম্মের একটা প্রধান অঙ্গ।

জাপানের বহুস্থানে শিন্তোগণের মঠ মধ্যে লিঙ্গমূর্ত্তি সংস্থাপিত রহিয়াছে, ইহা আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। 'শিন্তো' শব্দ বোধ হয় "শিবতন্ত্র" শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

আমেরিকার বহুস্থলে বিশেষতঃ মেক্সিকো, পেরু, হাইতি দ্বীপ প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন কালে লিঙ্গপূজা বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। স্পানিয়ার্ডগণ যখন প্রথমে আমেরিকায় প্রবেশ করে, তখন তাহারা দেখিয়াছিল যে দেশের সর্ব্বত্র লিঙ্গ ও যোনিমূর্ত্তির পূজা হইত, আর ঐ মূর্ত্তি সকল মন্দির মধ্যে রক্ষিত হইত। আফ্রিকার ডাহোমিবাসিগণ লিঙ্গমূর্ত্তিকে দেবশ্রেষ্ঠ "লেঙ্গবা" নামে অভিহিত করে * "লেঙ্গবা" শব্দ বোধ হয় লিঙ্গদেব শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, পৃথিবীর কোন স্থানে এই ভূমণ্ডলব্যাপি লিঙ্গপূজার উৎপত্তি হইয়াছিল? পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে সাধারণ ভারতবাসীর মনে স্বতঃই বিশ্বাস হইবে যে ভারতবর্ষই লিঙ্গপূজার উৎপত্তি স্থল ও ভারতবর্ষ হইতেই এই পূজা পৃথিবীর সর্ব্বত্র কালক্রমে বিস্তারিত হইয়াছিল, কেননা এই দেশেই লিঙ্গপূজা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বিশ্বাস আমাদিগের নিকট যতই স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত হউক না

---

* Phallism in ancient Worship—by H. M. Westropp and C. S. Wate.

কেন, ইহার সমর্থনের জন্য যতক্ষণ আমরা অতি স্পষ্ট প্রমাণ দেখাইতে না পারি, ততক্ষণ ইহা আধুনিক সভ্য জগতে গ্রাহ্য হইবে, ইহা আশা করা যায় না। কোন কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত মনে করেন যে অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আপনা হইতেই স্বতন্ত্রভাবে লিঙ্গপূজার উৎপত্তি হয়। ইঁহাদের যুক্তি এই হইতেছে যে, মানবের প্রকৃতি জগতের সর্ব্বত্রই একই প্রকারের; সুতরাং মানবের চিত্তও জগতের সর্ব্বত্র একই প্রকারে কার্য্য করিবে, ইহাই স্বাভাবিক। এই জন্যই জগতের অনেক স্থলে একই প্রকারের ধর্ম্ম বিশ্বাস ও একই প্রকারের কুসংস্কারের স্বাধীনভাবে উৎপত্তি হইয়াছে, এ বিষয়ে এক দেশ অন্য দেশের নিকট ঋণী, একথা মনে করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। এই প্রকারের ব্যাখ্যার সারবত্তা যাহাই হউক না কেন, ইহা যে লিঙ্গপূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রযুজ্য নহে, ইহা আমরা পরে দেখাইব। কোনও কোনও পণ্ডিত আবার উল্লিখিত যুক্তির উপর আরও অধিক দূর অগ্রসর হইয়া বলিয়া থাকেন যে, আদিম অসভ্য যুগে মানবের চিন্তাশক্তি যখন অপরিণত অবস্থায় ছিল, তখন যৌন সম্বন্ধ ব্যতীত যে সৃষ্টিক্রিয়া সংসাধিত হইতে পারে, এ চিন্তা সে করিতে পারিত না; সেই জন্য অসভ্য মানব সৃষ্টিকর্ত্তাকে লিঙ্গমূর্ত্তি বা যোনি মূর্ত্তিরূপে পূজা করিতে আরম্ভ করে। অর্থাৎ অসভ্য মানবগণের মধ্যেই এই পূজার উৎপত্তি হইয়াছিল। এই সকল কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে আমাদিগকে বর্ত্তমান বিবর্ত্তনবাদ অর্থাৎ ডারউইনের Evolution theoryতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়; অর্থাৎ আমাদিগকে প্রথমে অনুমান করিয়া লইতে হয় যে, প্রাচীনকালে যখন মানবজাতি সর্ব্বপ্রথমে ভূপৃষ্ঠে আবির্ভূত হয়, তখন তাহাদের সম্পূর্ণ অসভ্য অবস্থা; কেবলমাত্র জড়প্রকৃতির অন্ধক্রিয়া ভিন্ন অন্য কোনও প্রকার অপার্থিব শক্তির ক্রিয়া সেই সকল অসভ্য মানবের উপর কখনও কার্য্য করিত না; আর এই জড়প্রকৃতির সাহায্যেই ক্রমশঃ তাহারা অসভ্য অবস্থা হইতে সভ্য অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল—অর্থাৎ ব্রহ্মা, মনু, দক্ষ, অত্রি প্রভৃতি আমাদের আদিম পূর্ব্বপুরুষগণ প্রথমতঃ বনমানুষের মত অসভ্য ও বাক্‌শক্তি রহিত জীব ছিলেন তাহার পর প্রাকৃতিক নিয়মের প্রভাবে ক্রমশঃ তাঁহাদের বংশধরগণ কথা কহিতে শিখিয়াছিলেন। এই মতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, সত্য ত্রেতাদি যুগে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের যে সকল অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় আমাদের বেদ-পুরাণ-তন্ত্রাদি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে তাহা মিথ্যা; আরও বলিতে হইবে যে, আমাদের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বল, নৈতিক-প্রবৃত্তি বল, বুদ্ধি বল, মন বল,—এ সকলের কোনও কিছুতেই ঈশ্বর বা ঐ প্রকার কোন অমানুষিক শক্তির কোনও হাত কখনও ছিল না, ও এখনও নাই—মানবের বাহ্য অবয়ব ও অন্তর প্রকৃতি আপনা হইতেই প্রাকৃতিক নিয়মের বলেই ক্রমশঃ গঠিত হইয়াছে—ধর্ম্মজ্ঞান কখনও মানবের নিকট ঈশ্বর-প্রণোদিত বা revealed হয় নাই,—মানব ইহা নিজে হইতেই প্রাকৃতিক নিয়মের বলে উৎপাদন করিয়াছে। বলা বাহুল্য অনেকের নিকট এই জড়বাদ খুব যুক্তি-সঙ্গত ও গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক বলিয়া মনে হইবে; কিন্তু এই সকল কথা জগতের যাবতীয় চিন্তাশীল ব্যক্তি কখনও ধ্রুবসত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ অতীব দুরূহ হইতে পারে, কিন্তু অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব ও কার্য্যশীলতার পরিচয় ত আজিও এই জড়যুগের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের সকল ব্যাপার দূরে থাকুক, এই অসীম রহস্যের কণামাত্রও প্রকৃতরূপে ব্যাখ্যা করিতে বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞান অক্ষম। ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদও এখন আর পাশ্চাত্ত্য জগতের প্রধান প্রধান মনীষিগণ কর্ত্তৃক সত্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে না। Martineau প্রভৃতি বিখ্যাত দার্শনিকগণ কিরূপ অকাট্য যুক্তিদ্বারা এই বিবর্ত্তনবাদের ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করিয়াছেন, তাহা অনেকেই জানেন। এরূপক্ষেত্রে Golden age অর্থাৎ সত্য ত্রেতা দ্বাপর প্রভৃতি সভ্যতর যুগ যে বাস্তবিকই জগতে বর্ত্তমান ছিল ইহাতে অবিশ্বাস করি-

যার অধিকার আমাদিগের নাই! আমাদের দর্শন, আমাদের চিকিৎসা, আমাদের জ্যোতিষ প্রভৃতি এ বিষয়ে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিতেছে। A. Wilder. M.D. নামক একজন বিখ্যাত আমেরিকান চিকিৎসক এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা কতকটা বিদ্রূপপূর্ণ হইলেও শিক্ষাপ্রদ। তিনি বলিয়াছেন—

> Modern Science somewhat audaciously has endeavoured to set aside the time-honoured tradition of a golden age. We do not undertake to controvert the new doctrine, so necessary to establish the recently traced relationships between men and monkeys. The same social law which allows every man to choose his own company,, can be extended perhaps to the selection of his kindred."

সে যাহা হউক, বিষয়ের জটিলতা পরিহারের জন্য আমরা এস্থলে আর অধিকতর দার্শনিক আলোচনা হইতে সম্প্রতি ক্ষান্ত রহিলাম। সংক্ষেপে এস্থলে ইহা বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, লিঙ্গপূজা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উপরি-উক্ত মত সত্য হইলে, আধুনিক অসভ্য জাতিগণের মধ্যে এই পূজার অধিকতর প্রচলন দেখিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে। ভারতবর্ষ এক্ষণে লিঙ্গপূজার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। এদেশে আমরা এক্ষণে কি দেখিতে পাই? এ দেশের অসভ্য জাতিগণের মধ্যে এ পূজার একেবারে প্রচলন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কোনও প্রাচীনকালেও যে ছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহা ছাড়া পূজকগণের অসভ্য জনোচিত ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও সম্ভোগলিপ্সা হইতে এই পূজার তদুৎপত্তি হইয়াছিল এ কথাও বলা চলে না। ভারত-পট্ট. বুঝায়। লিঙ্গপূজকগণের মধ্যে ইন্দ্রিয়পরায়ণতার বৌদ্ধধর্ম্মের সহিতত নাই-ই, অধিকন্তু ইহা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা ধারণতঃ অতি কঠোর সংযমশীলতা ও সন্ন্যাসের অধিকারী হইয়া থাকেন। মহাদেবের মদনমথন নাম হইতেই বোধ হয় সে কথা সূচিত হইতেছে। এই সকল কথা Encyclopædia of Ethics and Religion গ্রন্থে Phallism প্রবন্ধের লেখক মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন।

আর এক শ্রেণীর পুরাতত্ত্ববিৎ আছেন যাঁহারা অনুমান করেন যে, তুরস্কের অন্তর্গত আসিরিয়া অঞ্চলে লিঙ্গপূজার উৎপত্তি হইয়াছিল। পরে ইহা সেখান হইতে পূর্ব্বদিকে ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে ও পশ্চিম দিকে মিসর গ্রীস প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। এই অনুমানের সমর্থনের জন্য এই সকল পণ্ডিত কোনও সন্তোষজনক যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। সুতরাং এ বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

এক্ষণে আমাদিগকে দেখিতে হইবে, জগতের কোন্ স্থলে সর্ব্বপ্রথম লিঙ্গপূজার আরম্ভ হয়। এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রথমে যে প্রশ্ন মনের মধ্যে উদিত হয় তাহা এই—গ্রীক্‌গণ এই লিঙ্গপূজা কোথা হইতে পাইল?

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে Dionysius বা Bacchus দেবতার পূজা হইতেই প্রথমতঃ গ্রীক্‌দেশে ও পরে সমগ্র ইউরোপে লিঙ্গপূজার প্রবর্ত্তন হয়। কিন্তু ঐই Bacchus দেবতা গ্রীসের নিজস্ব দেবতা নহেন। তিনি অন্যদেশ হইতে আসিয়া গ্রীসে নিজের প্রতিপত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। গ্রীক্‌গণ প্রথমে এই দেবতার পূজায় যোগ দিতে স্বীকৃত হয় নাই; শেষে অনেক বাদ প্রতিবাদের পর গ্রীসদেশে এই দেবতার পূজা প্রচলিত হয়। এই Bacchus দেবতা যদি গ্রীসের নিজস্ব দেবতা না হন, তাহা হইলে তিনি কোন্ দেশ হইতে আসিলেন ইহা অনুসন্ধেয়। এ কথা জানা গিয়াছে যে, প্রাচীনকালে এশিয়া মাইনরে বিশেষতঃ ঐ দেশের অন্তর্গত Lydia ও Phrygia নামক প্রদেশ দুইটীতে Bacchus দেবতার পূজা অতি সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইত। তত্রত্য লোকে ঐ দেবতাকে Indian Bacchus বা ভারতীয় বকেশ নামে অভিহিত করিত। এই দেবতার ভারত

হইতে প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে Lydia প্রদেশে Mount Ymolus নামক স্থানে প্রত্যেক বৎসর একটা উৎসব হইত। এই সকল বিবরণের মূলে কিছু সত্য আছে বলিয়া স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, Bacchus নামক দেবতা (বা দেবতারূপে পরিগণিত মানুষ) ভারত হইতে এশিয়া মাইনর, গ্রীস্ প্রভৃতি অঞ্চলে গমন করিয়া তত্তদ্দেশে লিঙ্গপূজার ও তৎসংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠানাদির প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু উল্লিখিত বিবরণগুলি বোধহয় পশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সত্য ও ঐতিহাসিক বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা যদি Bacchus এর ভারতবর্ষীয়তায় বিশ্বাস করিতেন, তাহা হইলে স্পষ্ট ভাবেই স্বীকার করিতেন যে, লিঙ্গপূজার উৎপত্তিস্থল ভারতবর্ষ, আর ভারতবর্ষ হইতেই এই পূজা গ্রীস্, এশিয়ামাইনর, ইজিপ্ট প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহারা স্পষ্টভাবে কোনও স্থলে সে কথা বলেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহারা পূর্ব্বোল্লিখিত বৃত্তান্তগুলিকে অলীক ও ভিত্তিহীন উপকথা (myth) বলিয়া মনে করেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীভুদেব মুখোপাধ্যায়।

ভাষাহীন

বলিবার যাহা ছিল, বারবার
ভুলে যাই সখি, ভুলে যাই !
বেদনা-সজল আঁখি ছলছল
মেলি অবিরল রহি তাই ।
কত কথা হায়, কত নিবেদন,
কত যে কামনা রহিল গোপন,
নব নব সুর জাগিছে মধুর,
ভাষা নাই, তার ভাষা নাই !

কে হরিল মোর স্বপনের ঘোর,
আবেশ-বিভোর দিনমান !
কে কাড়িল হায় নিঠুর লীলায়
মুখর বীণায় শত গান !
মূকের চাহনি, নয়নের জল,
কার হিয়া আজি করিবে বিভল ?
তবু মনে মনে সবাকার সনে
অভিমান, বৃথা অভিমান !

বুঝেছ কি সখি নয়নের ভাষ,
বোঝাবার আশ বারবার ?
ফুটি' ফুটি' ওঠে মরমের পুটে
কত সাধ শোভা অনিবার ?
হেরিছ কি চোখে ভরিয়া সরম
ভাষাহীন বাণী, ব্যথিত মরম ?—
প্রকাশ-ব্যথায় ফেটে বাহিরায়
হাহাকার—শুধু হাহাকার !

অবসর আর হলনা এবার,
বেলা যায়—ওই বেলা যায় !
কি বুঝিলে তাই সুধাইতে চাই,
ছুটে ছুটে যাই নিরালায় ।
না ফুটিতে ফুল শুকাল বিতান,
না বাঁধিতে সুর থেমে গেল গান,—
মধুযামিনীর ঝরা মাধবীর
বুকে আয় সখি বুকে আয় !

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

"প্রতাপসিংহ"-এর গান। *

প্রথম গীত

[রচনা—স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

উদাসী।

শঙ্করা—একতালা।

সুখের কথা বোলো না আর, বুঝিছি সুখ কেবল ফাঁকি;
দুঃখে আছি, আছি ভাল, দুঃখেই আমি ভাল থাকি।
দুঃখ আমার প্রাণের সখা, সুখ দিয়ে যা'ন চোখের দেখা,
দু'দণ্ডের হাসি হেসে, মৌখিক ভদ্রতা রাখি।
দয়া করে' মোর ঘরে সুখ পায়ের ধুলা ঝাড়েন যবে,
চোখের বারি চেপে রেখে মুখের হাসি হাস্‌তে হবে;
চোখের বারি দেখ্‌লে পরে, সুখ চলে' যা'ন বিরাগভরে;
দুঃখ তখন কোলে ধরে' আদর করে' মুছায় আঁখি॥

[স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

আস্থায়ী

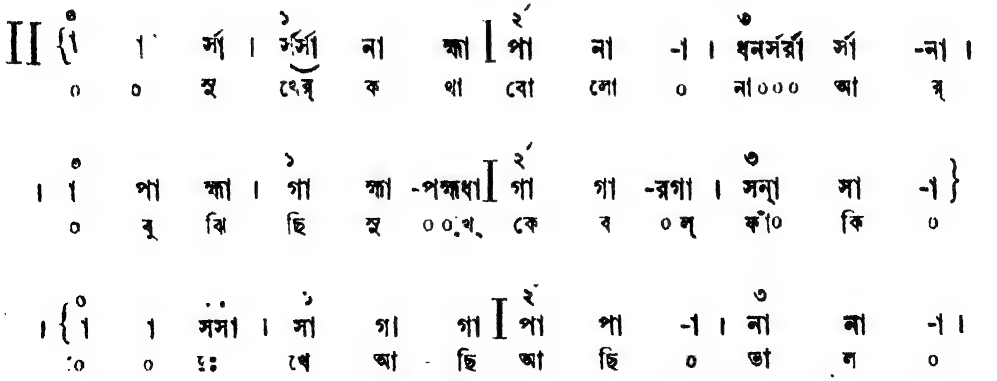
II {। । র্সা । র্সর্সা না ণা I পা না -া । ধনর্সর্রা র্সা -না ।
০ ০ সু খের্ ক থা বো লো ০ না০০০ আ র্
। । পা ক্ষা । গা ক্ষা -পক্ষধা I গা গা -রগা । সন্া সা -া }
০ বু ঝি ছি সু ০০খ্ কে ব ০ল্ ফাঁ০ কি ০
। { । । সসা । সা গা গা I পা পা -া । না না -া ।
০ ০ দুঃ খে আ ছি আ ছি ০ ভা ল ০

---

* "প্রতাপসিংহ"এর গানের স্বরলিপি ধারাবাহিকরূপে "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে, এবং নাটকান্তর্গত গানগুলি অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গীত হয়, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হইবে।

—লেখিকা।

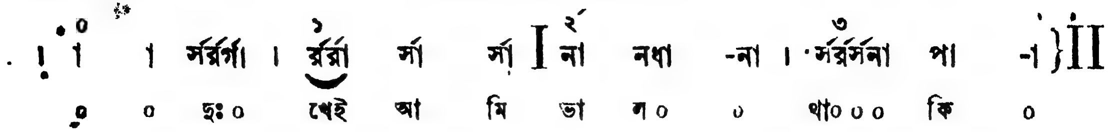
০ ০ দুঃ০ খেই আ মি ভা গ০ ০ থা০০০ কি ০

অন্তরা

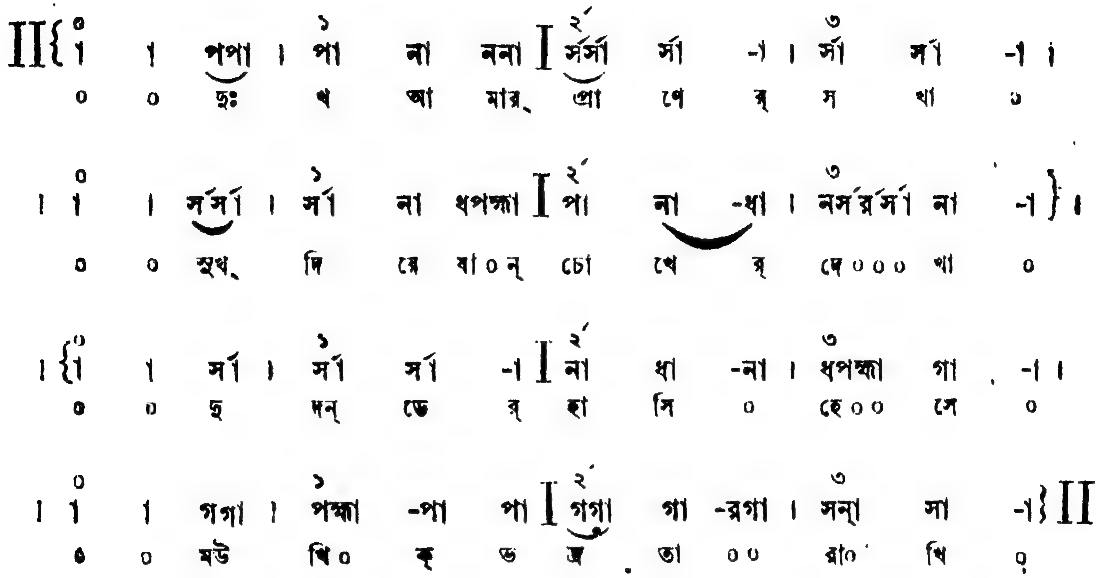
০ ০ দুঃ খ আ মার্ প্রা ণে র্ স খা ০
০ ০ সুখ্ দি য়ে যা০ন্ চো খে র্ দে০০০ খা ০
০ ০ দু দন্ ডে র্ হা সি ০ হে০০ সে ০
০ ০ মউ খি০ ক্ ভ ঙ্গ তা ০০ রা০ খি ০

সঞ্চারী

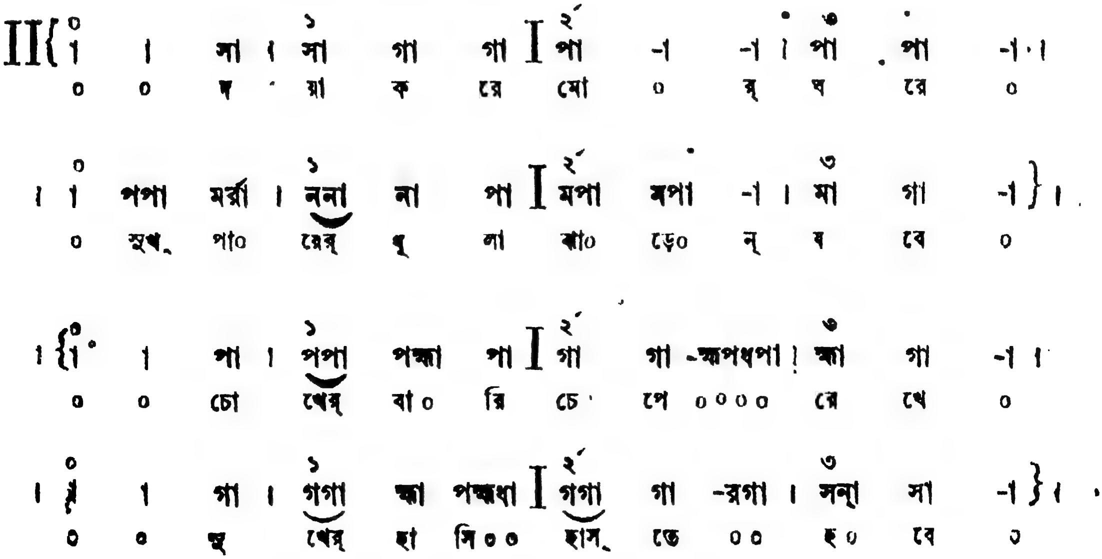
০ ০ দ য়া ক রে মো ০ র্ দ রে ০
০ সুখ্ পা০ য়ের্ ধূ লা বা০ ড়ে০ ন্ ষ বে ০
০ ০ চো খের্ বা০ রি চে পে ০০০০ রে খে ০
০ ০ দু খের্ হা সি০০ হাস্ তে ০০ হ০ বে ০

আভোগ

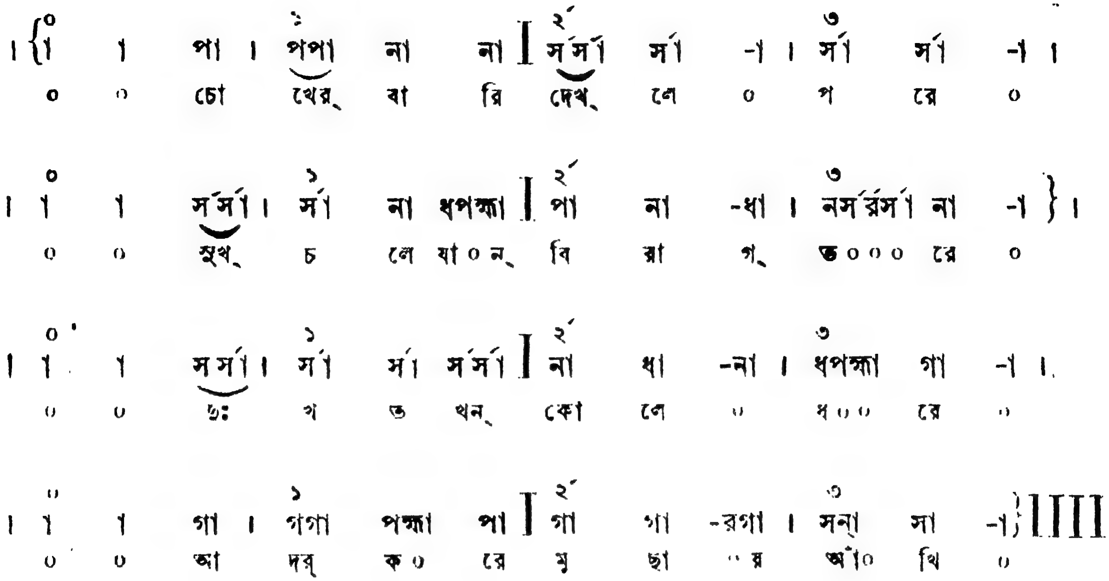

দাবী

শুক ওই সেফালির বোঁটা—
শরতের শোভা তার ধরা,
সীমন্তের সিদুঁরের ফোঁটা
এয়োতের মহিমায় ভরা।

২

ক্ষুদ্র এক কণিকা আকার
কৌটা মাঝে লিপ্ত মৃগনাভি—
আসামের সুরভি ভাণ্ডার
গিরিবন করিতেছে দাবী।

৩

তুচ্ছ ওই ভুর্জ্জপত্র খানি
হিমাদ্রির রহস্য-বিলয়,
অভয়ের অমৃতের বাণী
লক্ষ্যে ও অলক্ষ্যে বুকে বয়।

৪

শঙ্খ বয় সাগরের ভাবা—
গভীরতা জাগে তার ডাকে,
নর্ম্মদার নর্ম্ম ভালবাসা
মর্ম্মর মর্ম্মেছে গেঁথে রাখে।

৫

অতি ক্ষুদ্র হীরকের রেণু
গোলকুণ্ডা এঁকে রাখে বুকে,
রাখালের হাতে গড়া বেণু
অসীমের গান তার মুখে।

৬

মানব হউক যত হীন,
লাঞ্ছিত হউক রিপু হাতে,
তবু সে ভোলেনি কোনোদিন
যোগ তার বিরাটের সাথে।

৭

শীর্ণ দেহ জীর্ণ কাঁথা পুঁজি
ধরা তারে করে উপহাস,
পরশমাণিক ফেরে খুঁজি
তুচ্ছ দ্রব্যে নাহি অভিলাষ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

চরকার গান

বন্‌বন্ শন্‌শন্ শোঁ শোঁ স্বর কা'র ?
ঘর্ঘর ঘর্ঘর ঘুরপাক্ চরকার ।
ভারতের পতি-পুত, অন্ন ও বস্ত্র,
ভাতকাপড়ের দুখ নিবারণ-অস্ত্র ।

আয় আয় ভারতের পরভাতী পর-ঘর
ছুটে আয় লাঞ্ছিত, আত্মীয়-নির্ভর,
আয় ধনী, নির্ধন, অলসী ও বিলাসী
নর নারী ঘরে বোস্ চরকার উপাসী ।

ছেড়েদেরে ভিক্ষুক ভিখ মাগা পথপর,
চরকার সেবা কর্ ফিরি আপনার ঘর ;
ঘরে আয় কাণা খোঁড়া রাস্তার জঞ্জাল,
ছাড় পরদয়া-আশা, ওরে নরকঙ্কাল ।

বন্‌বন্ শন্‌শন্ কি এলো, কি দরকার ?
যে শুধায় বল তারে—ওই গান চরকার ।
ক্ষুধিতের অন্ন ও নগ্নের লজ্জা—
মগ্নের তরী ও যে সব সুখ-সজ্জা ।

কোন্ অমরার ধন ভরি দিল ভাণ্ডে ?
কোন্ স্বপনের ফুল ফুটিল এ কাণ্ডে ?

কোন গানে প্রাণ টানে ? কে এল, এ চর কার ।
লক্ষ্মীর চর এ যে, রূপ ধরি চরকার ।

ধানক্ষেতে ঢেউ তোলে হরিতে ও স্বর্ণে,
কাপাসের ক্ষেত জাগে চিরশ্বেত বর্ণে,
মৃদুবাত-হিন্দোলে চরণের পাঁজ দোলে
সেই পদধূলা তুলা পিঁজে সব ঘরে তোলে ।

চরকার বীণ্‌কার কর আর ডর কার ?
চরকার দরকার ঐ তার ঝঙ্কার ।
চরকায় দাও পাক, কর এই কারবার
যত পার প্রাণপণ, দাও পাক বারবার ।

টপটপ টিপ লও সত্বর-সত্বর,
ব্রাহ্মণ তাঁতি জোলা, হও সব তৎপর ।
ঘরে ঘরে যাক ভরে শুধু মোটা খদ্দর—
মোটা কাপড়েতে হোক্ গোটা নীচ ভদ্দর ।

খদ্দর এসেছে রে করিবারে উচ্ছেদ
ছোট বড়—কুলি বাবু, এই দুই জাতিভেদ,
কাপড়ের মহাবাধা পর্ব্বত উচ্চ
চরকার খদ্দরে করে দিবে তুচ্ছ ।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ।

গ্রন্থ-সমালোচনা

সোণার বালা (উপন্যাস)— শ্রীজলধর সেন প্রণীত। কলিকাতা ১৪এ রামতনু বসুর লেন মানসী প্রেসে মুদ্রিত ও তথা হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবলক্রাউন ১৬ পেজি ১৮৪ পৃষ্ঠা মূল্য ১৷৷০।

বইখানি দেখিতেও যেমন, পড়িতেও তেমনই মনোরম। ইহাতে আর্ট নাই, কিন্তু সামাজিক জীবনের এমন একটা আদর্শ আছে, যাহা অসাধারণ নহে এবং ছেলে বুড়োর কাযে লাগিবে। গল্পটি 'শিক্ষক' নামক মাসিক পত্রে বাহির হইয়াছিল, এক্ষণে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ভাল কাগজে ব্রোঞ্জর কালিতে ছাপা, সুদৃশ্য কাপড়ে বাঁধাই সুতরাং বালক বালিকাকে উপহার দিবার, স্কুল কলেজের লাইব্রেরীতে রাখিবার এবং পারিতোষিক দিবার জন্য ইহার মত পুস্তক আর দ্বিতীয় নাই। কেহ শিক্ষার কথা বলিলেই কুইনীনের বড়ি খাইবার কথা আমাদের মনে হয়। কিন্তু প্রবীণ গ্রন্থকার গল্পচ্ছলে এমন সুন্দর সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন যে, ছেলেদের অভিভাবকদের স্বতঃই মনে হইবে, একটু বিবেচনা করিলে তাঁহারা তাঁহাদের ছেলেদের প্রকৃতই মানুষ করিয়া তুলিতে পারেন।

আমরা সাধারণতঃ জানি, কেবল বিবাহবন্ধন দ্বারা পরকে আপনার করা যায়। যাহার সহিত রক্তের সম্বন্ধ আছে স্নেহের

অভাবে সে যেমন পর হইয়া যায়, যাহার সহিত রক্তের সম্বন্ধ নাই স্নেহের বাঁধনে তেমনই পরকেও আপন করিতে পারা যায়। সংসারে এরূপ ঘটনা বড় বিরল নহে। পূর্ব্বে সহরে এরূপ ঘটনা সচরাচর দেখা যাইত এবং এখনও গ্রামে দেখা যায়। এইরূপ একটা ঘটনার উপরেই গল্পের ভিত্তি। পরের ছেলেকে আপন করিতে হইলে যে মাতৃস্নেহের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা যে কিরূপ পবিত্র স্বর্গীয় দৃশ্য তাহা এই প্রবীণ গ্রন্থকার সুনিপুণ তুলির একটি আঁচড়ে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আর্ট ও বাস্তবতার দোহাই দিয়া নবীন উপন্যাস লেখকেরা আজকাল বঙ্গসাহিত্যে যে সকল নারকীয় চিত্র আঁকিতেছেন, তাহার মধ্যে এই স্বর্গীয় চিত্র দেখিয়া আমরা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমরা এই উপন্যাসের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীরাখালরাজ রায়।

সাহিত্য-সমাচার

পাবনা কিশোরীমোহন ষ্টুডেণ্টস লাইব্রেরীর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর জোয়াদ্দার মহাশয় লিখিয়াছেন—"মানসী ও মর্ম্মবাণী"র গত কার্ত্তিক সংখ্যায় পাবনা কিশোরীমোহন ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরীর সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে পদক পুরস্কারের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল, ঐ বিজ্ঞাপন আপনাদিগের নিকট গত ১৩২৭ সালে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পাঠান হয়। দুঃখের বিষয়, ঐ বিজ্ঞাপন গত বৎসরে প্রকাশিত না হইয়া বর্ত্তমান সনের কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়াতে, আমাদিগকে সাধারণের নিকট অপ্রতিভ হইতে হইতেছে। উক্ত সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন গত ১৩২৭ সালের ২১শে চৈত্র হইয়া গিয়াছে ও মনোনীত প্রবন্ধ লেখকগণকে পদক প্রদত্ত হইয়াছে। আশা করি, আগামী সংখ্যায় উক্ত ভুল সংশোধন পূর্ব্বক বর্ত্তমান সনের অধিবেশনের বিজ্ঞাপন সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন। বর্ত্তমান সনের বিজ্ঞাপন আপনাদিগের নিকট ১৭-১-২২ তারিখে প্রেরিত হইয়াছে। নিবেদন ইতি।"

পদক পুরস্কার—পাবনা কিশোরীমোহন ষ্টুডেণ্টস লাইব্রেরীর অষ্টম বার্ষিক উৎসব-সম্মিলনী উপলক্ষে যাঁহারা নিম্নলিখিত বিষয়ে বঙ্গভাষায় শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লিখিবেন তাঁহাদিগকে এই পদক প্রদত্ত হইবে। সকল শ্রেণীর লেখক বা লেখিকা এই প্রতিযোগিতায় প্রবন্ধ পাঠাইতে পারিবেন।

১। "বীণাপাণি রৌপ্যপদক"।—(৫ম বর্ষ) দাতা শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র লাহিড়ী বি-এ।

বিষয় :—১। (ক) বঙ্গসাহিত্যে বাংলার সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনের ক্রম-পরিবর্ত্তনের ইতিহাস অথবা

(খ) আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার সহিত গার্হস্থ্য জীবনের সামঞ্জস্য।

২। সুবর্ণনলিনী রৌপ্যপদক। (১ম বর্ষ) দাতা শ্রীগিরিজাশঙ্কর জোয়াদ্দার।

বিষয় :—(ক) গ্রাম্য-কবিতা ও গ্রাম্য গীতি অথবা

(খ) বঙ্গীয় নারী-সাহিত্যিক কর্ত্তৃক বঙ্গভাষার পরিপুষ্টি।

প্রবন্ধ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। আগামী ১৩২৮ সালের ২০শে চৈত্রের মধ্যে প্রকাশিত হইবে। প্রবন্ধ পাঠাইবার সময় নকল রাখিয়া পাঠাইবেন, কারণ প্রবন্ধ ফেরত পাঠান হয় না।

প্রবন্ধ পাঠাইবার ঠিকানা—শ্রীগিরিজাশঙ্কর জোয়াদ্দার
কিশোরীমোহন ষ্টুডেণ্টস লাইব্রেরী, পাবনা।

* * *

শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত সচিত্র 'হীরার কণ্ঠি' গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১॥০

* * *

শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রণীত "বিন কাশিম" নাটক প্রকাশিত হইল, মূল্য ১।০

কলিকাতা
১৪এ, রামতনু বসুর লেন, "মানসী" প্রেস হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সেতার-বাদিনী

চিত্রকর—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

MANASI PRESS.
CALCUTTA.

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

১৪শ বর্ষ
১ম খণ্ড

চৈত্র, ১৩২৮

১ম খণ্ড
২য় সংখ্যা

সতীত্ব বনাম মনুষ্যত্ব

নারীর সতীত্ব তাঁহার মনুষ্যত্বের অন্তরায় হইতে পারে কি না, সম্প্রতি এইরূপ একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে।

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার কোন কোন উপন্যাসের নরনারীর চিত্রের মধ্য দিয়া ইতিপূর্ব্বে এই সংশয় তুলিয়াছিলেন। তাঁহার 'শ্রীকান্তে'র অভয়া বলিতেছে—

"একজন নির্দ্দয়, মিথ্যাবাদী, কদাচারী স্বামী বিনা দোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে বলেই কি তার সমস্ত নারীত্ব ব্যর্থ, পঙ্গু হওয়া চাই? এই জন্যই কি ভগবান মেয়েমানুষ গড়ে তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন?"

তাঁহার 'স্বামী'র নায়িকা সৌদামিনীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংঘটিত 'মন্ত্রপূত' বিবাহ সম্বন্ধে তাহার প্রণয়ী নরেন বলিতেছে,—

"এমন কোন্ সভ্যদেশ পৃথিবীতে আছে যেখানে এত বড় অন্যায় হ'তে পা'রত? * * * কোন দেশের মেয়েরা ইচ্ছে করলে এমন বিয়ে লাথি মেরে ভেঙ্গে দিয়ে যেখানে খুসী, চলে যেতে না পারে?"

কিন্তু এতদিন পরে কাব্যচরিত্রের কুহেলিকা ভেদ করিয়া শরৎ-চন্দ্রের আলোক খুব স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। সম্প্রতি "স্বরাজ সাধনায় নারী"* প্রবন্ধে তিনি তাঁহার মত খুব পরিষ্কার করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

"মেয়ে মানুষকে আমরা যে কেবল মেয়ে করেই রেখেচি মানুষ হ'তে দিই নি স্বরাজের আগে তার প্রায়শ্চিত্ত দেশের হওয়া চাই-ই। অত্যন্ত স্বার্থের খাতিরে যে দেশ, যেদিন থেকে কেবল তার সতীত্ব-টাকেই বড় করে দেখেচে, তার মনুষ্যত্বের কোন খেয়াল করে নি, তার দেনা আগে তাকে শোধ করতেই হবে। এইখানে একটা আপত্তি উঠতে পারে, নারীর পক্ষে সতীত্ব জিনিষটা তুচ্ছও নয়, এবং

---

* শরৎ বাবুর এই প্রবন্ধটি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের নিকট পঠিত হইয়াছিল। পরে ১৩২৮ পৌষের 'নব্য-ভারতে' বাহির হইয়াছে।

দেশের লোক তাদের মা-বোন-মেয়েকে সাধ করে যে ছোট করে রাখতে চেয়েছে তাও ত সম্ভব নয়। সতীত্বকে আমিও তুচ্ছ বলিনে, কিন্তু একেই তার নারী-জীবনের চরম ও পরম শ্রেয়ঃ জ্ঞান করাকে কুসংস্কার মনে করি। কারণ মানুষের মানুষ হবার যে স্বাভাবিক ও সত্যকার দাবী একে ফাঁকি দিয়ে যে কেউ যে কোন একটা কিছুকে বড় করে খাড়া ক'রতে গেছে, সে তাকেও ঠকিয়েছে, নিজেও ঠকেছে।"

কিন্তু আপনারা ভুল বুঝিবেন না। শরৎ-চন্দ্রের এই আলোক তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব নহে, তাহা রবির কাছে ধার করা বলিয়া মনে হয়। আর একজন গ্রন্থকার ঐ পথাবলম্বী হইয়া আরও এক ডিগ্রী উপরে উঠিয়াছেন। ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত তাঁহার "শুভা" উপন্যাসে দেখাইয়াছেন, তাঁহার নায়িকা শুভা স্বামী কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা হইয়া, ক্রোধভরে একটি প্রতিবেশী যুবাকে ডাকিয়া আনিয়া তাহার সহিত বাহির হইয়া গেল এবং প্রথমে থিয়েটারের অভিনেত্রী ও পরে বাজারের বেশ্যা হইয়া, গ্রন্থাদি রচনা দ্বারা তাহার নারী-জীবন সার্থক করিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে নারী-জীবন সার্থক করার রেয়াজটা আজকাল বাঙ্গলা সাহিত্যে পুরাদমে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। শরৎবাবু এবার দেশে 'স্বরাজ'-আন্দোলনের সুযোগ পাইয়া, তাহাকে রাজনীতিক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার ভাবের তরজমা করিলে এরূপ দাঁড়ায়:—

"আমি একটা বস্তুকে তোমাদের চিরজীবনের পরম সত্য বলিয়া অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি। এ কেবল পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা। যে দেশ বা জাতি অন্য দেশ বা জাতির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়াছে, সে দেশ বা জাতি তাহার নিজের স্বাধীনতাও হারাইতে বাধ্য হইয়াছে। ইংরেজ জাতি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে; কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা ফিরাইয়া না দিলে নিশ্চয়ই তাহারা মারবে। যদি এখনও পর্য্যন্ত তাহাদের মরণের কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছে না, বরং তাহারা জার্ম্মান প্রভৃতি প্রবল পরাক্রান্ত জাতিদিগকেও জয় করিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, আমার কথা তোমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ কর। ভারতবর্ষ মেয়েদের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে বলিয়া, ভারতও স্বাধীন হইতে পারে নাই। সেই প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ স্বাধীন ছিল সন্দেহ নাই, তখন নারীদের স্বাধীনতা বোধহয় নিশ্চয়ই ছিল। তবে তাহার প্রমাণটা কিছু কুয়াসাচ্ছন্ন। এসিয়াতে অবশ্য এমন দুই একটা স্বাধীন মুসলমান রাজ্য আছে— যেখানে নারীদের স্বাধীনতা নাই; কিন্তু সে নিতান্তই 'দৈবাতের বলে।' ভারতবর্ষে কিন্তু সে দৈববল খাটিবে না। আবার পরাধীন ব্রহ্মদেশেও দেখিতে পাই, সেখানকার নারীরা সম্পূর্ণ স্বাধীন,—তাহারা নিঃসঙ্কোচে ঘরের বাহিরে বেড়ায়, দোকানে বসিয়া বেচাকেনা করে, আবার আবশ্যক হইলে গাড়ীর কোচম্যানকে ইক্ষুদণ্ড দ্বারা ঠেঙ্গায়—এসব আমার নিজের দেখা কথা। আমি তাদের অনেক সহর, অনেক গ্রাম, অনেক পল্লী, অনেকদিন ধরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়াছি। সে দেশের নারীরা "সতীত্বটাইকে একটা ফ্যাটিশ্‌ করে তুলে তাদের ভাল হবার পথটাকে কণ্টকাকীর্ণ কোরে তোলে না।" সে জন্য সে দেশ থেকে "আনন্দ জিনিষটা একেবারে নির্ব্বাসিত হয়ে যায় নি।" সুতরাং আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি ব্রহ্মদেশ এখন পরাধীন হইলেও অচিরে তাহা স্বাধীন হইবে। অতএব ভারত যদি স্বরাজ পাইতে চায় তবে ভারতের নারীকেও বিদেশী বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সতীত্ব ফ্যাটিশ্‌কে বর্জ্জন করিয়া নিছক আনন্দ উপভোগ করিতে হইবে। যদি ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হয়, তবে আমার সৃষ্ট অভয়া-কিরণময়ীর দলের সাহায্যেই হইবে। অতএব হে ভারতবাসিগণ! তোমরা নারীদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া তোমাদের পূর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। আর হে ভারতরমণীগণ! তোমাদিগকেও বলি, তোমরা আর সতীত্বরূপ নাগপাশে বদ্ধ হইয়া থাকিও না, খোলা প্রাণে কেবল আনন্দ উপভোগ কর; তাহাদ্বারাই তোমাদের নারীজীবন

সার্থক হইবে; আর সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে।”

ঠাট্টা বিদ্রূপ ছাড়িয়া দিয়া একবার দেখা যা'ক শরৎ বাবুর উক্তিতে কোন সত্য আছে কি না। তিনি মনে করেন, নারীদের মানুষ হওয়ার একটা স্বাভাবিক দাবী আছে, আমরা ভারতবাসী পুরুষগণ নিজেদের স্বার্থ সাধনের জন্য তাহা চাপিয়া রাখিয়াছি। আমাদের স্বার্থের জন্যই আমরা নারীর সতীত্ব মহিমা ঘোষণা করিয়া নারীকে তাহার জীবন সার্থক করিতে দিতেছি না। কথাটা খুব গুরুতর, এজন্য ইহার সত্য নির্ণয় করিতে হইলে ব্যাপক ভাবেই ইহার আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ দেখা যাক, পাশ্চাত্য সমাজের নারীর সহিত হিন্দুনারীর পার্থক্য কোন্ খানে। কারণ পাশ্চত্য সমাজের নারীদিগকেই অনেকে আদর্শ নারী বলিয়া গণ্য করেন; বলা বাহুল্য শরৎবাবুও সেই মতাবলম্বী।

পাশ্চাত্য সমাজে পুরুষের ন্যায় নারীর অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা আছে। পাশ্চাত্য সমাজে নারীর বিবাহ করা না করা সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। যাঁহারা বিবাহ-সম্বন্ধে আবদ্ধ হন, তাঁহারা অবশ্য স্বামীর জীবিত কাল পর্য্যন্ত তাঁহার অধীন হইয়া চলেন। যাঁহারা বিবাহ করেন না, তাঁহাদের পিতা মাতা বা ভ্রাতার অধীন হইয়া থাকা না থাকা সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করিলে তাঁহারা স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন। যাঁহারা বিধবা হন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারেন, অথবা স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করেন। পাশ্চাত্য সমাজে একজনের প্রেমে পড়িয়া যদি তাঁহাকে কোন কারণ বশতঃ বিবাহ করিতে না পারেন, তবে ইচ্ছা করিলে অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে পারেন। ইহাতে তাঁহার সতীত্ব-গৌরবের হানি হয় না। আবার বিবাহিতা নারী ইচ্ছা করিলে স্বামীর দোষ প্রমাণ করিয়া বিবাহ সম্বন্ধ ছেদন করিতে পারেন ও অবলীলাক্রমে পরপুরুষের সহিত মিলিত হইতে পারেন। ইহাতেও সমাজে তাঁহার কোন নিন্দা নাই। কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রী যদি স্বামীর জীবিত কালে পরপুরুষাসক্ত হন তবেই তাঁহার নিন্দা হয়। সে স্থানে তাঁহাকে অসতী বলা যায়।

আমাদের হিন্দু সমাজে নারীর এরূপ স্বতন্ত্রতা নাই। বিবাহ বন্ধন নারীজীবনের অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য। বিবাহের পূর্ব্বে নারী পিতা মাতা বা ভ্রাতার অধীন, বিবাহের পরে স্বামীর অধীন হইয়া থাকেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বিধবা হইলে, তখনও তাঁহার স্বাধীনতা নাই। তিনি স্বামীর পরিবারভুক্ত হইয়া, অথবা পিতামাতা ভ্রাতার আশ্রয়ে থাকিতে বাধ্য। বিধবার যদি বিবাহ হয়—তবে তিনি পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হন। স্বামীর জীবদ্দশায় পরপুরুষাসক্ত হইলে ত কথাই নাই। স্বামী পরস্ত্রী-আসক্ত বা অন্য কারণে তাহার সংসর্গ অসহ্য হইলেও হিন্দুনারী তাহার সহিত বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন না। জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য হিন্দু রমণী পুরুষের ন্যায় স্বাধীনভাব অবলম্বন করিলে সমাজে তাঁহার নিন্দা হয়। কারণ উপার্জ্জন-ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে প্রবেশ করিলে তাহার পরপুরুষের সহিত মেলামেশা দ্বারা সতীত্বের হানি হওয়ার আশঙ্কা আছে। এই কারণে হিন্দু রমণীগণ স্বামীর সংসারে অথবা পিতা-মাতা ভ্রাতার সংসারে, স্থলবিশেষে বহুপ্রকার ক্লেশ ও নির্য্যাতন সহ্য করিলেও, স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে চেষ্টা করেন না।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, পাশ্চাত্য সমাজের নারীর সহিত হিন্দুনারীর প্রধান দুইটি বিষয়ে সম্পূর্ণ পার্থক্য।

(১) হিন্দু রমণীর পাশ্চাত্য রমণীর ন্যায় অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা নাই।

(২) হিন্দু রমণীর সতীত্বের আদর্শ পাশ্চাত্য রমণী অপেক্ষা অনেক উচ্চ।

শরৎ বাবুর ন্যায় যাঁহারা পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শে আমাদের হিন্দুসমাজ সংস্কার করিতে ব্যগ্র, তাঁহাদের মতে সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীনতার অভাবে হিন্দু নারীর জীবন পঙ্গু হইয়া আছে। আর হিন্দু নারী বৃথা সতীত্বগর্ব্বের কুসংস্কারে মুগ্ধ হইয়া তাহার জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

কিন্তু স্বাধীনতা কাহাকে বলে? আত্মার স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। তাহা সর্ব্বভূতে সমদর্শন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।

সর্ব্বভূতাস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
পশ্যতি যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ।—গীতা

"যিনি যোগযুক্ত হইয়া সর্ব্বভূতে সমদর্শন করেন, তিনি আত্মাকে সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে ও সর্ব্বপ্রাণীকে আত্মার মধ্যে দর্শন করেন।" দৈত্যকুমার প্রহ্লাদ একদিন দৈত্যশিশুদিগকে এই সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন

"সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য।"—বিষ্ণুপুরাণ।

"হে দৈত্যগণ তোমরা সাম্য অবলম্বন কর, সাম্যই বিষ্ণুর প্রকৃত আরাধনা।"—দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে রাজনীতি শিক্ষা করিবার জন্য গুরুগৃহে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাস করিয়া প্রত্যাগত হইলে, হিরণ্যকশিপু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"মিত্রেষু বর্ত্তেত কথমরিবর্গেষু ভূপতিঃ?"

—"রাজা মিত্রের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন, আর শত্রুগণের সঙ্গেই বা কিরূপ ব্যবহার করিবেন?" তদুত্তরে দৈত্যকুমার বলিলেন,

"সর্ব্বভূতাত্মকে তাত জগন্নাথে জগন্ময়ে।
পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্র কথা কুতঃ॥
ত্বয্যাস্তি ভগবান্ বিষ্ণুর্ময়ি চান্যত্র চাস্তি সঃ।
যতস্ততোহয়ং মিত্রং মে শত্রুশ্চেতি পৃথক্ কুতঃ॥

—"হে পিতঃ, জগন্নাথ জগন্ময় পরমাত্মা গোবিন্দ যখন সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মরূপে বিরাজ করিতেছেন, তখন মিত্র আর শত্রু, এরূপ কথা কেন? ভগবান বিষ্ণু তোমাতে আছেন, আমাতে আছেন, অন্যত্রও আছেন। সুতরাং ইনি মিত্র, উনি শত্রু, এরূপ ভেদজ্ঞান থাকিবে কেন?"

যে সাম্য জগন্নাথ জগন্ময়ের জগতে শত্রুমিত্রের ভেদ দেখিতে পায় না, তাহাই প্রকৃত সাম্য। কিন্তু ফরাসী জাতি এক সময়ে যে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা (Liberty, Fraternity, Equality) প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ধরাতল নরশোণিতে প্লাবিত করিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ। ফরাসী জাতি যে সাম্যের সাধন করিয়াছিল, তাহা অহঙ্কারমূলক। তাহার মূলমন্ত্র হইতেছে, "তুমি যে মানুষ, আমিও সেই মানুষ; তোমার যে অধিকার আছে, আমারও সেই অধিকার থাকা উচিত।" আর প্রহ্লাদ যে সাম্য প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা অহঙ্কার বিনাশের ফল। "তুমি আমি সকলেই সচ্চিদানন্দময়, তোমা হইতে আমার কোন পৃথক অস্তিত্ব নাই,"—এরূপ ধারণামূলক। এই প্রকার সাম্য সাধনা দ্বারাই মৈত্রীর রাজ্য, প্রীতির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন সর্ব্বত্র সকলেই স্বাধীনতা লাভ করে, কেহ তাহাকে অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পারে না। তখন সকলেই সকলকে এই বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাবে দর্শন করে। এইরূপে সাম্য হইতে মৈত্রী, মৈত্রী হইতে স্বাধীনতার বিকাশ হয়।" * আত্মার সেই প্রকৃত স্বাধীনতা-বিকাশের নাম স্বরাজ্য সিদ্ধি বা মানবাত্মার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠা। ইহারই অপর নাম মুক্তি। এইরূপ স্বাধীনতাই আমাদের দেশের স্ত্রী পুরুষের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া আসিয়াছে। এইরূপ স্বাধীনতা লাভ করাই, কি পুরুষ কি নারী, সকলেরই জীবনের স্বার্থকতা ও মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ।

"Liberty, Fraternity, Equality" এই সকল মেকি ভাবের ন্যায় "Woman's Rights" ভাবটিও ঐ পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়াছে। যাঁহারা আমাদের সমাজতত্ত্ব বুঝেন না, এই সকল আপাত-মনোরম বাক্য বা idea সহজেই তাঁহাদের চোখে ধাঁধা লাগাইতেছে। শরৎ বাবুও সেই ধাঁধায় পড়িয়া বলিতেছেন —আমরা নারীদিগের মানুষ হওয়ার স্বাভাবিক দাবী চাপিয়া রাখিয়াছি।

---

* ১৩১১ সালে লিখিত, আমার "বিশ্বমিত্রের তপস্যা" নামক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত। সুখের বিষয় কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করিতে গিয়া এই মত প্রচার করিয়া আসিয়াছেন।

(ভারতবর্ষ ফাল্গুন ১৩২৮)

আমাদের সমাজে নারী অনেক বিষয়ে পুরুষের অধীন, কিন্তু পুরুষই কি সকল বিষয়ে স্বাধীন? মানবাত্মাকে প্রকৃত স্বাধীনতা বা মুক্তিলাভ করিতে হইলে তাহাকে অনেক তপস্যা করিতে হয়। সেই তপঃসাধন (discipline) এর মধ্য দিয়া তাহার মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। একজন দার্শনিক লিখিয়াছেন:—

"Human nature in order to attain all its completeness had first of all, as it were, to lose its life in order to gain it. The individual had to sacrifice part of his all-sided development in order that he might gain it again, and in a larger measure, through the medium of society. This process is the process of civilisation. The long and, as it often seems, weary road by which man can only realise himself by self-sacrifice can only reach unity through the way of diversity, and must die to live."*

অর্থাৎ মানবাত্মা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার জন্য, তাহাকে সমাজের মধ্য দিয়া অতি সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হয়, সমাজের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া সাধনা করিতে করিতে তাহার মনুষ্যত্বের ক্রম-বিকাশ হয়। ইহাই তাহার অধীনতা স্বীকার করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ। ইহাই তাহার মৃত্যুদ্বারা পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্তি। † ইহা দ্বারাই মানব সভ্যতা গড়িয়া উঠে।

মানবাত্মা যে সাধনা দ্বারা পরস্পরের সাহচর্য্যে পূর্ণতা লাভ করে, তাহার একটির নাম বিবাহ। এই বিবাহ দ্বারাই অসম্পূর্ণ আত্মা পূর্ণতা লাভ করে, এবং স্ত্রীপুরুষ উভয়ে মিলিয়া একটি পরিবার গঠন করে। এই পরিবার হইতেই সমাজের বিকাশ, এবং সমাজের মধ্য দিয়া মানব সভ্যতার বিকাশ। বিবাহ দ্বারাই মানব গৃহস্থাশ্রমে দায়িত্ব স্বীকার করিয়া উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির দমন, ভোগলালসার সঙ্কোচ, স্নেহমমতার বিকাশ, সমাজের প্রীতি-সাধন, প্রভৃতি গুণগ্রামের অভ্যাস দ্বারা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। সেই জন্য মানবের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য বিবাহবন্ধন আমাদের সমাজে অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য। এই জন্য গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করিলে কাহারও সন্ন্যাসে অথবা মোক্ষলাভে অধিকার হয় না। বিবাহ একটি ব্রত, ইহা দ্বারা সৃষ্টিধারা রক্ষিত হয় বলিয়া ইহার অপর নাম, প্রজাপতিব্রত।

শ্রুতি বলেন—"প্রজাপতি একাকী থাকিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। সেই জন্য স্বীয় দেহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন, তাহার ফলে পতি ও পত্নী এই দুইটি রূপ হইল। এই যে স্ত্রীমূর্ত্তি ইহা আত্মারই অর্দ্ধাংশ, কেবল পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত মাত্র। সেই জন্য স্ত্রী-বিযুক্ত শরীর 'অর্দ্ধবৃগল' অর্থাৎ একটা শস্যের (মটরের) অর্দ্ধাংশের ন্যায় পতিত থাকে। দারপরিগ্রহ করার পরে তাহা পূর্ণ হয়।" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ, প্রথম অধ্যায়, চতুর্থ ব্রাহ্মণের ৩য় মন্ত্রের ভাষ্যানুবাদ)

স্ত্রী যেমন পুরুষের অর্দ্ধাংশ, স্ত্রীজাতিও সমাজের অর্দ্ধাংশ। স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতি এই উভয়ে মিলিয়া মনুষ্যসমাজ,—এমন কি পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ উদ্ভিদাদি স্থাবর জঙ্গম প্রাণিসমাজ গঠিত। জড়দেহেও স্ত্রীত্বশক্তি পুংত্বশক্তি সমানভাবে ক্রিয়া করিতেছে। কোন কোন বিশেষ জড়ে তাহা স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। যেমন magnet-এর মধ্যে positive pole ও negative pole, আকাশে positive electricity ও negative electricityর স্ফুরণ হয়। এই যে বিশ্বব্যাপী স্ত্রীত্বশক্তি ও পুংত্বশক্তি, মনুষ্য সমাজে ইহাই স্ত্রী ও পুরুষরূপে দেদীপ্যমান। সৃষ্টিধারা রক্ষার জন্য এই উভয় শক্তির পরস্পর মিলন একান্ত আবশ্যক। ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়।

---

* (The Logic of Hegel, by William, Chap VII p. 73)

† রবীন্দ্রনাথও বলেন, "ত্যাগেই লাভ হইয়া থাকে। এই আত্মবলিদানে মানবাত্মার মস্তক উন্নত হয়।"—"ভারতবর্ষ" ফাল্গুন ১৩২৮, ৪২৮ পৃঃ।

মনুষ্য সমাজকে যদি একটি নরদেহের সহিত তুলনা করা যায়, তবে তাহার এক অর্দ্ধাংশ পুরুষ ও অপর অর্দ্ধাংশ স্ত্রী। সেই দুই অর্দ্ধের মিলন দ্বারা সেই নরদেহ গঠিত। ইহার কোন অর্দ্ধই স্বাধীন নহে। সুতরাং "Rights of Men, Rights of Women" এই সকল উক্তির কোনই অর্থ নাই। স্ত্রী যে অর্থে পুরুষের অধীন, পুরুষও সেই অর্থে স্ত্রীর অধীন। পুরুষের যে অধিকার, স্ত্রীরও সেই অধিকার। কিন্তু কোন বিশেষ বিশেষ কারণে স্ত্রীজাতি পুরুষ-নিরপেক্ষ হইয়া থাকিতে পারে না। তাহার কারণ পুরুষের অত্যাচার নহে। সৃষ্টিকর্ত্তা নারীকে পুরুষ হইতে পৃথক্ ছাঁচে গড়িয়াছেন। নারীর শরীর গঠন পুরুষের শরীর অপেক্ষা কোন কোন অংশে বিভিন্ন। নারীর শরীরাবয়ব গর্ভধারণ ও সন্তান পোষণের উপযুক্ত হইয়া নির্ম্মিত। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ উদ্ভিজ্জাদি সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যেই এইরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ইহা দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রায় পরিস্ফুট। সৃষ্টিকর্ত্তা নারীজাতির উপরে গর্ভধারণ ও সন্তান পোষণের ভার অর্পণ করিয়া তাহাকে পুরুষজাতি হইতে পৃথক্ করিয়াছেন। এই কারণে নারীজাতি পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল এবং পুরুষের অধীন। অতএব যে নারী পুরুষ-নিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করেন, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করেন না, তিনি স্বভাবের নিয়ম লঙ্ঘন করেন। আমাদের হিন্দু সমাজে পুরুষ ও নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে বাধ্য—কারণ এই নিয়ম স্বভাবের অনুকূল এবং সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রেত।

কিন্তু আমাদের সমাজে নারী পুরুষের অধীন বলিয়া তাহাতে নারীর মনুষ্যত্ব লাভের কোন ব্যাঘাত হয় কি? আমি পুর্ব্বেই দেখাইয়াছি, মনুষ্যত্বলাভ করিতে হইলে স্ত্রী পুরুষ সকলকে সমাজের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে। কারণ সমাজই মনুষ্যোচিত গুণগ্রাম বিকাশের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। সমাজ ত্যাগ করিয়া অরণ্যে বাস করিলে কাহারও কাহারও ব্রহ্মত্ব লাভ হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ নরনারীর মনুষ্যত্ব লাভের পক্ষে সমাজে বাস করাই স্বাভাবিক। হিন্দু রমণী পুরুষের সহিত বিবাহ বন্ধনে মিলিত হইয়া সমাজে বাস করেন বলিতে সেই বিবাহ বন্ধনই প্রেমের বন্ধনে পরিণত হয়। সেই প্রেমের বন্ধন দ্বারা পরস্পরের অধীনতার ভাব একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। স্বামী স্ত্রীর প্রেমের অধীন হইয়া অর্থ উপার্জ্জনের ভার গ্রহণ করেন, আবার স্ত্রীও স্বামীর প্রেমের অধীন হইয়া গৃহের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণপূর্ব্বক উভয়ের ও পরিবারস্থ সকলের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যাদি বিধান করেন। এইরূপে হিন্দুরমণী কর্ম্মক্ষেত্রের কঠোর জীবনসংগ্রাম হইতে সুরক্ষিত হইয়া আছেন।

এস্থলে হয়ত কেহ কেহ বলিবেন, কর্ম্মক্ষেত্রের কঠোরতার মধ্যে পড়িতে হয় না বলিয়াই ত এদেশের নারীজীবন পঙ্গু হইয়া রহিয়াছে,—পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা দ্বারাই ত তাহার সম্যক্ বিকাশ হইতে পারে।

সম্যক্ বিকাশ হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই বিকাশপ্রাপ্ত জীব আর তখন নারী থাকে না, তখন তাহা এক রকম পুরুষশব্দবাচ্য হইয়া পড়ে। নারী পুরুষের ন্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, পুরুষের ন্যায় কর্ম্মক্ষেত্রে ভাল মন্দ সব প্রকার সংসর্গে পড়িয়া, নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতার পেষণে রমণীসুলভ সহৃদয়তা কোমলতা প্রভৃতি গুণনিচয় হারাইয়া একপ্রকার কিম্ভূত কিমাকার জীবে পরিণত হয়। আমেরিকার মার্কিণ প্রদেশের রমণীগণ এইরূপ পুরুষোচিত শিক্ষা পাইয়া পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা সময় সময় আমরা সংবাদ পত্রাদিতে পাঠ করিয়া চমকিত হই। মার্কিণ রমণীগণ এখন অনেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করেন না; করিলেও অনেক সময়ে সে বিবাহ অত্যন্ত ক্ষণভঙ্গুর। অতি সামান্য কারণে তাহা বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। ফরাসীদেশেও বিবাহ প্রথার তেমন আদর নাই, সেই দেশের প্রজা-বৃদ্ধির জন্য গবর্ণমেণ্টকে আইন করিতে হইয়াছে। ইংলণ্ডের রমণীগণ এখনও ততটা অগ্রসর হন নাই, এখনও ইংরেজ সমাজে বিবাহিত

জীবনের গৌরব আছে।* কিন্তু কোন কোন রমণীকে কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয় হয় বলিয়া নারী চরিত্রের পবিত্রতা নষ্ট হইতেছে। সেদিন সংবাদপত্রে পড়িতেছিলাম, ফৌজদারী আদালতে প্রতারণা, চুরি, পকেটমারা প্রভৃতি অপরাধের জন্য অনেক সভ্যাভব্যা সুশিক্ষিতা রমণীর দণ্ড হইয়া থাকে, বরং সেই প্রকার অপরাধীর সংখ্যা এখন ক্রমে বাড়িতেছে। সুতরাং কর্ম্মক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিলে যেমন রমণীগণ পুরুষের ন্যায় স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জত করিতে সমর্থ হন, সেইরূপ কঠোর প্রতিযোগিতা দ্বারা তাঁহাদের সুকোমল চিত্তবৃত্তির বিপর্য্যয় ঘটিয়া পাপ সংস্পর্শে তাঁহাদের চরিত্র কালিমালিপ্ত হওয়ার আশঙ্কাও যথেষ্ট আছে। ইহাকে নারীজীবনের সার্থকতা কি প্রকারে বলা যায় তাহা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য।

আজকাল পুরুষদিগের মধ্যেই জীবন-সংগ্রাম যেরূপ কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও কতশত যুবক জীবিকা নির্ব্বাহের কোন উপায় সংঘটন করিতে পারিতেছেন না, ইহার পরে যদি রমণীগণ অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া আসিয়া তাঁহাদের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতে আরম্ভ করেন, তবে সমাজের কি দশা হইবে ভাবিতেও পারি না। এখন রমণীগণ তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার পুরুষের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। পুরুষগণও স্নেহমমতার বশবর্ত্তী হইয়া যথাসাধ্য সেই ভার নিজের স্কন্ধে অম্লানবদনে বহন করিতেছেন। ইহাতে কোন প্রকার প্রতিযোগিতা নাই, অনায়াসেই সংসার চলিয়া যাইতেছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে পাশ্চাত্য আদর্শ অনুকরণ করিয়া রমণীগণ যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেন, এবং মার্কিণ দেশীয় রমণীগণের ন্যায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে অনিচ্ছুক হন, তবে তদ্দ্বারা তাঁহাদের নারীত্বের বিকাশ ত হইবেই না, অধিকন্তু তদ্দ্বারা হিন্দুজাতি বিনাশের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইবে। লোকগণনার দ্বারা দেখা গিয়াছে, এবার ভারতবর্ষের, বিশেষত বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি অতি সামান্যই হইয়াছে। বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা মাত্র শতকরা ২ হারে বাড়িয়াছে। ম্যালেরিয়া, কলেরা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, প্লেগ, বসন্ত প্রভৃতি রোগে, বিশেষতঃ দারিদ্র্য নিবন্ধন দুর্ব্বলতার জন্য ক্রমেই লোকক্ষয় হইতেছে। ইহার পরে যদি সন্তানোৎপাদন কমিয়া যায়, তবে এই অধঃপতিত জাতির বাঁচিয়া থাকিবার আশা কোথায়? অতএব বরপণ প্রথার প্রতিকারের জন্য শরৎবাবু যে কন্যার পিতামাতাদিগকে মেয়ের বিবাহ একেবারে না দিবার পরামর্শ দিয়াছেন—তাহা চোরের উপর রাগ করিয়া কলার পাতায় ভাত খাওয়ার ন্যায় কতদূর সমীচীন তাহা সকলে বিবেচনা করিবেন। পাশ্চাত্য প্রথার অনুকরণ করিতে যাইয়া ব্রাহ্মসমাজের কতকাংশ এই অল্পকালের মধ্যেই যে সঙ্কুল সমাজ-সমস্যার মধ্যে পড়িয়াছেন, তাহাও একবার সকলের বিবেচ্য। উক্ত সমাজে অনেক রমণীকে ২০ ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অনূঢ়া থাকিতে দেখা যায়, অনেকে অবিবাহিত অবস্থায়ই জীবন যাপন করেন। কিন্তু এদিকে লোকগণনায় ব্রাহ্মসমাজের লোকসংখ্যা একেবারেই বাড়িতেছে না।

পাশ্চাত্য সমাজের তুলনায় হিন্দু রমণীগণ অনেক বিষয়ে পরাধীন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের কি স্বাধীনতা একেবারেই নাই? তাহারা কি পুরুষের গোলামী করিয়াই জীবন যাপন করে? তাহা ত মনে হয় না। সকলেই জানেন, নিজ নিজ পরিবারের মধ্যে হিন্দুনারী অনেক বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনি গৃহিণী, অর্থাৎ গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। তিনি অনেক বিষয়ে স্বামীর উপর প্রভুত্ব করেন। তাঁহার পুত্র

---

* রাডিয়ার্ড কিপ্লিং তাঁহার এক উপন্যাসে, কোনও এক স্ত্রীচরিত্রকে female woman বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তাঁহার মতে ইংলণ্ডেও male woman এবং female woman এই দুই শ্রেণীর woman আছে।

—মাঃ বঃ সম্পাদক।

কন্তাগণ তাঁহার অনভিমতে কোন কাজ করিতে পারে না। গৃহকর্ত্তা অর্থ উপার্জ্জন করিয়াই খালাস, গৃহের সুখ স্বচ্ছন্দতার বিধান সম্পূর্ণ গৃহিণীর হাতে। সুতরাং এ বিষয়ে একজন ইংরেজ রমণীর সহিত হিন্দু রমণীর কোন পার্থক্য নাই। তবে যে স্থানে স্বামীর দুর্ব্যবহারের জন্য গৃহে তিষ্ঠান তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে, তখন তিনি ইংরেজ রমণীর ন্যায় গৃহত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু সেরূপ ঘটনা, রেলের কলিসনের ন্যায় নিতান্ত বিরল। সেরূপ স্থলেও ইচ্ছা করিলে তার দাঁড়াইবার স্থানের অভাব হয় না। কারণ হিন্দুসমাজে দুরবস্থাপন্ন নিকট আত্মীয়কে গৃহে স্থান দেওয়ার প্রথা এখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। তবে পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষে আমাদের স্বার্থপরতা অত্যন্ত বাড়িতেছে ও উদারতা কমিতেছে। সেই জন্য প্রতিপালকের নিষ্ঠুর ব্যবহারে অনেক রমণীকে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে দেখা যায়। তাহার কারণ পুরুষের শিক্ষার দোষ ও মনুষ্যত্বের অভাব। আমাদের সমাজের পুরুষগণ সুশিক্ষার অভাবে ও কুশিক্ষার প্রভাবে ক্রমেই মনুষ্যত্বহীন হইতেছে। তাহারা আবার মানুষ হইলে, নারীজাতির আর এ প্রকার দুঃখ থাকিবে না।

আমরা এইরূপে দেখিলাম, কি পুরুষ কি নারী উভয়েরই প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে প্রথমে অধীনতা স্বীকার একান্ত আবশ্যক। উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সমাজের শাসনাধীনে থাকিলে তবে মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে পারে। নারীর কোন কোন বিষয়ে পুরুষের অধীন হওয়া স্বাভাবিক। সেই অধীনতা স্বীকার দ্বারাই তাহার নারীত্বের বিকাশ হয়। নারীপ্রকৃতি পুরুষের প্রকৃতি হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচক Rev. E. J. Thomson তাঁহার Rabindranath Tagore নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতের সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন—

"Woman is different from man and therefore to him (Rabindra Nath) the modern outcries to make her equal with man are meaningless. He would have her remain a woman, a centre of love and inspiration without which the world is poverty-stricken." (Page 94)

নারীর প্রকৃতি পুরুষের প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া, তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রও বিভিন্ন। নারীর কর্ম্মক্ষেত্র গৃহের অভ্যন্তরে, পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র গৃহের বাহিরে। সুতরাং নারীর শিক্ষা দীক্ষাও সে কর্ম্মক্ষেত্রের উপযোগী হওয়া উচিত। সেইরূপ শিক্ষা দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া নারী যদি তাঁহার কর্ত্তব্য পথে বিচরণ করিতে পারেন, তবেই তাঁহার জীবন সার্থক হয়। সেজন্য তাঁহাকে গৃহের বাহির হইয়া কর্ম্ম ক্ষেত্রে পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তাঁহার নারীচরিত্র বিকাশের পক্ষে গৃহই প্রশস্ত ক্ষেত্র। তিনি বিদ্যাশিক্ষা করুন, তিনি শিল্পকলায় পারদর্শিতা লাভ করুন, তাঁর চরিত্র বিকাশের জন্য এরূপ শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে। সুখের বিষয় আজকাল অনেক হিন্দু মহিলা উচ্চ শিক্ষা পাইতেছেন এবং গ্রন্থাদি রচনা দ্বারা যশস্বিনী হইতেছেন। কিন্তু আমার মতে নারীর হৃদয়ের শিক্ষাই তাঁহার প্রকৃত শিক্ষা। কারণ হৃদয়ের শিক্ষা দ্বারাই তাঁহার নারীত্বের সম্যক্ বিকাশ হয়। তিনি হৃদয়ের স্নেহ প্রীতির বন্ধনে পরিবারের সকলকে বাঁধিয়া রাখিবেন, তিনি প্রেমের দ্বারা স্বামীর হৃদয় জয় করিয়া, তাহার জীবনের ধ্রুবতারা হইয়া তাহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরণা দান করিবেন, তিনি নিঃস্বার্থ সেবা দ্বারা শ্বশুরকুলের সম্রাজ্ঞী হইয়া গৃহে অধিষ্ঠিতা হইবেন। এই প্রকার শিক্ষার দ্বারাই নারী পুরুষের "centre of love and inspiration" হইতে পারেন, এবং ইহাতেই তাঁহার পূর্ণ বিকাশ।

এখন দেখা যাক, সতীত্বদ্বারা নারীজীবনের সার্থকতালাভের কোন ব্যাঘাত হয় কি না।

নারী জীবনের সার্থকতা যদি পুরুষের সাহচর্য্য দ্বারা সম্পাদিত হয়, তবে নারীর সতীত্ব সেই সার্থকতার অন্তরায় না হইয়া বরং সেই সার্থকতা আনয়ন করে। আমাদের দেশে সতী নারী পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী, সতী নারী পুরুষের সহধর্ম্মিণী, সতী নারী পুরুষের গৃহলক্ষ্মী—"গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।" সতীনারী প্রেমের দ্বারা স্বামীর হৃদয় জয় করিয়া তাহার সহিত এক মন এক প্রাণ এক আত্মা হইয়া যান, সুতরাং স্বামীর জীবন সার্থক হইলে সেই সঙ্গে তাঁহার জীবনও সার্থক হয়। তাঁহার জীবন সার্থক করিবার জন্য আর পৃথক উপায় অবলম্বন করিতে হয় না। এই জন্য শাস্ত্র বলিতেছেন—"নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞঃ"—স্ত্রীলোকদিগের আর পৃথগ্ভাবে কোন ধর্ম্মকর্ম্মের প্রয়োজন নাই। আমরা এই আদর্শ সতীনারীর চিত্র পাই তিনটি পৌরাণিক চরিত্রে—সতী, সীতা ও সাবিত্রীতে। সুতরাং নারীর সতীত্ব বুঝিতে হইলে তাঁহাদের চরিত্র-মহিমা বুঝিতে হইবে। সকলেই জানেন সাবিত্রী নিজের সতীত্ব দ্বারা মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন, সীতা তাঁহার চরিত্রবলে ত্রিলোক জয় করিয়া ছিলেন, আর সতী তাঁহার তপস্যা দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবের হৃদয় জয় করিয়া তাঁহার সহিত একাত্মভাবে মিশিয়াছিলেন।

সাবিত্রী পিতার আদেশে নিজের বর নির্ব্বাচন করিতে বাহির হইয়া দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই জানিতে পারিলেন সত্যবান স্বল্পায়ু। সেই জন্য তাঁহার পিতা মহারাজ অশ্বপতি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সাবিত্রীকে অন্য বর বরণ করিতে আজ্ঞা দিলেন, কারণ তখনও সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর বিবাহ হয় নাই। কিন্তু সেই আদর্শ সতীর হৃদয়মুকুরে যে পতির চিত্র একবার প্রতিফলিত হইয়াছে, সেখানে অন্য মূর্ত্তি কি প্রকারে স্থান পাইবে? তাই তিনি পিতাকে বলিলেন, "সত্যবান দীর্ঘায়ু হউন বা স্বল্পায়ু হউন, সগুণ হউন বা নির্গুণ হউন, আমি যখন একবার তাঁহাকে পতি বলিয়া মনে মনে বরণ করিয়াছি, তখন এ জীবনে অন্য পতি গ্রহণ করিব না।" ইহার পরে নির্দ্দিষ্ট দিনে সত্যবানের মৃত্যু হইল, যম তাঁহাকে স্বীয় আলয়ে গ্রহণ করিতে আসিলেন, কিন্তু সাবিত্রী তাঁহাকে তাঁহার ঐকান্তিক পতিপ্রেম দ্বারা এরূপ মুগ্ধ করিলেন যে যমরাজ সত্যবানকে তাঁহার জীবন ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন। সাবিত্রী-চরিত্রের শিক্ষা এই, যে নারী মনে মনেও পরপুরুষের কামনা করেন তিনি অসতী। আবার একজনের প্রেমে পড়িয়া যে নারী কোন কারণবশতঃ তাহাকে বিবাহ না করিয়া অন্য পুরুষকে বিবাহ করেন তিনিও অসতী। সুতরাং পাশ্চাত্য সমাজের তুলনায় সাবিত্রীর আদর্শ কত উচ্চ!

সীতাদেবী রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া অশোক বনে অবরুদ্ধ হইয়া আছেন। রাবণ তাঁহাকে কিছুতেই বশীভূত করিতে না পারিয়া, দুইমাস সময় দিয়াছেন। ইহার মধ্যে তিনি রাবণের ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মত না হইলে, রাবণ তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ভক্ষণ করিবেন। এইরূপ সময়ে হনুমান আসিয়া, সীতাকে পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিকট লইয়া যাইতে প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু জানকী এরূপভাবে পলায়নে সম্মত হইলেন না। তিনি আদর্শ সতী, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক কি পরপুরুষ স্পর্শ করিতে পারেন? আবার রাবণ যেন তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে তস্করের ন্যায় হরণ করিয়া আনিয়াছিল, তাই বলিয়া তিনি রঘুকুলবধূ, তিনি কি প্রকারে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিবেন? এরূপ ভাবে পলায়ন করিলে তাঁহার স্বামী সেই রঘুকুলতিলকের বীরত্বে যে কলঙ্ক স্পর্শিবে। তাই তিনি হনুমানকে বলিলেন—

"যদি রামো দশগ্রীবমিহ হত্বা সরাক্ষসম্।
মামিতো গৃহ্য গচ্ছেত তৎ তস্য সদৃশং ভবেৎ ॥"

—"রাম যদি দশাননকে সবংশে নিধন করিয়া আমাকে লইয়া যাইতে পারেন, তবেই তাঁহার ন্যায় বীরের উপযুক্ত কার্য্য হয়।" অর্থাৎ সীতার নিকট পতিলাভ অপেক্ষাও পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বড়। নিজের প্রাণ যায়

য়েও ভাল, তবুও তাঁহার বীরপতির বীরধর্ম্মে কলঙ্ক স্পর্শ না হয়। আবার দেখিতেছি, রামচন্দ্র যেমন ক্ষত্রবীর, তেমনি তিনি রাজা। তিনি সেই রাজধর্ম্ম পালনের জন্য নিরপরাধা সীতাকে বনবাসে পাঠাইলেন। তখনও সীতা স্বামীর ধর্ম্মরক্ষার জন্য সেই বনবাসক্লেশ অম্লানবদনে সহ্য করিলেন। সতী রমণী পতির ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য অকাতরে আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারেন, সীতা-চরিত্রে আমরা এই শিক্ষা পাই।

দক্ষ প্রজাপতির কন্যা সতীর মন প্রাণ আত্মা শিবের সহিত এরূপভাবে মিশিয়া গিয়াছিল যে, দক্ষ যখন যজ্ঞস্থলে শিবনিন্দা করিলেন, তখন সতী তাঁহার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। কিরূপ কঠোর সাধনা দ্বারা পতির সহিত এরূপ একাত্ম-ভাব জন্মিতে পারে, তাহা এই সতীই তাঁহার পরজন্মে হিমালয়-তনয়া উমা রূপে দেখাইয়াছেন। তিনি পতি-লাভের জন্য যে দুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা অবশেষে বিশ্বপতিকেই পতিরূপে পাইয়াছিলেন। বিশ্বপতিকে লাভ করা যদি নারী জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহা পাতিব্রত্য সাধনা দ্বারাই পাওয়া যায়, উমার তপস্যাকাহিনীতে আমরা এই শিক্ষা পাইতেছি।

আমরা সতীশিরোমণি সতী, সীতা, সাবিত্রীর চরিত্র আলোচনা করিয়া কি পাইতেছি? আমরা পাইতেছি, সতীত্বধর্ম্মপালন নারীজীবনের এক কঠোর তপস্যা। সেই তপঃসাধন দ্বারাই নারীজীবন সার্থক হয়। সতী নারীর চরিত্রে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ দৃষ্ট হয়। সতী নারীর আত্মত্যাগ, সংযম, সহিষ্ণুতা ও একনিষ্ঠ প্রেমের দ্বারাই তাঁহার নারীজীবন সফল হয়। স্বরাজ সাধনায় যদি এই সকল গুণের আবশ্যক হয়, তবে প্রকৃত সতী রমণী দ্বারাই স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হইবে।

এস্থলে কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, স্বার্থপর পুরুষগণ নারীদিগকে perpetual slave অর্থাৎ চিরদাসী করিয়া রাখিবার জন্যই সতী, সীতা, সাবিত্রীর কাল্পনিক কাহিনী রচনা করিয়াছে;—আর যত স্বার্থত্যাগ শিক্ষা কি কেবল নারীর বেলায়? নারীকে "সাবিত্রী সমানাস্থ" বলিয়া পাঠ লেখা হয়, কিন্তু কৈ পুরুষকে ত সত্যবান হওয়ার জন্য কেহ আশীর্ব্বাদ করে না।

তাহার কারণ এই যে, নারী যদি সাবিত্রীতুল্যা হন, তবে তিনি তাঁহার স্বামীকে অধোগতি হইতে, এমন কি মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে পারেন। এমন কোন্ নরাধম পুরুষ আছে, যে তাহার সাবিত্রীসমা পতিব্রতা তপস্বিনী স্ত্রীর চরিত্র-প্রভাবে বিশুদ্ধ চরিত্র না হইয়া থাকিতে পারে? যাঁহারা এরূপ কথা বলেন, তাঁহারা কি বলিতে চান যে, স্বামী দুরাচার হইলে তাহার প্রতিহিংসা স্বরূপ স্ত্রীকেও দুশ্চরিত্রা হইতে হইবে? ইহাই কি Woman's Rights কথার অর্থ? সীতা সাবিত্রীর আদর্শ অনুসরণ করিতে যাইয়া নারী যদি পুরুষের চিরদাসী হয়, তবে তাহাতে ত নারীর লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। কারণ সেই উচ্চতম আদর্শ অনুসারে জীবন গঠন করিতে হইলে যে সকল সদ্গুণের বিকাশ হয়, তাহাতেই নারীজীবন সার্থক হইতে পারে। মানবাত্মা এইরূপ ত্যাগের দ্বারাই পূর্ণতালাভ করিতে পারে, মরিয়া আবার বাঁচিয়া উঠে। এই সকল প্রশ্ন কেবল তাঁহাদের মনেই উদয় হয়, যাঁহারা শরীরের দক্ষিণ হস্তকে বাম হস্তের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করেন।

আবার কেহ হয়ত বলিবেন, তোমার "সর্ব্বভূতে সমদর্শন", "আত্মার স্বাধীনতা", সীতা সাবিত্রীর উচ্চ আদর্শ, পুস্তকের পৃষ্ঠাতেই শোভা পায়। সংসার এখনও সেইরূপ স্বর্গরাজ্য (Utopia) হইবার ঢের দেরী। বাস্তব জীবনে আমরা কি দেখিতে পাই? যে রমণী নিজের দুর্ব্বলতার জন্য সেইরূপ উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে না, অথবা যে রমণীর পাষণ্ড স্বামী তাহাকে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়া গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেয়, তাহার জীবন কি বৃথা যাইবে? তাহার জীবনের সার্থকতা কিসে হইবে?

হিমালয়ের চূড়ার ন্যায় সতী, সীতা, সাবিত্রীর উচ্চতম আদর্শ অধিকাংশ রমণীর পক্ষেই দুরধিগম্য সন্দেহ নাই।*

---

* মহাকবি তুলসীদাস তাঁহার রামায়ণে চারিপ্রকার সতী নারীর বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

মানব জীবনের উচ্চতম বিকাশের জন্য তাহার আদর্শ চিরদিনই অতি উন্নত ধ্রুবতারার ন্যায় সেই আদর্শ সাধারণ নরনারীকে কর্ত্তব্যপথে চালিত করে। কিন্তু যাহারা এই সংসার পথে চলিতে চলিতে দৈব দুর্ব্বিপাকে পড়ে, অথবা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তাহাদিগকে ত দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিতেই হইবে। যে রমণী স্বামীর অত্যাচারে গৃহত্যাগিনী হইতে বাধ্য হয়, অথবা নিজের দুর্ব্বলতার জন্য পাতিব্রত্য ধর্ম্ম পালনে অসমর্থ, তাহার জীবনে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। তাহা তাহার কর্ম্মফল বলিতে হইবে। কিন্তু তাহাকে ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার সহিত সেই দুঃখভোগের মধ্য দিয়া ভাবী জীবন সার্থক করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। তবে একথা ঠিক যে, কোন রমণীই অদৃষ্টের উপর রাগ করিয়া পাপ প্রলোভনে গা ঢালিয়া দিয়া তাহার জীবন সার্থক করিতে পারে নাই—শরৎ বাবুর অভয়া সৌদামিনী পারে নাই, নরেশ বাবুর শুভ্রও পারে নাই। সৌদামিনী বরং তীব্র অনুতাপের দ্বারা কতকটা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, অবশেষে ক্ষমার অবতার স্বামীর পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নারীজীবন সার্থক করিবার অবসর পাইয়াছিল। কিন্তু অভয়া তাহার দুরদৃষ্টের জন্য দুঃখ ঘাড় পাতিয়া স্বীকার না করিয়া, পরপুরুষ রোহিণীর দ্বারা তাহার প্রেমলালসা ও মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া জীবন সার্থক করিতে পারিয়াছিল কি না, তাহা গ্রন্থকারই বলিতে পারেন। তবে আমরা এইটুকু বুঝি, যে, স্বামিপরিত্যক্তা শকুন্তলা তপস্যাদ্বারা তাঁহার দুঃখ দূর করিবার অভিলাষিণী হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার স্থান হইয়াছিল স্বর্গে। কিন্তু দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া যদি তিনি নারীর অধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্য পরপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন,* তবে তিনি পৃথিবীতেই থাকিয়া যাইতেন—এমন কি হয়ত তাঁহাকে নরক দর্শন করিতে হইত।

আবার হয়ত কেহ বলিবেন, সতী, সীতা, সাবিত্রীর আদর্শ সত্যযুগে চলিয়াছিল, এখন সময়ের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে;—এখন সে সকল প্রাচীন আদর্শ out of date অর্থাৎ অচল হইয়া পড়িয়াছে। এখনকার সময়োপযোগী নারীর আদর্শ হইতেছেন,—Miss Nightingale—যিনি উচ্চ বংশ-গৌরব তুচ্ছ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে হতাহত সৈনিকদিগের সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন; George Eliot (Miss Mary Evans)—যিনি অনেকগুলি উচ্চশ্রেণীর উপন্যাস লিখিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন; Miss. Mary Carpenter—যিনি খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম প্রচার ব্রত গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া এদেশের অনেক হিত-সাধন করিয়াছিলেন; Miss. Pankhurst,—যিনি ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদিগের পূর্ণ অধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্য পুরুষদিগের সহিত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য জগতে এই সকল মহিলা তাঁহাদের কৃত কার্য্য দ্বারা চিরযশস্বিনী হইয়াছেন স্বীকার করি। কিন্তু সকল সমাজের মনুষ্যত্বের মানদণ্ড (Standard) এক নহে। সকল দেশে মানবসভ্যতার মূল উদ্দেশ্য এক—অর্থাৎ মানবজীবনের পূর্ণ বিকাশ,—হইলেও দেশভেদে ও জাতিভেদে তাহার বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠে। William Wallace তাঁহার উল্লিখিত গ্রন্থে সেই বিকাশের প্রণালী এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"It is possible sometimes to identify civilisation with the material increase

---

উত্তমকে অস বস মন মাহি।
স্বপনেহু আন পুরুষ জগ নাহি॥
মধ্যম পরপতি দেখহি কৈসে।
ভ্রাতা পিতা পুত্র নিজ যৈসে॥
ধর্ম্ম বিচারি সমঝি কুল রহহি।
সে নিকৃষ্ট তিয় শ্রুতি অস কহহি॥
বিনু অবসর ভয়তে রহ যোই।
জানেউ অধম নারী জগ সোই॥—(অরণ্যকাণ্ড)
—মাঃ বঃ সম্পাদক।

* শকুন্তলা দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া যদি তাঁহার নামে Maintenance Suit আনিতেন, তবে কেমন হইত?
- লেখক।

in the means of producing enjoyment or with the progress of scientific teaching as to the laws of those material phenomena on which material civilisation is largely dependent. It is possible sometimes to take as its test the stores of artistic works, and the extension of a lively and delicate love of all that is beautiful and tasteful. One may identify it with a high-toned moral life, and with an orderly social system. Or one may maintain that the real civilisation of a country presupposes a lofty conception and reverent attitude to the supreme source of all that is good and true and beautiful." (pp. 73·74)

অর্থাৎ কোনও দেশে, সভ্যতার বিকাশ তাহার পার্থিব সুখসমৃদ্ধি ও বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা সেই সুখ বৃদ্ধির নিত্যনূতন উপায় উদ্ভাবনের দ্বারা প্রকাশ পায়; কোনও দেশে তাহা শিল্পকলার চরম উন্নতি, ও নানাপ্রকার শ্রেষ্ঠ ও সুচারু শিল্পদ্রব্য-সম্ভারের দ্বারা পরিচিত; আবার কোনও দেশে সভ্যতার উন্নতির মহৎ, নৈতিক জীবনের উচ্চ আদর্শ ও সুসংযত সমাজ প্রতিষ্ঠা। আবার কোনও দেশের সভ্যতা সত্যশিবসুন্দর পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তির পরাকাষ্ঠা দ্বারা পরিমিত হয়।—বলাবাহুল্য হিন্দুজাতির সভ্যতার মধ্যে এক সময়ে ধর্ম্মভাব প্রবলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সেই জন্য মানবজীবনের ঐহিক সুখের (material prosperity) দিকে বেশী লক্ষ্য না করিয়া হিন্দুজাতি আত্মার পূর্ণ পরিণতিলাভের জন্য সমাজগঠন করিয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত হিন্দু নরনারীর জীবনের সার্থকতা ধর্ম্মের দিক দিয়াই অধিক পরিগণিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে দেশের সুখসমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু তাহার জন্য আমাদের জাতীয় চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইবে কিনা তাহা সুধীগণের বিবেচ্য। পূর্ব্বকালে দেশের স্বাধীনতা ও সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মজীবনেরও চরম উন্নতি হইয়াছিল। যদিও আমরা বর্ত্তমান সময়ে অধঃপতনের চরমসীমায় উপনীত হইয়াছি, তথাপি এখনও আমাদের মধ্যে সেই ধর্ম্মজীবনের যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহা দেখিয়া একজন সহৃদয় ইংরাজ কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন। রবীন্দ্রশিষ্য বিশ্ববিখ্যাত Rev. C. F. Andrews সংপ্রতি To the Indians" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"After long and earnest meditation and enquiry, the one conclusion which I am able to draw more certainly than any other is this, that, in India the religious motive, which lies deepest of all and at the back of all as its very source and fount of inspiration, has been always vitally active. This has been the salt of purification, and which has again and again renewed India and saved Indian civilisation from decay * * * * * Eygpt has perished, Babylon has perished. But India which was their contemporary has not perished. She is still producing men of genius in religion, philosphy and art. This vast antiquity and perpetual youth of India is a phenomenon almost unique in the history of mankind. * * * * European civilisation has not yet got through its own youthful centuries of growth, and it is already showing signs of decay. But India is still bringing forth fruit in her old age. * * * * What is then the salt without which Indian civilisation would long ago have lost its savour? I find it in one thing, namely, the deep religious spirit which penetrated from the first the domestic life and made it pure and healthy,—that deep religious spirit, which made countless Indian thinkers and saints ready to sacrifice all that earth holds dear, if only they could attain to the Truth."

রেভারেণ্ড এন্‌ড্রুজ্ সাহেবের সাক্ষ্য দ্বারা আমরা পাইতেছি, একমাত্র ধর্ম্মভাবই এই হিন্দুজাতিকে এতদিন জীবিত রাখিয়াছে—হিন্দুর গার্হস্থ্য জীবনে এই ধর্ম্মভাবই তাহাকে সুস্থ ও পবিত্র রাখিয়াছে। বলাবাহুল্য, হিন্দুনারীর সতীত্ব ও পাতিব্রত্যই আমাদের গার্হস্থ্যজীবনের প্রধান অবলম্বন। হিন্দুজাতি যদি তাহাদের জাতীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করে, তবে হিন্দুনারীর পাতিব্রত্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। কারণ সেই পাতিব্রত্য দ্বারাই তাহার নারী-জীবনের চরম সার্থকতা এবং সেই পাতিব্রত্যই হিন্দুজাতির প্রতিষ্ঠা।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

মতভেদ

অত্যাচার বর্ব্বরতার লক্ষণ। প্রাচীনকাল হইতে এ পর্য্যন্ত মতভেদের ফলে মানুষ মানুষের উপর যে সকল ভীষণ অত্যাচার করিয়াছে তাহা স্মরণ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তথাপি মতভেদ চিরদিনই হইতেছে, চিরদিনই হইবেও। শুধু মানুষের মধ্যে নহে, ইতর প্রাণিগণের মধ্যেও মতভেদ হইয়া থাকে, হইতেছে ও হইবে। দুইজন দশজন একত্র থাকিতে হইলেই মতভেদ অনিবার্য্য। কিন্তু এই কারণ বিভিন্ন মনুষ্য সমাজে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া উপস্থিত করে। ইতর প্রাণী সমাজেও সর্ব্বক্ষেত্রে সমান প্রতিক্রিয়া উপস্থিত করে না। বিবর্ত্তনবাদ এক্ষণে বৈজ্ঞানিকগণ-মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং ইতরপ্রাণী সমাজের প্রতিক্রিয়া বিবেচনা না করিলে মানব সমাজের প্রতিক্রিয়া সম্যক্ উপলব্ধ হইবে না।

কোন-কোন ইতর প্রাণিগণ মধ্যে সমাজ গঠিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার অবস্থা সর্ব্বত্র একরূপ নহে। কোনও ইতর প্রাণী কেবলমাত্র সঙ্গমকালে দুইটীতে একত্র হয়; ঐ কাল অন্তে ঐ দুইটিতে আর কোন সম্বন্ধই থাকে না; উহারা সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। অন্য ইতর প্রাণী সঙ্গমকালে দুইটিতে একত্র হইলেও, সে সম্বন্ধ অচিরে ছিন্ন হয় না; উহারা দীর্ঘকাল অথবা আমরণ একত্রই বাস করে। অপর ইতর প্রাণী আত্মরক্ষার অথবা আহার সংগ্রহের নিমিত্ত ন্যূনাধিক কাল একত্র থাকে; ঐ কারণের শেষ হইলেই একত্র অবস্থারও শেষ হয়। অবশেষে কোন কোন ইতর প্রাণী বহুসংখ্যক একত্র হইয়া নিয়তই বসবাস করে। যাহারা কোন কারণ বশতঃ অস্থায়ীভাবে একত্র হয়, তাহাদিগের অবস্থাকে সমাজ বলা যায় না। আমি এই অবস্থাকে নৈমিত্তিক সংশ্রব * বলিব। কিন্তু যাহারা বহুসংখ্যক আজীবন নিয়তই একত্র বসবাস করে, তাহাদিগের অবস্থাকেই প্রকৃতপক্ষে সমাজ বলা যায়। নৈমিত্তিক সংশ্রব দ্বিবিধ, তাহা উপরে বলা হইয়াছে। কুকুর বিড়াল ইত্যাদি প্রাণী সমাজবদ্ধ নহে, ইহাদিগের সংশ্রবও কামজ মাত্র এবং ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু কোন কোন জাতীয় পারাবতের এবং ঘুঘুর সংশ্রব কামজ হইলেও দীর্ঘস্থায়ী—হয়ত আমরণ স্থায়ী। বক, শৃগাল, হরিণ, হস্তী প্রভৃতি প্রাণী আত্মরক্ষা অথবা আহার সংগ্রহের নিমিত্ত দলবদ্ধ হয়, এ অবস্থাও অস্থায়ী। কিন্তু মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা প্রভৃতি (মেরুদণ্ডহীন সুতরাং দেহাংশে অনুন্নত) প্রাণী সমাজবদ্ধ না হইয়া থাকেই না; উহাদিগের এই অবস্থা আমরণস্থায়ী।† ইতর জীবগণ মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বানর; ইহাদিগের মধ্যে কোন কোন শ্রেণী প্রায় মানুষের মত; যেমন গরিলা,

---

* Gregarious mass.

† ইহাদিগের সমাজে কর্ম্মবিভাগ সুপ্রতিষ্ঠিত।

ওরাংওটাং, শিম্পাঞ্জি। এ সকল উচ্চ শ্রেণীস্থ প্রাণীও পিপীলিকাদিগের ন্যায় উন্নত ও চিরস্থায়ী সমাজ গঠন করিতে পারে নাই। ইহাদিগের সামাজিক অবস্থা সর্ব্বক্ষেত্রে উন্নতও নহে, চিরস্থায়ীও নহে। এই সকল অবস্থায় মতভেদের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন।

মত প্রথমতঃ ইচ্ছা হইতে জাত হয়। এই সময়ে ইচ্ছায় ও মতে বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না। ইচ্ছার সমতা মধ্যেও বিরোধ অথবা ভেদ নিহিত থাকিতে পারে। একখণ্ড অস্থির লোভে উভয় পশুকে দ্বন্দ্ব এবং সংগ্রাম করিতে সকলেই দেখিয়াছেন। ঈদৃশ স্থলে ইচ্ছার সমতা অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। এক্ষেত্রে উভয় পশুই যেন উভয়কে বলিতেছে, "অস্থিখণ্ড আমি লইব, তুমি পাইবে না।" ইহাতেই বিরোধ সৃষ্টি হয়; তাহা হইতেই সংগ্রাম। সে সংগ্রামে যে পশু পরাজিত হয় সে মারা যাইতে পারে, অথবা গুরুতররূপে আহত হইতে পারে। দুইটি পুংজাতীয় পশু একটি স্ত্রীজাতীয় পশুকে পাইবে ইচ্ছা করিলেও, এরূপ ইচ্ছাকে মতভেদ বলা যায় না, ইচ্ছার বিরোধ অথবা ভেদকেও মতভেদ বলা যায় না। উন্নত প্রাণিগণ মধ্যে যখন বিচারবুদ্ধির উন্নতি হয়, তখন নানাবিধ ইচ্ছার এবং অনিচ্ছার সুখ দুঃখময় পরিণাম তুলনা করিয়া মত গঠিত হয়। সুখ সকল প্রাণীই ইচ্ছা করে, দুঃখ কেহই চাহে না। কিন্তু সুখ লাভ করিতে হইলে যদ্যপি প্রথমতঃ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা বিচারবুদ্ধির ফলে জীব অনন্যোপায় হইয়া সহ্য করে। অন্যক্ষেত্রে দুঃখ সকলেরই পরিহার্য্য। সুখ দুঃখময় ফল পরিহার করা অথবা গ্রহণ করা মতের কার্য্য। ইহাই সামাজিক ব্যবহারে "উচিত অনুচিত" বোধ উৎপন্ন করে। ঐ আহত পশুর যদি এরূপ মত হয় যে, বলিষ্ঠের সহিত দ্বন্দ্ব করা সঙ্গত নহে, তবেই ঐ কার্য্যকে অনুচিত জ্ঞান হইবে। এই শ্রেণীর জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি উন্নত না হইলে জাত হয় না। আর যদি উহার এরূপ মত হওয়া সম্ভব হইত যে, অপরের আহার্য্য বস্তুর প্রতি লোভ উচিত নহে, তাহা হইলে উহার বিচারবুদ্ধি ধর্ম্ম বুদ্ধিতে দিকে উন্নত হইত। কিন্তু উন্নত মনুষ্য সমাজে দুঃখও অনেক সময় বরণীয় হইতে পারে। যখন বিরোধী ইচ্ছার সংঘর্ষে একটী নির্দ্দিষ্ট ইচ্ছা প্রবল হয়, তখন অপর ইচ্ছাটী পরাজিত হইয়া যায়। সেই ক্ষণেই ঐ প্রবল ইচ্ছা হইতে কর্ম্ম উৎপন্ন হয়; তাহার দুঃখময় পরিণামও মানুষ তুচ্ছ বোধ করে।

ইতর প্রাণিগণ মধ্যে বিচারবুদ্ধি অনুন্নত; সুতরাং তাহারা সংযম দ্বারা ইচ্ছাকে দমিত করিতে পারে না। এই হেতু নিরঙ্কুশ ইচ্ছার পরিচালনে তাহারা হত অথবা গুরুতর রূপে আহত হইয়া জীবন ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহার ফলে তাহারা নির্ব্বংশ অথবা বিলুপ্ত হইয়া যায়। যে পশুটি হত হইয়াছিল সে বংশবৃদ্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল। যে পশুটি গুরুতররূপে আহত হইয়াছিল সেও আহার সংগ্রহ অথবা বংশবৃদ্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া ক্রমে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঈদৃশ অবস্থা পাশবিক। কিন্তু উন্নত মানুষ এ অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছে; —পশুভাবাপন্ন মানুষ এখনও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই। ধ্বংস অথবা লোপ এখনও তাহার লক্ষ্য আছে; কিন্তু কথঞ্চিৎ সভ্যাবস্থায় তাহার প্রণালী মাত্র পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছে। সভ্যাবস্থায় হনন এবং আঘাতের সহিত অবরোধ প্রণালীও উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু অবরোধ অনেক সময় আমরণকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হওয়ায় হননের ন্যায়ই কার্য্য করে। কখন কখন জ্ঞানকৃতই অবরোধকে এরূপভাবে বিধান করা হয় যে, তাহার ফলে অবরুদ্ধ ব্যক্তি চিররুগ্ন হইয়া যায় অথবা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ সকল বিধানও হননের ন্যায়ই কার্য্য করিয়া থাকে। ইহার ফলে, বিরোধী ইচ্ছা এরূপ পরাস্ত অথবা লুপ্ত হইয়া যায় যে, অবশেষে বিজয়ী ইচ্ছার প্রতিকূলতা চিরতরে নিবৃত্ত ও শান্ত হয়। যখন জীবসমাজে এইরূপ দশা উপস্থিত হয়, তখন বিজয়ী জীব অবাধ নেতৃত্ব লাভ করে। সে অবস্থায় নেতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহারই

ইচ্ছা থাকে না, অথবা থাকিলেও তাহা প্রকাশ লাভ করে না। সমাজ তখন জড়ত্ব প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে অবনত হইয়া যায়।

ইহা হইতে বুঝা গেল যে প্রথমতঃ ইচ্ছা, পরে মত উৎপন্ন হয়। ইতর প্রাণিগণ মধ্যে ইচ্ছার বিরোধ হইতে হনন, তাহা হইতে ধ্বংস সাধিত হয়। পশুভাবাপন্ন মানুষের মধ্যেও এইরূপই হইয়া থাকে। কখনও বা স্পষ্টভাবে হনন, কখনও বা গৌণভাবে প্রকারান্তরে হনন। ট্যাসমেনিয়ার আদিম নিবাসীরা প্রথম শ্রেণীর উদাহরণ; দ্বিতীয় শ্রেণীর উদাহরণ সকলের সমক্ষেই রহিয়াছে, সুতরাং উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পৃথিবীর ইতিহাসে হনন অথবা ধ্বংস নানাবিধ করাল মূর্ত্তিতে মানব সমাজে বহুবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মতভেদের ফলে বর্ব্বর জাতীয় মানবসমাজে একে অপরকে খুঁটায় বাঁধিয়া পোড়াইয়া মারিয়াছে, জলে ডুবাইয়া হত্যা করিয়াছে; অন্ধকূপে রুদ্ধ করিয়া বধ করিয়াছে; অনাহারে মারিয়াছে; শূলে দিয়া মারিয়াছে; তোপের মুখে উড়াইয়া দিয়াছে; হস্ত পদ নাসিকা কর্ণ ইত্যাদি ছেদন করিয়া বধ করিয়াছে। এ সকল নিষ্ঠুর আচরণ বহু কারণেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কখনও ক্ষমতার বশবর্ত্তী হইয়া, কখনও রাজ্যলোভে, কখনও বাণিজ্য ব্যপদেশে, কখনও বা ধর্ম্ম প্রচার উপলক্ষ করিয়া একের ইচ্ছার অথবা মতের সহিত অপরের বিরোধ হইলে ঐ সকল নৃশংস আচরণ পূর্ব্বে হইয়াছে, এখনও হইতেছে। পৃথিবীর অধিকাংশ নরনারী এখনও পশুভাবেই আছে। ইচ্ছা অথবা মতের বিরোধ সত্ত্বেও তাহা সহ্য করা সংযমের কার্য্য, উদারতা এবং আত্মত্যাগের ফল। সুতরাং তাহা উচ্চশ্রেণীর সভ্যাবস্থা ব্যতীত হয় না। ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যত্র তদ্রূপ দৃষ্টান্ত প্রায় দেখা যায় না। প্রকৃত পক্ষে এই গৌরবান্বিত দেশে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, জোরোয়াষ্ট্রীয়ান প্রভৃতি মানব-সমাজে সংযম এবং আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত অধিক দেখা যায়। আজি নহে, বহুকাল হইতেই দেখা যাইতেছে। সুতরাং এ সকল সমাজে ইচ্ছার বিরোধ অথবা মতভেদ হেতু কেহ কাহাকে পোড়াইয়া মারে না, শূলে দেয় না, অন্ধকূপে আবদ্ধ করে না, আমরণকাল অবরুদ্ধ রাখে না। ইহারা কোন কালেই ঈদৃশ আচরণ করে নাই। ধর্ম্ম বিষয়ে, নীতি বিষয়ে, বিজ্ঞান বিষয়ে বহু প্রকার বিরুদ্ধমত এতদ্দেশে শান্তভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সূর্য্য ঘোরে কি পৃথিবী ঘোরে, এ বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও ভাস্করাচার্য্য অথবা বরাহমিহিরকে কোন প্রবলতর শক্তি অবরুদ্ধ, দগ্ধ অথবা বধ করে নাই। অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, আস্তিক, নাস্তিক যুগ যুগান্তর হইতে এই সুসভ্য দেশে শান্তিতে বসবাস করিয়াছে। মতভেদে পীড়ন কখনই এখানে হয় নাই, তাহা বলিতেছি না; কিন্তু তন্নিমিত্ত অমানুষিক অত্যাচার কখনই অনুষ্ঠিত হয় নাই এ কথা দৃঢ়ভাবেই বলা যায়। মোটের উপর এখানে উদারতা ও ন্যায়পথ চির বিরাজমান।

ঈদৃশ উন্নত অবস্থা, হনন ও ধ্বংসের বহুকালপরবর্ত্তী। এ অবস্থায় মতের সামঞ্জস্য অথবা একীকরণ হইয়া থাকে। বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর মধ্যে * কিংবা বিভিন্ন সমাজ মধ্যে যে মতভেদ হয়, তাহা পীড়ন দ্বারা উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করা যায়। কিন্তু নিজসমাজ মধ্যে যে মতভেদ হয়, তাহা পীড়ন দ্বারা দমন করা সকল সময়ে সহজসাধ্য হয় না। সুতরাং কোন প্রকারে বিরোধী মতের সামঞ্জস্য অথবা একীকরণ আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই আবশ্যকতার ফলে সংযম, সহিষ্ণুতা ও আত্মত্যাগ আসিয়া উপস্থিত হয়। "প্রিয়জন" শব্দে কেবল সমশ্রেণীর প্রিয়জন বুঝাইতেছি না; সম শ্রেণীর এবং অন্য শ্রেণীর প্রিয় পদার্থও বুঝাইতেছি। পুত্রের সহিত মতভেদ হইলে যেমন তাহাকে বধ করা যায় না, তেমনি প্রিয় একটি অশ্বের সহিত মতভেদ হইলেও তাহাকে বধ করা যায় না। অশ্বটিকে আমি যে দিকে যে পথে লইয়া যাওয়া উচিত বোধ করিতেছি,

---

* Species.

সে সেইদিকে সেই পথে যাইতে আপত্তি করিতেছে। কিন্তু অশ্বটি আমার প্রিয় বস্তু। তখন ঈষৎ প্রহার করিয়াও যদি তাহার আপত্তি খণ্ডন করিতে না পারি, তবে আমার মতই পরিবর্ত্তন করিয়া তাহার মতের সহিত সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে হয়। তৎপরে তাহাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আমার নির্দ্দিষ্ট পথে অথবা স্থানে আনিতে হয়। যাহাকে ভালবাসি তাহার সম্বন্ধেও যেমন, যাহাকে ভয় করি তাহার সম্বন্ধেও তেমনই করিয়া কৌশলে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিজের মতের দিকে আনিতে হয়। ভালবাসা অথবা ভয় ব্যতীত ন্যায় কিংবা ধর্ম্মরক্ষাহেতু মতের একীকরণ, অনুন্নত সমাজে দেখা যায় না। তদ্রূপ সমাজে নিকৃষ্ট স্বার্থ সিদ্ধ করাই নিয়ম; উৎকৃষ্ট স্বার্থ যাহা পরার্থের সহিত অভিন্ন তাহার কোন সুস্পষ্ট ধারণা তদ্রূপ সমাজে থাকে না। সুতরাং পীড়ন, বধ অথবা কৌশল অবলম্বন করা সে সমাজের চিরন্তন অভ্যাস অথবা প্রথা বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

এ কথা বর্ব্বর সমাজে ধারণাই হয় না যে পুরাকাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত যদি কোন বিষয়েই মত পরিবর্ত্তন না হইত, তবে সমাজ কখনই ক্রমোন্নত হইতে পারিত না। পরিবর্ত্তন মতভেদ হইতেই জাত হয়। মতভেদ না হইলে মত পরিবর্ত্তন হইবার উপায় নাই। মত পরিবর্ত্তন না হইলে সামাজিক উন্নতিও অসম্ভব। মত একভাবে থাকিলে সমাজও একভাবে থাকে। ইহারই নাম জড়ত্ব, এবং জড়ত্বের ফল অবসাদ ও অবনতি। মতভেদ সহ্য করিতেই হইবে, নচেৎ অধোগতির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায়ান্তর নাই। কি প্রকার মত মঙ্গলজনক তাহা বিচার দ্বারা স্থির করিতে হয়, পীড়ন দ্বারা নহে। পীড়নকারী বর্ব্বর, সে অনুন্নত পশুভাবাপন্ন, একথা সুসভ্য মানবগণের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত। তাহা হইলেই প্রতীয়মান হইবে যে পীড়নকারী অন্য ব্যবহার জানে না, সুতরাং তাহার ঐ উপায় অবলম্বন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এই কথা বিশদরূপে চিত্তে প্রতিভাত হইলেই পীড়নকারীর উপর হিংসা ক্রোধাদি না হইয়া বরং দয়ার উদ্রেক হইবে। উৎপীড়িত সুসভ্য ব্যক্তিগণ হিংসা ক্রোধ প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইবেন, ইহা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। স্বয়ং উন্নত হইলে হইবে না, পৃথিবীর বর্ব্বরগণকেও সুসভ্য করিতে হইবে; তাহাদিগকে উদ্ধার করাও গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। সংযম, সহিষ্ণুতা ও ন্যায়বিচার অনায়াসেই ভীরুতা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। যাহারা অনুন্নত তাহারা এ সকলকে ভীরুতা বিবেচনা না করিয়া অন্য কিছুই বিবেচনা করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু ভীরুতা মাত্রই নিন্দনীয় নহে; অন্যায় ও অধর্ম্মমূলক ভীরুতাই নিন্দনীয় ও বর্জ্জনীয়। সুসভ্য সমাজে "ধর্ম্মভীরু" কথা প্রশংসাজনক। ক্ষমা, ধৈর্য্য, পরোপকার, সৎসাহস, উদ্যম, দৃঢ়তা এবং বিনয় নম্রতা, স্নেহ, ভক্তি—এ সকল অতিশয় সুসভ্যাবস্থার ফল। অনুন্নত জাতীয়গণ এ সকলকে যেরূপই বিবেচনা করুক না কেন, সভ্য সমাজে তৎপ্রতি বিন্দুমাত্রও প্রণিধান করিবার প্রয়োজন নাই। প্রণিধান করিলেই অধোগতি অবশ্যম্ভাবী এবং অনিবার্য্য হইয়া উঠে।

ক্রমশঃ

শ্রীশশধর রায়।

হিমাচল

হে বিশাল, হে মহান ! ক্ষুদ্র হ'তে আমি ক্ষুদ্রতম,
চরণের প্রান্তে তব শিশু হতে দুর্ব্বল অক্ষম।
বিরাট সৌন্দর্য্য হেরি পরিপূর্ণ অসীম বিস্ময়ে
বিমুগ্ধ রয়েছি চাহি শ্রদ্ধাভরে ভাষাহীন হয়ে !
ধ্যানের সমাধি মাঝে মগ্ন তুমি যুগ যুগান্তর,
অন্তহীন তপ তব শ্রান্তিহীন, হে তাপসবর।
কীর্ত্তি তব কালজয়ী, বিত্ত তব অনন্ত অক্ষয়,
ভক্তিভরে বার বার নমি পায়ে ওগো মৃত্যুঞ্জয়।

শ্রীঅমিয়া দেবী।

আশ্চর্য্য সফল স্বপ্ন

(সত্য ঘটনা)

আজকাল আত্মিক তত্ত্ব লইয়া চারিদিকেই বিশেষ আলোচনা চলিতেছে। কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের পক্ষপাতী মানুষ এ জগতে যথেষ্ট পরিমাণে আছে, তাহাদের সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য নয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে পারে। কিন্তু যাঁহাদের সংস্কার মার্জ্জিত, যাঁহারা শিক্ষা, সাধনা ও আত্মানুশীলন বলে সাধারণ মানবজ্ঞানের ঊর্দ্ধে বিচরণক্ষম,—তাঁহাদের প্রত্যক্ষ দর্শন কাহিনীর মধ্যে সত্যানুসন্ধান-ব্রতীদের আলোচনার মাল মশলা অনেক সংগৃহীত হইতে পারে। এই শ্রেণীর একটি পূজ্যপাদ বৃদ্ধের প্রত্যক্ষ-দর্শন ব্যাপার আজ "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র পাঠকগণ সমীপে উপস্থিত করিতেছি।

পূজনীয় প্রত্যক্ষদর্শী মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত রাখালদাস মুখোপাধ্যায়। বয়স বর্ত্তমানে ৬৫ বৎসরের উপর। প্রথম জীবনে ইনি কৃষ্ণনগর বিদ্যালয়ে ৺রামতনু লাহিড়ী ও তৎসাময়িক শিক্ষকগণের ছাত্র ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে বর্দ্ধমান রাজএষ্টেটে প্রায় চল্লিশ বৎসরের উপর গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার বহনে নিযুক্ত ছিলেন। কর্ম্মজীবনে ইহার সততা, সৎসাহস, তেজস্বিতা ও বিশ্বস্ততার বিশেষ পরিচয় পাইয়া ইঁহার সদ্গুণের জন্য ভূতপূর্ব্ব মহারাজ ৺আফতাবচন্দ বাহাদুর ও বর্ত্তমানের মহামান্য শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর ইঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। ইনি উপস্থিত শারীরিক অসুস্থতার জন্য অবসরপ্রাপ্ত, কিন্তু বর্দ্ধমানের অশেষ গুণালঙ্কৃত গুণগ্রাহী মহারাজ বাহাদুরের কাছে ইঁহার গুণের সম্মান আজিও বিশেষ আদরণীয় হইয়া আছে।

ইনি একজন উচ্চশ্রেণীর সাধক। আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যের সঙ্গেও এই জ্ঞানতপস্বী সাধকের বিশেষ উচ্চাঙ্গের পরিচয় আছে। শান্তিশতক, বৈরাগ্যশতক, দৃষ্টান্তশতক প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থের ইনি সুন্দর বাঙ্গালা অনুবাদ কবিতাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। "বাসি ফুলহার" নামে ইঁহার এক-

খানি কবিতা পুস্তক সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। ভাষার প্রাঞ্জলতা, ভাবের উচ্চতা ও মিষ্টতায় বইখানি "অম্লান পঙ্কজমালা" বলিয়া বিজ্ঞসমাজে সমাদৃত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া বর্দ্ধমান রাজবংশের আদ্যোপান্ত পরিচয়, রাজপরিবারের প্রধান প্রধান ঘটনা ও বৈষয়িক বিবরণ ও এতদঞ্চলের বহু বিস্মৃতপ্রায় বিবরণ সংগ্রহ করিয়া বিপুল অধ্যবসায়ে ইনি একটি সুবৃহৎ ইতিবৃত্ত রচনা করিয়াছেন। বহিখানির নাম "রাজবংশানুচরিত।" বহিখানি পড়িলে দেশের একটি মহাগৌরবশালী অভিজাত-বংশের এবং দেশের পূর্ব্ব অবস্থার সম্বন্ধে এমন বহু সারবান বিবরণ জানা যায়, যাহা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে বিশেষ উপকারজনক। বর্দ্ধমান মহারাজের পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ, দয়াদাক্ষিণ্য ও মহাপ্রাণতার পরিচয় পড়িতে পড়িতে আনন্দ, কৌতূহল, সম্ভ্রম, গৌরবে মন ভরিয়া উঠে, এবং সে সকল স্মৃতির বিবরণ-সংগ্রহকর্ত্তার নিপুণ অধ্যবসায়ের কথা স্মরণ করিয়া বিস্ময় জাগে।

পরিতাপের বিষয় বর্ত্তমানে দৃষ্টিশক্তি-হীনতার জন্য এই সাধক-লেখনী নিশ্চল রহিয়াছে। না হইলে, বাঙ্গলা সাহিত্য ইঁহার আরও কত সাধনার দান লাভে অলঙ্কৃত হইত কে জানে?

ইনি বর্ত্তমানে বর্দ্ধমানে বাস করিতেছেন। ইঁহার একটি স্বপ্নের দৃশ্য কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে বাস্তবের সহিত মিলিয়াছিল, সে সম্বন্ধে ইনি নিজমুখে যেরূপ বলিয়াছেন, যথাসাধ্য অবিকল লিপিবদ্ধ করিতেছি—

"প্রায় বত্রিশ বৎসর আগের কথা, তখন আমি এই বর্দ্ধমানেই আছি। একদিন রাত্রে খুব গাঢ় নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিলাম, যেন আমি কোথায় এক সহরের মধ্যে একটি পাথর বাঁধানো প্রশস্ত রাস্তার উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছি। রাস্তার দুই পাশে নানারকম ঘরবাড়ী ও দোকানশ্রেণী রহিয়াছে। ঘুমন্ত অবস্থায় নির্ব্বিবাদে স্পষ্ট অনুভব হইল যেন সেগুলা আমার বহুদিনের পরিচিত।

সেই পাথরের রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে কিছুদূর আসিয়া একটি সুদৃশ্য বারান্দাযুক্ত দোতলা বাড়ীর সামনে পৌঁছিলাম। বাড়ীখানি রাস্তার পাশেই। স্বপ্নে মনে হইল যেন বাড়ীখানা আমার নিজের।

স্বচ্ছন্দে বাড়ীর ভিতর ঢুকিলাম। চকমিলানো বারান্দাযুক্ত সুন্দর অন্তঃপুর। বারান্দার পাশে কক্ষশ্রেণী। উঠানের এক পাশ দিয়া, দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি, সিঁড়ির ডান পাশে কুয়া। তার কিছু দূরে পায়খানা। সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিয়া, দ্বিতলের চকমিলানো বারান্দায় পৌঁছিলাম। বারান্দারও চারি পাশে কক্ষশ্রেণী। এ বারান্দা ও বারান্দার চারিদিক ঘুরিলাম, সমস্ত ঘরগুলা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম। কি উদ্দেশ্যে ঘুরিতেছি তাহা কিছুই মনে হইল না। শুধু সবই আমার বহুদিনের পরিচিত, আমার নিজের বাড়ী ঘর—এইটুকুই মনে হইতেছিল।

চারিদিক ঘুরিয়া আবার যেন আমার সেই নিজের বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। সেই রাস্তা ধরিয়া আবার অগ্রসর হইলাম। কিছুদূর গিয়া, বেলে পাথরের পাঁচিল ঘেরা সুন্দর পাথরের সিঁড়ি বাঁধানো একটি পুকুর দেখিতে পাইলাম। এই পুকুরটি পর্য্যন্ত আসিয়া সেই পাথরের রাস্তাটি শেষ হইয়াছে। পুকুরের বাম পাশ দিয়া একটা মেটে রাস্তা বাহির হইয়াছে, আমি সেই রাস্তা দিয়া আবার অগ্রসর হইয়া চলিলাম।

কিছু দূর গিয়া, কতকগুলি সিঁড়ি দেখিতে পাইলাম। সিঁড়িগুলি রাস্তার পাশ দিয়া নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। আমি সেই সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিলাম। কিছুদূর গিয়া দেখিলাম, সিঁড়ির একপাশে একটি বটগাছ রহিয়াছে। গাছটির গোড়া পাথর দিয়া বাঁধান।

গাছটি ছাড়াইয়া সেই সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আরও কিছুদূর গিয়া দেখিলাম, সিঁড়িটি শেষ হইয়াছে। সম্মুখেই সুদূর-বিস্তৃত একটা বালি ঢাকা নদী রহিয়াছে। নদীর জল কিছুমাত্রই দেখা যাইতেছে না, সমস্তই বালি

ঢাকা। তবু যেন আমি বুঝিলাম, সেই বালিঢাকা বিশাল-বিস্তার স্থানটি নদী।

এই পর্য্যন্ত স্বপ্ন দেখিয়া সহসা আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া উঠিয়া সমস্ত স্বপ্নটা প্রত্যক্ষ দৃষ্টের মত স্পষ্ট মনে পড়িতে লাগিল। বর্ত্তমান রাজ-সরকারের কার্য্যের জন্য পশ্চিমের অনেক সহরে ঘুরিয়াছি। অনেক স্থানে অনেক রকমের পাথরের রাস্তাঘাট দেখিয়াছি, কিন্তু স্বপ্নে যাহা দেখিলাম সেস্থান জীবনে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না। অথচ ঘুম ভাঙ্গিবার পর সেই জাগ্রৎ অবস্থাতেও যেন মনে হইতে লাগিল স্বপ্নদৃষ্ট স্থান ও বাড়ী ঘরগুলি বাস্তবিকই কখনও দেখিয়াছি, সেগুলি আমার বিশেষ পরিচিত। কিন্তু কোথায় কখন দেখিয়াছি কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না।

কিছুদিন পরে স্বপ্নের কথা ভুলিলাম। এই ঘটনার দুই তিন বৎসর পরে আমার জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় শ্রীমান্ প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের, গয়াধামবাসী কোন ভদ্রলোকের কন্যার সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে আমরা বরযাত্রীদল বর লইয়া গয়াধামে উপস্থিত হইলাম। প্রকাশের পিতা পরলোকগত সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অত্যন্ত সৌখীনলোকের লোক ছিলেন। গান বাজনায় তাঁহার বড় ঝোঁক ছিল। গায়ক বাদক দলও আমাদের সঙ্গে চলিল। আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব, গায়ক, বাদক সম্প্রদায় লইয়া আমাদের দলটী বেশ বড় রকমেরই হইয়াছিল।

বৈবাহিক মহাশয়ের নির্দ্দিষ্ট বাসায় উঠিয়া আমরা প্রথমে স্নানাহার ও বিশ্রাম করিলাম। তার পর বৈকালের দিকে বৈবাহিক মহাশয়ের প্রেরিত একজন গয়ালীর সঙ্গে আমরা দলশুদ্ধ সকলে সহর দর্শনে বেড়াইতে বাহির হইলাম।

ইতিপূর্ব্বে আমার ভাগ্যে গয়াক্ষেত্র দর্শনের সুযোগ কখনও ঘটে নাই—এই আমার জীবনে প্রথম গয়াদর্শন। আমি চারিদিক দেখিতে দেখিতে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে চলিলাম। গয়ালী মহাশয় পথ প্রদর্শকরূপে আমাদের আগে আগে চলিলেন।

অনেকগুলি রাস্তা ঘুরিয়া, নানা স্থান দেখিয়া শেষে আমরা একটি পাথর বাধানো রাস্তায় আসিয়া পৌছিলাম। রাস্তাটি চলিতে চলিতে চারিদিক চাহিয়া সহসা আমি কেমন বিস্মিত হইলাম। মনে হইল যেন রাস্তাটা আমার বিশেষ পরিচিত, এ রাস্তা দিয়া আমি পূর্ব্বে কোন সময় যাতায়াত করিয়াছি, এবং নিশ্চয় যে কোন সময় হউক এ রাস্তা আমি দেখিয়াছি—এ রাস্তা আমার আদৌ অপরিচিত নয়।

আবার মনে হইল, তাই বা কিরূপে সম্ভবে? ইতিপূর্ব্বে আমি কখনও গয়াধামে আসি নাই। পূর্ব্বে এ পথ দিয়া হাঁটা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। ভাবিতে লাগিলাম, তবে বোধ হয় অন্য কোন স্থানে এই রকম ধরণের রাস্তা দেখিয়া থাকিব।

ইতিপূর্ব্বে দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি নানাস্থানে কার্য্যোপলক্ষে গিয়াছিলাম। অনেক সহরে অনেক পাথরের রাস্তা দেখিয়াছি। কিন্তু ঠিক এই রকম রাস্তা সে সকল স্থানের মধ্যে কোথায় কখন দেখিয়াছি, কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিলাম না। অথচ এই রাস্তাটা যে আমি বিশেষ করিয়া পূর্ব্বে দেখিয়াছি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্তু কোথায় দেখিয়াছি, কিছুই মনে পড়িল না। মনে মনে বড় সংশয় বোধ হইতে লাগিল।

অবাক্ হইয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে চারিদিক চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইলাম। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, এবং যতই দেখিতে লাগিলাম, ততই মনে হইতে লাগিল, বাস্তবিকই এই রাস্তা ও দুইপাশের সমস্ত বাড়ী ঘর দোকানপত্র সমস্তই আমার পূর্ব্বপরিচিত। এ রাস্তা দিয়া নিশ্চয়ই পূর্ব্বে আমি কোনও সময় আসা যাওয়া করিয়াছি।

বিস্ময়, সংশয় এবং কৌতুহলে আমি নির্ব্বাক হইয়া পড়িয়াছিলাম। অন্যমনস্কভাবে নীরব গম্ভীর হইয়া পথ হাঁটিতেছি দেখিয়া সঙ্গীরা কেহ কেহ পরিহাস করিলেন, কেহ বা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কি হে রাখাল, তুমি কি এত ভাবছ বল দেখি?"

বিশেষ কিছু উত্তর দিতে পারিলাম না; কিন্তু ভাবনাটা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল। মনে মনে তর্ক করিতে লাগিলাম, পথটা আমার এমন পরিচিত হইল কি করিয়া? আমি কস্মিনকালেও যখন গয়ায় আসি নাই, তখন নিশ্চয়ই এ পথ আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। কিন্তু ঠিক এই রকম একটা পথ আমি কোথায় দেখিয়াছি, বেশ মনে পড়িতেছে, কিন্তু কোথায়? সেই পথের সঙ্গে এই পথটার সৌসাদৃশ্য বড় অদ্ভুত!

চলিতে চলিতে একস্থানে আসিয়া দেখিলাম সেখানে রাস্তার বাম পাশে, একটি সুদৃশ্য বারান্দাযুক্ত দ্বিতল বাড়ী রহিয়াছে। বাড়ীখানির দিকে চাহিয়া তাহার সম্মুখ-দৃশ্য চোখে ঠেকিবামাত্র হঠাৎ বিদ্যুতের মত দুই তিন বৎসর পূর্ব্বের সেই স্বপ্নটির স্মৃতি আমার মনে পড়িয়া গেল!—চকিতে মনে হইল, এই ত ঠিক! এই সেই বাড়ী, এই সেই পথ। এই সমস্ত দৃশ্যই আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি!—বাস্তব জীবনে এস্থান আমি কখনও চোখে দেখি নাই। এ স্থানটার বর্ণনা কখনও কাহারও মুখে শোনা দূরে থাক—কখন কল্পনাও করি নাই। শুধু সেই স্বপ্নে মাত্র এই সব দৃশ্য আমি দেখিয়াছি।

স্পষ্ট ও উজ্জ্বলরূপে সমস্ত মনে পড়িয়া গেল। অভাবনীয় বিস্ময় ও আনন্দের উত্তেজনায় আমি প্রায় চীৎকার করিয়াই সঙ্গীদের উদ্দেশে বলিয়া উঠিলাম, "ওহো তোমরা দাঁড়াও, একটা মজার কথা শোন—এই বাড়ী আমার—"

আমার উত্তেজনা দেখিয়া সঙ্গীরা সবিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইল কি না, সে বিষয়ে প্রশ্ন বর্ষণে পরিহাস কৌতুক করিতেও বন্ধুদের কেহ কেহ কুণ্ঠিত হইলেন না। সাতকড়ি উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি?"

আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম, "এই রাস্তা, এই বাড়ী আমি দু তিন বছর আগে একদিন স্বপ্নে দেখেছি। এর আগে আমি কখনো গয়ায় আসি নি, কিন্তু সেই স্বপ্নে এই সব দৃশ্য আমি এত স্পষ্ট করে দেখেছি যে, সব আমার মনে আছে। স্বপ্নে আমি এই বাড়ীর মধ্যে ঢুকেছি; এর কোথায় কোন্ ঘর কোন্ বারান্দা দেখেছি সব আমার মনে আছে—আমি বলে দিচ্ছি, তোমরা শোন।"

আমার উত্তেজিত চীৎকারে সেই নিরাপদ আনন্দযাত্রায় মাঝে হঠাৎ ছন্দোভঙ্গ হওয়ায় আমাদের "গাইড" গয়ালী ঠাকুরটি এতক্ষণ স্তব্ধ বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। আমার কথা শুনিয়া তাহার অর্থ তিনি কতদূর কি বুঝিলেন, সে সংবাদ অন্তর্য্যামীই জানেন। সহসা এই সময় ছুটিয়া আসিয়া একেবারে আমায় চাপিয়া ধরিলেন, "কেয়া বাবুজি, তুম ইয়ে মকানমে আয়ে থেঁ? হাম ইয়ে মকান কিরায়া লিয়া মে। হামারা যাত্রীলোক আকে ইয়ে মকামমে রহতে হঁয়। বোলো বাবু তুমহারা নাম কেয়া?"

তার পর তিনি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের নাম ধাম তলব করিয়া খাতাপত্র মিলাইবার জন্ম বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আমি ধমকাইয়া তাঁহার সে উৎসাহ ঠাণ্ডা করিয়া বলিলাম, "তুমি এ বাড়ী ভাড়া নিয়েছ? আচ্ছা বল দেখি এই বাড়ীর ভিতরদিকটা ঠিক এই রকম কি না?"—বলিয়া আমি স্বপ্নে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, ঠিক সেইরূপ বর্ণনা করিলাম।

গয়ালী অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিল, আমার বর্ণনা সমস্তই নির্ভুল। তার পর সে অত্যন্ত কাতরতার সহিত অনুনয় বিনয় আরম্ভ করিল যে, আমি যখন পূর্ব্বে এ বাড়ীতে আসিয়া বাড়ীর অবস্থা সমস্তই স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছি, তখন আর আমার অস্বীকার করা উচিত নয়—আমি তাহারই অধিকারভুক্ত যজমান। অতএব তাহার হাতেই আত্মসমর্পণ করা এবার আমার অবশ্য কর্ত্তব্য ইত্যাদি।

সঙ্গীরা তখন খুব কৌতুহলী হইয়া উঠিয়াছেন। গয়ালীকে থামাইয়া তাঁহারা আমায় বলিলেন, "স্বপ্নে আর কি দেখিয়াছ বল।"

আমি সেই পাথরের রাস্তার শেষ সীমায় যে

পাথরের সিঁড়ি বাঁধানো পাথরের প্রাচীর বা পাড় বেষ্টিত পুকুর দেখিয়াছিলাম, সেই পুকুর, মেটে রাস্তা, এবং তাহার কিছু দূরে সিঁড়ি ও সিঁড়ির পাশে যে পাথরের গোড়া বাঁধানো বটগাছ দেখিয়াছিলাম, সমস্ত যথাযথ বলিলাম। গয়ালী ঠাকুরটি উত্তরোত্তর আশ্চর্য্য ও কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন, প্রত্যেক বিবরণই অক্ষরে অক্ষরে ঠিক এবং আমি যখন ইতিপূর্ব্বে ঠিক এই স্থানে আসিয়াই সবই দেখিয়া গিয়াছি তখন আমি তাঁহারই যজমান। তিনি ছাড়া আর কাহাকেও পাণ্ডা বলিয়া গ্রহণ করা আমার পক্ষে অন্যায় হইবে।

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আমি স্বপ্ন বর্ণনা করিতে লাগিলাম। সকলের শেষে বালুকাবৃত নদীর কথা উল্লেখ করিতেই গয়ালী উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "হাঁ বাবু, এই ত ফল্গু হ্যায়!"

আমি বলিলাম, "তা আমি জানি না, তবে স্বপ্নে এই পর্য্যন্ত দেখেছি।"

আমার কথা শেষ হইলে সঙ্গীরা অনেকেই অনেক মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। তার পর সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিলেন—"স্বপ্নদৃষ্ট স্থানটা যখন বাস্তবের সঙ্গে মিলেছে, তখন এস সকলে মিলে, নিজ নিজ চোখে আগাগোড়া সমস্ত দেখে আসা যাক।"

গয়ালীর সঙ্গে বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া, ভিতরের সমস্ত অংশ আমরা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া আসিলাম। ঠিক যেখানে যেরূপ বারান্দা, যেরূপ স্থানে সিঁড়ি প্রভৃতি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম সবই ঠিক সেইরূপ রহিয়াছে। তার পর বাড়ীর বাহির হইয়া আমরা ফল্গুতীর পর্য্যন্ত ঘুরিয়া সব দেখিয়া আসিলাম। আমার স্বপ্নদৃষ্ট বর্ণনার সঙ্গে কিছুমাত্র কোথাও ভুল হইল না।

আমার সেদিনের সেই সঙ্গীদের অধিকাংশই আজ ইহলোক ছাড়িয়া গিয়াছেন। কেবল দুইজন মাত্র জীবিত আছেন, তাঁহারা এই ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষী। তাঁহারা বর্দ্ধমানেই আছেন। তাঁহাদের একজন বর্দ্ধমান রাজবাটীর সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন; দ্বিতীয় ব্যক্তি—বর্দ্ধমান রাজসংসারের আশ্রিত, তনখাভোগী, শ্রীযুক্ত সত্যপ্রকাশ ঘোষ। ইঁহাদের কাছে সন্ধান লইলে এ ঘটনার সত্য সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।"

* * * *

জানি না, স্বপ্নবিজ্ঞানবিদ্‌গণ পূজনীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই স্বপ্নকে বিচার করিয়া কি বলিবেন। তবে যাঁহারা মনে করেন জাগ্রৎ অবস্থায় মানুষের মন বুদ্ধি যে সকল বিষয় লইয়া সর্ব্বদা আলোচনা করে, স্বপ্নাবস্থায় তাহারাই স্মৃতিসংস্কারজাত দৃশ্য দেখিতে পায় মাত্র, তদতিরিক্ত আর কিছুই দেখা সম্ভব নয়,—তাঁহাদিগকে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই আশ্চর্য্য—অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, জ্ঞানের অতীত স্বপ্নটির কারণ কি, বিচার করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

নানা দেশের অঙ্গরাগ

বহুদিন পূর্ব্বে কমলাকান্ত শর্ম্মা নারী-প্রসঙ্গে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। সে সকলের পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন; পরন্তু নিরাপদও নয়। তাঁহার স্থূল বক্তব্য এই যে, "স্বীয় দেহ সজ্জিত করিতে এত যাহাদিগের যত্ন, তাহাদিগের প্রকৃত সৌন্দর্য্য যে অধিক আছে এরূপ বোধ হয় না।" কেবল তাহাই নয়, তিনি একটি মারাত্মক কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে স্ত্রীজাতির চেয়ে পুরুষ জাতির সৌন্দর্য্য অধিক। আবার প্রকৃতির সৃষ্টিপদ্ধতি সমালোচনা করিয়া তিনি ময়ূর, কুক্কুট, সিংহ বৃষ প্রভৃতি কয়েকটি প্রাণীর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

অহিফেনসেবীর কথার সত্যাসত্য নির্ণীত হইয়াছে

কি না জানি না। তবে দেখিতে পাই (বোধ হয় কমলাকান্তের গঞ্জনাতেই) আধুনিক শিক্ষিতা ললনারা গুরুভার অলঙ্কারগুলি ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু অঙ্গরাগটি ছাড়িতে পারেন নাই; বরং তার বাহুল্যই হইয়াছে। রুজ, পাউডার, হেজলিন প্রভৃতির ব্যবহার উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। এই রং মাখা সম্বন্ধে আজ কিছু বলিব।

কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সভ্যাসভ্য সকল জাতির ললনারা অতি প্রাচীনকাল হইতে আজি অবধি রূপ-লাবণ্য বাড়াইবার জন্য শরীরের কোন কোন অংশে রং দিয়া অঙ্গরাগ করিয়া আসিতেছেন। সুন্দরীরা শুনিয়া সুখী হইবেন—আমাদের দেশের সেকালের ললনারা আধুনিক পাউডারের মত পাউডার ব্যবহার করিতেন;—সে হচ্ছে লোধ্রফুলের রেণু।

"মুখে তার লোধ্র রেণু,
লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি
কুরুবক মাথে,
তনু দেহে রক্তাম্বর
নীবি বন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি
বাজে আধা আধা।"
(স্বপ্ন, রবীন্দ্রনাথ)

উল্কির ব্যবহার পৃথিবীর সভ্যাসভ্য সকল জাতির মধ্যে ছিল। এখন পাশ্চাত্য জাতির পুরুষ এবং আমাদের দেশের অশিক্ষিতা পল্লী ললনাদের মধ্যে ইহা অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছে।

আমাদের দেশে বিধবা ভিন্ন সকল রমণীই হাত, পা, নখ আলতায় রাঙাইয়া থাকেন।

নিতান্ত লাক্ষারসরাগলোহিতৈ-
নিতম্বিনীনাঞ্চরণৈঃ সনূপুরৈঃ।
পদে পদে হংসরুতানুকারিভি-
র্জনস্য চিত্তং ক্রিয়তে সমন্মথম্॥"
(ঋতুসংহার)

"এলো চুলে বেণে বৌ আল্‌তা দিয়ে পায়।
নোলক নাকে কলসী কাঁকে জল আন্‌তে যায়॥"
(দীনবন্ধু)

সিন্দুর সধবার লক্ষণ। ভারতের সর্ব্বত্র ইহার প্রচলন আছে। বিশেষতঃ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ইহার ব্যবহার অত্যধিক। সিন্দুর হিন্দুদের ধর্ম্মকার্য্যের একটি উপকরণ বলিয়া ইহার সমাদর খুব বেশী।

"কৌটা খুলি রক্ষোবধূ যত্নে দিলা কোঁটা
সীমন্তে, সিন্দুর বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি ললাটে আহা! তারা রত্ন যথা!
দিয়া ফোঁটা, পদধূলি লইলা সরমা।"
(মেঘনাদবধ)

খয়েরের টিপ সময় সময় বঙ্গনারীদের সীমন্তের শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকে।

নেত্র শোভার জন্য অঞ্জন ছিল,—চলিত কথায় যাহাকে কাজল বলা হয়। যে কামিনী-কটাক্ষে জগৎ অস্থির, সেই নয়নে আবার অঞ্জন? কি মারাত্মক।

হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে
সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।
(রবীন্দ্রনাথ)

আমাদের সুন্দরীরা ওষ্ঠযুগল পাণ চিবাইয়া রাঙা করেন। মুখগহ্বরের দন্তও সৌন্দর্য্যে বঞ্চিত হয় নাই। পূর্ব্বে দাঁতে মিশি দিয়া দাঁতের সৌন্দর্য্য বাড়ান হইত।

"দাঁতে মিশি মুচক্যা হাসি
প্রাণ কাড়্যা লয়—"

নব্যারা এখন আর মিশি পছন্দ করেন না।

সেকালের বিলাসিনীরা চন্দন, কুঙ্কুম ও অলকা তিলকা দিয়া দেহের শোভা বর্দ্ধন করিতেন।

"কণ্ঠে পরায়ল মণিময় হার।
অঙ্গে বিলেপন কুঙ্কুম ভার॥
বসন পরায়ল করি কত ছন্দ।
কিঙ্কিণী জালহি নীবি নিবন্ধ॥

নিজ করপল্লবে মঝু মুখ মাজ।
নয়নহি কয়ল সুকাজর সাজ॥
অলকা তিলকা দেই চৌরি নেহারি।
কহে কবিশেখর যাউ বলিহারি॥"

(শ্রীশ্রীপদকল্পতরু)

তরুণী বৈষ্ণবীদের 'রসকলি' আজকালের একটি উল্লেখযোগ্য চিত্র। উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের ভামিনীরা হলুদের রং ফোটাইবার জন্য গায়ে হলুদ মাখেন।

ভারতবর্ষে রংএর উৎসব হইয়া থাকে,—তাহা 'ফল্গুৎসব' বা হোলি। হোলির সময়ে ভারতের হিন্দুদের মধ্যে যেরূপ সজীবতা ও উন্মাদনার আবির্ভাব হয়. তেমন অন্য দেশে দুর্লভ।

"এসে ফাগুনকে দিন আট সজনী।
পূর্ণ শশী ভঁই উজারা চাঁদনী॥
বহে মলয়া পবন কোয়েলা কুহরে বন।
গায়ে সব সখী মন বাহার সোহিনী॥
লালে লাল যমুনাতীর, উড়ে কুঙ্কুম আবির।
জাবট ধীর সমীর, লাল ব্রজভামিনী॥
লালেলাল কুঞ্জবন, লালরত্ন সিংহাসন।
লাল মদনমোহন, লাল রাধারাণী॥
লাল তাল তমাল, পশু পক্ষি লালে লাল,
কহে দাস পক্ষিগান, লাল গোপ গোপিনী।"

(শ্রীশ্রীপদকল্পতরু)

আমাদের আলতার মত মেহেদী পাতার রং ইহুদী, মুসলমান ও মিশরিদের মধ্যে খুব প্রচলিত। বিবাহোৎসবে মিশরে এই অঙ্গরাগ প্রথার মহা সমারোহ হইয়া থাকে। এই মেহেদী-উৎসব রাত্রি "হেনারাত্রি" নামে প্রসিদ্ধ।

আমাদের কাজলের মত মিশরের রঙ্গিণীরা চোখে "কোহল" ব্যবহার করেন। ধুনা বা বাদামের ছাল পোড়াইলে যে কালী পড়ে, তাই কোহল। মিশরিণীদের দেখাদেখি গ্রীক ও চীন সুন্দরীরাও কালো আঁখির অনুরক্ত হইয়াছেন। আমাদের মুসলমান রমণীরা সুর্ম্মার ভক্ত।

তিব্বত রূপসীরা এতই রূপাভিমানিনী যে, তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের রূপচ্ছটায় পুরুষগুলা মূর্চ্ছিত হইতে পারে, পাগল হইতে পারে, কিংবা পতঙ্গের মত দগ্ধ হইতে পারে! তাই তাঁহারা পথে বাহির হইবার সময় পুরুষের প্রতি অপার করুণা প্রকাশ করিয়া মুখে কালি মাখিয়া থাকেন।

শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু।

লিঙ্গপূজা ও ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অতঃপর আমাদিগকে দেখিতে হইবে আমাদের পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতির মধ্যে Indian Baeche বা Bacchusএর কোন সন্ধান পাওয়া যায় কি না। যদি তাহা পাওয়া যায়, তাহা হইলে আর বলা চলিবে না যে, Indian Bacchusএর কাহিনী অলীক কাহিনী মাত্র। বামন-পুরাণের ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিঙ্গপূজার বৃত্তান্ত সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রকার লিখিত হইয়াছে :—

"সর্ব্বপ্রথমে স্বয়ং ব্রহ্মা কনক-পিঙ্গল বর্ণ একটা লিঙ্গ গ্রহণ করিলেন, এবং তিনি তাহার পর ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের নিমিত্ত পৃথক পৃথক বর্ণের শিবলিঙ্গের ব্যবস্থা করিলেন (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীত বর্ণ ও শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ লিঙ্গপূজা করিবেন)। ব্রহ্মা এই চারি জাতির পূজার জন্য চারি প্রকারের শাস্ত্রও প্রস্তুত করিলেন। এই শাস্ত্রগুলির মধ্যে প্রথম ভাগের

নাম শৈব, দ্বিতীয় ভাগের নাম পাশুপত, তৃতীয় ভাগের নাম কালবদন ও চতুর্থ ভাগের নাম কপালিন। বশিষ্ঠের প্রিয় পুত্র স্বয়ং শক্ত্ শৈব মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার শিষ্যের নাম গোপায়ন। মহর্ষি আপস্তম্ব কালবদন মতাবলম্বী ছিলেন। ক্রৌত দেশের অধিপতি বকনামক বৈশ্য তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। ধনদ নামক ঋষি কপালিন মতাবলম্বী ছিলেন, কুন্দোদর নামা শূদ্র তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন।"

উল্লিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে 'আপস্তম্বনামে ভারতীয় ঋষি কালবদন মতাবলম্বী লিঙ্গোপাসক ছিলেন, আর ক্রৌথ দেশের অধিপতি বক নামক বৈশ্য তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। এই ক্রৌথ দেশ যে গ্রীসের সন্নিহিত ভূমধ্যসাগর-মধ্যস্থ ক্রৌত (Crete or Candia) নামক দ্বীপ, আর এই বক নামক বৈশ্যরাজাই যে Bacehe or Bacchus এ কথা বোধ হয় এক্ষণে নিতান্ত অবিশ্বাসী ব্যক্তিকেও স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে দেখা গেল, কালবদন শাস্ত্র অনুসারে শিবলিঙ্গ পূজার প্রথম প্রবর্ত্তক ভারতীয় ঋষি আপস্তম্ব ও তদীয় শিষ্য ক্রৌতদেশের অধিপতি বক,' একথা আমরা ভারতীয় পুরাণে পাইতেছি। পাশ্চাত্য পুরাণেও সেই কথাই সমর্থিত হইতেছে—গ্রীস্, ইজিপ্ট, এশিয়ামাইনর প্রভৃতি অঞ্চলে যিনি লিঙ্গপূজার প্রচার করেন' সেই বক বা বকেশ দেবতা ভারতীয়।

বকেশ দেবতার পূজা গ্রীক্ অঞ্চলে আরব্ধ হইয়া ক্রমশঃ সমগ্র ইউরোপে বিস্তৃত হইয়াছিল। মিশরদেশে ও এশিয়ামাইনরেও এই পূজা অতি সমারোহের সহিত সমাচরিত হইত, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মিশরের প্রধান দেবতা Osiris যে, Bacchus দেবতার রূপান্তর একথা প্রাচীন গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। Sophocles বলিয়াছেন যে ইটালিতে এই Bacchus দেবতার পূজার এইরূপ প্রভাব ছিল যে তিনিই ইটালিদেশের একমাত্র শাসনকর্ত্তা ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। Campania প্রদেশে এই দেবতাকে Hebon (শিব ?) নামে পূজা করা হইত। এই Hebon দেবতার সহিত তাঁহার পত্নী 'Hebe (শিবা ?)রও পূজা হইত। Hebe দেবীকে স্থানে স্থানে Demeter (দেবমাতা ?), স্থানে স্থানে বা Kore (গৌরী ?) নামে অভিহিত করা হইত। জন্তুগণের মধ্যে বৃষ ও ব্যাঘ্র এই Baechus দেবতার প্রিয় ছিল। তাঁহার হস্তে Thyrsus (ত্রিশূল ?) নামক একটা ত্রিশূলাকার দণ্ড ও পানপাত্র থাকিত, আর শিরোদেশে একটা বৃষভশৃঙ্গ বিলম্বিত থাকিত। এই সকল বিবরণ হইতে অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, শিব ও Hebon বা Baechus অভিন্ন দেবতা; আর তাঁহার পত্নী দেবজননী গৌরী Hebe, Kere (গৌরী) ও Demeter (দেবমাতা) প্রভৃতি বিভিন্ন নামে ইউরোপের নানা স্থানে পূজিতা হইতেন। বক নামক রাজার পূজিত বলিয়াই বোধহয় এই Hebon বা শিব দেবতা বকেশ (বক+ঈশ অর্থাৎ God of Bacche) নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। Lydia প্রভৃতি স্থানে যিনি Indian Bacchus নামে পরিচিত ছিলেন, সমগ্র পাশ্চাত্য মহাদেশে যিনি লিঙ্গপূজার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, আর সুরাপানে উন্মত্ত ভক্তমণ্ডলীপরিবৃত হইয়া যিনি নৈশ উৎসবে লিঙ্গপূজার অনুষ্ঠানে অধিনায়কত্ব করিতেন, তিনি আপস্তম্ব ঋষির শিষ্য ক্রৌত দেশের অধিপতি রাজর্ষি বক বা Baeche। আর সেই বকরাজ পাশ্চাত্য প্রদেশে যে দেবতার পূজার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই দেবতা Phallus (ফলেশ), দুণেশ (Dionysus) বকেশ (Baechus) বা শিব (Hebon) নামে ইউরোপের নানা স্থানে পূজিত হইতেন। শিব ফলদাতা—জগতের উৎপাদক সেই জন্য তাঁহার একটা নাম ফলেশ, ইহা রাজস্থান গ্রন্থ প্রণেতা Colonel Tod প্রভৃতি মনীষিগণের মত। Bacche ও Bacchus একই নহেন, বক পূজক আর বকেশ পূজিত দেবতা; তবে পরবর্ত্তিকালে পূজ্য ও পূজকের বিভিন্নতা লোকে ভুলিয়া গিয়া উভয়কেই

অভিন্ন যে, তা মনে করিয়াছিল। গ্রীকগণ Baeche (বক) ও Bacchus (বকেশ) এই উভয় নামেই এই দেবতাকে অভিহিত করিত। এই বকেশ দেবতার আর একটা নাম Dionysus। পাশ্চাত্য পণ্ডিত Westropp এই Dionysus শব্দ দেবানিশি শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মতে মহাদেবকে দেবনিশি (God of Night) নামে অভিহিত করা চলে। আমার বিবেচনায় Dionysus শব্দটা দুণেশ শব্দের অপভ্রংশ—দুণেশ শব্দ দুণ ও নিশ এই দুই শব্দের যোগে উৎপন্ন; দুণ শব্দ জ্যোতিষের ভাষায় সপ্তম ভাবের নামান্তর অর্থাৎ দাম্পত্য সম্বন্ধ সূচক; সুতরাং যিনি দাম্পত্য সম্বন্ধের পরিপোষক, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোজক ও বিশ্বের উৎপাদক সেই মহাদেবকেই এই নামে অভিহিত করা হইত, ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়।

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, জগতে যে যে দেবতার পূজার সম্পর্কে লিঙ্গপূজার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, সেই সকল দেবতার নামের সহিত ভারতবর্ষীয় মহাদেবের নামের সাদৃশ্য রহিয়াছে একটুকু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, ঐ সকল নামের প্রত্যেকটাই মহাদেবের এক একটা বিকৃত নাম ব্যতীত আর কিছুই নহে। এশিয়ামাইনরে যে যে দেবতার পূজার সম্পর্কে লিঙ্গপূজার অনুষ্ঠান হইত, তাঁহাদের নাম Chemos, Moloch, Merodock, Adonais, Sabazius, Bacchus or Bagaios প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে Chemos শব্দ সম্ভবতঃ ক্ষেমেশ শব্দের অপভ্রংশ। 'ক্ষেমেশ' শব্দের অর্থ মঙ্গলময়, শিব শব্দের অর্থও তাহাই। এই Chemos দেবতাই মিশরদেশে Khem (ক্ষেম) নামে অভিহিত হইতেন। Moloch ও Merodoc নাম দুইটী 'মৃড়ক' শব্দের অপভ্রংশ; 'মৃড়ক' শব্দে মহাদেবকে বুঝায়। ঐ প্রকার Adonais শব্দ অর্দ্ধনারীশ শব্দের অপভ্রংশ, ইহা ওয়েষ্ট্রপ সাহেব দেখাইয়াছেন; হর ও গৌরীর সম্মিলিত মূর্ত্তিই অর্দ্ধনারীশ নামে অভিহিত। Sabazius সম্ভবতঃ 'শবশায়ী' শব্দের অপভ্রংশ;—ইহাও মহাদেবের একটী নামান্তর। Bacchus বা Bagaios শব্দ কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মিশরদেশের যে যে দেবতার পূজার সম্পর্কে লিঙ্গপূজার অনুষ্ঠান হইত তাঁহাদের নাম—Khem (ক্ষেম), Horus (হর), Osiris (ঈশ্বর), Sebek (শিবক), Seb (শিব), Serapis বা Saraphis (সর্পেশ)। এই নামগুলির প্রত্যেকটাই যে মহাদেবের এক একটা বিকৃত নাম বিশেষ তাহা আর না বলিলেও চলে। উল্লিখিত Khem দেবতাকে মিসরবাসিগণ পিতৃদেবতা বলিত ও তাঁহার পত্নী Maut (মাতা?) দেবীকে তাহারা মাতৃদেবতা বলিত। গ্রীস, ইটালি প্রভৃতি দেশের দেবতাগণের সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলা চলে। Dionysus (দ্যুণেশ), Phallus (ফলেশ), Hebon (শিব) প্রভৃতি নামগুলি স্পষ্টতঃই মহাদেবের নাম। ঐ প্রকার Cteis (সতী) Koro (গৌরী), Hebe (শিবা) ও Demeter (দেবমাতা) প্রভৃতিও জগজ্জননীর এক একটা নাম মাত্র। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, Hebon, Hebe প্রভৃতি দেবদেবীর পূজার পদ্ধতি যে সকল পুস্তকে লিখিত ছিল তাহাদিগকে Sibylline books বলা হইত। শিবলিঙ্গ শব্দ হইতে এই Sibylline শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে—এ কথা মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। আফ্রিকার Lengba ও যে সম্ভবতঃ ভারতীয় 'লিঙ্গদেব' শব্দের অপভ্রংশ তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এই সকল কথা ভাবিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, ভারতেই লিঙ্গপূজার উৎপত্তি হইয়াছিল ও ভারত হইতেই এই পূজা পরবর্ত্তিকালে সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং পৃথিবীর অসভ্য জাতি সকলের মধ্যে এই পূজা আপনা হইতে প্রাচীনকালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, এ কথা আর বলা চলে না।

লিঙ্গপূজার ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা আর একটা অতি প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি। আমরা দেখিলাম যে অতি প্রাচীনকালে—প্রাগৈতি-

হাসিক যুগে—ভারতীয় ঋষি আপস্তম্বের শিষ্য বক নামক বৈশ্য ইউরোপ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। সম্ভবতঃ এই বক রাজা ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া এই দেশে রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, অথবা মহর্ষি আপস্তম্ব ইউরোপে গমন করিয়া তদ্দেশবাসী এই বৈশ্যরাজাকে শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। শেষোক্ত অনুমান সত্য হইলে বুঝিতে হইবে যে, ভারতীয় বৈশ্যগণ তাহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই সম্ভবতঃ বাণিজ্য উপলক্ষে ইউরোপে গিয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যাপার যাহাই হউক না কেন, ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, যৎকালে গ্রীক্ ও রোমান্ জাতির সভ্যতার সূচনা মাত্রও হয় নাই, যৎকালের ইতিহাস এক্ষণে জগতের সমক্ষে Mythology বা অলীক গল্প মাত্র বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় রাজগণ ইউরোপে যাইয়া রাজ্য স্থাপন করিতেন, আর ভারতীয় ঋষিগণও তাৎকালিক ইউরোপীয়গণকে দীক্ষা প্রদান করিতেন। এই কথা স্বীকার করিলে আমাদিগকে আরও স্বীকার করিতে হইবে যে, অতি প্রাচীন কালে ইউরোপ, মিশর, পশ্চিম এশিয়া প্রভৃতি স্থান ভারত হইতে সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিল; অর্থাৎ ভারতীয়গণ এইসকল দেশে সভ্যতার বিস্তার করিয়াছিলেন। "জিপসি জাতি ও ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার" প্রবন্ধে এই কথাই আমি অন্য প্রকারে প্রমাণ করিয়াছি।

আমরা দেখিতে পাই সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ অল্পবিস্তর বিকৃতভাবে ইউরোপীয় ভাষা সকলের মধ্যেও প্রচলিত রহিয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ইহা হইতে অনুমান করিয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ ও ইউরোপীয় জাতি সকল একই আর্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন, অর্থাৎ অতি প্রাচীন কালে ভারতীয় আর্য্যগণের পূর্ব্বপুরুষগণ ও ইউরোপীয় জাতি সকলের পূর্ব্বপুরুষগণ একই স্থানে বাস করিতেন, আর তাঁহারা সকলে একই বংশ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিলেন। বলাবাহুল্য, এই প্রকারের একটা খাঁটি অনুমানের সাহায্য না লইয়াও অধিকতর সন্তোষজনকরূপে পূর্ব্বোল্লিখিত ভাষা সাদৃশ্যের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। আমরা দেখিতে পাইলাম অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষীয়গণ ইউরোপে যাইয়া রাজ্যস্থাপন করিতেন ও তদ্দেশবাসিগণকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে দীক্ষা প্রদান করিতেন। সুতরাং ইউরোপের ভাষা সকলের উপর সংস্কৃত ভাষা যে তাহার প্রভাব বিস্তার করিবে, ইহাই স্বাভাবিক। ভারতীয় ভাষা দ্বারা ইউরোপীয়গণ তাঁহাদের নিজের ভাষার পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন; সেই জন্যই অনেক সংস্কৃত শব্দ আজিও ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় মধ্যে বিকৃত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে—একথা আমরা নিঃসংকোচে এক্ষণে বলিতে পারি।

শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়।

নারীর কথা

গত আষাঢ় মাসের "ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী 'নারীর কথা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধের বহুস্থানে নারীর প্রতি হিন্দুসমাজের (প্রবন্ধের ভাবে বোধ হয়, হিন্দু সমাজকেই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা হইয়াছে) অত্যাচার এবং অবিচারের বিষয় দুঃখের এবং কোথায়ও বা শ্লেষের ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। যখন কোথাও প্রকৃত অত্যাচার হয়, তখন তাহার বিরুদ্ধে যদি আমরা দণ্ডায়মান না হই, প্রকৃত বেদনায় যদি আমরা সহানুভূতি এবং প্রতীকারের মঙ্গলকর চেষ্টা প্রয়োগ না করি, তবে আমরা নিশ্চয়ই

মনুষ্য নামের অযোগ্য। এই অত্যাচার যথার্থই যদি অসহায়া নারীজাতির অশ্রুপাতের কারণ হয়, যে অশ্রু আমাদের জননীগণ বিরলে সম্বরণ করেন, আমাদের ভগিনীগণ নির্জ্জনে মোচন করেন, এবং আমাদের সহধর্ম্মিণীগণ হৃদয়ের অভ্যন্তরে রোধ করিয়া একটা প্রবল বেদনার ন্যায় প্রতিনিয়ত বহন করিতে থাকেন, তবে তজ্জনিত প্রত্যবায় আমাদের অন্তহীন লজ্জা এবং অপমানের সহিত আমাদের ধ্বংস সাধনে অবিরাম প্রবৃত্ত হইবে সন্দেহ নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে সমাজের এবং সমাজের অঙ্গ-বিশেষের কার্য্যের উদ্বোধন করিতে যিনি চেষ্টা করেন, তিনি নিঃসন্দেহ আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

কিন্তু প্রবন্ধ-লেখিকার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াও প্রবন্ধ সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা অতি আবশ্যক মনে করিতেছি।

নারীজাতির প্রতি-পুরুষ সমাজের কর্ত্তব্য বুদ্ধির উন্মেষ করা যদি প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হয়, তবে আমার মনে হয় লেখিকা স্থানে স্থানে অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এবং কোন কোন অভিযোগকে কল্পনার সাহায্যে বড় করিয়া উপস্থিত করিয়া, কোথাও বা অসংযত ভাষার প্রয়োগ করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনপথ বিঘ্নসংকুল করিয়া তুলিয়াছেন। বিষয়টাকে সমগ্রভাবে গ্রহণ না করিয়া, ইহার অংশ বিশেষের আলোচনায় পাশ্চাত্য সমাজের কতকগুলি ধারণা জোর করিয়া প্রবিষ্ট করাইয়া, এমন একটা অনৈসর্গিক চিত্রের পরিকল্পনা করিয়াছেন, যাহার মধ্যে কৃত্রিমতার রেখা সুস্পষ্ট দেদীপ্যমান। প্রবন্ধটি পড়িয়া এরূপ মনে হইয়াছে যেন কতকগুলি বাঁধা অভিযোগের পুনরাবৃত্তি ইহার উপজীবিকা—যেন সংগ্রাম করিতেই হইবে বলিয়া, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, সেখানে একজন কাল্পনিক শত্রু প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। যেন একটা অসুবিধার সচেষ্ট অনুভূতির মধ্যে অপর পাঁচটা সুবিধার সদ্ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; যেন সমাজটা কেবল পুরুষের, তার সংস্কারে নারীর দায়িত্ব সহজেই বাদ দেওয়া যাইতে পারে!

প্রবন্ধটী পড়িয়া আর একটা ধারণা স্বতঃই মনে সঞ্চিত হইতে থাকে। মনে হয়, একটা ভাব, অন্তঃপ্রবাহ স্রোতের ন্যায় বিদ্যমান থাকিয়া বিষয়টাকে ক্ষীণমূল করিয়া ফেলিয়াছে। লেখিকা ইহা যেন একটা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন—যেন পুরুষ এবং নারী বর্ত্তমান ফরাসী এবং জর্ম্মানের ন্যায় বিরুদ্ধ স্বার্থবিশিষ্ট দুইটি স্বতন্ত্র জাতি, যাহারা সর্ব্বদা নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য পরস্পরের কার্য্যকলাপ অতি সন্দেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছে এবং যেমন করিয়া হউক ছলে বলে কৌশলে স্বীয় অধিকার বিস্তৃত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। এই জন্যই প্রবন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলির যথেচ্ছ ব্যবহার সম্ভব হইয়াছে—লেখিকা নারীদিগকে "নিজেদের প্রাপ্য অধিকার বঞ্চিতা" দেখিয়া তাহাদের "অভাব অভিযোগ" তাহাদের "পতি দেবতার (চোন বা না চোন)" নিকট উৎপীড়নলাভ তাহাদের "নির্জ্জীব দাসীত্ব" প্রভৃতি এক জাতির প্রতি অপর এক দুর্দ্দান্ত জাতির দুর্ব্যবহারের ফলের ন্যায় মনে করিয়া তাঁহার যুক্তি যোজনার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু পুরুষ এবং নারীর বিচার করিতে হইলে তাহাদিগকে কি এমন করিয়া স্বতন্ত্র, স্বাধিকারবিভক্ত, স্বার্থবিশিষ্ট পরস্পর নিরপেক্ষ বলিয়া মনে করা চলে? যেখানে পুরুষ নারী পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া, একের অস্তিত্ব অপরের সত্তায় মিলাইয়া, নূতন জীবনের প্রফুল্ল পুষ্পে বিকশিত হইয়া উঠিয়া সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষা করিতেছে, যেখানে পুরুষ এবং নারীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে সমাজের পরিপূর্ণ এবং সুসম্বদ্ধ মূর্ত্তি কোন মতেই চিন্তায় ব্যক্ত হইয়া উঠে না, সেখানে নারীর অধিকার সম্বন্ধে অসহিষ্ণু আলোচনা যেন কৃত্রিমতা-দোষ দুষ্ট বলিয়া মনে হয়। নারী যদি নিজেকে সমাজের এক ব্যক্তি বলিয়া ধারণা করেন, মনে করেন, তিনি জননী, ভগিনী, কন্যা, পত্নী অথবা অপর কোন অপরিহার্য্য সামাজিক সম্বন্ধে আবদ্ধ একটি জীব, তবে দেখিবেন,

নারীর স্বতন্ত্র অধিকারের প্রশ্ন কত ক্ষীণ হইয়া পড়ে, কত কথার উত্তর আপনি হইয়া যায়, আবার কত প্রশ্ন কল্পনার ছায়ার ন্যায় ভাসিয়া চলিয়া যায়। নারী স্বতন্ত্রা কিছুতেই নহেন। আমার এই সুখের গৃহপ্রাঙ্গণে কেমন করিয়া তাঁহাকে একটী গণ্ডীর মধ্যে বসাইয়া দিয়া তাঁহার সত্তার পরিপূর্ণ প্রাচুর্য্য হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিয়া রাখিব? কেমন করিয়া আমি আমার জন্য একটী নিষ্ঠুর নিভৃত নিকেতন রচনা করিয়া তাহার দ্বারে প্রবেশ নিষেধের বিজ্ঞাপন দিব? নারীকে বাদ দিলে যে আমার এই সোণার সংসার মুহূর্ত্ত মধ্যে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলিতে পরিণত হইয়া যায়, চতুর্দ্দিক হইতে কেবল শূন্যতার শুষ্ক বিশীর্ণ দৃষ্টি আসিয়া আমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়, পৃথিবীর অমৃতস্রোত যে সহসা থামিয়া যায়।' একই গৃহের ছায়ায় যদি পিতাপুত্রের অধিকার সম্বন্ধে বিরোধ হয়, মাতা এবং কন্যার মধ্যে দেনা-পাওনার আত্মসন্ধিমূলক আলোচনা চলে, তবে তাহার কদর্য্যতা, অশোভনীয়তা সমাজে নরনারীর স্বতন্ত্র-অধিকার-প্রসঙ্গের অপেক্ষা অল্প নয়।

প্রকৃত কথা এই যে, নারী এবং পুরুষ যেভাবে সমাজে অবস্থান করিতেছে তাহা অনেকটা অলঙ্ঘনীয় প্রকৃতির বিধান। পুরুষ কখনও ষড়যন্ত্র করিয়া নারীগণের হীনতা সম্পাদন করে নাই। প্রকৃতির প্রেরণায় উভয়ে উভয়ের সঙ্গ আকাঙ্ক্ষা করে। সে আকাঙ্ক্ষায় মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে। দেহের প্রয়োজন হইতে আরম্ভ করিয়া আধ্যাত্মিক প্রয়োজন পর্য্যন্ত উভয়ে এক সঙ্গে সাধন করে। পুরুষ যে আপনার দেহমনের বলে নারীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছে, এবং সেই দায়িত্বের ভার লঘু ও সেই কার্য্যটী আনন্দপূর্ণ করিয়া, নারীকে, অহঙ্কারে নয়, কিন্তু আদরে ও ভালবাসায় 'অবলা' এই আখ্যা প্রদান করিয়াছে, তাহার জন্য তার সেই শ্রমস্বীকারকে যেমন মূর্খতা বলা অন্যায়, তেমনি নারী যদি সমাজের পুরুষের নিকট শ্রদ্ধামিশ্রিত সম্মান, আদর, ভক্তি এবং সর্ব্ব অবস্থায় সেবা পাইবার দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়া থাকে, তবে তাহাকে তজ্জন্য কপটাচারিণী অথবা মায়াবিনী বলিয়া নিন্দা করাও সমভাবে দূষণীয়। প্রয়োজন এবং তৎসাধনোপযোগী যোগ্যতা ও সামর্থ্য দ্বারা প্রত্যেকের স্থান সমাজে নির্ণীত হইয়াছে এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেবল এইটুকু মনে রাখিতে হইবে, মানুষের প্রয়োজনটা শুধু দেহ-সুখে আবদ্ধ নয়। ইহার মধ্যে কপটতা, ষড়যন্ত্র, অত্যাচার-প্রবৃত্তি প্রভৃতির কার্য্য অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করা বড় কঠিন হইবে। গায়ের জোরের রাজত্ব বহুকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, এখনও চলিতেছে, আরও বহুকাল চলিবে—কিন্তু তাহার রাজত্ব ঐ জোর প্রকাশের ক্ষেত্র পর্য্যন্ত; গায়ের জোর ছাড়া অন্যবিধ জোরও জগতে আছে; সেখানে নারীর ন্যায় পুরুষও আত্মসমর্পণ করিয়াছে (এবং তজ্জন্য তাহারা নারীকে অন্যায় ভাবে নানাপ্রকার গালাগালি করিয়া নিজেদের অপদার্থতাকে আরও উপহাসযোগ্য করিলেও)—এ সংবাদ নারীজাতি ভাল করিয়াই জানেন।

কিন্তু মানবের বড় মঙ্গলের কথা একটা আছে। তার দৈহিক প্রয়োজন এবং তাহার সাধন সমস্যা যখন যখন তাহার সমস্ত চেষ্টাকে আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছিল, তখন হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত শারীর ব্যাপারের পশ্চাতে একটা নিগূঢ় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ঈপ্সিত—কথঞ্চিৎ ব্যক্ত—বহুশঃ অপ্রকাশিত একটা অনুপ্রেরণা চিরকাল অবস্থিত থাকিয়া ক্রমশঃ তাহার সর্ব্বকার্য্য, আকাঙ্ক্ষা এবং আনন্দকে এক অভিনব সুন্দর ও উন্নততর ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। যেখানে গায়ের জোর স্পষ্ট প্রতীয়মান, সেইখানেই তাহাকে অস্বীকার করিবার ইচ্ছাও তেমনই স্পষ্ট হইয়া উঠে। আর যখনই এই সত্য স্বীকৃত হইয়া গেল, তখনই দেখা গেল পশুবলরূপ দানবের দুখানা পা-ই পঙ্গুত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। অমনি নীতির দেবতা তাহাকে নির্ম্মম কশাঘাত আরম্ভ

করিবেন। দানবের বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত সে আঘাতের বিরাম নাই। নারীজাতি চিন্তিত হইতেছেন কেন? দেবতা তাঁহাদের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়াছেন, জয়মাল্য তাঁহাদেরই শিরে অর্পণ করিবেন।

নারীর অথবা পুরুষের কথা স্বতন্ত্র করিয়া লিখিবার আমার সাধ্য নাই। কিন্তু তাহাদের উভয়ের অকুণ্ঠিত এবং অব্যাহত গতি যে পরম অভীপ্সিত পরিণামের দিকে সানন্দে অগ্রসর হইতেছে, তার জন্য যার যেটুকু আত্মত্যাগ আবশ্যক তাহাকে তাহা করিতে হইবে। পুরুষ তাহার উন্নততর আদর্শকে লাভ করিবার জন্য আশ্রয় করিবে নারীর হস্তের মঙ্গলস্পর্শ, তাহার নয়নে দেখিবে আধ্যাত্মিক জগতের নয়নাভিরাম অরুণ-জ্যোতিঃ, তাহার হৃদয়ে অনুভব করিবে মাধুর্য্যের অফুরন্ত উৎসধারা, তার বাণীতে আশা, দৃষ্টিতে পবিত্রতা, কর্ম্মে প্রেম, এবং জীবনে অপূর্ব্ব সার্থকতা। আর নারী—তিনি দেখিবেন, তাঁর স্বাভাবিক আত্মদান-প্রবৃত্তি পুরুষের সাহচর্য্যে যেমন প্রসার লাভ করে এমন আর কোথায়ও নহে। কি তাহার বীরগর্ব্ব! কেমন তার কার্য্যে দৃঢ়তা, কেমন উদারতা! কেমন করিয়া সে দুঃখকে বরণ করিতে জানে! কেমন করিয়া জগতের দুঃখের বোঝা আপনার মাথায় করিয়া সানন্দে বিঘ্নসঙ্কুল পথে একাকী চলিয়া যায়—একটু সহানুভূতিরও অপেক্ষা করে না। দুর্ব্বলকে রক্ষা করে, সবলের সহিত সংগ্রাম করে, নিজের বিদীর্ণ রক্তাক্ত দেহের প্রতি ফিরিয়াও চাহে না। ইচ্ছা হয় ইহারই পায়ে আত্মসমর্পণ করিয়া জীবনের চরিতার্থতা লাভ করি—নারীর হৃদয়ে এমনই করিয়া আপনিই ভক্তির আবির্ভাব হইবে। সে তাহার সাহায্যে পুরুষের হৃদয়ে আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সঙ্গে একযোগে জীবনব্রত সাধন করিবে। পুরুষের সহিত নারীর এই মনোবিবাদ-সমস্যা—এ কি অশ্রদ্ধেয় ব্যাপার! ইহার কল্পনা করাও ক্ষীণ ও কৃত্রিম ভাবপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া মাত্র।

লেখিকার প্রবন্ধে আর একটি ভাব দেখিতেছি পাশ্চাত্য নারীসমস্যার একান্ত অনুবৃত্তি। সে দেশে বিবাহিতা নারী এমন কি কুমারীগণের হস্তেও এই সমস্যার এমন অশ্লীল আলোচনা দেখিয়াছি, যাহা কখনও বিচারের বিষয় করিবার সাহস এবং প্রবৃত্তি মনে উপস্থিত হয় নাই। নারীর স্বাধীনতা সে সব দেশে আমাদের দেশের অপেক্ষা এক হিসাবে অনেক বেশী, কিন্তু তথাপি সেখানে কি অসন্তোষের ঝড় বহিতেছে! রমণীরা যেন অতিলুব্ধ ও জিগীষুভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আপনাদের কল্পিত অধিকারের সীমা নির্দ্দেশ করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত ও উদ্বেগগ্রস্ত! এবং তাঁহারাই ইহা বেশী করিয়া করিতেছেন যাঁহারা বিবাহিত জীবনের পরিপূর্ণতা কখন নিজেদের অভিজ্ঞতায় অনুভব করেন নাই। তাই তাঁহারা পুরুষকে এক বিরুদ্ধাচারী জীবের দলভুক্ত করিয়া তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে ক্ষেত্রে বিরুদ্ধতা, সংগ্রাম, দ্বেষ ইত্যাদি প্রশ্নই প্রায় অপ্রাসঙ্গিক, সেখানে এরূপ কলহের সৃষ্টি নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। যে দেশের ব্যষ্টির বিশিষ্টতাকে সম্ভাব্যের সীমা ছাড়াইয়া বহুদূর অগ্রসর করান হইয়াছে, সেই দেশের সহিত, এই মহাসমন্বয়-সাধনের দেশের সামাজিক হিসাবে এরূপ বাহ্যিক সখ্য স্থাপন করিতে যাওয়া সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের দেশের স্ত্রীপুরুষের আদর্শ-সম্বন্ধ, উঁহাদের সম্বন্ধ হইতে অনেক বিভিন্ন। সুতরাং সেখানকার ভাবে এদেশের বিচার করা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। এদেশে স্ত্রীকে পুরুষের বিরুদ্ধে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়া স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে ব্যূহবদ্ধ করিয়া প্রদর্শন করিবার দিন এখনও আসে নাই—আশা করি, কখনও আসিবে না।

লেখিকার যুক্তির শাণিত অস্ত্রগুলির কোনটাই বোধ হয় পাঠককে তত বিদ্ধ করিবে না, যেমন তাঁহার নিক্ষিপ্ত "পতিদেবতা (হৌন বা না হৌন)" লইয়া বিদ্রূপবাণ বর্ষণ। ইহার অর্থ এ নয় যে, ইহা দ্বারা প্রবন্ধ-সূচিত অত্যাচার অচিরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। বেদনার কারণ এই, আমাদের দেশের একজন উচ্চ-শিক্ষিতা মহিলা এত সহজে দেশের একটা অতিসম্মানিত সনাতন আদর্শকে হঠাৎ এমন করিয়া অপমানিত

করিতে পারিলেন। এক্ষেত্রে ত মনে হয় ভাবটী ঠিক তাঁহার নিজস্ব নহে। এ সম্বন্ধে তিনি একটু ভাবিয়া লিখিলে ভাল হইত। আমার স্মরণ হয়, এইরূপ "পতিদেবতা" লইয়া তামাসা কিছুদিন পূর্ব্বে কোন তরুণ লেখক "প্রবাসী" পত্রে করিয়াছিলেন। তখন একবার প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা করিয়াও করিতে পারি নাই। কিন্তু এই অদ্ভুত ভাবের বিষ যখন নারী-সমাজেও প্রবেশ করিয়াছে, তখন তাহার মহা অনিষ্টকরতা প্রদর্শন না করিলে অন্যায়কে, অমঙ্গলকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে মনে করি।

"প্রবাসী"র সেই লেখকটি স্ত্রীরপক্ষে পতিকে দেবতা বলিয়া মনে করা, অথবা স্বীকার করা হীনতা এবং বর্ব্বরতামূলক বলিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মত, ঐরূপ করিলে স্ত্রীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার খর্ব্বতা করা হয়, মানুষ মানুষকে দেবতা বলিয়া পূজা করিলে তার মনুষ্যত্বের মর্য্যাদার হানি হয়; সুতরাং যে ভ্রান্ত ধারণা এবং সামাজিক ইন্দ্রজাল-প্রভাবে নর এবং নারীর মনে এইরূপ প্রভুত্ব এবং দাসীত্বের আবির্ভাব সম্ভাবিত হইয়াছে, তাহার বিনাশ সাধন কর্ত্তব্য। ইহাই সেই তরুণ লেখকের পক্ষের যুক্তির কথা।

এইখানে একটা কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। সমাজের মধ্যে একটা ভাবের এবং আচারের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদ্বারা তাহাকে অনুপ্রাণিত করা অতি কঠিন কার্য্য। এবং তাহার কঠিনতা আরও বাড়িয়া যায়, যখন সে ভাব, সংযম এবং ত্যাগের পথ দেখাইয়া দেয়। এ দেশের মত কাহারা স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধকে এমন করিয়া সংযমের পরম পাবন প্রদেশে স্থাপন করিয়া সমাজে তাহাকে পাশবীয়তা হইতে অনেক উচ্চে, আনন্দশৃঙ্গে অধিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে? এই সম্বন্ধের মধ্যেই কি মানুষের আত্মবিস্মৃতির সম্ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নয়? সুতরাং এখানেই কি সংযমের প্রয়োজন সেই পরিমাণে অধিক নয়? স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সম্বন্ধে যে সংযমের আদর্শ এ দেশের নরনারীকে পরিচালিত করিতেছে, যে সব দেশে স্ত্রীপুরুষের প্রেমের মধ্যে ভক্তির অবসর কল্পিত হয় নাই তথায় সেই সংযমের সম্ভাবনা কোথায়? সাম্যের পূজা করিতে গিয়া যখন রমণী পতিদেবতাকে প্রণয়ের সখামাত্র করিতে উদ্যত হয়, তখন সত্যই কি সে বৃহত্তর মঙ্গলকে অভ্যর্থনা করে? সেখানে ছদ্মবেশে অসংযমরূপী অমঙ্গলের আবির্ভাব হয় না কি? অসংযম এবং সহজ স্বাধীনতার পরামর্শ যখন যুক্তির হাত ধরিয়া আসিয়া আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে থাকে, তখন বহুকাল সঞ্চিত সংযমরূপ তপস্যার ফল আমরা অনেক সময় নির্ব্বিচারে তাহার হাতে সমর্পণ করিতে দ্বিধাবোধ করি না। পতিদেবতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আমরা যে ত্যাগ এবং সংযমের বন্ধন খুলিয়া দিতে চাহিতেছি, তাহা দ্বারা কি আমাদের সমাজের মঙ্গল সাধিত হইবে?

"পতিদেবতা" এই কথা লইয়া যখন বিদ্রূপ করা হয়, তখন যাহারা 'পতিদেবতা'র ভক্তিমতী স্ত্রীকেই বেশী আঘাত পাইতে হয়। কারণ তাহাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখান হয় যে দুর্ব্বল, ভ্রান্ত, পরপদানত, খোসামুদে, আত্মসম্মানহীন! সে একজন রক্তমাংসময় মানুষকে সে জীবনের দেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে! পুরুষ স্বয়ংই পতিদেবতা হইয়া বসিয়া আছেন, তিনি ব্যঙ্গের একটু সমালোচনার অন্তর্গত হইলেন মাত্র। তিনি হাসিয়া এ আক্রমণ উপেক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু যদি কোন হিন্দু বালিকা সত্য সত্যই এই ভাব লইয়া শিক্ষিত সমাজে গিয়া ভাবটাকে এমন করিয়া উপেক্ষিত ও অপমানিত হইতে দেখে, তবে সে স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধকে কি ভাবে দেখিতে শিখিবে? পূর্ব্ববিশ্বাসকে উপহাস করিয়া কোন্ নূতন ভাবকে আশ্রয় করিয়া তাহার বিবাহিত জীবনের পত্তন করিবে? "প্রবাসী"র নবীন লেখক একটা কথা নিঃসন্দেহ ভুলিয়াছেন। তিনি ভুলিয়াছেন যে স্বামীতে দেবত্বের আরোপ, সমাজগৃহীত একটা আদর্শমাত্র। যেখানে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে প্রকৃত প্রেমের সঞ্চার

হয়,* সেখানে ভক্তিই তাহার পরম পরিসমাপ্তি, আমাদের দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতারা ইহা খুব দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, নারী যখন প্রেমে পুরুষের নিকট বাঁধা পড়ে, তখন ক্রমশঃ তাহার নিজের প্রাপ্যের চিন্তা সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর হইতে থাকে এবং সেবার আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হইতে হইতে সে প্রিয়তমের প্রীতির নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে। ভোগ তখন ত্যাগে পর্য্যবসিত হয়, লালসা শ্রদ্ধাকে পথ ছাড়িয়া দেয়, প্রাপ্তির সম্মিলন অপ্রাপ্তির পূজায় নিঃশেষ হইয়া যায়; সুখের স্থানে অন্তহীন আশা, স্পর্শের স্থানে ধ্যান, প্রমোদের কক্ষে আনন্দ, মিলনের উপরে বিরহ, এবং আনন্দলিপ্সার আসনে ভক্তির প্রতিষ্ঠা হয়। সেই ধর্ম্মাত্মাগণ জানিতেন প্রেমের রসকে চিরনবীন রাখিবার পক্ষে এই পথ ছাড়া অন্য উপায় নাই। তাঁরা আরও জানিতেন ভক্তি যেমন নারী জীবনের নিজস্ব বৃত্তি এমন কোন বৃত্তিই নাই; সুতরাং প্রেমকে ভক্তিতে পর্য্যবসিত করিয়া দিয়া তাঁহারা এমন একটি আদর্শ দেখাইয়াছেন, যাহার তুলনা মনুষ্য-সমাজে অতি বিরল।

যাঁহারা স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ভাবের সাম্য স্থাপনা করিতে চান, তাঁহারা এই আদর্শকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন। তাঁহাদিগকে এসম্বন্ধে আর একটু চিন্তাশীল হইতে অনুরোধ করি। আরও একটা কথা আছে। তাঁহারা একবার যেন অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, প্রকৃত প্রেমিকা স্ত্রী সহজেই স্বামীর প্রতি ভক্তিপরায়ণা কি না, এবং তাহাদের প্রেমের আকাঙ্ক্ষা তাহাদিগকে ভক্তির পথে লইয়া গিয়া বাস্তবিকই স্বামীকে সর্ব্বগুণসম্পন্ন সর্ব্বদোষবর্জ্জিত দেবোপম বলিয়া প্রতীয়মান করে কি না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই যে স্বামীকে দেবতা রূপে গ্রহণ, ইহা কি সম্ভব? যে স্ত্রী প্রতিদিন স্বামীকে সাধারণ জীবের মত ক্ষুৎপিপাসা রাগ দ্বেষ ইত্যাদির অধীন দেখিতে পায়, তাহাকে কেমন করিয়া সর্ব্বদা দেবতাজ্ঞানে পূজা করিবে? এ প্রশ্নের উত্তর আছে। সেবা, পূজা এ সমস্ত অন্তরের জিনিষ। প্রেমপরায়ণা সাধ্বী স্ত্রী দিবসের মধ্যে কতবার আপনার স্বামীকে নূতন করিয়া দেখিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। কতবার তাঁহার সেই পরিচিত স্বরটি শুনিবার জন্য গৃহকর্ম্মের মধ্যে উৎকর্ণ হইয়া সেই স্বরসুধা পান করেন। প্রণয়ের সেই চির-পলায়মান আনন্দমূর্ত্তিকে ধরিয়া রাখিবার জন্য যত্নপূর্ব্বক কত আয়োজন করেন এবং কত আগ্রহে সেই চেষ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর করেন। এই নিত্যপূজাও প্রণয়িনীর একটা আকাঙ্ক্ষার পদার্থ। ইহা চেষ্টা করিয়া সম্পন্ন করিতে হয়, কারণ, সে চেষ্টার ফল পরম স্পৃহনীয়। উপহাস করিয়া ইহাকে উড়াইয়া দিলে কুসংস্কার পরিহার করা হয় না, একটা অভীপ্সিত বস্তু হইতে আপনাকে বঞ্চিত করা হয় মাত্র।

ভক্তির অনুশীলন ক্ষেত্র এমনটি আর কোথায়ও পাওয়া যায় না, যেমন স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধের মধ্যে। একটা দৈহিক আকর্ষণ অবলম্বন করিয়া এই ভাবে যে মানব-চিত্ত সম্পদের শ্রেষ্ঠ রত্নের অধিকারী হওয়া যায়, ইহা কি আশ্চর্য্য বিধান! এই বিধানের গূঢ় অভিপ্রায় যাঁহারা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা এই ভক্তির সম্পদের মধ্যে উপহাসের বস্তু দেখিতে পাইবেন আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু যাঁহারা প্রেমের তত্ত্ব কিছুমাত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলিতে পারেন, কেমন করিয়া এই প্রেম মিলনাকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়া, দেহ সুখের গণ্ডী পার হইয়া, চিন্তা এবং ভাব-বিনিময়েরও উর্দ্ধতর প্রদেশে উত্থিত হইয়া ধীরে ধীরে অনধিগম্যের ধ্যানে পরিণত হইয়া যায়।

প্রেমের রাস্তা খুলিয়া দাও, দেখিবে সে তোমাকে ভক্তির এবং পূজার দেশে লইয়া যাইবে। সে আর কোন পথ জানে না, কারণ এই পথেই তার জীবন।

কেহ কেহ আর একটা সন্দেহ দ্বারা পীড়িত হন। অযোগ্যে কি ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা যায়? সুতরাং সেখানে ত এ আদর্শ টেকে না! আমার

প্রথম উত্তর একটি জিজ্ঞাসার ভিতর দিব। যাহারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অন্য ভাবের প্রবর্ত্তন আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারাই কি এ স্থলে তাঁহাদের আদর্শ লাভ করিতে পারেন? আসল কথা এই, যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রণয় সঞ্চার না হয়, তবে সেখানে কোন আদর্শই টিঁকবে না। বিনা প্রণয়ে স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধের চরিতার্থতা ব্যতিরেকেও সাধারণ এবং লক্ষ্যহীনভাবে অধিকাংশ জীবনই ত চলিয়া যায় কিন্তু তাহাদের কথা আমাদের প্রবন্ধের অন্তর্গত নহে। আমরা আদর্শের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত; সুতরাং তদুপযোগী আলোচনাই করিব।

যদি অযোগ্য স্বামীকে কোন নারী ভালবাসিয়া থাকেন—কারণ এ কথা সকলেই জানে যে প্রেম, রূপ গুণ ধন দৌলতের অপেক্ষা করে না,—তবে তিনিও স্বামীকে অপর সমস্ত পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিবেন। আর যখনই এই শ্রেষ্ঠত্ব বোধ হইল, তখনই ভক্তির ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। কে না জানে কত পতিপরায়ণা সমস্ত হৃদয়ের ভক্তি দিয়া, মূঢ় দেশাচারের অনুরোধে নয় অথবা মূঢ়ের প্রশংসার লোভেও নয়, স্বীয় অযোগ্য পতির জন্য আপনার দেহ, মন সমস্ত উৎসর্গীকৃত করিয়া রাখিয়াছে? কে তাহাকে যুক্তির কশাঘাতে তাহার প্রিয়তমের পূজা হইতে নিবৃত্ত করিবে? যদি একবার প্রেম হইল, তবে তাঁহাকে পূজার পথে পরিচালিত করা কি অতি সহজ এবং স্বাভাবিক নয়—অন্ততঃ এই দেশে? সহজ এবং উচিত এই জন্য যে, তাঁহাকে সেই পথে প্রবর্ত্তিত করা যায়। যাহার যে ধর্ম্ম তাহাকে তাহা আচরণ করিতে দিলে সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, ধর্ম্মের নিরোধ কর; সে শুকাইয়া মরিবে।

ধ্যানের পথে অগ্রসর হও, দেখিবে প্রেমের ইহাই স্বাভাবিক গতি। এই পথেই মাত্র তাহার উপলক্ষ্যের এবং আদর্শের সন্ধান পাওয়া যাইবে, অন্য পথে নয়। জগতে যত আদর্শের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া নয়, স্বভাবের অনুকূলে এবং স্বভাবের সহায়তাতেই হইয়াছে। এ পথে সেই সহায়তা আছে এবং তদ্ব্যতীত আদর্শের মহনীয়তাও আছে। কেন তাহাকে বিমুখ করিয়া আদর্শ লাভ হইতে বঞ্চিত থাকিব?

আর একটা কথা মনে রাখিলে এ সম্বন্ধে আরও নিশ্চিন্ত হওয়া যাইবে। প্রেম পদার্থ কখনও একদেশদর্শী নয়। প্রকৃত প্রেম এবং তৎপশ্চাতে ভক্তির সঞ্চার হইলে, তাহাদ্বারা যিনি পূজারিণী তিনি যেমন মঙ্গল লাভ করিবেন, যাহাকে তিনি পূজা করিবেন, সে অযোগ্য হইলেও তাহারও অশেষ মঙ্গল হইবে। এ প্রেম সত্যই স্পর্শমণি, ইহার সংসর্গে যে আসিবে সেই সোণা হইয়া যাইবে। ইহা সমস্ত মালিন্যকে হেমাভা প্রদান করিবে, সমস্ত অন্ধকারের কুহেলিকাকে আলোকপাতে উদ্ভাসিত করিবে। স্বামীকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিলে কোন দিকে অমঙ্গল নাই; মঙ্গল প্রচুর আছে।

সাম্যবাদী জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, প্রেমের ধর্ম্মে স্বামীকে যদি দেবতা জ্ঞান করিতে হয়, তবে পত্নীকে কেন দেবতা জ্ঞান করা যাইবে না? অবশ্য যাইবে। একজন ধর্ম্মবক্তা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "এক ঈশ্বরের নীচে আমার পত্নীই এখন আমার প্রধান গুরু এবং ধর্ম্মপথের সহায়।" আমাদের দেশের শাস্ত্র ইহার সমর্থন করে। কিন্তু এ সম্বন্ধে ইহাই শেষ কথা নহে। প্রবন্ধের বিষয়ও ইহা নহে—আবশ্যক হইলে পরে ইহার আলোচনা করা যাইবে। এ প্রসঙ্গ আপাততঃ এখানে শেষ করা যাউক।

লেখিকা পতি দেবতার উপর বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া, তুলসীদাস কবীর প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কালের অবতারকল্প মহাপুরুষ পরমহংসদেব এবং তাঁহার প্রিয়শিষ্য স্বাধীনতার উপাসক স্বামী বিবেকানন্দের নাম পর্য্যন্ত এক অশ্রদ্ধেয় পংক্তিতে আনিয়া ফেলিয়া স্ত্রীলোকের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের প্রয়োগ করিয়াছেন।

লেখিকা যদি বিশেষ চিন্তা এবং বিচার না করিয়া এরূপ অসঙ্গত চিন্তাকে অন্তরে স্থান দিয়া থাকেন, তবে তাঁহার ক্ষমা হইতে পারে না। এসম্বন্ধে "উদ্বোধন" পত্রে কিছু কিছু উত্তর দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং তাহার পুনরুক্তি করিব না। একটি কথা মাত্র বলিয়া এই ভিত্তিহীন অভিযোগের বিষয় শেষ করিব।

মহাপুরুষগণ সকলেই পুরুষ শিষ্যগণকে কামিনী-সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাহার অর্থ এই, আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে যাঁহারা আরূঢ় তাঁহাদের পক্ষে যে সংযম অভ্যাস প্রয়োজন, তজ্জন্য কায়মনোবাক্যে ইন্দ্রিয়-সেবার পদার্থ হইতে দূরে অবস্থান করা সেই সংযম সাধনের অপরিহার্য্য উপায়। অনূঢ়া কন্যাগণকে তাহাদের জননীরা পুরুষ-সমাজে অবাধে যাতায়াত করিতে দেন না; তজ্জন্য পুরুষেরা ঘৃণিত হইলেন বলিয়া মনে করিলে, তাঁহারা ভ্রান্ত—যদিও এস্থলে প্রত্যক্ষতঃ ধর্ম্মজীবন যাপনের উদ্দেশ্য বর্ত্তমান নাই। যদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধ করা ধর্ম্মমার্গের একটা প্রধান কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে তদুপযোগী উপদেশ কেন উপহাসের সামগ্রী হইবে বুঝিতে পারি না। ধর্ম্মসাধন-নিরতা কোন সাধুশীলা নারী যদি আধ্যাত্মিক জীবন লাভে কৃত-সংকল্পা কোন চিরকুমারীকে উপদেশ প্রদান করিতেন, তবে তাঁহাকে যথাসম্ভব এমন সংসর্গ পরিহার করিতে উপদেশ দিতেন, যাহাদ্বারা কোন প্রকারে চিত্তের বিকার উপস্থিত হইতে পারে; এবং এরূপ উপদেশ বহুস্থলে প্রকৃতই দেওয়া হইয়াছে। মধ্যযুগের ইয়োরোপের কথা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারিবেন। শাস্ত্রকারগণ যদি ব্যবস্থা দ্বারা প্রলোভনের ক্ষেত্র সংকীর্ণ করিয়া দিয়া থাকেন, যদি তাঁহারা সামাজিক অনুশাসনের বলে নারীগণের চিত্তে আপনাদের সম্মান সম্বন্ধে অতি গভীর ধারণা প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া থাকেন, তবে নারীগণকে পিতা, ভ্রাতা, স্বামী প্রভৃতির আশ্রয়-সম্পন্না করিবার উপদেশে এমন ঘৃণার কথা কি আছে? প্রলোভনকে দূরে রাখিবার চেষ্টাকে নারীর প্রতি অমর্য্যাদা প্রদর্শনের রূপান্তর বলিয়া ব্যাখ্যা করা অত্যধিক ভাবপ্রবণতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। যেখানে অতিরিক্ত শাসন দ্বারা আমরা কাহাকেও উচ্চতর লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়া রাখি, সেখানে সে শাসন নিশ্চয়ই গর্হিত; কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন করিয়া যদি আমরা প্রকৃত কোন প্রলোভনের পথ রুদ্ধ করি, তাহাতে আপত্তি করা উচিত কি? আমার ত এমন কোন পুরুষ অথবা নারীর সাক্ষাৎকার এপর্য্যন্ত লাভ করি নাই, যিনি আপনাকে সমস্ত প্রলোভনের উপর অচল অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত মনে করিয়া সামাজিক নীতির শাসনকে অনাবশ্যক অত্যাচার অথবা অপমানমূলক বিধি বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। নরনারীর মধ্যে অনুধা কোন ধর্ম্ম নাই, অপরাজেয় কোন শক্তি নাই; তাহারা মঙ্গলকর সমাজবিধির বলে আপনার এবং অপরের অধিকার রক্ষা করিয়া চলিতেছে। নতুবা যদি তাহারা নিঃসহায় হইত, তবে কবে তাহারা আপনাদিগকে ধূলিধূসরিত দেখিয়া লজ্জায় মাথা লুকাইয়া থাকিত—এ কথা বলিতে সমাজের কোন সংকোচ কোন দ্বিধা নাই। ভদ্রতার খাতিরে সমাজ রাখিয়া ঢাকিয়া কিছু বলিবে না।

পুরুষ নারীকে তাহাদের "দুষ্প্রবৃত্তি, পৈশাচিক লিপ্সা, নিষ্ঠুর পীড়নের উপকরণস্বরূপ করে" এরূপ ভাষা অত্যন্ত অসংযত এবং অন্যায়। পুরুষ স্ত্রীকে অথবা স্ত্রী পুরুষকে যে কখন কখন ভোগের পদার্থ মনে করে; তাহা তাহাদের সমগ্র প্রকৃতির একাংশের অভিব্যক্তি মাত্র; জীবনের এই দিকটা লইয়াই নরনারী জগতে বাস করিতেছে না। যদি করিত, তবে তাহারা পশুত্বের সীমাও অতিক্রম করিত না। তাহাদের বহু কর্ম্ম এবং চেষ্টা আছে, তাহাদের আদর্শ বহু-পথগামী—শারীর সুখে নিবদ্ধ নহে। ভোগস্পৃহা মানুষের একান্ত ভিতরকার ধর্ম্ম নয়। অতি দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিলেও এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যাইবে। পুরুষ নারীকে দুষ্প্রবৃত্তির সাধন এবং উপকরণ বলিয়া মনে করে এ কথা সত্য হইলে আজই

সমাজ অচল হইয়া পড়িত। কটক অথবা পুরী হইতে, কোথা হইতে ঠিক মনে নাই, একটি বিদুষী মহিলা ঠিক এই কথা বলিয়াই মহাত্মা গান্ধীকে আধুনিক যুবকগণের চরিত্রের প্রতি অবহিত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে মহাত্মা যাহা বলিয়াছিলেন, সে কথা বড় মূল্যবান। "হে নারি, তুমি আপনাকে ভোগের পদার্থ বলিয়া যুবকগণকে মনে করিতে দিও না। তোমার সাজ সজ্জা আর বিলাস পদ্ধতি দ্বারা তাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিও না। সীতা কখনও দেহসজ্জা দ্বারা রামের মন ভুলাইতে চেষ্টা করেন নাই" ইত্যাদি।

আত্মোন্নতিকামী ব্যক্তির পক্ষে পরদোষানুসন্ধান করা অপেক্ষা আত্মপরীক্ষা অধিকতর কার্য্যকারী উপায়। আশা করি, নারী-সমাজের নেতৃবর্গ এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন, কারণ এ সমস্ত বিষয় বিশেষ ভাবে তাঁহাদেরই আলোচ্য।

পরিশেষে আমার নিবেদন, আমাদের স্ত্রীলেখিকাগণ আমাকে জিগীষা-প্রণোদিত মনে না করেন। আমার মনে হইতেছে তাঁহাদের অনেকেই এই নরনারী-মৈত্রী সম্বন্ধে সম্যক এবং নিবিষ্ট আলোচনা করেন নাই, এবং সেই জন্য আপাত-মনোরম ভ্রান্ত যুক্তির অনুসরণ করিয়াছেন। "নারীর কথা" প্রবন্ধ পড়িয়া আমার মনে ব্যথা লাগিয়াছিল, এজন্য এতদিন পরেও এতগুলি কথা লিখিলাম। অযোগ্য হইলেও আমরা একটা নিবেদন করিতে চাহিতেছি, আমাদের মহিলাগণ যেন আপনাদিগকে এমন অশোভন আলোচনায় নিয়োজিত করিয়া ব্যক্তিগত চিন্তা এবং ভাবকে এমন করিয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া আপনাদিগের মর্য্যাদার লাঘব না করেন। আমরা যদি স্ত্রীজাতির প্রতি উদাসীন এবং আমাদের নিজের চরিত্রে হীনতাবশতঃ ঘৃণার পাত্র হই, তবে আমাদিগকে শিক্ষা দিন। কিন্তু দেবীদের গৌরবে গৌরবান্বিত মহিলাগণ সে কথা লইয়া অভিমানপূর্ণ আলোচনা করিতে পারেন না। তাঁহাদের সম্মান এবং হ্রী তাঁহাদিগকে বড় উচ্চে রক্ষা করিয়াছে।

শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সরকার।

অশ্রুকুমার

(উপন্যাস)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ডেপুটী বাবুর বিপদ।

শয্যা-রচনার জন্য অশ্রুকুমারের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া সৌদামিনী অল্পকাল মধ্যে পত্রখানা যথাস্থানে প্রাপ্ত হইয়াছিল। শয্যাসংস্কার করিয়া, সে যখন আপন শয়নকক্ষে যাইতেছিল, তখন ডেপুটী বাবু বৈকালিক জলযোগের পূর্ব্বে হস্তমুখ প্রক্ষালন জন্য উপরের স্নানাগারে গিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ প্রক্ষালনের শব্দ শুনিয়া, সৌদামিনী স্নানাগারের দ্বারে নিকট দাঁড়াইয়া বলিয়া গেল, "দাদা মহাশয়, তুমি হাত মুখ ধুয়ে আমার ঘরে যেও; সেখানে তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। আজ তুমি আমার ঘরে বসেই জলখাবার খাবে; আমি গোপালকে বলে যাই।"

সৌদামিনীর অভিলাষানুযায়ী কার্য্য করিতে ডেপুটী বাবু প্রতিশ্রুত হইলে, সে পুনরায় নিম্নে যাইয়া গোপালকে জলখাবার দিবার কথা বলিয়া আসিল, এবং আপন কক্ষে যাইয়া দাদামহাশয়ের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল।

অল্পকাল পরে ডেপুটী বাবু সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ

করিলে, সৌদামিনী তাঁহাকে শয্যাপ্রান্তে আপন পার্শ্বে উপবেশন করাইল।

উপবেশনান্তর ডেপুটী বাবু নাতিনীর দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া, হাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কি বলবে, দিদিমণি?"

সৌদামিনী বলিল, "অনেক কথা বলব। কিন্তু আগে তুমি বল এই চিঠি কার হাতের লেখা।"—এই বলিয়া সৌদামিনী সেই পুরাতন পত্রখানা তাঁহার চক্ষের সমক্ষে তুলিয়া ধরিল।

ডেপুটি বাবু পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া উহা বস্ত্রপ্রান্তে মুছিয়া লইলেন; পরে উহা নাসিকাতে সংলগ্ন করিয়া কহিলেন, "কই দেখি কার লেখা? এ তোমার বাবার—[illegible] লেখা। এসব তুমি কোথায় পেলে?"

সৌদামিনী একখানি ডেপুটী বাবুর হাতে দিয়া কহিল, "আমি মার একটা বাক্সে ওটা পেয়েছিলাম। তাতে [illegible] ও তাঁর হাতের লেখা অনেক [illegible] তার মধ্যে অনেক চিঠি পেয়েছি। [illegible] চিঠিখানি [illegible]। এই চিঠিখানি তুমি পড়ে দেখ, এতে আমার বিয়ের সম্বন্ধে বাবার একটা উপদেশ আছে।"

ডেপুটী বাবু নিবিষ্ট চিত্তে পত্রখানি পাঠ করিলেন। তাহার পর উহার উপরের তারিখটি লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার মনে পড়িল যে ঐ বৎসর ঐ সময়েই তাঁহার বৈবাহিকের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুকালের ইচ্ছানুযায়ী, রঙ্গণঘাটের ভুবনেশ্বর বাবুর পুত্রের সহিত সৌদামিনীর বিবাহ দিবার জন্য, তাঁহার জামাতা তাঁহার কন্যাকে উপদেশ দিতেছে। রঙ্গণঘাটে যে অশ্রুকুমারের বাটী তাহা ডেপুটী বাবুর স্মরণ ছিল না। তিনি ভাবিলেন, এই রঙ্গণঘাট কোথায়, আর এই ভুবনেশ্বর বাবুই বা কে? এই ভুবনেশ্বর বাবুর কোনও পুত্র আছে কি না তাহাও বলিতে পারা যায় না। জামাতা যে সময়ে এই পত্র লিখিয়াছিল তখন সৌদামিনী জন্মগ্রহণ করে নাই, তখন ভুবনেশ্বর বাবুরও পুত্রকন্যা ছিল না; কেননা পত্রে স্পষ্টই লেখা রহিয়াছে "ভুবনেশ্বর বাবুর পুত্র কন্যা হইলে।" তথাপি এই পত্রখানা কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার হস্তগত হইলে, তিনি নিশ্চয় সেই অনিশ্চিত পুত্রের সন্ধান লইতেন। এখন তাহার সময় [illegible]।

পত্রপাঠান্তে ডেপুটী বাবুকে চিন্তাশীল দেখিয়া, সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছ, দাদামশায়?"

ডেপুটী বাবু বলিলেন, "ভাবছি যে তোমার বাবার ইচ্ছামত তোমার বিয়ে হবার এখন আর কোনও উপায় নেই। তোমার বিয়ের সম্বন্ধ আগেই পাকাপাকি রকম স্থির হয়ে গেছে; আর তোমার মনোমত বরের সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে। অন্য দিকে এই ভুবনেশ্বর বাবুর ছেলে আছে কি না, থাকলেও সে কি রকম ছেলে, তার মা বাপ কিছু আছে কি না, [illegible] কিছুই জানিনে। এক দিকে সমস্ত নিশ্চিত, অন্য দিকে সবই অনিশ্চিত। এই নিশ্চিতটা ধরে থাকাই ভাল। আর বুঝে দেখ, দিদিমণি, তোমার বিয়ের আমি যে সম্বন্ধ স্থির করেছি, তা সকল দিকেই খুব ভাল হয়েছে। তোমার বাবা বেঁচে থাকলে তবুও সে এটিকেই বেশী পছন্দ করত।"

অশ্রুকুমার যে ভুবনেশ্বর বাবুর পুত্র তাহা এ পর্য্যন্ত ডেপুটী বাবু অবগত না থাকায় সৌদামিনী বিলক্ষণ বিস্মিত হইল। কিন্তু আপন বিস্ময় মনোমধ্যে গোপন রাখিয়া, সে অশ্রুকুমারের পরিচয় দিতে অগ্রসর হইল না; ভাবিল, ক্রমে ইহা প্রকাশ করিবে। আপাততঃ [illegible] জমীদারের সহিত বিবাহের সম্বন্ধটা যাহাতে দাদা মহাশয় ভাঙ্গিয়া দেন, সর্ব্বাগ্রে সেই চেষ্টা করিতে হইবে। ইহা মনে করিয়া সে কহিল, "বাবা বেঁচে থাকলে এখন কি পছন্দ করতেন বা না করতেন তা তুমিও বলতে পার না, আমিও বলতে পারি নে। তবে এটা নিশ্চয় বলতে পারি যে, বাবা যদি তাঁর বাবার মৃত্যুকালের আজ্ঞা লঙ্ঘন করে কোন কায করতেন, তা হলে সেটা তুমিও পছন্দ করতে না, আমিও পছন্দ করতাম না।"

ডেপুটী বাবু বুদ্ধিমতী নাতিনীর দিকে মুগ্ধনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "না দিদিমণি, তুমি সত্য বলেছ, আমি সেটা পছন্দ করতাম না। আমরা হিন্দু, আমরা জানি পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘনের মত পাপ আর নেই।"

সৌদামিনী কহিল, "তা হলে, দাদামশায় তুমি কেন আমাকে এই মহাপাপ করতে দেবে? কেন আমি আমার বাবার কথা অমান্য করব? আমার মা বেঁচে থাকলে, তাঁর কর্ত্তব্য কাযটা তিনি নিজেই করতেন। তিনি বেঁচে নেই, এখন তাঁর কর্ত্তব্যটা— আমি তাঁর মেয়ে—আমারই ত প্রতিপালন করা উচিত। তুমি কি বল, দাদামশায়?"

সৌদামিনীর প্রতিভা-সমুজ্জ্বল মুখ দেখিয়া ডেপুটি বাবু অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, সেই উচ্ছৃঙ্খল বালিকা কিরূপে এইরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞানময়ী হইয়া উঠিল? তিনি বলিলেন, "তুমি তোমার বাবার ইচ্ছানুযায়ী কায কর সেটা আমারও ইচ্ছা। কিন্তু এখন আমরা যা করে ফেলেছি, তার পরিবর্ত্তন করবার উপায় নেই।"

সৌদামিনী কহিল, "কেন উপায় নেই? এখনও ত আমার বিয়ে হয়ে যায় নি।"

ডেপুটি বাবু বলিলেন, "বিয়ে না হোক; কিন্তু বিয়ের সম্বন্ধটা পাকাপাকি রকম স্থির হয়ে গেছে।"

সৌদামিনী কহিল, "তার অনেক আগে—আমার জন্মের আগে—আমার বাবা, আমার ঠাকুরদাদার মৃত্যুকালের আজ্ঞায় অন্য জায়গায় আমার বিয়ে স্থির করে গিয়েছিলেন। দাদামশায়, তুমি ভেবে দেখ, তুমি কি আমার বিয়ের সেই আগেকার সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিতে পার? বাবা বেঁচে নেই বলে কি আমি বাবার আদেশ অমান্য করতে পারি? তুমি সেই জমীদারদের চিঠি লিখে তাদের বিয়ের সম্বন্ধটা এখনই ভেঙ্গে দাও। বাবা আমাকে যাঁর হাতে দিয়ে গেছেন, তিনি ছাড়া আর কারও সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না।"

ডেপুটী বাবু বলিলেন, "দিদিমণি, তুমি কি বলছ তা বুঝতে পারছি না। ঐ জমীদারের সঙ্গে তোমার বিয়ে বন্ধ করবার উপায় নেই। কালই তাঁরা গায়ে হলুদ পাঠাবেন; তার জন্যে দু হাজার টাকা খরচ করে' জিনিষ পত্র কিনেছেন। তাঁদের বাড়ীতে বিয়ের অন্যান্য উদ্যোগও চলেছে; তার জন্যেও বোধ হয়, তাঁরা অনেক টাকা খরচ করে ফেলেছেন। আজ হঠাৎ যদি বিয়েটা বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে তাঁদের কত ক্ষতি ও অপমান হবে ভেবে দেখ দেখি। মনে রেখ, আমরাই আগে ঘটক পাঠিয়ে বিয়ের কথাটা তুলেছিলাম। ঐ বিয়েটা বন্ধ করলে, হয়ত তোমারও বিশেষ অনিষ্ট করা হবে। এই বিয়ে ভেঙ্গে যাবার পর, যদি ঐ ভুবনেশ্বর বাবুর অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখি যে তাঁর মোটেই কোনও পুত্রসন্তান নেই, কিংবা যে পুত্র আছে, সে তোমা অপেক্ষা বয়সে ছোট, কিংবা অন্যপ্রকারে অযোগ্য, তখন আমাদিকে কি অসুবিধায় পড়তে হবে ভেবে দেখ দেখি। এই হরিহরপুরের জমীদারটি তোমার যেমন মনোমত পাত্র হয়েছে, তেমন একটি মনোমত পাত্র কোথায় আবার খুঁজে পাব?"

সৌদামিনী ডেপুটী বাবুর দীর্ঘ যুক্তির কোনও উত্তর না দিয়া সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কাকে আমার মনোমত বলছ?"

ডেপুটি বাবু বলিলেন, "কেন দিদিমণি, হরিহরপুরের ছোট জমীদার বাবুটি কি তোমার মনোমত বর নয়?"

সৌদামিনী ললাট কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে কথা তোমাকে কে বল্লে?"

ডেপুটি বাবু বিস্মিত হইলেন; বালিকা যে শত প্রকারে তাঁহার নিকট ধরা দিয়াছে, তাহা সে কি ভুলিয়া গেল? তিনি কহিলেন, "কেন? তাদের বড় বড় হাতী আছে, ঘোড়া আছে, ভাল ভাল গাড়ী আছে শুনে, তুমি আমাকে বলছিলে যে তুমি ঐ রকম হাতীতে গাড়ীতে চড়তে ভালবাস। তাইত আমি অনেক চেষ্টা করে, ঐ জমীদারদের বাড়ীতে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করেছিলাম।"

সৌদামিনী কহিল, "আমি ভুল করেছিলাম, দাদামশায়। আমি গাড়ীতে চড়তে ভালবাসিনে; যে গাড়িতে মানুষ চাপা পড়বার ভয় আছে, তাতে কি চড়তে আছে? আর হাতীতে? ছি ছি! মেয়েমানুষ হাতী চড়লে বিশ্রী দেখায়?"

ডেপুটি বাবু কহিলেন, হাতী ঘোড়া সম্বন্ধেই যেন ভুল করলে; কিন্তু জমীদারে সেই ছবিখানা মাথার বালিশের নীচে নিয়ে শুয়ে থাকতে কেন? আমি এখন বুড়ো হয়েছি বলে, আমি কি কিছুই বুঝতে পারিনে?"

সৌদামিনী হাসিল; কহিল, "তুমি কিছুই বুঝতে পারনি। বাঁদরের ছবি পেলেও লোকে দেখে, তাই দেখেছিলাম। তারপর, কখন্ ভুল করে বালিশের নীচে রেখেছিলাম একটুও মনে ছিল না। সত্যি বলছি দাদামশায়, একটুকও মনে ছিল না। মনে থাকলে তখনই আমি তা তোমার হাতে দিতাম। তা আমার বালিসের নীচে পেয়ে, তুমি বুঝি মনে করছিলে, আমি ভক্তি করে, সেখানা মাথার নীচে রেখেছিলাম? দাদা মশায় আমি সত্য বলছি, তুমি কিছুই বুঝতে পারনি। আমার বাবা যাঁর হাতে আমাকে সম্প্রদান করে গেছেন, তাঁকে ছাড়া আর কারও প্রতি ভক্তি আমার মনে আসতে পারে না।"

ডেপুটীবাবু কহিলেন, "তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে দিদিমণি, তুমি যেন তোমার সেই পিতৃদত্ত বরটিকে দেখেছ।"

সৌদামিনী মুখ অবনত করিয়া বলিল, "আমিও দেখেছি, তুমিও দেখেছ; তুমি তাঁকে বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছ।"

অন্ধকার ঘরে বিদ্যুৎ বাতির সুইচ্ টিপিলে, যেমন তাহা সহসা আলোকিত হইয়া উঠে, সৌদামিনীর এই বাক্যে, ডেপুটী বাবুর সমস্ত হৃদয় আলোকিত হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন যে অশ্রুকুমারই ভুবনেশ্বর বাবুর পুত্র,—সৌরামিনী তাহা কোন ক্রমে জানিতে পারিয়াছে। ভাবিলেন অশ্রুকুমারের সহিত সৌদামিনীকে অবাধে মিশিতে দেওয়া ভাল হয় নাই। বালিকা, যৌবনের প্রথম উন্মেষে, তাহার অগ্নিশিখা সম উজ্জ্বল ও তেজোময় মূর্ত্তি দেখিয়া নিশ্চয় মুগ্ধ হইয়াছে—হরিহরপুরের জমীদারিটা একটা পুরাতন পুতুলের মত, তাহার মন হইতে ফেলিয়া দিয়াছে। কিন্তু ডেপুটিবাবু কিরূপে তাঁহার চির আদরের নাতিনীকে বিদ্যাহীন ধনহীন অশ্রুকুমারে হস্তে সমর্পণ করিবেন? কিরূপে দারিদ্র্যের পঙ্কে এই রত্নাধিক রত্ন নিক্ষেপ করিবেন? তাহা ছাড়া জমীদারদিগকে যে কথা দিয়াছেন, তাহাই বা কি রূপে প্রত্যাখ্যান করিবেন? অথচ বালিকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কার্য করা সহজ হইবে না। হায় হায়! সৌদামিনীর বিবাহ লইয়া, ডেপুটীবাবু শেষ মুহূর্ত্তে কি বিপদেই পতিত হইলেন।

এইরূপ মনে চিন্তা করিয়া ডেপুটী বাবু বিমর্ষ মুখে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কার কথা বলছ, দিদিমণি? অশ্রুকুমারের কথা? অশ্রুকুমারই কি ভুবনেশ্বর বাবুর ছেলে?"

সৌদামিনী তাহার মুখখানা নিম্নদিকে আন্দোলিত করিয়া কহিল, "হাঁ।"

ডেপুটীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি করে জানলে?

সৌদামিনী আনতাননে কহিল, "তাঁদের মুখে শুনেছি?"

ডেপুটী বাবু কহিলেন, "কিন্তু তোমার বাবার চিঠিতে যে ভুবনেশ্বর বাবুর কথা আছে, ইনি যে সেই ভুবনেশ্বর বাবু তা কি করে জানলে?"

সৌদামিনী কহিল, "দুজনেরই বাড়ী রঙ্গণঘাটে, তা ছাড়া ভুবনেশ্বর বাবুর যে ছবি আমাদের বাড়ীতে আছে, তা দেখে মা আর ছেলে দুজনেই তাঁকে চিনেছেন।"

ডেপুটিবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তুমি ও কি বলছ দিদিমণি, ভুবনেশ্বর বাবুর ছবি আমাদের বাড়ীতে আসবে কি করে? আমি ত তা কখনই দেখি নি। সে ছবি তুমি কোথায় পেলে?"

সৌদামিনী ছবি প্রাপ্তির ইতিহাস বিবৃত করিয়া কহিল, "আমি আমার ঠাকুরদাদা মহাশয়কে কখন দেখি নি, তবু তাঁর ছবিখানা দেখলে মনে হয়, যেন আমি ঐ নির্জীব ছবিটাকে তোমারই মত ভালবাসি। কেন এমন হয় তুমি বলিতে পার?"

ডেপুটী বাবু বুঝিলেন যে পিকশিশু বায়সকুলায়ে প্রতিপালিত হইলেও বয়োপ্রাপ্তির সহিত সে কুহুধ্বনি করিয়া থাকে। তিনি আজীবন সৌদামিনীকে লালন পালন করিয়া, এবং তাহাকে প্রাণপণে ভালবাসিয়া, তাঁহার যে ভালবাসাটুকু লাভ করিতে পারিয়াছেন, সেই ভালবাসা প্রতিদান ব্যতীত, সে অত্যন্ত সহজে তাহার পিতাকে প্রদান করিল; সৌদামিনীর এই স্বজনপ্রীতি দেখিয়া, ডেপুটীবাবু প্রীত হইলেন; কিন্তু অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে একটু ব্যথাও অনুভব করিলেন। তিনি নাতিনীর প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "তুমি সেই বংশে জন্মেছ কিনা, তাই আপনা হতেই সেই বংশের প্রতি তোমার মনে একটা টান জন্মেছে।"

সৌদামিনী কহিল, "সেই ঠাকুরদাদার মৃত্যুকালের আদেশ অমান্য করলে, আমার কি কখন ভাল হবে, দাদামশায়?"

ডেপুটি বাবু কহিলেন, "তুমি উতলা হয়ো না। তোমার যাতে ভাল হয়, আমি সেই ব্যবস্থা চিরকালই করেছি, চিরকালই করব। আজ বিকালে রামতনু বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় একটা সুব্যবস্থা করব। এই চিঠিখানা আমার কাছে থাক্।"

সৌদামিনী কতকটা আশ্বস্ত হইল। ডেপুটিবাবু জলযোগ করিয়া নিম্নে নামিয়া আসিলেন। বহির্বাটীতে যাইয়া দেখিলেন, অশ্রুকুমার একখানা পুস্তক লইয়া অনন্যমনে পাঠ করিতেছে। তাহার প্রশান্ত ও উজ্জ্বল মুখে যেন ছায়াহীন স্বর্গের উজ্জ্বল ছায়া পতিত হইয়াছিল। সেই মুখ দেখিয়া ডেপুটী বাবু ভাবিলেন, বাস্তবিক ঐ মুখে এমন কিছু আছে, যাহাতে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারা যায় না; তথাপি এই দরিদ্র বিত্তহীনের হস্তে পড়িলে, দিদিমণি আমার চিরদুঃখিনী হইবে।

এই অশ্রুকুমারের উজ্জ্বল রূপপ্রভা সৌদামিনীর মনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা সবিশেষ অবগত হইবার জন্য ডেপুটি বাবু অন্য এক কক্ষে যাইয়া বৃদ্ধা ঝিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

বৃদ্ধা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কেন ডেকেছেন বাবু?"

ডেপুটি বাবু আপনার প্রধান প্রশ্ন প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বলিলেন, "এই, দিদিমণির জলখাবার খাওয়া হয়েছে কি না তোমাকে তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।"

বৃদ্ধা কহিল, "না এখনও তার জলখাবার খাওয়া হয়নি। আমাদের কথা কি শোনে? পাড়াগাঁ থেকে ঐ যে ছেলেটি এসেছে, ওর জলখাবার খাওয়া না হলে দিদিমণি একদিনও জলখাবার খায় না; ভাতও খায় না।"

ডেপুটী বাবু মনে মনে ভাবিলেন, "ইস্! আমার অজ্ঞাতসারে জলটা বেশিদূর, অগাধে গড়াইয়া গিয়াছে! ছেলেমানুষ রূপে মুগ্ধ হইয়া বোধ হয় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন খায় না?"

বৃদ্ধা কহিল, "দিদিমণি ঐ ছেলেটিকে আর তার মাকে ভারি ভক্তি করে; এমন ভক্তি কখনও দেখি নি। কোনও কোনও দিন ঐ ছেলেটির পাতেই খেতে বসে। আমাদের বাধা দিয়ে নিজেই ওর শোবার বিছানা ঝেড়ে দেয়; ওর কাপড় জামা নিজেই গুছিয়ে রাখে। ঐসকল দেখে শুনে ঐ ছেলেটির মা আমাদের দিদিমণিকে ছেলের বউ করতে ইচ্ছা করেছেন।"

ডেপুটী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি করে জানলে যে দিদিমণির সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবার জন্য তাঁর ইচ্ছে হয়েছে?"

বৃদ্ধা কহিল, "সেই কথা আপনাকে বলবার জন্যেই ত ছেলের মা কাল সন্ধ্যেবেলা আমাকে অনুরোধ করেছিলেন।"

ডেপুটী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদিমণি কি হরিহরপুরের জমীদারদের সম্বন্ধে কোনও কথা বলে?"

বৃদ্ধা কহিল, "কি হয়েছে, জানি নে; কিন্তু আজকাল তাঁদের কথা মুখেও আনে না। সেই ব্যারাম থেকে উঠে অবধি তাঁদের কথা, বা নিজের বিয়ের কথা একবারও বলে নি। একদিন আমি তাঁদের কথা বলতে গিয়েছিলেম, তাতে দিদিমণি আমাকে ধমক দিয়ে বল্লে, 'চুপ কর্ চুপ কর্ ঝি, ও সব কথা আমাকে বলিসনে; আমার ঘেন্না করে।'"

ডেপুটীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেখানে কি দিদিমণির বিয়ে করতে ইচ্ছা নেই?"

বৃদ্ধা কহিল, "কি জানি বাবু, তার কি রকম মতি আমি কিছুই বুঝতে পারিনে। তাকে আমি ছেলেবেলা থেকে মানুষ করে এসেছি, কিন্তু একদিনের তরেও তাকে চিনতে পারলাম না।"

নিকটে কক্ষদ্বারে প্রভাকরকে দেখিয়া, ডেপুটীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভাকর, তোমার হাতে কি? তুমি কি বাহিরে যাচ্ছ?"

প্রভাকর কহিল, "আমার হাতে কতকগুলি বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র; আমি এগুলি ডাকে দিতে যাচ্ছি।"

ডেপুটী বাবু কহিলেন, "থাক্ থাক্, চিঠিগুলো এখনও ডাকে দিও না। আমি ভয়ানক বিপদে পড়েছি। বোধ হয় এই বিয়ে বন্ধ রাখতে হবে।"

প্রভাকর অবাক হইয়া নির্নিমেষ নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ডেপুটীবাবুর বিপন্মুক্তি।

প্রভাকর ডেপুটীবাবুকে কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহা আর করা হইল না। দ্বারের নিকট সহসা ঘটক ঠাকুর আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, "নমস্কার ডেপুটী বাবু, কেমন আছেন? আপনার ভৃত্যকে একবার তামাক দিতে বলুন।"

ডেপুটী বাবু কহিলেন, "নমস্কার ঘটক মশায়! এখানে স্থানাভাব; ঐ বৈঠকখানা ঘরে চলুন; আমিও সেখানে যাচ্ছি।"

ঘটক ঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে যাইয়া বিস্তীর্ণ শয্যার উপর উপবেশন করিলেন।

ডেপুটী বাবুও তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া বসিলেন। দেখিলেন যে অশ্রুকুমার আর এখন তথায় বসিয়া নাই; সে যথারীতি প্রাতাহিক ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিল। দেখিলেন অশ্রুকুমার যে স্থানে বসিয়া ছিল, সেইস্থানের নিকটে একখানা খাতার উপর একখানা বই ও একটা পেন্সিল রহিয়াছে। বইখানা তুলিয়া লইয়া, তিনি তাহার পত্র সকল উল্টাইয়া দেখিলেন,—ইংরাজি অক্ষর; কিন্তু ল্যাটিন ভাষায় লিখিত। ঐ পুস্তকের আবরণের লিখিত ছিল Ciceronis Rhetorica লাটীন ভাষার এই বৃহৎ পুস্তক লইয়া অশ্রুকুমার কি করিতেছিল? তিনি বিস্মিত হইয়া খাতাখানা তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন খাতা ইংরাজী ও বাঙ্গালা লেখায় পূর্ণ—এক খানি পাতায় ইংরাজি লেখা, তাহার পরের পাতায় বাঙ্গালা লেখা। খাতাখানা প্রায় সমস্তই লেখা হইয়া গিয়াছে; কেবল কয়েকখানি পাতা মাত্র অবশিষ্ট আছে। খাতা পেন্সিলের দ্বারা লিখিত। খাতার আবরণের উপর তিনটি ছত্রে লিখিত আছে—

CICERO'S RHETORIC
সিসিরোর বাক্যকুহক।
ASRUKUMAR CHAKRABARTY

ডেপুটী বাবু খাতার সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হস্তলিপি পাঠ করিয়া দেখিলেন যে সকল স্থলেই ভাষা প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ,—তেমন সরস ভাষা তিনিও রচনা করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। তিনি ভাবিলেন, যদি এই পুস্তকখানি অশ্রুকুমার পাঠ করিয়া থাকে, যদি এই খাতাখানি সেই লিখিয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সে কোনও ক্রমে মূর্খ নহে; বরং অসাধারণ পণ্ডিত। কিন্তু সৌদামিনীর নিকট তিনি শুনিয়াছিলেন যে অশ্রু-

কুমার ভালরূপ লেখাপড়া শিক্ষা করে নাই ;—হয়ত বিনয়বশতঃ সে সৌদামিনীর নিকট আত্মপ্রকাশ করে নাই। তাহা হইলে অশ্রুকুমার বিদ্বান্ ও বিনয়ী ; সে অত্যন্ত সুশ্রীও বটে। কেবল তাহার যদি কিছু অর্থ থাকিত, আর হরিহরপুরের জমিদারের সহিত বিবাহের সম্বন্ধটা পাকাপাকি না হইয়া যাইত, তাহা হইলেই অশ্রুকুমারের সহিত সৌদামিনীর বিবাহ দিতে ডেপুটী বাবুর একটুও আপত্তি থাকিত না। অল্পকাল মধ্যে এই সকল বিষয় মনে মনে চিন্তা করিয়া, তিনি ধূমপানরত ঘটকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "ঘটক মশায়, আজ কি অভিপ্রায়ে আপনার শুভাগমন হয়েছে ?"

ঘটক ঠাকুরের শিখাটা কৃষ্ণতৃণাচ্ছাদিত ময়দানের উপর মনুমণ্টের মত উচ্চ হইয়াছিল। তাহা অবনত করিবার চেষ্টা করিয়া তিনি কহিলেন, "এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে আজ গাত্র হরিদ্রার দিন নির্দ্ধারিত আছে। আপনার নাতিনীর গাত্র হরিদ্রা—সমারোহ ব্যাপার। কিন্তু এত বড় ব্যাপারের প্রধান লক্ষণ কুকুর, কলাপাতা ও ভাঙ্গা ভাঁড় দ্বারের নিকট লক্ষ্য না করে ভাবলাম, 'কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং।' তাই সন্ধান নেবার জন্যে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করলাম।"

ডেপুটী বাবু কহিলেন, 'ভালই করেছেন। কিন্তু আজ গাত্রহহিদ্রা হয় নি।"

ঘটকঠাকুর অতি বিস্ময়ে তাঁহার অক্ষ সদৃশ অক্ষি বিঘূর্ণিত করিয়া কহিলেন, "গাত্রহরিদ্রা হয় নি ? কেন এর কারণটা কি ? শুভকার্য্যে বিলম্ব হওয়াটা ত ভাল নয় ;—কেন না, শাস্ত্রেই বলেছে, শুভস্য শীঘ্রং।"

ডেপুটী বাবু কহিলেন, "গত কল্য অপরাহ্ণে কেদার বাবুর এক চিঠি পেলাম ; তিনি লিখেছেন যে গাত্রহরিদ্রার সমুদয় উদ্যোগ সম্পন্ন করতে না পারায়, তাঁদের পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণীর আদেশে গাত্রহরিদ্রা একদিন পেছিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। কাল গাত্রহরিদ্রা আসবে। বিবাহ ধার্য্য দিনেই হবে।"

ঘটকঠাকুর কহিলেন, "তাঁদের সবই বাড়াবাড়ি। উদ্যোগটা একটু কম করে ধার্য্যদিনেই গাত্রহরিদ্রা পাঠান তাঁদের কর্ত্তব্য ছিল। কেন না শাস্ত্রেই বলেছে, 'সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং।' যা হোক ধার্য্যদিনে যে উদ্বাহ সম্পন্ন হবে এই মঙ্গল।"

ডেপুটি বাবু ভাবিলেন, ধার্য্যদিনে বিবাহ হওয়া সম্বন্ধে যে বিষম প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তখনই ঘটক ঠাকুরের নিকট প্রকাশ করেন। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিলেন যে রামতনু বাবুর সহিত পরামর্শ না করিয়া কোনও কথা প্রকাশ করা সদ্‌বিবেচনার কার্য্য হইবে না। অতএব তিনি ঘটকের সহিত অন্যান্য কথায় কিয়ৎকাল আলাপ করিয়া, এবং তাম্রকূট সেবনে তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিয়া বিদায় দিলেন।

ঘটক প্রস্থান করিবার অল্পকাল পরেই রামতনু বাবু আসিয়া ডেপুটী বাবুকে নমস্কার করিলেন।

ডেপুটী বাবু প্রতিনমস্কার করিয়া কহিলেন, "আসুন আসুন, আজ আপনাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন। আজ আমি এক আকস্মিক বিপদে পড়ে গেছি।"

রামতনু বাবু। আজ আপনাকে মহা বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্যেই আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি।

ডেপুটী বাবু। সে কি ? আপনি আমার বিপদের কথা কি করে অবগত হলেন, যে তা থেকে আমাকে উদ্ধার করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন ? দুঘণ্টা আগে আমার বিপদের কথা আমি নিজেই অবগত ছিলাম না।

রামতনু বাবু। আমি চারদিন আগে আপনার বিপদের প্রথম সন্ধান পেয়েছিলাম। তার পর এই ক' দিন নানাস্থানে নানা কৌশলে, নানারূপ অনুসন্ধান করে যা জানতে পেরেছি, তাতে বুঝেছি যে এখন আমি আপনাকে সকল বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারব।

ডেপুটী বাবু। আমি যে বিপদের কথা বলছি, বোধ হয়, আপনি তা জানেন না। আপনি বোধ

হয়, আমার অজনানিত অন্য কোনও বিপদের কথা বলছেন। আমি আগে আমার জানিত বিপদের কথা আপনাকে জানাই, তার পর, আমার অজানিত বিপদের কথা আপনার কাছে শুনব।"—বলিয়া ডেপুটী বাবু ব্যাপারটা সবিস্তারে রামতনু বাবুকে জানাইলেন।

শুনিয়া রামতনু বাবু বলিলেন, "আশ্চর্য্য বটে! ডেপুটী বাবু, আপনি এতে বেশ একটু বিধাতার হাতের খেলা দেখতে পাচ্ছেন না? দেখুন দেখি, বিধাতা কি অদ্ভুত উপায়ে, দিদিমণির বিয়ের ঠিক আগেই অশ্রুকুমারকে আপনাদের কাছে এনে দিলেন! এতে আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে অশ্রুকুমারের সঙ্গে দিদিমণির বিয়ে হওয়া কেবল মাত্র তার পরলোকগত পিতা বা পিতামহের ইচ্ছা নয়, এটা বিধাতারও ইচ্ছা।"

ডেপুটী বাবু। শুনলাম, অশ্রুকুমারের পিতারও আদেশ আছে, স্বর্গীয় দীনবন্ধু বাবুর পুত্রের কোন কন্তার সঙ্গে তার বিয়ে হয়।

রামতনু। আমার মনে হয়, এ বিয়ে ঘটবেই। আমি জানি কৌলীন্য প্রথার জন্যে আপনি কোনও আপত্তি উত্থাপন করবেন না। কিন্তু এই বিয়েতে আপনার একটা আপত্তি থাকতে পারে। আপনি বলতে পারেন যে অশ্রুকুমার কৃতবিদ্য নয়, সে যথেষ্ট রূপবান, সুশীল ও সৎস্বভাবাপন্ন, কিন্তু বিদ্যাহীন।

ডেপুটী। সে বিদ্যাহীন কি না, সে বিষয়ে আমার মনে এখন যথেষ্ট সন্দেহ জন্মেছে। এই দেখুন, অশ্রুকুমার এই ল্যাটিন বইখানি পড়ছিল; আর এই খাতাখানিতে তার বাঙ্গলা ইংরাজী অনুবাদ করছিল।

রামতনু বাবু পুস্তক ও খাতাখানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিলেন, "অশ্রুকুমার ল্যাটিন জানে, আর এমন বড় ল্যাটিন পুস্তক পড়তে পারে, আর এমন বিশুদ্ধ ইংরাজী লিখতে পারে; অতএব সে কখনই বিদ্যাহীন নয়। আর যার বিদ্যা আছে, কালক্রমে সে নিশ্চয় অর্থোপার্জ্জনও করতে পারবে; সুতরাং ভবিষ্যতে তার দারিদ্র্যও থাকবে না। তবে তার সঙ্গে দিদিমণির বিয়ে দিতে আপনার আপত্তি কি?"

ডেপুটী। আপনি কি ভুলে গেছেন যে হরিহরপুরের ছোট জমীদারের সঙ্গে দিদিমণির বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেছে?

সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হোন।"—বলিয়া রামতনু বাবু তাঁহার গৃহিণী তাঁহার নূতন ঝির নিকট হইতে যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, সে সকল কথা বর্ণনা করিলেন।

শুনিয়া ডেপুটি বাবু অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

রামতনু বাবু বলিলেন, "কিন্তু একটা ঝির কথায় নির্ভর করে আপনাকে সংবাদটা তখনই প্রদান করতে আমার প্রবৃত্তি হল না। তার কথাটা যথার্থ কি না তার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলাম। সেই দিনই একাদশী চক্রবর্ত্তীর কাছারী বাড়ীতে গিয়ে তাঁর ম্যানেজার বাবুর কাছে সংবাদ নিলাম। তাঁর কাছে শুনলাম যে ঐ ঐ নামের তিনটি শালা একাদশী চক্রবর্ত্তীর মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত ঐ বাড়ীতে ছিল। তার পর তারা কোথায় গেছে, তা তিনি বলতে পারলেন না। আমার প্রশ্নে তিনি আরও বললেন, যে তিনি তাদিগকে 'মত্তপায়ী ও কুচরিত্র বলে জানেন'। সেই বাড়ীতে এমন দু একজন চাকর আছে, যারা তাদিগকে দেখবামাত্র চিনতে পারবে। আমার অনুরোধে তিনি সেই রকম একটি চাকরকে আমার কাছে ডেকে পরিচিত করে দিলেন।

ডেপুটী। তার পর এই চাকরকে নিয়ে আপনি কি করলেন?

রানতনু। পরদিন আমি তাকে আমার বাড়ীতে ডেকে আনলাম এবং তাকে কিছু টাকার লোভ দেখিয়ে, টিরেটি বাজারে একটা ছদ্মবেশের দোকানে নিয়ে গিয়ে একটা ভালরকম ছদ্মবেশ পরালাম।

ডেপুটী। ছদ্মবেশটা কি রকম হল?

রামতনু। তার অল্প অল্প দাড়ি গোঁফ ছিল; একটা নাপিত ডেকে তা বেশ করে কামিয়ে দিলাম।

তার পর তাকে একটি ছোট কাঁচা পাকা গোঁফ এবং একটি কাঁচাপাকা নূর পরালাম। তার মাথায় কাঁচা পাকা বাউরি কাটা চুল পরালাম; চুলের উপর জরি আর চুমকির কায করা একটি নীল মখমলের টুপি পরালাম। লোকটা রোগা ছিল; তার হাতে পেটে ও পায়ে কাপড় জড়িয়ে তাকে একটা মোটা মানুষের পায়জামা ও চাপকান পরালাম। এইবেশে সে বড় বড় বাইজিদের দালাল হল। তখন তার নাম রাখলাম নূর মহম্মদ আলি। তখন সে চোখে সুর্ম্মা লাগিয়ে আমার সঙ্গে ভবানীপুরে গেল।

ডেপুটী। আপনার মাথায় এত বুদ্ধি জন্মাল কি করে?

রামতনু। আমার এত বুদ্ধি, দেখুন তবু গৃহিণী বলেন যে আমার মত বোকা তিনি বাপের জন্মে দেখেন নি। যাক সে কথা। এখন সেই লোকটাকে অন্য কিছু না সাজিয়ে বাইজিদের একজন দালাল সাজাবার কারণটা কি বুঝতে পেরেছেন ত? আমি মনে করেছিলাম, যে তাতে তাদের চেহারাই কেবল চেনা হবে না, তাদের চরিত্রও চেনা হবে। বলা বাহুল্য, আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়েছিল।

ডেপুটী। বাস্তবিক রামতনু বাবু, আপনার বুদ্ধির বাহাদুরী আছে। এ যেন একটা পুরো ডিটেক্‌টিভের ব্যাপার।

রামতনু। লোকটাকে আমি ভাল করে' শিখিয়ে পড়িয়ে সন্ধ্যার পর জমীদারদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম। নিজে রাস্তার অপর পারে একটু দূরে গাড়ীর ভিতর বসে রইলাম।

ডেপুটী। লোকটা কতক্ষণ বাদে আপনার কাছে ফিরে এল?

রামতনু। প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে।

ডেপুটী। কি খবর দিলে?

রামতনু। সে ফিরে এসে বল্লে যে সে তাদের বৈঠকখানা ঘরে বসে তাদের কাছে অনেক নূতন আমদানী বাইজির খাপ্‌সুরৎ চেহারার খোষগল্প করে এসেছে। তারা কেউই তাকে চিনতে পারে নি; কিন্তু সে তিনজনকেই চিনেছে,—তারা সেই তিন শালাই বটে। তার পর, সে আমকে পাঁচটা টাকা দেখিয়ে বল্লে যে, সুধীরনাথ জ্যেষ্ঠদের সমুখেই ঐ টাকা তাকে দিয়ে অনুরোধ করেছে যে পরদিন সে এসে যেন তাকে এক সুন্দরী বাইজির কাছে নিয়ে যায়।

ডেপুটী। রাম রাম! এমন কুচরিত্র! কিন্তু পরদিনই আপনি আমাকে সংবাদটা দিলেন না কেন? আমি পুলিশে খবর দিয়ে তাদের শ্রীঘরের ব্যবস্থা করতাম।

রামতনু। পরদিন আমি সার্ভে আফিসে গিয়েছিলাম, তাই আপনার কাছে আসতে পারিনি। সেখানে আমি রংপুর জেলার একখানা বড় ম্যাপ কিনলাম। দেখলাম, সেই ম্যাপে অতি সামান্য পল্লীগ্রামেরও উল্লেখ আছে; কিন্তু হরিহরপুরের নাম কোথাও দেখলাম না। সেই আফিসে অনুসন্ধান করে জানলাম যে, ঐ ম্যাপে কোন পল্লীরই নাম ছাড় পড়ে নি। বুঝলাম হরিহরপুরের অস্তিত্ব নেই। যে গ্রামের অস্তিত্ব নেই, তার জমীদারও থাকতে পারে না। কাযেই ঐ শালারা জমীদার নয়।

ডেপুটী। জমীদার না হলে এত ধুমধাম কোথা হতে হয়?

রামতনু। এ কথাটা আমিও ভেবে ঠিক করতে পারি নি। হয়ত কোন কৌশলে তারা ভগিনীপতির কিছু অর্থ হস্তগত করতে পেরেছিল। যা'হক এই নকল জমীদারদের আরও কিছু সংবাদ সংগ্রহ করবার জন্যে কাল বিকেলে আমি আবার ভবানীপুরে গিয়েছিলাম। সেখানে তাদের বাড়ীর কাছে অনেক লোক জড় হয়েছে দেখলাম। তাদের কাছে আমি যা খবর পেলাম তাতে আমার মনে হাস্যরসের সঙ্গে একটা বীভৎস রসের উদয় হল।

ডেপুটী। বীভৎস রস? কি রকম?

রামতনু। জানেন ত তাদের একজন ম্যানেজার ছিল। এই ম্যানেজার মহিষীর কাছে আমার গৃহিণী

প্রথম প্রথম হরিহরপুরের তত্ত্ব সংগ্রহ করেছিলেন। এই ম্যানেজারের নাম যাদবচন্দ্র দাস, সে ঐ মহিষীটিকে নিয়ে ঐ ভবানীপুরেই একটা পৃথক বাড়ীতে বাস করত। ঐ স্ত্রীকে কুলটা দেখে সে তাকে আর তার সেই লোকটাকে—দুজনকেই কাল দুপর বেলা হত্যা করে সে আপনিই পুলিশের হাতে ধরা দিয়েছে। আর থানায় গিয়ে সে এমন এজাহার দিয়েছে, যাতে ঐ তিনটি শালাকেও পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে এবং হাজতে বন্ধ করে রেখেছে। যদি থানার লোকের কাছে আরও কিছু সংবাদ সংগ্রহ করতে পারি, এই প্রত্যাশায় আমি আজ দুপর বেলা আবার ভবানীপুর গিয়েছিলাম। কিন্তু থানার লোক বড় কিছু বল্লে না। যা হোক, আমি জানতে পারলাম যে শালাদের পক্ষে জামীন হয়ে হাজত থেকে তাদিকে কেউ মুক্ত করে নিয়ে যায় নি, তারা হাজতেই আছে।

ডেপুটী বাবু একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ভগবান আমাদিকে রক্ষা করেছেন। কাল তবে তারা গায়ে হলুদ পাঠাতে পারবে না।"

রামতনু। কাল কেন, কোন কালেই তাদের কাছ থেকে হতে গায়ে হলুদ আসবে না। অবিলম্বে তাদের সকল জুয়াচুরীই ধরা পড়ে যাবে।

ডেপুটি বাবু কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া বলিলেন, আমি শুধু ভাবছি, দিদিমণিকে বিয়ে করবার জন্যে তারা এত টাকা খরচ করে' এত বড় একটা জুয়াচুরী কেন করলে? দিদিমণির রূপে মুগ্ধ হয়ে তারা এমন কায করেছে এ আমার মনে হয় না। তবে টাকার লোভে যদি করে' থাকে। কিন্তু দিদিমণিকে বিয়ে করলে তারা ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার বেশী পেত না। এটা কি তাদের পক্ষে এতই প্রলোভন যে, তাই পাবার জন্যে তারা একটা মিথ্যা ধুমধাম দেখিয়ে প্রায় তত টাকাই খরচ করবে? বোধ হয় এই জুয়াচুরীর দ্বারা কেবল মাত্র আমাকেই ঠকাত না, আরও বেশী লোককে ঠকাবার উদ্যোগ করেছিল। আচ্ছা রামতনু বাবু, তাদের একজন দানশীলা মা ছিল, সে কোথায় গেল।

রামতনুবাবু হাসিয়া, সেই স্ত্রীলোকের প্রকৃত পরিচয় দিয়া বলিলেন, "সে মাগীও পুলিশের হাতে পড়েছে।"

প্রভাকর শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়াছিল। ডেপুটী বাবু তাহাকে বলিলেন, "প্রভাকর, তোমার কাছে যে নিমন্ত্রণ পত্রগুলি আছে, তা এই মেঝের উপর রেখে তাতে আগুন লাগিয়ে দাও।"

প্রভাকর তাহাই করিল। ডেপুটীবাবু মহাবিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

রাজিয়ার চরিত-কথা

রাজিয়ার রাজত্বকাল দীর্ঘ নহে—মোটে তিন বৎসর, তিন মাস, ছয় দিনের। কিন্তু ইহারই মধ্যে যে-সব বাধাবিঘ্ন ও পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে, তাহাতে ঐতিহাসিক ঘটনার স্থান অল্প ছিল না। কিন্তু সন্ধান হইয়াছে অল্পই; সন্ধান হয় নাই, এরূপ ঘটনারও আভাস যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে, শুধু প্রকাশের সূত্রই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এই সব প্রকাশ পাইলে রাজিয়ার ইতিহাস যে, ভারত-ইতিহাসের একটা দিক অপূর্ব্ব রাগে রঞ্জিত করিয়া তুলিবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু উপস্থিত যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাও অবহেলার নহে; রাজিয়া-রাজত্বের বৈশিষ্ট্য, এবং রাজিয়া-চরিত্রের

বৈচিত্র্য ও বিশালতার পরিচয়, ইহারই মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। ধ্বংসাবশেষ স্তম্ভের গুরুত্ব এবং স্তূপের প্রসারতা দেখিয়া যেমন ঐশ্বর্য্যময় রাজপুরীর অতীত-গৌরবের উপলব্ধি হয়, কালের করাল হস্তচ্যুত দুই চারিটি ছিন্নভিন্ন ঘটনা-সমবায়েও তেমনই রাজিয়া-রাজত্বের অপূর্ব্ব কাহিনী জীবন্ত হইয়া উঠে।

এখন হইতে প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে রাজ্ঞী রাজিয়া দিল্লীর রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। দিল্লীর রাজসিংহাসনে মুসলমান-মহিলার উপবেশন ইহাই প্রথম এবং ইহাই শেষ। বহুকাল পরে মোগল-আমলে কোন কোন মনস্বিনী মহিলা সাম্রাজ্যের শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু পর্দ্দার ঘোর তাঁহারা কেহই কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই,—জনান্তিকে সম্রাটের বা সিংহাসনের আড়ালে থাকিয়াই যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন।

কিন্তু এই তেজস্বিনী নারী পর্দ্দার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। না, শুধু পর্দ্দার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা বলিলেও তাঁহার সম্বন্ধে সুবিচার করা হইবে না,—জাতি ধর্ম্ম ও সমাজের মজ্জাগত সংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি সম্মুখ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

রমণীকে যোগ্যতার উপযুক্ত সম্মান দিতে আমরা পুরুষেরা যে নিতান্তই নারাজ, এ কথাটা শ্রুতিকটু হইলেও যে নিরতিশয় সত্য, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একালে এই বিংশ শতাব্দীতেও যখন সমস্ত জগৎ সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত বলিয়া আমরা গর্ব্ব করিতেছি, তখনও রমণীর অধিকারের স্থানটিকে আমরা যথাসাধ্য আড়াল করিয়া রাখিবার চেষ্টা হইতে বিরত হই নাই। আর রাজিয়ার কথা তো আজিকার কথা নহে—প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। বিশেষ তিনি অতিরক্ষণশীল মুসলমান-সমাজের কন্যা। রমণীর সিংহাসনে উপবেশনের ব্যাপার তখন অলীক অসম্ভব রূপকথামাত্র। সুতরাং প্রতিকূলতার আর অন্ত ছিল না।

শুধু একমাত্র আনুকূল্য ও প্রেরণার স্থান তাঁহার পিতা—আল্‌তামাশ্‌। কন্যাকে সিংহাসনে বসাইবার প্রস্তাব তিনিই করিয়াছিলেন। অবশ্য পুত্রেরা অনুপযুক্ত বলিয়াই রাজ্যরক্ষার ভার তিনি উপযুক্ত কন্যার হস্তে অর্পণ করিবার অভিপ্রায় করেন। কিন্তু এইরূপ অভিপ্রায়ের মধ্যেই কি তাঁহার ঔদার্য্যের, তেজের ও স্বাধীন চিন্তার পরিচয় নাই ? ধর্ম্মমত বিরোধী,—সমাজ, আত্মীয়স্বজন জনমত প্রতিবাদী, সংস্কার প্রতিকূল, বৃদ্ধ আল্‌তামাশ্‌ মন্ত্রিগণকে বলিতেছেন,—"কন্যা সিংহাসনে বসে, ইহাই আমার অভিপ্রায়। আপনারা আমার অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করুন।" স্বোপার্জ্জিত রাজ্যে আল্‌তামাশের মমত্ব-বোধ যে অনেকখানি, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু চিরাচরিত প্রথা, বদ্ধমূল সংস্কার, এবং কঠোর বিধিনিষেধের কাছে প্রতিনিয়তই কি আমরা আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় বস্তুকে অস্বীকার করিতেছি না ? কয়জনে আমরা সনাতন জড়তার পাশ ছিন্ন করিয়া ন্যায়পথের যাত্রী হই ? লাখে একজনও নহি। সুলতান আলতামাশ্‌ সেই দুর্ল্লভ—সেই অসাধারণ চরিত্রের লোক। তাঁহার চরিত্রের এই বিশিষ্টতা কন্যা রাজিয়ায় পরিপূর্ণমাত্রায় বর্ত্তিয়াছিল, তিনি জনমতকে আপনার বিবেক-বুদ্ধির কাছে তৃণবৎ জ্ঞান করিতেন।

কিন্তু সুলতানের মন্ত্রিসমাজ অত্যন্ত সাধারণ প্রকৃতির লোক। আল্‌তামাশ্‌ বা তাঁহার কন্যার চরিত্র তাঁহাদের কাছে অতি উচ্চ, অতি দুর্ব্বোধ। তাঁহারা সকলে শিহরিয়া উঠিয়া একবাক্যে সুলতানের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন,—"এ যে নিতান্তই অসম্ভব অসঙ্গত কথা, জনাব!" যাঁহারা কন্যার অভিভাবকস্থানীয় হইয়া তাঁহার সিংহাসন-রক্ষার সহায়স্বরূপ হইবেন, তাঁহাদের মুখে এই প্রতিবাদের ঘোর কোলাহল! সুলতান্ হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"কাজটা কিন্তু বড় ভাল হইল না। ফলাফল পরে বুঝিতে পারিবে।"

সুলতানের মৃত্যুর পর মন্ত্রীরা যে রাজিয়াকে

সিংহাসন দেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহারা রাজিয়ার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রুক্‌ন্-উদ্দীন্‌কে সিংহাসনে বসাইয়া বুঝিলেন, দূরদর্শী সুলতানের কথাটা কত বড় সত্য। বিলাসী অকর্ম্মণ্য রুক্‌নের শাসনকে অগ্রাহ্য করিয়া দেশব্যাপী অরাজকতার তাণ্ডব নৃত্য সুরু হইল, অত্যাচার-অবিচারের আর অবধি রহিল না। প্রজার অসন্তোষ ও অশান্তিতে ইন্ধন জোগাইতে লাগিলেন—রুক্‌নের গর্ভধারিণী, উগ্রপ্রকৃতি শাহ্ তুর্কান্। পাছে সন্তানের সিংহাসনের কোন বিঘ্নবিপত্তি ঘটে, সেই ভয়ে অতি সতর্ক শাহ্ তুর্কান্ রাজপুরীকে কসাইখানার মত রক্তাক্ত করিয়া তুলিলেন। সুলতানের অন্যান্য বেগমেরা তাঁহার হস্তে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইলেন, কুমার কুতবের চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত হইল। কিন্তু অভীষ্টপথের প্রবলতম অন্তরায়—রাজিয়া তাঁহার চক্ষের উপর জীবিত। তুর্কান্ যে তাঁহার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলেন, ইহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। তাঁহাকে ধ্বংস করিবার জন্য তিনি ভীষণ ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। অকস্মাৎ বিধাতার রুদ্ররোষ তাঁহার মাথার উপর গর্জ্জিয়া উঠিল। উত্তেজিত নাগরিকগণ ভীম-পরাক্রমে রাজধানী আক্রমণ করিয়া শাহ্ তুর্কান্‌কে বন্দী করিল। রাজনন্দিনী রাজিয়া সিংহাসন জুড়িয়া বসিলেন।

ইতিহাসে রাজিয়ার সিংহাসনপ্রাপ্তির এই ঘটনাটুকুই আছে, তাহার অতিরিক্ত আর কিছুই নাই। কিন্তু বিষাক্ত সর্পের বিবরে বাস করিয়াও যে তিনি কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছিলেন, কেমন করিয়া নাগরিকগণ তাঁহার প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া প্রবল রাজশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সাহসী হইয়াছিল, সে-সকল কাহিনী জানিবার জন্য পাঠকের চিত্ত স্বভাবতই উন্মুখ হইয়া উঠে; কিন্তু ইতিহাস তৎসম্বন্ধে নীরব বলিলেই হয়। ইতিহাসের এই নীরবতা ভঙ্গ করিতে পারিলে হয়তো রাজিয়া-চরিত্রের আরও একটা উজ্জ্বল অংশের সহিত আমরা পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ হইতাম। কিন্তু সেই নীরবতা-ভঙ্গের আয়োজন এখনও হইয়া উঠে নাই।

যাহা হউক, সিংহাসন পাইবার পর তিনি শুধু সিংহাসনের শোভা হইয়া রহিলেন না, রাজদণ্ড-ধারণের শক্তি ও সামর্থ্য তাঁহার কতদূর, অচিরে প্রজাপুঞ্জ তাহার পরিচয় পাইল। রুক্‌ন্-উদ্দীন্ সসৈন্যে তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। রমণী-শাসনের নিকট মাথা নত করিবার ইচ্ছা অনেকেরই ছিল না। উজীর নিজাম্-উল্-মুল্ক্, তাহাদিগকে সম্মিলিত করিয়া রাণীর বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। কিন্তু তাঁহার তেজ বীর্য্য ও ধৈর্য্যের নিকট, সে আয়োজন ব্যর্থ হইতে অধিকদিন লাগিল না। তারপর নানাস্থানে যে বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির কারণ ঘটিয়াছিল, তাহাও তিনি দূর করিয়া রাজ্যকে শান্ত ও সংযত করিলেন। বঙ্গ হইতে পঞ্চনদ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানের মালিক-আমীরগণ সসম্মানে রাজ্ঞীর নিকট উপঢৌকন আদি প্রেরণ করিয়া মস্তক অবনত করিলেন। রাজ্ঞীর মোহরাঙ্কিত মুদ্রা তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির নিদর্শনস্বরূপ রাজ্যমধ্যে প্রচারিত হইল।*

কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল রাজ্যকে সুশৃঙ্খল করিয়া সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করা তো সহজ কথা নহে, ইহার জন্য কুমারী রাজিয়াকে প্রাণপণ করিতে হইয়াছিল। তিনি জানিতেন, অবলার দুর্ব্বলতার অখ্যাতি চিরদিনের। এই অখ্যাতির সুযোগে দুর্ব্বৃত্তেরা যে-কোন মুহূর্ত্তে রাজ্যে অমঙ্গলের সূচনা করিতে পারে, তাই তিনি

---

* রাজিয়ার নামে সর্ব্বপ্রথমে যে মুদ্রা প্রচলিত হয়, তাহাতে খোদিত ছিল:—

(মুদ্রায় এক পৃষ্ঠে) উম্‌দৎ-উন্ নিস্ওয়ান্ মাল্কা-এ-জমান্ সুলতান্ রাজিয়্যৎ বিন্‌ৎ শমস্-উদ্দীন্ অএলতিমিশ্

(অপর পৃষ্ঠে) জর্ব্ বল্দা-এ-দেহ্লী সনেঃ ৬৩৪ জলুস্-ই-আহদ্।

অর্থাৎ,—নারীশ্রেষ্ঠ, যুগনিয়ন্ত্রী, সুল্‌তান রাজিয়া—শমস্-উদ্দীন্ ইএলতিমিশের কন্যা। দিল্লীনগরে অঙ্কিত, সিংহাসনারোহণের প্রথম বর্ষ, ৬৩৪ হিজ্‌রী।

অন্তরে বাহিরে পুরুষ সাজিয়া দৃঢ়হস্তে রাজ্যের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজিয়া প্রকাশ্যে রাজসিংহাসনে বসিয়া দরবার করিতেন, রমণীর বেশে নহে—পুরুষের বেশে—সুলতানের সাজ সাজিয়া। নগরেও বাহির হইতেন, ঐ পুরুষের বেশে—মাথায় টুপী, গায়ে কোর্ত্তা, কটিতে তরবারি, ঘোড়ায় চড়িয়া। মনে হইবে গল্প। কিন্তু সত্য ঘটনা যে অনেক সময়ে গালগল্পের চেয়েও অদ্ভুত হয়, একথা মিথ্যা নহে।

ইতিহাস সব কথা খতাইয়া লিখে না, লিখিবার দরকারও নাই। বড় বড় কথা—রাজ্য ও রাজনীতির সঙ্গে যার সংস্রব মুখ্য, সে শুধু তার কথাই পাড়িয়া থাকে, বাদবাকি অনেক কথা অনেক সময় পাঠককে জোড়াতাড়া দিয়া ঠিক করিয়া লইতে হয়, নতুবা ইতিহাসের পাঠ সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না। পুরুষের বেশে রমণীর এই যে প্রকাশ্য দরবার, এই যে নগর-পরিভ্রমণ, ইহা লইয়া কি ঘরে ঘরে অপ্রীতিকর আলোচনার সৃষ্টি হয় নাই? শত্রুপক্ষ প্রকাশ্যে না হউক, অপ্রকাশ্যে অসঙ্গত বিদ্রূপহাস্যের তরঙ্গ তুলে নাই? কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্তরালবর্ত্তিনীরা সকৌতুকে সন্তর্পণে পর্দ্দার একটি প্রান্ত তুলিয়া ধরিয়া রাণীর এই অপূর্ব্ব নগর-পরিভ্রমণ দেখিতে দেখিতে লজ্জায় ভয়ে সারা হয় নাই? ইতিহাসে ইহার কিছুই নাই; কিন্তু এমনই সব ঘটনা যে ঘটিয়াছিল, তাহার কি অণুমাত্রও সন্দেহ আছে? ঘটনা ঘটিত, এবং সজাগ সতর্ক তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজিয়ার কাছে কিছুই অজ্ঞাত থাকিত না; কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করিতেন না; কর্ত্তব্যের কাছে বিচার-বুদ্ধিহীন জনসমাজের মতামতকে তৃণবৎ অসার বলিয়া মনে করিতেন। ইহা অবশ্য তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তার একটা বিশিষ্ট পরিচয়—একটা মস্ত বড় গুণ। কিন্তু গুণও যে অনেক সময় দোষের আকার ধারণ করে, তাহা মিথ্যা নহে। এই পুরুষোচিত দৃঢ়তাই নাশের কারণ হইয়াছিল। কেমন করিয়া, তাহা বলিতেছি।

হাব্‌শী জমাল্-উদ্দীন্ রাণীকে ঘোড়ায় চড়াইয়া দিত। ব্যাপারটা নূতন নহে; সুলতানেরা, এমন কি মোগল-বাদশাহ্‌রাও অশ্বপালের সাহায্যে ঘোড়ায় উঠিতেন। আর একালেও কি বড়মানুষেরা সহিসের কাঁধে ভর না দিয়া ঘোড়ায় উঠেন? রমণী হইয়াও তিনি এই বাদশাহী-দস্তুর পরিহার করেন নাই; তাহার পর দেখা যাইতেছে, এই বিজাতীয় হাব্‌শীটি রাণীর একটু অধিক অনুগ্রহভাজন হইল। আর কি রক্ষা আছে? তুর্কী আমীর-মালিকগণের মনের ছাই-চাপা আগুন একেবারে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মহাপুরুষের কথা * অমান্য করিয়া এই নারী সিংহাসনে বসিয়াছে, পর্দ্দার আড়াল ঘুচাইয়াছে, ঘোড়ায় চড়িয়া রাজপথে বাহির হইয়াছে, তাহার উপর তুর্কীগণের চক্ষুশূল যে অসভ্য হাব্‌শী, সেই জাতের একটা নগণ্য লোক—জমাল্-উদ্দীনের উপর অনুগ্রহ! সে অনুগ্রহের মাত্রাটাও আবার একটু বেশী। ক্রোধোন্মত্ত তুর্কী প্রধানেরা রাণীর সর্ব্বনাশ-সাধনের জন্য চারিদিকে অসন্তোষের অনল ছড়াইতে লাগিলেন। রাণীর কার্য্যে অনেকেরই মনের সনাতন জড়তায় আঘাত লাগিয়াছিল, সুতরাং দল ক্রমশঃই পুষ্ট হইয়া উঠিল।

রাজ্ঞী অসন্তোষের কারণ জানিয়াও প্রতিকার করিলেন না,—জমাল্-উদ্দীনের প্রতি অনুগ্রহের ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। জমাল্‌ও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার নিমকের মান রক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই।

তবরহিন্দার সীমন্তরাজ অল্‌তুনিয়ার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তাঁহার সৈন্যসামন্ত ও অর্থসম্পৎ প্রচুর। লোকটাকে ক্ষেপাইয়া তুলিতে পারিলে, কাজ সহজেই হাসিল হইতে পারে। অল্‌তুনিয়া যদিও বর্ত্তমান পদমানের জন্য, ঐশ্বর্য্য-প্রতিপত্তির জন্য রাণীর কাছে

---

* The Arabian Prophet had said truly that 'the most precious thing in the world is a virtuous woman,...the people that makes a woman its ruler will not find salvation.'...Med. India. Lane-Poole, p. 75.

বিশেষভাবে ঋণী, তাঁহারই প্রসাদে তবরহিন্দার সামন্ত, —তথাপি মালিকগণের প্ররোচনায় অলতুনিয়ার নিমকের মর্য্যাদা রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি প্রকাশ্যভাবে রাণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। বিরুদ্ধ-পক্ষের উদ্দেশ্যসিদ্ধির আর কালবিলম্ব হইল না। রাণী সসৈন্যে অল্‌তুনিয়াকে দমন করিতে গিয়া তাঁহারই অর্থপুষ্ট তুর্কী আমীর-মালিকগণের হস্তে অসহায় অতর্কিত অবস্থায় ধৃত হইয়া তবরহিন্দার দুর্গে বন্দী হইলেন। তাহাদেরই তরবারির মুখে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া নিমকের 'নোকর' হাব্‌শী জমাল্‌-উদ্দীন্ রাণীর অনুগ্রহের ঋণ সুদে-আসলে পরিশোধ করিল।

কিন্তু অলতুনিয়ার শুধু নিমকহারামী করাই সার হইল, কিছুই লাভ হইল না! যাহাদের প্ররোচনায় তিনি সুনাম হারাইয়া, ন্যায়ধর্ম্মকে অস্বীকার করিয়া, বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, সেই বিশ্বাসঘাতক আমীর-মালিকেরা দিল্লীতে ফিরিয়া গিয়া স্বার্থের ষোল আনা ভাগ নিজেরাই গ্রাস করিয়া ফেলিল, তাঁহাকে ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করিল না। রোষে ও ক্ষোভে অল্‌তুনিয়া অধীর হইয়া উঠিলেন। রাজ্ঞী রাজিয়া তো কখনও তাঁহার ইষ্ট বই অনিষ্ট করেন নাই, তাহার উপর রাজ্যে সুশাসনের ব্যবস্থা করিয়া প্রজাপুঞ্জের হৃদয় অধিকার করিয়াছেন।—তাঁহারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ! এই ঘৃণিত কার্য্যের ফল তাঁহার যাহা হওয়া উচিত, হইয়াছে; কিন্তু যাহাদের ছলনা তাঁহাকে এই কার্য্যে লিপ্ত করিয়াছিল, তাহারা স্বচ্ছন্দমনে সুখের সাগরে সাঁতার কাটিবে, আর তিনি তাহাই বসিয়া বসিয়া দেখিবেন, সে তো কিছুতেই হইতে পারে না।—অল্‌তুনিয়া অধীর অশান্ত-মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রাজিয়া ছিলেন তবরহিন্দার কারাগারে। তাঁহারই অর্থপুষ্ট আমির-মালিকেরা যে তাঁহাকে বিঘোরে ফেলিয়া অসহায় অবস্থায় বন্দী করিবে, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। সমস্তটা পৃথিবীর স্মৃতিই যেন নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার বিষাক্ত ছুরি লইয়া তাঁহার অন্তঃকরণটাকে দীর্ণ বিদীর্ণ করিতেছিল, আর কারানিরুদ্ধ হতভাগিনী জেব্-উন্নিসার মত তিনিও হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতেছিলেন, 'জেনে রাখ্, বন্দী তুই, শেষ দিন না আসিলে আ নাই নাই—আশা নাই খুলিবে যে লৌহ-কারাগার।'

কিন্তু একদিন অকস্মাৎ সত্য সত্যই তাঁহার কারা-কক্ষের দ্বার খুলিয়া গেল। তিনি সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, তবরহিন্দার সামন্তরাজ—অল্‌তুনিয়া তাঁহার সম্মুখে!

তবরহিন্দার সামন্তরাজ অতঃপর যে শুধু রাজিয়ার নিকট ক্ষমা চাহিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিলেন, তাহা নহে—প্রস্তাব করিলেন, রাজিয়া যদি তাঁহাকে পরিণয়-পাশে আবদ্ধ করিতে সম্মত হ'ন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার রাজ্যোদ্ধারের ও আমীর মালিকগণকে বিশ্বাস-ঘাতকতার উপযুক্ত প্রতিফল দিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। রাজিয়া অসম্মত হইলেন না। যে রাজ্যের অনুরোধে তিনি নারীত্বকে বিস্মৃত হইয়া পৌরুষের সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই রাজ্যের অনুরোধেই আবার তিনি নারী হইয়া অল্‌তুনিয়াকে বরমাল্য দিতে প্রস্তুত হইলেন।

ঠিক যেন একখানি সুরচিত নাটকের একটি সুন্দর দৃশ্য আমাদের মানস-চক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া গেল। দুইটি চরিত্র তাহাতে যে ভাবের অভিনয় করিলেন—যাহা যাহা বলিলেন, তাহা আগাগোড়া ঔৎসুক্যের উদ্দীপক। এমন কি ইহার পর আরও কি হয়—মিলন এবং তাঁহাদের মিলনের ফলাফল—দেখার জন্যও মনে একটা উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়া রহিল। ধু এই একটি মাত্র দৃশ্য নহে, রাজিয়ার সমগ্র জী ই একখানি ঔৎসুক্যময় বিচিত্র নাটকের রঙ্গভূমি। না-সংঘাতে ঘটনার সৃষ্টি, অন্তরের আন্দোলন, বিপ্লবি র সহিত মানবজীবনের কঠোর সংগ্রাম, ভাগ্যচক্রের অতর্কিত নিষ্ঠুর পীড়ন, প্রভৃতি নাটকের উৎকৃষ্ট উপকরণ ইহাতে পুঞ্জীভূত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বঙ্গের রঙ্গমঞ্চে রাজিয়ার নামে যে নাটকের অভিনয় হয়, তাহাতে এই

সকল ঐতিহাসিক উপকরণ আণুবীক্ষণিক অনুসন্ধানেও ধরিবার উপায় নাই। তাই রাজিয়ার মত বীরচরিত্রকে রঙ্গমঞ্চে প্রেমের ন্যক্কারজনক অভিনয় করিতে দেখিয়া আমাদিগকে শিহরিয়া উঠিতে হয়। যে নারী বিপদের পর্ব্বতপরিমাণ বাধাকে পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া সিংহাসন জুড়িয়া বসে, বিদ্রোহের দাবানল নির্ব্বাপিত করিয়া রাজ্যে শান্তির শীতল ছায়া বিস্তার করে, অথবা লোকলজ্জাকে জঞ্জালের মত দূর করিয়া দেয়—সেই নারী বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে অন্যায় অবৈধ প্রেমের ভিখারিণী! আরও লজ্জার কথা এই যে, দর্শকেরা সাড়ম্বরে চট্‌পট্ করতালিধ্বনি সহকারে ইতিহাসের এই বর্ব্বরোচিত অবমাননা স্বচ্ছন্দেচিত্তে উপভোগ করিয়া থাকেন!

রাজিয়ার সমস্ত জীবনের মধ্যে শুধু একটি স্থানে একটু ত্রুটীর—মলিনতার অনুমান করা যায়, তাহা জমাল্‌-উদ্দীনের প্রতি অনুগ্রহ। আর সর্ব্বত্র অমলিন,—তাম্বর ! কার্য্যগতিকে রাণীর সন্নিহিত হইবার যে সুযোগ জমাল্‌-উদ্দীনের ছিল, সে সুযোগ কর্ম্মচারিগণের মধ্যে অনেকেরই ছিল না। এই সূত্রেই সে মনিবের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু রাণীর অসঙ্কোচ পুরুষোচিত চালচলন, সর্ব্বোপরি স্বহস্তে শাসন-কার্য্য-পরিচালন, আমীর-মালিকগণের সংস্কারবুদ্ধি এবং স্বার্থকে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। এমন কি পুরুষের রাজত্বকালেও নানাদিকে তাহাদের যে স্বার্থ-সিদ্ধির পথ ছিল, সজাগ সতর্ক রাণীর রাজত্বে তাহা নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে রুষ্ট আমীর-মালিকগণের যে-কোন অজুহাতে রাণীর সর্ব্বনাশ-সাধনের চেষ্টা করা স্বাভাবিক। রাণীর অনুগ্রহের কথাটাও যে তাহাদের একটা অজুহাতমাত্র নহে, তাহা কি কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে? তাহারা তিলকে তাল করিয়া রাজ্য জুড়িয়া অশান্তি উদ্দীপনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। চেষ্টার ফল ফলিয়াছিল সত্য, কিন্তু আশানুরূপ ফলিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। নিকটের লোকেরা বিদ্রোহী হয় নাই; বিদ্রোহী হইয়াছিল তবরহিন্দার মালিক অলতুনিয়া। অলতুনিয়া জমাল্‌-উদ্দীনের সঙ্গে রাণীর সংশ্রবের কল্পনায় উত্তেজিত হ'ন নাই, হইলে কদাচ ইহার পর তাঁহাকে স্বেচ্ছায় বিবাহ করিয়া কৃতার্থ হইতেন না। তাঁহার বিদ্রোহের কারণ বোধ হয়, স্বার্থ। স্বার্থসিদ্ধি না হওয়ায় যে অলতুনিয়া আমীর-মালিকগণের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য রাজিয়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা সত্য। ক্রোধে মানুষ অনেক সময় অনেক অবিবেচনার কাজ করে, অতএব তিনিও করিয়া-ছিলেন—এরূপ সন্দেহ পাঠকের মনে উদয় হইতে পারে। কিন্তু বিবাহ না করিয়াও কি রাজিয়ার সঙ্গে যোগ দিয়া অলতুনিয়া আমীর-মালিক-গণকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতে পারিতেন না? তারপর কলঙ্কিনীকে বিবাহ কি কোন ভদ্রসন্তান—বিশেষ তাঁহার মত সম্ভ্রান্ত ক্ষমতাপন্ন লোক—জানিয়া-শুনিয়া করিতে পারেন?

মোট কথা, রাজিয়ার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিবার মত কোন প্রমাণ ইতিহাসে নাই। 'অতিরিক্ত অনুগ্রহে'র কথায় একটা অতি ক্ষীণ সন্দেহের কারণ জন্মিতে পারে মাত্র, কিন্তু তাহার প্রতিকূলে বলিবার কথা অনেক। সুতরাং ইহারই সূত্রে তাঁহাকে অবৈধ প্রেমের নায়িকারূপে দাঁড় করান যে কত বড় ধৃষ্টতা, পাঠকেরা তাহা অনুমান করিবেন।

একজন ঐতিহাসিক রাজিয়ার সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"Those who scrutinize her actions will find no fault but that she was a woman." Briggs' Ferishta, 217-8)

অর্থাৎ, রাজিয়ার একমাত্র অপরাধ যে তিনি স্ত্রীলোক। যাঁহারা তন্নতন্ন করিয়াও তাঁহার দোষ ধরিবার চেষ্টা করিবেন, তাঁহারাও তাঁহার দোষের সন্ধান পাইবেন না। কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য।

শুধু যে রণাঙ্গণে সৈন্য-পরিচালনায় রাজিয়ার কৃতিত্ব, গুণের পরিচয়, তাহা নহে,—তিনি বিদুষী, তিনি সহৃদয়া, তিনি গুণগ্রাহিণী। কুরাণে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি এই ধর্ম্মগ্রন্থ বিশুদ্ধ উচ্চারণের

সহিত পাঠ করিতে পারিতেন। (Ferishta, i. 217). আওরংজীব্-দুহিতা জেব্-উন্নিসার ন্যায় তিনিও সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণের উৎসাহদাত্রী। *

রাজিয়ার পরবর্ত্তী জীবন ব্যর্থতার কাহিনীতে করুণ। তাহার সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই। যে রাজ্যোদ্ধারের আশায় তিনি অল্‌তুনিয়ার গলায় বরমাল্য অর্পণ করিলেন, সে আশা তাঁহার পূর্ণ হইল না। স্বামী-স্ত্রী প্রচুর শক্তি সংগ্রহ করিয়াও আমীর-মালিকগণের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন বটে, জয়লাভ করিতে পারিলেন না। পরাজিত হইয়া তাঁহাদিগকে পলায়ন করিতে হইল ; তারপর হিন্দু জমিদারগণের হস্তে ধরা পড়িয়া তাঁহাদিগকে অতি নিঃসহায় অবস্থায় প্রাণ দিতে হয়। কিন্তু কেমন করিয়া তাঁহারা ধরা পড়িলেন, হিন্দু-জমিদারগণ তাঁহাদিগকে কিরূপ নিষ্ঠুরভাবে নিহত করিলেন, অন্তিমকালে তাঁহাদের কি বলিবার ছিল, কোন্ কথা উচ্চারণ করিয়া তাঁহারা চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন, আজ তাহার কিছুই জানিবার উপায় নাই, ইতিহাস সে সম্বন্ধে নীরব থাকিয়া বিষাদের একটা সুগভীর রহস্যজাল বুনিতেছে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* "Sultan Raziyat—may she rest in peace—was a great sovereign, and sagacious, just beneficent, the patron of the learned, a disponser of justice, the cherisher of her subjects, and of warlike talent, and was endowed with all the admirable attributes and qualifications necessary for kings."...Tabakat-i-Nasiri...Minhaj, p, 617.

সরলার আত্মকাহিনী

(গল্প)

পূজা উপলক্ষে বাবার আফিস বন্ধ হইয়াছে। পূর্ণ এক বৎসরের মধ্যে এই একমাস মাত্র তিনি দীর্ঘ ছুটি পাইতেন, তাই প্রতি বৎসরই আমরা এই সময় একবার করিয়া বাড়ী যাইতাম, অন্য সময় যাওয়া বড় ঘটিয়া উঠিত না। সেবার আর আমাদের বাড়ী যাওয়া হইল না। বাবা বলিলেন, "এবার দেশে যে রকম ম্যালেরিয়া, আর বাড়ী গিয়ে কায নেই।" কলিকাতায় থাকিতেও কাহারও মন লাগিতেছিল না, তাই মা প্রস্তাব করিলেন, "আচ্ছা। পুরী বেড়াতে গেলে হয় না?" বাবা আনন্দের সহিত ইহাতে সম্মতি দিলেন, আমি ত একেবারে আহ্লাদে আটখানা।

পুরী যাইবার বন্দোবস্ত সব ঠিক হইল। বাবা তাঁহার জনৈক বন্ধুকে দিয়া সমুদ্রের ধারে এক মাসের জন্য একটি দ্বিতল বাড়ী ভাড়া করাইলেন। পুরী যাইবার যাত্রী হইলাম—আমি, বাবা, মা, আমার ছোট ভাই এবং আমাদের পুরাতন চাকর অতুল দা। বাসায় থাকিলেন দাদা ও বামুন ঠাকুর। পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী বলিয়া দাদা পুরী বেড়াইতে গেলেন না।

পূজা উপলক্ষে আফিস, আদালত, স্কুল ও কলেজ প্রভৃতি কেবল বন্ধ হইয়াছে, সুতরাং আমরা ষ্টেশনে আসিয়া দেখি,—বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী ও উড়িয়া প্রভৃতি নানা জাতীয় জনসঙ্ঘে ষ্টেশনটি একেবারে পরিপূর্ণ। অতুলদার গায়ে অসুরের মত বল ছিল, সে দুই হাতে সেই জনতাকে ঠেলিয়া আমাদিগকে মধ্যম শ্রেণীর মেয়ে গাড়ীর নিকট লইয়া আসিল, আমরা গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। নির্দ্দিষ্ট সময়ে গাড়ী ছাড়িবার সঙ্কেত করিলে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। গাড়ী প্লাটফর্ম্ম ছাড়ে ছাড়ে, এমন সময় একজন হৃষ্টপুষ্ট সুদর্শন

যুবক কোথা হইতে উল্কার মত ছুটিয়া আসিয়া আমাদের গাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। অতিমাত্র ব্যস্ততা হেতু প্রথমটা তিনি বুঝিতেই পারেন নাই যে এ মেয়ে গাড়ী। তার পর বসিতে গিয়াই চমকিয়া উঠিলেন, তখন তাড়াতাড়ি দরজার কাছে সরিয়া গিয়া উত্তরীয়াঞ্চলে ললাটের ঘাম মুছিতে লাগিলেন।

আমাদের এ গাড়ীতে ২০।২৫টি স্ত্রীলোক ছিল, সকলেই ভদ্রমহিলা। অকস্মাৎ একজন অপরিচিত পুরুষকে এরূপ ভাবে গাড়ীতে উঠিতে দেখিয়া তাহারা যেন কিছু চঞ্চল হইয়া পড়িল। সম্মুখের বেঞ্চের কয়েকটি স্ত্রীলোক সন্ত্রস্তভাবে পরস্পরকে ঘেরিয়া বসিল। ওদিকের দরজার সম্মুখে একটী স্ত্রীলোক বসিয়া ছিলেন, তাঁহার প্রৌঢ় বয়সের শিথিল গাত্রখানি আগাগোড়া স্বর্ণালঙ্কারে মণ্ডিত। তিনি পার্শ্বের একটি মেয়ের গায়ে জোরে এক ঠেলা দিয়া বিকৃত স্বরে বলিলেন, "ওলো ওদিকে তাকিয়ে দেখছিস্ কি? গাড়ীতে গুণ্ডা উঠেছে।" তার পর তাড়াতাড়ি উঠিয়া গাড়ী থামাইবার শিকল ধরিলেন। স্ত্রীলোকটিকে সহসা শিকল টানিতে উদ্যত দেখিয়া যুবকটী কাতরভাবে বলিয়া উঠিলেন, "শিকল টান্‌বেন না! শিকল টান্‌বেন না। আমি গুণ্ডা নই, ভুল করে এখানে উঠেছি, পরের ষ্টেশনে গিয়েই গাড়ী বদলে নেবো।"

স্ত্রীলোকটি বোধ হয় খুব মুখরা, তিনি শিকলের নিকট হইতে হাত না সরাইয়া বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে কহিলেন "তুমি যে গুণ্ডা নও তার প্রমাণ কি? এত গাড়ী থাক্‌তে ভুল হল এসে তোমার মেয়ে গাড়ীতে? আর এই পূজোর সময় বাড়ী যাচ্ছ, সঙ্গে তোমার বাক্স পেটরা নেই, বাক্স পেটরা যাক চুলোর দোরে, হাতে তোমার একটা ছাতা পর্য্যন্ত দেখছি নে। আর, ভদ্রলোকের মত পোষাক পরেই ত গুণ্ডারা গুণ্ডামি করে থাকে, তারা কখনও লেংটি বা কৌপীন পরে আসে না।" যুবকটী তখন ক্ষিপ্রহস্তে পকেট হইতে লাল রঙের একখানা খাম বাহির করিয়া বলিলেন, "আমি বাড়ী যাচ্ছি না, এই দেখুন এক জরুরী তার পেয়ে ছুটে এসেছি।"

"ওরকম খাম কি আর পথের ধারে কুড়িয়ে পাওয়া যায় না?"

"আপনি বিশ্বাস করুন, আমি ভদ্রলোকের ছেলে, কলেজে পড়ি।"

"না না, ওসব বুঝি নে, তুমি যখন মেয়ে গাড়ীতে এসে উঠেছ তখন তোমাকে বিশ্বাস নেই। তোমাকে এ গাড়ী থেকে নামিয়ে না দিলে আমার সোয়াস্তি হচ্চে না।"

এবার যুবকটি একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "আঃ! একজন ভদ্রমহিলা এরকম ব্যবহার কর্‌তে পারেন তা আগে জানতুম না।"

আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, যুবকটির দুরবস্থা দেখিয়া যথার্থই আমার বড় দুঃখ হইতেছিল। তার পর প্রথম দর্শনেই তাঁহাকে আমি সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে বলিয়া বুঝিয়াছিলাম। তাঁহার চেহারার উপর দিয়া এমনই একটা মাধুর্য্য ঢেউ খেলিতেছিল, যাহাতে তাঁহাকে অসৎ লোক বলিয়া কল্পনা করিবার অবসর থাকে না। তাঁহার কথাগুলিকে আমি অকপট হৃদয়ের কথা বলিয়াই মানিয়া লইয়াছিলাম। আমি তখন স্ত্রীলোকটিকে বলিলাম, "আপনি এত ব্যস্ত হচ্চেন কেন? আমরাও ত গাড়ীতে রয়েছি। তার পর, গাড়ীও ত প্রায় পরের ষ্টেশনে এসে পড়ল।"

স্ত্রীলোকটি আমার প্রতি একটা ভ্রূকুটি নিক্ষেপ পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, "তুমি বাছা সেদিনকার মেয়ে, কি বোঝ? তোমার জন্মের আগ থেকে আমি গাড়ীতে যাতায়াত করে আস্‌ছি। গুণ্ডারা এই ভাবে ভদ্রতার ভাণ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর চক্ষের নিমেষে কায সেরে চম্পট দেয়।" স্ত্রীলোকটীর ব্যবহারে আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "আচ্ছা, এই তিন চার খানা বেঞ্চি ডিঙিয়ে তারপর ওঁকে আপনার কাছে যেতে হবে, আর আমরা ত' ওঁর কাছেই রয়েছি, আমাদের গায়েও ত গয়না আছে, এই'ত গলায় নেক্‌লেস! উনি যদি গুণ্ডা হন, এখান থেকেই কায সেরে পালাতে পারবেন, আপনার অতদূর আর

ওঁকে কষ্ট করে যেতে হবে না।" স্ত্রীলোকটী তখন একটু নরম হইয়া বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িলেন। যুবকটী কিয়ৎকাল বিহ্বলনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর গাড়ীর গতি ক্রমশঃই মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। নিকটেই ষ্টেশন মনে করিতে করিতে, পরবর্ত্তী ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্ম দেখা দিল। গাড়ী ভাল করিয়া থামিতে না থামিতেই তিনি তাড়াতাড়ি নামিয়া আমার প্রতি একটা সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বলিলেন, "আপনাকে ধন্যবাদ! কেবল আপনার গুণেই আজকের ফাঁড়াটা আমার কেটে গেল।"

২

পুরীতে আসিয়াছি। মুক্ত প্রান্তরের মুক্ত আকাশ এবং মুক্ত বাতাস আমার নিকট বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হইল। দুই দিবসের মধ্যে কোথাও বাহির হইয়া কিছু দেখিবার অবকাশ ঘটে নাই। তৃতীয় দিন আমরা সান্ধ্য আরতির সময় শ্রীশ্রীভগবানের দারুময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া আসিলাম। তার পর ৪।৫ দিনের মধ্যে সেখানকার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মন্দির, আশ্রম, তীর্থস্থান ও সরোবরগুলি দেখা হইল। আর দেখা হইল, সেখানকার সমুদ্র। জীবনে আমার এই প্রথম সমুদ্র দেখা। কি মহান্ কি বিরাট সমুদ্র! যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে কেবল অনন্ত জলরাশি ধূ ধূ করিতেছে। এমন বিরাট দৃশ্য জীবনে আর কখনও দেখি নাই। প্রতিদিন বিকাল বেলা আমি বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সেই বিরাট পদার্থের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। সমুদ্রের বিশাল বক্ষে উত্তাল তরঙ্গমালার তাণ্ডবলীলা, তাহার শ্রবণবিদারী ভৈরব গর্জ্জনে পুনঃ পুনঃ বেলাভূমির উপর সবেগে পতন, মুহুর্মুহুঃ শুভ্র ফেনপুঞ্জ উদ্গীরণ প্রভৃতি অপূর্ব্ব দৃশ্য সকল আমার চক্ষে বড়ই ভাল লাগিত। তার পর যখন ভগবান সহস্ররশ্মি সমুদ্রের প্রশান্ত বক্ষ হইতে সায়ংকালীন রশ্মিজাল সম্বরণ করিতে করিতে দিকচক্রবালের অন্তরালে ডুবিয়া পড়িতেন, সে চিত্ত-বিমোহন দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ভাবাবেগে আমি তন্ময় হইয়া যাইতাম। প্রত্যহ বিকাল বেলা সমুদ্র দেখা আমার একটা প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল।

কয়েক দিন পর একদিন সন্ধ্যাকালে তালাবন্ধ পাশের বাড়ীতে সহসা সন্ধ্যা-বাতি জ্বলিয়া উঠিল। দ্বিতলের গবাক্ষ দিয়া তাহার আলোকরশ্মি আমাদের দালানের গায়ে আসিয়া পড়িল। পরদিন অতুলদার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম—একটি বাবু বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য এখানে আসিয়াছেন।

যাহা হউক, আমি আমার অভ্যাসমত সেদিনও সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে গেলাম; সূর্য্যাস্তের পর বাসায় ফিরিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় এক ঈষৎ পরিচিত কণ্ঠস্বরে আমাকে একটু থমকিয়া দাঁড়াইতে হইল। পশ্চাৎ দিক হইতে ২৪।২৫ বৎসরের একটি যুবক আমার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "আশ্চর্য্য! বিধাতার কি অপূর্ব্ব সংঘটন! আপনাকে যে এখানে এরকম অবস্থায় দেখতে পাব, কোনদিন তা স্বপ্নেও ভাবি নি।"

আমি ইঁহাকে দেখিবামাত্রই চিনিয়া ফেলিলাম, ইনিই সেদিন হাওড়া ষ্টেশনে ভুল করিয়া মেয়ে গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন। আমি কোনও উত্তর না দিয়া দ্রুতপদে বাসার দিকে চলিতে লাগিলাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে বেড়াতে এসেছেন বুঝি?"

আমি অস্ফুট স্বরে উত্তর দিলাম, "হাঁ।"

"বাসা নিয়েছেন কোথা?"

আমি অঙ্গুলি-দ্বারা নীরবে বাসার দিকটা নির্দ্দেশ করিলে তিনি হাসিয়া বলিলেন "ওঃ, নিকটেই বাসা! তাই বুঝি সাহস করে একা বেড়াতে আসেন? এখানে আপনার অভিভাবক কেউ আছেন?"

আমি ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম—"হাঁ।"

তিনি পুনরায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "[illegible] কি?"

[illegible] আমি হাসিয়া উত্তর দিলাম, "হ্যা!"

তিনি আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, বরাবর সমুদ্রের ধার ধরিয়া আপন মনে চলিতে লাগিলেন। আমিও বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

পর দিন দেখি, সেই যুবকটির সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে বাবা বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তার পর, বৈঠকখানায় বসিলেও তাঁহাদের আলাপের নিবৃত্তি হইল না। কিছুকাল পরে বাবা আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সরলা, অতুল বুঝি এখনও বাজার থেকে আসে নি ?"

আমি ভিতর হইতে উত্তর দিলাম—"না।"

"তবে তুমিই দু'পেয়ালা চা নিয়ে এস।"

আমি চা লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলে বাবা বলিলেন, "এটী আমার মেয়ে, এবার এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়ছে, পাস হলে বিবাহ দিব। ছেলের শিক্ষার মত মেয়ের শিক্ষাকেও আমি খুব আবশ্যক বলে মনে করি, তাই বহুব্যয়-সাপেক্ষ হলেও এদের নিয়ে আমায় কলকাতাতেই থাকতে হয়।"

যুবকটি সহাস্যে বলিলেন, "আপনি বোধ হয় শুনে আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন যে এঁকে আমি পূর্ব্ব হতেই চিনি।"

বাবা যথার্থই আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাই নাকি! কোথায় দেখ্‌লে তুমি একে?" তিনি তখন তাঁহার মেয়ে গাড়ীতে উঠাসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার বাবার নিকট যথাযথ বর্ণনা করিলেন। বাবা খুব খুসী হইয়া বলিলেন, "বটে!"

তিনি উৎসাহ ভরে বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ! সেদিন সত্য সত্যই উনি আমার বড় উপকার করেছিলেন।"

পরদিনও যুবকটি ৭।৮টার সময় চা পান ও বাবার সঙ্গে গল্পগুজব করিয়া চলিয়া গেলেন; প্রাতঃকালে বাবা সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে গেলে সেখানে উভয়ের সাক্ষাৎ হইত। তার পর ফিরিয়া আসিবার পথে তিনি প্রথম আমাদের বাসার সম্মুখে আসিতেন; বাবাও তাঁহার বিদেশের সঙ্গীকে বসিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেন। শুনিলাম তাঁহার নাম নরেন্দ্রনাথ রায়। কলিকাতায় বি-এ পড়েন; পীড়িত আত্মীয় বায়ু পরিবর্ত্তনে আসিয়াছিলেন; পীড়া বৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া নরেন্দ্রবাবু কয়েক দিন হইল এখানে আসিয়াছেন। যাহা হউক, আজ ৯।১০ দিন যাবৎ তিনি প্রত্যহই আমাদের বাসায় আসিয়া চা-পান করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে গত কল্যমাত্র তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন—"সরলা, আজকের চা-টা কিন্তু কিছু ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে।"

আমি কোনও উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া ছিলাম। বাবা তাঁহার পকেটের ঘড়ী দেখিয়া বলিলেন, "আমরাও আজ ঘুরে আসতে কিছু বিলম্ব করে ফেলেছি।"

পরদিন তিনি চা পান করিতে করিতে বাবাকে বলিলেন, "রাত্রির ট্রেণে দেশে ফিরব।"

"তাই নাকি? আবার ঘুরে আস্‌বে ত?"

"তা বলতে পারিনে, রোগীর অবস্থা ভাল হতে থাকলে আর আস্‌ব না। আপনি এদের মধ্যে মধ্যে দেখবেন।"

"তা নিশ্চয়। কলকাতা গিয়ে দেখা হবে ত?"

"আজ্ঞে হাঁ! কিন্তু—"

"ঠিক কথা। ও সরলা, আমাদের বাসার ঠিকানাটা লিখে এনে দে ত।"

আমি ইংরাজীতে বাবার নাম ও বাসার ঠিকানা লিখিয়া, কৌতূহলবশতঃ তাহাতে আবার তারিখ সহ নিজের নাম স্বাক্ষর করিলাম। তার পর, তাহা আনিয়া বাবার হাতে দিলে, বাবা আবার তাঁহার হাতে দিলেন। তিনি তাহা একবার পড়িয়া পকেটে পুরিলেন। পড়িবার সময় তাঁহার মুখের উপর আমার অপাঙ্গ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। দেখিলাম, তখন তাঁহার চোখ-মুখের উপর দিয়া আনন্দের এক বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। তার পর, তিনি বাবাকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

৩

কলিকাতায় ফিরিবার মাস খানেক পর একদিন বিকাল বেলায় সেই যুবকটী আমাদের বাসার সম্মুখে

আসিয়া দাঁড়াইলেন। দ্বিতল হইতে হঠাৎ তাঁহাকে দেখিয়া ত্বরিতপদে ভিতরে চলিয়া আসিলাম। বাবার সঙ্গে তাঁহার অনেকক্ষণ আলাপ হইল। সন্ধ্যাকালে তিনি তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

তৎপরে প্রতিমাসেই তিনি দুই একবার করিয়া আমাদের বাসায় আসিতেন। বাবা পরম আগ্রহে তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতেন, সমাদর পূর্ব্বক জলযোগ করাইতেন। এইরূপে ৪।৫ মাস কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে কার্য্যগতিকে কয়েকবার আমাকে তাঁহার সম্মুখে গিয়া পড়িতে হইয়াছে। তিনি—"কেমন আছ সরলা? পড়াশুনা চল্‌ছে ত বেশ?" প্রভৃতি প্রশ্ন করিলে আমি "হাঁ" "না" এইরূপ একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া সরিয়া পড়িতাম।

একদিন সন্ধ্যার পর আমাকে লইয়া বাবা ও মা'র মধ্যে কি কথাবার্ত্তা হইতেছিল, আমি দরজার আড়ালে গিয়া দাঁড়াইলাম। মা বলিলেন, "মেয়ে যে চৌদ্দ ডিঙিয়ে যায়, আর উদাসীন থাক্‌লে ত চলে না।"

বাবা বলিলেন, "তাই বলে আমি আমার মেয়েকে যা'র তা'র হাতে ত ধরে দিতে পারিনে! ভাবছি যদি এমন একটী ছেলে পাওয়া যায় যে সংসারে তার কেউ নেই, তা হলে কল্‌কাতাতেই দেখে শুনে একটা চাকরীর যোগাড় ক'রে দিই, মেয়ে আমার চোকের সামনেই থাক্‌বে। এই রকম একটী ছেলের সন্ধানেই আছি।"

"এ সন্ধান পর্ব্ব কবে তোমার শেষ হবে? মেয়ে যে ধাড়ী হয়ে উঠল!"

"আঃ, বিরক্ত করলে দেখছি! আমার মেয়ে কি ফেলনা! কত বেটা এ মেয়ে পেয়ে কৃতার্থ হয়ে যাবে।"

"আচ্ছা, নরেন ছেলেটী ত বেশ; এবার বি-এ পরীক্ষা দিবে। তোমার মুখেই শুনেছি ওর বাপ মা নেই। ওকে সম্মত করতে পারলে ত তোমার মনোরথ সিদ্ধ হয়।"

মা'র কথা শুনিয়া বুক্‌টা আমার দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া গেল। বাবার উত্তর শুনিবার জন্ত রুদ্ধ আবেগে উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম।

বাবা খুব উৎসাহের সহিত বলিলেন, "হ্যাঁ! ছেলেটী সর্ব্বাংশে সরলার যোগ্য পাত্র বটে, হাজারের মধ্যেও এমন একটী খুঁজিয়ে পাওয়া যায় না। এবার কৌশলে কথাটা পাড়তে হবে।"

"তাই পেড়ো" বলিতে বলিতে মা ভিতরে আসিবার উপক্রম করিলেন। আমি এক দৌড়ে সেখান হইতে পালাইয়া গেলাম।

ইহার একপক্ষ পর আবার নরেন্দ্রবাবু আমাদের বাসায় আসিলেন। বাবার সঙ্গে তাঁহার অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তিনি চলিয়া যাইবার পর বাবা আসিয়া মাকে বলিলেন, "নরেন সম্মত হয়েছে।" শুনিয়া, আমি উল্লসিত হইয়া উঠিলাম।

ইহার কয়েক দিন পর পুনরায় তিনি আমাদের বাসায় আসেন। তখন আমি স্কুলে ছিলাম। আমি স্কুলের গাড়ী হইতে নামিয়া বৈঠকখানায় ঢুকিতেই দেখিতে পাইলাম—তিনি একাকী একখানি ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় খবরের কাগজ পড়িতেছেন। হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে গিয়া পড়ায় লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেলাম। কারণ তখন আমার পায়ে জুতা ও মোজা ছিল, কেশবেশ ব্রাহ্ম মেয়েদের ধরণের ছিল। তিনি আমাকে দেখিয়াই সহাস্য মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন —"পরীক্ষা ত এল সরলা, প্রস্তুত হচ্চে কেমন?" আমি লজ্জাজড়িত স্বরে উত্তর দিলাম, "হচ্ছি এক রকম।" বলিয়া তাড়াতাড়ি পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিলাম।

আমাদের পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। বি-এ পরীক্ষাও শেষ হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে একবারও আর নরেন্দ্রবাবু আমাদের বাসায় আসিলেন না। কয়েক দিন পরে বাবা তাঁহার পত্র পাইলেন, জরুরী কাযে হঠাৎ তিনি বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি আর এক নূতন ব্যাপার ঘটিল। আমার পিসতুত ভাইয়ের বিবাহ উপলক্ষে আমাদিগকে কাঞ্চনপুরে যাইতে হইল। খুব সমারোহে

বিবাহ হইয়া গেল। বৌভাতের দিন বিকাল বেলা পিসা মহাশয়কে কিছু ব্যস্ত দেখিলাম। তিনি যেন ব্যস্তভাবে কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। একটু পরে ২৫।২৬ বৎসরের একটী যুবক পিসা মহাশয়ের বাড়ী আসিলেন। পিসামহাশয় শশব্যস্তে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, ইনি শক্তিগ্রামের জমিদার, এই পরগণা ইঁহারই জমিদারীর এলাকাভুক্ত। এখানে জমিদার মহাশয়ের এক কাছারী আছে, ইনি কাছারী পরিদর্শনে আসিয়াছেন। পিসা মহাশয় তাঁহাকে বৌভাতের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি ইঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটায় এখানে অন্নগ্রহণ করিবেন না, জলযোগ করিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবেন। জমিদার বাবু বাড়ীর ভিতরে আসিয়া জলযোগ করিতে বসিলেন। পরিবেষণের ভার পড়িল আমার উপর। আমি থালা লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে পিসামহাশয় তাঁহাকে আমার পরিচয় দিলেন। জমিদার বাবু চকিতে একবার আমার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া পিসা মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এঁর হাতে শাঁখা দেখছিনে, বিবাহ বুঝি এখনও হয় নি?"

পিসা মহাশয় উত্তর করিলেন, "না। ওর বাপ ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসেছেন যে মেয়ে এণ্ট্রান্স পাস না করলে বিয়ে দেবেন না। এবার ও এণ্ট্রান্স দিয়েছে।" জমিদার বাবু কেবল "বেশ ত!" বলিয়া নীরবে জলযোগ শেষ করিলেন।

কয়েক দিনের মধ্যে আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। ৬।৭ দিন পর হঠাৎ পিসামহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবা ও মার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার কি পরামর্শ হইল। পরদিন তিনি যাইবার সময় বাবাকে বলিলেন, "তুমি ভাই এমন সুযোগ ছেড় না। অনেক তপস্যার ফলে এমন ঘর বর পাওয়া যায়। জমিদার বাবু যখন স্বয়ং পছন্দ করেছেন, তখন বুঝ্‌তে হবে মেয়ের পরম সৌভাগ্য। ভেবে চিন্তে, পরামর্শ করে দেখ। দেখে, যেমন হয় আমায় লিখো।"

এতক্ষণে আমি পিসামহাশয়ের অতার্কিত শুভাগমনের প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিলাম। তাঁহার কথায় মা একেবারে গলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু বাবাকে এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী দেখা গেল না। তিনি বলিতে লাগিলেন, "নরেনকে কথা দিয়েছি যে, সে কথা ফিরিয়ে নেবো কি করে?"

পরদিন একখানা পত্র আসিল। পত্রখানা পড়িয়া বাবা মার হাতে দিলেন, মা পড়িয়া বিছানার উপর রাখিলেন। বাবাকে বড় দুঃখিত বলিয়া বোধ হইল। কিছুক্ষণ বাবা ও মার মধ্যে কোনও কথাই হইল না। শেষে মা নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "যা' হোক, তুমি মন স্থির করে এই সম্বন্ধই ঠিক্ কর। পাত্র ধনবান, বিদ্বান ও কুলীন, এমন সুযোগ আর তুমি কোথায় পাবে?" বাবা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক "আচ্ছা" বলিয়া ম্লানমুখে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন, মাও সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইলেন। তখন আমি শঙ্কিত চিত্তে চিঠিখানি তুলিয়া পড়িতে লাগিলাম—

শ্রীচরণেষু

সপ্রণাম নিবেদন—দুঃখের সহিত আপনাকে জানাইতে হইতেছে যে আমি আমার প্রতিশ্রুতি পালনে অক্ষম। আপনি আপনার কন্যা সরলাকে অন্যপাত্রে সমর্পণ করুন। ভগবানের নিকট তাহার সৌভাগ্য কামনা করি। ইতি

প্রণত
শ্রীনরেন্দ্রনাথ
বীরভূম।

আমার বুকের মধ্য হইতে একটি দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল। নিজের উপর অত্যন্ত ধিক্কার জন্মিল। যাহারা শতমুখে আমার রূপগুণের প্রশংসা করে, মিথ্যাস্তাবক বলিয়া তাহাদের উপর ঘৃণা আসিল। সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধ অভিমানের ক্ষুব্ধবেগও খুলিয়া গেল---যে গর্ব্বিতের মত উপেক্ষা করিল, নিষ্ঠুরের মত প্রত্যাখ্যান করিল,—তাহার উপেক্ষাকে কি আমি অভিনন্দনের মত বরণ করিয়া লইতে পারিব না? খুব পারিব।

পরদিন মা বাবাকে বলিলেন, "নরেন্ বোধ হয় বিলেত-টিলেত পড়্‌তে যাবে, তাই রাজি হল না। যা'হক, তুমি আজই ভট্‌চাজ্ মহাশয়কে লিখে দাও।" সেই দিনই বাবা পিসামহাশয়কে সম্মতিসূচক পত্র লিখিয়া দিলেন। সপ্তাহ মধ্যে পিসামহাশয়কে সঙ্গে লইয়া জমিদার বাবুর পক্ষ হইতে চারিজন বিশিষ্ট লোক আসিলেন। পরদিন শুভক্ষণ দেখিয়া আমার বিবাহের শুভ পত্র হইয়া গেল, আমি শক্তিগ্রামের ভাবী জমিদার গৃহিণী হইয়া থাকিলাম।

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি আমাদের পরীক্ষার ফল বাহির হইল, আমি দ্বিতীয় বিভাগে পাস হইয়াছি। কয়েকদিন পরে দাদার পরীক্ষার ফলও জানা গেল, তিনিও দ্বিতীয় বিভাগে এল-এ পাশ করিলেন। দেড় মাস পরে শক্তিগ্রাম হইতে বাবার নিকট সংবাদ আসিল, আমার ভাবী পতি পাস কোর্সে এবং ভাবী দেবর বিজয় বাবু অনার্স কোর্সে বি-এ পাস করিয়াছেন। আমাদের বাসায় খবরের কাগজ আসিত, আমি ইঁহাদের উভয়ের নামই তাহাতে দেখিলাম। কিন্তু উৎসুক্যপূর্ণ দুইটী চক্ষু দিয়া আগাগোড়া খবরের কাগজখানি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও নরেন্দ্রনাথ রায় নামক কোনও ব্যক্তিকে পাসের তালিকায় দেখিতে পাইলাম না। তিনিও ত পরীক্ষা দিয়াছিলেন; তবে বোধ হয় ফেল করিয়াছেন।

আমার ভাবী স্বামীর কালাশৌচ শেষ হইবার পর, বাবা শাশুড়ীকে বিবাহের দিন স্থির করিতে লিখিলেন। উত্তরে তিনি জানাইলেন—আমার ভগিনী-পুত্র বিজয় সম্প্রতি শূল বেদনায় শয্যাগত। চিকিৎসার জন্য শীঘ্রই তাহাকে স্থানান্তরে পাঠান হইবে। সে একটু সুস্থ হইয়া ফিরিয়া না আসিলে বিবাহের আয়োজন করা যাইতে পারে না, সুতরাং আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক কিছুদিন অপেক্ষা করুন।"

বিজয় বাবুর সারিয়া আসিতে প্রায় ছয় মাস লাগিল। তারপর, সেখান হইতে আমার কোষ্ঠী চাহিয়া পাঠান হইল। কোষ্ঠী দেখিয়া জ্যোতিষী মহাশয় নাকি বলিয়াছিলেন—কন্যার পাপগ্রহ অধুনা অষ্টমে, ভোগকাল আরও তিন মাস; কাযেকাযেই আর তিন মাস অপেক্ষা করিতে হইল। তারপর যে মাস আসিল, সে মাসে হিন্দুর বিবাহাদি শুভ কর্ম্ম হয় না, পরের মাসেও নানা কারণে বিবাহ স্থগিত থাকিল। তাহার পরের মাসে,—অর্থাৎ বিবাহের পত্র হইবার প্রায় দুই বৎসর পরে, ষোড়শ ও সপ্তদশের সন্ধিক্ষণে শক্তিগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ চৌধুরী বংশে আমার শুভ পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। নারী-জীবনের এক অভিনব অধ্যায় আরম্ভ হইল।

৪

আমি পাল্কীতে চড়িয়া প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাইতেছি। সাধারণতঃ বাঙ্গালী মেয়েরা যে ভাবে যাইয়া থাকে, আমিও সেই ভাবেই যাইতেছি। সীমন্তে সিন্দুর-রেখা, ললাটে সিন্দুর বিন্দু, পদদ্বয় অলক্তে রঞ্জিত, হাতে নূতন শাঁখা এবং নোয়া, গায়ে অলঙ্কার, পরিধানে লাল রঙের নূতন শাড়ী।

পাল্কী আসিয়া অন্দর মহলে ঢুকিতেই—"নূতন বৌ আসছে" বলিয়া বাড়ীময় একটা সাড়া পড়িয়া গেল। আমাকে বরণ করিয়া লইবার জন্য কয়েকটী সধবা স্ত্রীলোক সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া গৃহদ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীও একপাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। আশে পাশে বালিকা, কিশোরী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা প্রভৃতি বিভিন্ন বয়সের আরও কতকগুলি স্ত্রীলোক ছিল। পাল্কী নামাইবার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চাৎ দিক হইতে কে গম্ভীর গলায় বলিয়া উঠিল—"নূতন বৌ এল বুঝি?" সে রব শুনিয়া যুবতী এবং কিশোরীরা সন্ত্রস্তভাবে এদিক ওদিক সরিয়া পড়িল। লোকটি পুনরায় সেইরূপ গম্ভীর গলায় বলিল—"আমি চলে যাচ্ছি, তোমরা বৌ বরণ করে তোল। এখন যে উনি তোমাদের বৌ গিন্নি। এত দিন ছিলেন মিস্ চক্রবর্ত্তী, এখন হলেন মিসেস চৌধুরী, একেবারে ডবল প্রমোশন!" আমার শাশুড়ী বলিলেন "তুই এখান থেকে সরে যা, নইলে কেউ এগুচ্ছে না।"

লোকটির কথা শুনিয়া বিরক্তিতে আমার মনটা

ভরিয়া গেল। প্রথম শ্বশুর বাড়ী পা দিতে না দিতেই খোঁচা দেওয়া "মিস চক্রবর্ত্তী", "ডবল প্রমোশন" প্রভৃতি বাক্যে আমার শিক্ষা এবং পিতৃকুলকেই যে উপহাস করা হইতেছে, তাহা কি আর আমি এত বড় মেয়ে হইয়া বুঝিতে পারিলাম না? যাহা হউক, লোকটিকে দেখিবার জন্য বড় কৌতূহল হইল। পাল্কীর দরজা ফাঁক ছিল, সেই ফাঁক দিয়া অস্পষ্টভাবে দেখিলাম—২৬।২৭ বৎসরের একটি সুন্দর যুবক অন্যদিকে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। তাহার স্কন্ধ পর্য্যন্ত লম্বিত কটা রঙের কুঞ্চিত কেশরাশি, মুখ শ্মশ্রু-মণ্ডিত, চক্ষে সবুজ রঙের সোণার চসমা, গায়ে আলখেল্লা গোছের একটা কৃষ্ণবর্ণ রেশমী পাঞ্জাবী, পায়ে জরির কাজ করা নাগরা জুতা, একটু লম্বা রকমের চেহারা, গায়ের রং ধপধপে সাদা। মনে হইল, যেমন বিদখুটে লোক, পোষাকও তেমনি বিদখুটে! লোকটী কিছুদূর চলিয়া গেলে, আমার শাশুড়ী অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "মা! তোমরা এস, বিজয় চলে গেছে।"

ওঃ! এতক্ষণে আমি চিনিতে পারিলাম—ইনিই আমার স্বামীর মাসতুতো ভাই বিজয়বাবু! পরীক্ষার ফল দেখিয়া লোকটীর উপর আমার এতদিন একটা যে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, তাঁহার অভদ্র আচরণে আজ তাহা অনেকটা খর্ব্ব হইয়া গেল। যাহা হউক, কি কিশোরী, কি যুবতী, কি প্রৌঢ়া সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল—"বলিহারি বৌ! এ যেন হাতে গড়া সোণার প্রতিমা! বাবুর বেশ পছন্দ! বাস্তবিক পছন্দের প্রশংসা করতে হয়।"

একরূপ সুখে স্বচ্ছন্দেই জীবন কাটিতে লাগিল। আজ দুই বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে, ইহার মধ্যে স্বামীর ভালবাসা, শাশুড়ীর বাৎসল্য, আত্মীয়স্বজনের সদয় ব্যবহার, পরিজনবর্গের আদর যত্ন আমাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। প্রকাণ্ড বাড়ী, মনোরম অট্টালিকা অতুল ঐশ্বর্য্য, অক্ষুণ্ণ মানসম্ভ্রম, কিছুরই অভাব নাই, কোন বিষয়েই দুঃখ নাই। কেবল একমাত্র কারণে মধ্যে মধ্যে আমাকে কিছু মনঃপীড়া প্রদান করিত, তাহা বিজয় বাবুর ঐ খোঁচা দেওয়া পরিহাস। তিনি বাগে পাইলেই আমাকে শুনাইতে ছাড়িতেন না যে, আমি নিম্নঘরের মেয়ে, শক্তিগ্রামের চৌধুরী বংশ আমার পিতৃকুল অপেক্ষা ঢের উচ্চ, এ বংশে মেয়ে বিবাহ দিয়া আমার পিতা ধন্য হইয়াছেন, তাঁহার কুল পবিত্র হইয়াছে, আমি সাধারণ চাকুরীজীবীর মেয়ে, শক্তিগ্রামের প্রবল প্রতাপ জমিদারের ঘরে আসিয়া কূয়োর ব্যাঙ একেবারে সাগরে পড়িয়াছি ইত্যাদি। এ সকল কথায় আমার মনে বেদনার সঞ্চার হইলেও, আমি ইহার প্রতিবাদ করিতে পারিতাম না, কারণ এ বাড়ীতে বিজয় বাবুর অখণ্ড প্রতাপ। তাঁহাকে ভয় না করিয়া চলিত এমন লোক কেহ ছিল না, অধিক কি স্বয়ং কর্ত্তা পর্য্যন্ত ইহার হাতের পুতুল ছিলেন। সুতরাং এ সকল বাক্যযন্ত্রণা নীরবেই আমাকে সহ্য করিতে হইত।

এই অভাবনীয় সুখরাশির মধ্যে থাকিয়াও, আমি সেই পুরাতন স্মৃতির হস্ত হইতে একেবারে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি নাই। সময় সময় তাহা স্মরণ হইলে নিজেকে যেন অশুচি বলিয়া মনে হইত। যোগী ঋষি কঠোর যোগ সাধনা দ্বারাও যে মনকে সহজে বশে আনিতে পারে না, আমি সাধারণ মেয়েমানুষ হইয়া কি প্রকারে তাহাকে এত শীঘ্র বশে আনিব? তবে সে চিন্তাকে কোন দিনও আমি প্রশ্রয় দিই নাই। যখনই মনের মধ্যে সে স্মৃতি জাগিয়াছে, তখনই তাহাকে সেই স্থানে সজোরে চাপিয়া ধরিয়াছি, আর প্রার্থনা করিয়াছি—হে ঈশ্বর! আমি যেন মনেও কোন দিন স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী না হই।

৫

বিবাহের পর তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আমার স্বামী এম-এ পাস করিয়া আইন পড়িতেছেন। বিজয় বাবু বি-এ পাশের পর আর পড়িলেন না, শূলবেদনা, তাঁহার তখনও ছিল। তিনি বাড়ী থাকিয়া আমাদের জমিদারীর তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। স্বামী গ্রীষ্মের

ছুটী, পূজার ছুটী, ও বড়দিনের ছুটী ছাড়া ছোটখাট ছুটিতেও বাড়ীতে আসিতেন। তিনি বাড়ী থাকিলে বিজয় বাবুকে কতকটা নরম দেখিতাম, কিন্তু তিনি চলিয়া যাইবার পর তাঁহার বাড়াবাড়ি চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইত। আমি আমার স্বামীকে এ সম্বন্ধে কোন দিন কিছু বলি নাই। স্বামীর কাণে এ সকল কথা তোলাকে আমি নীচতা বলিয়া মনে করিতাম।

আমার স্বামী এম-এ পাস করিবার পর বিজয়বাবু আমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া প্রায়ই বলিতেন—"এবার এম-এ পাস করতে দাদার অর্দ্ধেক রক্ত শুকিয়ে জল হয়ে গেছে! এ ত আর মেয়েমানুষের পরীক্ষা নয় যে দিলেই পাস! মেয়েমানুষের পরীক্ষকেরা ঠিক যেন কল্পতরু।"

তখন মাঘ মাস, মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিশ্রাম করিতে যাইতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম—বিজয় বাবু উন্মত্তের মত বাড়ীর ভিতর ছুটিয়া আসিতেছেন। তাঁহাকে এ ভাবে আসিতে দেখিয়া আমার বুকটা এক অতর্কিত অশুভের আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি শাশুড়ীর ঘরে ঢুকিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "দাদার কলেরা হয়েছে, এখন 'তার' পাওয়া গেল।" শাশুড়ী ভীতি-বিজড়িত স্বরে কহিলেন, "কি বল্লি?" "হাঁ! আর দেরী নাই, গাড়ী এসে পড়ল, আমি চল্লাম, তুমি পরের ট্রেণে এস।" এই বলিয়া তাড়াতাড়ি সিন্দুক হইতে একতাড়া নোট পকেটে পুরিয়া ঝড়ের মত তিনি ষ্টেশনের দিকে ছুটিলেন। পরের ট্রেণে শাশুড়ীও তিন চারিজন লোক সহ কলিকাতায় রওনা হইলেন।

চারি দিন পর যখন ইঁহারা ফিরিয়া আসিলেন, তখন বাড়ীময় একটা ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল। আমার শাশুড়ী কপালে করাঘাত করিয়া উচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। ভৃত্যেরা বিষণ্ণমুখে তাঁহার পরিত্যক্ত বিছানা, বাক্স, তোরঙ্গ, আলমারী, চেয়ার, টেবিল ও রাশি রাশি বই ঘরে তুলিতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, পা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, হাত পা অবসন্ন হইয়া পড়িল, চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া আসিল। আমি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, বসিয়া পড়িলাম। তারপর কি হইল কিছুই জানি না।

৬

বর্ষাকালে খরস্রোতা নদীর পাড় ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইলে যেমন কোন মতেই তাহা বাধা মানে না, অবিরত কেবল ধুপ্ ধাপ্ করিয়া পড়িতেই থাকে, আমার ভাগ্যনদীতেও তাহাই হইল। স্বামীর মৃত্যুর পর শাশুড়ী একেবারে শয্যা লইলেন। দিন দিন দ্রুতগতিতে তাঁহার শরীর ক্ষয় হইতে লাগিল। ডাক্তারী, কবিরাজী প্রভৃতি কোন চিকিৎসাতেই কিছু ফল হইল না। এক দিন তিনি আমাকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, "বৌমা! আমার সময় হয়ে এসেছে। আর বেশী দিন বিলম্ব নাই, তুমি পোয়াতি। বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল যে সন্তানটির মুখ দেখে যাই, কিন্তু শরীরের অবস্থায় বুঝ্ ছি, দুরন্ত কালের অতদিন আর সবুর সইবে না। যা হোক, তোমাকে এখনই কয়েকটা কথা বলে রাখি, হয়ত এর পর আর সময় হবে না। তুমি বুদ্ধিমতী, সুশীলা, আমার কথা কয়টী শেষ পর্য্যন্ত স্মরণ রেখ বৌমা! তুমি কখনও বিজয়ের সঙ্গে কলহ করোনা। ওর মত সচ্চরিত্র ছেলে ক'জন আছে? কিন্তু জানিনা, তোমাদের জন্মান্তরীণ কি শত্রুতা ছিল, যার ফলে তুমি ওর বিষনয়নে পড়েছ। কিন্তু তবু তুমি নিশ্চয় জেনো, ওর দ্বারা তোমার সম্পত্তির এক চুলও অপচয় হবে না, হৃদয়ের রক্তের মত সে তা রক্ষা করবে। ওর মত খাঁটি মানুষ পৃথিবীতে খুব কম আছে।" 'সত্যসত্যই ইহার এক মাস পরে আমার করুণহৃদয়া শাশুড়ী আমাদিগের মায়া কাটাইয়া পরপারের যাত্রী হইলেন।

শাশুড়ীর মৃত্যুর পর বাবার গুরুতর পীড়ার সংবাদ পাইয়া আমি শ্রীনগরে চলিয়া গেলাম। বাবা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়া ছয়মাসের পর ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছিলেন। কয়েক মাস ভুগিয়া ভুগিয়া তিনিও একদিন সন্ধ্যাকালে আমার কোলে মাথা রাখিয়া চিরদিনের

মত নয়ন মুদ্রিত করিলেন। আমি বিধবা হইবার পর হইতে বাবার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তিনি একেবারে শরীর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। একে একে আমার স্নেহের বন্ধনগুলি ছিন্ন হইয়া গেল।

আমি শ্বশুরালয়ে ফিরিয়া আসিলাম। বিজয় বাবু এবার আমার উপর বিষম খাপ্পা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার দাদা ও মাসীমার অকাল মৃত্যুর আক্রোশ-বিষ দিবারাত্র আমার উপর উদ্‌গিরণ করিতে লাগিলেন। আমি অলক্ষণা বৌ, আমার জন্যই সংসারটা ছারেখারে গেল, একথা দিবসে অনেকবার আমাকে শুনিতে হইত। কি করিব? প্রতীকারের কোনও উপায় ছিল না, অতএব কেবল নির্জ্জনে অশ্রুপাত ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াই আমি নীরব থাকিতাম।

বিজয় বাবুর সঙ্গে এপর্য্যন্ত আমি কথা কহি নাই। আমার শ্বাশুড়ী এবং স্বামী কথা বলিবার জন্য অনেক বার পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন, কিন্তু অত বড় দেবরের সঙ্গে কথা বলিতে সত্য সত্যই আমার বড় সঙ্কোচ বোধ হইত। তিনিও কোনদিন আগ্রহ করিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিতে আসেন নাই। একদিন আমার সম্মুখেই তিনি শ্বাশুড়ীকে বলিয়াছিলেন—তখন আমার স্বামী জীবিত। "কি বল মা, মেমসাহেবের সঙ্গে আলাপ না করাই শ্রেয়! কখন্ কি বলতে কি বেয়াদবি ক'রে ফেলব, আর সঙ্গে সঙ্গে মানহানির মামলা রুজু হয়ে যাবে।" যাহা হউক যথাকালে সুকুমারী ভূমিষ্ঠ হইল। সুকুমারীর অন্নপ্রাশনে অনেক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইলেন। দাদাকেও নিমন্ত্রণ করা হইল। তিনি আসিলেন। কিন্তু বিজয় বাবু চক্রান্ত করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজনের সভায় দাদাকে অপমানিত করেন। আমাদের জ্ঞাতি ও কুটুম্ববর্গের সহিত দাদার বসিবার আসন হয়, কিন্তু বিজয় বাবুর প্ররোচনায় আমাদের [illegible] জ্ঞাতি তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করেন এবং [illegible] হইতে আসন তুলিয়া সাধারণ ব্রাহ্মণগণের সহিত করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে দাদা ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণভোজনের সভা পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া আসেন। আমি দাসীদ্বারা বিজয় বাবুকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি গম্ভীর ভাবে উত্তর দেন, "যার যেরূপ পদমর্য্যাদা তার সেইরূপ ব্যবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত! লাফ্-দিয়ে সাগর ডিঙাতে চাইলে চলে না। আমরা না হয় কুটুম্ব বলে সব সহ্য করলাম, কিন্তু অপর সাধারণ জ্ঞাতিবর্গ তা সইবে কেন?"

কথা শুনিয়া রাগে আমার গা জ্বলিয়া গেল। ইচ্ছা হইল, তখনই শুনাইয়া দিই—"সেই পদমর্য্যাদাহীন ব্যক্তির ভগিনীকেই ত তোমরা এক সময়ে পায়ে ধরে সেধে এনেছিলে। তখন তোমাদের কুলগৌরব কোথায় ছিল?" কিন্তু পারিলাম না, দুঃখে ক্ষোভে ও মর্ম্মপীড়ায় আমার বাক্‌রোধ হইয়া আসিল।

ইদানীং বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারে বিজয় বাবুর সঙ্গে মধ্যে মধ্যে আমাকে একটু আধটু কথা বলিতে হয়। প্রথম প্রথম দাসী দ্বারাই কথা চালাইতাম, অবশেষে আড়ালে থাকিয়া আপনিই দুই এক কথার জবাব দিতে লাগিলাম। বিশেষ কোনও ব্যাপার উপস্থিত হইলে বিজয় বাবু বৃদ্ধ নায়েব মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া পরামর্শ করিতে আসিতেন।

কিন্তু তাঁহার অত্যাচার ক্রমশঃ আমার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল। মানুষ যতবড় ধৈর্য্যশীলই হউক না কেন, তাহার ধৈর্য্যের ত একটা সীমা আছে? সেবার আমার দাদার বিবাহ, মা মাথার দিব্যি দিয়া যাইতে লিখিলেন, আমি যাইবার জন্য উদ্যোগী হইলাম। এত বড় জমিদার-গৃহিণী আমি, বিশেষতঃ সংসারের কর্ত্রী, সুতরাং বৌকে যা তা একটা কিছু দেওয়া ভাল দেখায় না মনে করিয়া, একছড়া মূল্যবান নেকলেস দিবার সংকল্প করিলাম। কয়েকখানি ক্যাটালগ দেখিয়া, নূতন ধরণের জুয়েল বসান একছড়া নেকলেস পছন্দ করিলাম, দাম ৬৫০ টাকা। আমি নায়েব মহাশয়কে ডাকাইয়া তিন দিনের মধ্যে এই হার আনাইয়া দিতে বলিলাম। কয়েক ঘণ্টা পরে নায়েব মহাশয় আসিয়া বলিলেন—"এত টাকা দিয়ে হার কিনতে ছোট বাবু নিষেধ করেছেন।"

আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। আমি ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলাম—"আমার কাযের উপর কথা বলবার তাঁর কি অধিকার আছে? আমি ওসব কিছু শুনতে চাইনে, তিনদিনের ভিতর ঐ হার এনে দিতেই হবে, নইলে কারও ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।" বিকালবেলায় ঝির মুখে বিজয় বাবু আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন, টাকা তিনি কিছুতেই দিবেন না, হার দিবার যদি অত সখ হয়ে থাকে, তবে আমার নিজের যে দুগাছি আছে, তার একগাছি স্বচ্ছন্দমনে দিতে পারি, এখন আর আমার হারে প্রয়োজন কি?

কথা শুনিয়া রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। অবশ্য আমার নিজের দুই ছড়া হার ছিল। কিন্তু তাহা পুরাতন, নূতন বৌকে ঐ পুরাতন জিনিস দিতে আমার বড় লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। যাহা হউক, এবিষয় লইয়া বিজয় বাবুর সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে প্রবৃত্তি হইল না। মনে মনে এক অভিসন্ধি আঁটিয়া, তখনই কাছারীর মুহুরী বাবুকে ডাকাইলাম এবং আমার দুই ছড়া নেকলেস তাঁহার হাতে দিয়া বলিলাম—"আপনি আজই কলিকাতা চলে যান, এবং এই হার দুছড়া কোনও পরিচিত পোদ্দারের দোকানে বন্ধক রেখে এই হারগাছি কিনে আনুন।" নেক্‌লেসের ক্যাটালগ দিলাম। তিন দিন পরে আমার বাঞ্ছিত হার আসিয়া পৌঁছিল, আমি সুকুমারীকে লইয়া শ্রীনগরে চলিয়া গেলাম।

৭

নদীর একটা নূতন চর লইয়া ছোট তরফের সঙ্গে আমাদের এক সত্ত্বের মামলা চলিতেছিল। আমি শক্তিগ্রামে ফিরিয়া গিয়া শুনিতে পাইলাম, জজকোর্টে আমাদের হার হইয়াছে। হাইকোর্টে আপিল করিবার জন্ত উকিল বাবুকে আদেশ দিয়া বিজয় বাবু অপরাহ্নে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। সন্ধ্যাকালে সংবাদ পাওয়া গেল, ছোট তরফের কর্ত্তা প্রায় তিন শত লাঠিয়াল মজুত করিয়াছেন; জোর পূর্ব্বক চর দখল করিয়া তাহাতে প্রজা বসাইবেন। আমিও নায়েব মহাশয়কে অবিলম্বে লাঠিয়াল সংগ্রহ করিতে আদেশ দিলাম। রাত্রি দশটার ভিতর তিন শতাধিক লাঠিয়ালে আমাদের দেউড়ি পূর্ণ হইয়া গেল। আমার আশঙ্কা ছিল শেষ রাত্রে উহারা চর দখল করিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু পরদিন বেলা ৯টা পর্য্যন্তও উহাদের সেরূপ কোন চেষ্টা দেখা গেল না। আমি নায়েব মহাশয়কে লিখিয়া জানাইলাম—"আমার দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত যেন লাঠিয়াল দিগকে বিদায় দেওয়া না হয়।"

বিজয় বাবু বেলা এগারটায় ফিরিয়া আসিলেন। তিনি দেউড়িতে লাঠিয়াল মোতায়েন দেখিয়া চটিয়া গেলেন এবং তখনই তাহাদিগকে কিছু কিছু বক্‌সিস্ দিয়া বিদায় দিলেন।

যখন এই কথা আমার কাণে আসিল, তখন লজ্জা ঘৃণা ও অপমানে আমি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলাম। আমার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইল। এ বাড়ীতে আর এক দণ্ডও থাকিতে ইচ্ছা হইল না। তখনই আমি বাড়ীর বেহারাদিগকে অন্দরে ডাকাইয়া আনিলাম এবং একরূপ একবস্ত্রেই পাল্কীতে উঠিয়া শ্রীনগরে পাল্কী চালাইতে বলিলাম।

পাল্কী সদর দরজার সমীপবর্ত্তী হইলে সহসা পশ্চাদ্দিক্ হইতে কঠোর কণ্ঠে হুকুম হইল "বেহারারা! পাল্কী থামাও।"

সে হুকুমের হুঙ্কারে তাহারা কাঁপিয়া উঠিল। আমি ভিতর হইতে চীৎকার করিয়া কহিলাম—"পাল্কী থামিও না, শ্রীনগরে চল।" বেহারারা থমকিয়া দাঁড়াইল। পুনরায় সেইরূপ কঠোর কণ্ঠে হুকুম হইল "রামতেওয়ারী, ফটক বন্ধ করো, বেহারা লোক্‌কো ভিতরসে বাহির হোনে মৎ দেও।" হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে ঝন্ ঝন্ শব্দে সেই প্রকাণ্ড সিংহদ্বার অর্গলবদ্ধ হইয়া আমার গমনপথ রোধ করিল।

লাঞ্ছনা, অবমাননা ও মর্ম্মপীড়ায় আমার মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। বেহারারা আমাকে অন্দর মহলে ফিরাইয়া আনিল, আমি গিয়া শয্যা লইলাম।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, এবাড়ী ত্যাগ না করিয়া জলগ্রহণ করিব না। পরদিন একথা বাড়ীময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। পরিচারিকারা শতবার সাধ্য সাধনা করিয়াও আমাকে কিছু খাওয়াইতে পারিল না। বাড়ীর পুরাতন বৃদ্ধ কর্ম্মচারীরা আসিয়াও অনুরোধ করিল, আমি তাহাদিগকে আমার সংকল্প শুনাইয়া দিলাম। তাহারাও ভগ্নমনে ফিরিয়া গেল। বেলা ৩টার সময় ঝি আসিয়া খবর দিল ছোট বাবু আসিতেছেন। আমি কোনও উত্তর দিলাম না, ঘৃণা ও বিরক্তিতে আমার মন ভরিয়া উঠিল। বিজয় বাবু বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া, ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুন্‌তে পেলুম, তুমি নাকি আজ দু'দিন ধরে উপোস করে আছ?"

আমি অবজ্ঞাভরে উত্তর দিলাম—"সে কথা জিজ্ঞাসা করবার কোনও দরকার দেখিনে, আমি শ্রীনগর যেতে পারব কি না তাই জান্‌তে চাই।"

"তা পরে হবে, এখন তুমি স্নান আহার করগে।"

আমি দৃঢ় স্বরে বলিলাম, "এ বাড়ী ত্যাগ না করে আমি জলগ্রহণ করবো না।"

আমার কথা শুনিয়া তিনি কিয়ৎকাল অধোবদনে কি ভাবিলেন, তার পর একটু স্নিগ্ধ স্বরে কহিলেন—"তোমার বাড়ী, তুমি ত্যাগ না করে জলগ্রহণ করবে যে না এ কেমন কথা?"

আমি বিদ্রূপের স্বরে বলিলাম, "কে বলে এ বাড়ী আমার? আমার বাড়ী হলে কি এ বাড়ীর সাড়ে ছশো টাকার উপরেও আমার কর্তৃত্ব থাকত না? আমার হুকুমের কোনও মূল্য হত না?"

"ওঃ, তাই তুমি জান্‌তে চাচ্ছ? আচ্ছা তবে তাই বলি। আমি বাড়ী এসে যখন দেখলাম, বহু লাঠিয়ালে দেউড়ী পূর্ণ, তখন তাদিকে বিদায় দেওয়াই যুক্তিযুক্ত বলে বোধ হল। বেটারা এক একজন এক একবেলা পাকি তিন পোয়া চালের ভাত মারবে, আর তিন বেলা লাঠিতে তেল মাখাবে, এ অপব্যয় আমার অসহ্য।"

"তা হলে, চরটী আপনার বিবেচনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর?"

"চরের ব্যবস্থা আমি পূর্ব্বেই করে রেখেছিলাম। জোর করে চর দখল করবার অভিসন্ধির কথা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে তারযোগে জানাই। তিনি জরুরী তারে ছোর তরফের কর্ত্তাকে জানিয়েছেন যে—'চর লইয়া কোনরূপ দাঙ্গা হাঙ্গামা বা শান্তিভঙ্গ হইলে তজ্জন্য তোমাকেই দায়ী হইতে হইবে।' সুতরাং কর্ত্তার আর ওদিকে এক পা এগুবার সাধ্য নেই।"

তারপর—"তুমি একটু অপেক্ষা কর আমি আস্‌ছি।" এই বলিয়া তিনি বাহিরবাড়ী চলিয়া গেলেন। প্রায় পনের মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া আমার হাতে দুইছড়া হার দিয়া বলিলেন, "এই নাও। তোমার নূতন হারের দরুণ সরকারে ৬৫০ টাকা তোমার নামে খরচ লেখা আছে।"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় ছিল এ হার?"

"কেসিয়ারের লোহার সিন্ধুকে।"

"কবে ছাড়িয়ে আনা হল?"

"বাঁধা দেওয়া হয়নি।"

"আশ্চর্য্য! আমার সঙ্গে এরকম লুকোচুরি খেলবার তাৎপর্য্য কি?"

"অবশ্যই কিছু আছে, তা তুমি শীঘ্রই জানতে পারবে।"

তারপর তিনি পকেট হইতে একটুকরা কাগজ বাহির করিয়া, কম্পিত হস্তে আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "লেখা কার চিন্‌তে পার?"

লেখা দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। পুরীতে পিতার অনুরোধে আমাদের কলিকাতার ঠিকানা লিখিয়া নরেন্দ্রবাবুকে যে কাগজখানি দিয়াছিলাম, ইহা তাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় পেলেন আপনি এ কাগজ?"

"পুরীতে।"

"পথে কুড়িয়ে?"

না, স্বয়ং লেখিকার কাছ থেকে।"

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "নরেন্দ্রনাথ রায় কার নাম ?"

তিনি ভগ্নকণ্ঠে উত্তর দিলেন—"নরেন্দ্রনাথ আমারই পিতৃদত্ত নাম। মাসীমার এক ভাসুরের নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ, তাই তিনি আমার নূতন নাম রাখেন বিজয়চন্দ্র। বাড়ীছাড়া হলে আমি কখনও কখনও আমার বিলুপ্ত নাম ব্যবহার করতাম।"

৮

পরদিন প্রাতঃকালে জানা গেল, রাত্রির ট্রেণে বিজয় বাবু কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। সহসা তাঁহার এরূপ অন্তর্দ্ধানে মনের মধ্যে নানারূপ সন্দেহের উদয় হইতে লাগিল। জানি না কোন্ মায়াবলে এতদিন তিনি আমাকে এমন অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

চারি দিন পর রেজিষ্টারী ডাকে তাঁহার এক পত্র আসিল। পত্র পড়িয়া আমার মনে হইল, এ কি স্বপ্ন না বাস্তব ঘটনা ? আমি সুপ্ত না জাগ্রত ? বাস্তবিক কি এক বিরাট প্রহেলিকার ভিতর দিয়া আমার জীবনের স্রোত এতদিন প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে ? পত্রে লেখা ছিল—

"বৌদি,

শেষ পরীক্ষার পর কলিকাতার বাসায় আসিয়া বাড়ীর পত্রে জানিলাম, কর্ত্তা সান্নিপাতিক জ্বরে সাংঘাতিক কাতর। তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গুছাইয়া রাত্রির ট্রেণে দুই ভাই বাড়ী চলিয়া আসিলাম। কাহারও সঙ্গে দেখা করিবার অবসর ঘটিল না। সাতাইশ দিনের জ্বরে কর্ত্তা স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর, দাদা মফঃস্বলের কাছারীগুলি পরিদর্শন করিতে যান, সেই সময় কাঞ্চনপুরে এক কাঞ্চন প্রতিমা দেখিয়া, তাঁহাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য তিনি একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন। এই সংবাদ যখন আমার কাণে আসিল, তখন যুগপৎ শত বজ্র যেন আমার শিরে নিপতিত হইল, আমি বাহ্যজ্ঞান হারাইলাম! তার পর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে চিন্তা করিতে লাগিলাম, কি উপায়ে দাদার মত পরিবর্ত্তন করা যায় ? কিন্তু কোন প্রকৃষ্ট উপায়ই মনোমধ্যে উদিত হইল না, অগত্যা তখন মাসীমাকে গিয়া বলিলাম, "মা। খোলাকাটা বামুণের মেয়ে ঘরে আনতে হবে ? বল ত, তা হলে শক্তিপুরের চৌধুরী বংশের কৌলিন্য-গৌরব কোথায় থাকে ? সমাজে কি একেবারে সাত হাত নীচে গিয়ে পড়তে হবে না ? তা ছাড়া জমিদারের ছেলের জমিদারের ঘরেই বিয়ে হওয়া উচিত, তাতে বিষয় আশয়ের পক্ষেই মঙ্গল, আমরা কেন সাধারণ লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে যাব ? তুমি গিয়ে তাঁকে মত পরিবর্ত্তন করতে বল।" দাদা মত পরিবর্ত্তন করা দূরে থাক, বরং দ্বিগুণ উৎসাহে উত্তর দিলেন—"তুমি এতে অমত করো না। নিম্ন ঘরের মেয়ে আনতে কোনও দোষ নেই, দিতেই যত দোষ। বৌভাতের সময় কয়েক শত টাকা বেশী ব্যয় করলেই হবে!"

দাদার দৃঢ়তা দেখিয়া দমিয়া গেলাম। দুই চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম, আমার মনে হইল—আমি যেন পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গ হইতে পড়িয়া গিয়াছি। যাহা হউক অনেকক্ষণে নিজকে কতকটা সামলাইয়া লইয়া শয্যায় পড়িয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম—এখন কি করা কর্ত্তব্য ? সব কথা খুলিয়া বলিলে এখনই ত দাদা তাঁহার সংকল্প পরিত্যাগ করিবেন, কিন্তু সে পরিত্যাগের পরিণাম কি ? তাঁহার হৃদয়ের এক কোণে অশান্তির যে এক দাবানল জ্বলিয়া রহিল, তাহা কি কখনও নির্ব্বাপিত হইবে ? অধিকন্তু আমার মনেও যখন এ কথা জাগিবে, তখন আমার চিত্তেই কি সুখশান্তি থাকিবে ? দুই দিক নষ্ট হওয়া অপেক্ষা একদিক রক্ষা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। একদিক আমাকে অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে। আশ্রিত, অনুগত এবং প্রতিপালিতের ধর্ম্ম অবশ্যই আমাকে পালন করিতে হইবে। কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গেল। স্বহস্ত-রোপিত আশালতাকে সমূলে

ছেদন করিবার জন্য স্বহস্তেই আমি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা ধারণ করিলাম।

দাদার বিবাহ স্থির হইয়া গেল। আমি অসম্মতিসূচক চিঠি লিখিয়া বীরভূমে আমার জনৈক বন্ধুর নিকট পাঠাইলাম, সে তাহা তোমার পিতাকে পাঠাইয়া দিল।

কাঞ্চনপুরের ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া এ পক্ষের লোকেরা কলিকাতা চলিয়া গেল। আমি ভাবিলাম—দাদাকে না হয় ফাঁকি দিলাম, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা কি? তাহাকে ফাঁকি দিতে না পারিলে এখানে ত সুখ সোয়াস্তি থাকিবে না, দিবানিশি লজ্জা ও সঙ্কোচের মধ্যে তাহাকে থাকিতে হইবে। সুতরাং মনে মনে এক অভিসন্ধি আঁটিয়া, সহসা একদিন নিশীথে শূলবেদনায় নিদারুণ চিৎকার আরম্ভ করিয়া দিলাম। বাড়ীশুদ্ধ সকলে অস্থির হইয়া উঠিল। ডাক্তার ও কবিরাজ আসিলেন। ভাল ভাল ঔষধ ব্যবস্থা হইয়া গেল। কতক ঔষধ মুখে রাখিয়া বমনের ছলে ফেলিয়া দিতাম, কতক কতক আবার গোপনে পিক্‌দানীতে ঢালিতাম। এইভাবে কিছুদিন চলিল। রোগ আমার ক্রমশঃ বাড়িতেই থাকিল। কবিরাজ মহাশয়কে রোগের অসাধ্যতা জ্ঞাপন পূর্ব্বক তারকেশ্বরে পাঠাইবার উপদেশ দিতে বলিলাম। আমার তারকেশ্বর যাওয়া স্থির হইল। তার পর সেখানে গিয়া আমি দাঁড়ি, গোঁফ এবং মাথার চুল রাখিয়া দিলাম। স্বতন্ত্র বাসা লইয়া, অনেক দিন থাকিবার বন্দোবস্ত করিলাম। চুল, গোঁফ, দাড়ি প্রভৃতি এক বৎসরের মধ্যে খুব বড় হইয়া উঠিল। মাথায় তৈল মাখা ছাড়িয়া দিলাম। তাহাতে কালো চুলগুলি পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিল। বাড়ীর সকলকে জানাইলাম—আমি বাবা তারকেশ্বরের নিয়ম পালন করিতেছি, এক বৎসরের জন্য নিয়ম পালনের আদেশ ইয়াছে। এক বেলা আতপান্ন ধরিলাম। হঠাৎ এই পরিবর্ত্তনে শরীরটাও শূল রোগীর মতই কৃশ হইয়া পড়িল। এইরূপে একবৎসর কাটিয়া গেল।

তার পর, বিবাহের দিন স্থির করিবার জন্য মাসিমার নিকট তোমার পিতার চিঠি আসিল। আমি মনে মনে ভাবিলাম আরও কিছুদিন যাওয়া দরকার। সুতরাং আর একদিন রাত্রিতে দ্বিগুণ বেগে শূলবেদনায় চিৎকার আরম্ভ করিয়া দিলাম। বিবাহ স্থগিত থাকিল, আমি পুনর্ব্বার তারকেশ্বরে আসিলাম। এবার এখানে আসিয়া একজন নামজাদা বহুরূপীর সাক্ষাৎ পাইলাম। সে একজন উচ্চদরের হরবোলাও ছিল। সে নানাপ্রকার পশু পক্ষী এবং মানুষের স্বর অবিকল নকল করিতে পারিত। কয়েকটী টাকার বিনিময়ে, তাহার নিকট কণ্ঠস্বর বদলাইবার কৌশল শিক্ষা করিতে লাগিলাম। দুই মাসে কৌশলটা আমার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়া গেল। আমি প্রৌঢ় লোকের কণ্ঠস্বরে কথা বলিতে লাগিলাম। তার পর সেই বহুরূপীর মিকট জানা গেল—কালো রঙের লম্বা কোর্ত্তা গায়ে দিলে চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। সেই হইতে কাল রঙের আলখেল্লা পরিতে আরম্ভ করিলাম। দিবারাত্র শরীর আবৃত্ত করিয়া রাখার জন্যই হউক, অথবা আতপান্নের গুণেই হউক, কিংবা তৈল বর্জ্জনের ফলেই হউক আমার গায়ের রং অস্বাভাবিক সাদা হইয়া উঠিল। একখানি ইংরাজী পুস্তকে পড়িয়াছিলাম—সবুজ রঙের চস্‌মা চক্ষে দিলে মুখাকৃতির অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটে, অল্প পরিচিত লোকে সহসা সে মুখাবয়ব ধরিতে পারে না। সুতরাং বাড়ী আসিবার আগে একজোড়া চস্‌মা কিনিয়া আনিলাম। দাদার কালাশৌচ শেষ হইবার প্রায় ১১মাস পর বিবাহ হইল। বাবা তারকেশ্বরের নিয়ম ভঙ্গ হইবার আশঙ্কা জানাইয়া আমি বিবাহোৎসব হইতে দূরে থাকিলাম। ইহাতেও আমার সন্দেহ ঘুচিল না। আমি মনে মনে আর এক ভীষণ সংকল্প করিয়া বসিলাম—নববধূর সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করিতে হইবে, আমার উপর তাহার ঘৃণা বিদ্বেষ জন্মাইতে হইবে, বিদ্বেষের গাঢ় প্রলেপে তাহার নেত্রদ্বয় অন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। তাই প্রথম সম্ভাষণেই নিজের উপর তোমার বিদ্বেষ উৎপাদনের চেষ্টা করিলাম। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের মধ্যে

ধরা পড়িবার ভয়ে কোনও দিন তোমার মুখের দিকে তাকাইয়া কথা বলি নাই। পূর্ব্বের চেহারার সঙ্গে বর্ত্তমান প্রকৃতি এবং চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, সুতরাং এক অবগুণ্ঠনবতী পুরমহিলার সঙ্গে প্রতারণায় আমি কৃতকার্য্য হইলাম। কিন্তু যাঁহার জন্ম এত, তিনি আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেলেন !

দাদা ও মাসীমার মৃত্যুর পর আমার কঠোর নীতিকে আরও কঠোরতর করিয়া তুলিলাম। কেন না আমাদের মধ্যে যে দুইটী উচ্চ প্রাচীর ব্যবধান ছিল, কালের কঠোর আঘাতে অকস্মাৎ তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ায়, আতঙ্কে আমার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল।

এই আমার কথা। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর তোমাকে বড় যন্ত্রণা দিয়াছি। আমার বিবেক আমাকে যেদিকে চালাইয়াছে, আমি সেইদিকেই চলিয়াছি। ঈশ্বর জানেন, একটি রূঢ় কথা মুখে আনিতে আমার জিহ্বায় কত শত বৃশ্চিক দংশন যাতনা অনুভূত হইয়াছে। যাহা হউক, আমি আমার অতীতের পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধের জন্য আজ সকাতরে তোর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।"

সাত দিন পর দাদাকে সঙ্গে লইয়া বিজয় বাবু কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। পূর্ব্বে বিজয়বাবু যে কয়বারই আমাদের কলিকাতার বাসায় গিয়াছিলেন, ঘটনাক্রমে দাদার সঙ্গে একবারও তাঁর সাক্ষাৎ হয় নাই, বিজয় বাবু আসিবার পূর্ব্বেই দাদা খেলিতে অথবা বেড়াইতে বাহির হইতেন।

বিজয় বাবু বাড়ী পৌঁছিয়াই আমার শয়নকক্ষের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। পরিচারিকা সংবাদ দিল, "ছোট বাবু আপনার জন্তে অপেক্ষা করছেন।"

আমি নিতান্ত অনিচ্ছায়, একান্ত সঙ্কুচিতভাবে দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বিজয় বাবু বলিলেন, "বৌদি, আমি কাল সকালে তীর্থ পর্য্যটনে যাত্রা করব। আর কখনও ফিরবো কি না বলতে পারিনে। তোমার দাদাকে মফঃস্বলের বড় বড় কাছারীগুলি ঘুরিয়ে এনেছি। মাতব্বর প্রজা ও কর্ম্মচারীদের সঙ্গে পরিচয় করে দিয়েছি। তিনি আমার স্থানে কায করবেন। আমার নিজের বিষয় আশয় গুলিও আপাততঃ তোমাদের জিম্মায়ই রইল, পরে ওর একটা ব্যবস্থা করা যাবে। যোগেশ বাবু বুদ্ধিমান এবং তেজস্বী যুবক, তাঁর দ্বারা জমিদারীর কায ভালই চলবে। তুমি লেখাপড়া শিখেছ, জ্ঞান বুদ্ধিও হয়েছে, তুমিও এখন আপন বিষয় সম্পত্তি বুঝে চলতে পারবে। আমি তোমার নিকট শত অপরাধে অপরাধী, আজ এই শেষ বিদায়ের দিন তুমি আমার সকল অপরাধের কথা ভুলে যাও।"

আমি কোনও উত্তর দিতে পারিলাম না, আমার দুই চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। বোধ হয়, তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়া নীরবে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

পরদিন প্রকৃতই তিনি তীর্থ যাত্রার জন্ম প্রস্তুত হইলেন। তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্ম গ্রামস্থ বন্ধু বান্ধবেরা ও কর্ম্মচারিগণ বহির্দ্বারে সমবেত হইল। একমাত্র এই হতভাগিনী ভিন্ন আর কেহ ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিলেন না যে, এই তাঁহার শক্তিগ্রাম হইতে মহাপ্রস্থান। তিনি প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে আগাগোড়া বাড়ীখানি ঘুরিয়া বেড়াইলেন। আশৈশবের স্নেহস্মৃতিবিজড়িত বাড়ীখানির সঙ্গে চিরজীবনের মত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে তাঁহার বড় কষ্ট হইতেছিল। তাঁহার চোখ মুখের উপর সে কষ্টের সুস্পষ্ট ছায়াপাত দেখিয়াছিলাম। তারপর, সকলকে বিদায় সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া, তিনি গাড়ীতে উঠিলেন।

৯

বিজয় বাবু পূর্ণ তিন বৎসর ভারতের নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া, প্রয়াগে এক কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক কুষ্ঠরোগীর পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি যেখানে যে অবস্থায়ই থাকিতেন, প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে দাদা তাঁহার একখানি পত্র পাইতেন। এই সুদীর্ঘ তিন বৎসরের মধ্যে এ নিয়মের কোনও

ব্যতিক্রম হয় নাই। আজ মাসের ১৭ই তারিখ, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার পত্র আসিল না। আমরা বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম, পরদিন টেলিগ্রাম করা স্থির হইল। অপরাহ্নে আমার পাঠাগারে বসিয়া একখানি বাংলা দৈনিক খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম, দেখিতে পাইলাম একস্থানে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—"সেবকের আত্মত্যাগ।" সংবাদটির প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই আমার বুকটা যেন কি জন্য সজোরে স্পন্দিত হইতে লাগিল। আমি রুদ্ধশ্বাসে পড়িতে লাগিলাম—"প্রয়াগ-প্রবাসী সুপ্রসিদ্ধ সেবক বাবু বিজয়চন্দ্র রায় গত সোমবার ত্রিবেণীর তীরে সান্ধ্য ভ্রমণ করিতেছিলেন, সহসা চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন করিয়া প্রবল বেগে ঝড় উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে একখানি আরোহিপূর্ণ নৌকা ঝড়ের বেগ সামলাইতে না পারিয়া জলমগ্ন হইতে লাগিল। স্ত্রী পুরুষ এবং বালক বালিকারা আকাশভেদী আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল। বিজয় বাবু মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া নদীগর্ভে ঝম্পপ্রদান করিলেন। সহস্র প্রতিকূল তরঙ্গবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া নৌকার নিকটবর্ত্তী হইলেন। নৌকা তখন প্রায় ডুবিয়া গিয়াছে। তিনি দুইটি বালককে বামহস্তে জড়াইয়া ধরিয়া সন্তরণ পূর্ব্বক তীরে উঠিলেন। তারপর আর একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে নৌকার নিকট হাবুডুবু খাইতে দেখিয়া পুনর্ব্বার তিনি নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। কিন্তু এই সময় ঝড়ের বেগ অতি প্রবল হইয়া উঠিল। মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। করকাপাত এবং ঘন ঘন অশনি-নির্ঘোষ হইতে লাগিল। ভয়াবহ তরঙ্গমালার সৃষ্টি হইল। প্রকৃতি যেন আজ ত্রিবেণীর বক্ষে সংহার মূর্ত্তি প্রকটিত করিল। বিজয় বাবু আর উঠিতে পারিলেন না। পরদিন তাঁহার মৃত দেহ ত্রিবেণীর বক্ষে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়।"

আর পড়িতে পারিলাম না। আমার নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিল। সমস্ত বাড়ীখানি যেন আমাকে লইয়া কুলাল চক্রের মত ঘুরিতে লাগিল। আমি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলাম। আমার চৈতন্য লোপ পাইল। জানি না, কতক্ষণ আমি এইভাবে ছিলাম।

তারপর যখন আমার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, তখন দেখি, আমি আমার পালঙ্কে শুইয়া আছি, দাদা শিয়রে বসিয়া বাতাস দিতেছেন, অদূরে দুই জন ডাক্তার উপবিষ্ট।

পরদিন সেই কাগজখানি আবার আমি পড়িতে আরম্ভ করিলাম। তারপর লেখা ছিল—"আশ্রমের সেবকবৃন্দ ও বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। তিনি অক্লান্ত ভাবে অহোরাত্র কুষ্ঠরোগীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিথাকিতেন। তিনি দরিদ্রগণেরও পরম বন্ধু ছিলেন। এই উন্নতমনা ব্রাহ্মণ যুবক এক সমৃদ্ধ পরিবারে জন্মলাভ ও উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও, সংসারধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া এই মহাব্রতকেই জীবনের সার বস্তু করিয়াছিলেন। তাঁহার অভাবে প্রতিষ্ঠানটির অবনতি না ঘটে, ইহাই জনসাধারণের নিকট প্রার্থনীয়।"

পরদিন দাদার সহিত এলাহাবাদ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। বালিকা বয়সে একদিন তাঁহাকে অনুরাগের চক্ষে দেখিয়াছিলাম বলিয়া না হউক, একজন মহাপ্রাণ, আত্মত্যাগী, দেবচরিত দেবর বলিয়াও কি তাঁহার পবিত্র শ্মশানক্ষেত্রে এক বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিবার আমার অধিকার নাই? তাঁহার কুষ্ঠাশ্রমটি যাহাতে রক্ষা পায়, সে সুবন্দোবস্ত করাও আমার অবশ্য কর্ত্তব্য সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, একমাস পরে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীমধুসূদন আচার্য্য।

প্রবাসীর পত্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সে দিন Y. M. C A ছাত্রাবাসে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে লর্ড লিটনের বক্তৃতায় ও পরদিন এডিবরা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে লর্ড লিটন ও আমার বক্তৃতায় সন্দেহ দূরীকরণ কার্য্য অধিক অগ্রসর হইয়াছে মনে হয়। কোথাও বক্তৃতা করিব না প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও এখন কিছু বলিতে হইল। কারণ কমিটীর কার্য্য সম্বন্ধে ছাত্রদিগের সন্দেহ শুধু মনে নয়, মুখেও যথেষ্ট প্রকাশিত হইতেছে। লর্ড লিটন উদারভাবে কমিটীতে আমাদের বিশেষ সহায়তা করিতেছেন এবং আমরা থাকিতে সব দিক দেখিয়া শুনিয়া জ্ঞানতঃ কমিটীকে কোনও অপরাধে অপরাধী হইতে দিব না এ কথা ছাত্রদিকে স্পষ্ট বলাতে উপকার বই অপকার হয় নাই। আজ ছাত্রদিগের সহিত আলাপে তাহা বেশ বোঝাও গেল। বাস্তবিক ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইয়াছে—ছাত্রদিগের মধ্যে অসন্তোষের ভাব যেরূপ ক্রমশই বাড়িতেছে তাহাতে শীঘ্রই এ সমস্যার মীমাংসা না হইলে কোনও পক্ষেরই মঙ্গল হওয়া সম্ভবপর নহে। জানিনা আমাদের কমিটীর দ্বারা এ কাজ কতদূর কি হইবে।

গ্লাসগো—২রা জুলাই

মোটর চ্যারাব্যাঙ্কে প্রায় ত্রিশ মাইল সহরের বাহিরে বেড়াইয়া আসিলাম। ছোট ছোট পাহাড়গুলির কোলে সবুজ রঙ্গের ক্ষেত, নানা ফল ফুলের গাছ, ছোট ছোট বাগানে উঁচু পাহাড়ের উপর ইউনিভার্সিটির সুন্দর বাড়ী, নীচে কেলভিন নামে ছোট নদীটী কুলকুল রবে বহিয়া ক্লাইড নদীতে পড়িতেছে। চারিদিকের দৃশ্য বড় সুন্দর। ক্লাইড নদীর সহিত লখ্ লোমণ্ড নামে সুন্দর হ্রদের যোগ হইয়া আরও মনোরম হইয়াছে। লোমণ্ড পাহাড়ের নীচেই এই সুন্দর হ্রদ। দূরে গ্র্যাম্পিয়ান নামে পাহাড়ের শ্রেণী দেখা যাইতেছিল। অনেকক্ষণ এই সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের উপভোগ হইল।

পথে কেলমার্ণ নামে ছোট এক গ্রামে একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখে পড়িল। দেখিলাম একজন প্রবীণ ভদ্রলোক স্বহস্তে উদ্যানের তৃণচ্ছেদন করিতেছেন। পরিচয়ে জানিলাম তিনি স্থানীয় পাদ্রী। তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া স্থানীয় প্রাচীন ইতিহাস অনেক জানা গেল। নিজে সঙ্গে করিয়া জন বুকাননের স্মৃতিস্তম্ভ দেখাইলেন। ইনি প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারক জন নক্সের সমসাময়িক ছিলেন। রাণী মেরীর অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে ইঁহারা উভয়েই দাঁড়াইয়াছিলেন—ইঁহারা অত্যাচার নিবারণ ও প্রজার স্বত্বরক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া স্কটল্যাণ্ডের অনেক আইনকানুন পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেইজন্য কৃতজ্ঞ দেশবাসী এই স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছে। ইহারাই কর্ম্মীর সম্মানরক্ষা করিতে জানে বটে।*

কাস্তে হাতে পাদ্রী সাহেবের সঙ্গে কথা কহিয়া, তাঁহার মুখে বিশুদ্ধ ল্যাটিন ভাষায় শাস্ত্রকথা শুনিয়া আমাদের সেকালের গ্রামের কাস্তে হাতে অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা স্বতঃই মনে পড়িল। এ শ্রেণীর সাবেকী লোক এখানেও ক্রমে হ্রাস পাইতেছে।

৪ঠা জুলাই, সোমবার

এতদিনে ইউনিভার্সিটী ও কলেজ পরিদর্শনকার্য্য সমাপ্ত হইল। এইবার ইউনিভার্সিটী কংগ্রেসের

---

* এ দেশে আজ পর্য্যন্ত এমন কোনও সহর এমন কোনও নগর অথবা এমন কোনও ক্ষুদ্র গ্রামও দেখিলাম না যেখানে কোন না কোন বীর অথবা কর্ম্মীর প্রস্তরমূর্ত্তি কিংবা স্মরণচিহ্ন স্থাপিত না হইয়াছে।

অধিবেশনের পর লণ্ডনে বসিয়া বাকী কার্য্য শেষ করিতে হইবে।

রাত্রের ট্রেণে গ্লাসগো হইতে লণ্ডনে ফিরিলাম। বিশ্রামের সুবিধা হইবে বলিয়া স্লিপিং কারে আসার জন্য ন্যায্য ভাড়া অপেক্ষা পনর শিলিং বেশী দিতে হইল। কিন্তু এই বেশী দিয়া সুবিধা অনেক। প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র শয্যা, স্বতন্ত্র বসিবার স্থান, এক প্রস্থ করিয়া পৃথক বিছানা। জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিবার যথেষ্ট যায়গা। স্নানের ঘর সেই কামরারই সংলগ্ন। রাত্রে বেশ সুনিদ্রাই হইল। সকালেই গার্ডসাহেব নিদ্রাভঙ্গ করিয়া চা বিস্কুট ও কাপড় ছাড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গেল। এমনই চমৎকার বন্দোবস্ত! তাহার বক্‌সীশ মাত্র এক শিলিং। ভারতবর্ষের "নবাবপুত্র" গার্ডসাহেবদিগের সহিত ইহাদের তুলনাই হইতে পারে না। যথা লণ্ডনের পুলিসম্যান ও কলিকাতার "পাহারাওয়ালা।"—রাত্রে বেশ বৃষ্টি হইয়াছিল শুনিলাম। কিছুমাত্র টের পাই নাই। অতএব সুনিদ্রার স্বতন্ত্র সার্টিফিকেট বা সাক্ষ্যের প্রয়োজন হইবে না। ১৪০ দিন অনাবৃষ্টি—কাগজে লিখিতেছে যে ১০০ বৎসর এরূপ অনাবৃষ্টি হয় নাই—চারিদিকে বিশেষতঃ চাষীমহলে হাহাকার পড়িয়াছিল। এ সময় বৃষ্টি হইয়া কতক রক্ষা হইল। তাহার উপর কয়লা কুলীর ধর্ম্মঘটে ব্যাপার আরও গুরুতর হইয়াছিল। তাহাও এক প্রকার মিটিয়াছে। দশ কোটী টাকা সরকারী তহবিল হইতে সেলামী লইয়া কয়লা কুলীর মজুরেরা ও মনিবেরা তাহাদের বিবাদ আপাততঃ মিটাইয়াছে—অর্থাৎ কয়লার ন্যায্য দামের উপর সাধারণকে আরও দশ কোটী টাকা কয়লার দামই হউক দণ্ডই হউক দিতে হইল।

লর্ড লিভার হিউম তাঁহার বাটীতে এক সপ্তাহ বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। লিভার ব্রাদার নামে সাবানওয়ালা কোম্পানীর ইনি প্রধান ব্যক্তি। অতি সজ্জন ও গুণগ্রাহী—অগাধ ধন সম্পত্তি—অথচ অতি অমায়িক সাধাসিধা ধরণের লোক। সদ্‌ব্যয়ও যথেষ্ট করেন। বাড়ীখানি চমৎকার সাজান—নূতন পুরাতন শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণের উচ্চশ্রেণীর অনেক ছবি ও প্রস্তর মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া ইনি ইঁহার চিত্রশালা বাগানবাড়ী সাজাইয়াছেন। বিপত্নীক ধনকুবের এই সকল খেয়ালে অবসরকাল কাটান। আট বৎসর স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে—স্ত্রীর প্রস্তর মূর্ত্তি নিত্য নূতন পত্রপুষ্পে সজ্জিত করেন। বাগানের সাজসজ্জা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। বাগানটী ঠিক হ্যাম্পষ্টেড হিথের উপর বলিয়া শোভা আরও বাড়িয়াছে। বাগানের পরই ক্রোশের পর ক্রোশ অপূর্ব্ব দৃশ্য—হ্যাম্পষ্টেড হিথ। চমৎকার স্বাস্থ্যকর স্থান।

তাঁহার অপূর্ব্ব আতিথ্য সৎকারে মোহিত হইলাম। কিঞ্চিৎ বধির বলিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কিছু অসুবিধা হয়। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভাত—যে লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে পি-এইচ, ডি পড়িতেছে—সংবাদ পাইয়া আমার সহিত দেখা করিতে আসিল। লর্ড মহোদয় অমায়িক ব্যবহারে তাহাকেও বিশেষ যত্ন করিয়া আহার করাইলেন। নিজে মোটরে করিয়া আমাদের রিচমণ্ড পার্ক, কিউ গার্ডেন্‌স্ প্রভৃতি স্থানে বেড়াইয়া লইয়া আসিলেন। বধিরতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তাঁহার শিল্পানুরাগ বিশেষ প্রশংসনীয়। ইনি early to bed and early to rise makes a man healthy wealthy and wise নীতির বিশেষ পক্ষপাতী। অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক হইয়াও প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া, যৎসামান্য আহারান্তে, আপিসে উপস্থিত হইয়া সমস্ত দিন রীতিমত কাজকর্ম্ম করেন।

৬ই জুলাই, বুধবার

স্যর শঙ্কর নায়ার, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সাজাদা মহম্মদ আপ্‌তাব প্রভৃতি কৌন্সিলের মেম্বর ও অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত দেখা করিয়া কংগ্রেস ও কমিটি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বাকী কাজ শেষ করিয়া, বেলা ৯টার সময় স্যাভয় হোটেলে সম্রাট্‌ প্রদত্ত মহাভোজে যাইলাম। এবারের ভোজটা যেন অনেকটা "মুদিখানায় খাবার বরাৎ" দিবার মতই বোধ হইল। এবার ইউনিভার্সিটী

কংগ্রেস উপলক্ষে সব ব্যাপারই এইরূপ দেখিতেছি! গতবারে প্রতিনিধিগণকে কোনও না কোনও ইউনিভার্সিটী ডিগ্রী দিয়া সম্মানিত করিয়াছিল। এবার সে সকল ব্যবস্থার কথা শুনিতেছি না। গতবার ডিউক অব্ কনটের পুত্র প্রিন্স আর্থার অব্ কনট ভোজ সভার সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া তবু কতকটা মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। এবারে রাজবংশের জনপ্রাণী উপস্থিত নাই। কেবল রাজাধিরাজের নামে ভোজ এইমাত্র। দেশের লোক আসিলে সরকারী খরচায় ময়রাবাড়ী জল খাইবার বরাতের মত কতকটা দাঁড়াইল।

গবর্ণমেণ্টের পক্ষে মিষ্টার আর্থার ব্যালফুর সভাপতি রূপে ভিন্নদেশের প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করিয়া বক্তৃতা করিলেন। কিন্তু উহা তেমন জমিল না। কংগ্রেস সম্বন্ধীয় উৎসবে আজ আমি এই প্রথম উপস্থিত। লিটন-কমিটির কাজের জন্য লণ্ডনের কোন কংগ্রেস উৎসবেই উপস্থিত হইতে পারি নাই।

স্যর নীলরতন সরকার, শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রামান প্রভৃতি কলিকাতা ইউনিভারসিটীর অপর প্রতিনিধিগণের সহিত দেখা হইল। গতবারের কংগ্রেসে বিদেশী ইউনিভারসিটীর ভাইস্ চ্যানসেলার ও অধ্যাপক যাঁহাদের সহিত পরিচয় হইয়াছিল তাঁহাদের সহিত আবার দেখা হওয়াতে যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

স্যর মাইকেল স্যাডলার এবং গ্লাসগো, এডিনবরা, লিভারপুল, নিউক্যাসেল, বার্মিংহ্যাম প্রভৃতি ইউনিভারসিটির অধ্যক্ষগণের সঙ্গে পুনরায় দেখা শুনা হইল।

সন্ধ্যার পর আহারান্তে লর্ড লিভার হিউমের ভগিনী ভাগিনেয়ী প্রভৃতির সহিত ভারত সাহিত্য ও শাস্ত্রকথা সম্বন্ধে নানা আলোচনা হইল। তাঁহারা শিক্ষিত ও রসগ্রাহী হইয়াও এসকল বিষয়ের বিশেষ কোন সংবাদই রাখেন না। ইহা অতি আশ্চর্য্য বোধ হইল। ভারত কথা শুনিবার ও আলোচনা করিবার সুযোগ ও সুবিধা পান নাই বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়াছে। এদিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক মনে হয়।

অক্সফোর্ড—৮ই জুলাই, শুক্রবার

কংগ্রেস অব্ দি ইউনিভারসিটিজ্ অব্ দি এম্পায়ারের অধিবেশন উপলক্ষে পুনরায় এখানে আসিতে হইয়াছে।

এইবার লইয়া অক্সফোর্ডে তিনবার আসা হইল।

ধর্ম্ম মাহাত্ম্য ও সময়ে সময়ে অধর্ম্ম মাহাত্ম্য অক্সফোর্ডের নিজস্ব। কত শত বর্ষ ধরিয়া অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ ইংলণ্ডের ধর্ম্মজীবন কর্ম্মজীবন ও চিন্তাস্রোত উজ্জ্বল ও মলিন করিয়াছে তাহা বলা যায় না। গ্রেট বৃটেন ও ব্রিটিশ জাতির জীবনের ইতিহাস ইহার প্রতি ধূলিকণায় জড়িত। তিন বার কেন, তিন শত বার আসিয়াও এই সকল স্থানের যথার্থ মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা যায় না। Home of many a lost cause অক্সফোর্ডের সুখ্যাতি ও অখ্যাতি। যখন কোনও নূতন ভাবস্রোত সুপথেই হউক বা কুপথেই হউক প্রবাহিত হইয়াছে, অক্সফোর্ড তাহার পূর্ণমাত্রায় অংশ দাবী করিয়াছে। ধর্ম্মের নামে নরহত্যাতে যেমন নিপুণতা দেখাইয়াছে, আবার ধর্ম্মের যথার্থ ভিত্তি স্থাপনেও সেই নিপুণতার পরিচয় দিয়াছে।

গতবারে এই ইউনিভার্সিটিজ্ কংগ্রেস দশ বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডনে হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ সেবার লণ্ডনে নিজের নিজের বন্দোবস্তেই ছিলেন। লণ্ডনে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিদ্যালয় পরিদর্শন, পার্টি ভোজ প্রভৃতি সমারোহেই হইয়াছিল এবং কংগ্রেসের অধিবেশন সাউথ কেনসিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শন কার্য্য কংগ্রেসের পূর্ব্বে ও পরে হইয়াছিল।

এবারেও সাধারণ প্রণালী তাহাই। লণ্ডনের পরিবর্ত্তে এদেশের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ডে অধিবেশনের ব্যবস্থা হইয়া ভালই হইয়াছে। অন্যান্য প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিনিধিগণের যেমন অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়াছিল, লণ্ডনও তেমনই করিয়াছিল। কিন্তু এবার সবই যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হইতেছে।

একজ্যামিনেশন হল নামক প্রকাণ্ড ঘরে কংগ্রেসের অধিবেশনের স্থান হইয়াছে। দুই বেলাই স্বতন্ত্র সভাপতির কর্ত্তৃত্বে চারি দিন অধিবেশন হইল। লর্ড কর্জ্জন, মিঃ আর্থার ব্যালফোর, লর্ড হ্যালডেন, লর্ড রবার্ট সিসিল, লর্ড ক্রু এবং লর্ড কেনন সভাপতি ছিলেন।

নানা কারণে এবার কংগ্রেসের কাজ সুবিধামত হইল না বলিয়াই সকলের ধারণা। আসল কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আতিথ্যেরও বিস্তর ত্রুটী হইয়াছিল। সভাপতিদের এবং যে সকল বক্তাগণ লিখিত অথবা মুদ্রিত বক্তৃতা পাঠ করিলেন তাঁহাদের যাহা হয় এক রকম হইল। কিন্তু যাঁহারা উপস্থিতমতে বক্তৃতা করিলেন, তাঁহারা—এক স্যর মাইকেল স্যাডলার ব্যতীত—কেহই বড় বিধা করিতে পারিলেন না। বরং মোটের উপর ভারতীয় প্রতিনিধিগণ এ বিষয়ে সাফল্য লাভ করিলেন। সময়ের অল্পতার জন্য ভাল করিয়া সকল কথার আলোচনাও হইল না। কার্য্য বিভাগ করিয়া বিশেষ কথার বিশেষ আলোচনার ব্যবস্থা না হইলে অন্যান্য কংগ্রেস ও সম্মিলনীর মত বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেসও ক্রমশঃ কেবল নামেই গিয়া দাঁড়াইবে।

এবার প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে বৈদেশিক ইউনিভারসিটির মাত্র প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস্ চ্যান্সেলারদিগকে কয়েকটি ইউনিভারসিটি সম্মানসূচক "ডাক্তার" ডিগ্রী প্রদান করিলেন। এই সূত্রে স্যর নীলরতন সরকার কলিকাতা ইউনিভারসিটির ভূতপূর্ব্ব ভাইসচ্যান্সেলার বলিয়া অক্সফোর্ড ও এডিনবরা হইতে সম্মানিত হইলেন। ইহা আমাদের বিশেষ গৌরব ও আনন্দের কথা। গতবারে বর্ত্তমান লেখক স্কটল্যাণ্ডের দুইটি ইউনিভার্সিটী কর্ত্তৃক এইরূপে সম্মানিত হইয়া ধন্য হইয়াছিল।

আর্শ্মিহান গেলারী ও উড্হাম কলেজে প্রতিনিধিগণের সম্মানার্থে প্রীতি সম্মিলন হইল। ব্যালিয়ল কলেজে এড়ুকেশন মিনিষ্টার মিঃ ফিসার্ শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। সেদিন লায়ন সাহেবের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার হেডিংটন হিলের বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। হেডিংটন হিল হইতে অক্সফোর্ডের দূর দৃশ্য বড় সুন্দর। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর টার্ণার তদানীন্তন অক্সফোর্ডের চিত্র Oxford from the Headington Hill সুন্দর আঁকিয়াছিলেন; ম্যাঞ্চেষ্টার আর্ট গ্যালারীতে উহা সযত্নে রক্ষিত আছে। সেণ্ট হিলডাস্ নামক মহিলা কলেজেও একদিন পার্টি হইল। এই কলেজের সুন্দর বাগানের নীচেই "চার্" অথবা চারওয়েল নদী টেমস নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া পৌরাণিক নাম পাইয়াছে "আইসিস্"। কেম্ব্রিজের নদীর নাম "ক্যাম"। এই দুই নদী দুই প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌষ্ঠব ও গৌরব যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছে। সংকীর্ণ এই খালতুল্য নদীতেই অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের জগৎপ্রসিদ্ধ নৌকার বাচ খেলা হয়। যদিও কেম্ব্রিজে College Backsএর মত সুন্দর খিড়কীর বাগান অক্সফোর্ডে নাই, কিন্তু ক্রাইষ্ট, মডলেন, সেণ্ট হিলডাস্ প্রভৃতি কলেজগুলি আইসিস্ নদীর উপর হইয়া এখানের প্রাকৃতিক দৃশ্যও চমৎকার। দাঁড়টানা, লগী ঠেলার ধুম খুব। বড় বড় বজরায় আফিসও হয়। নৌকার বাচ খেলা লইয়া সকলেই উন্মত্তপ্রায়।

রসহীন শুষ্ক দৈনিন্দন কার্য্যের অবকাশে মাঝে মাঝে এই সব আমোদ আহ্লাদ উপলক্ষ করিয়া বড় বড় লোকের সহিত আলাপে কখন কখন স্থায়ী বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। Buxton নামক এক্সিটার কলেজের এক জন নৃতত্ত্ববিৎ অধ্যাপকের সহিত যাইয়া Pitt-Revers Museum নামক নৃতত্ত্ব বিদ্যা সম্বন্ধে যে অদ্ভুত সংগ্রহ এবং শিক্ষাদ্রব্য সম্ভার দেখিলাম, তাহা হইতে এক দিনে এত বিষয় জ্ঞানলাভ হইল যে এক বৎসরেও পুস্তক পড়িয়া তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। কংগ্রেসে আমার বক্তৃতার মধ্যে এই ভাবের কথাই ছিল। যাহাতে আমাদের ছাত্র ও শিক্ষকগণ আশ্রমতুল্য এইরূপ সারস্বত নিকেতনে সশ্রদ্ধ আতিথ্যলাভ করিতে পারে তাহারই চেষ্টা আমাদের কমিটি করিতেছেন। কংগ্রেসেও কাজে কাজেই আমাকে সেই কথারই আলোচনা বেশী করিতে হইল। বোধ হয় তাহাতে কিছু ফলও হইল।

লিটন কমিটির কাজের জন্য আমার স্বতন্ত্র করিয়া

সমস্ত ইউনিভারসিটিতে আবার যাওয়া হইবে না বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু কেম্ব্রিজের ভাইস-চ্যানসেলার ডাক্তার জাইলস্ সেকথা কোনও মতেই শুনিলেন না। বিশেষ আগ্রহ ও স্নেহের সহিত বলিলেন যে কেম্ব্রিজের সমস্ত উৎসবে আমাকে উপস্থিত থাকিতেই হইবে। নেহাত না পারিলে অন্ততঃ সোমবারের মহাভোজ পর্য্যন্ত থাকিতেই হইবে—তিনি কোনও কথাই শুনিবেন না। তাঁহার এ সাগ্রহ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না। অগত্যা কমিটির সোমবারের অধিবেশনে অনুপস্থিত হইতে হইল। পূর্ব্বে স্থির ছিল না যে সোমবার লর্ড হ্যালডেনের সাক্ষ্য হইবে। তাঁহার সাক্ষ্যের দিন যেমন করিয়া হউক উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। ওদিকে আবার সোমবার সন্ধ্যার সময় কার্লটন্ হোটেলে Peace Conferenceএ ভারতের ও উপনিবেশের প্রতিনিধিগণকে যে ভোজ দেওয়া হইল তাহাতেও উপস্থিত হইতে পারিলাম না। ইহাতেও বিশেষ ক্ষতি হইল। কারণ উপনিবেশ ও ভারত (Colonies and India) সম্বন্ধে যে মহা সমস্যা উঠিয়াছে তৎসম্বন্ধে উপনিবেশ-প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনার বিশেষ একটা সুবিধা হারাইলাম। সময়ের অল্পতার জন্য এবং সময়ে সময়ে সাগ্রহ নির্ব্বন্ধ এড়াইতে না পারিয়া অনেক সময়ে এইরূপ কর্ত্তব্যচ্যুতি হয়।

উপনিবেশবাসিগণ ভারতবাসীদিগকে কেবল দেশেই নির্য্যাতন করে শুধু তাহাই নয়; ইংলণ্ডের ইউনিভারসিটিগুলিতেও তাহাদের প্রতাপ ও প্রভাব এত বেশী যে ভারতীয় ছাত্রগণ এখানেও তাহাদের দ্বারা নির্য্যাতিত হয়। এখানের বহু অধ্যাপক ও স্থানীয় ছাত্র এই প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া নিগ্রো ও ভারতবাসীর তারতম্য সময়ে সময়ে দেখিতে পায় না। উপনিবেশবাসী আমেরিকান ও ফ্রেঞ্চ ছাত্রগণকে ভারতীয় ছাত্রগণ অপেক্ষা অধিক সুবিধা দেওয়া হয়। কংগ্রেসে সেদিন একজন আমেরিকান প্রতিনিধি বলিলেন যে উপনিবেশ ফ্রান্স ও আমেরিকার ছাত্রগণকে ব্রিটীশভাবে ব্রিটীশ ইউনিভারসিটির দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া দিতে পারিলে সেই সকল ছাত্র উক্ত দেশে ব্রিটীশ বন্ধু হইয়া বৃটেনের বহুতর মঙ্গল সাধিত করিতে পারিবে।

কংগ্রেসে আমার বক্তৃতায় আমি এই শ্রেণীর কথার উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার বক্তব্য অতি অল্প কথায় শেষ করিতে হইয়াছিল; কারণ বক্তা-বাহুল্যের জন্য পাঁচ মিনিটের অধিক কাহারও বলিবার অধিকার ছিল না। সভা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে প্রায় পনর মিনিট বলিতে দিয়াছিলেন। সেই জন্য কথাটা একটু বিস্তারিত ভাবেই বলিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। ভারতবাসিগণের মধ্যেও ব্রিটীশ বন্ধু থাকিবার প্রয়োজন যথেষ্ট আছে—শুধু আমেরিকা ফ্রান্স ও উপনিবেশে ব্রিটীশ বন্ধু থাকিলেই হইবে না—অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আমার ইহাও প্রতিপাদ্য ছিল।

অক্সফোর্ডের কলেজ, মিউজিয়াম, আর্ট গেলারী প্রভৃতি পুনরায় বেড়াইয়া গতবারের অপেক্ষা অনেক অধিক দেখিলাম ও শিখিলাম। বডলিয়ান লাইব্রেরী পূর্ব্বে ভাল করিয়া দেখিবার অবকাশ পাই নাই—এবার পুস্তক সংগ্রহ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। প্রথম চার্লসের পতনের ইতিহাসের সহিত বডলিয়ান লাইব্রেরীর একটী ঘর বিশেষভাবে সম্বদ্ধ। এইখানেই চার্লস পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া নিজের বিপদের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে অক্সফোর্ডের কলেজগুলি অত্যন্ত ধনী ছিল—তাহাদের ধনরত্ন রাজার বিপদে অকাতরে ঢালিয়া দিয়া ক্রমওয়েলের নিকট নানারূপে বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল। এই লাইব্রেরীতে প্রায় দুই কোটী পুস্তক আছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ৫ কোটী পুস্তক আছে শুনা যায়। এখানে কলিকাতা ক্যাথিড্রালের একটি সুন্দর আদর্শ রক্ষিত রহিয়াছে। এই লাইব্রেরীতে বহু ছাত্র ও অধ্যাপক প্রত্যহ বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে গবেষণা ও অধ্যয়নে নিযুক্ত আছেন।

৯ই জুলাই, শনিবার

ভাইসচ্যান্সেলার মহাশয়ের সাগ্রহ নিমন্ত্রণ রক্ষার

জন্য। আজ বেলা ১টার গাড়ীতে অক্সফোর্ড হইতে কেম্ব্রিজে যাত্রা করিলাম। পৌছিতে বেলা ৫॥০টা বাজিল। পথে গরমের সীমা ছিল না। নীলরতন বাবু, লেডি সরকার, মিঃ দাস গুপ্ত ও ডাক্তার প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত এক গাড়ীতে যাওয়াতে কথাবার্ত্তায় গরমের কষ্ট কতক উপশম হইল। কেম্ব্রিজ সেণ্ট পিটার্স কলেজে বাসা পাইলাম। রাত্রের ভোজের সময় অধ্যাপক ডড্‌লি ও বার্ণেশ্ প্রভৃতির সহিত আলাপে পরম আপ্যায়িত হইলাম। ভাইসচ্যান্সেলার ডাঃ জাইল্‌স এবং ইঁহাদের যত্ন ও আদরের সীমা নাই। রাত্রি ৯টার সময় ইমানুয়েল কলেজে ভাইসচ্যান্‌সেলারের সুন্দর বাগানে সান্ধ্য মিলনে বহু অধ্যাপক ও অধ্যক্ষের সহিত আলাপ হইল। মিসেস্ স্কট ভারতীয় ছাত্রদিগের প্রতি বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিতেছেন; তাঁহার সহিত দেখা হইয়া ভারতীয় ছাত্রসম্বন্ধে নানা কথা হইল। অধ্যাপক র‍্যাপ্‌সনের সহিত এদেশে ভারতবর্ষের ইতিহাস শিক্ষা প্রসারের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ও ভারতীয় অধ্যাপকগণের এখানে আসা সম্বন্ধে আলোচনা হইল। তিনিও স্বীকার করিলেন যে এখনও এখানকার জনসাধারণের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান অতীব সীমাবদ্ধ। ইহাতে উত্তরোত্তর উভয়পক্ষেরই ক্ষতি বই লাভ হইতেছে না। শীঘ্রই এ অবস্থার প্রতিকার করা নিতান্ত প্রয়োজন। উভয় জাতির মধ্যে যোগ্য ব্যক্তি দ্বারা পরস্পরের ভাব বিনিময় ব্যতীত অন্য উপায় নাই। স্যর আর্ণেষ্ট রদারফোর্ডের সঙ্গেও দেখা হইল। গতবারে ম্যানচেষ্টার ইউনিভারসিটিতে পরিচয় হইয়াছিল। রেডিয়ম সম্বন্ধে তিনি তখন বিশেষ আলোচনা করিতেছিলেন। এখন তিনি জগদ্‌বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। পুনরায় তাঁহার সহিত আলাপ ও আলোচনা করিয়া আনন্দিত হইলাম।

১১ই জুলাই, সোমবার

কাল ও আজ কেম্ব্রিজের ইউনিভারসিটি, কলেজ, লাইব্রেরী ও মিউজিয়ামগুলি আবার সমস্ত ঘুরিয়া দেখিলাম। প্রত্যেক বারই কত নূতন জিনিষ চোখে পড়িতেছে, কত নূতন শিক্ষা হইতেছে। বাস্তবিক এ সমস্ত স্থানে বার বার আসিয়া দেখিয়া মন যেন তৃপ্ত হইতে চাহে না। এখানকার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত দেখিয়া, মহাপ্রাণ উদারচেতা অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণের সহিত আলাপ করিয়া ইচ্ছা হয় যে আবার ছাত্রজীবন ফিরাইয়া আনিয়া কিছুকাল এই সকল সারস্বত পীঠে শিক্ষা সাধনা করি। এমনই স্থান মাহাত্ম্য!

আজ ভাইসচ্যান্সেলার মহোদয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণের অভ্যর্থনার জন্য এক বিশেষ ভোজ-সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। সেখানে প্রতিনিধিগণ ব্যতীত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ আহূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তায় আলোচনায় মহা আনন্দে সময় কাটিল। এই ভোজসভায় উপস্থিত থাকিবার জন্যই ডাঃ জাইল্‌স অত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমারও এই উপলক্ষে নূতন লোকের সহিত পরিচয়ে তাঁহাদের সহিত ভাবের আদান প্রদানে এবং নানা নূতন তথ্য শিক্ষা করিবার সুযোগ পাওয়ায় লাভ বই ক্ষতি হইল না।

কংগ্রেসের কার্য্য এবং তৎসংক্রান্ত উৎসবাদির পালা শেষ করিয়া এইবার লণ্ডনে ফিরিয়া আমাদের কমিটীর কার্য্যের ছিন্নসূত্রের পুনরায় অনুসরণ করিতে হইবে। কত দিনে একার্য্য শেষ হইবে কে জানে?

লণ্ডন—১৯শে জুলাই, মঙ্গলবার

২৮শে এপ্রিল বাড়ী ছাড়িয়াছি। অতএব প্রায় তিন মাস হইতে চলিল এখানে আসা হইয়াছে। কিন্তু এখনও কাজ শেষ হওয়া দূরে থাক, আরম্ভের সূচনা পর্য্যন্ত দেখিতেছি না। কাজের সুবিধাও কিছু দেখিতে পাইতেছি না। আমাদের কমিটি ভারতবর্ষে যাইবে কি না সে বিষয়ে মতভেদ যথেষ্ট রহিয়াছে। মেম্বরদের নিজেদের মধ্যে মতভেদ, বড়লাট ও তস্য কৌন্‌সেল, সেক্রেটারী অব ষ্টেট ও তস্য কৌনসেল সকলের মধ্যেই মতভেদ রহিয়াছে। যদি কমিটীর ভারতবর্ষে না যাওয়া স্থির হয়, তাহা হইলে বিস্তৃতভাবে যে সমস্ত কাজের আরম্ভ হইয়াছে তাহার শেষ কোথায় হইবে তাহাও

বোঝা যাইতেছে না। কমিটীর অধিবেশন স্থানের নিকট হইবে এবং নানা বিষয়ে সুবিধা হইতে পারে মনে করিয়া ন্যাসন্যাল লিবারেল ক্লাবে থাকাই স্থির করিলাম। কারণ হোটেলে বাস আর ভাল লাগিতেছে না। কোনও ভদ্র গৃহস্থ পরিবারে থাকার প্রস্তাব দুই একটা হইয়াছিল। তাহাও আমার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক নহে। কারণ হোটেলে নিজের ইচ্ছামত কাপড় পড়িয়া নিজের ঘরে চুপ করিয়া শুইয়া থাকিবার অধিকার অন্ততঃ আছে। কিন্তু গৃহস্থ বাড়ীতে সে অধিকার নাই। ইচ্ছা থাক আর না থাক আহারের বৈঠকে সর্ব্বদা যথোচিত বেশভূষা করিয়া উপস্থিত থাকা আবশ্যক। কারণ ইহাই এখানের ভদ্ররীতি। আমার পক্ষে এখন এসব করা অসম্ভব; অনেক চিন্তার পর কতকটা স্বাধীনভাবে থাকিতে পারিব বলিয়া ন্যাসন্যাল লিবারেল ক্লাবের মেম্বর হইয়া সেখানেই থাকা স্থির করিয়াছি।

আজকাল অত্যন্ত গরম বোধ হইতেছে। বিলাতে এমন সময় এমন প্রচণ্ড গ্রীষ্ম কখনও হয় নাই। তাহার উপরে গরম কাপড় পরিয়া ক্লাবের ছোট ঘরে সাসী আঁটা জানালার জন্য একটুও হাওয়া না পাইয়া বিষম কষ্ট হইতেছে। আমাদের কমিটি ঘরে ইলেক্‌ট্রিক পাখার ও বরফের বন্দোবস্ত করিয়া তবে নিস্তার পাওয়া গিয়াছিল। গরমের দরুণ সর্দ্দির আবির্ভাবেও যথেষ্ট কষ্ট দিতেছে।

বেলা ১১টা হইতে ৪॥০টা পর্য্যন্ত ৪২ নং গ্রোভনার গার্ডেন হাই কমিশনর আফিসে কমিটির বৈঠক হইতেছে।

ইহার মধ্যে শনিবারে কাজ একেবারে বন্ধ ছিল; বৃহস্পতিবার শুক্রবারও এক বেলা বই কাজ হয় নাই। এই অবকাশে লণ্ডনের কতক কতক দেখাশুনা আবার হইয়াছে। লর্ড ক্লুইড (যিনি পূর্ব্বে স্যর হারবার্ট রবার্টস্ ছিলেন) বিলাতের মাদকতা নিবারিণী সভার সভাপতি এবং এ কার্য্যে একজন প্রধান অগ্রণী। বর্ত্তমান লেখক কলিকাতা মাদকতা নিবারিণী সভার সভাপতি। এই সূত্রে তাঁহার সহিত পূর্ব্ব হইতে যথেষ্ট আলাপ পরিচয় ছিল। তিনি ভারতবর্ষেও মাদকতা নিবারণ চেষ্টায় বিশেষ উদ্যোগী ও যত্নবান। আমরা তাঁহার নিকট হইতে এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। গত রবিবার তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী ও তিনি, আত্মীয়তা ও যত্নের চূড়ান্ত করিলেন। এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টের পার্লিয়ামেণ্টারি আণ্ডার-সেক্রেটারী মিঃ লিণ্ড্‌সের সহিত সেখানে পুনরায় সাক্ষাৎ হইল। ইনিও ভারতবর্ষে মাদকতা নিবারণের চেষ্টায় বিশেষ যত্নবান। সে সম্বন্ধে অতি বিস্তারিত আলোচনা হইল। সেই দিনই বৈকালে এই সভার সম্পাদক ফ্রেডরিক গ্রবের বাটীতে চায়ের নিমন্ত্রণে যাইয়া আমেরিকার প্রসিদ্ধ মাদক নিবারিণী কার্য্যের অনুষ্ঠাতা "পুসিফুট" জনসনের সহিত পরিচয় হইল। ইনি লণ্ডনের ছাত্রদিগের দুর্দ্দান্ত ব্যবহারে একটা চক্ষু হারাইয়াছেন। এখানেও স্বদেশে বহুপ্রকারে লাঞ্ছিত হইয়াছেন। তথাপি এক দিনের জন্য কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত হন নাই। বরং আরও অধিক তেজের সহিত নিজের কায করিয়া যাইতেছেন। শীঘ্রই তিনি ভারতবর্ষে যাইবেন। তাঁহাকে প্রয়োজনীয় কথা বুঝাইয়া দিবার জন্যই এই দেখাশুনার কথাবার্ত্তার আয়োজন হইয়াছিল। বড় দুঃখের বিষয় আমি তাঁহার কলিকাতায় যাইবার সময় উপস্থিত থাকিতে পারিব না। কমিটির কাজ হইতে কতদিনে রেহাই পাইব জানি না।

সোমবারে সেক্সপিয়ার হাটে একটি সম্মিলনীর আয়োজন হইয়াছিল। সেখানে এবারও বিস্তর ছাত্রের সহিত দেখাশুনা ও আলাপ পরিচয় হইল। পুরা স্বদেশী ধরণের জলযোগের আয়োজন ছিল। মিসেস্ বেসান্ত রিফরম্‌স্ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। তিনি ছাত্রগণকে বলিলেন যে অধীর হইয়া গোলযোগ করিয়া উপস্থিত ত্যাগ করা কোন মতেই উচিত নহে। যতদূর শাসন সংস্কার হইয়াছে তাহাকেই ভিত্তি করিয়া ভাবী উন্নতির

চেষ্টা করা উচিত। লর্ড লিটন সভাপতি ছিলেন। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়কে এইরূপ উপদেশ প্রদান উপলক্ষে পূর্ব্বে এই স্থানেই কোন কোন উষ্ণমস্তিষ্ক ছাত্র দুর্ব্বিনীতভাবে অপমানের চেষ্টা করিয়াছিল। এখন মিসেস বেসান্তের কথা ছাত্রেরা শান্তভাবে গ্রহণ করিল—ইহা শুভ চিহ্ন বলিতে হইবে।

এ কয়দিন গরম একটু কম হইয়াছে। মাঝে মাঝে মেঘলা ও অল্প বৃষ্টি হইয়া কিছু ঠাণ্ডা পড়িয়াছে।

সেদিন ইণ্ডিয়া আফিসে আমাদের ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট স্যর উইলিয়ম ডিউকের সহিত দেখা হইয়াছিল। সুরেশের ; অকাল মৃত্যুতে আত্মীয়জনোচিত শোক প্রকাশ করিলেন। আত্মসুখ বলিদান দিয়া প্রাণপণে শেষদিন পর্য্যন্ত দেশের কাজ নিঃশব্দে করিয়া সে চলিয়া গিয়াছে, স্যর উইলিয়ম মুক্তকণ্ঠে এ কথা স্বীকার করিলেন।

আজ কমিটীর কাজ শেষ হইবার পর লর্ড লিটন নিজে সঙ্গে করিয়া হাউস অব লর্ডস-এ লইয়া গিয়া নিজে তন্ন তন্ন করিয়া সব দেখাইলেন। গতবারে এই হাউস অব লর্ডস-এর কেবল ঘরের শোভাই দেখা হইয়াছিল, কারণ তখন সভার অধিবেশন স্থগিত ছিল। এবার লর্ড লীটনের অনুগ্রহে সভার অধিবেশন দেখিবার ও কার্য্যপ্রণালী বুঝিবার অবকাশ হইল। হাউস অব লর্ডস, হাউস অব কমন্স ও তৎসংলগ্ন Big Ben নামক প্রকাণ্ড ঘড়ি ও তাহার স্তম্ভ, নিকটস্থ ওয়েষ্ট মিনষ্টার এ্যাবি ও সেণ্ট মার্গারেটস্ চার্চ্চ এবং ব্রিজ হইতে পার্লামেণ্ট সংলগ্ন টেমস নদীর উপর বারান্দা দেখিতে বড় সুন্দর। ওয়েষ্ট মিনষ্টার হল—যেখানে প্রথম চার্লস, ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রভৃতির বিচার হইয়াছিল—মেরামতের জন্ত এখন বন্ধ। দেখা হইল না। ওয়েষ্টমিনষ্টার হল এবং ওয়েষ্টমিনষ্টার অ্যাবি দুইটিই অতি প্রাচীন হইয়াছে—জীর্ণ সংস্কার অভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। সেণ্ট পল্‌স ক্যাথিড্রেলও স্থানে স্থানে মেরামত অভাবে বিপদের কারণ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। সাধারণ প্রদত্ত চাঁদায় এ সকল মেরামতের বন্দোবস্ত হইতেছে। পার্লামেণ্টের প্রবেশ দ্বারের দেওয়ালের গায়ে দুই দিকে যে সকল সুন্দর ছবি রহিয়াছে তাহাও সাধারণ চাঁদায় হইয়াছে। এখানে সরকারী সাহায্যের উপর লোক অতি অল্প বিষয়ে নির্ভর করে।

হাউস অব লর্ডসের কমিটি ঘরটাকে Moses's Room বলে। কারণ বিলাতী মতে আইনের প্রথম প্রবর্ত্তয়িতা মোজেসের জীবনচরিত সম্পর্কীয় ঘটনাবলী এই ঘরের ভিত্তিগাত্রে চিত্রিত। Foreigner's gallery নামক সম্মান সূচক স্থানে গ্রেট লর্ড চেম্বারলেনের অনুগ্রহে আমার আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আয়রল্যাণ্ডের গোলযোগের পর পার্লামেণ্টের কোন স্থানেই এখন সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই।

রাজসিংহাসনের সম্মুখেই লাল কাপড় মোড়া লর্ড চান্সালারের তক্ত—লাল কাপড় মোড়া তাকিয়া তাঁহার পশ্চাতে। যদিও ইহাতে পশমের সম্পর্ক নাই তবুও এই সম্মানিত আসনের নাম Woolsack, তাহার উপর "সভাপতি" সমাসীন। কিন্তু তাঁহার সভাপতির ক্ষমতা বলিয়া বিশেষ কোনও ক্ষমতা নাই। হাউস অব কমন্সে স্পীকারের যেমন পদ—লর্ড চ্যান্সেলারের পদ ঠিক তাহা নহে। তাঁহার আসনের সম্মুখে যে ছোট কার্পেট পাতা আছে তাহা হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়া লর্ড চ্যানসেলার যথেচ্ছ বক্তৃতা করিতে পারেন। হাউস অব কমন্সের স্পীকারের ন্তায় তাঁহার মুখ বন্ধ নহে বটে। কিন্তু স্পীকারের ক্ষমতাও তাঁহার নাই। অগুকার সভায় লর্ড চ্যানসেলার বার্কেনহেড নিজের গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধেই মদ্যপান নিবারণ আইন সম্বন্ধে ঘোরতর বিতণ্ডা বাধাইলেন। অনেকটা সেই কারণেই আইন মঞ্জুর হইল না।

ক্রমশঃ

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

কাশ্মীর ভ্রমণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বাজার ছাড়াইতেই ঝেলমবক্ষে একটী সেতু। নদীমধ্যে অসংখ্য নৌকা। কোনখানি বা বৃহৎ House Boat, কোন খানি বা ক্ষুদ্র, আর বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র নৌকা ইতস্তত চলিতেছে। বাজারে সারি সারি দ্রব্যসম্ভার—তরিতরকারী—আর বিশেষত রক্তবর্ণ সেওএর দোকান। আরক্তগণ্ডা বালিকারা ছুটাছুটি করিতেছে। কোন্ দিকে তাকাইব স্থির করিতে পারিতেছিলাম না।

বেলা প্রায় ১২টা, কিছু দেখিবার বা উপভোগ করিবার সময় ছিল না। গন্তব্য স্থানের কোন সন্ধান করিতে না পারিয়া একেবারে রাজাসাহেবের টাঁকিপুরার আফিসে উপস্থিত হইলাম। সেখান হইতে একটী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বিশেষ ভদ্রতা করিয়া আমার সহিত একটী লোক দিলেন। লোকটী 'পণ্ডিত' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। কুলীকে সঙ্গে লইয়া আমরা আবার নদীর তীরে পৌছিয়া একখানি অতিক্ষুদ্র নৌকা সহযোগে অপর পারে পৌছিলাম। এই নৌকাগুলির নাম 'শিকারা'। ১২টার বাসায় পৌছিলাম। পথের উত্তর পার্শ্বে সুন্দর সফেদা বৃক্ষের সারি—পথের ধারেই বাসা। রাশীকৃত French pear (ফরাসী পেয়ারা) ও দুগ্ধ সহযোগে জলযোগ, তার পর আহার ও বিশ্রাম। আজ আর বাহির হইব না।

শ্রীনগরের এক প্রধান সৌন্দর্য্য এই সফেদা বৃক্ষশ্রেণী। বরমূলা হইতে শ্রীনগর ৩৬ মাইল রাস্তার দুই পার্শ্বেই এই সুন্দর বৃক্ষশ্রেণী। পরে জানিয়াছি এই সফেদার সারি আরও ৩৪ মাইল দূরে অনন্তনাগ

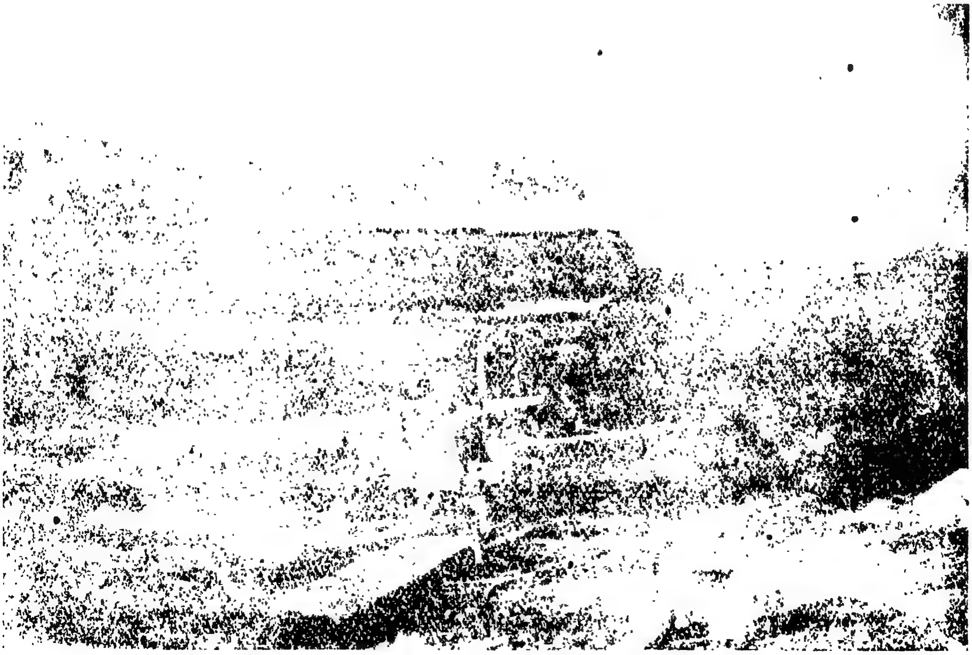

কাশ্মীরের হাউস বোট ও তৎসংলগ্ন কিচেন বোট

কাশ্মীরী হাঁজি (মাঝি)

বা ইস্‌লামাবাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং এরূপ একটী দ্বিতীয় রাস্তা পৃথিবীতে আর নাই।

এখানে এখন ফলের মরস্থম চলিয়া গিয়াছে। সে সময়ে বহুলোকে নাকি কেবল ফল খাইয়াই ২।৩ মাস কাল কাটাইয়া দেয়।

অপরাহ্ণকালে পায়চারী করিতে দেখিলাম, কয়েকটী নিম্নশ্রেণীর বালিকা ঘুঁটে তুলিতেছে। একবার ধোয়াইয়া পরিস্কার কাপড় পরাইলেই নিখুঁত সুন্দরী! এত বড় কম্পাউণ্ড ও বাগান যুক্ত বাড়ীর ভাড়া মাত্র ৬০৲ টাকা। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীনগরে বাড়ীঘর বড় একটা ছিল না; সমস্তই বাগান, আর আর প্রায় সমস্ত লোকই House boatএ বাস করিত। এখন অনেক বাড়ী হইয়াছে, তথাপি ঝেলম্ বক্ষে ছোট বড় প্রায় ৪০০০ House boat ও ডোঙ্গা আছে। বহু পরিবার বারোমাস তাহাতেই বসবাস করে।

শ্রীনগরের অধীবাসীদের শতকরা প্রায় ৮০ জন মুসলমান। বাকী সব ব্রাহ্মণ। মুসলমানেরা প্রায় সকলেই পূর্ব্বে হিন্দু ছিল। কিছুদিন পূর্ব্বেইও ব্রাহ্মণেরা মুসলমানদের জল ব্যবহার করিত। কারণ এক পরিবারেই এক ভ্রাতার বংশধরগণ মুসলমান, আবার হয়তো অন্য ভ্রাতার সন্তানগণ ব্রাহ্মণ। অধুনা ভেদ-নীতি আরম্ভ হইয়াছে।

রাত্রি পর্য্যন্ত আমার আত্মীয়ের বন্ধু 'প' বাবুর সহিত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় থাকিয়া, অবশেষে একটু ঘুরিয়া, নিকটেই কয়েকটী প্রবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিয়া বাসায় ফিরিলাম। ফিরিয়া দেখি তিনি আসিয়াছেন। অনেক আলোচনার পর কবে কেথায় যাওয়া হইবে বিবেচনা করিয়া রাত্রি ১১টায় শুইয়া পড়িলাম।

১৩ই অক্টোবর—সকাল বেলা উঠিয়া স্থির করিলাম যে একটু বেড়াইয়া আসিয়া আবার 'প' বাবুর সহিত তাঁহার কর্ম্মস্থান 'গুপ-কর' পাহাড়ের দিকে যাইব। সেখানে রাজাসাহেবের (বর্ত্তমান মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্র ও উত্তরাধিকারী) জন্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতেছে। কিন্তু সকালবেলা সকলের উঠিতে বিলম্ব হইয়া যাওয়াতে আর বাহির হওয়া হইল না।

আহারাদি করিয়া একখানি টঙ্গাতে আমরা উভয়ে গুপ-করের দিকে চলিলাম। একটু যাইয়া ফাঁকা রাস্তা, আর দুইপার্শ্বে সুন্দর সফেদা বৃক্ষশ্রেণী। আর একটু যাইয়াই ডানদিকে বিস্তৃত বাদামের বাগান। তাহার পরেই দূরে গুলমার্গ পর্ব্বতের তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গগুলি সূর্য্যকিরণে ঝল্‌মল্ করিতেছে। মাঝে মাঝে কাশ্মীরের আর এক প্রধান সৌন্দর্য্য—বিখ্যাত 'চেনার' বৃক্ষরাজি। কোথাও বা আপেল, আখ্‌রোট, আলুবাখারা, পিচ্, ন্যাসপাতি প্রভৃতির বাগান।

প্রায় দুই মাইল যাইয়া আমরা বাম পার্শ্বে একটী পাহাড় পাইলাম। এইটীই বিখ্যাত 'শঙ্করাচার্য্য পর্ব্বত'

পুরাতন ব্রিজ—শ্রীনগর

পর্ব্বতশৃঙ্গ শ্রীনগর হইতে প্রায় ১০০০ ফিট উচ্চ এবং সর্ব্বোচ্চ স্থানে একটী মন্দির। জনরব বৌদ্ধধর্ম্ম বিনাশ করিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য এখানে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে মুসলমানেরা যখন কাশ্মীরের প্রায় সমস্ত লোককে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করে, তখন সেই মন্দিরের অর্দ্ধাংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেয়। আবার যখন কাশ্মীরে হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনকার রাজা মন্দিরের ভগ্নাংশ সংস্কার করিয়া দেন। প্রবাদ এই যে মুসলমানেরা কাশ্মীরের সমস্ত হিন্দুকেই মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করে, কোনরূপে মাত্র এগার ঘর ব্রাহ্মণ জাতি রক্ষা করেন। বর্ত্তমান পণ্ডিতগণ তাহাদেরই বংশধর। সেই জন্যই কাশ্মীরে মুসলমান ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি নাই।

‘শঙ্করাচার্য্য’ পর্ব্বত ছাড়াইয়া আমরা আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌছিলাম। পাহাড়ের গা কাটিয়া রাজা সাহেবের জন্য একটি ক্ষুদ্র সহর প্রস্তত হইতেছে। সহস্রাধিক কুলী খাটিতেছে। কুলীরা সকলেই পুরুষ এবং মুসলমান। স্ত্রী কুলী এখানে নাই।

একটী উচ্চ স্থানে এক ছায়াবহুল চেনার বৃক্ষের তলদেশে দাঁড়াইয়া আমি চারিদিক দেখিতে লাগিলাম। চারিদিকেই পর্ব্বত। একদিকে দূরে ‘গুলমার্গ’ পর্ব্বতের তুষার শৃঙ্গ। আর একটু ঘুরিতেই মন্দিরশীর্ষ ‘শঙ্কর পর্ব্বত’ দৃষ্টি রোধ করিতেছে। আর একটু ঘুরিতেই ‘হরি পর্ব্বত’ মাথায় একটী দুর্গ লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পরেই ‘মানস বন’ ও গুপকরের অনুন্নত পর্ব্বতমালার অন্তরাল হইতে ‘মহাদেব’ পর্ব্বতের দুই একটি তুষার শৃঙ্গ অল্পমাত্র দেখা যাইতেছে। আর এই পর্ব্বত রাজির প্রাচীরের মধ্যে শ্রীনগরের সেই ভুবনবিখ্যাত ‘ডাল হ্রদ’ (Dal বা Dhai lake) এই হ্রদটি একটী বিস্তৃত বিল, আর মাঝে মাঝে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। দ্বীপের উপর ও হ্রদের চারি পার্শ্বে অগণিত সফেদা চেনার ইত্যাদি বৃক্ষশ্রেণী ও ফলের বাগান। অতি নির্জ্জন ও শান্তিপূর্ণ স্থান। এমন স্থানে প্রাসাদ নির্ম্মাণের ইচ্ছায় রাজা সাহেবের রুচির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। প্রাণ ভরিয়া এই সুন্দর শান্তিপূর্ণ দৃশ্য দেখিয়া লইলাম। চেনার ও সফেদা বৃক্ষের রং বদলান আরম্ভ হইয়াছে।

শীতের প্রারম্ভেই বৃক্ষরাজি হরিদ্রাভ হইয়া উঠে, ক্রমে রক্তবর্ণ হইয়া সমস্ত পাতা ঝরিয়া যায় এবং গাছগুলি বরফে ঢাকিয়া থাকে। বসন্তের প্রারম্ভে বরফ গলিয়া পুনরায় কচি কিশলয়ে সাজিয়া উঠে।

প্রতি ঋতুতে শ্রীনগরের সৌন্দর্য্য এই বৃক্ষরাজির বিভিন্ন সাজে বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং যেন প্রকৃতি দেবীকে নানা বিচিত্র বসনে ভূষণে সাজাইয়া সৌন্দর্য্য-পিপাসু ভ্রমণকারীকে তৃপ্ত করিয়া থাকেন। ফলতঃ সমস্ত বৎসর কাশ্মীরে না থাকিলে ইহার সমস্ত সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায় না। এখন ফুলের সময় নয়, যে মাসে নাকি সমস্ত কাশ্মীর একটী ফুলের বাগান হইয়া উঠে। গাছে, লতায়, মাঠে, পাহাড়ে, জলে, এমন কি ঘরের চালে—সর্ব্বত্রই ফুল। শরতে ফলের সৌন্দর্য্য, হেমন্তে বৃক্ষের সৌন্দর্য্য, শীতে বরফের সৌন্দর্য্য, আর বসন্তে সমস্তই সুন্দর। প্রায় এক ঘণ্টা দাঁড়াইয়া এই সুপ্ত সৌন্দর্য্য উপভোগ করিলাম। এখান হইতে ফিরিতে আর মন সরিতেছিল না।

"পরী-মহল"

কিছুতেই তৃপ্ত হইতেছিল না। মনে করিলাম একবার নিকটবর্ত্তী শঙ্কর পর্ব্বতে উঠিয়া স্বর্গের শোভা নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লই। বন্ধু নিম্নে একটী বাড়ীতে গিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন যে সকাল বেলা শঙ্কর পর্ব্বতে উঠিবার প্রশস্ত সময়—এখন রৌদ্রে অতিশয় কষ্ট হইবে। তাঁহার এক বন্ধু বলিলেন, "আমি আজ পরী মহলে যাইতেই ঘামিয়া গিয়াছিলাম।" নাম শুনিয়াই মন নাচিয়া উঠিল— 'পরী মহল' সে কি ? পরীরা কি সেখানে বসবাস করে ? তিনি অনতিদূরে গুপকর পর্ব্বতগাত্রে একটি অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "সম্রাট জাহাঙ্গীর ঐ মহল নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।" আমি তখনই উহা দেখিতে যাইবার প্রস্তাব করিলাম। বন্ধুর চাপরাসী ফল বাগানের ভিতর দিয়া আমাকে একটি সুন্দর রাস্তায় পৌছাইয়া দিয়া বলিয়া গেল, "সিধা জনাব"। আমি

"তৃতীয় ব্রিজ"—শ্রীনগর

সিধা চলিলাম। পাহাড় ও হ্রদের মধ্যে এই রাস্তা। দুই পাশেই ফলের বাগান ও সফেদা বৃক্ষের সারি। খানিকদূর গিয়া দেখি বাগানে ন্যাসপাতি ও আপেলের স্তূপ করিয়া রাখিয়াছে। সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত। আর একটু যাইয়া আমি একটি ক্ষুদ্র বস্তির ভিতর ঢুকিয়া পড়িলাম। কেবল ফলের বাগান, আর তাহার মধ্যে কৃষকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর। একটী ছোট বালিকাকে দেখিয়া, হিন্দিতে পাহাড়ে যাইবার রাস্তা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে যে উত্তর দিল তাহাতে অনুমান করিলাম যে সোজা যাইতে হইবে। ভাষাটা যেন অনেকটা হিন্দিরই মত।

প্রায় এক মাইল যাইয়া পাহাড়ের পাদদেশে পৌছিলাম। এখন রাস্তা প্রস্তরপূর্ণ। ক্রমেই উপরে উঠিতেছি, পাশ দিয়া ঝর ঝর করিয়া ঝরণা বহিয়া যাইতেছে। পাহাড়ের উপর কাহার যেন কণ্ঠস্বর শুনিলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। পরীরা তো খেলা করিতেছে না? একটু বিশ্রাম করিয়া আবার উঠিতে লাগিলাম। প্রখর রৌদ্রে গা ঘামিয়া উঠিতেছিল। আর একটু উঠিয়া দেখি, পাহাড়ের গায়ে এক দল ভেড়া চড়িতেছে। তাহাদের রাখালদের কথাই আমার কানে গিয়াছিল। মেষপালক আমাকে দেখিয়া 'সেলাম সাহেব' বলিয়া অভিবাদন করিল। আমি তাহার নিকট একটী সংক্ষিপ্ত রাস্তা দেখিয়া লইয়া অতি কষ্টে ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিলাম। বহুদিন পরে পাহাড়ে উঠিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম।

পাহাড়ের গায়ে জংলী গোলাপ এবং নানা লতাগুল্ম ও কাঁটা গাছ। অবশেষে পরী মহলের দরজায় পৌছিলাম এবং ধীরে ধীরে সর্ব্বোচ্চ স্তরে উঠিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

অতি নির্জ্জন স্থান। প্রকাণ্ড পাহাড়ের গা কাটিয়া স্তরে স্তরে এই বিরাট মহল পাথর দিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখন অনেক যায়গায় ছাদ পড়িয়া গিয়াছে। সমস্ত বাড়ীটাই প্রায় জঙ্গলে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। বসিয়া নিম্নে বিস্তৃত ডাল হ্রদের উপর ভাসমান উদ্যান ও ক্ষুদ্র মোটর বোটের যাতায়াত লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। চারিদিকে উন্নত পর্ব্বতমালা বেষ্টিত এই মনোরম উপত্যকা এখান হইতে বেশ দেখাইতেছে। অনতিদূরে শ্রীনগরের বাড়ীঘরগুলি ম্যাপে আঁকা বলিয়া বোধ হইতেছে।

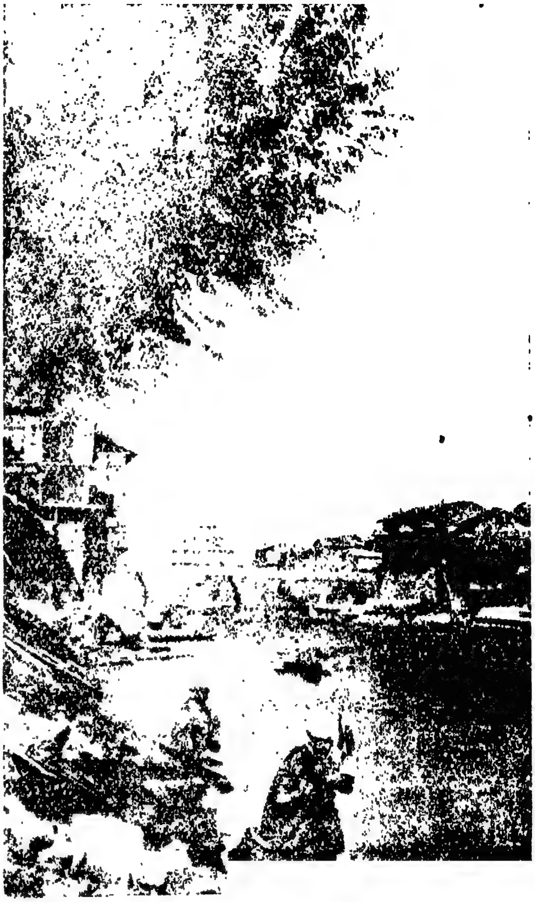
নদী হইতে শ্রীনগর দৃশ্য

ভগ্নস্তূপে অনেক নাম দেখিয়া, নিজেও নাম তারিখ লিখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। মোগল সম্রাট! তোমার সাধের পরী মহলও আজ তোমারই সহযাত্রী হইতে বসিয়াছে।

জগতের নশ্বরত্ব ভাবিয়া অন্যমনস্ক ভাবে ডাল

পণ্ডিত

হ্রদের দিকে চাহিয়া আছি, হঠাৎ পিছন দিকে একটা শব্দ শুনিয়া গা কাঁটা দিয়া উঠিল। পরী হয়তো নাই, কিন্তু বন্যজন্তু তো থাকিতে পারে! উঠিয়া পিছন ফিরিতেই দেখি যে, পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে একটী জীবন্ত পরী ডানা মেলিয়া আমার দিকেই দ্রুত আসিতেছে। রুমালে চক্ষু মুছিয়া চাহিয়া দেখি যে পিঠের উপর লম্বা ঘাস ও গাছের ডালের বোঝা চাপাইয়া দিয়া এক সুন্দরী রমণী নিচে নামিয়া আসিতেছে, আর তাহার পশ্চাতে বোধ হয় তাহার স্বামী আর একটী বড় বোঝা লইয়া আসিতেছে। আমার পরী ভ্রম হইবার কারণ ছিল।

সমস্ত বাড়ীটিই বোধ হয় দ্বিতল ছিল, এবং পর্ব্বতের স্তরে স্তরে তিন চার মহলে বিভক্ত ছিল। এখন মাত্র পাথরের দেওয়ালগুলি দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু তাহার এক টুকরাও টানিয়া খুলিতে পারিলাম না। ধীরে ধীরে সেই দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ পথহীন পর্ব্বতগাত্র দিয়া নামিয়া আসিলাম। ১২-৩০শে রওনা হইয়াছিলাম—২টা বাজিয়া গিয়াছে। শরীর ক্লান্ত বোধ হইতেছে।

আবার সেই বাগানগুলির ভিতর দিয়া ফিরিয়া আসিতে দেখি, সেই ফলের স্তূপের নিকট রাস্তার পার্শ্বে, কেরোসিন বাক্সের এক আলমারি প্রস্তুত করিয়া, একটী বালক একরাশি টুকটুকে লাল ছোট বড় আপেল সম্মুখে করিয়া, এবং ঠিক সেইরূপ দুটী আপেলের মত গাল লইয়া বসিয়া আছে। বড় পিপাসা বোধ হইতেছিল। ছোট বড় ১২।১৪টি আপেল তুলিয়া লইয়া দাম জিজ্ঞাসা করিলাম। বালক বলিল একআনা। পয়সা দিয়া সেই আপেল খাইতে খাইতে সেই সুন্দর রাস্তা দিয়া চলিলাম। ৪।৫টি বালক বালিকা যাইতেছিল, আপেল দেখাইতেই তাহারা আমায় ঘিরিয়া ধরিল। সকলকে এক একটা করিয়া দিলাম,—তাহারা আনন্দে খাইতে লাগিল। আমিও গিয়া বন্ধুর নিকট পৌছিলাম।

পাঁচটায় বন্ধুর কার্য্য শেষ হইল। তাহার বন্ধু Mr. Q এর মোটরে আমরা বাসায় পৌছিলাম। এই সুন্দর রাস্তাগুলিতে অপরাহ্নে মোটরে চলা যে কি আনন্দের বিষয় তাহা বলিয়া বুঝান যায় না।

সন্ধ্যার পর আর বাহির হইলাম না। আগামী কল্য বড়লাট সাহেব আসিবেন, এবং সে উপলক্ষে আনন্দোৎসব হইবে—এই সমস্ত বিষয় এবং এখানকার শাসন পদ্ধতি ইত্যাদির আলোচনায় সন্ধ্যা অতিবাহিত হইল।

১৪ই অক্টোবর—আজ সকাল বেলা উঠিয়া শঙ্কর পর্ব্বতে যাইব স্থির ছিল, কিন্তু চা পান করিতে বিলম্ব হইয়া যাওয়ায় তাহা হইয়া উঠিল না। তৎপরিবর্ত্তে চাকরের সহিত বাজারে রওনা হইলাম।

শ্রীনগর সহর ঝেলম, বা বিতস্তা নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। ঝেলম ও তাহার কেনালগুলি সহরের ভিতর দিয়া প্রবাহিত। ঝেলম বক্ষে ৭টী সেতু দিয়া পারাপারের ব্যবস্থা। এতদ্ব্যতীত শাখাগুলির উপরও

অনেক সেতু আছে। এই সেতুগুলির নাম "কদল" যথা আমীরা বা মীরা কদল (1st bridge)। এই নদীই শ্রীনগরের এক প্রধান সৌন্দর্য্য। নদীবক্ষে অসংখ্য শিকারা অর্থাৎ ক্ষুদ্র ডিঙ্গি এবং House boat ভাসিতেছে। আর দুই পাশে শ্রেণীবদ্ধ বাড়ী। ভাল ভাল House boat গুলি প্রায় সমস্তই ভাড়ার জন্য, আর নিকৃষ্ট শ্রেণীর গুলি স্থানীয় লোকের আবাসস্থল।

পণ্ডিতাইন

এই House boatগুলির সত্বাধিকারী অধিকাংশই মুসলমান হাঁজী (মাঝি)। তাহারা সপরিবারে House boat এর সংস্পৃষ্ট kitchen boatএ বাস করে। এই হাঁজীদের মত চরিত্রহীন জাতি আর ভারতবর্ষে কোথাও আছে কি না সন্দেহ। ইহারা কাশ্মীর আসিবার পথে বরমূলা পর্য্যন্ত যাইয়া সৌখীন ধনী যুবকদিগকে নিজ নিজ স্ত্রী কন্যা প্রভৃতির ফোটোগ্রাফ দেখাইয়া নৌকা ভাড়া দিবার চেষ্টা করে, এবং শুনা যায় যে অনেক অপরিণামদর্শী যুবক এই সমস্ত লোকের হাতে পড়িয়া, ফিরিবার সময় রেলভাড়া পর্য্যন্ত শেষ করিয়া ফেলে।

শ্রীনগরের রাস্তার কোন নাম লেখা নাই, কিন্তু সেতুগুলির নামে পাড়াগুলির নাম হইয়াছে। ঝেলম পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। আমাদের বাসা হইতে অনতিদূরেই প্রথম সেতু বা 'মীরা কদল'—তাহার পর ক্রমে ক্রমে আর ৬টী সেতু; সর্ব্বশেষে অ্যানিকট।

আজ লাট সাহেব বেলা ২টার সময় ঝেলম বক্ষে অ্যানিকট হইতে নৌকায় শোভাযাত্রা করিয়া আসিবেন। আমাদের স্থির হইল যে শিকারা করিয়া ঝেলম বক্ষে এই শোভাযাত্রা দেখিতে হইবে। বাসার কিছু দূরেই একটী কেনাল, সেখানে আমরা শিকারায় উঠিলাম। পাণের পাতার আকারের বৈঠা দিয়া ৪জন হাঁজী (মাঝি) পিছনদিকে বসিয়া নৌকা বাহিতে লাগিল। শিকারা ঝেলমের দিকে ছুটিল। দুই পাশেই হাউস বোট এবং তাহার সহিত রান্নার নৌকা ইত্যাদি রহিয়াছে।

প্রথম সেতুর নিকটেই আমরা নদীতে পড়িলাম। সম্মুখেই নদীগর্ভ হইতে বাঁধিয়া মহারাজের প্রাসাদ উঠিয়াছে। অট্টালিকাটি দ্বিতল, উপরে টিন ও কাঠের

কাশ্মীর-বাসী মুসলমান ভদ্রলোক

ছাদ। ঝেলম বক্ষে অগণিত শিকারা করিয়া লোকজন এই শোভাযাত্রা দেখিতে চলিয়াছে। সমস্তগুলি সেতু ও দুই পারের বাড়ীগুলি পতাকাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছে। অসংখ্য নরনারী লাট সাহেবের দর্শন কামনায় নদীর তীরে, ঘাটে, ঘরের জানালায়, এমন কি চালের উপর বসিয়া এবং দাঁড়াইয়া আছে।

আমরা ক্রমে ক্রমে ৭টি সেতুই পার হইয়া গেলাম। তৃতীয় সেতুর নিকট নদীর এপার ওপার দড়ী ঝুলাইয়া দিয়া তাহারই সহিত কাঠের বড় বড় অক্ষর বাঁধিয়া, তাহার উপর কতকগুলি ফুলের মত বালক নানাবর্ণের পোষাক পরিয়া অক্ষর সাজিয়া রহিয়াছে—

WELCOME

—এরূপ আর পূর্ব্বে কোথাও দেখি নাই।

নদীর দুই ধারে শ্রীনগরের প্রায় সমস্ত স্ত্রী পুরুষ জমিয়া গিয়াছে। আজ কাশ্মীরীদের—বিশেষতঃ কাশ্মীরী রমণীর—শারীরিক সৌন্দর্য্য দেখিবার অবকাশ। সত্যই কবির ভাষায় বলিতে হয়—

"যার মুখপানে চাই হেন লয় মনে,
এই রূপবতী নারী রমণির মণি!

* * *

নিরখিয়া এই সব সুন্দরী ললনা,
কে বলিবে তিলোত্তমা কবির কল্পনা!"

বাস্তবিক জানালায় যে ২।১টি রমণীমূর্ত্তি দেখিলাম, তাহার দিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লওয়া বোধ হয় সন্ন্যাসীর পক্ষেও সম্ভব নয়।

পঞ্চম সেতু পার হইতেই তোপধ্বনি আরম্ভ

কাশ্মীরী রমণী

হইল। ৭ম সেতু পার হইতেই দেখি, এক প্রকাণ্ড বজরার ছাতে স্বয়ং লাট সাহেব, মহারাজ, লাটসাহেবের পত্নী এবং তাঁহাদের পশ্চাতে ভাবী মহারাজ 'রাজা সাহেব' কাশ্মীরের সৈন্যাধ্যক্ষের পোষাকে বসিয়াছেন। তাঁহাদের মাথার উপর রাজচ্ছত্র। আরও অনেক চেয়ারে তাঁহাদের শরীররক্ষী ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বসিয়া অছেন। নৌকাখানি একখানা মোটর লঞ্চে টানিতেছে। চারিদিকে বাচের নৌকা ও অগণিত শিকারা।

আমরাও শিকারা ফিরাইয়া শোভাযাত্রার সহিত চলিলাম। এ এক সুন্দর দৃশ্য। ঝেলমের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সহস্র শিকারা ছুটিয়াছে, আর দুই দিকে অগণিত নরনারী জয়ধ্বনি করিতেছে।

প্রথম সেতুর পাশে নৌকা লাগিলে সকলে নামিয়া মোটর ও গাড়ীতে তুরুক সওয়ার পরিবৃত হইয়া Residency অভিমুখে চলিয়া গেলেন। আমরাও সেতু ছাড়াইয়া সেই অস্তগামী সূর্য্যের সুবর্ণরশ্মিরঞ্জিত অপরাহ্ণের মৃদু সমীর পুলকিত উৎসবোন্মত্ত নরনারীর আনন্দধ্বনি মুখরিত ঝেলম বক্ষ বাহিয়া অগ্রসর হইলাম। সমস্ত ঘটনা যেন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইল।

নদীর দুই পারেই হাউস বোট, কোন কোন খানা অতিশয় প্রকাণ্ড। দ্বিতল এমন কি ত্রিতল নৌকাও দেখিলাম! ভিতরে নানা কারুকার্য্য ও বিলাসের আসবাবে পরিপূর্ণ। সমস্ত গুলিরই নম্বর আছে এবং নানারূপ সুন্দর নাম যথা—'শান্তি ভবন'; 'হিমালয়', 'বুলবুল' ইত্যাদি। দোকানীরা শিকারায় করিয়া অনেক বিলাসের দ্রব্য এই সমস্ত নৌকাবাসিদিগের নিকট বিক্রয় করিতেছে। মাঝে মাঝে বড় মালের নৌকা "বাহাবা" ২।১ খানা দেখিলাম। প্রায় দুই মাইল গিয়া নিজের বাসার ঘাটে উঠিলাম।

আজ এখানে প্রবাসী বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের মুখপত্র বসু মহাশয়ের বাড়ীতে স্থানীয় বালক বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণের সভায় নিমন্ত্রণ ছিল। গিয়া দেখি প্রায় ২৫।৩০ জন বাঙ্গালী একত্র হইয়াছেন। সঙ্গীতাদির পর বালক বালিকাদের আবৃত্তি হইল। এতদূরে বাঙ্গালীদের এই উদ্যম ও একতা দেখিয়া বাস্তবিক প্রীত হইলাম।

সভা না ভাঙ্গিতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল। কাল বোধ হয় বেজায় শীত হইবে। আহারাদির পর গল্প করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

১৫ই অক্টোবর

আজ হাজার ফিট উচ্চ অর্থাৎ সাগর সমতল হইতে ছয় হাজার ফিট উচ্চ শঙ্কর পর্ব্বত—মুসলমানদের মতে তক্ত-ই সলিমান—হইতে শ্রীনগরের হ্রদ, নদী ও কাশ্মীর উপত্যকার ও তাহার চারিদিকের উন্নত পর্ব্বতরাজির দৃশ্যাবলী দেখিয়া নয়ন মন সার্থক করিব ইচ্ছায় একটু সকাল সকাল উঠিয়া বাহিরে চাহিয়াই হতাশ হইয়া গেলাম। টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, আর দারুণ শীত। ক্রমেই বৃষ্টি বাড়িতে লাগিল। ঘরের বাহির হইতে না পারিয়া প্রাণ হাঁফাইয়া উঠিল। কাশ্মীরে একাদিক্রমে ৪।৫ দিন বৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য্য নয়। তবে মোটের উপর এখানে বৃষ্টির পরিমাণ খুব কম। রাত্রে শীতও বেশী হইল, আকাশও পরিষ্কার বোধ হইল; কাল খুব ভোরে উঠিয়া বাহির হইব সঙ্কল্প করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

১৬ই অক্টোবর

সকাল বেলা উঠিয়া দেখি, সেই একই ভাব। আজও শঙ্করে যাওয়া হইল না। কাল সমস্ত দিন বাড়ীতে কাটাইয়াছি, আজ বাহির হইতেই হবে।

আহারাদির পর, বেলা ১টায় আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল, কিন্তু মেঘ কাটিল না। শীত আরও বাড়িয়াছে। শুনিলাম গুলমার্গ পাহাড়ের তলদেশ পর্য্যন্ত বরফ পড়িয়াছে। গুলমার্গ যাইয়া বরফ দেখিবার জন্য মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু ঘোড়া, টঙ্গা প্রভৃতি কোনই যান বাহন পাওয়া যাইবে না—বিশেষ রৌদ্র না উঠিলে তথায় যাওয়া বিপজ্জনক শুনিয়া নিবৃত্ত হইতে হইল।

আজ কেহই বাহির হইবেন না। তখন এখানকার

একটি যুবক Mr. I. বলিলেন যে তিনি আমাকে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া গুপ-কর হইয়া চশমা সাহী এমন কি 'নিষাধ বা পামপুর পর্য্যন্তও যাইতে পারেন। ২—৩০এ উভয়ে বাহির হইলাম। প্রথমে শীতে হাত পা আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছিল, বাতাস যেন তীক্ষ্ণ ছুরীর মত মুখে চোখে বিঁধিতে লাগিল। প্রায় দুই মাইল চলিয়া আমরা যখন শঙ্কর পর্ব্বতের পাদদেশে পৌছিলাম, তখন হাত পা ও শরীর যেন বরফ হইয়া উঠিয়াছে। রাস্তায় বহু পুলিশ পাহারা দাঁড়াইয়াছে, লাট সাহেব শ্রীপ্রতাপ কলেজ পরিদর্শন করিতে যাইবেন। কলেজের সুন্দর বাড়ীটি পতাকাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছে; শত শত বালক সজ্জিত হইয়া এই ভীষণ শীতেও বেশ নির্ব্বিকার ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

শঙ্করের নিকট বাম দিকে রাস্তা ডালহ্রদ ম হরি পর্ব্বতের দিকে গিয়াছে। সে রাস্তা ছাড়িয়া আমরা ডান দিকের রাস্তা ধরিলাম। পর্ব্বত ঘুরিতেই ডানদিকে অনন্তনাগ হইয়া জম্মু যাইবার রাস্তা, তাহার পরই বহুবিস্তৃত মনোরম কাশ্মীর উপত্যকা গুলমার্গ পাহাড় ও বিরাট পীরপাঞ্জাল পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমরা শঙ্কর পর্ব্বতের গা ঘেঁসিয়া ক্রমাগত পূর্ব্বদিকে চলিয়া একেবারে ডাল হ্রদের তীরে গুপকর পর্ব্বতের পাদদেশে পৌছিলাম। আকাশও মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। অনেক এতদ্দেশীয় নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক ফেরনের নীচে 'কাংরী' লইয়া পথ চলিতেছে। এই ফেরন একটা লম্বা আলখেল্লা জাতীয় জামা, অস্তিন এতঢিলা যে তাহার মধ্য দিয়া স্বচ্ছন্দে হাত বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এতদ্দেশীয় স্ত্রী পুরুষ সকলেই এই জামা ব্যবহার করে এবং তাহার ভিতরে বেতের (willow) ঝুড়ির মধ্যে মৃৎপাত্রে আগুন করিয়া এক হাত দিয়া ধরিয়া রাখে। এই কাংরী কাশ্মীরের বিশেষত্ব। ইহা আর কোথাও নাই। ইহার ব্যবহার না থাকিলে কাশ্মীরের দরিদ্রেরা বাস করিতে পারিত না। পুরুষেরা একখানা ১০।১২ হাত লম্বা লুই ডবল করিয়া গায়ে ঢাকা দিয়া পথ চলিতেছে। এই লুই তাহাদের ওয়াটারপ্রুফ, তাহাদের সর্ব্বস্ব। ইহাতে তাহারা জিনিষপত্র এমন কি কাঠ পর্য্যন্ত বাঁধিয়া লইয়া থাকে। অনেকরই পায়ে ঘাসের জুতা; এই জুতায় বরফের উপর চলিতে পিছলাইয়া যায় না।

দেখিতে দেখিতে বৃষ্টি আরম্ভ হইল; আমরা বাধ্য হইয়া রণে ভঙ্গ দিলাম। একটী মাত্র ছাতা-ফিরিতে একেবারে ভিজিয়া গেলাম। দৌড়াইয়া শরীর গরম রাখিতে হইতেছিল। এই পরিশ্রমে শরীরটা যেন ভাল বোধ হইতেছিল।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়।

আলোচনা

"রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে বস্তুপন্থা"

গত মাঘের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ তাঁর সম্বন্ধে আমার মস্ত একটা ভুল দেখাইয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। তাঁহার প্রবন্ধ "সাহিত্যে" ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, ঠিক যে সংখ্যায় "নষ্ট নীড়ে"র সমালোচনা বাহির হইয়াছিল সেইটি দুর্ভাগ্যক্রমে আমার হাতে পড়ে নাই—তাতেই আমার এ ভুলটা সম্ভব হইয়াছে। সে সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার না থাকিলেও, শ্রীযুক্ত বিমল বাবু আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, নিজের মত সমর্থনের জন্য সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আমাকে কিছু বলিতে হইতেছে।

'বস্তুপন্থা" অর্থ লইয়া বিমল বাবু গোড়াতেই একটা ভুল করিয়াছেন দেখিতেছি। যে সাহিত্য-রীতি সমাজের জনগণের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখকে কেন্দ্র করিয়া ফুটিয়া উঠে, যাহা দারিদ্র্যের রিক্ততা ও পাপের কালিমাকে—সমাজের বীভৎস কালো কুৎসিৎ

দিকটাকেই---বিকশিত করিয়া তুলিতে ব্যবহৃত হয়, আমি তাকেই বস্তুপন্থা নাম দিয়াছি, বস্তুপন্থার স্বরূপ বলিতে আমি তাকেই বুঝি। বিমল বাবুও স্বীকার করিবেন যে এই বস্তুপন্থা নেহাৎ গণতন্ত্রী সাহিত্য রীতি, বিশেষ করিয়া আধুনিক যুগেরই জিনিষ। গোড়াতে এ কথা মানিয়া লইলে বিমল বাবু এত কথা বলিবার অবসর পাইতেন না।

এই বস্তুপন্থা, সাহিত্যসৃষ্টির একমাত্র শ্রেষ্ঠ রীতিও যে নয় তাহা আমারই প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি। রবীন্দ্র-সাহিত্যেরও শ্রেষ্ঠত্ব যে এই বস্তুপন্থা অবলম্বন করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই তাহাও আমি বলিতে ক্রুটী করি নাই। এই আধুনিক অসুৎকৃষ্ট বস্তুপন্থা মোটামুটিভাবে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ছিল না বলিলে কি করিয়া তার অগৌরব প্রচার করা হয় তাহা আমি বুঝি না। আমি জানি এবং সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি, পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের যেমন গণতন্ত্রতার দরকার তেমনি দরকার আভিজাত্যের,---একের নিকট তাহা যেমন শক্তি সংগ্রহ করে, অন্যকে তার অবলম্বন করিয়া তাহা তেমনি তার সৌন্দর্য্য ফলাইয়া তুলে। মুটে মজুরের কায়ক্লেশের সঙ্গে বিলাসীর সখ না মিলাইলে তার সৃষ্টি অসম্ভব।

বৈষ্ণব সাহিত্যে, বিশেষতঃ চণ্ডীদাসে, বাংলার গার্হস্থ্য জীবনের দুইচারিটা অসম্পূর্ণ ছবি পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যকে বস্তুপন্থী বলিলে তার সাহিত্যিক বৈশিষ্টতা প্রকাশ করা হইবে না, তার প্রতি যে সাহিত্যিক সুবিচারটাও করা হইবে ইহা আমার কিছুতেই মনে হয় না।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাবলী বস্তুবিষয় অবলম্বনে রচিত হইলেও তাঁহাকে কেন সাহিত্য সৃষ্টির ইতিহাসে আমল দেওয়া হয় নাই, মুকুন্দরামের সহিত তাঁহার তুলনা করিলেই তাহা পরিস্কার হইয়া যাইবে। রঙ্গলাল ও বিহারীলালের নাম করা হইয়াছে বৃথা। সারদামঙ্গলের বস্তুপন্থা কথাটা হাসির উদ্রেক ছাড়া আর কিছুই করে না। ‘রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের শিষ্য, কাজেই বিহারীলালের বস্তুপন্থা আছে’, এটা কি রকম যুক্তি? রবীন্দ্র-সাহিত্যের যতটুকু বিহারীলাল কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত, তার মধ্যে বাস্তবতার দূরতম আভাসটি পর্য্যন্তও যে নাই বিমল বাবু কি তার খবর রাখেন? আধুনিক যুগের কাব্যসাহিত্যের কথা যদি পাড়িতেই হইল, তবে বিমলবাবু নবীন সেনের নামোল্লেখ করিলে পারিতেন, কারণ তাঁহার কুরুক্ষেত্র ইত্যাদিতে যে বস্তুপন্থার বিকাশ আছে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যে তাহা বিরল। আর বস্তুপন্থা না মাড়াইয়াও যে কাব্য বড় হইতে পারে, মেঘনাদবধ ও রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যগ্রন্থাবলী তাহার নিদর্শন। বিমল বাবু দেখিতেছি এই কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছেন যে, আমি রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছিলাম, কাব্য সাহিত্য সম্বন্ধে নয়। মাইকেলের কাব্যের কথা না বলিয়া প্রবন্ধে প্রহসনের উল্লেখ কেন করা হইল তাও তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

বাংলার বস্তুপন্থার ইতিহাসে মাইকেল যে বড় একটা স্থান জুড়িয়া আছেন, তাহা কেহই বলিবে না। তবে দীনবন্ধু সম্বন্ধে অনেকে এই কথা বলিবেন। দীনবন্ধুকে তাঁহার প্রাপ্য গৌরব দিয়াও আমি এই কথা বলিতে চাই, তিনি বাঙ্গালীর ব্যঙ্গরূপকেই আঁকিতে সমর্থ হইয়াছেন, তার স্বরূপকে নয়। অর্থাৎ যাহা কিছু অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক, তাহাই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে। পানদোষ, ইন্দ্রিয়দোষ অথবা বুদ্ধির দোষ মানুষকে যেখানে পশুর পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া দিয়াছে, সেইখানেই তাঁহার কৃতিত্ব। স্বাভাবিক বাঙ্গালী চরিত্র অঙ্কনে তিনি যে সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই, তাহা তাঁর নবীন মাধব, সৈরিন্ধ্রী, সরলতা হইতে আরম্ভ করিয়া ললিত, লীলাবতী সকলই সাক্ষ্য দিবে। সংকীর্ণ সীমার মধ্যে যেখানে তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে সেখানেও তিনি শ্রেষ্ঠতার দাবী করিতে পারেন না। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বস্তুপন্থী চিত্রশিল্পী হইতে পারিতেন যদি তাঁর মানব চিত্রশালার মধ্যে এমন কয়েকটি চরিত্র থাকিত, যাদের মধ্যে মানব স্বভাবকে না ডিঙাইয়াও তাদের ত্রুটি বিচ্যুতির ছবি ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে, যাদের মধ্যে মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব না করিয়াও পশুত্বের দাবী মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তিনি যে কালীর দাগ দিয়াছেন তাহাতে যে সত্যের দ্যুতিটি পর্য্যন্ত মুছিয়া অথবা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। সেখানে না আছে সৌন্দর্য্য না আছে মঙ্গল।

ঐতিহাসিক উপন্যাস বা রোমান্সের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া যেখানে বলিয়াছি, “তাতে প্লটের বাহাদুরী এবং ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত আছে, কিন্তু বস্তুচিত্র বিকাশের তেমন অবকাশ নাই” সেখানটা যে বিমল বাবুর নিকট আশ্চর্য্য ঠেকিল তাহা আমার কাছে সব চেয়ে বিস্ময়কর বোধ হইতেছে। ইহার সমর্থনের জন্য সমালোচকগণের উক্তি তুলিয়া দিয়া তাঁর সাহিত্যবোধকে আমি অপমানিত করিতে চাহি না। ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং সামাজিক উপন্যাসের পার্থক্যটা কোন জায়গায় তাহা তিনি নিজেই অবধান করিয়া দেখিবেন আশা করি। খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস মানব মনকে যে অতীতের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে ঘুরাইয়া আনে, রাজ রাজড়া ও রাণী বেগমের সঙ্গে সঙ্গে জড়াইয়া যে ঘটনাবিপর্য্যয় ও রাজ্য ভাঙ্গাগড়ার ছবি ফুটা-

ইয়া তোলে, সেখানে বাস্তব বর্ত্তমান এবং তার ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের কোন স্থান নাই। এই বাস্তবকে কল্পনার তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিতে পারাই বরং তার কৃতিত্ব। তবে খাঁটি আজকাল কিছুই নাই, রক্তমিশ্রণটা যেমন সুপ্রজননের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে, সাহিত্যিক রীতির মিশ্রণ লইয়াও তেমনি আজ কাল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেরও আবির্ভাব হইতেছে। বঙ্কিমেরও বস্তু-পন্থার বিকাশ যথেষ্ট হইয়াছে। তবু যদি এই কথা বলা যায় যে মোটামুটি বঙ্কিমের প্রতিভা ঐতিহাসিক উপন্যাসেই খুলিয়াছে, এবং ঐতিহাসিক কাঠামোকে অবলম্বন করাতেই বর্ত্তমান তাঁর নিকট হইতে কতকটা দূরে রহিয়াছে এবং কাজেই বস্তুপন্থার শ্রেষ্ঠ বিকাশটা তাঁর মধ্যে হইতে পারে নাই, তবে তাঁকে কিছুমাত্র খাটো কিম্বা তাঁর অগৌরব করা হয় না; তাঁর সাহিত্যিক বিশিষ্টতার কথাটিই বলা হয়।

বস্তুপন্থা বলিতে বিমল বাবু বিশেষ একটা কিছুকে বুঝিয়াছেন বলিয়া তাঁর আলোচনাটির মধ্যে কোন পরিচয় নাই। তবে যেখানে তিনি ভবভূতির শ্লোক তুলিয়াছেন, সেখানে হয়ত তাঁর নিজেরও অজ্ঞাতসারে তিনি বস্তুপন্থার একটা সম্ভাবিত অর্থের আভাস দিয়াছেন। সুখ দুঃখ প্রভৃতি মানব হৃদয়ের স্থায়ী ভাব-গুলির নিবিড় অনুভূতি যেখানে একটা নামরূপ লাভ করে, সেখানেই বস্তুপন্থার বিকাশ হয় বলা যায়। বস্তুপন্থা কথাটাকে সেই ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে—সেইভাবে তাহা সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের প্রাণ, এমন কি আধ্যাত্মিক কবিতার মধ্যেও তার অভাব হইলে চলে না। আমি কথাটাকে যে সে ভাবে ব্যবহার করি নাই, আমার প্রবন্ধের মধ্যেই তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

শ্রীসুখরঞ্জন রায়।

পুলিশের গল্প

গৌহাটীর কথা (২)

আমি গতবারের কামাখ্যা শীর্ষক প্রবন্ধে একটা কিংবদন্তী সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম যে সেই কিংবদন্তীটা কামরূপের পক্ষে উপচার-পদ অর্থাৎ complimentary নহে। উপচার-পদ কথাটা কালিদাস এই অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন, যথা উপচার পদং নচেদিদম্। কিন্তু "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র মুদ্রাকর তাহা "উপকার প্রদ" করিয়া পাঠককে উপহার দিয়াছেন। এই কয়েকটা কথা বলা উচিত মনে করিয়া বলিলাম। এখন প্রকৃত বক্তব্যের অনুসরণ করি।

আমি যখন গৌহাটিতে বদলি হইলাম তখন সেখানে ডেপুটি কমিশনর ছিলেন টিউনন সাহেব, যিনি এখন সার উইলিয়াম টিউনন হইয়া হাইকোর্টের বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করিতেছেন। টিউনন সাহেব একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সোনাপুর থানার চার্জ্জ লইয়া কার্য্য করিতে পারে এমন একজন হেড্ কন্‌ষ্টেবল্ কামরূপে আছে কি না, যে স্থানীয় প্লাণ্টারদিগের অনুবর্ত্তী না হইয়া স্বাধীন ভাবে কায করিতে পারে? (Who will not be subservient to the Planters)। আমি বলিলাম, "যখন ডেপুটি কমিশনরেরাই প্লাণ্টারদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন, তখন কিরূপে আশা করা যাইতে পারে যে এক বেচারা হেড্-কন্‌ষ্টেবল প্লাণ্টারদিগের অনুবর্ত্তী না হইবে?" টিউনন্ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ কোন্ ডেপুটি কমিশনর প্লাণ্টারদের অনুবর্ত্তী?" আমি উত্তর করিলাম, "তাহা আমি জানি না। আমি এইমাত্র জানি যে গড্‌ফ্রী সাহেব, গ্রীনশীল্‌ড্‌স্ সাহেব এবং আপনি প্লাণ্টার-দিগের মুখাপেক্ষা করেন না।" টিউনন্ সাহেব তখন দুই একজন ডেপুটি কমিশনরের নাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহারা প্লাণ্টারদিগের অনুবর্ত্তী কি না?" আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তাহার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেহ কেহ প্লাণ্টারদের অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন কেন?" আমি বলিলাম, "সেরূপ না করিলে প্লাণ্টারগণ সেই সকল কর্ম্মচারীর স্থান এমন 'উত্তপ্ত' করিয়া তোলেন যে কর্ম্মচারীরা

সেখানে তিষ্ঠিতে পারেন না—যেমন আপনার বিরুদ্ধে কাছারের এবং ডিব্রুগড়ের প্লাণ্টারগণ করিয়াছিলেন।" টিউনন্ সাহেব বলিলেন, "কাছারের প্লাণ্টারেরা যে আমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন তাহা আমি জানি; কিন্তু ডিব্রুগড়ের প্লাণ্টারগণও যে সেইরূপ করিয়াছিলেন তাহা শুনি নাই।" আমি বলিলাম, "তাঁহারা আপনার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকটে কোন অভিযোগ করিয়াছিলেন কি না তাহা আমি জানি না। কিন্তু তাঁহারা যে আপনার প্রতি বিশেষ বিরূপ ছিলেন তাহা আমি দুই একজন প্লাণ্টারের মুখেই শুনিয়াছি।"

ইহার পর টিউনন সাহেবের সহিত আমার কোন বিষয়ে কোনরূপ আলাপ হইয়াছিল কি না আমার মনে নাই। আমি পূর্ব্বে যখন ডিব্রুগড়ে ছিলাম, তখন তিনি সেখানে অ্যাসিস্‌টাণ্ট কমিশনর ছিলেন। সেখানেও সকলেই তাহার পক্ষপাত-বর্জ্জিত সুবিচারের প্রশংসা করিত এবং কামরূপেও সকলের মুখেই সেইরূপ প্রশংসা শুনিয়াছি। তিনি যে কিরূপ সুবিচারক তাহা সম্প্রতি খরিয়ালের গুলিমারা মকদ্দমার যাঁহারা তাঁহার আদেশ পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন।

আমি গৌহাটিতে আফিসে কাজ করিবার সময়ে যখনই একটু অবকাশ পাইতাম, তখনই গল্প করিবার জন্য এবং তাম্রকূট সেবনের জন্য কতিপয় পাদমাত্র দূরবর্ত্তী উকীলদিগের লাইব্রেরিতে গিয়া বসিতাম। সেখানে অনেক সময়ে টিউনন্ সাহেবের প্রশংসা শুনিতাম। উকীলদিগের মুখে ইহাও শুনিয়াছি যে গৌহাটি হইতে বদলি হইবার পূর্ব্বে টিউনন সাহেব কয়েকজন উকীলকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তিনি বিচার বিভাগেই যাইবেন না শাসন বিভাগেই থাকিবেন। উকীলেরা নাকি সকলেই তাঁহাকে বিচার বিভাগেই যাইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন।

ডিব্রুগড়ে থাকিতে টিউনন সাহেব অতি অল্পদিনেই আসামী ভাষা শিখিয়াছিলেন। সাক্ষীর উক্তি লিখিয়া লইবার সময়ে, প্রথমে, সাক্ষী যাহা বলিত তাহা শুনিয়া সেরেস্তাদারকে তাহার ইংরাজী করিতে বলিতেন। ইংরেজী শুনিয়া সাক্ষীকে আর একবার বলাইয়া লইতেন। এইরূপেই তিনি আসামী ভাষা শিখিয়াছিলেন।

টিউনন সাহেবের ইংরেজী কোন কোন শব্দের উচ্চারণ কিছু বিশেষ প্রকারের ছিল। একটা এখনও মনে আছে। Heard শব্দটাকে তিনি হর্ড না বলিয়া হিয়ার্ড বলিতেন।

উকীল ঘরে বসিয়া টিউনন সাহেবের পূর্ব্ববর্ত্তী কামরূপের ডেপুটি কমিশনর ক্যাম্বেল সাহেবের অনেক গল্প শুনিতাম। তিনি সিবিলিয়ান ছিলেন না, পঞ্চাশ টাকা বেতনে কার্য্য আরম্ভ করিয়া আসামের কমিশনর পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন, এবং কুইণ্টন্ সাহেবের হত্যার পর কয়েক দিন চীফ কমিশনরের আসনেও বসিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে কামরূপের রাজা বলিত। তিনি অতি প্রখরবুদ্ধিশালী ছিলেন। সকল কাযেই আইন অনুসরণ না করিয়া সুবিচার করিতেন। একটী বাঙ্গালী যুবক কামরূপে আসিয়া 'ভেড়া' হইয়া গিয়াছিল। তাহার বৃদ্ধ পিতা বঙ্গদেশ হইতে কামরূপে গিয়া বিশেষ চেষ্টা করিয়া যখন তাহাকে দেশে আনিতে পারিল না, তখন উকীলদিগের পরামর্শে ক্যাম্বেল সাহেবকে গিয়া তাঁহার দুঃখের কথা জানাইল। ক্যাম্বেল সাহেব যুবকটীকে ডাকাইয়া তাহাকে পিতার সহিত দেশে ফিরিতে আদেশ করিলেন। সে বলিল সে যাইবে না। সাহেব বলিলেন, তাহা হইলে তাহাকে তিনি জেলে পাঠাইবেন। সে বলিল, সে কোন অপরাধ করিলে ত তাহাকে জেলে পাঠাইবেন। সে কোন অপরাধ করে নাই, সুতরাং তাহাকে জেলে পাঠাইবার সাধ্য কাহারও নাই। এই ঔদ্ধত্যের জন্য সাহেব তাহাকে সত্য সত্যই জেলে পাঠাইলেন। সেখানে দুই তিন মাস থাকিয়াও যখন তাহার দর্পচূর্ণ হইল না, তখন সাহেব তাহাকে দিয়া ঘানি টানাইবার আদেশ করিলেন। কয়েক দিন ঘানি টানিয়া তাহার তেজ কমিয়া গেল। সে পিতার সহিত দেশে ফিরিতে সম্মত হইল। ক্যাম্বেল সাহেব তখন তাহাকে মুক্তি

দিলেন। ক্যাম্বেল সাহেবের সম্বন্ধে শ্রুত গল্প আরও দুই একটা লিখিতেছি। তাঁহার কাছে সত্য কথা বলিয়া ক্ষমা চাহিলে ক্ষমা পাওয়া যাইত। একবার একটী ভদ্রবংশীয় যুবক মাতাল হইয়া তরবারি দ্বারা তাহার স্ত্রীকে কাটিয়া মুমূর্ষু প্রায় করিয়াছিল। যুবকের অন্তত পাঁচ সাত বৎসর কারাবাস নিশ্চয় জানিয়া তাহার আত্মীয়েরা ক্যাম্বেল সাহেবের নিকট গিয়া সমস্ত কথা সত্য সত্য বলিলেন। সাহেব তখনই ঘটনা স্থলে গিয়া, যুবকটী পাগল হইয়াছে বলিয়া তাহার হাতে হাতকড়া লাগাইয়া তাহাকে জেলে পাঠাইলেন। দুই তিন মাস পরে যখন অনেক চিকিৎসায় তাহার স্ত্রীর আরোগ্য হইল, তখন ক্যাম্বেল সাহেব যুবককে ছাড়িয়া দিলেন।

একবার একজন পুলিস কর্ম্মচারী এক মকদ্দমায় আসামীর নিকট হইতে একহাজার টাকা ঘুস লইয়াছিল। বিচারে তাহার কয়েক মাস কারাবাসের আদেশ হইল। যখন তাহাকে আদালতের বাহিরে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন সে হঠাৎ ক্যাম্বেল সাহেবের এজলাসের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ধর্ম্মাবতার আমি পুলিসকে একহাজার টাকা ঘুসও দিলাম—আমার ফাটকও হইল।" সাহেব তখনই সেই পুলিস কর্ম্মচারীকে ডাকাইয়া টাকা ফেরত দিতে বলিলেন। পুলিস কর্ম্মচারী জানিতেন যে মিথ্যা কথা বলিলে ক্যাম্বেল সাহেবের কাছে রক্ষা নাই। সুতরাং তিনি অর্দ্ধেক সত্য অবলম্বন করিয়া বলিলেন যে তিনি মোটে পাঁচশত টাকা লইয়াছিলেন, তাহা ফিরাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। সাহেব ধমক দিয়া বলিলেন, অবশ্যই একহাজার টাকা লইয়াছ। তখন সেই কর্ম্মচারী একহাজার টাকার কথাই স্বীকার করিয়া বলিলেন যে তিনি সেই টাকার মধ্যে পাঁচশত টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন, অবশিষ্ট টাকা ফিরাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। সাহেব তখন আসামীকে ৫০০ টাকা লইয়াই সন্তুষ্ট হইতে বলিলেন। সে আপত্তি করিল। সাহেব তখন তাহাকে খুব এক ধমক দিয়া বলিলেন যে তাহা হইলে সে মোটেই টাকা পাইবে না এবং তাহার কারাবাসের পরিমাণও বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। বেচারা তখন সেই ৫০০ লইতেই রাজি হইল।

আমি গৌহাটিতে বদলি হইবার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একবার মাত্র ডিব্রুগড়ে ক্যাম্বেল সাহেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি তখন সাব ইন্‌স্পেক্টর ছিলাম। তিনি আসামী ভাষা সুন্দর রূপে বলিতে এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে পারেন বলিয়া আমি তাঁহার প্রশংসা করিলাম। তিনি সেই প্রশংসায় প্রীত হইলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম।

ক্যাম্বেল সাহেব লোকের সঙ্গে মুরুব্বিয়ানা ভাবে কথা কহিতেন। কিন্তু টিউনন সাহেবের সেরূপ কিছুই ছিল না। তিনি বাঙ্গালা বা আসামী ভাষায় কথা কহিবার সময়ে হেড কন্‌ষ্টেবলদিগের প্রতিও আপনি শব্দ প্রয়োগ করিতেন।

ক্যাম্বেল সাহেবের মৃত্যু কালা আজর রোগে হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি।

টিউনন সাহেবের সম্বন্ধে আর একটা মাত্র কথা বলিব। তিনি গৌহাটি হইতে চলিয়া যাইবার দুই কি তিন বৎসর পরে Review of Reviews নামক মাসিক পত্রিকার এক সংখ্যায় সুমেরুদেশে ভ্রমণকারী ডক্‌টর ন্যান্‌সেনের ছবি মুদ্রিত হইয়াছিল। সেই ছবি দেখিয়া উকীলেরা অনেকেই বলিলেন যে ন্যানসেনের সহিত টিউনন সাহেবের আকৃতির সাদৃশ্য আছে। আমারও তাহাই বোধ হইল। অবসরপ্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টর জেনারাল ড্রাইবর্গ সাহেবও আমাকে এক পত্রে লিখিলেন যে ন্যান্‌সেনের সহিত টিউনন সাহেবের আকৃতির কিছু সাদৃশ্য আছে।

আসামে থাকিতে থাকিতে আমি ইহা অপেক্ষাও অবয়বগত আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিয়াছি। রবর্ট ক্রস্ মেকফন্ নামক এক ব্যক্তি "হল্‌টা টী কোম্পানি"কে প্রবঞ্চনা করিয়াছিল বলিয়া তাহার নামে ওয়ারেন্ট হওয়ায় সে আমেরিকায় পলায়ন করে। তাহার

সহিত এক ব্যক্তির আশ্চর্য্য সাদৃশ্য ছিল। মেককনের মুখেও একটাও দাঁত ছিল না, সেই ব্যক্তিও সম্পূর্ণ দন্তহীন ছিল। মেককনেরও দাড়ি গোঁফ হয় নাই, সেই ব্যক্তিও শ্মশ্রুগুম্ফবিহীন ছিল। মেককনের ফোটোগ্রাফ দেখিলেই সেই ব্যক্তি বলিয়াই মনে হইত। এ বিষয়ে সকল কথা খুলিয়া লিখিতে পারি না।

আর একটা আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিয়াছি ভারতবর্ষের পূর্ব্বোত্তর প্রান্ত সদীয়ায়। সদীয়ার নিকটে আবর নামে এক অসভ্য জাতি বাস করে। তাহারা মধ্যে মধ্যে দলে দলে সদীয়ায় আসিয়া থাকে। এক দিন তাহাদের দলে এমন একজন লোককে দেখা গেল, যাহার আকৃতি সদীয়া মিলিটারি পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর ইডেন সাহেবের মত। লোকে তাহাকে ইডেন আবর নাম দিয়াছিল। তাহার দাঁত, ওষ্ঠ, চক্ষু ইডেন সাহেবের মত ছিল।

এখন গৌহাটির কথায় প্রত্যাবৃত্ত হওয়া যাউক। প্রথমে সেখানকার কয়েকজন উকীলের কথাই বলিব। আমি তাঁহাদের সঙ্গে গল্প করিয়া যে কেবল আমোদ পাইতাম তাহা নহে, শিক্ষা ও উপদেশও লাভ করিতাম। তাঁহারা সকলেই বহু প্রকারে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। দীননাথ সেন ছিলেন সরকারী উকীল। তিনি উত্তম সংস্কৃত এবং পারশী জানিতেন। তিনি এমন স্থিরবুদ্ধি ছিলেন এবং ইংরাজীতে তাঁহার এমনই অসাধারণ অধিকার ছিল যে, একেবারে এক দিস্তা কি দুই দিস্তা কাগজ লইয়া লিখিতে বসিতেন তাহাতে কখনও একটা সংশোধন করিতে হইত না। তাঁহার বাসায় প্রত্যহ বৈকালে পাশা খেলা, কখন কখন দাবা খেলা হইত। তিনি নিজে প্রায়ই দ্রষ্টা হইয়া থাকিতেন। কয়েকটি পলিতকেশ বৃদ্ধ খেলিতেন। পাশা খেলিতে খেলিতে সময়ে সময়ে কিরূপ উত্তেজনা হয় তাহা পাশক্রীড়কেরা সকলেই জানেন। একবার দীন বাবুর বাসায় এইরূপ উত্তেজনা ও উল্লাসের একটা দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। একদিকে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত পণ্ডিত জয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং তাঁহার সহকারী ছিলেন তাঁহার অপেক্ষাও গলিত দন্ত এক বৃদ্ধ যাঁহার নামটা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। সেই সহকারী একবার একটা অপ্রত্যাশিত আড়ি মারিলেন। তাহাতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় আহ্লাদের উত্তেজনায় একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া সেই সহকারীকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার মুখ চুম্বন করিলেন। ইহাতে ক্রীড়ক এবং দর্শকদের মধ্যে হাসির একটা তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। দীন বাবু অঙ্গচালনার অভাবে অনুক্ষণই অসুস্থ থাকিতেন। ঔষধে রোগ প্রতীকার হয় বলিয়া তাঁহার বড় একটা বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু তিনি ঔষধে দুই তিন শত টাকা ব্যয় করিতেন এবং চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বহু পুস্তকও ক্রয় করিতেন। একবার শিলং হইতে গৌহাটিতে ফিরিবার সময়ে তাঁহার টঙ্গা উল্‌টাইয়া গিয়াছিল। তাহাতে তাঁহার মস্তকে বড় আঘাত লাগে। ইহার কয়েক মাস পরে তাঁহার মৃত্যু হইল।

দীন বাবুর পর সরকারী উকীল হইলেন রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন। তাঁহার মত ধার্ম্মিক পরোপকারী সাধু ব্যক্তি সংসারে অতি অল্পই দেখা যায়। তিনি দরিদ্র ব্যক্তিদিগের ওকালতনামা লইয়া যে কেবল তাহাদের অর্থ শোষণ করিতেন না তাহা নহে। তাহারা স্বেচ্ছাক্রমে যত টাকা দিতে চাহিত, তাহাও তাহাদের পক্ষে কষ্টকর বলিয়া কম টাকা লইতেন। যদি তাহারা মকদ্দমায় হারিয়া যাইত, এবং সেই হার যদি কালী বাবুর অন্যায় বোধ হইত, তাহা হইলে তিনি নিজ ব্যয়ে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত আপীল করিতেন। কালী বাবুর পিতা ৺শ্রীমন্ত সেন মহাশয়ও পূর্ব্বে গৌহাটিতেই ওকালতী করিতেন। পিতা পুত্র উভয়েই মহা তেজস্বী এবং হিন্দু শাস্ত্রে পরম ভক্তিমান ছিলেন। তাঁহারা কাহারও বাড়ীতে কখনও কিছু আহার করিতেন না, সুতরাং কাহাকেও আহারের জন্য নিমন্ত্রণও করিতেন না। বাড়ীতে কোন ক্রিয়া কর্ম্ম উপস্থিত হইলে আত্মীয় বন্ধুর বাড়ীতে প্রভূত পরিমাণে সিধা

পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহারা নিমন্ত্রণ করিয়া কাহাকেও খাওয়াইতেন না বটে, কিন্তু অতিথিসেবায় ত্রুটি করিতেন না। দীন দুঃখীকে সর্ব্বদা সাহায্য করিতেন। আহার ব্যবহারে সামাজিকতা ভিন্ন আর সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহারা আদর্শ চরিত্র ছিলেন। কালী বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা উমাচরণ বাবুও গৌহাটিতে ওকালতি করেন। তিনি সর্ব্ববিষয়ে পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুরূপ।

আমার সময়ে মনোমোহন লাহিড়ীও গৌহাটীর এক প্রধান উকীল ছিলেন। তিনিও নিজ ব্যবসায়ে এবং চরিত্রগুণে খুব যশস্বী ছিলেন। তাঁহার পিতা হরিমোহন লাহিড়ী মহাশয় গৌহাটিতে স্কুলের ডেপুটী ইনস্পেক্টর ছিলেন এবং সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। মনোমোহন বাবু মধ্যে মধ্যে আসামী বাঙ্গালী নির্ব্বিশেষে গৌহাটীর যাবতীয় ভদ্রলোককে বড় বড় ভোজ দিতেন।

ললিতমোহন লাহিড়ী আসামের একজন শ্রেষ্ঠ উকীল ছিলেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। আসামের অন্যান্য জেলায়ও তাঁহার বিস্তর পশার আছে। যখন কটন সাহেব চীফ কমিশনর হইয়া প্রথম গৌহাটীতে গেলেন, তখন ডেপুটী কমিশনর সাহেব ললিত বাবুকেই 'লীডার অব্ দি বার' বলিয়া পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন।

উকীল রামদাস ব্রহ্মের নামোল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। তিনি বি-এল না হইলেও বোধ হয় কাহা অপেক্ষাও বিদ্যাবত্তা ও ব্যবসায়ের জ্ঞানে হীন ছিলেন না। নানা দেশের ইতিহাস তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় বালকদিগকে বড় ভাল বাসিতেন। পাঁচ সাতটী বালককে সর্ব্বদাই প্রতিপালন করিতেন। কিছুদিন হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

গৌহাটীর আসামী উকীলদের মধ্যে সত্যনাথ বরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। সৌম্যদর্শন, মিষ্টভাষী ও তেজস্বী ছিলেন। ওকালতীতেও তাঁহার বেশ যশ ছিল। তিনি বাঙ্গালীদের সঙ্গে সর্ব্বদাই মিশিতেন।

উকীল মহেশ্বর গোস্বামী বৃদ্ধ ছিলেন। পত্নীর সহিত নিজের নাম সাদৃশ্যে তিনি দ্বিতীয় জরৎকারু ছিলেন, যেহেতু তাঁহার পত্নীর নাম মহেশ্বরী। এ বিষয়ে আমার বন্ধু মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় এক জরৎকারু। এই কথা হইতেই পাঠক তাঁহার পত্নীর নামটা বুঝিয়া লইবেন।

উকীল সোণারাম দাস একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী স্কুল স্থাপন করিয়া অমর কীর্ত্তি রাখিয়াছেন।

উকীল আবদুল মুন্সীও গৌহাটীর উকীল ছিলেন। তাঁহার মিষ্টভাষিতা ও সৌজন্যের কথা আমার চিরদিনই মনে থাকিবে।

একজন বাঙ্গালী উকীলের নাম যথাস্থানে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। তিনি কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস। তিনি এখন চব্বিশ পরগণায় প্রথম শ্রেণীর সবজজ।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

হেমচন্দ্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রভাতকুমার লিখিয়াছেন—"চিত্তবিকাশে'র দ্বিতীয় কবিতা 'বিভু কি দশা হবে আমার?' পড়িলে প্রাণ কাটিয়া যায়।" যে কবি একদিন "বিধাতানির্ম্মিত চারু মানব নয়ন"কে পরশমণির সহিত তুলনা করিয়াছিলেন তিনি এখন দৃষ্টিহারা হইয়া লিখিয়াছেন—

বিভু কি দশা হবে আমার?
একটি কুঠারাঘাত শিরে হানি অকস্মাৎ,
ঘুচাইলে ভবের স্বপন,
সব আশা চূর্ণ করে রাখিলে অবনী' পরে
চিরদিন করিতে ক্রন্দন।
আমার সম্বল মাত্র ছিল [illegible] নেত্র,

অস্ত ধন ছিল না এ ভবে,
সে নেত্র করে হরণ,　　হরিলে সর্ব্বস্ব ধন,
ভাসাইয়া দিলে ভবার্ণবে।

*　　*　　*

সব ঘুচাইলে বিধি　　হরে নিয়া চক্ষু নিধি,
মানবের অধম করিলে।
বল বিত্ত সব হীন,　　পর-প্রতিপাল্য দীন
করে ভবে বাঁধিয়া রাখিলে।
জীবের বাসনা যত　　সকলই করিলে হত
অন্ধকারে ডুবায়ে অবনী,
না পাব দেখিতে আর　　ভবের শোভাভাণ্ডার
চির অস্তমিত দিনমণি।

*　　*　　*

প্রতিদিন অংশুমালী,　　সহস্র কিরণ ঢালি,
পুলকিত করিবে সকলে,
আমারি রজনী শেষ,　　হবে না কি? হে ভবেশ
জানিব না দিবা কারে বলে?
আর না সুধার সিন্ধু　　আকাশে দেখিব ইন্দু,
প্রভাতে শিশির বিন্দু জ্বলে।
শিশির বসন্ত কাল,　　আসে যাবে চিরকাল,
আমি না দেখিব কোন কালে।

*　　*　　*

নিজ পুত্র কন্যা মুখ　　পৃথিবীর সার সুখ
তাও আর দেখিতে পাব না।
অপূর্ব্ব ভবের চিত্র　　থাকিবে স্মরণে মাত্র
স্বপ্নবৎ মনের কল্পনা।

কবিতাটির উপসংহারে হেমচন্দ্র বিভুপদে প্রার্থনা করিয়াছেন—

জীবনের শেষ কালে　　সকলি হরিয়া নিলে
প্রাণ নিয়া দুঃখে কর পার।

প্রভাতকুমার লিখিয়াছেন, "ইহা পাঠ করিয়া কিছু বিস্মিত হইয়াছিলাম। আর যে হয় বলুক, হেম বাবুর মুখে ত এ কথা শোভা পায় না। তিনি যে আশার কবি, উৎসাহের কবি, 'বিশ্ব পূরে যায় শুনে আশা গান' তাঁহার মুখে এ কথা কেন?" বড় কষ্টেই হেমচন্দ্রের মুখ হইতে শেষোক্ত প্রকারের আক্ষেপোক্তি নির্গত হইয়াছিল। হেমেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "এ মর্ম্মব্যথার কাহিনী বড় করুণ। তবে একথা বলিতে পারি যে, কবির যে প্রতিভালোকে বঙ্গসাহিত্য সমুজ্জ্বল, অর্থের বা দৃষ্টির অভাবে তাহার দীপ্তি নির্ব্বাপিত হইবার নহে; তাঁহার যে কল্পনা ইচ্ছায় স্বর্গ বা নরকের চিত্র অঙ্কিত করিয়া পাঠকের নয়ন সমক্ষে আনিয়াছে, নয়নের দৃষ্টির অভাবে তাহার গতিরোধ হয় না। তিনি আপনিও বলিয়াছেন, কল্পনার প্রসাদ পাইলে 'কি দুঃখ এ জগতের ভুলিতে না পারি?' কিন্তু এ কথা লইয়া অধিক কিছু বলিতে যাওয়া দুঃসাহসের কার্য্য—দৃষ্টির অভাব প্রথমে কবির নিকট বড়ই দুর্ব্বিষহ বলিয়া বোধ হইয়াছে। তদ্ভিন্ন 'বৃত্রসংহারে' কন্দর্পের মুখ দিয়া তিনি বলাইয়াছেন,—

সুখ দুঃখ ইন্দ্রপ্রিয়া,　　সকলি বাসনা নিয়া
যুকতির আয়ত্ত সে নয়।"

ইহার পরবর্ত্তী কবিতাটিতেই কবি এই মানসিক ব্যাধির ঔষধ পাইয়াছেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "ইহার পর কবি ভক্ত দার্শনিকোচিত বিচারের ফলে যেখানে উপনীত হইয়াছেন, সেখানে ভক্তির উচ্ছ্বসিত স্রোতে বিষাদ ও বেদনা, সংশয় ও শঙ্কা ভাসিয়া যায়; শঙ্কা শান্তিতে পরিণত হয়। তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন—

কোথা আজি সেই অযোধ্যাধাম,
কোথা পূর্ণ ব্রহ্ম সীতাপতি রাম;
কোথা আজি সেই পাণ্ডবের সখা,
কোথায় মথুরা, কোথায় দ্বারকা।

কে পারে খণ্ডিতে অদৃষ্ট শৃঙ্খলে,
ঘটেছে আমার যা ছিল কপালে।
কে পারে রাখিতে বিধাতা কাঁদালে,
বৃথা কেন তবে কাঁদিয়া মরি।

এস ভগবান, কর ধৈর্য্য দান,
কর শান্তিময় অশান্ত পরাণ।
সৌভাগ্য অভাগ্য ভাবিয়া সমান
নিজ কর্ম্ম যেন সাধিতে পারি

*　　*　　*

আপনারই দোষে আপনি হারাই

বিধাতারে কেন সে দোষে জড়াই।
এ সান্ত্বনা কেন পরাণে না পাই
নিজ কর্ম্মফল অদৃষ্ট কেবল।"

শ্রীযুক্ত রসময় সাহা

প্রভাতকুমার বলেন, ইহার পরবর্ত্তী কবিতায় কবির মানসিক ব্যাধির আরোগ্যের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। "কবি কল্পনার দৃষ্টিতে পৃথিবীকে সুন্দরী দেখিতেছেন।

জয় জগদীশ জয় বলরে বদন।
বিভুগানে মাতোয়ারা জগৎ আনন্দে ভরা,
সাজিয়াছে বসুন্ধরা পরিয়া ভূষণ,
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন।

এই কবিতাটির একস্থানে হেম বাবু গীতোক্ত ভগবানের বিশ্বরূপ বর্ণনায় সুন্দর অনুকরণ করিয়াছেন। ইহার পরই তিনি ভগবানের ভুবনমোহনরূপ বর্ণনা করিতেছেন,—

ভুবনমোহন রূপ নেহারি আবার
মহানন্দে বসুন্ধরা করয়ে বিহার।
যখন বসন্তকালে নাচিয়া তরঙ্গ চলে.
ধীর সমীরণে খেলে তটিনীর পুলিনে,
নিদাঘে জোছনা নিশি হাসিয়া অমিয় হাসি,
যখন উদয় হয় তারাহার গগনে
পুনঃ যবে বরষায় বেগে স্রোতধারা ধায়,
কুতূহলী বনস্থলী শিখী নাচে বিপিনে,
যখন সুধার আশে শরৎচন্দ্রমা পাশে
চকোর চকোরী ভাসে দূর শূন্য গগনে,
দেখি বসুমতী হাসে আনন্দিত মনে
জয় জগদীশ জয় বলরে বদনে॥"

হেমেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "জগৎ শোভার ভাণ্ডার। সংসার সংঘাতে, জীবন সংগ্রামের তাড়নায় ও যাতনায়, নানা প্রবল প্রবৃত্তির উন্মাদকারী উত্তেজনায় আমরা সে সকল লক্ষ্য করিবার অবকাশ পাই না। কবির প্রতিভা সে সকলকে পরিস্ফুট করিয়া তুলে। সৃষ্টির প্রভাতে যেদিন আদিম মানব নগ্ন সরলতায় বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে জগতের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছিল, সেদিন স্নেহময়ী প্রকৃতি তাহার নয়নসমক্ষে কি সৌন্দর্য্যরাশি মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, অন্ধ কবি মিলটন তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। আজ দৃষ্টি হারাইয়া কবির নিকট সেই সকল সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ সুন্দর বোধ হইতেছে; সেই ভাব তাঁহার "কৌমুদী", "খদ্যোত", "আলোক", "প্রজাপতি" প্রভৃতি কবিতায় প্রকাশিত। প্রজাপতির শোভায় মুগ্ধ কবি বিহ্বল হৃদয়ে বলিয়াছেন,—

কিছুই না পাই ভেবে আদি অন্ত সীমা,
সকলই আশ্চর্য্য ভব,
অদ্ভুত তোমার ভব,
কে জানে, মহিমাময়, তোমার মহিমা!"

"আলোক" শীর্ষক কবিতা সম্বন্ধে প্রভাতকুমার বলেন, "আলোক কবিতাটি দেখিবার জিনিষ। কবির চক্ষে এখন 'চির অস্তমিত দিনমণি'—এ অবস্থায় তিনি আলোক সম্বন্ধে কি লেখেন জানিতে সকলেরই কৌতূহল হইতে পারে। বিরহেই ত ভালবাসার বিকাশ বল, পরিপাক বল, যাহা কিছু সবই। প্রথম যখন বিশ্বলোকে আলোকের আবির্ভাব হইল, তখন কিরূপ হইল, হেমবাবু তাহারই বর্ণনা করিতেছেন। এস্থলে তিনি

যাহা কল্পনা করিয়াছেন ইংরাজী কিংবা সংস্কৃত কোনও সৃষ্টি-কল্পনার সঙ্গে তাহা মিলে না। বাইবেলে লেখা আছে ঈশ্বর আলোক সৃষ্টি করার পর জীব সৃষ্টি করিলেন।. শ্রীমদ্‌ভাগবতের সৃষ্টি কল্পনা অত্যন্ত জটিল। বঙ্গ কবি কল্পনা করিতেছেন, সৃষ্টির আর যাহা কিছু সমস্ত শেষ হইলে, পরে আলোকের সৃজন। কল্পনাটি সুন্দর হইয়াছে। জীবগণ জন্মাবধি কেহ পরস্পরকে দেখে নাই, প্রকৃতিকেও দেখে নাই, শব্দে শুনিয়াছে, স্পর্শে অনুভব করিয়াছে মাত্র। তাহাদের যে দৃষ্টিশক্তি বলিয়া একটা শক্তি আছে, তাহাও তাহারা জানিত না। এমন অবস্থায় শুভক্ষণে বিশ্বপতি অন্ধকারের যবনিকা সহসা উত্তোলিত করিলেন। কি বিস্ময়, কি সুখ, কি আনন্দের তরঙ্গ জীব জগৎকে আকুল করিয়া দিল!

জগৎ হইল আলোকময়
ঘুচিল আঁধার জড়তা ভয়।
বিধাতার এই অতুল ভুবন,
হইল তখন নন্দন কানন।
তরুলতা তৃণ মৃৎ ধাতু জল
নিজ নিজ রঙে সাজিল সকল।
পতঙ্গ বিহঙ্গ কুরঙ্গ কুঞ্জর
কিরণ মাখিয়া অতি মনোহর।
রঞ্জিল গগন বিবিধ বরণে,
নানা বনফুল ফুটিল কাননে।
আলোকে প্রকাশ হইল তখন
সুন্দর স্বর্গীয় মানব বদন
হেরি সে বদন পশু পক্ষী যত
নিজ নিজ শির করিল নত।"

'চিত্তবিকাশে'র অন্তর্গত 'জন্মভূমি' ও 'কি সুখের দিন' শীর্ষক কবিতাদ্বয় কবির আত্মকথায় পরিপূর্ণ। কবির বাল্যজীবনের পরিচয় প্রদানকালে আমরা শেষোক্ত কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। "জন্মভূমি" শীর্ষক কবিতাটির কোন কোনও অংশে হেমচন্দ্রের পূর্ব্বরচিত কবিতার গাম্ভীর্য্য ও উদ্দীপনা লক্ষিত হয়। হেমেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "যাঁহারা মনে করিবেন যে এ পুস্তকে হেমচন্দ্রের পূর্ব্বের কবিতার গম্ভীর ও উত্তেজক ভেরী নিনাদ নাই, তাঁহারা ভ্রান্ত। বর্ত্তমান পুস্তকের অধিকাংশ কবিতায় সে জ্বালাময় অগ্নিশ্বাসী ভাব না থাকিলেও, সেই ভেরী নিনাদের প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হইয়াছে,—সে ধ্বনি বড় মধুর—বড় চিত্তবিমোহক। "বৃত্রসংহারে" হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

কে আছে ত্রিলোক মাঝে প্রাণী হেন জন
সুদূর প্রবাস ছাড়ি বহুদিন পরে
আসি ফিরি নিজ দেশে—কিবা মরু আর
গিরিকূট, অরণ্যানী—নিরখি পূর্ব্বের
পরিচিত গৃহ, মাঠ, তরু, সরোবর,
নদী, খাত, তরঙ্গ, নির্ঝর, প্রাণিকুল
নাহি ভাসে উল্লাসে, না বলে মনোসুখে
'এই জন্মভূমি মম।'

'চিত্তবিকাশে' তিনি লিখিয়াছেন,—

জগতে জননী জনম-ভুবন
গুরুত্ব গৌরবে দুই অতুলন
স্বরগ(ও) নিকৃষ্ট দুয়েরই কাছে।

* *

কে আছে এমন মানব সমাজে,
হৃদি-তন্ত্রী যার আনন্দে না বাজে,
বহুদিন পরে হেরি স্বদেশ।
না বলে উল্লাসে প্রফুল্ল অন্তরে
প্রেম-ভক্তি-মোহ-অনুরাগ-ভরে
এই জন্মভূমি—আমার দেশ।*
তুমি বঙ্গমাতা এত হীনপ্রাণা,
এত যে মলিনা এত দীন হীনা,
তোমারও সন্তান স্বদেশে ফিরে
হেরে তব মুখ মনে ভাবে সুখ

---

* এই কয়টি পংক্তি স্যর ওয়াল্টর স্কটের নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি স্মরণ করাইয়া দেয় —

Breathes there a man with soul so dead,
Who never to himself hath said,
This is my own—my native land ?
Whose heart hath ne'er within him burned,
As home his foot steps he hath turned,
From wandering on a foreign strand ?

প্রাণের আবেগে হইয়া সোৎসুক
নিজ জন্মদেশ আনন্দে হেরে।

হে জগৎপতি, এ দাস মিনতি,
রেখো এই দয়া বঙ্গমাতা প্রতি,
বঙ্গবাসী যেন কখন(ও) কেহ
যেখানেই থাক্, যেখানেই যাক,
যতই সম্মান যেখানেই পাক,
না ভুলে স্বদেশ ভকতি স্নেহ।

বরদাচরণ মিত্র

বঙ্গভূমির প্রতি এমন ভক্তিভরা স্নেহের কথা কবিতায় বহুদিন পাঠ করি নাই।"

বৃত্রসংহারে হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

জগত কল্যাণ হেতু নরের সৃজন
নরের কল্যাণ নিত্য পরের পালনে।

"চিত্তবিকাশে" "ধনবান" শীর্ষক কবিতায় হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

সাধিতে জগৎ হিত ধনীর সৃজন
বিধাতা তাদের হস্তে দিয়াছেন ধন
জগতের সুমঙ্গল করিয়া মনন
এ কথা যে বুঝে মর্ত্ত্যে দেবতা সে জন।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ বলেন, "ইহা পাঠ করিলে কবি সাশ্রুনয়নে আপনার কথায় যাহা বলিয়াছেন তাহাই মনে পড়ে—

নিজপর ভাবি নাই অনন্ত উপায়—
যে এসেছে আশা করে দিয়েছি তাহায়।"

"ভালবাসা" শীর্ষক কবিতার :আলোচনা প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রপ্রসাদ উহাতে প্রকটিত প্রবল "পেসিমিষ্টিক সুর" দেখিয়া "ব্যথিত ও আশঙ্কিত" হইয়াছিলেন। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, "যিনি একদিন যে প্রেমে—

পরাণে পরাণ বাঁধা প্রণয়ের ভরে
পরিপূর্ণ পরিতোষ প্রেমীর অন্তরে

সেই প্রেমের মধুর গীত গাহিয়াছেন, তিনিই বর্ত্তমান পুস্তকে বলিতেছেন—

এ যে ভালবাসা ভরা দেখি এ সংসার,
ভালবাসা নয় ইহা স্বার্থের বিকার,
স্নেহ দয়া মায়া আর যাহা কিছু বল
ভালবাসা কিন্তু তবু নহে এ সকল।
ভালবাসা বলি যারে পরাণে যেয়াই,
সে ভালবাসারে হায় কোথা গেলে পাই?
পরাণের বিনিময়ে পরাণ বিকাই,
এ ভালবাসা কি তবে পৃথিবীতে নাই।"

ক্রমশঃ

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

"প্রতাপসিংহ"-এর গান। *

দ্বিতীয় গীত

[রচনা—স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

মেহের্‌উন্নিসা।

খাম্বাজ—যৎ।

বসিয়া বিজন বনে, বসন-আঁচল পাতি,
পরাতে আপন গলে, নিজ মনে মালা গাঁথি।
তুষিতে আপন প্রাণ, নিজ মনে গাই গান ;
নিজ মনে করি খেলা, আপনারে করে' সাথী।
নিজ মনে কাঁদি হাসি, আপনারে ভালবাসি,
সোহাগ, আদর, মান, অভিমান, দিনরাতি॥

[স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

আস্থায়ী

২´　　　৩　　　০　　　১
II{সা　সা　।　রগমা　-পা　।　-া　-ধর্সা　।　-ণা　-া　I
ব　সি　　স্বা০ ০　০　　০　০ ০　　০　০

২´　　　৩　　　০　　　১
I ধা　-া　।　পা　মগমা　।　গরা　গা　।　-া　-া　I
বি　০　　জ　ন০ ০　　ব ০　নে　　০　০

২´　　　৩　　　০　　　১
I মা　মা　।　মা　-া　।　-পা　পা　।　পা　পা　I
ব　স　　ন　০　　০　আঁ　　চ　ল

২´　　　৩　　　০　　　১
I -া　-া　।　পক্ষা　পা　।　-া　-া　।　-মঃ　গাঃ　I
০　০　　পা ০　তি　　০　০　　০　০

---

* "প্রতাপসিংহ"এর গানের স্বরলিপি ধারাবাহিকরূপে "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে, এব
নাটকান্তর্গত গানগুলি অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গীত হয়, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হইবে।

—লেখিকা।

	২´			৩			০			১..		
[	গা	মা	।	পা	-া	।	-া	পা	।	পপা	-পধা	I
	প	রা		তে	০		০	আ		প ন	০০	

	২´			৩			০			১		
[	পধা	-পধা	।	-পর্সা	র্সা	।	-ণা	-ধা	।	-পঃ	-মাঃ	I
	গ০	০০		০০	লে		০	০		০	০	

	২´			৩			০			১		
[	মা	মা	।	পা·	ধণা	।	-ধা	-পা	।	মা	মা	I
	নি	জ		ম	নে০		০	০		মা	লা	

	২´			৩			০			১		
[	-া	-া	।	গা	গা	।	-মগা	-মগমগা	।	-রঃ	-সাঃ	}II
	০	০		গাঁ	থি		০০	০০০০		০	০	

প্রথম অন্তরা

	২´			৩			০			১		
{	মা	মা	।	পধণা	-র্সা	।	-া	-র্সা	।	-া	-র্সা	I
	তু	মি		তে০০	০		০	০		০	০	

	২´			৩			০			১		
[	-া	গা	।	গা	ধণা	।	পা	ধা	।	-া	-া	I
	০	আ		প	ন০		প্রা	ণ		০	০	

	২´			৩			০			১		
[	ণা	ণা	।	ণা	ণা	।	-া	-া	।	ধা	ধা	I
	নি	জ		ম	নে		০	০		গা	ই	

	২´			৩			০			১		
[	-ণা	-ধা	।	-ণধা	-ণধণধা	।	পক্ষা	পা	।	-া	-া	I
	০	০		০০	০০০০		গা ০	ন		০	০	

	২			৩			০			১:.		
[	গা	মা	।	পা	পা	।	-া	-া	।	পপা	-ধা	I
	নি	জ		ম	নে		০	০		করি	০	

	২´			৩			০			১		
[	পধা	-পধা	।	-পর্সা	র্সা	।	-ণা	-ধা	।	-পঃ	-মাঃ	I
	খে০	০০		০০	লা		০	০		০	০	

২´ ৩ ০ ১
I মা মা । পা ধণা । -ধা -পা । মা মা I
আ প না রে০ ০ ০ ক রে

২´ ৩ ০ ১
I -া -া । গা গা । -মগা -মগমগা । -রঃ -সাঃ }II
০ ০ সা থী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

দ্বিতীয় অন্তরা

২´ ৩ ০ ১
II{ মা মা । মা পধণা । -র্সা -া । -র্সা -া I
নি জ ম নে০০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I -র্সা ণা । ণা ধণা । -পা ধা । -া -ধা I
০ কাঁ দি হা০ ০ সি ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I ণা ণা । ণা ণা । -া -া । ধা ধা I
আ প না রে ০ ০ ভা ল

২´ ৩ ০ ১
I -ণা -ধা । -ণধা -ণধণধা । পক্ষা পা । -া -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ বা ০ সি ০ ০

২ ৩ ০ ১
I গা মা । পা -া । -া পা । পপা -ধা I
সো হা গ ০ ০ আ দর ০

২ ৩ ০ ১
I পধা -পধা । -পর্সা -া । -ণা -ধা । -পঃ মাঃ I
মা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন

২´ ৩ ০ ১
I মা মা । পা ধণা । -ধা -পা । মা মা I
অ ভি মা ন ০ ০ ০ দি ন

২´ ৩ ০ ১
I -া -া । গা গা । -মগা -মগমগা । -রঃ -সাঃ }II II
০ ০ রা তি ০০ ০০০০ ০ ০

হিন্দী গান 'খৎ'-তালে যখন গীত হয়, তখন সাধারণতঃ চারিপদ বিশিষ্ট ১৪ মাত্রার ঠেকার সহিত চলিয়া থাকে। তন্মধ্যে ও ৩য় পদ প্রত্যেকে তিন মাত্রা-যুক্ত, এবং ২য় ও ৪র্থ পদ প্রত্যেকে চার মাত্রায় পূর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক বাঙ্গলা গানে, ই স্বরলিপিতে দেওয়া তালাঙ্কানুযায়ী, 'খৎ' তালের একটি পূর্ণমঞ্চ আট মাত্রায় পরিসমাপ্তি হয়। ঠেকা যথা:—

২´ ৩ ০ ১
I তা তিন্ । নাতা তিন্ । তা তিন্ । ধিন্ ধিন্ I

—লেখিকা।

সাহিত্য-সমাচার

মীর্জাপুর সাহিত্য-সম্মিলনীর পদক পুরস্কার।

বর্ত্তমান বর্ষে সম্মিলনী হইতে নিম্নলিখিত পদকগুলি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখককে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

১। সুচিত্রা রৌপ্যপদক, বিষয়—কারখানা ও হশিল্প।

২। পুরন্দর রৌপ্যপদক, বিষয়—জাতিভেদ ও র্তমানে হিন্দু সমাজ।

৩। গঙ্গারাম স্মৃতিপদক (রৌপ্য) বিষয়—শরৎ-দ্রের উপন্যাস সমূহের স্ত্রী চরিত্র।

৪। সরস্বতী রৌপ্যপদক, বিষয়—রঞ্জন শিল্প।

প্রবন্ধ সমূহে মৌলিকতা থাকা আবশ্যক। চতুর্থ বন্ধে স্বীয় অভিজ্ঞতার কথাই লিখিতে হইবে, উপযুক্ত বেচিত না হইলে কেহই পুরস্কার পাইবেন না। রচনা শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ সালের মধ্যে সম্পাদকের নামে ঠাইতে হইবে।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত "নবীন-ন্যাসী" উপন্যাস ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। মূল্য ২।•

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "পত্রচিত্র" নামক কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হইল। মূল্য ৸•

শ্রীমতী উমা গুপ্তা প্রণীত "ঘুমের আগে" নামক কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

শ্রীমতী ননীবালা দেবী প্রণীত "পাহাড়ের গল্প" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১৲

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত রহস্য-লহরী উপন্যাসমালার ৫৯ ও ৬০নং উপন্যাস "রাজকীয়-গুপ্তকথা" ও "অদৃশ্য-সংগ্রাম" প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত পঙ্কজ গল্পগ্রন্থ যন্ত্রস্থ। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত "গৌরাঙ্গ" কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

পঞ্চশর

চিত্রকর—শ্রীজিতেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

MANASI PRESS.
CALCUTTA.

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

১৪শ বর্ষ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩২৯

১ম খণ্ড
৩য় সংখ্যা

সাঁওতাল পুরাণ

হিন্দুদিগের পুরাণ শাস্ত্রে, খ্রীষ্টীয়গণের ওল্ড টেষ্টামেণ্ট গ্রন্থে, মুসলমানদিগের কোরাণাদিতে, দ্রাবিড়ীগণের পুরাণশাস্ত্রে যেমন প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক একটা কাল্পনিক বিবরণ আছে, সেইরূপ সাঁওতালদিগেরও একটা পুরাণ আছে। তবে সাঁওতালদিগের লিপিবিদ্যা না থাকায় তাহাদের লিখিত পুরাণ নাই। যাহা আছে তাহা তাহারা বংশানুক্রমে শুনিয়া মনে গাঁথিয়া রাখে। তাহাদের এই অলিখিত পুরাণশাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্ব আছে, তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের একটা ধারা আছে এবং তাহাদের সভ্যতা ও চিন্তা-প্রণালীর অনুরূপ নানা প্রাচীন কাহিনী আছে।

সৃষ্টিকাণ্ড।

অতি প্রাচীনকালে ঠাকুর-বাবা (১) মানুষ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সুবিধা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের জন্য নানা প্রকার বিধান করিয়াছিলেন। ঠাকুর বাবার সৃষ্টিতে মানুষকে পরিশ্রম করিয়া কোনও কিছু প্রস্তুত করিতে হইত না। মানুষের যাহা আবশ্যক তাহা প্রকৃতিতে প্রচুর পরিমাণে জন্মাইত। মানুষ ইচ্ছামত তাহা কুড়াইয়া লইয়া ভোগ দখল করিত। কিন্তু মানুষ নিজের দোষে ঠাকুর বাবাকে চটাইয়া সেই সমস্ত সুবিধা হারাইয়াছে।

তখন সাঁওতালেরা চম্পারাজ্যে (২) কিস্কুরাজাদিগের (৩) অধীনে পরমসুখে বাস করিত। তাহারা অতি

---

(১) বাবা যেমন একটা সংসারের স্বামী বা গৃহস্বামী তেমনি ঠাকুর-বাবা এই বিশ্বসংসারের স্বামী বা কর্ত্তা। বিমানবিহারী সূর্য্যদেবই সাঁওতালদের ঠাকুর বাবা।

(২) এই চম্পা কোথায় ছিল?

(৩) সাঁওতালদিগের মধ্যে পৌরাণিক যুগে দ্বাদশ শ্রেণী বা বর্ণ ছিল। স্বশ্রেণীতে ইহাদের বিবাহ হইত না। 'কিস্কু' ইহাদের অন্যতম; কিস্কুগণই পৌরাণিক যুগে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের রাজত্ব আমাদের 'রাম-রাজত্বের' ন্যায় সর্ব্বসুখের হেতুভূত ছিল।

সরল ও ধর্ম্মভীরু ছিল এবং ঠাকুরের পূজা করিত। সেই জন্য ঠাকুরের খুব স্নেহ ছিল। ধান-গাছে তখন ধান জন্মাইত না,—একেবারে তুষবিহীন চাউল গাছে ধরিত,—সাঁওতালদিগকে ঢেঁকিতে ধান ভাঙিয়া চাউল করিয়া লইতে হইত না—গাছ হইতে তুলিয়া লইলেই হইত। কাপাস গাছে তূলা হইত না; একেবারে সাঁওতালদিগের পরিধানোপযোগী বস্ত্র কার্পাস-বৃক্ষের ফল-স্বরূপে জন্মাইত। তূলা হইতে সূতা ও সূতা হইতে বস্ত্রনির্ম্মাণের পরিশ্রম সাঁওতালদিগকে করিতে হইত না। আর একটা বিশেষ সুবিধা ছিল এই যে, মাথার উকুন তুলিবার জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তির সাহায্য আবশ্যক হইত না। কারণ মাথার খুলি (skull) তখন জোড়া ছিল না; আবশ্যকমত খুলিয়া লইয়া পরিস্কার করিয়া, পুনরায় পাগড়ীর ন্যায় মাথায় বসাইয়া দিলেই চলিত।

সাঁওতালদিগের এই পৌরাণিক সুখসম্ভারের অন্তরায় হইয়াছিল একটী হীন-স্বভাবা দাসী। খ্রীষ্টীয়গণের ইবা (Eva) ও গ্রীকদিগের প্রজেপীনার (Proserpinaর) ন্যায় এই রমণীই সাঁওতালদিগের পৌরাণিক সুখে হানা দিয়াছে। এই রমণী এক রাজার দাসী ছিল। একদিন মাঠে মল ত্যাগ কালে গাছ হইতে চাউল তুলিয়া খাইয়া ফেলে। আর একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ তাহার এই ছিল যে, গোশালা পরিষ্কার করিবার কালে এই রমণী গোময় দ্বারা পরিধেয় বস্ত্র কলঙ্কিত করিত। ঠাকুর বাবা এ প্রকার অপবিত্রতা দেখিতে পারিলেন না। এ অপরাধের ভয়ঙ্কর শাস্তি হইল। ঠাকুর বাবা ক্রুদ্ধ হইয়া গাছে চাউল ধরা বন্ধ করিয়া দিলেন। সেই অবধি গাছে ধান হয়, চাউল হয় না। কারণ তুষাবৃত না থাকিলে পুনঃ পুনঃ চাউল এই ভাবে অপবিত্র হইত। আর হইল এই যে, গাছে কাপড় জন্মান বন্ধ হইয়া গেল। গাছে সেই অবধি কাপাস ফল ধরে। নতুবা এই ভাবে চিরকাল দুষ্টস্বভাবা রমণীগণ নিসর্গজাত বস্ত্র অপবিত্র করিত। আর মানুষের মাথার খুলি মানুষের মাথায় জুড়িয়া গেল; পাগড়ীর ন্যায় আল্গা হইয়া লাগিয়া থাকিল না। কারণ তাহা না হইলে তাহারা মাথা অপবিত্র করিবার সুযোগ পাইত। (৪)

প্রাচীনকালে আকাশখানা পৃথিবীর গায়ে লাগিয়া থাকিত এবং ঠাকুর বাবা আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া সাঁওতালদিগের ঘর-বাড়ী দেখিয়া যাইতেন। সেই জন্য সাঁওতালদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ ঘরের উঠানে, সদর দরজায় বা খিড়কি দুয়ারে উচ্ছিষ্ট দ্রব্যাদি বা উচ্ছিষ্ট ভোজন পত্রাদি ফেলিয়া রাখিতে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের আদেশ অনুসারে রাত্রিকালে ঘরে কোনও উচ্ছিষ্ট বাসন রাখিবার উপায় নাই; কারণ ঠাকুর বাবা সাধারণতঃ রাত্রিকালেই পৃথিবী পরিদর্শনে আগমন করেন। তিনি যদি কোনও গৃহে উচ্ছিষ্ট বাসন দেখিতে পান, তাহা হইলে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েন। ফলে অভিশাপ ও অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু স্ত্রীজাতিই সাঁওতালদিগের সর্ব্ব অনিষ্টের মূল হইয়াছে। কারণ একদিন এক রমণী রাত্রিকালে আহারের পর উচ্ছিষ্ট শাল-পত্র সমূহ ঘরের বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছিল। বাতাসে উড়িয়া সেই পাতা আকাশে চলিয়া যায়। তাহাতে ঠাকুর বাবা অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া পৃথিবী হইতে আকাশটাকে বহুদূরে সরাইয়া দিয়াছেন; কারণ মানুষের এত অপবিত্র ব্যবহার তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই।

এই জন্য এখনও সাঁওতালেরা রাস্তায় উচ্ছিষ্ট পাতা ফেলিতে নিষেধ করে এবং নিজেরা উচ্ছিষ্ট পাতা রাস্তায় ফেলে না। লোকালয় হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে তাহারা উচ্ছিষ্ট পাতা ফেলিয়া দিয়া আইসে।

---

(৪) এই স্থানে উল্লেখ করা যায় যে, সাঁওতালেরা অতি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। তাহাদের আরণ্যগৃহ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত হইলেও অতি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরের দেওয়ালের চতুর্দ্দিক ইহারা লেপিয়া পরিস্কার করে। উঠানটী রোজ লেপিয়া পরিষ্কার করে। আমাদের অনেক হিন্দু গৃহস্থের গৃহ অপেক্ষা ইহাদের আরণ্য গৃহ পরিষ্কার। ইহাদের ঘর ও উঠান চক্চকে তক্তকে। কোথাও কোনও আবর্জ্জনা নাই। একটী পাতাও পড়িয়া থাকে না।

সাঁওতালদিগের ঠাকুর বাবা হইতেছেন 'সিং চন্দো' বা সূর্য্যদেব ; এবং 'নিন্দ্ চন্দো' বা চন্দ্রদেব তাঁহার পত্নী। সাঁওতালদিগের অপবিত্র ব্যবহারে ঠাকুর বাবা বা 'সিং চন্দো' অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া পৃথিবীর সমস্ত সাঁওতাল বা মনুষ্যকে ধ্বংস করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়েন। আকাশে যে সকল তারা বা নক্ষত্র দেখা যায়, উহারা 'সিং চন্দো' ও 'নিন্দ চন্দোর' পুত্র কন্যা। আজকাল রাত্রিকালে যত তারা দেখা যায়, সেকালে দিবা ভাগেও ঐ প্রকার অসংখ্য তারা আকাশে দেখা যাইত। দিনমানের তারাগুলি সিং চন্দোর পুত্র কন্যা আর রাত্রিকালের তারাগুলি নিন্দ চন্দোর। এইরূপে তাঁহারা আপন পুত্র কন্যা ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। এখন 'সিং চন্দো'র প্রতিজ্ঞা হইল মনুষ্যজাতির (অর্থাৎ সাঁওতাল জাতির) উচ্ছেদ সাধন করিতেই হইবে এবং সেই সঙ্গে তাঁহার পুত্র কন্যাদেরও ধ্বংস করিতে হইবে। তাহা হইলেই সৃষ্টি নাশ হইবে। 'নিন্দ চন্দো' স্নেহে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি ত আর সৃষ্টি নাশ দেখিতে পারেন না। কিন্তু উপায় কি ? 'সিং চন্দো'র ইচ্ছায় বাধা দেয় কে ? তথাপি 'নিন্দ চন্দো' অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। অনেক কথা-কাটাকাটির পর ঠাকুর-বাবা একটু নরম হইলেন। বলিলেন, নূতন সৃষ্টির জন্য দুইটী মানুষ ও দুইটী তারা রাখিয়া দিয়া অবশিষ্ট যাবতীয় নর-নারী ও তারকার ধ্বংস হইবে।

অবশেষে স্থির হইল 'পিল্চু-হারাম' ও 'পিল্চু-বুধি' নামে যুবক ও যুবতীকে বাদ দিয়া সমস্ত মনুষ্যজাতির ধ্বংস হইবে। আর তারার মধ্যেও শুকতারা ও সন্ধ্যাতারাকে ছাড়িয়া দিয়া অবশিষ্ট সমস্ত তারার ধ্বংস হইবে, এই স্থির হইয়া গেল। সুতরাং ঐ যুবক ও যুবতীর প্রতি সিংচন্দোর আদেশ হইল, "এই গহ্বরে প্রবেশ কর।" তাহারা ভয়-বিহ্বল চিত্তে গর্ত্তে প্রবেশ করিল। তাহার পরে ঐ গহ্বর কাঁচা চামড়া দিয়া সিংচন্দো স্বয়ং ঢাকিয়া দিলেন।

তার পর ধ্বংসকার্য্য আরম্ভ হইল। এ ধ্বংস হিন্দুদিগের প্রলয়ের ন্যায় পৃথিবীকে জলময় করিয়া হয় নাই। খ্রীষ্ট-ধর্ম্মিগণের ন্যায় 'নোআর জাহাজ' (Noah's Ark) সৃষ্টিও হইল না। সূর্য্যের দাহিকা শক্তি অগ্নিরূপে বর্ষিত হইতে লাগিল। সমস্ত পৃথিবী পুড়িতে লাগিল। বন, জঙ্গল, মানুষ, জানোয়ার, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ—সব দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি এই অগ্নিবর্ষণ চলিল। গহ্বরের ভিতরে থাকিয়া সাঁওতাল যুবক ও সাঁওতাল যুবতী 'বাহা' সুরে গান ধরিল :—

"পাঁচ দিন, পাঁচ রাত আগুন বরষিবে!—হো!
পাঁচ দিন, পাঁচ রাত, বড় বড় রাত! হো!
কোথা রইবি তোরা দুজন সাঁওতাল মানুষ?—হো!
কোথা গেলে রক্ষা পাবি তোরা? হো!
একটা চামড়া আছে, একটা চামড়া আছে হে।
একটা পাহাড় আছে একটা পাহাড় হে!
আর একটা আছে তাতে গভর হে।
সেইখানে রব আমরা দুটি হে।
সেইখানে রক্ষা পাব দুটী হে।"

পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রির অবসানে যখন তাহারা গহ্বরের বাহিরে আসিল, তখন তাহারা প্রথমেই একটা 'কর্কে' গাছের মাথা ভাঙ্গিয়া পুড়িতে পুড়িতে একটা গাভীর উপর পড়িয়াছে, গাভীটী পুড়িয়া মরিয়া গিয়াছে, তাহার পার্শ্বেই একটা মহিষ গাই পুড়িয়া মরিয়াছে। তাহা দেখিয়া তাহারা গান ধরিল—

গাইটী ধক্ ধক্ ছাই হে ধক্ ধক্ ছাই!
করকের গাছ পুড়ে ছাই!
পড়ে আছে মহিষ গাই পুড়ে হয়ে ছাই হে
পুড়ে হয়ে ছাই।"

এই প্রকারে যে যে বস্তু তাহারা দেখিল, তাহা দেখিয়াই বিলাপের গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল। অন্য পক্ষে আকাশের বালক-বালিকা তারকা-কুলের কি হইল দেখুন।

হাজার হইলেও নিন্দ চন্দোর রমণীর হৃদয়। আপন পুত্র কন্যার ধ্বংস হইবে ইহা মাতৃহৃদয়ে সহ্য হইল না।

‘সিং চন্দোর সহিত তিনি একটু চালাকি খেলিলেন। আপনার ভাগের যাবতীয় তারকা-কুলকে তিনি একটা ঝুড়ির মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। তার পর মুখে রাঁঙা রঙ মাখাইয়া সিংচন্দোকে বলিলেন, “আমার মুখ দেখ, আমি আমার ছেলেদের খাইয়া ফেলিয়াছি। তাহাদের রক্তে মুখ রাঙা হইয়াছে। তুমি তোমার ছেলেদের খাইতে পার।” সুতরাং শুকতারা’ ও সন্ধ্যাতারাকে বাঁধ দিয়া সমস্ত তারাগুলিকে সিংচন্দো খাইয়া ফেলিলেন। সেই অবধি আর দিনে তারা নাই।

এইরূপ সমস্ত কার্য্য করিয়া সিংহচন্দোর আর দ্বিতীয় বার পৃথিবী দগ্ধ করিবার শক্তি থাকিল না। সুতরাং ‘নিন্দ চন্দো’ এইবার নিশ্চিন্তমনে আপন পুত্র কন্যাগণকে লুক্কায়িত করিয়া দিলেন। কিন্তু তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়া দিলেন যে, বাপা তাহাদিগকে দেখিলে ক্রুদ্ধ হইবেন। চাঁদের ছেলেমেয়েরা রাত্রিকালে আকাশে খেলা করিতে লাগিল। ‘সিংচন্দো তাহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। ক্রোধে অধীর হইয়া ‘সিংচন্দো’ ‘নিন্দচন্দো’র দিকে তাড়া করিয়া আসিলেন। ভয়ে তারাগণ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। সেই অবধি তাহারা বিক্ষিপ্তই আছে—তার পূর্ব্বে সকলে একস্থানে ছিল। ‘সিংচন্দো তাহাদিগকে কিছু না বলিয়া ‘নিন্দ চন্দো’কে দুই টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। সেই জন্য সেই কাল হইতে চাঁদের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। তৎপূর্ব্বে চাঁদ সূর্য্যের ন্যায় চির পূর্ণাঙ্গ ছিলেন।

আর সেই যে দুইজন মানুষ বাঁচিল—‘পিলচু-হারাম’ ও ‘পিলচু বুধি’—তাহাদের দ্বাদশ পুত্র ও দ্বাদশ কন্যা জন্মে। তাহাদের দ্বারা ক্রমশঃ মনুষ্যজাতির বৃদ্ধি হইয়া সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ হইয়াছে। তার পর সেই বারো জন হইতে ক্রমে খাদ্যের বিভিন্নতা অনুসারে সাঁওতালদিগের বারো জাত হইয়াছে।

* * *

একদিন ‘চন্দো’ বনে কাঠ কাটিতে গিয়াছেন; ফিরিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তাঁহার পত্নী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাই তিনি কতকগুলি মশা সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। উদ্দেশ্য—মশার কামড়ে অস্থির হইয়া চন্দো গৃহে ফিরিবেন। কিন্তু ‘চন্দো’ তাহা করিলেন না। তিনি কতকগুলি ডাস সৃষ্টি করিলেন, তাহারা মশা ধরিয়া খাইতে লাগিল। তখন নিন্দ চন্দো আরও অনেক জানোয়ার সৃষ্টি করিয়া পাঠাইলেন। সিংচন্দো মারিয়া ফেলিলেন। অবশেষে ‘নিন্দ চন্দো একটি ব্যাঘ্র সৃষ্টি করিয়া পাঠাইলেন। সিংচন্দো কতকগুলি কাঠের কুচো ছুঁড়িয়া মারিলেন। কাঠের কুচোগুলি বৃকে পরিণত হইয়া ব্যাঘ্রের অনুসরণ করিল। ব্যাঘ্র পলাইল। সেই অবধি ব্যাঘ্র বৃককে ভয় করে।

চন্দো ঘরে ফিরিলে তাঁহার পত্নী তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, “তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তোমার সৃষ্টির এত জীবজন্তুকে খাইতে দেয় কে?”

চন্দো বলিলেন, “আমি সকলকে খাইতে দিয়াছি।” তাঁহার পত্নী একটি পতঙ্গ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। দেখাইলেন লোহার পাত্র মধ্যে পতঙ্গ ঘাস খাইতেছে। চন্দো লজ্জিত হইলেন।

* * *

জন্মান্তরবাদ।

সাঁওতালেরা আত্মার দেহান্তর পরিগ্রহ বিশ্বাস করে। ইহাদের ঠাকুর জল, স্থল, আকাশ, মানুষ, গরু, মাছ, পোকা, ও অন্যান্য যাবতীয় প্রাণী ও বৃক্ষাদি এক কালে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় সৃষ্টি করিয়াছেন। সে সংখ্যা কমেও না, বাড়েও না। যতদিনে দেহ মধ্যে তাহারা বাড়িয়া পূর্ণাঙ্গ হইবে, ঠাকুর তাহাও ঠিক করিয়া দিয়াছেন। তাহার ফলে এই হইয়াছে যে মানুষের শরীরেও কুকুর বিড়াল প্রভৃতি ইতর প্রাণীর আত্মা প্রবেশ করে। আর কুকুর প্রভৃতির শরীরেও মানুষের আত্মা প্রবেশ করে। যদি কোনও মানুষের শরীরে মানুষের আত্মা থাকে, তবে তাহার আচার ব্যবহার ভদ্রোচিত হইবে। বিড়াল কুকুরের আত্মা

পাইলে মানুষ কলহপ্রিয় হয়। ভেকের আত্মা পাইলে মানুষ নির্জ্জনতাপ্রিয় ও মুখ-চোরা হয়। বাঘের আত্মা হইলে মানুষ অত্যন্ত ক্রোধী হয়, কিছুতেই শান্ত হয় না।

এ বিষয়ে একটি গল্প আছে। এক ব্রাহ্মণ গাছ গাছড়া দিয়া চিকিৎসা করিত। তাহার দুই পত্নী ছিল। তাহারা বড় কলহপ্রিয় ছিল। তাহাদের কলহে বিরক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ যোগীর বেশে গৃহত্যাগ করে। চলিতে চলিতে সে এক সহরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন সহরে মড়ক লাগিয়াছে। অসংখ্য মৃতের লাশ একটা গাছের নীচে স্তূপাকারে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। গাছের উপরে দুইটা শকুনি ছিল। একটি শকুনি অন্যটিকে বলিতেছে, "কোন্ লাশটি আমরা প্রথমে খাইব?" অন্য শকুনি কোনও উত্তর না করায় প্রথম শকুনি পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করে। তাহাতে সে বলে, "দেখিতেছ না নীচে মানুষ আছে।" ব্রাহ্মণ পাখীর ভাষা বুঝিত বলিয়া এই সব কথা বুঝিতে পারে। তাহারা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন তুমি এখানে বসিয়াছ? তোমার কি কোনও বিপদ ঘটিয়াছে?" ব্রাহ্মণ তাহার পত্নীদ্বয়ের কথা বলিল। শকুনিরা তাহাকে একটি করিয়া পালক খসাইয়া দিয়া বলিল, "এই পালক কাণে গুঁজিয়া দেখিলে তুমি মানুষ চিনিতে পারিবে।" তখন ব্রাহ্মণ গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। ঐ পালক কাণে দিয়া যাইতে যাইতে ব্রাহ্মণ এক গ্রামে দেখিল, কতকগুলি লোক বিড়াল, কতকগুলি লোক শিয়াল আবার কেহ বা কুকুর। ঘরে গিয়া দেখিল, তাহার একটি পত্নী কুকুরী ও অপরটি শূকরী। সুতরাং সে ঘরে না ঢুকিয়াই ফিরিল। প্রতিজ্ঞা করিল যে, যে রমণী হাতে করিয়া ভিক্ষা দেয় তাহাকেই বিবাহ করিবে। কারণ অন্য প্রাণীতে মুখে করিয়া ভিক্ষা দেয়।

এক গ্রামে এক চামারের কন্যা তাহাকে হাতে করিয়া ভিক্ষা দিতে আসিল। ব্রাহ্মণ দেখিল, সে প্রকৃতই মানবী। তখন সে চামারকে বিবাহের অভিপ্রায় জানাইল। চামার তাহাতে ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "আমরা চামার, আমাদের ঘরে বিবাহ করিলে তোমার জাতিনাশ হইবে। তুমি অমন কথা মুখে আনিও না।" ব্রাহ্মণ তাহাতেও বিচলিত না হওয়ায় চামার অপরাপর চামারদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া, গ্রামের মণ্ডলদিগকে ডাকিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিল। তখন ব্রাহ্মণ তাহার সমস্ত পরিচয় দান করিল। শুনিয়া সকলে খুসী হইল। ব্রাহ্মণ চামার হইয়া সুখে দিন কাটাইতে লাগিল।

* * *

পরলোক।

মৃত্যুর পর পরলোকে গিয়া মানুষকে অতি কষ্টে কাল যাপন করিতে হয়। 'চন্দো বোংগা' তাহাদিগকে অত্যন্ত খাটাইয়া লয়। সেখানে মেয়েরা এরণ্ড ফল খলে ভাঙ্গিয়া তৈল প্রস্তুত করে। বীজ হইতে চন্দো বোংগা মানুষ গড়ে। সারাদিন তাহাদিগকে পরিশ্রম করিতে হয়। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। যে সকল স্ত্রীলোকের ছেলে, আছে তাহারা ছেলেকে স্তন্যদান করিবার জন্য কিঞ্চিৎ অবসর পায়। আর যে সকল পুরুষ তামাক পাতা চিবাইয়া খায়, তাহারা সেই কার্য্যের জন্য কিঞ্চিৎ অবসর পায়। এই কারণে সাঁওতালেরা তামাক পাতা চিবাইয়া খাইতে শিখে। হুঁকায় তামাক পোড়াইয়া খাওয়ায় কোনও লাভ নাই; কারণ সেজন্য ছুটী পায় না। এখানে কেহ জল খাইতে পায় না। পুষ্করিণী বা সরোবরে যে সকল ভেক প্রহরী আছে, তাহারা কাহাকেও জলে নামিতে দেয় না। এই জন্য সাঁওতালদের মৃত্যুকালে তাহাদের সঙ্গে জলপানের পাত্র দেওয়া হয়, কারণ পাত্র থাকিলে তাহাতে করিয়া জল তুলিয়া লইয়া তাহারা খাইতে পারে। পরলোকে জল খাইতে পাইবার আর একটা উপায় আছে। জীবিতকালে অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করিলে সাঁওতালেরা পরলোকে জল খাইবার সুবিধা পায়। পুণ্যের ফলে নহে, পাপের শাস্তিস্বরূপে। অশ্বত্থবৃক্ষের পত্র পুষ্করিণীর জলে পড়িয়া জল কলুষিত করে বলিয়া

বৃক্ষরোপণকারীকে জলে নামিয়া পাতা কুড়াইয়া ফেলিতে হয়। তাহাতে তাহার জল খাইবার সুবিধা হয়।

* * *

তামাকের উৎপত্তি।

এক ব্রাহ্মণ-বালিকার কোনও জ্ঞাতি না থাকায় বিবাহ হয় নাই। অবিবাহিত অবস্থায়ই তাহার পরলোক হয়। তাহার শবদাহ করিয়া লোক-জন ফিরিয়া যাইলে পর চন্দো ভাবিলেন, "এই বালিকা সংসারে গিয়া অনাদৃত হইয়াছে। ইহাকে এমন একটা বর দান করিব যে, অতঃপর পৃথিবীর সকল লোকেই ইহার সমাদর করিবে।" এই ভাবিয়া তিনি ঐ বালিকার শ্মশানে তামাক গাছ জন্মাইয়া দিলেন। এক রাখাল-বালক গোচারণের কালে দেখিল তাহার ছাগল ঐ গাছের পাতা খাইতে লাগিল। রাখাল মনে করিল পাতাটা বোধ হয় মিষ্ট হইবে; তাই সে একটা পাতা লইয়া মুখে দিল। কিন্তু পাতা তিক্তাস্বাদ বলিয়া মুখে রাখিতে পারিল না, ফেলিয়া দিল। অপর একদিন তাহার দন্তশূল হওয়ায় নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগেও যখন তাহার রোগ সারিল না, তখন কি-মনে-করিয়া সে এক পাতা তামাক মুখে দিল। চিবাইতে চিবাইতে তাহার দন্তশূল ভাল হইয়া গেল। তখন সে তামাকপাতা চিবাইয়া খাওয়া অভ্যাস করিল। একদিন একটুকরা হাড়-পোড়া চূর্ণ দিয়া একটা তামাকপাতা ঘষিয়া দেখিল তাহাতে তাহার স্বাদ ভাল হয়। সুতরাং সেই অবধি সে চূণ দিয়া তামাক পাতা খাওয়া ধরিল। তাহার দেখাদেখি অনেকেই তামাক ধরিল। ক্রমে পৃথিবীতে তামাকপাতার সমাদর বাড়িতে লাগিল। এখন তামাকের চাষ চলিতেছে।

* * *

হরিচন্দ্ ও ষোলশত গোপিনী।

কোনও অবিবাহিতা রমণীর গর্ভসঞ্চার হওয়ায় সে এক জঙ্গলের মধ্যে বাঁশঝাড়ে একটী পুত্র ও একটী কন্যা প্রসব করিয়া চলিয়া যায়। এক বন্য গাভী তাহাদিগকে স্তন্যদান করিয়া মানুষ করে। কোনও লোকে তাহাদিগকে আনিতে গেলে গাই শিঙ নাড়িয়া তাড়াইয়া দিত। অবশেষে বালক বালিকা বড় হইয়া পরস্পরকে বিবাহ করিল। তখন গাভী তাহাদিগকে রাখিয়া চলিয়া গেল। ঠাকুর আকাশ হইতে ষোলশত গোপিনী পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা শিখর রাজ্যে আসিয়া ঐ বালক বালিকাকে তাহাদের রাজা ও রাণী করিল। রাজার নাম হরীচন্দ্। এখন রাজা হরীচন্দের দুর্গ ও রাজধানী কোথায় হইবে তাহা বিচার করিবার জন্য সভা হইল। রাজা ও রাণী সভার মধ্যস্থলে বসিলেন। দক্ষিণ পার্শ্বে হিকিম্ মুহুরি বসিল; বামে বসিল ভুজা ও জগনাথ মুহুরি। গোপিনীরা বৃত্তাকারে তাহাদিগকে ঘিরিয়া বসিল। স্থির হইল, পাচেট পাহাড়ে হরীচন্দের রাজধানী হইবে। পচেট পাহাড়ে রাজধানী ও দুর্গ নির্ম্মাণ হইয়া গেল। অনেক সাঁওতাল চম্পা হইতে আসিয়া সেখানে বাস করিল। হরীচন্দের শিখর রাজ্য সমৃদ্ধিপূর্ণ হইল। হরীচন্দের পিতা মাতার পরিচয় ছিল না বলিয়া, সাঁওতালেরা তাহাকে 'বোংগা' (দেবতা বা অপদেবতা) বলে। রাজা হরীচন্দ 'চাতার' পরব করিয়াছিলেন।

* * *

অজ্ঞাত-পিতৃক বালক-বালিকা।

যদি কোনও ভ্রষ্টা রমণীর পুত্র কন্যা জন্মে এবং লজ্জা বা ভয় বশতঃ রমণী ছেলের পিতার নাম না করে, তাহা হইলে প্রসূত সন্তানকে 'চন্দোর ছেলে' বলা হয়। তাহার জন্মকালে প্রতিবেশীদিগের সভা বা উৎসব হয় না। ছেলের শিরোমুণ্ডন বা নামকরণ (নার্তা) হয় না। ছেলে কোনও জাতির অন্তর্নিবিষ্ট হয় না। পুত্র হইলে তাহার নাম হয় 'চান্দু' বা 'চন্দ্রাই' বা কখনও কখনও 'বীরবস্তো'; আর কন্যা হইলে তাহার নাম হয় 'চন্দ্রো' বা 'চান্দমুনি' বা 'বোরেলা'। কিছুকাল পরে

গোপন রাখিবার সর্ত্তে সন্তানের মাতা তাহার মাতা বা তৎস্থানীয় কোনও রমণীর নিকট সন্তানের পিতার নাম বলে। এবং তখন ছেলের পিতৃবংশের কাহারও নাম অনুসারে ছেলের নাম রাখা হয়। কিন্তু ছেলের পিতার নাম কেহ জানিতে পারে না। ছেলে বড় হইলে তাহার একটা ডাক-নাম রাখা হয়। পরে বালকের কীর্ত্তি-কলাপ যশস্কর হইলে তাহার নাম নূতন করিয়া রাখা হয় এবং সাঁওতাল বলিয়া তাহাকে গ্রহণ করা হয়। যদি কখনও পিতা আত্মপ্রকাশ না করে এবং পুত্রকে গ্রহণ করিতে না চাহে, তাহা হইলে মাতা পুত্রকে জন্মকালেই মারিয়া ফেলে বা পুতিয়া রাখে। যাহারা ওঝার কাজ করে তাহারা এই গর্ত্ত খুঁজিয়া হত বালকের অস্থি সংগ্রহ করিয়া রাখে। কারণ এই অস্থি যাদুবিদ্যায় তাহাদের প্রধান সহায়।

শ্মশানভীতি।

শ্মশানে 'বোংগা' থাকে, 'বোংগা'রা মানুষ খায়। মানুষ মরিলে 'বোংগা' হয়। শ্মশানে 'বোংগা' দেখিলে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া কোনও লাভ নাই; কারণ 'বোংগা' ঘন ঘন দেহ পরিবর্ত্তন করে। কখনও বা মানুষ বেশে কখনও বা ইতর প্রাণীর বেশে 'বোংগা' বিচরণ করে। তাহারা আক্রমণ করিলে কেহ এড়াইতে পারে না। ছোট ছেলে মারা গেলে 'ভূত' হয়, আর গর্ভবতী রমণী মারা গেলে 'চুরিন্' হয়, গর্ভবতী রমণী গ্রামের বাহিরে বা শ্মশানে যাইতে পায় না। কারণ 'বোংগা' সর্ব্বত্রই তাহাদের অনিষ্ট করিবার জন্য বিচরণ করে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

খেয়া শেষে

খেয়ার শেষে নৌকা বেঁধে মাঝি
গৃহের পানে চল্‌ছে ফিরে আজি।
পড়ছে মনে অরুণ রাগে ভোরে,
হালটা ধরা দরাজ বুকের জোরে,
তুচ্ছ করে নদীর প্রলয় হানা;
আগিয়ে যাওয়া না শুনে সেই মানা,
নৌকা নিয়ে নদীর ঢেউয়ে নাচা,
চতুর্দ্দিকে সূর্য্য কিরণ কাঁচা,—
ফেরার পথে আজকে ক্ষণে ক্ষণে
সে সব কথা পড়ছে তাহার মনে।

হাস্যগানে বরযাত্রীর দল
ছাপিয়েছিল নদীর কলকল।
বিয়ের কনের সজল নত আঁখি,
মাঝির বুকে ছাপটী গেল রাখি,
কত শিশুর চাঁদের মত মুখ
কতই হাসি ভরলো মাঝির বুক।
ঝঞ্ঝা ঝালাস্ হরপা বানের জল,
মাঝির বুকে আনলে নূতন বল।
ফেরার পথে আজকে ক্ষণে ক্ষণে
সে সব কথা পড়ছে তাহার মনে।
ভীষণ নদীর তুফান পানে চেয়ে
কাঁদলো কাহার কোলের ছোট মেয়ে।

ঘাসগুলি সব বানের জলে এসে
পাশ দিয়ে তার চকিত গেল ভেসে।
ভাসিয়ে নেওয়া ফুল ও ফলের ভার
পরশ করে গেল নায়ের দাঁড়।
সূর্য্য ডোবে আঁধার আসে ঘিরে,
মলিন ছায়া জমছে তীরে নীরে।
দিনের আলো শেষ করে ওই মাঝি
দীপের ছায়ে ফিরছে ঘরে আজি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

পৌরাণিক ভূগোল

আমাদের পুরাণগুলিতে অনেক বিষয়ের মধ্যে পৃথিবীর ভৌগোলিক বিবরণও আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় নানা কারণে সে সকল বিবরণ অবিশ্বাস্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহার মধ্যে প্রধান কারণ পৌরাণিক নামের সহিত আধুনিক নামের মিল নাই। তদ্ভিন্ন পৃথিবীর প্রধান বিভাগ ৭টি দ্বীপ ও ৭টি সমুদ্র বাস্তবিক মানচিত্রে খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই যেহেতু ৭টি দ্বীপ কোনরকমে বাহির করা যাইতে পারে কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে লবণ সমুদ্র ব্যতীত দধি, দুগ্ধ, ইক্ষু, ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্যের সমুদ্র মরজগতে আর পাইবার উপায় নাই। কেন এরূপ অবিশ্বাস্য কথা পুরাণে স্থান পাইল তাহার কারণ সহজে বুঝা যায় না।

মহর্ষি বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি সঙ্কলন করিয়াছিলেন হিন্দুর এই প্রবাদে আস্থা স্থাপন করিলে, একটু গোলমাল বাধিয়া যায়। কারণ একই ব্যক্তি পুরাণগুলি সঙ্কলন করিলে ভূগোল ও ভবিষ্যরাজ সম্বন্ধে একই শ্লোক বিভিন্ন পুরাণে স্থান পাইত না। সুতরাং এ প্রবাদ ছাড়িয়া দিয়া আমরা ধরিয়া লইব যে, পুরাণগুলি বিভিন্ন লোকের সংগৃহীত এবং পুরাণগুলি আমরা যেমন পাইতেছি তেমনই আলোচনা করিব।

পার্জিটার সাহেব বহুদিন যাবৎ বহু হস্তলিখিত পুথি ও মুদ্রিত পুরাণ লইয়া আলোচনা করিয়া কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেই কথাগুলি এখানে বলিয়া তবে প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা করিব। তিনি বলেন মৎস্য, বায়ু, বিষ্ণু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ তৃতীয় হইতে চতুর্থ খৃঃ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান ভবিষ্য পুরাণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও অধুনা লুপ্ত এক ভবিষ্যপুরাণ ছিল, তাহা হইতে বহু বিবরণ মৎস্য,বায়ু, বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণে গৃহীত হইয়াছে। এই পুরাণগুলির মধ্যে প্রথমে মৎস্য, তৎপরে বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড এবং সর্ব্বশেষে ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ রচিত হয়। এই মৎস্য, বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ প্রথমে প্রাচীন প্রাকৃত ভাষায় রচিত হয়, পরে তাহা সংস্কৃতে তরজমা করা হইয়াছিল। প্রায় সমস্ত পুরাণগুলিরই বক্তা সুত। পুরাণগুলিতে প্রথমে কেবল ক্ষত্রিয় রাজগণের প্রাচীন কাহিনী মাত্র ছিল, পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত দ্বন্দ্বে জয়লাভ করিবার জন্য ব্রাহ্মণেরা ইহার মধ্যে নানা দার্শনিক তথ্য সম্বলিত কাহিনী সংযোজিত করেন। পুরাণগুলির রচনার স্থান মগধ, কেন না মগধের ভবিষ্য রাজবংশ সম্বন্ধে যেমন বিস্তৃত বিবরণ আছে তেমন অন্য কোন রাজবংশ সম্বন্ধে নাই।

পার্জিটার সাহেবের সহিত সকল বিষয়ে আমাদের মতের ঐক্য না থাকিতে পারে, কিন্তু পুরাণগুলি যে ভাট বা চারণ জাতির মত সুত বা মাগধজাতি কর্ত্তৃক প্রথমে প্রাকৃত ভাষায় কীর্ত্তিত হইত পরে, তাহা সংস্কৃত রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। গুণাঢ্যের "বৃহৎকথা" প্রাকৃত ভাষায় প্রথমে লেখা হয়। ইহার সংস্কৃত অনুবাদ প্রচলিত হইলে, প্রাকৃত ভাষায় লিখিত পুস্তকের অনাদর হওয়ায় তাহা ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায় এবং পণ্ডিত সমাজে তর্জ্জমা পুস্তক "কথা-সরিৎসাগরের"ই আদর হয়। "ললিত বিস্তর"ও এইরূপ প্রাকৃত ভাষায় লিখিত পুস্তকের অনুবাদ, ছন্দঃ ঠিক রাখিতে গিয়া অশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক এইরূপ তর্জ্জমা করিতে গিয়াই সুরা, সর্পি দধি, দুগ্ধ, ইক্ষুর সমুদ্র যে পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছে এই আজগুবি বিবরণের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। বর্ত্তমান পুরাণগুলি তুলনা করিলে বুঝা যাইবে যে বিভিন্ন পুরাণ বা বিভিন্ন লিখিত বিবরণ হইতে এক পুরাণের সর্ব্বপ্রকার বিবরণের উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের ৪৯ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে আছে, সুত পূর্ব্বতন মুনিগণ কর্ত্তৃক নির্দিষ্ট পুরাণসম্মত

বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। অধুনা ইয়ুরোপীয়গণ কর্ত্তৃক লিখিত ভূগোল বিবরণও বিভিন্ন লোকের সংগ্রহ করা। যাহা হউক এইবার প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

পুরাণগুলির মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেই প্রাচীন ভৌগোলিক বিবরণ বিস্তৃতভাবে আছে; সুতরাং এক ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অবলম্বন করিয়াই আমি এ বিষয়ের আলোচনা করিব। সাধারণতঃ দেখিতে পাই সমস্ত পুরাণেই পৃথিবীকে ৭টি দ্বীপে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথমে জম্বু দ্বীপ, তাহার চতুর্দ্দিকে তাহারই বিস্তৃতির অনুরূপ লবণ সমুদ্রের বিস্তৃতি; তাহার চতুর্দ্দিকে প্লক্ষ দ্বীপ, প্লক্ষ দ্বীপের বিস্তার জম্বুদ্বীপের বিস্তারের দ্বিগুণ। তাহার চতুর্দ্দিকে ইক্ষু সমুদ্র,তাহার চতুর্দ্দিকে শাল্মলী দ্বীপ। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সুরা, ঘৃত, দধি ও ক্ষীর সমুদ্র ও মাঝে মাঝে কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর দ্বীপ। প্রায় প্রত্যেক দ্বীপে ৭টি করিয়া বর্ষ পর্ব্বত, ৭টি করিয়া নদী ও ৭টি করিয়া বর্ষ আছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই সাত সংখ্যাটি মঙ্গলকর সংখ্যা বলিয়া সর্ব্বত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেই ইহার আরও বিস্তর দৃষ্টান্ত আছে।

এখন এই সাত দ্বীপের মধ্যে জম্বু দ্বীপের অংশবিশেষের অবস্থান সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, কেন না ভারত বর্ষ এই জম্বু দ্বীপের ৭টি (২৮।৩৪ অধ্যায়) বর্ষের অন্যতম বর্ষ। কিন্তু বর্ত্তমান সমগ্র ভারতবর্ষেরই কি প্রথম ভারতবর্ষ নাম ছিল। অর্থাৎ তখন ভারতবর্ষের বিস্তার কতদূর ছিল? এ প্রশ্নের সমাধান সহজ নহে। বেদে এক ভারত বংশের নাম পাওয়া যায়, ম্যাক্‌ডনেল ও কীথ সাহেবেরা বলেন, যে প্রদেশে ভারতবংশ রাজত্ব করিত পরে তাহাই কৌরবদের অধিকৃত হয়। চন্দ্রবংশীয় রাজা দুষ্মন্তের পুত্রের নাম নাম ভরত, আবার প্রিয়ব্রত যে সাত পুত্রকে সাত দ্বীপের অধিপতি করেন সেই সাত পুত্রের মধ্যে অগ্নীধ্রের প্রপৌত্রের নাম ভরত। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের এক মতে হিমাহ্ব নামক বর্ষ, ভরতের নামে ভারতবর্ষ নাম পাইয়াছে (৫৪।৩৩)। আবার অন্য মতে প্রজাগণের ভরণ করেন বলিয়া মনু ভরত নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তজ্জন্য এই বর্ষের নাম ভারতবর্ষ (১০।৪৮)। এই দুই মত দুই বিভিন্ন পুরাণের। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের সম্পাদক তাহা মিলাইয়া দেখিবার সুবিধা পান নাই বলিয়াই বোধ হয়। ইহার মধ্যে অগ্নীধ্রের প্রপৌত্র হইতেই যে, এই হিমাহ্ব বর্ষের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে তাহাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়।

ম্যাকডনেল ও কীথ সাহেবের মতে যখন কুরু বংশীয়েরা ভারতরাজ্য অধিকার করেন, তখনও পাঞ্চাল, কোশল, বিদেহ, কাশী প্রভৃতি রাজ্য পৃথক্ ছিল। সুতরাং বৈদিক যুগে হিমাহ্ব বর্ষ বা ভারতবর্ষ পশ্চিম হিমালয়ের অন্তর্গত ও সন্নিহিত কিয়দংশে আবদ্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয়। জৈন হরিবংশ মতে জম্বুদ্বীপে ৫টি ক্ষেত্র ছিল যথা বিদেহ ক্ষেত্র, ভরতক্ষেত্র, ধাতকী খণ্ড, পুষ্করার্দ্ধ ও ঐরাবত ক্ষেত্র। ভরতক্ষেত্রে চম্পা, কৌশাম্বী, হস্তিনাপুর ও অযোধ্যা এই কয়টি পুরীর নাম আছে। সুতরাং বর্ত্তমান সমগ্র ভারতবর্ষ যে, পূর্ব্বে ভারতবর্ষ নামে অভিহিত হইত না ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আলেকজান্দারের ভারতবর্ষ আক্রমণ সময়ে বা মেগাস্থেনেসের পাটলীপুত্রে অবস্থান কালে বা তৎপূর্ব্বে ভারতবর্ষ নাম প্রচলিত থাকিলে "ইণ্ডিয়া" নাম প্রচলিত হইত না। কোনও দেশের সমস্ত অংশ এক রাজার অধীন না হইলে, সহজে এক নামে অভিহিত হয় না। কোন ভরত বা কোন ভারতীয় রাজা যে কোনদিন সমস্ত ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াছিলেন এমন প্রমাণও নাই।

এখন দেখা যাউক জম্বুদ্বীপের নামের উৎপত্তি কিরূপে হইল। দ্বীপগুলির নাম তুলনা করিলেই দেখা যাইবে প্লক্ষ, শাল্মলী, জম্বু, শাক ও কুশ নাম গাছের নাম। পুরাণগুলিতে লিখিত আছে প্লক্ষ, শাল্মলী, জম্বু ও শাক বৃক্ষ হইতে দ্বীপগুলির নামকরণ হইয়াছে। ইহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না যে, একটি বড় গাছ হইতে একটা বড় দেশের নামকরণ হইতে পারে। জম্বু এই নামকরণ সম্বন্ধে পুরাণে লিখিত আছে যে, মেরুর দক্ষিণ

দিকে পর্ব্বতের দেবসেবিত শিখরে স্নিগ্ধ পর্ণ ভূষিত মহামূল ও মহাস্কন্ধ বিশিষ্ট এক জম্বু বৃক্ষ আছে। তাহার হাস্তীর মত বড় বড় অমৃততুল্য স্বাদু ফল পর্ব্বতের উপর পড়ে। এই ফল হইতে মধুবাহিনী জম্বু নামে নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এই নদীতে জাম্বুনদ নামে অনলপ্রভ স্বর্ণ জন্মে। দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ ও পন্নগগণ অমৃততুল্য মধুর জম্বুরস পান করিয়া থাকেন। এমন গল্প বোধ হয় কেহই বিশ্বাস করিবেন না। বোধ হয় অনেকেই জানেন তিব্বত দেশে ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি-স্থলে ইহার নাম 'চাম্পু।' 'চাম্পু অর্থে তিব্বতী ভাষায় বৃহৎ নদী। এই 'চাম্পু কথাটির চ এর উচ্চারণে একটু বিশেষত্ব আছে। কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র, পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, শ্যামটীন প্রভৃতি দেশে চ'এর দুই প্রকার উচ্চারণ আছে। এক সাধারণ চ, আর এক প্রকারের চ উষ্মবর্ণ। ইহা প্রায় স এর উচ্চারণের কাছাকাছি। ইংরাজীতে চ এর সাধারণ উচ্চারণ ch দিয়া লেখা হয়, কিন্তু এই উষ্ম উচ্চারণ বুঝাইতে ts দিয়া লেখা হয়। তাই ব্রহ্মপুত্রনদের মূলস্রোতের ইংরাজী নাম tsampu, আমি এই উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য চ এর পূর্ব্বে একটি ফুটকি দিয়াছি। মারাঠী ভাষাতেও এই-রূপ প্রথা আছে। এখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। আমরা বাঙ্গালীরা অকারের যেমন উচ্চারণ করি তেমন আর কোথাও নাই। অন্যত্র অকার, আকারের হ্রস্ব। আবার পূর্ব্বতাতারের তুর্কী ভাষা, তিব্বতী ভাষা এবং আরও অনেক ভাষায় বর্গের প্রথম বর্ণ ও তৃতীয় বর্ণের উচ্চারণে বড়ই গোলমাল হয়। অর্থাৎ প উচ্চারণ করিতে কোথাও ব উচ্চারিত হয়, আবার ব উচ্চারণ করিতে কোথাও প উচ্চারিত হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে প্রথম বর্ণ অঘোষ এবং তৃতীয় বর্ণ ঘোষবৎ—একই স্থান হইতে প্রথমটি শ্বাসের জন্য এবং তৃতীয় বর্ণ নাদের জন্য পৃথক শোনায়। আমরা বাঙ্গালীরাও শাক, বক উচ্চারণ করিতে শাগ্, বগ্ বলি। সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধির সূত্র আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ব শব্দের অন্তস্থ প্রথম বর্ণ স্থলে কোন কোন স্থলে তৃতীয় বর্ণ হয়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, জম্বু বা 'চাম্পু কথাটির অর্থ বৃহৎ নদী। এই 'চাম্পু নদীতে পূর্ব্বে সামান্য খুঁড়িলেই সোনা পাওয়া যাইত, তাই এই সোনার নাম ছিল জাম্বুনদ। এখনও অভিধানে স্বর্ণপর্য্যায়ে জাম্বুনদ নাম পাওয়া যায়।

এখন ভারতবর্ষের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান ভারতবর্ষের উত্তরাংশে দুইটি বৃহৎ নদ আছে, একটি সিন্ধু অপরটি ব্রহ্মপুত্র। মধ্যে ব্যবধান নিতান্তই অল্প। দ্বীপ কথাটার মূল অর্থ দুই জলের মধ্যস্থ স্থান। দ্বীপ কথাটার আর এক রূপ দো আব্। পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে অনেকগুলি দুই নদী মধ্যস্থ স্থানের নাম দোআব্। সুতরাং দেখা যাইতেছে বর্ত্তমান ভারতবর্ষের উত্তর দিক্ হইতে কোন জাতি বিশেষ দুই বৃহৎ জলের বা নদীর মধ্যস্থ স্থানের নাম জম্বুদ্বীপ রাখিয়াছিল।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এক স্থলে জম্বুদ্বীপের ছয়টি বর্ষ পর্ব্বত ও সাতটি বর্ষের নাম করা হইয়াছে যথা হৈমবত বা ভারতবর্ষ, হেমকূট সংস্পৃষ্ট কিম্পুরুষবর্ষ, নিষধ সংস্পৃষ্ট হরিবর্ষ, মেরু সংযুক্ত ইলাবৃত বর্ষ, তৎপরে যথাক্রমে নীল, রম্যক ও হিরণ্ময় বর্ষ। কিন্তু ইহার পরেই শ্বেতবর্ষ ও কুরুবর্ষের নাম আছে (২৪—২৮।৩৪)। ইহার মধ্যে ভারতবর্ষের অবস্থানের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এখন ইলাবৃত বর্ষের অবস্থান বোধ হয় কতকটা নির্ণীত হইতে পারিবে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে একস্থলে লিখিত আছে, ইলাবৃতবর্ষ চতুষ্কোণ ও চারি সহস্র যোজন দীর্ঘ (৩৩।৩৪)। ইহা হইতে অবস্থান বুঝা গেল না। অন্যত্র আছে, ইতিপূর্ব্বে সকলের মধ্যবর্ত্তী যে ইলাবৃত বর্ষের কথা বলিয়াছি সেখানে সূর্য্যের তাপ নাই (১১, ১২।৪৯)। এই বর্ষ মেরুপর্ব্বতের চারি দিকে অবস্থিত (১৬।৪৯)। এই ইলাবৃতবর্ষ চতুষ্কোণ ও শরাবের ন্যায় উচ্চভাবে অবস্থিত (১৭।৪৯)। নানা কারণে আমার মনে হইয়াছে এই ইলাবৃত বর্ষ পামীর মালভূমি। ইংরাজ ভৌগোলিকেরা মালভূমিকে টেবিলের সহিত তুলনা করিয়া টেব্‌ল্

ল্যাণ্ড বলেন, আর আমাদের পুরাণকারেরা শরা বা শরাবের সহিত তুলনা করিয়াছেন। পামীর মালভূমি ১২০০০ ফুট অপেক্ষাও উচ্চ, সেখানে যে সূর্য্যের তাপ নাই একথা বলাই বাহুল্য। ইলা বা ইরা কথাটির অর্থ জল, পঞ্জাবের ইরাবতী ও ব্রহ্মদেশের ইরাবদী নামেই তাহা প্রকাশ। পামীর চিরতুষারে আবৃত বলিয়া বোধ হয় ইহার নাম ইলাবৃতবর্ষ।

এখন দেখা যাউক পামীরকে ইলাবৃত বর্ষ বলিলে অন্যান্য বর্ণনার সহিত মেলে কি না। পুরাণে ভুবন বিন্যাসের বর্ণনায় যে মেরু বা মহামেরুর কথা আছে এই ইলাবৃত বর্ষ তাহার চারিদিকে ও মধ্যস্থলে অবস্থিত। যে পর্ব্বত শ্রেণী সাইবিরিয়ার উত্তর পূর্ব্ব কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজী মানচিত্রের স্তানোভোই, ইয়াব্লোনোই, সায়ান, পামীরের মধ্যভাগ, আলাইতাগ, হিন্দুকুশ, কাপেত দাগ ও এলবুর্জ নামে অবচ্ছিন্ন ভাবে কাম্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ দিক দিয়া এসিয়া মাইনর পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং সমস্ত এসিয়াকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহাই পৌরাণিকের মেরু বা মহামেরু। পুরাণে কথিত হইয়াছে, "এই মেরু পর্ব্বতকে অত্রিমুনি শত কোণ, ভৃগু মুনি সহস্রকোণ, সাবর্ণি অষ্টকোণ, ভাগুরি চতুষ্কোণ, বর্ষায়নি সমুদ্রাকৃতি, গালব শরাবাকৃতি, গার্গ উর্দ্ধবালাকৃতি ও ক্রোষ্টুকি বর্ত্তুলাকার বলিয়াছেন। বস্তুতঃ এই পর্ব্বতের আকৃতি কেহই মনুষ্য জীবনে জানিতে সমর্থ হয় না। যে ঋষি এই পর্ব্বতের যে দিক দেখিয়াছেন, তিনি সেই দিকের আকৃতি অনুমান করিয়াছেন, বাস্তবিক তিনি সমুদয় পর্ব্বতাকৃতি জানিতে পারেন নাই"। (৬৬-৬৮-৩৪) এই পর্ব্বতশ্রেণীর উভয় পার্শ্বেই পামীর বা ইলাবৃত বর্ষ অবস্থিত এবং প্রায় মধ্যস্থলেও আছে।

আবার পুরাণের বর্ণনায় (৩৪-৩৯।৩৪) (১৭-২২।৪৯) নিষধ, নীল, মাল্যবান ও গন্ধমাদন পর্ব্বতের যে অবস্থান লিখিত আছে, তাহার সহিত যথাক্রমে পামীরের নিকটস্থ মুস্তাগ বা কারাকোরাম, থিয়ানশান্, আল্তিনতাগ ও হিন্দকুশের অবস্থানের সঙ্গে মিলিয়া যায়। যথা মেরুর পশ্চিমদিকে গন্ধমাদন পর্ব্বত" (১৮।৪৯) বা হিন্দুকুশ, মেরুর পূর্ব্বভাগে নীল পর্ব্বতের দক্ষিণে ও নিষধ পর্ব্বতের উত্তরে মাল্যবান পর্ব্বত" (২১।৪৯) অর্থাৎ আল্তিন তাগ। "মাল্যবানের পশ্চিমে গন্ধমাদন পর্ব্বত" (৩৮।৩৪)।" একটি নদী ইলাবৃতের মধ্যভাগ ভেদ করিয়া প্রবাহিত হয়।" (২৪।৪৯) মানচিত্রে দেখা যায় চক্ষুঃ বা অক্ষিনদীর মূলস্রোতের অবস্থান ঠিক পামীরের মধ্যস্থলে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের যে অধ্যায়ে (৪৯) এই ইলাবৃত বর্ষের বিস্তৃত বর্ণনা ও পার্শ্বস্থ পর্ব্বতগুলির অবস্থান দেওয়া আছে, ঠিক তাহার পরের অধ্যায়েই (৫০) নিকটস্থ কৈলাস, হিমালয়, মুঞ্জমান্ প্রভৃতি পর্ব্বত এবং চক্ষুঃ, সিন্ধু, সরযু, গঙ্গা প্রভৃতি পরিচিত নদীর উৎপত্তিস্থল এরূপ ভাবে দেওয়া আছে যাহাতে মনে হয় যেন একজন লোক পামীর মালভূমির পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে সহজ পথে আসিয়া কৈলাস প্রভৃতির বর্ণনা করিতেছে। সেই লোকের বর্ণনা হইতেই বোধ হয় ভুবন-বিন্যাসের একটি অধ্যায়ের এই বিবরণ গৃহীত হইয়াছে। আমি সেই বিবরণ হইতে এখানে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি—

বামদিকে হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বে কৈলাসপর্ব্বত, সেখানে শ্রীমান কুবের রাক্ষসগণের সহিত বাস করেন (১।৫০)। কৈলাসের উত্তরপূর্ব্ব কোণে চন্দ্রপ্রভ নামে এক গিরি আছে (৪,৫।৫০)। কৈলাসের দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে পিশঙ্গ পর্ব্বতের পাদদেশে লোহিত নামক এক পর্ব্বত আছে। তাহার পাদদেশস্থিত লোহিত সরোবর হইতে লৌহিত্য নামক এক মহানদ উৎপন্ন হইয়াছে (১০—১২। ৫০)। কৈলাসের দক্ষিণ পার্শ্বে অঞ্জন নামক পর্ব্বতের নিকট বৈদ্যুত নামক পর্ব্বত আছে। তাহার পাদস্থিত মানস সরোবর হইতে সরযু নদী উৎপন্ন হইয়াছে। (১৪—১৫।৫০) কৈলাস পর্ব্বতের পশ্চিমে মহাদেবের প্রিয় মুঞ্জবান্ পর্ব্বত অবস্থিত। ইহা হিমপ্রধান বলিয়া অতিশয় দুর্গম (১৮—২০।৫০) ইত্যাদি।

যে সকল মানচিত্র স্থানের উচ্চতানুযায়ী বিবিধবর্ণে চিত্রিত হইয়া থাকে, তাহাতে এই সকল পর্ব্বত ও নদী সুন্দররূপে চিত্রিত আছে। বর্ণনা এমন বিস্তৃত যে, পড়িলে মনে হয় যেন, কোন সুলেখক ভ্রমণকারীর বর্ণনায় স্বচক্ষে পর্ব্বত, নদী ও সরোবরগুলি দেখিতেছি। কেহ ভারতবর্ষের উত্তর হইতে আসিয়া পূর্ব্বাভিমুখে হিমালয়ের ও কৈলাসের মধ্যে দাঁড়াইলে, তাহার বামদিকে কৈলাস ও দক্ষিণে হিমালয় থাকিবে, নতুবা ভারতবর্ষ হইতে কেহ গিয়া এই স্থানগুলি দেখিয়া বর্ণনা করিলে সরযুর উৎপত্তিস্থল মানস সরোবর বর্ণিত না, কেন না সরযূ নদীর ঠিক উৎপত্তিস্থল মানস সরোবরেরও কিঞ্চিৎ দক্ষিণে। ব্রহ্মপুত্রের এক নাম পূর্ব্বে বলিয়াছি ‘চাম্পূ বা জম্বু কিন্তু এখানে তাহার নাম লৌহিত্য। ইহার একমাত্র কারণ এই অনুমিত হয় যে, যে ব্রহ্মপুত্রকে লৌহিত্য বলিয়াছে আর যে জম্বু বা ‘চাম্পু বলিয়াছে তাহারা ভিন্নভাষাভাষী লোক।

পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি, সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র বেষ্টিত বর্ত্তমান ভারতবর্ষই জম্বুদ্বীপ। কিন্তু ইলাবৃতবর্ষ ও তাহার উত্তরস্থিত নীল, রম্যক বা রমণক, ও হিরণ্ময় বর্ষ জম্বুদ্বীপের বাহিরে পড়ে। ৭ বা ৯সংখ্যা পূর্ণ করিবার জন্য এই বর্ষগুলিকে জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত করা হইয়াছে বলিয়াই আমি মনে করি। ইহার পরে দেখা যাইবে যে, সপ্তদ্বীপের অবশিষ্ট দ্বীপ গুলি জম্বুদ্বীপের নিকটেই ছিল এবং জম্বুদ্বীপের কোন কোন বর্ষ এই সকল দ্বীপের অন্তর্গত।

হিমালয় পর্ব্বত সংস্পৃষ্ট ভারতবর্ষের অবস্থান কোথায় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কিন্তু কিম্পুরুষ বর্ষের ঠিক অবস্থান বুঝিয়া উঠা যায় না। ইহা ভারতবর্ষের পূর্ব্বে কিংবা পশ্চিমে হওয়া সম্ভব। আমার মনে হয় কাশ্মীর প্রদেশই কোনদিন কিম্পুরুষবর্ষ নাম পাইয়াছিল। ঠিক ইহার উত্তরস্থিত কারাকোরাম বা নিষধের চতুপার্শ্বস্থ বর্ষের নাম হায়বর্ষ। নীল বা থিয়ানশান পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ বর্ষের নাম নীলবর্ষ।

"নীলপর্ব্বতের উত্তরে ও শ্বেত পর্ব্বতের দক্ষিণে রমণক নামক বর্ষ আছে। তথায় মানবগণ রতিপ্রিয় বিমল ও জরাদুর্গন্ধ বিবর্জ্জিত ও প্রিয়দর্শন" (৩—৪।৪৭)। মানচিত্রে দেখিতেছি থিয়ানশান পর্ব্বতের উত্তরে আল্তাই পর্ব্বত শ্রেণী, ইহাই পৌরাণিকের শ্বেত পর্ব্বত।

পৌরাণিকেরা হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে, রম্যক বা রমণকবর্ষের অধিবাসীদের সহিত ইয়ুরোপের রোমক জাতির কিছু সম্পর্ক আছে। পরে সংকলন কালে রমক নামে রম্‌ধাতুর সম্পর্ক বাহির করা হইয়াছে। আল্তাই পর্ব্বতের উত্তরে সায়ান পর্ব্বতমালা বা শৃঙ্গবান্ পর্ব্বত। এই দুই পর্ব্বতের মধ্যস্থ ভূভাগ সম্ভবতঃ হিরণ্ময় বা হিরণ্যকবর্ষ। আবার "উত্তর সমুদ্রের নিকটে ও দক্ষিণাংশে উত্তর কুরু বর্ষ (১২।৪৭)। এখানকার ভূমি ও গৃহ সকল বিশুদ্ধ শঙ্খের ন্যায় শুক্ল বর্ণ।" (৩৯। ৪৭) ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সাইবিরীয়ার উত্তরভাগই উত্তর কুরু। কারণ এখানে ভূমি ও গৃহ তুষারের জন্যই শুক্লবর্ণ হইত। ভারতবর্ষের কুরুবংশীয়দের সহিত যে, উত্তর কুরুর অধিবাসীদের সম্পর্ক ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সপ্তদ্বীপ সম্বন্ধে পুরাণে বর্ণনা এই যে, দুই দুই দ্বীপের মধ্যে লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি ও ক্ষীরের সমুদ্র অবস্থিত। আবার উত্তর কুরুবর্ষের নদীগুলিও ক্ষীর, মধু, মদ্য, ঘৃত ও দধি বাহিনী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আবার জম্বুদ্বীপের লোকেরা জম্বুরস পান করে, কেতুমাল বর্ষের (গন্ধমাদন-পার্শ্বস্থিত) লোকে পনস রস পান করে ইত্যাদি। ইহা হইতে মনে হইবে, যাহা ইক্ষুসমুদ্র বা নদী তাহার জলই ইক্ষুরস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যাহারা উত্তর হইতে সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র নদদ্বয়ের মধ্যস্থ ভূভাগের নাম জম্বুদ্বীপ রাখিয়াছিল, তাহারা যখন ভারতে আসিয়া জম্বুদ্বীপকে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরে বেষ্টিত দেখিল, তখন দ্বীপের একটা অর্থ দাঁড়াইল—যে ভূভাগের চারিদিকে জল তাহার নাম দ্বীপ। এই অর্থে যবদ্বীপ, মালয় দ্বীপ ইত্যাদির নাম দ্বীপ। যখন দেখা গেল জম্বুদ্বীপের দুই দিকে লবণ সমুদ্র এবং তাহার জল অপেয়, তখন

অন্যান্য দ্বীপের পার্শ্বস্থ নদীর জল ক্ষীর, দধি, ইক্ষুরস প্রভৃতির ন্যায় সুস্বাদু এইরূপ বর্ণনাই বোধ হয় দেওয়া হইয়াছিল, পরে তাহা সেই সেই নামের সমুদ্রে পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব্বে যে ৯টি বর্ষের কথা বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুটি ব্যতীত অন্যগুলির কোনরূপ উল্লেখ না করিয়াই ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে পৃথিবীপদ্ম বা লোকপদ্মের চারিটি দেশের নাম ও বিবরণ দিয়া ভুবনবিন্যাসের কথা বলা হইয়াছে। একস্থলে বলা হইয়াছে, এই লোকপদ্মের উত্তরে উত্তর-কুরুতে ন্যগ্রোধবৃক্ষ, পশ্চিমে কেতুমালবর্ষে অশ্বত্থবৃক্ষ, দক্ষিণে জম্বুদ্বীপে জম্বুবৃক্ষ, পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্বনামে কদম্ববৃক্ষ (৩৬ অধ্যায়)। আবার অন্যত্র বলা হইয়াছে চতুর্মহাদ্বীপবতী পৃথিবীতে চারিটি দেশ আছে যথা ভদ্রাশ্ব, ভরত, কেতুমাল ও উত্তরকুরু। (৪৩ অঃ) এই দুই স্থল তুলনা করিলে বুঝা যায় জম্বুদ্বীপ ও ভারতবর্ষ এক।

পূর্ব্বের ৯টি বর্ষের মধ্যে ভারত ও কুরু বা উত্তর কুরু বর্ষের অবস্থান দেওয়া হইয়াছে, এখন দুটি নূতন দেশের নাম পাইতেছি কেতুমাল ও ভদ্রাশ্ব। গন্ধমাদন বা হিন্দুকুশ পর্ব্বতের নিকটেই কেতুমাল বর্ষ। কেতুমালের রমণীরা উৎপল বর্ণ (৪।৪৫)। এবং মাল্যবানের পূর্ব্বে ভদ্রাশ্ব বর্ষ (৬।৪৫)। ভদ্রাশ্বের অধিবাসীরা শ্বেতবর্ণ (৮।৪৫)। আর একটি দেশের নাম পূর্ব্ব দ্বীপ দিয়া বলা হইয়াছে, সেখানকার পুরুষগণ বিশুদ্ধ স্বর্ণ ও শঙ্খমিশ্রিত বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল (৩৮।৪৫)। এই পূর্ব্বদ্বীপ যে চীন দেশ তাহার আর সন্দেহ নাই, চীন দেশের পীত জাতিকে স্বর্ণ ও শঙ্খ মিশ্রিত বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল বলা হইয়াছে। এবং তিব্বতের উত্তর পূর্ব্ব ও চীনের উত্তর পশ্চিমস্থ আধুনিক কানসু প্রদেশই একদিন ভদ্রাশ্ব বর্ষ বলিয়া অভিহিত হইত। প্রথমে যাঁহারা অধিবাসীদের এইরূপে বর্ণনা দিয়াছিলেন, কেতুমাল, ভদ্রাশ্ব ও পূর্ব্বদ্বীপের অধিবাসীরা তাঁহাদের হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই বোধ হয় এইরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছিল।

জম্বুদ্বীপ ব্যতীত অবশিষ্ট ৬টি দ্বীপের নাম ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে যে পর্য্যায়ে দেওয়া আছে, অন্যান্য পুরাণে ঠিক সেই পর্য্যায়ে নাই এবং তাহাদের অবস্থানও বোধ হয় সে পর্য্যায়ে ছিল না। বর্ত্তমান আমুদরিয়া বা ওক্‌সুস্ (Oxus) বা পুরাণের চক্ষুঃ বা অক্ষি* নদীর উত্তরস্থ ভূভাগ গ্রীকদের লিখিত বিবরণে সগ্‌দিয়ানা নামে অভিহিত হইয়াছিল। শকদ্বীপ নাম হইতেই যে সুগ্‌দিয়া (না) নামের উৎপত্তি, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ভুবনকোষের পশ্চিমস্থ দেশ কেতুমাল বর্ষের নদীগুলির নামের মধ্যে কুশাবতী, শাকবতী, পুষ্কলা, রুযা প্রভৃতি নাম পাইতেছি (১৭—২২।৪৬)। শাকবতী নদী শাকদ্বীপে, কুশাবতী কুশদ্বীপে ও পুষ্কলা পুষ্করদ্বীপে প্রবাহিত হইত বলিয়াই মনে হয়। আবার গঙ্গার সপ্তধারার মধ্যে চক্ষুঃ নদী তুষার পহ্লব, শক প্রভৃতি জনপদের মধ্য দিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে (৪৬।৫০)। আবার ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের খগোল বিবরণে আছে, মাঘের শেষ দিনের পরে দক্ষিণকাষ্ঠা (মকর ক্রান্তি) হইতে প্রতিনিবৃত্ত সূর্য্য বিষুবস্থ হইয়া ক্ষীরোদসমুদ্রের উত্তরদিকে গমন করেন এবং শ্রাবণমাসে সূর্য্যদেব উত্তর দিকে গমন করিয়া ষষ্ঠ শাকদ্বীপের উত্তরবর্ত্তী দিক্ সকল ভ্রমণ করেন (৭১—৭৩।৫৪)। শকদ্বীপ আমুদারিয়া নদীর উত্তরবর্ত্তী হইলে সমস্ত বিবরণের সহিত সামঞ্জস্য থাকে। আমুদারিয়া ও সিন্ধুনদের মধ্যস্থ ভূভাগে হিন্দুকুশ বা গন্ধমাদন অবস্থিত। এখানকার লোকে পনসরস পান করিত (৪।৪৫)। গ্রীকদের বিবরণে হিন্দুকুশের নাম পারোপানিসাস্ দেওয়া হইয়াছিল। আবার কাশ্মীর বা কিম্পুরুষ বর্ষের লোকে প্লক্ষ রস পান করিত (৭।৪৯)। ইহা হইতে অনুমান হয় সিন্ধু ও আমুদরিয়ার মধ্যস্থ স্থানের নাম একদিন প্লক্ষদ্বীপ ছিল। জৈন হরিবংশ মতে ঐরাবত ক্ষেত্রের পূর্ব্বে ধাতকীখণ্ড এবং

---

* সম্ভবতঃ চক্ষুঃ বা অক্ষি শব্দে জল বা নদী বুঝাইত। বাঙ্গালা দেশে ময়ূরাক্ষি ও কপোতাক্ষ নামে সেই অর্থই বুঝাইতেছে—অর্থাৎ যে নদ বা নদীর জলের বর্ণ ময়ূর বা কপোতের বর্ণের মত।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে পুষ্করদ্বীপের দুইটি বর্ষের মধ্যে একটির নাম ধাতকীখণ্ড। জৈন হরিবংশের ঐরাবত ক্ষেত্র পঞ্জাব বলিয়াই অনুমিত হয়। ধাতকীখণ্ড এই ঐরাবত ক্ষেত্রের পূর্ব্বে না হইয়া পশ্চিমে হইলেই বর্ণনা ঠিক মিলিয়া যায়। হেলমন্দ ও সিন্ধুর মধ্যস্থ ভূভাগে পুষ্কর দ্বীপের মত নদী নাই, বর্ষা নাই। সিন্ধুর পশ্চিম তীরে গ্রীকদের মতে পুকেলাবতী বা পুষ্কলাবতী নামে এক নগরী ছিল। পশ্চিমস্থ কেতুমাল বর্ষের একটি নদীর নাম পুষ্কলা। অন্যান্য দ্বীপের অবস্থান সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারা যায় না। তবে শাকবতী ও কুশাবতী উভয়ই যখন পশ্চিমে অবস্থিত তখন মনে হয় শাকদ্বীপের দক্ষিণে কুশদ্বীপ অবস্থিত ছিল। আর পশ্চিমের কেতুমাল বর্ষের জনপদের মধ্যে ক্রৌঞ্চ নাম আছে। ইহাই সম্ভবতঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে আফগানিস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সমস্ত দ্বীপগুলিই ক্রমে ক্রমে উত্তর পর্য্যন্ত অবস্থিত ছিল।

কোন কোন পুরাণের মতে এক পুষ্করদ্বীপ ব্যতীত অন্য সমস্ত দ্বীপেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল। আবার কোন কোন পুরাণের মতে শাকদ্বীপ ব্যতীত অন্য কোথাও চতুর্ব্বর্ণ ছিল না। শাম্ব পুরাণ মতে শাম্বের সূর্য্যপূজার পৌরোহিত্য করিবার জন্য শাকদ্বীপ হইতে সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণগণ আনীত হন। শীতপ্রধান উচ্চ পর্ব্বতবাসী লোকদের পূজিত সূর্য্য মূর্ত্তির পায়ে বুট দেখিয়া মনে হয়, যাহারা সূর্য্যমূর্ত্তি ভারতে আনিয়াছিল, তাহাদের পরিচ্ছদের সহিত ভারতবাসীর পরিচ্ছদের বেশ পার্থক্য ছিল। উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র এই বুটপরা সূর্য্যমূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয় যে, শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণেরা একদিন উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। বর্ত্তমানে যুক্তপ্রদেশের শাকলদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা শাক দ্বীপের নাম বাহাল রাখিয়াছে। সম্ভবতঃ কোশল রাজবংশও কুশদ্বীপ হইতে আগত। প্রসিদ্ধ শাক্যবংশের নামে শাক কথাটির চিহ্ন আছে। অন্ধ্ররাজ বংশের কয়েকজন রাজা সাতবাহন বা শালবাহন নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। শকাব্দ সেই শালবাহন রাজার সহিত সংযুক্ত থাকিত—যেমন শালবাহন শকাব্দ বা শকনৃপতেরব্দ। ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরা কেহ চষ্টনকে, কেহ নহপানকে শকাব্দের প্রতিষ্ঠাতা মনে করেন কিন্তু অন্ধ্ররাজবংশের মত প্রভাবশালী রাজা কর্ত্তৃক স্থাপিত না হইলে শকাব্দ কখনও আজ পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকিত না। মনে হয় শকদ্বীপের বর্ব্বর অধিবাসীদের ব্যবহারে শকনামের নিন্দা প্রচলিত হইলে অন্ধ্ররাজবংশ ও শাক্যবংশ শাকদ্বীপের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে ভুবনকোষের চারিদিকে যেমন ৪টি দেশের নাম আছে, তেমনই ৪টি বন, ৪টি বৃক্ষ, ৪টি সরোবরের নাম আছে, এবং ৪টি মহানদী যথাক্রমে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সাগরে পড়িতেছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান উত্তর মহাসাগর বা আর্কটিক ওসনকে পুরাণে উত্তর সাগর, প্রশান্ত মহাসাগরকে পূর্ব্বসাগর, ভারত-মহাসাগরকে দক্ষিণ সাগর বলা হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পশ্চিম সাগর কাহাকে বলা হইয়াছে, বুঝা যায় না। মহানদী ব্যতীত পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ছোট ছোট নদী ও অসংখ্য জনপদ ও রাষ্ট্রের নাম আছে—এখন সেগুলিকে সমাক্ত করা কঠিন। কেবল পশ্চিমদিকে কেতুমালবর্ষে বঙ্গ, রাঢ়, ক্রৌঞ্চ জনপদ এবং শাকবতী, কুশাবতী, পুষ্কলা, কৃষা প্রভৃতি পরিচিত নাম পাইতেছি। ইহা হইতে অনুমান হয় যে পশ্চিমদিকেই শাকদ্বীপ, কুশদ্বীপ, পুষ্করদ্বীপ ও ক্রৌঞ্চদ্বীপ অবস্থিত ছিল, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বঙ্গ ও রাঢ় নাম এই পশ্চিম হইতেই কি বাঙ্গলায় আসিয়াছে ?

৪৮ অধ্যায়ে দক্ষিণদিকে ভারতবর্ষের ৯টি ভাগ বলা হইয়াছে—ইহার এক ভাগ হইতে অন্যভাগে যাওয়া অতিশয় দুঃসাধ্য। সাগর বেষ্টিত দ্বীপ যাহা কুমারিকা হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাহাই নবমঃদ্বীপ বা ভারতখণ্ড। অপর দ্বীপ কয়টির নাম ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরু, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব্ব ও বারুণ। ইন্দ্রদ্বীপ : ব্রহ্মদেশ এবং তাম্রবর্ণ সিংহল।

কিন্তু অন্যগুলি কোন্ দেশ বলিতে পারি না। ভারতখণ্ডের পূর্ব্ব প্রান্তে কিরাত, পশ্চিমপ্রান্তে যবন ও মধ্যভাগে চতুর্ব্বর্ণ বাস করে। এই ভারতখণ্ডে বা নবমদ্বীপে ৭টি কুলাচল পর্ব্বত আছে যথা হিমালয়, বিন্ধ্য, পারিপাত্র, শুক্তি, সহ্যাদ্রি, মহেন্দ্র, মলয় ও ঋক্ষ। প্রত্যেক কুলাচল হইতে নির্গত কতকগুলি নদীর নাম দেওয়া আছে, তাহা হইতে মহেন্দ্র, মলয় ব্যতীত আর সকলগুলির নাম ও অবস্থান বেশ বোঝা যায়। তাহাতে একটু পরিবর্ত্তন ঘটে দেখিতেছি। যাহা বর্ত্তমানে বিন্ধ্য তাহা পুরাণের পারিপাত্র এবং পুরাণের বিন্ধ্য মধ্যপ্রদেশের মহাদেও পর্ব্বত শ্রেণী, ঋক্ষ অমরকণ্টক মালভূমি, সহ্যাদ্রি পশ্চিমঘাট পর্ব্বত শ্রেণী।

মহেন্দ্র উড়িষ্যার নীলগিরি এবং মলয় দাক্ষিণাত্যের আনামলৈ পর্ব্বত বলিয়া বোধ হয়। নদীগুলির মধ্যে একটির নামের সহিত তাতার দেশের একটি হ্রদের নামের আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দেখিতেছি—মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে নির্গত একটি নদীর নাম ঋষিকুল্যা আর তাতার দেশের হ্রদটির নাম ইস্‌সিকুলা। ইহারই নিকটে ইয়ুএচি জাতিরা ভারতে প্রবেশের পূর্ব্বে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়াছিল।

ভারতের জনপদ ও রাষ্ট্রগুলির নাম এইরূপ,—মধ্য জনপদের নাম কুরু, পাঞ্চাল, শূরসেন, কুন্তল, কাশী, কোশল প্রভৃতি,উত্তরে বাহ্লীক, আভীর, পহ্লব, গান্ধার যবন, সিন্ধুসৌবীর,মদ্রক, শক,হূণ. পারদ, কেকয় প্রভৃতি জাতি এবং কাশ্মীর, চুলিক প্রভৃতি দেশ অবস্থিত। ইহাতে গুর্জ্জরদের নাম নাই। খৃষ্টীয় পঞ্চমশতকে হূণেরা ভারতে প্রবেশ করে, কিন্তু এখানে তাহাদের উত্তরের ক্ষত্রিয় জনপদের মধ্যে নাম পাইতেছি। তাই মনে হয় হূণেরা পঞ্চশতকে ভারতের মধ্যে প্রবেশের পূর্ব্বে যখন ভারতের উত্তরে ছিল তখনই তাহাদের নাম পুরাণে লিখিত হইয়াছে। রাজপুতানার ছত্রিশ রাজকুলের মধ্যে হূণদেরও নাম আছে। এখানে চীন জাতি ভারতের উত্তরে আছে বলিয়া লিখিত হইয়াছে। আবার গঙ্গার সপ্তধারার মধ্যে চক্ষুঃ নদী চীন তুষার, শক প্রভৃতি জনপদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে বলা হইয়াছে (৪৬।৫০)। চীনদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, তাহারা পশ্চিম এসিয়া হইতে আসিয়াছে। চীনেরা যখন পশ্চিম এসিয়ায় বাস করিত, তখনকার বিবরণ হইতেই চীনদের এইরূপ অবস্থান পুরাণে বলা হইয়াছে কি না তাহা বলা কঠিন। এমনও, হইতে পারে যে, চীনজাতি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে পামীর পর্য্যন্ত দখল করিলে, ইহারা ভারতবর্ষের উত্তরস্থ জাতি বলিয়া পুরাণে পরিগণিত হইয়াছে।

পূর্ব্বের জনপদের নাম—অক্ষ্রবাক, প্রবঙ্গ, বঙ্গ, পৌণ্ড্র, বিদেহ, মাল, তাম্রলিপ্তক, মগধ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ ইত্যাদি। অক্ষ্রবাক কোন্ জনপদ ? যাহাদের ভাষা অন্ধ্রদের ন্যায় ? এ কোন জাতি নির্ণয় করা কঠিন। মাল জনপদ মল্লভূম বলিয়া মনে হয়।

অতঃপর দাক্ষিণাত্যের জনপদের নাম আছে,—পাণ্ড্য, চোল, কেরল, বনবাসক, মহারাষ্ট্র, আভীর, কুন্তল, বিদর্ভ, অশ্মক, মাহিষক, কলিঙ্গ, অন্ধ্র প্রভৃতি। বিন্ধ্য পর্ব্বতস্থ দেশে মালব, করুষ, উৎকল, দশার্ণ, ভোজ, কিষ্কিন্ধক, নিষধ, অবন্তি প্রভৃতি জনপদের নাম পাইতেছি। উৎকলকে বিন্ধ্য পর্ব্বতস্থ দেশে ধরা হইয়াছে। মনে হয় বর্ত্তমানে যেখানে উৎকল আছে, পূর্ব্বে সেখানে ছিল না, মধ্য ভারতে ছিল। বিষ্ণুপুরাণে দাক্ষিণাত্যে অম্বষ্ঠ নামে একটি জনপদের নাম পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের মাহিষক জনপদ হইতে আগত জাতি মাহিষ্য ও অম্বষ্ঠ দেশ হইতে আগত জাতি অম্বষ্ঠ নাম ধারণ করিয়াছিল। বাঙ্গলার বৈদ্যজাতির মধ্যে বহুকাল হইতে সংস্কৃত চর্চ্চা দেখিয়া মনে হয়, তাঁহারা এই অম্বষ্ঠ দেশের ব্রাহ্মণ ছিলেন।

অতঃপর বাঙ্গলার তথাকথিত কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সম্বন্ধে এইখানে একটি কথা বলিব। সমস্ত, প্রাচীন কুলাচার্য্যগণই বলিয়াছেন বাঙ্গলার পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ কোলাঞ্চ দেশ হইতে আসিয়াছিলেন। এই কোলাঞ্চ কিরূপে কনোজ বা

কান্যকুব্জে পরিণত হইল, তাহা জানি না। নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, কান্যকুব্জের ত্রিসীমানায় যে সকল লোক বাস করে, তাহাদের সহিত বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের আকারে সাদৃশ্য নাই। কর্ণেল জেরিনি লিখিয়াছেন যে, আনামের লোকে ভারতবর্ষের কলিঙ্গ প্রদেশকেই কোলাঞ্চ বলে। এ কথা যদি সত্য হয়, (আর না হইবার কোন কারণ দেখি না) তাহা হইলে বাঙ্গলার পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ কলিঙ্গ দেশ হইতেই আসিয়াছিলেন। বাঙ্গলার সেন রাজবংশ যে দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়াছিল, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ নাই। শূর বংশের সহিত সেন বংশের সম্বন্ধ ছিল। দক্ষিণ রাঢ়ে শূর বংশের অস্তিত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং মনে হয় শূর বংশ ও সেন বংশ উভয়েই দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়াছিল—তাই দাক্ষিণাত্যাগত ব্রাহ্মণ কায়স্থদের তাঁহারা আদর করিয়া আনাইয়াছিলেন এবং সম্মানের সহিত রাখিয়াছিলেন। বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বাঙ্গলা দেশে বহুকাল ধরিয়া দাক্ষিণাত্য হইতে দলে দলে লোক আসিয়া বাস করিতেছিল, এবং তাহারা অনেকাংশে সুসভ্য ছিল।

ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল বাঙ্গালাদেশের লোকেই নামের পূর্ব্বে শ্রী ব্যবহার করে এবং ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র এই তিনমাসে লক্ষ্মীপূজা করে। আবার কেবল অন্ধ্র রাজবংশের রাজাদের নামের পূর্ব্ব "সিরি" বা শ্রীকথার ব্যবহার আছে। ইহা হইতে মনে হয় বাঙ্গলার পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের সঙ্গে সঙ্গে অথবা সেন ও শূর রাজবংশের সঙ্গে বাঙ্গালা দেশে এই লক্ষ্মীপূজা ও শ্রীপ্রয়োগের প্রচলন হইয়াছে।

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। উপরে ভারতবর্ষের যে সকল জনপদের নাম তুলিয়াছি, তদ্ভিন্ন প্রত্যেক প্রদেশেই আরও অনেক জনপদের নাম আছে। যে গুলির নাম তুলিয়াছি, প্রায় সেগুলির অস্তিত্ব বর্ত্তমান ঐতিহাসিকেরা ঐতিহাসিক প্রমাণের জন্ত স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

৪৮ অধ্যায়ে নানা দিকের জনপদের নাম করিতে করিতে পুরাণকার ৪৬ শ্লোকে মাঝখান হইতে বলিতেছেন, "সহ্যপর্ব্বতের উত্তর প্রান্তে যেখানে গোদাবরী নদী প্রবাহিত হইতেছে, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে তাহা মনোরম প্রদেশ।" সার রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর দেখাইয়াছেন যে এই শ্লোকটি বায়ু মৎস্ত ও মার্কণ্ডেয় পুরাণেও আছে। আর এই প্রদেশের প্রাচীন বিখ্যাত স্থান প্রতিষ্ঠান পুরী (বর্ত্তমান পইঠান)। এই পইঠান পেটেনিক, রাষ্টিক বা অন্ধ্র রাজাদের অধীন ছিল। পার্জিটার সাহেব অনুমান করেন, পুরাণগুলি প্রথমে মগধে রচিত হয়, যেহেতু মগধের রাজবংশের রাজাদের জন্য পুরাণে এক একটি পংক্তি লিখিত হইয়াছে কিন্তু অন্ত রাজবংশ সম্বন্ধে এত বিস্তৃত বিবরণ নাই। কিন্তু অন্ধ্র রাজবংশ সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে, তদ্ভিন্ন উক্ত মনোরম প্রদেশের কথা পড়িলে সহজেই মনে হয় যে, পুরাণকারেরা এই প্রদেশেই বাস করিতেন।

পরিশেষে একটি কথা নিবেদন করিব। আজকাল একদল সমালোচক দেখা দিয়াছেন, যাঁহারা লেখার প্রশংসার ধার ধারেন না, কেবল কোন রকমে চুরি প্রমাণ করিয়া লেখককে জগতের সমক্ষে অপদস্থ করিতেই ব্যগ্র। সেই শ্রেণীর সমালোচকদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিতেছি,—আমি কানিংহাম সাহেব ও শ্রীযুক্ত নন্দলাল দে মহাশয়ের লিখিত ভারতের প্রাচীন ভূগোলের নাম শুনিয়াছি বটে, কিন্তু পড়ি নাই। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের লিখিত "মানবের আদি জন্মভূমি" নামক বই একটু একটু পড়িয়াছিলাম কিন্তু প্রবন্ধ লিখিবার সময়ে আমার মোটেই মনে ছিল না তাঁহার বইয়ে কি লেখা আছে। তথাপি অজ্ঞাতসারে কোন অংশ চুরি করিয়াছি কিনা পাঠক তাহার বিচার করিবেন।

শ্রীরাখালরাজ রায়।

ইতিহাস

(বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর ত্রয়োদশ বর্ষে সভাপতির অভিভাষণ)

সমাগত সাহিত্য-সেবী ও সাহিত্যানুরাগী সুধীবৃন্দ !

মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মেলনের উদ্যোক্তারা আমাকে সাদরে আজ যে আসন দিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিবার আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য জানিয়াও কেন যে গ্রহণ করিলাম, তাহার একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া উচিত। আমার শক্তি-সামর্থ্য কতটুকু, আমি যতটা জানি, অপরে ততটা জানেন না, বা অপরের জানিবার সুবিধা ততটা নাই। ইতিহাস-সৌধ-নির্ম্মাতাদিগের মধ্যে কোন মনীষী শিল্পীকে এ পদে বৃত হইতে দেখিলে আমাপেক্ষা অধিকতর সুখী বোধ হয় কেহই হইতেন না। তবে আমার পক্ষ হইতে একটা কথা বলিতে চাই, আপনাদের ভালবাসার এই অযাচিত দান প্রত্যাখ্যান করিবার শক্তি আমার নাই। এই সভাপতি মনোনয়ন-কার্য্যে বাঙ্গালা দেশ আপনাদের বিচার-বুদ্ধির প্রশংসা করিতে না পারে, কিন্তু আপনাদের মহানুভাবতার—অমানীকে মানদান করিবার শক্তি ও অহৈতুকী ভালবাসার যে পরিচয় পাইবে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আর একটা কথা এখানে বলিলে বোধ হয় অশোভন হইবে না যে, পরমারাধ্য আদর্শ নৃপতি রামচন্দ্রের সেতুবন্ধন-কার্য্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কাঠ-বিড়াল আপনার সামর্থ্যানুযায়ী সাহায্য করিয়া যেরূপ ধন্য হইয়াছিল, আমিও সেইরূপ মাতৃ-মন্দিরের পরিকল্পিত ইতিহাস-কক্ষ নির্ম্মাণকার্য্যে আমার ক্ষুদ্র সাধ্যমত মালমসলা যাহা বহন করিয়া আনিয়াছি, তাহাতেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করি। আর এ বিষয়ে আমার যে কতদূর যত্ন, চেষ্টা বা আগ্রহ আছে, তাহা আপনাদের ন্যায় বান্ধবদিগের অবিদিত নাই। কি বলিয়া আপনাদিগকে যে আজ ধন্যবাদ দিব, তাহার ভাষা ঠিক করিতে পারিতেছি না। হৃদয় যখন ভাবের আবেগে পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে, তখন ভাষা মূক হইয়া যায়। আমি বক্তা নই—বক্তৃতার ভাষায় আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতে পারিব না, আপনারা আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন, ইহাই আমার প্রাণের কামনা।

আজ আমি যে স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া ইতিহাস আলোচনার সুষ্ঠু প্রণালী বিবৃতি করিবার চেষ্টা করিব, বাঙ্গালা দেশের মধ্যে ইতিহাস-বিশ্রুত সেই মেদিনীপুর জেলা মহামতি দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্রকে অঙ্কে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত মেদিনীপুরের নাম যে চিরকাল গ্রথিত থাকিবে, তাহা প্রাচীন সাহিত্যানুশীলনকারীকে আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। এই স্থানে বসিয়াই ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে কবি-কঙ্কণ মুকুন্দরাম "চণ্ডী"-মঙ্গলের অমরগীতি বাঙ্গালীকে শুনাইয়া গিয়াছেন। রামেশ্বরের "শিবায়ন", দুঃখী শ্যামদাসের "গোবিন্দমঙ্গল", ঘনরামের "ধর্ম্মমঙ্গল", কাশীরামের "মহাভারত" প্রভৃতি বাঙ্গালীর চিরপ্রিয় গ্রন্থরাজির সহিত মেদিনীপুরের নাম অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট। বাঙ্গালার ও বাঙ্গালার ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গদেব যখন পুরীর পথে ছুটিতেছিলেন, তখন তিনি এই মেদিনীপুরের ভিতর দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র পদধূলিস্পর্শে দেশ ধন্য হইয়াছে ও ইহার রজঃ আমার ন্যায় বৈষ্ণব-দাসানুদাসের নিকট ব্রজের রজের ন্যায় পবিত্র।

প্রাচীনতার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে এই প্রদেশান্তর্গত তমলুকের পদ-চুম্বন করিয়া এককালে সমুদ্র প্রবাহিত হইত। পাশ্চাত্য ও এদেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে প্রাচীন তাম্রলিপ্তকে আধুনিক তমলুক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মহাভারত, অথর্ব্বপরিশিষ্ট, বিষ্ণু, বায়ু, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য-পুরাণ, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি সংস্কৃতগ্রন্থে তাম্রলিপ্তের নাম আছে। মহাভারতে বহুবার তাম্রলিপ্ত ও তাহার নরপতির কথা পাওয়া যায়। জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থেও

তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে। এক সময়ে তাম্রলিপ্ত বাঙ্গালার বন্দর ছিল। ভবিষ্যপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, "তাম্রলিপ্তপ্রদেশে চ বর্গভীমা বিরাজতে।" অশোক এই স্থানে একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সে কালে সিংহলদ্বীপে যাত্রা করিতে হইলে এই স্থান হইতেই যাইতে হইত। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান যখন তাম্রলিপ্তে উপস্থিত হন, তখন ইহা গঙ্গার মোহানার নিকট অবস্থিত—সামুদ্রিক বন্দর ছিল। তিনি এখানে ২৪টী বৌদ্ধ মঠ দেখিয়াছিলেন। দুই বৎসর এখানে অবস্থান করিয়া, ফা-হিয়ান ধর্ম্মগ্রন্থসকলের অবিকল প্রতিলিপি ও চিত্রিত মূর্ত্তিগুলির যথাযথ নক্সা অঙ্কিত করিয়া লইয়াছিলেন। য়ুয়ন-চয়ঙ্ যখন এখানে আসিয়াছিলেন, তখনও তাম্রলিপ্ত ১৫০০লি বা ২৫০ মাইল বিস্তৃত ছিল। এখানে তিনি ৫০টী দেবমন্দির ও ১০টী বৌদ্ধমঠ দেখিয়াছিলেন। ই-চিঙ্ ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে চীনদেশ হইতে এই বন্দরে আসিয়াছিলেন। তখন ভারত ও চীনের সঙ্গে যে বাণিজ্য সংঘটিত হইত, তাহার কেন্দ্র ছিল তাম্রলিপ্ত। তৎপরে তাম্রলিপ্ত পশ্চিম বঙ্গের রাঢ়প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১০২১ হইতে ১০২৩ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোড়দেব রাঢ় প্রদেশের দক্ষিণাংশ উৎখাত করিয়া ধনাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান। ইহার প্রায় ১০০ বৎসর পরে চোড়গঙ্গদেব মন্দারনৃপতিকে পরাস্ত করিয়া মেদিনীপুর অধিকার করিয়াছিলেন।

অফগান ও মোগলদিগের অনেক খণ্ডযুদ্ধ এই জেলার মধ্যেই সঙ্ঘটিত হইয়াছে। বহু যুদ্ধের স্মৃতি এই জেলা বহন করিয়া আসিতেছে।

অনেক দিন ধরিয়া দেশ হইতে শান্তি দূর হইয়া গিয়াছিল। ক্রমে মোগলেরা রাজ্যমধ্যে শান্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু সে শান্তিও বহুদিন স্থায়ী হয় নাই। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকে এখানে তিনবার অশান্তির অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ১৬২২ খৃষ্টাব্দে রাজ্যলোলুপ সম্রাট্-কুমার খুরম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া, দাক্ষিণাত্য হইতে সৈন্যসহ ওড়িষা ও মেদিনীপুরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হন। ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি মেদিনীপুরের ভিতর দিয়া দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। হিজলী অবরোধে ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার দেশে অশান্তি উপস্থিত হইয়াছিল। ইংরেজ বণিক্‌দিগের বাণিজ্য-ব্যপদেশে তাহাদের সহিত নবাবের বিবাদ হয়। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে শোভাসিংহের বিদ্রোহানলে তৃতীয় বার এখানে অরাজকতা ও অশান্তির প্রাদুর্ভাব হয়। শোভাসিংহ অফগান সর্দ্দার রহিম খাঁর সহিত মিলিত হইয়া মেদিনীপুর হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত সমগ্র পশ্চিমবাঙ্গালা লুণ্ঠন করিতে থাকে। সম্রাট্-পুত্র অজিম-উস্-শান বিদ্রোহীদিগকে দমন করিয়া দেশে শান্তি আনয়ন করিয়াছিলেন।

আলিবর্দ্দি খাঁর রাজত্ব-প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে বর্গীর হাঙ্গামায় দেশ যখন উৎপীড়িত হইতেছিল, তখন মেদিনীপুরের ভাগ্যে অনেক লাঞ্ছনা ঘটিয়াছিল। ইহাদের হাঙ্গামায় মেদিনীপুরের যত ক্ষতি হইয়াছিল, বাঙ্গালার কোন জেলার তত ক্ষতি হয় নাই। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ও ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে চুয়াড় হাঙ্গামায় মেদিনীপুরবাসীকে অনেক অশান্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল।

মেদিনীপুর জেলায় প্রত্নতত্ত্বের অনেক নিদর্শন এখনও বিদ্যমান আছে। গোপীবল্লভপুর থানার অন্তর্গত কিয়ারচাঁদে দুই ফুট হইতে চার ফুট উচ্চ প্রায় হাজারটী ক্ষুদ্র স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ স্তম্ভ দক্ষিণ-ভারতে ও পুরুলিয়ায় পাওয়া গিয়াছে। কবে কাহার দ্বারা এগুলি প্রথম প্রোথিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ জানিবার জন্য আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে। অনেকের মতে এগুলি প্রাগৈতিহাসিক যুগের অসভ্য বুনো জাতিদের কীর্ত্তি। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাঙ্গালার মন্দিরের কথা লিখিয়া বলিয়াছেন, এখানকার অধুনাতন মন্দিরগুলি বিষ্ণুপুরের মন্দিরের অনুকরণে তৈয়ারী। বগড়ীর পঞ্চরত্ন মন্দির, চন্দ্রকোণায় লালজী মন্দির ও মেদিনী-

পুর সহরের প্রান্তভাগে নাড়াজোলরাজ-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে বিষ্ণুপুরের প্রভাব-নিদর্শন আছে। গড়বেতার সর্ব্বমঙ্গলা ও কানেশ্বর মন্দির, চন্দ্ররেখাগড়ের সহস্রলিঙ্গ মন্দির ও দাঁতনের শ্যামলেশ্বর মন্দির ওড়িষার মন্দিরের মত। প্রায় দুই শত বৎসর ওড়িষারাজদিগের প্রাধান্য এই জেলায় ছিল। এই প্রাচীন মন্দিরগুলি সেই সময়েরই বলিয়া মনে হয়। তমলুকের বর্গভীমার মন্দির সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিতে চান,এটাও ওড়িষা-পদ্ধতিতে নির্ম্মিত হওয়া বিচিত্র নয়; কিন্তু এ মন্দির সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অন্যরূপ। যদিও মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় আর ইহলোকে নাই—কিন্তু আমার পরম-সুহৃদ্ ওড়িষার স্থাপত্য-প্রণেতা শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহার ন্যায় সত্যানুসন্ধিৎসু এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে সত্য নির্দ্ধারণের পথ সুগম হইয়া যাইবে। ওড়িষার রাজা কপিলেশ্বরদেবের সময়ে পঞ্চদশ শতকে কেশিয়ারির নিকট গঙ্গেশ্বরে একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। কালক্রমে মুসলমানগণ উহা আপনাদের মসজিদে পরিণত করে।

মেদিনীপুর জেলায় দুর্গ, গড় ও পরিখার চিহ্ন যত অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, বাঙ্গালার কোন জেলায় তত দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল পুরাকীর্ত্তির বিবরণ ও দুর্গাধিপতিদের কাহিনী সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। ইতিহাস গঠনে এগুলি সহায়তা করিবে। এ বিষয়ে মেদিনীপুরের সহৃদয় ইতিহাসানুরাগীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

এই সকল ঐতিহাসিক উপকরণ ইতিহাস গঠনে কিরূপভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা আমি সংক্ষেপে ইতিহাসালোচনার প্রসঙ্গে কিছু বলিব; কিন্তু তৎপূর্ব্বে একটী কথা বলা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। দুঃখের সহিত জানাইতেছি, বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমরা দুইজন প্রতিভাশালী সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিককে হারাইয়াছি। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর ও মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ইঁহারা দুইজনে স্বনামধন্য। ইঁহাদের অন্য পরিচয় অনাবশ্যক। এই সময় কয়জন প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ প্রতীচ্য পণ্ডিতেরও মৃত্যু হইয়াছে। আপনাদের নিকট শ্রদ্ধার সহিত সেই সমস্ত জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতদেরও নাম এখানে না করিলে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে মনে করি। অধ্যাপক সেস্, মাস্পেরো, ফ্লীট, ভিন্সেন্ট স্মিথ, ভেনিস, কিণ্ড্, হর্ণলে, এগ্গেলিঙ ও কার্ণ, এই সকল মৃত মহাত্মাদের সকলেই ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন।

চারি দিকেই ইতিহাস আলোচনায় একটা প্রকাণ্ড সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দের মধ্যে ইতিহাস-বিজ্ঞানে একটা মস্ত ওলট্-পালট হইয়া গিয়াছে। শত বর্ষ পূর্ব্বে যাহা স্বপ্নের অগোচর ছিল, আজ তাহা প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। মিসর, আসিরিয়া, কালডিয়া, বাবিলোনিয়া, চীন, মধ্য-এসিয়া ও পারস্য দেশ যে সমস্ত লুপ্ত রত্ন বক্ষে ধারণ করিয়া ছিল, অদম্য অধ্যবসায়শীল পণ্ডিতগণের চেষ্টায় সম্প্রতি তাহাদের কয়েকটী আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইতিহাস-পাঠকদের মধ্যে অনেকে জানেন, প্রায় সাড়ে সাত শত বৎসর পূর্ব্বে রব্বি বেঞ্জামিন, বাবিলন ও নিনেভের ভগ্নাবশেষের কথা বলিয়া যাইবার পর হইতেই এই সকল স্থানের লুপ্ত গৌরবের দিকে লোকে আকৃষ্ট হয়। ফলে ১৬শ শতকের শেষভাগ হইতে অনুসন্ধানের বিশেষ চেষ্টা হয়। এই প্রসঙ্গে কয়েকটী উদাহরণ দিতেছি। Sir Gardner Wilkinson এর কঠোর পরিশ্রমের ফলে প্রাচীন মিসরের সামাজিক আচার-পদ্ধতি আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়াছে। অধ্যাপক Lepsius, প্রুসীয় Exploring Expedition এর অধিনায়ক হইয়া সুডানে মিসর-প্রভাব আবিষ্কার করিয়াছেন; এবং সেই দেশের ইতিহাস সকলনোপযোগী উপাদানসমূহ বার্লিনে লইয়া গিয়াছেন। তার পর Mariette মাটি খুঁড়িয়া Lepsius এর কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করেন। অতঃপর Cairo Museum স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে আসিরিয়া

ও বাবিলোনিয়ার প্রাচীন সভ্যতা প্রভৃতি ব্যাপার লইয়াও অনুসন্ধান চলিতেছিল। ফরাসী বোত্তা (P. E. Botta) ও ইংরেজ লেয়ার্ড (Layard) অক্কাড-রাজ সারগন ও সেনাখেরিব (Sennacherib) ও অন্যান্য অজ্ঞাতপূর্ব্ব বহু আসিরীয় রাজাদের প্রাসাদাবলী আবিষ্কার করিয়াছেন। মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে বাবিলোনিয়ার কয়েকটী প্রাচীন নগরের অস্তিত্বও জানা গিয়াছে, এবং তন্মধ্যস্থ মৃৎপুস্তকের গ্রন্থাগারও আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেগুলি ইউরোপ ও আমেরিকায় সংরক্ষিত আছে। বাবিলন-মন্দিরগুলির গঠনপ্রণালী কিরূপ ছিল, তাহাও মন্দিরনির্ম্মাণকারী বাবিলন ও আসিরীয় রাজগণের লিপি হইতে জানা যায়। সম্প্রতি নিপ্পুর, বাবিলন ও আশ্‌শুরে কয়েকখানি "ground plan" মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়াছে।

বর্ত্তমান প্রত্নানুসন্ধান-ফলে আর্য্য ও ককেসীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন হিটাইট্‌ নামক জাতির সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতার সম্বন্ধ আছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই হিটাইট জাতিদ্বারা মিতান্নিগণ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। খৃষ্ট জন্মের ১৬০০ বৎসর পূর্ব্বে এসিয়া মাইনরে মিতান্নিজাতির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। হিটাইটদের রাজার অনুগ্রহে বোগাজকোই-এর (Boghas-Kyoi) সন্ধিসূত্রে মিতান্নিরাজ দশরত্তপুত্র মাত্তিউজ (Mattiuza) পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। অল্পদিনের মধ্যে প্রভাবশালী হিটাইট জাতি মিতান্নিরাজ্যকে আপনাদের রাজ্যের অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এই ঘটনার প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে হিটাইটগণ এসিয়ামাইনরের উত্তর-পূর্ব্বে কাপ্পাডোকিয়ায় (Cappadocia) আসিয়া উপস্থিত হন। ইহারা আসিরীয়দিগের নিকট "খাত্তি" এবং মিসরবাসীদিগের নিকট "খেত" নামে পরিচিত ছিলেন। কালের প্রভাবে এই জাতির অধঃপতন ঘটে। আর্য্যজাতির আর এক শাখা আসিয়া ইহাদের হৃত রাজ্য অধিকার করে। কয়েকজন পণ্ডিত সম্প্রতি ইঁহাদের ভাষা পাঠ করিয়াছেন। রগোজিন ও আর একজন হঙ্গেরীয় পণ্ডিত ইঁহাদের এ পর্য্যন্ত দুর্ব্বোধ্য লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। বোগজকোই-এর গিরিস্থাপত্যে হিটাইটদের শিল্পনৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত স্মৃতিফলকগুলিতে কিছুদিন পূর্ব্বে Mi-it-ra-as-si-il, U-ru-w-ra-as-si-el, In-da-ra, Na-sa-at-it-ia-an-na অর্থাৎ মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্য, এই চারিটী দেবতার নাম পাওয়া গিয়াছিল। এখন আবার বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমার শ্রদ্ধেয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ বন্ধু শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সংবাদ দিয়াছেন। এ সমস্ত বিষয়ের ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করিলে হিটাইট্‌দিগের সঙ্গে খৃষ্টজন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ভারতীয় আর্য্যদের কিরূপ সম্পর্ক ছিল, তাহা বাহির হইয়া পড়িবে।

মধ্য-এশিয়ায় সার অরেল ষ্টাইনের নেতৃত্বে প্রাচীন কীর্ত্তির বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনেক বৌদ্ধ-মূর্ত্তি, ইষ্টক, খরোষ্ঠী, ব্রাহ্মী, গুপ্তব্রাহ্মী প্রভৃতি বহু ভাষার অক্ষর আবিষ্কৃত হইয়াছে। মধ্য-এসিয়া এক সময়ে গ্রীক, পারস্য, ভারত ও চীন-প্রভাবের মিলনক্ষেত্র ছিল। আমরা এখন মহামতি ষ্টাইনের আবিষ্কারের ফলে জানিতে পারিয়াছি যে, শিল্প ও ধর্ম্মব্যাপারে মধ্য-এসিয়ার উপর ভারতের প্রবল প্রভাব বহু দিন হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। এই স্থানের ভাষা ও শাসনব্যাপারে কিছু কাল ভারত-প্রভাবের প্রতাপ বড় কম ছিল না। মুসলমান আক্রমণের বহু পূর্ব্বে ভারত যে তাহার এসিয়ার প্রতিবেশীদিগের উপর সভ্যতার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, ষ্টাইনের 'প্রাচীন খোটান' ও 'সের ইণ্ডিয়া' তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। এ দিকে অক্লান্তকর্ম্মা Sven Hedin তিব্বত ও মানস-সরোবরের কত অজ্ঞাতপূর্ব্ব ব্যাপার আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া, ভারত-গৌরব-কাহিনী বিবৃত করিতেছেন। রলিন্‌সন্‌, ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ, ফুশে, ফোগেলপ্রমুখ পণ্ডিত, গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, ৯০০ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দ

হইতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতালোকে ভারতবহির্ভূত অনেক জাতি প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। আবার স্যর চাল্‌স্ এলিয়ট্‌প্রমুখ পণ্ডিতেরা দেখাইয়াছেন যে, ভারতবহির্ভূত জাতির উপর ভারতের প্রভাব বড় অল্প নয়। এক জাতি যদি অন্যের সংস্পর্শে আসে, তাহা হইলে পরস্পর প্রভাবান্বিত হওয়া অসম্ভব নয়। প্রসঙ্গতঃ অপর জাতির উপর ভারতের প্রভাবের কথা এই সমস্ত পণ্ডিত কিছু কিছু বলিয়াছেন।

ভারতের একটা কলঙ্ক আছে—ভারতবাসী দেশ ছাড়িয়া যাইতে চায় না; কিন্তু ইঁহারা দেখাইতেছেন যে, ভারতবর্ষ সমুদ্র ও পর্ব্বতমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও অতি প্রাচীনকালে ভারতবাসী সমুদ্র ও পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, দেশদেশান্তরে যাইত ও নানা স্থানে ভারতীয়. প্রভাব বিস্তার করিত। প্রাচীন ভারতবাসী ভারতের বাহিরে, সুদূর অঞ্চলেও দিগ্বিজয় করিয়া আসিয়াছে, সাম্রাজ্য-স্থাপন করিয়াছে, এবং ভাব ও ভাষার বিস্তারে সহায়তা করিয়াছে। প্রাচীন ভারতের প্রভাব—ভারতের উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়াছে। ভারতবাসী যে ভারতের বাহিরে রাজ্যবিজয়ে অনভ্যস্ত ছিল না, শ্রীবিজয়ের বিবরণ ও রাজেন্দ্রচোড়ের লিপি তাহার দৃষ্টান্ত। ভারতবাসী ভারতের বাহিরে রাজ্যবিস্তার করিয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাববিস্তারের তুলনায় তাহা কিছুই নহে। যবদ্বীপ, কম্বোজ, সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলে এক সময় হিন্দুসাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল, এক সময় সুদূর বোর্ণিও দ্বীপেও হিন্দুর বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইত। যবদ্বীপ ও মলয় অঞ্চলে ইসলাম-প্রভাব প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া, হিন্দুপ্রভাবকে ম্লান করিয়াছিল সত্য, কিন্তু যবদ্বীপে ভারতীয় বর্ণমালা এখনও বর্ত্তমান, ভারতীয় রীতিনীতি এখনও প্রচলিত। সিংহল, বর্ম্মা, শ্যাম, কম্বোজ, চম্পা ও যবদ্বীপে যে ধর্ম্ম, শিল্প, লিপি, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও রাজনীতি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাও হিন্দুদের নিকট হইতে গৃহীত। আর তিব্বতের কথা বলিতে গেলেও ঠিক একই কথা বলিতে হয়। পদ্মসম্ভব তিব্বতীদের মহামান্য লামাগুরু। ইঁহার অপর নাম পদ্মাকর। ওয়াডেল্ বলেন, তিনি ৭৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে প্রায় একশত পণ্ডিত লইয়া তিব্বতে গমন করেন। এই ভারতবাসী তিব্বতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও লামার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। ইহার পূর্ব্বে রাজা স্রোঙ্-সনের (Srong-btsan) সময় হইতে (৬৫০ খৃঃ) ভারতবর্ষ ও চীন হইতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা মধ্যে মধ্যে তিব্বতে গমন করিত। পদ্মসম্ভবের তত্ত্বাবধানে তিব্বতের অন্তঃপাতী সম্-য়াস্ প্রদেশে ভারতীয় নালন্দমঠের আদর্শে তিব্বতের প্রথম মঠ নির্ম্মিত হয়। তিনি তাঁহার আত্মীয় শান্তরক্ষিতকে সেই মঠের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ভারতীয় প্রভাব ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলেই অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল—কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে তেমন করে নাই। চীন, জাপান, কোরিয়া, আনাম প্রভৃতি স্থানে চৈনিক ভাবেরই প্রাদুর্ভাব বেশী। শিল্প, নীতি, সাহিত্য—সকলই চীনের। চীন ভাষার বর্ণমালা খাঁটি চীনা। কিন্তু চীন ও জাপানের বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতেরই সম্পত্তি।

ফরাসী পণ্ডিত ফুরনেরো তাঁহার "প্রাচীন শ্যাম" পুস্তকে বলিয়াছেন, পুরাতন লিপি পাঠে জানিতে পারা যায় যে, পুরাকালে পূর্ব্ব উপদ্বীপ ছয়টী রাজ্যে বিভক্ত ছিল,—(১) টনাকিন উপসাগর হইতে লাওস অঞ্চল পর্য্যন্ত প্রদেশ যবন-দেশ নামে অভিহিত ছিল; (২) চম্পাদেশ বর্ত্তমান আনাম; (৩) উত্তর পশ্চিমে সয়ম্-দেশ; (৪) কম্বুজদেশ, ইহা এখনকার কাম্বোডিয়া, (৫) রমন্যদেশ ও (৬) মলয় উপদ্বীপ—এই ছয়টি দেশে অল্পবিস্তর ভারতীয় সভ্যতার বীজ উপ্ত হইয়াছিল। কাবাতন, ফিনো, এমোনএর, ফগুসনপ্রমুখ পণ্ডিত প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই সমস্ত দেশের জাতিদিগের মধ্যে হিন্দু-সভ্যতার প্রভাব যথেষ্ট ছিল। ধর্ম্ম,

সমাজ ও শিল্পে এগুলি তাঁহারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন ; যবদ্বীপেও যে ভারতীয় সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা স্থলপথ দিয়া নয়, জলপথ দিয়া।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে অশোক-অনুশাসন ও গুহা-মন্দিরস্থ লিপি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু কোন পণ্ডিতই এ সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। বাকৃট্রিয়দিগের ভারত-আক্রমণ ও পঞ্জাবে রাজ্যস্থাপন সম্বন্ধে কয়েকজন পণ্ডিত মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এসম্বন্ধে মূল গ্রন্থ, লিপি ও মুদ্রার সাহায্যে বিশেষ সাবধানতার সহিত বিচার করিয়া আলোচনা না করিলে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে না।

বাকৃট্রিয়দিগের পর শক-জাতি আসিয়া কাঠিয়াবাড় ও মালবে ২০০ বৎসরেরও অধিককাল শাসন করে। ইহাদের সম্বন্ধে খুব ভাল করিয়া অনুসন্ধান এখনও হয় নাই। শকদিগের পর উত্তর-ভারতে কুষাণদের আগমন। ইহাদের দুইটি বংশ ছিল, কণিষ্কই শেষ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। মহাযান-সাহিত্যে ইঁহার নাম অধিক প্রসিদ্ধ। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ তাঁহাকে সাধারণতঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতকে ফেলিয়া থাকেন; কিন্তু রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকার বিশেষরূপ বিচার করিয়া তাঁহাকে তৃতীয় শতকের প্রথম পাদে ফেলিয়াছেন। তিনি মালব ও অন্যান্য স্থানে আবিষ্কৃত কুষাণ-লিপির অঙ্ক পরীক্ষা করিয়া ইহার প্রারম্ভ ১০০ খৃষ্টাব্দেই স্থির করিয়াছেন। তবে তাঁহার এই মত অন্যান্য পণ্ডিতেরা মানিতে চান না। কণিষ্কের সময় সম্বন্ধে সুসিদ্ধান্ত হওয়া আবশ্যক। তার পর গুপ্তদের সময়ে কুষাণ, কাঠিয়াবাড় ও মালবের শকেরা হতবল হইয়া পড়ে। আর বিদেশীয়েরা ভারতে প্রবেশ করিতে থাকে। আভীরগণ দলে দলে আসিয়া হিন্দু হইয়া যায় এবং ভারতীয়দের শাখা বলিয়াই চলিয়া যায়। নাসিকে আভীরের একখানি লিপি দেখিয়া স্যর ভাণ্ডারকার বলেন, তাহারা মহারাষ্ট্র দেশে, সম্ভবতঃ খান্দেশে রাজত্ব করিত। গুর্জ্জরগণও বাহিরের জাতি—পঞ্জাবের পথ দিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়া রাজপুতনায় তাহারা রাজ্য স্থাপন করে। সেখান হইতে কনৌজ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তৃত করে। এইরূপ জাতিদের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া আলোচনা হয় নাই। রাজপুতদেরও দুই একটা শাখা বাহির হইতে আসিয়াছে। ধারা ও উজ্জয়িনীর পরমার-বংশের বিবরণ এখনও ভাল করিয়া আলোচনা করা হয় নাই। ইহাদের অনেক উপাদান আছে। যৌধেয়দের সম্বন্ধে ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার অনেকগুলি নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়াছেন। এই সমস্ত প্রত্নতত্ত্বালোচনা যাহা কিছু করা হইয়াছে, প্রধানতঃ মুদ্রা ও লিপির সাহায্যেই হইয়াছে।

সম্প্রতি মুদ্রা হইতে ঐতিহাসিক তথ্য বাহির করিবার একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বিত হইতেছে। অণুবীক্ষণ সাহায্যে মুদ্রার ছায়াচিত্র গ্রহণ করিয়া কেহই এ পর্য্যন্ত মুদ্রার লিপি অনুশীলন করেন নাই। শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অণুবীক্ষণ সাহায্যে অস্পষ্ট মুদ্রালিপি ও মুদ্রার অঙ্কিত মূর্ত্তি প্রভৃতির অনুশীলন করিয়া মুদ্রার নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। গার্ডনার একটি মুদ্রা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, পুরু একটি হস্তীর উপর আসীন রহিয়াছেন ও আলেকসন্দর অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, হস্তে বল্লম লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় উহার ছায়াচিত্র অণুবীক্ষণ সাহায্যে দেখিয়া বলিতেছেন যে, হস্তীর উপর আসীন যোদ্ধা অশ্বারোহী ব্যক্তিকে পাশবদ্ধ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। এই একটি ঘটনা হইতেই দেখা যাইতেছে যে, এই সব প্রণালীতে মুদ্রার ছায়াচিত্র গ্রহণ করিলে হয়ত মুদ্রাতত্ত্বের ইতিহাসে অনেক বিপ্লব উপস্থিত হইবে।

ঐতিহাসিক তথ্য নির্দ্ধারণে মুদ্রাতত্ত্ব ও লিপিতত্ত্বের উপযোগিতা কত বেশী তাহা প্রত্যেক ইতিহাস অনুশীলনকারীই অবগত আছেন। তবে মুদ্রা বা লিপি হইতে ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহের পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, মুদ্রা বা লিপি জাল কি না, অথবা কোন

ইসলাম্ আখুন কর্ত্তৃক অরেলষ্টাইনের ন্যায় মুদ্রা বা লিপি-পরীক্ষক প্রতারিত হইতেছেন কি না।

ভারতের প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে কয়েকটি সমিতি বিশেষ কার্য্য করিয়াছে। লর্ড কার্জ্জনের সময়ে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান-সমিতির বিশেষ সংস্কার সাধিত হয়। ১৯১০ সালে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত-মণ্ডলী ডাক্তার ফোগেল, কার্ণ প্রভৃতি মনীষীর সাহায্যে Panjab Historical Society স্থাপন করেন। এদিকে Behar and Orissa Research Societyও খুব কাজ করিতেছেন। মৌর্য্যদের পূর্ব্বভারত ইতিহাস-সম্পর্কে ১৮২৫ সাল হইতে কলিঙ্গরাজ খারবেলের লিপি জানা ছিল। পণ্ডিত ভগবান্লাল ইন্দ্রজী হাতিগুম্ফার উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার করেন। প্যারিসের ষষ্ঠ কংগ্রেস-বিবরণে এই পাঠোদ্ধার আছে। ১৬৫ মৌর্য্যাব্দে ইহা ক্ষোদিত বলিয়া সকলে বিশ্বাস করিতেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ফ্লীট ও লুডার্স এই অব্দের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। পরে ভিন্সেণ্ট স্মিথের অনুরোধে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাশীপ্রসাদ জয়স্বাল খারবেল লিপির পুনরায় পাঠোদ্ধার করিয়া "১৬৫" মৌর্য্যাব্দে ইহা ক্ষোদিত হইয়াছে বলিয়া স্থির করেন। ইহার ফলে ভিন্সেণ্ট স্মিথ সুঙ্গবংশ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বের সমস্ত বিবরণ ৫০ বৎসর করিয়া পিছাইয়া দেন। এই লিপি সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্তও বাদানুবাদ চলিতেছে। এই লিপির সিদ্ধান্তগুলি মানিয়া লইবার পূর্ব্বে কয়েকটী বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত। আমাদের দেখিতে হইবে, খারবেল নামক রাজার এই লিপি ব্যতীত অন্য কোথাও পরিচয় পাওয়া যায় কি না, বাহাপতি মিত্র ও পুষ্যমিত্র এক ব্যক্তি কি না, পুষ্যমিত্রের সহিত খারবেলের কোন সংঘর্ষ শুঙ্গবংশের ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যায় কি না, এই বিষয়গুলি আমাদের ভাল করিয়া বিচার করিয়া, এই লিপির সিদ্ধান্ত কতদূর গ্রহণযোগ্য, তাহা দেখিতে হইবে।

এইবার আমরা আমাদের বঙ্গদেশের বিষয় কিছু বলিব। কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালার ইতিহাসের কিছু কিছু উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালার ইতিহাসের বিশাল গবেষণাক্ষেত্রের কোন কোন অংশে এখনও কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। মৃত্তিকাগর্ভে যে ঐতিহাসিক তত্ত্বসমূহ লুক্কায়িত আছে, তাহার উদ্ধারের জন্য যে অর্থ ও শক্তি নিয়োগ প্রয়োজন, তাহা এখনও বিশেষভাবে করা হয় নাই। আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে মালদহ জেলার অন্তর্বর্ত্তী গৌড়, মুর্শিদাবাদে রাঙামাটী ও পাঁচথুপী, বগুড়া জেলায় মহাস্থান, পাহাড়পুর, বিহার ও মহীপুর, দিনাজপুরে জগদ্দল প্রভৃতি প্রাচীন স্থান ঐতিহাসিকগণের তত্ত্বাবধানে খনিত হইলে অনেক নূতন ঐতিহাসিক তথ্য নিশ্চয়ই বাহির হইবে। বর্ত্তমান প্রণালীর ইতিহাস আলোচনা এ দেশে অষ্টাদশ শতাব্দের শেষভাগে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। ঊনবিংশ শতকে তাঁহাদের বিপুল প্রচেষ্টার ফলে প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের অনেক লুপ্ত তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। এই শতকের শেষভাগে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভগবান্লাল ইন্দ্রজী ও রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকারপ্রমুখ ভারতবাসী ঐতিহাসিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। অধুনা তাঁহাদের আদর্শ লক্ষ্য করিয়া আরও অনেক ভারতীয় পণ্ডিত এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। এক্ষণে বলিতে পারা যায়, ঐতিহাসিক গবেষণাক্ষেত্রে ভারতীয়ের কৃতিত্ব কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহে। পাদ্রে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিবার পর, রাজা রাজেন্দ্রলাল "বিবিধার্থ-সংগ্রহে" বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন। তার পর "বঙ্গদর্শনে" বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গের ইতিহাসের শুভ সূচনা করেন। শ্রদ্ধেয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও ছেলেদের জন্য একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়া ফেলেন। 'বঙ্গদর্শন' উঠিয়া যাইবার সময় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইতিহাস আলোচনায় ব্রতী হন। ক্রমশঃ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুপ্রমুখ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের মৌলিক গবেষণা দ্বারা

আমাদের দেশের ধারাবাহিক ইতিহাসের ভবিষ্যৎ লেখকগণের পথ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য করিয়া দিতেছেন। অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ঐতিহাসিক আলোচনার অগ্রণী হইয়া, এ বিষয়ে চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, রাজসাহীতে আজ কয়েক বৎসর হইল, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে এই সমিতির কার্য্য বিশেষ প্রশংসার্হ। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহে ইহার বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালার ইতিহাসের সকল বিভাগের পরিচয় দেওয়া এই অল্প সময়ে সম্ভবপর নয়। তবে উদাহরণস্বরূপ দুই চারিটী বিষয়ের উল্লেখমাত্র করিব। গুপ্তরাজাদিগের কোন লিপি পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ছিল না, এক্ষণে তাঁহাদের একখানিমাত্র তাম্র-শাসন বঙ্গদেশে রাজসাহী জেলায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেখানি প্রথম কুমারগুপ্তের লিপি। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, প্রথম কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত—এই কয়জন গুপ্তরাজারও কয়েকটী মুদ্রার আবিষ্কার বাঙ্গালা দেশে হইয়াছে। এইরূপ প্রমাণ আলোচনা করিয়া ঐতিহাসিকের দেখিবার সুবিধা হইবে, বঙ্গদেশ কোন দিন গুপ্তদিগের অধিকারভুক্ত ছিল কি না।

ভৌগোলিক সংস্থান-নির্ণয় ইতিহাসের একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়। ভৌগোলিক সংস্থান স্থির না হইলে ঐতিহাসিক ব্যাপার লইয়া অনেক সময় নানা গোলে পড়িতে হয়। বঙ্গের কোন্ সময়ে কতটা সীমা ছিল, বঙ্গ নাম কেন হইল, বঙ্গে কত জাতির প্রভাব ছিল এবং বঙ্গের উপর অন্য জাতির প্রভাবের পূর্ব্বে ইহার অধিবাসীরা কিরূপ ছিল, এই সমস্ত বিষয়েরও মীমাংসা করিতে হইবে। দশকুমারচরিতে পাওয়া যায়, "সুহ্মেষু দামলিপ্তী নাম নগরী।" দামলিপ্তী বা তাম্রলিপ্তি মেদিনীপুরের তমলুক; দেখা যাইতেছে, ইহা এক সময়ে সুহ্মের রাজধানী ছিল; সুতরাং সেই সময়ে সুহ্মের সংস্থানও স্থির হইয়া যাইতেছে। কিন্তু বরাহমিহিরের সময় সুহ্ম ও তাম্রলিপ্ত পৃথক্ ছিল। কেন না, তিনি "তাম্রলিপ্তকাঃ" ও "সুহ্মাঃ" পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ দিকে মহাভারতের টীকায় নীলকণ্ঠ, সুহ্ম ও রাঢ়ের একই অর্থ করিয়াছেন। পালি মহাবংশের নির্দ্দেশ হইতে বঙ্গ ও মগধের মধ্যে উত্তর-রাঢ়ের সংস্থিতি পাওয়া যায়। কাজেই নীলকণ্ঠের "রাঢ়" ও সুহ্ম অভিন্ন হইবার পক্ষে আপত্তি থাকে না। এইরূপে যে সমস্ত স্থানে সুহ্মের উল্লেখ আছে, তৎসমুদয় একত্র সমাবেশ করিয়া বিভিন্ন সময়ে সুহ্মের সংস্থান ঠিক করিতে হইবে এবং সুহ্ম বলিতে আসাম, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান বোঝা সম্ভব কি না, তৎসম্বন্ধে সমস্ত তর্কের সমাধানও করিতে হইবে। পুণ্ড্র, গৌড়, কর্ণসুবর্ণ, সমতট প্রভৃতি স্থান লইয়াও অনেক তর্ক আছে। এই সমস্ত স্থানের সংস্থান লইয়া বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। এইগুলি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হওয়া দরকার।

সমতটের ভৌগোলিক সংস্থান লইয়া এত দিন ঐতিহাসিকগণ নানারূপ মতবাদের অবতারণা করিতেছিলেন। সম্প্রতি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বিল্‌কিনিয়া গ্রামে উৎকীর্ণ লিপি সমেত একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে 'বিল্বকিণ্ডকিয়' গ্রাম যে সমতটের অন্তর্গত, তাহা ক্ষোদিত আছে। সুতরাং ত্রিপুরা জেলা যে সমতটের অন্তর্গত, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। "বাঙ্গালা-নগরে"র সংস্থান সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে ১৯২০ সালে Hodivala ও ১৯২১ সালে Geographical Journal এ সম্বন্ধে কয়েকটী নূতন তথ্যের সংবাদ দিয়াছেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

শেষ রক্ষা

(গল্প)

বিধাতার অখণ্ডনীয় 'কপালের লিখনে' চতুর্দ্দশ পুরুষের নাম উজ্জ্বল করিয়া শ্রীমান্ বিমলেন্দু দাস যখন এম্-এ, বি-এল, উপাধি লইয়া ও তদুপরি আরও এক যোড়া কৃত্রিম চক্ষু লইয়া সংসার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল, সেদিন যে তাহার পিতা শিবরাম দাসের হৃদয় আনন্দে অধীর হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

শিবরাম ওরফে শিবু একজন বর্ণজ্ঞানহীন পল্লী-কৃষক। চাষা বলিলে অন্য যে কেহ রাগ করে করুক, শিবু কিন্তু এই উপাধিতেই সন্তুষ্ট ছিল। সে ৬।৭টী পাস করা উচ্চ উপাধিধারী পুত্রের পিতা হইলেও এখনও শীতের শিশির-সিক্ত, বর্ষার অবিরাম বারিবর্ষিত ও গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রতপ্ত মাঠে মাঠে প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও বৈকাল কাটাইয়া দেয়। তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, "কি হে, ছেলে তোমার এত বড় পণ্ডিত হল, এখন আর কেন এত কষ্ট ?" শিবু উত্তর দিবে—"এত দিন চাষ আবাদ করেই খেলাম কর্ত্তা, আর বাকি ক'টা দিন বাবু হয়ে লাভ কি ? আপনাদের আশীর্ব্বাদে এই ক্ষেতগুলি বজায় রাখতে পারলে আমার বংশে মোটা ভাত কাপড়ের কোনও দিন অভাব হবে না।"—সুতরাং তাহাকে বলা বৃথা।

তবে ছেলেকে চাষা রাখিলেই ত হইত, এই অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া কয়েক বৎসর আয়ুর বিনিময়ে তাহাকে পণ্ডিত করা কেন ? টাকা রোজগারের জন্য কি ? হাঁ। একটা অজ্ঞাত কুহকে মুগ্ধ হইয়া আজকাল অন্য দশজন যেমন অদূর ভবিষ্যতে পুত্রের উপার্জ্জিত অর্থে আকাশে সৌধ রচিবার আশায় বর্ত্তমানের আয় ব্যয়ের হিসাব না খতাইয়া ছেলেদের ইংরাজী স্কুলে পাঠাইয়া দেন, শিবুও তেমনি দিয়াছিল।

দীর্ঘকাল বাড়ীতে বসিয়া থাকায় যে পিতার বিস্মিত অসহিষ্ণু দৃষ্টি তাহার উপর ক্ষণে ক্ষণে পতিত হইতেছে, বিমলেন্দু ইহা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল। কি জানি চাকুরীর অবস্থা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ পিতা যদি কোন দিন গ্লানিজনক কোন কথা বলিয়াই বসেন, তাই সাবধানতা অবলম্বন করিয়া চাকুরীর ব্যাপার সমস্ত তাঁহাকে জানাইয়া বিমলেন্দু বলিল, "এত লেখাপড়া শিখে কি শেষে ৬০ টাকার স্কুল মাষ্টারি নিয়ে কেলেঙ্কারী কিনতে বলেন ?"

পনের গণ্ডা টাকা ! তাও আবার মাসে মাসে ! শিবুর যা জমি জমা আছে, তার আয়ের উপর যদি আরও পনের গণ্ডা টাকা মাসে মাসে আসিয়া যোগ হয়, তাহা হইলে আর চাই কি ? ছয় মাসের মধ্যে সে আরও দুইখানি টিনের ঘর ও আরও একযোড়া হাল গরু করিতে পারিবে। এত বড় চাকরীটা—তাও আবার মাষ্টারী—কত বড় সম্মানের পদ—কেন যে ছেলের চোখে এত তুচ্ছ ঠেকিতেছে তাহা শিবু বুঝিতেই পারিল না। তাই সে ধীরে ধীরে বলিল, "তবে দারোগা-গিরি—"

এমন মূর্খও মানুষে হয় ? বিমলেন্দুর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। ক্রোধ করা বৃথা জানিয়া সংক্ষেপে সে পিতাকে বুঝাইয়া দিল—ঐসব সামান্য চাকুরী তাহার যোগ্য নহে। ইহাতে তাহার সম্মান যাইবে—ভবিষ্যৎ নষ্ট হইবে, নিন্দায় কাণ পাতা যাইবে না। এক পথ আছে—ওকালতি ; কিন্তু তাহাকে পসার জমাইতে হইলে কলিকাতায় বাসা করিয়া পরিবার লইয়া যাইতে হইলে রীতিমত ষ্টাইলে থাকিতে হইলে ; যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন।

শিবরাম ষ্টাইলের অর্থ বুঝিল না। তবে কয়েকটি কথা খুব বুঝিল—"যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন।" বুঝিয়া

তার একটু ভাবান্তর উপস্থিত হইল—বাপরে! আবার টাকা। এ যাবৎ যতগুলি টাকা সে পুত্রের শিক্ষাযজ্ঞে আহুতি দিয়াছে, তাহার হিসাব কাগজে কলমে জমা খরচ লেখা না থাকিলেও, মানসপটে স্পষ্টরূপে অঙ্কিত আছে। তার পর, বধূমাতাকে সেই কলির আজব সহর কলিকাতায় লইয়া যাওয়া! বৃদ্ধ শিবুদাস ক্রীড়ারত বালক হাবুলকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া হুঁকায় একটা জোর টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে মনে মনে বলিল, "উহুঁ, তা হবে না।"

"কি বলেন? সামান্য টাকার জন্যে কি জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সব নষ্ট হবে?"

পুত্রের প্রশ্নে স্বপ্নোত্থিতের মত চমকিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে শিবুদাস বলিল, "তা—তা—কত দিতে হবে এখন? আর বৌমাকে কি—কি—এখন না নিয়ে গেলে হয় না? সে সহর নাকি ভাল নয়, সেখানে গেরস্ত বৌ ঝিয়ের মান ইজ্জৎ থাকে না।"

পুনরায় বিমলেন্দুর ভ্রূকুঞ্চিত হইল, ভাবিল মূর্খতাই সকল দোষের আকর। পিতাকে চটাইতেও সাহস হইল না। তাই সে জিহ্বা সংযত করিয়া, কলিকাতায় যে কত বড় বড় শিক্ষিত লোকের বাস তাহা বিবৃত করিয়া, টাকার একটা এষ্টিমেট পিতাকে বুঝাইয়া দিল।

পুত্রের ষ্টাইল ও এষ্টিমেট বজায় রাখিবার জন্য নিরীহ শিবুদাস তাহার আজন্ম অন্নদাত্রী ভূমির কিয়দংশ পরহস্তে দিয়া হৃদয়ে বড় শূন্যতা বোধ করিল। যাওয়াই যখন স্থির, তখন আর অযথা বাধা প্রদান করিয়া পুত্রকে ক্ষুণ্ণ করিতে প্রবৃত্তি না হওয়ায়, সে গ্রামের পুরোহিত দ্বারা শুভদিন দেখাইয়া যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হইল।

নির্দ্দিষ্ট শুভদিনে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও স্ত্রী পুত্র কন্যা সহ বিমলেন্দু কলিকাতা যাত্রা করিল। ষ্টেশনে তাহাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া শিবুদাস যতক্ষণ গাড়ী দেখা গেল ততক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তারপর, শূন্যহৃদয়ে সে বাড়ী ফিরিয়া দেখিল সব আঁধার।

২

বিমলেন্দুর ওকালতীর পাঁচটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই পাঁচটি বৎসরে তার দেশের জমি জমা বাড়ী ঘর সমস্তই একে একে বিসর্জ্জন দিয়া, সে এখনও কলিকাতায় টিকিয়া আছে। তাহার স্ত্রী মোক্ষদাও এখন আর সে পাড়াগেঁয়ে গৃহস্থবধূ নহে। তাহার মনটা বিশেষ বিকৃত না হইলেও, স্বামীর তাড়নায় সর্ব্বদা জামা সেমিজে সজ্জিত হইয়া ফিটফাট হইয়া থাকিতে হয়, কাযেই আহারের খরচ কমাইয়া দিয়া আজকাল বাহিরের এই চটক বজায় রাখিতে হইতেছে। হইবেই বা না কেন? লোকে দেখিতে বাহিরের পালিশটাই তো দেখে? ভিতরে কে কি খায় না খায় তাহা জানিবার জন্য কার মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন? আর বাজার সামগ্রী যতই কম হউক না, কেন রাঁধিবার জন্য একটি ৮।৯৲ মাহিয়ানার পাচক আছে। এই দারুণ গ্রীষ্মে গৃহের যিনি শোভা তিনি আগুন তাপে বসিয়া শরীর ক্ষয় করিবেন ইহা কি কোন স্বামীর অভিপ্রেত হইতে পারে? তবে কদাচিৎ পাচক না আসিলে রান্না কিংবা ঝি চাকরের অসুখ হইলে তাহাদের কাযগুলি মোক্ষদাকে সকলই করিতে হয়, কিন্তু সে কতকটা বিরক্ত ও কতকটা বাধ্য হইয়া—আগের মত আনন্দ ও প্রীতির সহিত নহে।

নিঃসম্বল লোকের পক্ষে প্রথম ওকালতি ব্যবসায়ে—বিশেষ হাইকোর্টে—প্রবেশ করা যে কেবল মরীচিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হওয়া শুধু তাই নয়, ঘোর নির্ব্বুদ্ধিতা—মিষ্টার ডস্ এত দিনে তাহা বুঝিলেন—কিন্তু বুঝিয়া কি হইবে? দেনার পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। এদিকে ছেলে খালি পায়ে স্কুলে যাইতে পারিতেছে না, মেয়ের জামা নাই, গৃহিণীর কাপড় নাই, দোকানে দোকানে বাকির তাগাদা, নিজের শত তালিযুক্ত ছেঁড়া জুতা, মলিন পোষাক।

বাহিরের বৈঠকখানায় একখানি চেয়ারে পিঠ রাখিয়া টেবিলের উপর পা ছড়াইয়া দিয়া বিমলেন্দু এই রকম অভাব অনটনের চিন্তাস্রোতে হাবুডুবু

খাইতে খাইতে আপন অবস্থার কথা ভাবিতেছিল—আর মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরাইয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। হঠাৎ তাহার ভ্রূযুগ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। টেবিলের উপর সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া সে বলিয়া উঠিল—"যে কোন রকমেই হোক আমি টাকা করব—ন্যায় অন্যায় কিছু দেখব না।"

এই বিমলেন্দুই একদিন তার বন্ধু মহলে গর্ব্বে বুক ফুলাইয়া বলিয়াছিল—"উকিল হইলাম বটে, কিন্তু দেখিও তোমরা, আমি কোন dishonest wayতে টাকা করিব না।" সে আজ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তবে কথা যে সে না রাখিয়াছিল এমন নহে। মক্কেলের কায সে প্রাণপণে করিয়া দিত। গরীব মক্কেলের জন্য বিনা পয়সায় খাটিয়া দিত—কার্য্যগতিকে মোকদ্দমা না হইলে ফি পর্য্যন্ত লইত না। কিন্তু গুণের আদর করিতে কেহ জানিল না। হাইকোর্টরূপ বিশাল জলধি তরঙ্গের একটি ছোট্ট ঢেউ সে—কেহ তাহার সন্ধান লইল না। এই পাঁচ বৎসরের উপার্জ্জনের হিসাব সে খতাইয়া দেখিয়াছে, গড়ে মাসে বড় জোর ১০০ টাকা। একশ টাকায় কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া করিয়া স্ত্রীপুত্রের ভরণ পোষণ ও অন্যান্য নানাপ্রকার বাজে ব্যয় চলে না।

সহসা বাড়ীর সম্মুখে একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী দাঁড়াইবার শব্দ হইল—"এই ১৭ নম্বর নয়? হ্যাঁ এই ত।"

দুইটি যুবক গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া দেখিল, বাহিরে দেওয়ালে এক খণ্ড কালো রঙের কাঠের উপর সাদা অক্ষরে বাঙ্গালায় ও ইংরাজীতে লেখা রহিয়াছে "বিমলেন্দু দাস এম-এ, বি-এল, উকিল হাইকোর্ট।"

যুবক দুইটি সদর দরজার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ দিকের ঘরটিতে প্রবেশ করিয়া বিমলেন্দুকে নমস্কার করিল। একজন বলিল, "আপনার নামই কি বিমলেন্দু বাবু?"

বিমলেন্দু প্রতিনমস্কার করিয়া উত্তর দিল, "আজ্ঞে হাঁ, বসুন। বলিয়া ইঙ্গিতে সম্মুখের দুইখানি চেয়ার দেখাইয়া দিল। আগন্তুকের একজন পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া বিমলেন্দুর হাতে দিল। খাম ছিঁড়িয়া বিমলেন্দু পড়িতে লাগিল—

"প্রিয় মিঃ দাস,

পুরাণো বন্ধুত্বের দাবীর জোরে আজ একটা অনুরোধ করিতে সাহস করিতেছি। আশা করি রাখিবেন। পত্রবাহক এই দুই ভদ্রলোক আমার নিতান্ত আত্মীয়, অবস্থা ভাল। মোক্তারী পরীক্ষা দিয়াছে, কিন্তু পাস করিবার আশা বড় নাই। পরীক্ষক মিঃ—র কাছে আপনার খুব খাতির আছে জানি। একটু চেষ্টা করিয়া দেখিবেন কি? আবার বলি—পুরাণো বন্ধুত্বের দাবী। আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন।

আপনার

এইচ, এল, ঘোষ।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে বিমলেন্দুর ব্যথিত শুষ্ক মুখ হর্ষোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া, চিঠিখানি যুবকদিগের হাতে ফিরাইয়া দিবার ভান করিতে করিতে ম্লানমুখে বলিল, "দেখুন, বড্ড দুঃখিত হ'লাম। একায আমাদ্বারা হওয়া কঠিন। না না, এ আমি পারবো না।"

যুবক দুইটি একবার পরস্পর চোখ টিপিল এবং তার পর হাত যোড় করিয়া মিনতির স্বরে বলিল, "আমাদের জন্যে আপনার এ কষ্টটুকু করতেই হবে। তবে আমরা বলতে সাহস করি না—কিন্তু—কিন্তু যদি কিছু মনে না করেন তবে —"

একটু ভাবিয়া, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বিমলেন্দু বলিল, "সে ত বটে, সে ত বটে। কিন্তু—আচ্ছা কত দিতে পারেন আপনারা?"

"আপনাকে এক শ, আর পরীক্ষককে একশ।" বিমলেন্দু গম্ভীর মুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, "নাঃ, আমা দ্বারা এ কায হবে না। বুঝছেন না—কাযটা কত কঠিন।"

বিমলেন্দুর কথার ঝাঁজে পুনরায় যুবকদের মধ্যে

একটা চোখের ইঙ্গিত খেলিয়া গেল এবং দর দস্তুরের পর স্থির হইল ৫০০ টাকা।

সাময়িক দুই চারিটি প্রশ্ন করিবার পর বিমলেন্দু তাহাদিগকে চা খাইবার অনুরোধ করিল। ঘড়ীতে তখন বেলা পৌনে ন'টা। যুবক দুইটী উঠিবার উপক্রম করিয়া বলিল, তাহারা চা খাইয়াই আসিয়াছে। সৌজন্য ভরা সুরে তাহাদের গমনে বাধা দিয়া বিমলেন্দু বলিল; "তাতে কি এসে যায়? খেয়ে এসেছেন—নয় আর একপেয়ালা খাবেন।"

বিমলেন্দু ভিতরে গিয়া দেখিল, মোক্ষদা একগাদা বাসন লইয়া কলতলায় মাজিতে বসিয়াছে; ছোট ছেলে সেইখানে জল কাদায় পড়িয়া প্রাণপণে কাঁদিতেছে। আজ মাসাবধি ঝি নাই।

স্বামীকে সম্মুখে দেখিয়া মোক্ষদার মেজাজ আর এক ডিগ্রী উচ্চে উঠিল। সে ছেলেটির পিঠে এক প্রকাণ্ড চপেটাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল, "মর জলে ভিজে জ্বর হয়ে মর, মরতে জায়গা পাওনি তাই আমার কাছে এসেছ।"

ছেলেটিকে কোলে তুলিয়া কোঁচার কাপড়ে তার গায়ের জল মুছাইতে মুছাইতে বিমলেন্দু বলিল, "ওকে শুধু শুধু মারছো কেন—কচি ছেলে ও কি বোঝে?"

"ওঃ, বড় দরদ দেখাতে এসেছে যা হোক! ছেলে রাখবার একটা চাকর রেখে দাও না অত যদি মমতা।"

কথা কাটাকাটিতে সময় নষ্ট করা বৃথা, বিশেষ স্ত্রীর কাছে নিজের একটু কাযও আছে। বিমলেন্দু কণ্ঠস্বর যথোচিত মোলায়েম করিয়া বলিল, "অমাবস্যা কি চির দিনই থাকে মুখী? আবার ঝি চাকর আসবে, ভাবনা কি? পূর্ণিমা যদি চিরস্থায়ী হত তবে কি তার আদর কেউ করতো? দুঃখ আছে বলেই সংসারে সুখের এত আদর। তা সে যাক, তাড়াতাড়ি একটু চা তৈরী করে দাও দেখি, দুজন ভদ্রলোক এসেছেন।"

মুখ বাঁকাইয়া মোক্ষদা তীব্র শ্লেষ মিশ্রিত স্বরে বলিল, "হাঁড়ি চড়বে কিসে তার নাই ঠিকানা, চা খায়। কচি ছেলেটা এই এত বেলা অবধি না খেয়ে খিদেয় পড়ে কাঁদছে, দুপয়সার সাগু বার্লি যে কিনে খাওয়াব এমন একটি পয়সা আমার হাতে নেই—এমনি পোড়া অদেষ্ট!"

"আহা থাম, বাইরে লোক রয়েছে। সব হবে ভাবনা কি? চা-টা শীগ্‌গির করে দাও, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেল না।"

বহু কষ্টে চা চিনি ও দুধের যোগাড় করিয়া দুই পেয়ালা চা লইয়া বিমলেন্দু লক্ষ্মীর বাহন দুইটির তুষ্টি সাধন করিল। কথা রহিল, দুই তিন দিন মধ্যেই কাজ আরম্ভ হইবে।

কাণে আশার ঝঙ্কার ধ্বনিত হইলেও বিমলেন্দুর মন সংশয়ে ভরিয়া উঠিল। এক্জামিনার মিঃ—রায় ত অর্থে বশীভূত হইবার লোক নহেন! আর এ বিষয় তাঁহার নিকট উত্থাপন করাও সহজ কথা নয়! অন্য একটা উপায় ভাবিয়া লইয়া সে আপন মনেই বলিল, "ঠিক হয়ে যাবে—তবে একটু সাহস চাই।" চাবির রিংটি বাহির করিয়া তার মধ্য হইতে একটি চাবি সে বার কয়েক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল ঠিক আছে।

মিঃ রায় বিমলেন্দুরই সিনিয়র বৃদ্ধ উকীল। তিনি তাঁহার জুনিয়র বিমলেন্দুকে বিশেষরূপ বিশ্বাস ও স্নেহ করিতেন।

৩

আজ কয়েক দিন দাস পরিবারের গৃহে আশা দেবীর আবির্ভাবে সকল দীনতা ও মলিনতা এক নবীন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ বিমলেন্দু বাবুর হৃদয় যেন মলয় স্পর্শে নূতন পল্লবে মঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে একটা অশান্তির হাওয়াও বহিতে লাগিল। জীবনে এই প্রথম তার অসাধুর কার্য্য! আবার অমনি ক্ষুধাতুর বস্ত্রহীন পুত্রকন্যার প্রতিকৃতি, ক্ষীণকায়া গৃহিণীর মলিন মুখ, তদুপরি ভবিষ্যতের উজ্জ্বল দৃশ্য সকলে মিলিয়া তাহাকে এমনি বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল যে বিমলেন্দু আর ভাবিতে পারিল না। পাপকে বক্ষ পাতিয়া আলিঙ্গন করিল।

গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা রাত্রি বাজিল। সে বাজনা সুপ্ত কলিকাতা নগরীর চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতে প্রয়াস পাইল, কিন্তু কিছুদূর ঘুরিয়া ফিরিয়া বাতাসে কোথায় মিলিয়া গেল। এই গভীর শীতের রাত্রে একখানি ট্যাক্‌সি চৌরঙ্গী রোডের বক্ষ ভেদ করিয়া রসা রোডের উপর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে মোড় ফিরিয়া বাঁ দিকের একটা গলি দিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, একখানি দ্বিতল বাড়ীর সম্মুখে থামিল। ট্যাক্‌সি হইতে নামিল পূর্ব্বোক্ত সেই দুইটি যুবক।

যুবক দুইটি বারান্দায় উঠিতেই বিমলেন্দু তাহাদের হস্ত ধারণ করিয়া ঘরে লইয়া গেল।

অপ্রশস্ত একখানা কক্ষ, দেওয়ালের চারিদিকে কয়েকখানা ক্যালেণ্ডার সম্বলিত ছবি—একদিকে একটা ক্লক আপন মনে টক্ টক্ করিতেছিল। ঘরের মধ্যে একখানা টেবিল ও চারিদিকে কয়েকখানা চেয়ার। আলমারীতে কতকগুলি আইনের বইও সজ্জিত ছিল, কিন্তু তাহাদের কাহারও উদ্‌ঘাটিত হওয়া বহুকাল ঘটিয়া উঠে নাই! টেবিলের উপর একটি জুয়েল ল্যাম্প জ্বলিতেছিল।

যুবক দুইটি গা হইতে ওভার কোট খুলিয়া চেয়ারের পিঠে রাখিয়া পাশাপাশি দুখানা চেয়ারে বসিল। বিমলেন্দু ইত্যবসরে চাবি বাহির করিয়া, টেবিলের ড্রয়ার হইতে বাহির করিল—দুখানা কাগজে মোড়ান খাতা ও একটা কালীর দোয়াত। খাতা দুইখানি ও কালীর দোয়াতটি টেবিলের উপর রাখিয়া, বুক্ সেল্‌ফ হইতে একখানি আইনের বই টানিয়া বাহির করিয়া তাহার পাশে রাখিল। রাখিয়া, ধীরপদে একবার বাহিরে গিয়া চারিদিক ভাল করিয়া দেখিয়া আসিল। তাহার পর দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

এইবার সে যুবক দুইটির অপর দিকে একখানা চেয়ার অধিকার করিয়া, কাগজ মোড়া খাতা দুইখানা খুলিয়া ফেলিল। যুবকেরা মোক্তারী পরীক্ষায় যে সরকারী খাতায় প্রশ্নোত্তর লিখিয়াছিল এ সেই খাতা।

যুবক দুইটির সম্মুখে প্রশ্নপত্র দিয়া বিমলেন্দু আইনের বই খুলিয়া উত্তরগুলি একটু একটু উল্‌টাইয়া এক এক জনকে বলিয়া যাইতে লাগিল। যুবক দুইটি লিখিতে লাগিল।

ক্লকে ক্রমে চারিটা বাজিল। অন্ধকার থাকিতে কার্য্য শেষ হওয়া চাই। হঠাৎ ও কি? রুদ্ধ জানালার পাখী দুটি মাত্র খোলা ছিল, হঠাৎ সে দুইটি বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কোন ভারী জিনিস পতনের শব্দ হইল। এই শব্দে কক্ষ মধ্যস্থ তিনটি লোকই চমকিয়া উঠিল। যুবক দুইটাকে বসিবার ইঙ্গিত করিয়া বিমলেন্দু সন্তর্পণে দরজা খুলিয়া দেখিয়া আসিল, কেহ কোথাও নাই।

কার্য্য অন্তে যুবক দুইটাকে বিদায় দিয়া, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বিমলেন্দু তাহার শয়ন কক্ষে ফিরিয়া আসিল। স্তিমিত আলোকে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া দেখিল সে ঘুমাইতেছে। উদ্বেগহীন চিত্তে সে তখন বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার উদ্দেশে নোটগুলি আলোকের নিকট মেলিয়া ধরিতেই, তাহার মনের মধ্যে সুপ্ত বিবেক যেন জাগ্রত হইয়া উঠিল—ভাবিল, কালই নোটগুলি ফিরাইয়া দিয়া যুবক দুইটাকে বলিবে এ কায তাহা দ্বারা হইবে না। কিন্তু সে মুহূর্ত্ত মাত্র। তখনই আবার সংসারের অভাব অনটনের কথা স্মরণ হইল। বাক্স খুলিবার শব্দে যদি যূথীর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়! কায নাই—সে পুনরায় নোটের তাড়াটী কোটের পকেটে রাখিয়া, নিদ্রিতা পত্নীর পার্শ্বে শুইয়া পড়িল।

৪

আজ সকালে ঘুম ভাঙ্গিতে বিমলেন্দুর দেরী হইয়া গেল। ঘড়ির ঢং ঢং শব্দের সঙ্গে দুটি ছেলে মেয়ের ক্রন্দন মিশ্রিত "মা কি খাব—ও মা ক্ষিদে পেয়েছে যে।" তাহার শ্রবণ পথে প্রবিষ্ট হইল।’

ওঃ এত বেলা হয়ে গেছে"— বলিয়া বিমলেন্দু শয্যা ত্যাগ করিয়াই আলনার কাছে গিয়া কোটের পকেট হইতে টাকা বাহির করিতে গেল। কিন্তু

কোট ? কোট কৈ ? আলনার উপর হইতে কাপড়গুলি টানিয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে কোটের অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোট ত ইহার মধ্যে নাই! মুহূর্ত্তে বাক্স ডেক্স টানিয়া খুলিয়া সে উন্মাদের মত চিৎকার করিয়া উঠিল, "আমার কোট ? কোট কি হল ? "

হাতের কায অর্দ্ধ সমাপ্ত রাখিয়া মোক্ষদা তাড়াতাড়ি উপরে আসিয়া স্বামীর অবস্থা দেখিয়া বলিল "কি হল, অমন ষাঁড়ের মতন চেঁচাচ্ছ কেন ?"

"আমার কোট ? কোট কি হল ?"

"ওঃ, কোট ? সে তো প্যাণ্টের সঙ্গে আজ সকালে ধোপাবাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"সর্ব্বনাশ করেছ"—বলিতে বলিতে বিমলেন্দু হাঁপাইতে হাঁপাইতে ধোপা বাড়ীর উদ্দেশে ছুটিল। নিকটেই ধোপা বাড়ী, তার ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইল না। সে কোন রকম ভূমিকা না করিয়াই উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"শিগ্‌গির বল আমার নোট কোথায় ?"

বিস্মিত দৃষ্টি স্বামীর মুখের প্রতি স্থির করিয়া মোক্ষদা বলিল, "সে কি ? তার আমি কি জানি ? পাগল হলে নাকি ?"

পাঁচ পাঁচ শো টাকার নোট কোটের পকেটে ছিল। কোট ধোপাবাড়ী দেবার সময় অত বড় তাড়াটা যে মোক্ষদার দৃষ্টিগোচর হয় নাই ইহা সে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিতে পারে ? তাই উত্তেজিত বিমলেন্দু কর্কশ স্বরে পুনরায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "পেয়েছ কি না শিগির বল, নৈলে এক এক করে সবগুলোকে খুন করে আমি ফাঁসি যাব।"

পরম নিশ্চিন্ত ভাবে মোক্ষদা বলিল, "সে, ইচ্ছে হয় খুন কর, কিন্তু সত্যি বলছি নোট আমি পাই নি। আর তোমার এ নোটের কথাও আমি বিশ্বাস করি না। তুমিতো আর আলাদিনের প্রদীপ পাওনি যে রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাবে! হয় স্বপ্ন দেখেছ, নয় অভাবের তাড়নায় মাথা খারাপ হয়েছে।"

বিছানার তলা হইতে সেই খাতা দুইখানি টানিয়া বাহির করিয়া স্ত্রীর দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, স্ত্রীর উপর জ্বলন্ত দৃষ্টি হানিয়া বিমলেন্দু বলিল, "বটে, স্বপ্ন দেখেছি, পাগল হয়েছি তবে ? এ দুখানা কি তোমার মুণ্ডু ?"

বিস্ময়চকিতা মোক্ষদা খাতা দুইখানি উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া বার কয়েক নাড়িয়া চাড়িয়া, কিছু বুঝিতে পারে নাই এমনি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি স্বামীর ক্রোধোন্মত্ত দৃষ্টির সহিত মিলাইয়া বলিল, "এতে কি টাকার মন্তর লেখা আছে ?"

"তোমার শ্রাদ্ধের মন্তর আছে।" বলিয়া গত রাত্রির ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া উদ্ধত স্বরে বলিল, "টাকা পেয়েছ কি না সত্যি করে বল ?"

কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া মোক্ষদা ক্রন্দন জড়িত স্বরে বলিয়া উঠিল, "ছিঃ ছিঃ তুমি এমন! তাইতো বলি, রাত দুপুরে নীচের ঘরে এমন কি কায ? ছিঃ ছিঃ শেষটা অর্থলোভে এমন নীচ হলে তুমি ? জালিয়াতি করে অর্থ উপার্জ্জন—সে কি না করলে চলত না, না হয় স্ত্রী পুত্রের হাত ধরে দোরে দোরে মেগে খেতে—"

"জালিয়াতি কিসের ?"

"জালিয়াতি নয়ত কি বলে একে ? কি বোঝাতে চাও তুমি আমায় ? এত কষ্ট পেয়েও, আমার স্বামী শিক্ষিত ন্যায়পরায়ণ বলে আমার মনে যে সান্ত্বনা ছিল, সেটাও আজ তুমি চূর্ণ করে দিলে! ওগো, আমার মাথা খেয়েও কি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়নি তাই এই রকম করে নিজের মথাটিও খেতে বসেছ।" স্বামীর মুখের দিকে মুহূর্ত্ত মাত্র দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া সে পুনরায় বলিতে লাগিল, "তুমি যা ভাবছ, সে আমি বুঝতে পেরেছি। ওগো, তুমি আমায় মাথা খেয়েছ মানে আমার পরকাল খেয়েছ, আমার মনুষ্যত্ব নষ্ট করেছ। আমি গরীবের মেয়ে, গরীবের ঘরে পড়েছিলাম, তুমি দুপাতা ইংরেজী পড়ে এখানে এনে আমায় বিলাসিতার স্রোতে ভাসিয়েছ। হাতা বেড়ি ধরলে যে হাত শক্ত হয়, রাঁধলে গায়ের রং ময়লা হয়

এ কুশিক্ষা তুমিই আমায় দিয়েছ। নিজের বিলাস চর্চ্চা ছাড়া মেয়েদের যে করণীয় অন্য কোন কায আছে এই পাঁচ ছয় বছরে তা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তাই তারই ফলে আজ দাস দাসীর অভাবে চোখে আঁধার দেখছি, এবং তারই চূড়ান্ত পরিণতি করতে আজ তোমায় টাকার জন্যে জালিয়াত সাজতে হয়েছে। হয় তো কাল এর চেয়েও আর একটা বেশী অন্যায় কায করে ফেলবে—ওঃ মাগো!” মোক্ষদার বুকের মধ্যে ক্রন্দনবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; সে দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

মোক্ষদার কান্না ও কথার মধ্যে এমনই একটা জোর ছিল, যাহার বলে বিমলেন্দু সেই মুহূর্ত্তেই তাহার সমুদয় সুখ দুঃখ লাভ লোকসান ভুলিয়া গিয়া আপনার অস্তিত্বটুকুও হারাইয়া ফেলিয়া নিজেকে সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীর মধ্যে সঁপিয়া দিল।

দারিদ্র্যের জন্যই সাংসারিক অনটন এবং সেই অনটন হেতুই অর্থলোভে এই অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান। নোটের তাড়াটি হারাইবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের বিপদ শত মূর্ত্তিতে যেন বিমলেন্দুর চোখের সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল।

তার পর আর এক চিন্তা—সেই খাতা দুইখানি। যে ভাবে খাতা দুইখানি সে লুকাইয়া আনিয়াছে, কার্য্য শেষে আবার তেমনি ভাবেই তাহা যথাস্থানে রাখিয়া আসিবে বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিল। টাকা হারাইবার সঙ্গে সঙ্গে সে সাহসও কোথায় অন্তর্হিত হইল। যদিও একার্য্যের সাক্ষী মাত্র পূর্ব্বোক্ত সেই যুবক দুইটি ছাড়া আর কেহ নাই, কিন্তু তথাপি তার মনে হইতে লাগিল, এই খাতা দুইখানি হারাইবার দরুণ যে একজামিনার মহাশয়ের সন্দেহ দৃষ্টি তাহা যেন তাহারই উপরেই নিপতিত হইবে।

তার পর মোক্তারী পরীক্ষার ফল বাহির হইলে পূর্ব্বোক্ত যুবক দুইটিও যে আসিয়া তাহাকে ধরিবে সে বিষয়েও সন্দেহ মাত্র নাই। এখন যত শীঘ্র সম্ভব এ স্থান ত্যাগ করিয়া নিজকে বাঁচাইতে হইবে।

৫

স্ত্রীর অবশিষ্ট অলঙ্কার কয়খানি ও অন্যান্য দ্রব্য বিক্রয় করিয়া, কতক বাজার দেনা শোধ করিয়া সে ভবানীপুর ত্যাগ করিল। বন্ধু মহলে বলিল সে একজন নন-কো-অপারেটর, তাই ওকালতী ত্যাগ করিয়া পল্লী সংস্কারের জন্য দেশে যাইতেছে।

হাটখোলায় একখানি ঘর ভাড়া করিয়া সেখানে স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের রাখিয়া বিমলেন্দু চাকরীর চেষ্টা করিতে লাগিল। একটু সতর্ক হইয়া চলাফেরা করিলে কলিকাতার মত সহরে কাহাকেও চিনিয়া বাহির করা সোজা নয়!

কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়। একদিন চাকরীর খোঁজে কোনও একটি কোম্পানির আফিসে যাইতে হইয়াছিল, ফিরিবার পথে ধর্ম্মতলার মোড়ে শ্যামবাজারের ট্রামে উঠিতে গিয়া সে দেখিল, বেঞ্চে বসিয়া সেই দুইটী যুবক। বিমলেন্দুর এক পা ট্রামের পা-দানিতে অন্য পা খানি মাটীতে—গাড়ীর হাণ্ডেল মুহূর্ত্তে তাহার শিথিল হস্তচ্যুত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে আছাড় খাইয়া পড়িল।

“বাঁধো বাঁধো” একটা কোলাহলের সহিত, কেমন করিয়া যে কখন তার অবসন্ন দেহ কাহারা ট্রাম গাড়ীর মধ্যে তুলিয়া লইল তাহা বিমলেন্দু বুঝিতেও পারিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার মোহভাব কাটিলে শুনিল, “ওঃ আর একটু হলেই মারা পড়তেন যে! এখন কোথায় আছেন? আপনার বাসায় আমরা গিয়েছিলাম আমাদের মায়ের পায়ের একটু ধূলো নিতে—কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, শুনলাম আপনারা দেশে গিয়েছেন।”

যুবকদের একটী কথাও বিমলেন্দুর কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল না। সে শুধু ভাবিতেছিল, “সর্ব্বনাশ! ইহারা যে এখনই আমাকে পুলিশের হস্তে সমর্পণ করিবে। মুহূর্ত্ত মধ্যে সকল কথাই প্রকাশ হইয়া পড়িবে!” তাহার পর বিমলেন্দুর চোখের সম্মুখে অন্ধকার কারাকক্ষের মুক্ত দ্বার উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং সেই চলন্ত ট্রাম হইতে সে লাফাইয়া

পড়িবার উপক্রম করিতেই, পুনরায় যুবক দুইটি তার দুই পাশ হইতে দুই হাত ধরিয়া ফেলিল, "কি করেন কি করেন—"

"দোহাই ধর্ম্ম, আপনারা আমাকে পুলিশে দেবেন না। আমি সত্য বল্‌ছি সে টাকা—"

তাহার আর্ত্ত স্বর ও বিচলিত ভাবে যুবক দুইটী বুঝিল, ঘটনাটী সম্পূর্ণ ইঁহার অজ্ঞাতে সম্পন্ন হইয়াছে। তাহারা বলিয়া উঠিল, "সেজন্যে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যেদিন খাতা লিখে দিয়ে আসি, তার পরদিন আবার আমরা আপনার বাড়ীতে গিয়েছিলাম। আপনি বাড়ী ছিলেন না। মা আমাদের দেখ্‌তে পেয়ে, আমাদের ডেকে নিয়ে নোটগুলি সমস্ত আমাদের ফিরিয়ে দেন— আর সেই সঙ্গে আমাদের জ্ঞানচক্ষুও উন্মীলিত করে দেন। মা আমাদের অন্যায় প্রবঞ্চনা ও জালিয়াতির হাত থেকে মুক্ত করে, আমাদের সত্যের পথে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এ জন্যে আমরা তাঁর কাছে আজীবন চিরকৃতজ্ঞ থাক্‌বো। চলুন, আপনার সঙ্গে গিয়ে মাকে একবার প্রণাম করে আসি।"

দেখিতে দেখিতে গন্তব্য স্থান আসিয়া পড়িল। বিমলেন্দুসহ যুবক দুইটী নামিয়া পড়িল। বিস্ময়-বিমুগ্ধ আরোহীবর্গ তাহাদের দিকে চাহিয়া ভাবিল—"কি বলে, এরা পাগল নাকি?"

শ্রীকিরণবালা দেবী।

বসন্ত-হিন্দোল

ও দখিণা! ও মাতাল! ও মন্ ভোলা!
দে দোলা দে মর্ম্মে বনে দে দোলা!
শিউরে ওঠা বকুল কলির মউ পিয়া,
চম্পকেরে পর্ণপুটে প্রাণ দিয়া,
আম্রবনে কোকিল বধূর ঘুম হরি,
মুঞ্জরিয়া শীর্ণ শাখায় মঞ্জরী,
দে দোলা দে মন দোলানো অন্তরে!
দে দোলা দে কুঞ্জে বনে অন্তরে!

কে লুকালো হিম আড়ালে লাজ আঁখি,
কে র'ল আজ শুক্‌নো পাতায় মুখ ঢাকি,
কোন্ অভাগার বৌ র'ল আজ বাক্‌হীনা,
চোখ গেল কার ঝল্‌সি প্রিয়ার চুম্ বিনা,
রাত জাগে ওই শূন্য শেষে কে আহা,
গুম্‌রে কাঁদে পিউ কাঁহা মোর পিউ কাঁহা!
বুক জোড়া সব রুদ্ধ ব্যথার ক্রন্দনে।
ও দখিণা দে ভাবা দে মন বনে!

যা ছুটে যা হো হো হোরীর গান ধরি,
দে পলাশে কৃষ্ণচূড়ায় লাল করি;
চুম্বিয়া লাজ-ঘোমটাঢাকা ফুল বাগে,
রঞ্জিয়া দে যৌবনেরি ফাগ রাগে!
বুকতলে আজ নৃত্য দোদুল দোল্ চলে
আধ্ ঘুমে কোন্ স্বপ্ন ব্যথা চঞ্চলে!
ও কুহকি! দে জাগায়ে মন জুড়ে
কল্পলোকের সুপ্তা বধূ নিদ্ পুরে।

মৃত্যু জরা কঙ্কালেরে দে নাড়া,
দোল দিয়ে দে চঞ্চলিয়া প্রাণ ধারা!
দে টুটায়ে কুণ্ঠা বাঁধন লাজ-ফাঁসি,
দে ফুটায়ে পাণ্ডু মুখে রূপ হাসি!
আধ মরা কে জীর্ণ কাঁথায় মুখ ঝাঁপে,
যৌবনেরি উৎসবে কার বুক কাঁপে,
দে সবুজের মদ মাতানে দে দোলা!
ও দখিণা দে দোলায়ে হিন্দোলা।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

বিবাহ-বিড়ম্বনা

এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? যে দেশে তরলমতি সরল প্রকৃতি বালক হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই বিবাহ করিবার জন্য লালায়িত, সে দেশে বিবাহের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে, সে কথা কাহার ভাল লাগিবে?

নব্য যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে নাটক নভেল পড়িয়া যাঁহাদের রুচি-বিকার ঘটিয়াছে, কবিকল্পিত কোন নায়িকাকে জীবন-সঙ্গিনী করিবার জন্য যাঁহারা আকাশে বাড়ী ঘর নির্ম্মাণ করিতেছেন, আমাদের কথায় তাঁহারা বিরক্তি প্রকাশ করিবেন; শাস্ত্রাভিমানী পণ্ডিত মহাশয়েরা বলিবেন, পিণ্ডের জন্য পুত্রের প্রয়োজন এবং পুত্রের জন্য বিবাহ করা প্রয়োজন—বিড়ম্বনা বোধে বিবাহ না করিলে—পিণ্ড লোপ, নাম লোপ, এবং বংশ লোপ হইবে। আমরা একে একে এগুলির আলোচনা করি।

পিণ্ডলোপ। আসঙ্গ-লিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য লোকে বিবাহ করিয়া থাকে; পিণ্ডপ্রাপ্তির আশায় কেহ কখন বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না; যদি কেহ কখনও তাহা করিয়াও থাকেন, সে দিনকাল আর নাই। শ্রদ্ধায় হউক, অশ্রদ্ধায় হউক, সামাজিক নিয়ম পালন করিবার জন্য লোকে এখন আদ্য শ্রাদ্ধটা কোন রকমে সারিয়া থাকে, কিন্তু পুরোহিতের খাতা অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যজমান বাড়ী হইতে তাঁহাদের যে আয় হইত, তাহা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে এবং বৎসরান্তে পূর্ব্ব পুরুষকে যে পিণ্ড দেওয়া হইত, তাহা একপ্রকার লোপ পাওয়ার উপক্রম হইয়াছে।

পিতামাতার প্রতি পুত্রের যে ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল, তাহা যেন আর নাই। ইতর ভদ্র প্রায় অনেক ঘরেই দেখিতে পাওয়া যায়, পুত্র উপায়ক্ষম হইয়া পিতামাতাকে ভরণ পোষণ করিতে না হয়, এজন্য আপন স্ত্রীটিকে লইয়া পৃথক হইতেছে। যে ছেলে বাপ-মাকে খাইতে দেয় না, সে যে তাঁহাদের মৃত্যুর পর পিণ্ড দিবে, ইহা কখনও আশা করা যায় না; দিলেও এমন অকৃতজ্ঞ পুত্রের দত্ত পিণ্ডে পরলোকগত পিতামাতার তৃপ্তিসাধন হইবে মনে হয় না।

পিণ্ডের জন্য পুত্র কামনা করা ভুল এবং পুত্রের জন্য বিবাহ করা বিড়ম্বনা।

নামলোপ। নাম লোপ হওয়া অনিবার্য্য; যাহার কীর্ত্তি থাকে, তাহার নাম থাকে, তদ্ভিন্ন জনসাধারণের মধ্যে কয়জনের নাম থাকে? তুমি তোমার বংশের সোণার চাঁদ বংশধর—তুমি জীবিত থাকিতে তোমার পূর্ব্ব পুরুষের নাম লোপ হইয়াছে। অন্যের কথায় কায নাই, তুমি নিজেই তোমার পূর্ব্ব পুরুষের নাম জান না। তোমার নামও একদিন কেহ জানিবে না; তাঁহাদের নাম লোপ হইয়াছে, তোমার নামও একদিন লোপ হইবে।

ঔরসজাত পুত্রকন্যা অপেক্ষা বরং মানস পুত্রকন্যা হইতে নাম থাকে। শেক্ষপিয়র গিয়াছেন, হ্যামলেট্, ওথেলো, ম্যাকবেথ তাঁহার নাম রাখিয়াছে; কালিদাস গিয়াছেন, শকুন্তলা হইতে তাঁহার নাম আছে। যতদিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, সূর্য্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি বঙ্কিমচন্দ্রের মানস কন্যাগণ তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

যাহার কীর্ত্তি থাকে তাহার নাম থাকে, যাহার কুকীর্ত্তি থাকে তাহারও নাম থাকে। রাণী ভবানী কাশীতে অন্নছত্র দিয়া গিয়াছেন, লালা বাবু বৃন্দাবনে দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম আছে। আওরঙ্গজেব বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ বানাইয়াছিলেন; কালাপাহাড় দেবদেবীর মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া গিয়াছেন,

তাঁহাদেরও নাম আছে। যত দিন হিন্দু ধর্ম্ম না লোপ পাইবে, ততদিন এক দিকে রাণী ভবানী ও লালা বাবুর নাম করিয়া লোকে তাঁহাদের চরণে অর্ঘ্য দিবে; অন্য দিকে আওরঙ্গজেব ও কালাপাহাড়ের নাম করিয়া লোকে মর্ম্মাহত হইতে থাকিবে।

তুমি যদি কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পার, তোমারও নাম থাকিবে; আর তুমি কুকীর্ত্তিশালী হইলে তোমার নামে তোমার ভাবী বংশধরগণ লজ্জিত হইবে এবং তোমার নাম তাহাদের নিকট বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়াইবে।

ভাল বা মন্দ কোন কীর্ত্তি তোমার না থাকিলে, জলবুদ্‌বুদের মত তোমার নাম এই কালস্রোতে কোথায় মিলাইয়া যাইবে কেহই তাহার সন্ধান রাখিবে না।

বংশলোপ। বংশ লোপ না হইয়া বংশ থাকে অনেক লোকেই সেই ইচ্ছা করে বটে।

Goldsmith সাহেব তাঁহার Vicarএর মুখে বলিয়া গিয়াছেন—

A man who married and brought up a large family, did more service than he who continued single.

—অবিবাহিত থাকা অপেক্ষা যে ব্যক্তি বিবাহ করিয়া বহু পরিবার প্রতিপালন করে, তাহার দ্বারা সংসারের অধিক পরিমাণে হিতসাধন হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি বহু পরিবার প্রতিপালন করিতে সমর্থ তাহার পক্ষে এ কথা সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু যে দিন আনে দিন খায়, যাহার বহু পরিবার প্রতিপালন করিবার আদৌ কোন ক্ষমতা নাই, তাহার পক্ষে এ কথাটি নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়।

এ সংসারে দরিদ্র লোকের সংখ্যাই বেশী; যখন দেখি বিবাহ করিয়া গরিবের ঘরখানি সন্তান সন্ততিতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের পেটে ভাত নাই, পরণে কাপড় নাই; অন্নাভাবে ছেলে মেয়েগুলি কঙ্কালসার হইয়াছে, বস্ত্রাভাবে বুকে হাত দিয়া তাহারা শীত কাটাইতেছে, ব্যারাম হইলে অচিকিৎসায় রোগ ভোগ করিয়া অকালে মারা পড়িতেছে, তখন কাহার না মনে হয় বিবাহ করা তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা হইয়াছে? সে নিজে গরিব ছিল, বিবাহ করিয়া আর দশটা গরিবের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। এই গরিবের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া তাহার দ্বারা সংসারের কি হিতসাধন হইয়াছে?

এ অবস্থায় আমাদের মনে হয়, বিবাহ না করিয়া একা থাকিলে তাহার সুখ স্বচ্ছন্দতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইত, এবং সংসার হইতে দশটি গরিবের সংখ্যা কমিয়া যাইত।

অবস্থা অনুসারে বংশ থাকা অপেক্ষা অনেকের বংশ লোপ হওয়াই মঙ্গল।

পশু পক্ষী হইতে মানুষ পর্য্যন্ত জীব মাত্রেরই হৃদয়ে আসঙ্গলিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য একটা প্রগাঢ় আগ্রহ জন্মিয়া থাকে। সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা করিবার জন্য এই আসঙ্গ লিপ্সা আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে, এবং এই আসঙ্গলিপ্সা হইতে বিবাহ প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে যে কত ভিন্ন ভিন্ন রকমের বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে তাহার ইয়ত্তা হয় না। এই সকল বিবাহ প্রথা প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়:—

(১) বিশৃঙ্খল (Promiscuous)
(২) বাহুপত্য (Polyandrous)
(৩) বাহুপত্ন্য (Poligamous)
(৪) দাম্পত্য (Monogamous)

বিশৃঙ্খল।

মানব সমাজের আদিম অবস্থায় বিবাহের কোন নিয়মপদ্ধতি বা শৃঙ্খলা ছিল না, এবং এখনও অনেক জাতির মধ্যে বিবাহ কাহাকে বলে সে সম্বন্ধে আদৌ তাহাদের কোন জ্ঞান নাই। তাহারা ইতর জীবজন্তুর

মত স্ত্রী পুরুষে মিলিত হইয়া সন্তান উৎপাদন দ্বারা বংশবৃদ্ধি করিয়া থাকে।

কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে বিবাহ পদ্ধতি অত্যন্ত ঘৃণিত ও লজ্জাকর বলিয়া বিবেচিত হয়। তাহাদের মধ্যে পাত্র পাত্রী বিচার না থাকায়, জনক দুহিতায়, এবং ভ্রাতা ভগিনীতে বিবাহ হওয়ার প্রথা আছে।

আফ্রিকার গঞ্জালভস ও লাবুন অন্তরীপের রাজারা নিজ দুহিতাকে বিবাহ করিয়া রাণী করিয়া লয়; আবার রাজার মৃত্যু হইলে, রাণী নিজের জ্যেষ্ঠপুত্রকে পতির পদে বরণ করিয়া থাকে।

যুদ্ধ করিয়া স্ত্রী হরণ করিবার নিয়মও কোন কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। কোন একটি পাত্রীর জন্য দুইটি পাত্র উপস্থিত হইলে তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং যুদ্ধ করিয়া যে জয়লাভ করিতে পারে, সেই সে পাত্রীকে বিবাহ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

কোন কোন সমাজে পাত্রীর মত অনুসারে বিবাহ হইয়া থাকে, বিবাহের সময় কেবল পাত্রীর অনুমতি লওয়া হয় এবং তাহার মত হইলেই বিবাহ হয়। কোথাও বা কন্যা বরকে স্বহস্তে পাণ তামাক দেয় এবং বর তাহা গ্রহণ করিলেই তাহারা উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়।

ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধদের মধ্যে বর কনে একাসনে বসিয়া আহার করিলেই তাহাদের বিবাহ হইয়া যায়। চীনে ও জাপানে বিবাহের সময় পাত্র একটি ফল কাটিয়া অর্দ্ধেক পাত্রীর মুখে দেয় এবং বাকী অর্দ্ধেক পাত্রী পাত্রের মুখে দিয়া থাকে।

নাভাগো জাতির মধ্যে বর কনে ফলপূর্ণ একটি ধামা মধ্যে রাখিয়া উভয়ে মুখোমুখি ভাবে বসিয়া সেই ধামা হইতে ফল খাইলেই তাহাদের বিবাহ হইল ধরিয়া লওয়া হয়।

এই সকল জাতির মধ্যে যেমন অতি সহজে বিবাহ হয়, আবার অতি সহজেই বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়। কেহ কোন কারণে স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেই পরস্পরের সম্বন্ধ সেই দিন শেষ হইয়া যায়।

বাহুপত্য।

এক স্ত্রী বহু পতি গ্রহণ করিলে তাহাকে বাহুপত্য বিবাহ বলে।

অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করিলে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতা তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; তৎপূর্ব্বে গৌতমবংশীয়া জটিলা সাত জন ঋষির পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বাক্ষী নাম্নী মুনিকন্যার সাত জন ঋষির সহিত বিবাহ হইয়াছিল। মারিষা নাম্নী কন্যাকে প্রচেতার দশ ভ্রাতায় বিবাহ করিয়াছিলেন।

উপরি-উক্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় সমাজের আদিম অবস্থায় আর্য্যগণের মধ্যেও এই বহুভর্ত্তৃকতা প্রথা প্রচলিত ছিল। এবং এখনও ভারতবর্ষের অনেক স্থানে এই প্রথা প্রচলিত আছে।

তিব্বতে উচ্চ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বহু ভর্ত্তৃকতা চলিয়া আসিতেছে। কাশ্মীর, লাদক, কুনাবার, কৃষ্ণবার, সিরমুর, মালাবার এবং সিংহল দেশীয় প্রথা অনুসারে রমণীরা বহু ভর্ত্তা গ্রহণ করিতেছে।

ত্রিবাঙ্কুড়ের দক্ষিণ অঞ্চলে "অম্বষ্ঠ" এবং "কমানার" জাতির মধ্যে এক ভ্রাতার স্ত্রী অপরাপর ভ্রাতার স্ত্রীরূপে গণ্য ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে; এবং সেই স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইলে জ্যেষ্ঠ সন্তান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার, মধ্যম সন্তান মধ্যম ভ্রাতার, পর পর এইরূপে সন্তানে স্বত্ব সাব্যস্ত হইয়া থাকে।

মালাবারের "নায়র" জাতির মধ্যে কোন পরিবারে একাধিক ভ্রাতা থাকিলে এক ভ্রাতা বিবাহ করে এবং সেই স্ত্রী অপর ভ্রাতাগণের স্ত্রী বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

টোডা, ফিউজিয়ন এবং তাহিতীর রমণীরা বহু ভর্ত্তা গ্রহণ করিয়া থাকে। কেরিব, এস্কুইমো, ওয়ালস্ এবং

এলিউবিয়ন ও কানারী দ্বীপবাসীদের এবং কানিয়া ও সেপায়েজিয়ান কসাকদের মধ্যে বহু ভর্ত্তৃকতা প্রথা প্রচলিত আছে।

আমেরিকার আভাক্স ও সেপেউয় জাতীয় রমণীগণ বহু ভর্ত্তার পত্নী হইয়া থাকে।

বাহুপত্ম্য।

এক স্বামী বহু স্ত্রী বিবাহ করিলে তাহাকে বাহুপত্ম্য বলে।

আমাদের দেশে এক ব্যক্তির বহু পত্নী গ্রহণ করার প্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ঋগ্‌বেদের সূক্তকার দীর্ঘতমা ঋষির পুত্র কক্ষীবান বড় রূপবান পুরুষ ছিলেন বলিয়া কোন রাজা তাঁহাকে আপন বাড়ী লইয়া গিয়া দশটী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন।

সত্যযুগে ধনমিত্র নামক কোন ধনৈশ্চর্য্য সম্পন্ন বণিক বহু বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া অভিজ্ঞান শকুন্তলায় উল্লেখ আছে।

ত্রেতাযুগে রাজা দশরথের একাধিক পত্নী ছিলেন। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ বহু বিবাহ করিয়াছিলেন। বসুদেবেরও বহু স্ত্রী থাকার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পৌরাণিক ~~যুগে রাজারা~~ বহু বিবাহ করিতেন তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

কলিযুগে কুলীন ব্রাহ্মণদের বহু বিবাহ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করা একটা ব্যবসা ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শতাধিক বিবাহ করিয়াছিলেন।

মুসলমানদের মধ্যে কোন কোন নবাব যে কত বিবাহ করিয়া গিয়াছেন তাহার সংখ্যা হয় না এবং এখনও পর্য্যন্ত শিক্ষিত ও পদস্থ মুসলমানদের মধ্যে একাধিক পত্নী গ্রহণ করার স্পৃহা হ্রাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

শুনিতে পাওয়া যায় আফ্রিকার লোয়াঙ্গো প্রদেশের রাজার সপ্ত সহস্র ভার্য্যা আছে।

দাম্পত্য।

এক পুরুষ এক স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া থাকিলে তাহাকে দাম্পত্য বিবাহ বলা যায়।

হিন্দুশাস্ত্রে নানাপ্রকার বিবাহের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং মহাভারতের যুগে ও তৎপূর্ব্বে বিবাহিতা ও অবিবাহিতা কন্যার গর্ভে ক্ষেত্রজ, কানীন, সহোঢ় প্রভৃতি যে নানাপ্রকার পুত্র উৎপন্ন হইত, তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিলে সেই অতি প্রাচীনকালে বিবাহ অত্যন্ত বিড়ম্বনার বিষয় ছিল বলিয়াই মনে হয়।

স্বামী আপন স্ত্রীর গর্ভে অন্যের দ্বারা পুত্র উৎপাদন করাইয়া লইত। স্বামী পুত্র উৎপাদন করিতে অসমর্থ হইলে অথবা পুত্র উৎপাদন করিবার পূর্ব্বেই স্বামীর মৃত্যু হইলে নিয়োগ বিধানে দেবর বা সপিণ্ড ব্যক্তির দ্বারা পুত্র উৎপন্ন করাইয়া লওয়া হইত। স্ত্রীর গর্ভে অন্যের দ্বারা যে পুত্র উৎপন্ন হইত তাহাকে ক্ষেত্রজ পুত্র বলিত।

কুরুরাজ পাণ্ডুর দুই স্ত্রী কুন্তী ও মাদ্রী। পাণ্ডুর আদেশ বা অভিপ্রায় অনুসারে এই দুই স্ত্রীর গর্ভে দেবর বা সপিণ্ড নয়, অন্যের ঔরসে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডবের জন্ম হইয়াছিল; তাঁহারা সকলেই ক্ষেত্রজ পুত্র হইলেও পাণ্ডুপুত্র, এজন্য পাণ্ডব নামে অভিহিত।

কুমারী অবস্থায় কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম হইয়াছিল। এবং সত্যবতীর গর্ভে পরাশরের ঔরসে বেদব্যাসের জন্ম হইয়াছিল; কর্ণ ও বেদব্যাস উভয়েই কানীন পুত্র।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন অপেক্ষা এখনকার লোকের রুচি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; এখন সমাজে ক্ষেত্রজ বা কানীন পুত্রের স্থান নাই কিন্তু সেই সেকালে পঞ্চ পাণ্ডব ক্ষেত্রজ এবং কর্ণ ও বেদব্যাস কানীন পুত্র হইলেও আদর সেখানে তাঁহারা পরম পূজনীয় হইয়া সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া গিয়াছেন।

কানীন পুত্রের ন্যায় মনু সংহিতায় সহোঢ় নামে

আর এক প্রকার পুত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কন্যা গর্ভবতী হইয়াছে ইহা জানিয়া হউক বা না জানিয়া হউক যে কেহ কন্যার পাণিগ্রহণ করিত, গর্ভস্থ সন্তানে তাহারই অধিকার জন্মিত এবং সেই সন্তান সহোঢ় নামে খ্যাত হইত।

কানীন ও সহোঢ় পুত্র হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, কুমারী অবস্থায় কন্যা অসচ্চরিত্রা হইলে তাহারও বিবাহ হইত; কন্যার চরিত্র ভাল কি মন্দ বিবাহকালে কোন বিচার হইত না, এবং অসচ্চরিত্রা কন্যাকে কেহ বিবাহ করিতে আপত্তি করিত না।

ক্ষেত্রজ, কানীন ও সহোঢ় এই তিন শ্রেণীর পুত্রই ব্যভিচার দোষের চূড়ান্ত ফল বলিয়া মনে হয়; কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ব্যভিচার দোষ দোষের মধ্যেই গণ্য হইত না; তখন স্ত্রীলোকেরা স্বেচ্ছাচারিণী হইলে তাহাতে স্বামী বা তাহার আত্মীয় স্বজন কেহই কোন আপত্তি করিত না; তাহারা কুমারী অবস্থা হইতে স্বেচ্ছাচারিণী হইত এবং ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে স্বচ্ছন্দে পরপুরুষ গমন করিত এবং তাহাদের এই স্বচ্ছন্দ বিহার অধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত না।

পাণ্ডু কুন্তীকে বলিতেছেন—

ঋতাবৃতৌ রাজপুত্রি স্ত্রিয়া ভর্ত্তা পতিব্রতে।
নাতিবর্ত্তব্য ইত্যেবং ধর্ম্মং ধর্ম্মবিদো বিদুঃ ॥
শেষেষন্যেষু কালেষু স্বাতন্ত্র্যং স্ত্রী কলার্হতি।
ধর্ম্মমেবং জনাঃ সন্তঃ পুরাণং পরিচক্ষতে ॥

১।১২২।২৫-২৬

—হে পতিব্রতে রাজপুত্রি! ঋতুকালে স্ত্রী স্বামীকে অতিক্রম করিবে না ধার্ম্মিকেরা ইহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া জানেন; অবশিষ্ট সময়ে স্ত্রী স্বেচ্ছাচারিণী হইতে পারে সাধুজনেরা এই প্রাচীন ধর্ম্মের কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

মহাভারতপাঠে আরও জানা যায়, বহুকাল হইতে এই অতি ঘৃণিত ও কদর্য্য প্রথা চলিয়া আসিতেছিল। একদিন মহর্ষি উদ্দালক, তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতু ও তাঁহার স্ত্রী একত্র বসিয়া ছিলেন, এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া শ্বেতকেতুর মাতার হাত ধরিয়া তাঁহাকে একান্তে লইয়া যাওয়ায় শ্বেতকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া নিয়ম করেন যে, স্বামী ভিন্ন যে নারী অন্য পুরুষ গমন করিবে বা যে পুরুষ পরস্ত্রীর প্রতি আক্রমণ করিবে তাহারা উভয়েই ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইবে।

মহাভারতের এই সকল কথা হইতে মনে হয়, পুরাকালে হিন্দুদের যে বিবাহ পদ্ধতি ছিল তাহা বিড়ম্বনার নামান্তর ভিন্ন আর কিছুই নয়। কোন্ সময় যে ইহার সংস্কার-সাধন হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

মনু সংহিতায় ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে।

(১) বরকে গৃহে আনিয়া বস্ত্র অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া কন্যাসম্প্রদান করার নাম ব্রাহ্ম বিবাহ।

(২) যজ্ঞারম্ভ করিবার কালে পুরোহিতকে সালঙ্কৃতা কন্যা দান করার নাম দৈব বিবাহ।

(৩) বরের নিকট ধর্ম্মার্থ একটী গাভী ও বৃষ লইয়া তাহাকে যে কন্যাদান করা হইত তাহার নাম আর্ষ বিবাহ।

(৪) গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আচরণ করিবার জন্য বরকে অর্চ্চনা করিয়া তাহাকে যে কন্যা সম্প্রদান করা হইত তাহার নাম প্রাজাপত্য বিবাহ।

(৫) কন্যা এবং কন্যাকর্ত্তাকে অর্থ দিয়া বশীভূত করিয়া বর যে কন্যাকে বিবাহ করে তাহার নাম আসুর বিবাহ।

(৬) বর এবং কন্যা উভয়ের মধ্যে অনুরাগ হওয়ার জন্য যে বিবাহ হয়, তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে।

(৭) কন্যাকে বল পূর্ব্বক হরণ করিয়া বিবাহ করার নাম রাক্ষস বিবাহ।

(৮) নিদ্রাভিভূতা, মদ্যপানে জ্ঞানশূন্যা, অথবা

অনবধানযুতা স্ত্রীতে উপরত হওয়ার নাম পৈশাচ বিবাহ।

স্ত্রী এবং পুরুষ যত প্রকার বৈধ এবং অবৈধ উপায়ে সম্মিলিত হইতে পারে, মনু তাহার কোনটী বাদ না দিয়া সকল গুলিরই বিবাহ আখ্যা দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ ভাবে যাহারা সম্মিলিত হইয়া থাকে তাহাদের সে সম্মিলনকে বিবাহ আখ্যা দিলে বিবাহের নামে কলঙ্ক দেওয়া হয়; এবং আজকালের দিনে মনুর দোহাই দিয়া কেহ এই প্রকার কোন বিবাহ করিলে সমাজে তাহাকে ঘৃণিত হইতে হয় এবং রাজদ্বারেও দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়।

মনু সংহিতায় আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ থাকিলেও প্রথম চারি প্রকার বিবাহ উৎকৃষ্ট এবং শেষ চারি প্রকার বিবাহ নিকৃষ্ট শ্রেণীর বিবাহ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

মনু যে আসুর বিবাহকে অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর বিবাহ বলিয়া হেয় জ্ঞান করিয়া গিয়াছেন, সভ্য এবং শিক্ষিত লোকের মধ্যে আজ কাল সেই আসুর বিবাহ প্রচলিত। পূর্ব্বে পাত্রীপক্ষ হইতে পাত্র পক্ষের নিকট টাকা আদায় করা হইত, এক্ষণে পাত্রপক্ষ হইতে পাত্রী পক্ষের নিকট টাকা আদায় করা হইতেছে। পূর্ব্বে মেয়ে বিক্রয় করা হইত এক্ষণে ছেলে বিক্রয় করা হইতেছে। যে ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের যত উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াছে, বিবাহের বাজারে তাহার দর তত বেশী। কন্যার বিবাহ কাল উপস্থিত হইলে লোক চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছে এবং কন্যার বিবাহ দেওয়া বিষম বিড়ম্বনা হইয়াছে।

মনু সংহিতায় যে আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে এক্ষণে একমাত্র ব্রাহ্ম বিবাহই প্রচলিত আছে। এই ব্রাহ্ম বিবাহ ধর্ম্মমূলক, এজন্য হিন্দুরা স্ত্রীকে ধর্ম্ম পত্নী বা সহধর্ম্মিনী বলিয়া থাকেন।

শাস্ত্রমুখে শুনিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মা আপন শরীরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধাঙ্গ হইতে স্ত্রী এবং অপর অর্দ্ধাঙ্গ হইতে পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এজন্য স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গিনীও বলা হয়। স্ত্রী পুরুষ একত্র মিলিত হইলে তজ্জন্য তাহারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্ম বিবাহে স্বামী ও স্ত্রীর পক্ষে মূলমন্ত্র হইতেছে

যদেতদ্ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥

—আজ হইতে তোমার হৃদয় আমার হউক, আর আমার যে এই হৃদয় ইহা তোমার হউক।

বিবাহের সময় অগ্নি এবং দেবতা সাক্ষী করিয়া স্বামী প্রতিজ্ঞা করেন স্ত্রীকে কখনও পরিত্যাগ করিবেন না; স্ত্রী প্রতিজ্ঞা করেন তিনি পতিব্রতা সতী হইয়া থাকিবেন এবং ধর্ম্মে কর্ম্মে সকল বিষয়ে স্বামীর অনুগামিনী হইবেন।

অন্য জাতির বিবাহ যেন চুক্তিমূলক বলিয়া মনে হয়, আর হিন্দু বিবাহ স্বামী স্ত্রীর চিরজীবনের অবিচ্ছেদ্য দৃঢ় ও অতি পবিত্র বন্ধন।

কোন্ যুগে কোন্ মহাপুরুষ এই ব্রাহ্ম বিবাহবিধি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন বলা যায় না, কিন্তু সে কালে বা একালে এই সকল অতি পবিত্র বিধি ব্যবস্থার প্রতি সম্মান দেখাইতে পারিয়াছেন তেমন লোকের সংখ্যাও বড় বেশী হইবে বলিয়া মনে হয় না।

বিবাহকালে স্ত্রী পুরুষ একত্র মিলিত হইয়া থাকিবে বলিয়া যে মন্ত্র উচ্চারণ হইয়া থাকে, সেই মন্ত্রশক্তির বলে যদি তাহাদের দুইটি হৃদয় এক হইত, তাহা হইলে কোন ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাহা হয় না। এজন্য ব্রাহ্ম বিবাহের নিয়ম পদ্ধতি যে সময় বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, সেই অতি প্রাচীন কাল হইতে লোকে তাহা ভঙ্গ করিয়া আসিতেছে।

স্বামী বিবাহের সময় স্ত্রীর হাত ধরিয়া বলিলেন, আজ হইতে আমার এই হৃদয় তোমার হইল"; তিনি আরও প্রতিজ্ঞা করিলেন সেই অবলা বালাকে কখনও পরিত্যাগ করিবেন না। কিন্তু তার পর যদি তিনি পুনরায় বিবাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সে হৃদয় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, স্ত্রীর প্রতি তাঁহার শঠতার পরিচয় দেওয়া হয়, এবং দেবতা সাক্ষী করিয়া স্ত্রীকে সকল

সময় সকল বিষয়ে রক্ষা করিবেন বলিয়া তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সে প্রতিজ্ঞাভঙ্গজনিত পাপেও তাঁহাকে লিপ্ত হইতে হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি চারি যুগ ধরিয়া বহু বিবাহ করিবার নিয়ম চলিয়া আসিতেছে, :এবং স্ত্রীলোকরাও স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতেছে।

সেকালে স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বেচ্ছাচারিণী হওয়া বিশেষ অধর্ম্মের কর্ম্ম বলিয়া লোকে মনে করিত না এবং স্বেচ্ছাচারিণী হইলেও তাহার পাতিব্রত্যধর্ম্ম নষ্ট হইত না; তাহা হইলে অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা এবং মন্দোদরী কখনও প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া থাকিতেন না। কিন্তু যাহার সতীত্ব নষ্ট হইয়াছে তাহাকে কি করিয়া পতিব্রতা বলা যাইতে পারে এবং সে প্রকার অসতী স্ত্রী কি করিয়া মনে প্রাণে স্বামীর অনুগামিনী হইতে পারে, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধারণা হয় না।

ব্রাহ্ম বিবাহ অন্য সকল বিবাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও,যে সকল মহাপুরুষ কর্ত্তৃক এ বিবাহের নিয়মপদ্ধতি বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহাদের কর্ত্তৃকই ইহা ভঙ্গ হইয়াছে এবং এখনও ভঙ্গ হইতেছে। হিন্দুর ইহা চিরজীবনের অবিচ্ছেদ্য দৃঢ় বন্ধন হইলেও, সাধারণে ইহা পালন করে নাই।

দাম্পত্য সুখের আশায় লোকে বিবাহ করিয়া থাকে, কিন্তু সে সুখ ভোগ করা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এই জন্য লোকে বহু বিবাহ করিয়া থাকে, এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া সস্ত্রীক বাস করার পর স্ত্রীবিয়োগ হইলে আবার বিবাহ করার জন্য লোক ব্যস্ত হইয়া থাকে।

অভাব উদ্ভাবনের প্রসূতি। কোন বিষয়ে আমাদের কোন অভাব থাকিলে সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য স্বভাবতই আমাদের মনে প্রগাঢ় ইচ্ছা জন্মে এবং সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য চেষ্টা হয়। লোকে যে বহু বিবাহ করিয়া থাকে, বা এক স্ত্রীর মৃত্যু হইলে আবার বিবাহ করিয়া থাকে, তাহার কারণ প্রথম স্ত্রী হইতে তাহার দাম্পত্য প্রেমের অভাব পূরণ হয় নাই, সে তাহার প্রথম স্ত্রীকে তেমন ভালবাসে নাই, বা সে স্ত্রীর নিকট তেমন ভালবাসা পায় নাই। যদি তাহাকে তেমন প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত, বা তাহার নিকট তেমন প্রাণঢালা ভালবাসা পাইত, তাহা হইলে তাহার আসনে কখনই অন্য স্ত্রীকে বসাইতে পারিত না; এবং পূর্ব্ব স্ত্রীর বসন ভূষণে এই নূতন স্ত্রীকে সাজাইয়া কখনই আনন্দ বোধ করিত না।

দাম্পত্য প্রেম স্বর্গীয় পদার্থ বলিয়াই মনে হয়। স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসিতে পারিলে, তাহারা পরস্পরের জন্য পরস্পরে আত্মবিসর্জ্জন করিতে সমর্থ হইলে এই অপার্থিব প্রেমপদার্থ লাভ করা যায়। দাম্পত্য প্রেম জন্মিলে দুই জনে এক প্রাণ হইয়া যায় এবং সে অবস্থায় স্বামীর পক্ষে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করা বা স্ত্রীর পক্ষে অন্য ভর্ত্তা বরণ করা একেবারে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। এই অমরবাঞ্ছিত প্রেম লাভ করিবার জন্য লোকে লালায়িত হইয়া আছে, এবং সকলের ভাগ্যে তাহা মিলে না বলিয়াই সংসারে নানাপ্রকার বিবাহ পদ্ধতির উৎপত্তি হইয়াছে।

আমাদের মধ্যে এক্ষণে যে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে, তাহাতে সুখ আছে, দুঃখও আছে। কিন্তু সুখ অপেক্ষা দুঃখের ভাগ যে কত বেশী তাহা বলিয়া শেষ হয় না; এবং বিবাহ করিয়া যে কত রকম অত্যাচার সহ্য করিতে হয় তাহারও ইয়ত্তা নাই।

বিবাহিত জীবনের সুখ দুঃখের সহিত অবিবাহিত জীবনের সুখ দুঃখের তুলনা হয় না। অবিবাহিত ব্যক্তি স্ত্রী পুত্রের অভাব কল্পনা করিয়া লইয়া, সেই কল্পিত অভাবের জন্য মনে মনে কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে; আর বিবাহিত পুরুষ আজীবন ধরিয়া প্রকৃত অভাবের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়া জর্জ্জরিত হয়। অবিবাহিত পুরুষ ভাবে তাহার স্ত্রী নাই, সন্তান সন্ততি নাই—এই অভাবজনিত তাহার যে কষ্ট তাহা অসহনীয় নয়; কিন্তু যাহার স্ত্রী বা সন্তান সন্ততি থাকিয়াও নাই, যাহার স্নেহের ধন, আদরের

যত্ন বা ভালবাসার সামগ্রী যমদূত আসিয়া বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লয়, তখন তাহার যে কি কষ্ট তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কাহারও বুঝিবার ক্ষমতা হইবে না; যমের এই নির্ম্মম আঘাত বিবাহিত ব্যক্তি মাত্রকেই এক দিন না একদিন সহ্য করিতে হয়; এবং সে আঘাতে তাহার হৃদয় এককালে ভাঙ্গিয়া যায় ও সমস্ত জীবন ধরিয়া তাহাকে হা হুতাশ করিয়া দিন কাটাইতে হয়।

ভালবাসায় সুখ আছে, কষ্টও আছে। আবার ভালবাসার একটা দারুণ অত্যাচারও আছে। অন্য সকল কষ্ট, সকল অত্যাচার সহ্য করা যায়, কিন্তু মানুষ ভালবাসিয়া যে কষ্ট পায়, তাহা তুষের আগুনের মত হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত নিঃশব্দে পরতে পরতে দগ্ধ করিতে থাকে।

এ সংসারে স্ত্রীপুত্রকে ভাল না বাসে কে? স্ত্রী পুত্র লইয়াই সংসার এবং সংসারের সমস্ত লোক স্ত্রী পুত্রের অভাব মোচন করিতে ব্যস্ত; তাহাদের নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি নাই, স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েগুলি কিসে ভাল থাকিবে, কি করিয়া তাহাদের সুখে রাখিতে পারিবে এই তাহাদের চিন্তা। কিন্তু এ সংসারে অধিকাংশ লোকই দেখিতে পাই অস্বচ্ছলতা প্রযুক্ত স্ত্রী পুত্রের অভাব মোচন করিতে পারে না, অর্থাভাব প্রযুক্ত ছেলেদের লেখাপড়া শিক্ষা দিতে পারে না, উপযুক্ত পাত্রে মেয়ের বিবাহ দেওয়া সাধ্যায়ত্ত হয় না, ব্যারাম হইলে তাহাদের চিকিৎসা করিবার ক্ষমতা হয় না; ক্ষুধার সময় তাহাদের আহার দিতে পারে না, লজ্জা নিবারণের জন্য কাপড় যোগাড় হয় না; অনাহারে এবং অচিকিৎসায় যখন দেখিতে পাই তাহারা জীর্ণ শীর্ণ হইয়া ইহলোক হইতে বিদায় হইতেছে, তখন ভালবাসার সুখ ও দুঃখ এবং ভালবাসার অত্যাচার হৃদয়ঙ্গম হয়।

যাহার স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, কন্যা নাই তাহার এই সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভোগ বা এই সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই জন্য বিবাহিত ব্যক্তির জীবন অপেক্ষা অবিবাহিত ব্যক্তির জীবন বড় সুখের এবং বড় আরামের বলিয়া মনে হয়।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বিবাহ না করিলে মানুষ কখনও তাহার চরিত্র বজায় রাখিয়া চলিতে পারে না। কিন্তু বিবাহিত পুরুষদের মধ্যেও তো বিস্তর কলুষিত চরিত্রের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। বিবাহ করিলে চরিত্র বজায় থাকিবে, আর বিবাহ না করিলে চরিত্র নষ্ট হইয়া যাইবে এ কথায় বিশেষ কিছু মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। চরিত্র ভাল রাখা বা নষ্ট করা ব্যক্তিমাত্রেরই নিজের হাতে; ইচ্ছা করিলে তিনি ভাল থাকিতে পারেন বা নষ্ট হইতে পারেন।

স্ত্রী পুত্র যে ধর্ম্মপথের প্রধান অন্তরায়, জনসাধারণের মতি গতি দেখিলে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। অধিকাংশ লোকেই স্ত্রী পুত্র লইয়া তাহাদের চিন্তায় এতই ব্যতিব্যস্ত যে ধর্ম্মচিন্তা করিবার তাহাদের অবকাশ হয় না, এবং ধর্ম্মার্থ তাহারা যে কিছু দান করিবে সে প্রবৃত্তিও তাহাদের মনে স্থান পায় না। ধর্ম্মার্থ কোন কায করিবার জন্য তাহারা এক পা অগ্রসর হইলে, স্ত্রী পুত্রের কথা মনে হইয়া দশ পা পিছাইয়া আসে। এ সংসারে যাঁহারা ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, স্ত্রীর সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না। Lord Bacon (বেকন) বলিয়া গিয়াছেন—

He that bath a wife and children has given hostages to fortune, for they are impediments to great enterprises, either of virtue or mischief.

বিবাহিত ব্যক্তিকে তাহার স্ত্রী পুত্রগণের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য যেন তাহাদের নিকট জামিনে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়; তাহাদের জন্য ভাল কায মন্দ কায কোন কাযই করিবার তাহার ক্ষমতা থাকে না।

বাস্তবিক এ সংসারে যত কিছু বড় কায বা ভাল কায, তাহা যাঁহারা বিবাহ করেন নাই, বা যাঁহাদের

সন্তানসন্ততি হয় নাই তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন। এই যে সেদিন স্বর্গীয় ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ সাধারণে হিতের জন্ত শিক্ষা কল্পে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়া গেলেন, শুনিয়াছি তাঁহার স্ত্রী নাই, সন্তানসন্ততিও নাই।

বিবাহ করিলে মানুষের কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকে না; আর অবিবাহিত ব্যক্তি মুক্ত পুরুষ—পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে টানিয়া রাখিবার কেহই থাকে না; তাঁহার অবস্থা যেমনই কেন হউক না, মঙ্গল ইচ্ছা থাকিলে তাঁহার দ্বারা যে কায হইবে, বিবাহিত ব্যক্তি তাহার এক কণাও করিতে পারিবে না।

বিবাহিত পুরুষ ক্ষুদ্র সীমাবিশিষ্ট স্থানের মধ্যে তাহার স্ত্রী পরিবার লইয়া বিচরণ করিয়া থাকে; আর অবিবাহিত পুরুষ ইচ্ছা করিলে এই সমস্ত সংসার তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র করিয়া লইতে পারে। সাধারণের হিতকল্পে জীবন উৎসর্গ করিতে পারিলে ইহজীবনে আত্মপ্রসাদ ও পরজীবনে অক্ষয় স্বর্গ সুখ সম্ভোগ হইয়া থাকে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

সেকালের পল্লীচিত্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূজা পার্ব্বণ

তখন গ্রামে ৮।১০ ঘরে দুর্গাপূজা, ৩০।৩৫ ঘরে কালী পূজা, বাজারে কোজাগর লক্ষ্মীপূজা, দুই বাড়ীতে দোল ও ২।৩ স্থানে চড়কপূজা হইত। প্রাচীনারা ব্রত হিসাবে জগদ্ধাত্রী পূজা ও অন্নপূর্ণা পূজা করিতেন। শ্রীপঞ্চমীর সময়ে সকল ভদ্র গৃহেই সরস্বতী পূজা হইত, কিন্তু প্রতিমা হইত না। তখন যাঁহাদের বাড়ী পূজার উৎসব হইত, পূর্ব্বপুরুষ হইতে তাঁহাদের বাড়ীতে তাহার সুবন্দোবস্ত ছিল। গোলায় ধান ছিল, তাহাতে সিদ্ধ ও আতপ চাউল, খই, চিঁড়া, প্রভৃতি তৈয়ার হইত। ঘরে গুড় ও নারিকেল থাকিত, তাহাতে মুড়কি ও নারিকেল নাড়ু তৈয়ার হইত। কুমার প্রতিমা নির্ম্মাণ করিত ও প্রয়োজনীয় মাটীর বাসন যোগাইত, মালী প্রতিমা চিত্র করিত ও সাজাইত। পুরোহিত পূজার কার্য্য করিতেন। কামার বলিদান করিত, প্রজা বলিদানের ছাগ, দুগ্ধ, দধি, ছানা, ক্ষীর, ঘৃত, নবনীত, তরি তরকারী, শাক সবজী যোগাইত, ঢোল বাজাইত, গঙ্গাজল আনিয়া দিত, গ্রামের ব্রাহ্মণদিগের ঘরে নৈবেদ্য বিতরণ করিয়া আসিত, মাছ দিত, আবার বেগার দিত। ঐ সকলের জন্ত তাহাদিগকে জমি দেওয়া ছিল। তাহাদিগকে নগদ কিছুই দিতে হইত না বা ডাকিতে হইত না। যথাসময়ে সমস্ত দ্রব্য ও লোক জন আপনাআপনি আসিয়া উপস্থিত হইত। পূজার সময়ে সকলেই ভদ্রাভদ্র লোকজনকে যত্নপূর্ব্বক যথাসাধ্য খাওয়াইতেন। নূতন কাপড় পরাইয়া গরীব লোকেরা পুত্রকন্তাদিগকে লইয়া প্রতিমা দর্শন করিতে আসিত; গৃহস্থ তাহাদের সকলকেই প্রচুর পরিমাণে খই মুড়কি চিড়া নারিকেল সন্দেশ কিছু মিষ্টান্ন জল খাবারস্বরূপ দিতেন; নিতান্ত দুঃখী দেখিলে নূতন বস্ত্র দিতেন। প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন বিস্তর ভিখারী ও বৈষ্ণব বিদায় হইত। প্রচুর আনন্দের সহিত গ্রামের পূজোৎসব সম্পন্ন হইত। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে বার মাসে তের পার্ব্বণ প্রচলিত ছিল। পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধ, তর্পণ, নবান্ন, অন্নপ্রাশন, লক্ষ্মীপূজা প্রভৃতি তাহার মধ্যে প্রধান ছিল।

তৎকালে যুবতীদের দেহ পুষ্ট, সবল, দৃঢ় ও লাবণ্য-

শিশু ও বালক

শিশু ও বালকের আহার

বিশিষ্ট ছিল। তাঁহারা এক মুহূর্ত্তের জন্য শ্রমকাতরা বা আলস্যপরায়ণা ছিলেন না। তাহার ফলে তাঁহারা সুস্থ ও সবল সন্তান প্রসব করিতেন; প্রসবকালে তাঁহাদের কোন কষ্ট হইত না; সূতিকাগারেও তাঁহাদিগকে কোন প্রকার ভোগ-ভোগ করিতে হইত না। গৃহ সংসারে সর্ব্বদাই সুখশান্তি বিরাজ করিত। শিশু ও বালকেরা জুতা জামা মোজা ব্যবহার করিত না। শীতে দোলাই তাহাদের একমাত্র সম্বল ছিল। বালকেরা খালি পায়ে স্কুলে যাইত। শিশুদের কোন পীড়া ছিল না। তাহারা প্রায় ৪।৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মাতৃস্তন্য ও ৩।৪ সের খাঁটি গাভীদুগ্ধ প্রত্যহ পান করিত। আমার স্বর্গীয়া মাতৃদেবী ও অন্যান্য গুরুজনদিগের মুখে শুনিয়াছি যে আমি ৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মাতৃস্তন্য ও ৫ সের দুগ্ধ প্রত্যহ পান করিতাম। আমার শরীরও বেশ সুস্থ সবল ও দৃঢ় ছিল। তাহার অল্পদিন পূর্ব্ব হইতেই গ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয় ও তাহাতে বিস্তর লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ম্যালেরিয়া স্বত্বেও আমার আহার বড় একটা কমে নাই। খুব ছেলেবেলা আমার মনে পড়ে আমি ও আমার জ্যাঠতুতো ভাই লুকাইয়া গাভীর বাঁটে মুখ দিয়া দুগ্ধ পান করিয়াছি। ছেলে মেয়েরা একটু বড় হইলে প্রাতে বিছানা হইতে উঠিয়া ধামাতে চিড়া মুড়কী বা খই মুড়কী বা মুড়ি মুড়কী বা চিড়া গুড় ও নারিকেল সন্দেশ লইয়া আহার করিত। কেহ বা বাসি রুটী গুড় দিয়া খাইত। যাহারা স্কুলে যাইবে তাহারা "এড়াভাত" একটু আলুভাতে কি বড়ীভাতে, কি বড়ি বেগুনে ভাতে, তৎসঙ্গে ঘরের সুন্দর গাওয়া ঘি ও একটু বাসি তরকারী মাছ বা অম্ল দিয়া আহার করিয়া স্কুলে যাইত। বেলা দেড়টা বা দুইটায় স্কুলে জলখাবারের ছুটি হইলে অনেকে বাড়ীতে আসিয়া রীতিমত আহার করিত। স্কুলের পর ফল, দুগ্ধ ও মুড়ি ইত্যাদি খাইত। তাহার পরে খেলা করিতে বাহির হইত।

বালকের খেলা ও আমোদ

কোথাও কোনও গাছে খুব পেয়ারা জাম আম পাকিয়াছে, বালকেরা সেইখানে দল বাঁধিয়া ছুটিত এবং গাছে উঠিয়া বাদুড়ের মত ঝুলিয়া ফল পাড়িয়া খাইত ও কোচড়ে করিয়া লইয়া আসিত। কখনও বা গ্রীষ্মের প্রভাতবায়ু স্পর্শে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিতাম উষার তরুণ প্রসন্ন কিরণ আমাদের মুখে পড়িয়াছে। চারিদিকেই পাখীদের মধুর গান; আমরা সেই গান শুনিতে শুনিতে ফুল তুলিতে যাইতাম। বকুল, করবী, মল্লিকা, মালতী, বক, অপরাজিতা প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্প বাড়ীতে আনিয়া দিতাম। কখন কখনও বকুল ফুলের মালা গাঁথিয়া প্রিয়জনের গলায় পরাইয়া দিতাম।

কেহ কেহ বাড়ীর সম্মুখে ফাঁকা জায়গায় সমবয়স্ক সকলে মিলিয়া গুলি ডাণ্ডা, হেড়ে ডুডু ও সময়ে সময়ে ক্রিকেটও খেলিত। সকলে মিলিয়া ছুটাছুটি হুড়াহুড়িত তাহাদের সর্ব্বদাই চলিত।

আমার ১৬।১৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ঐ সব খেলা বাদ পড়ে নাই। এমন কি ২৪।২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গাছে উঠিয়া ফল পাড়ার ঝোঁক ছাড়িতে পারি নাই। নারিকেল, পেয়ারা, আম, জাম, জামরুল প্রভৃতি যে সব গাছ আমি নিজহাতে পুঁতিয়াছি, সেই সব গাছে উঠিয়া, ছেলে মেয়েদিগকে ফল পাড়িয়া দিতে আমার বড়ই আনন্দবোধ হইত। বুড়া হইয়াছি, তবু আমার সে ঝোঁকটা এখনও যায় নাই। আমি ১০।১১ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পড়িতে আসি। কলিকাতায় নড়িবার যো নাই; পিঞ্জরাবদ্ধের ন্যায় থাকিতে হইত। বাড়ী যাইবার জন্য মনটা বড়ই ছট্‌ফট করিত। ছুটি হইলেই বাড়ী যাইতাম। যতদিন বাড়ী থাকিতাম, সমস্তদিন খেলার আনন্দে মত্ত থাকিতাম। দল বাঁধিয়া আজ এ পুকুর কাল ও পুকুর করিয়া স্নান করিতে যাইতাম। আমরা যে পুকুরে গিয়া পড়িতাম, সে পুকুরের জল ঘোলা না করিয়া উঠিতাম না। আমি ও

আমার সঙ্গীগণ, সকলেই সন্তরণে খুব পটু ছিলাম। যখন দেখিতাম কোনও গুরুজন স্নান করিতে আসিতেছেন, তখনই ডুব সাঁতার দিয়া চোঁ করিয়া অপর পারে উঠিয়া বড়ই শান্ত ছেলেটীর মত, গা হাত মাজিতাম। এইজন্য তাঁহারা সকলে আমার নাম "পানকৌড়ী" রাখিয়াছিলেন। পুকুরের ধারে তালগাছ; বৈশাখমাস, তাল কাটিতেছে; পঙ্গপালের মত সকলে পড়িয়া তালশাঁসগুলা খাইতে বসিতাম। যে তাল কাটিত সে আমাদের প্রজা, সে কিছু বলিত না, বরং খুসী হইয়া কচি কচি তালশাঁস আমাদিগকে কাটিয়া খাওয়াইত। আমাদের ঘন ঘন উপদ্রবে, সময়ে সময়ে সে বিরক্তও হইত। আহারের পরে, সেই দারুণ রৌদ্রে সকলে মিলিয়া প্রত্যেকে এক এক খানা ছুরি ও দেশলাইয়ের কৌটায় (তখন পাড়াগাঁয়ে নূতন উঠিয়াছে) লুণ লইয়া আম বাগানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাঁচা আম পাড়িয়া খাইতাম। আম পাকিলে ত তিলার্দ্ধও আমাদের অবসর ছিল না। স্নানাহারের জন্য কেবল বাড়ী আসিতাম।

জ্যৈষ্ঠ মাস, দারুণ রৌদ্র; বায়ু উত্তপ্ত বালুকা ও ধূলিকণা লইয়া চারিদিকে খেলা করিতেছে। বনভূমির তৃণশোভা নাই। সমস্তই দগ্ধ হইতেছে; জলাশয় সকল শুষ্কপ্রায়, শুষ্ক পত্র সকল বায়ু প্রভাবে চারিদিকে উড়িয়া যাইতেছে। স্খলিতপত্র বৃক্ষোপরি বসিয়া পক্ষিগণ শ্বাসত্যাগ করিতেছে। জলাশয়ে প্রস্ফুটিত কমলদলের মনোহর দৃশ্য ও গন্ধ চারিদিক আমোদিত করিয়াছে। গ্রাম তখন মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য্যকিরণে শান্ত ও সুষুপ্ত। কেবল মাঝে মাঝে কুকুরের রব, ছায়াশ্রিতা দুই একটি গাভীর হাম্বা রব, শালিকের ও ঘুঘুর ডাক, অশ্বত্থের মর্ম্মরশব্দ ও বৃক্ষচ্ছায়া-লুক্কায়িত ছোট ছোট পাখীর মধুর গান এবং আকাশে থাকিয়া থাকিয়া চিলের ডাক শুনা যাইত। কিন্তু আমরা সর্ব্বদাই ব্যস্ত; বনে কোথায় নোনা পাকিয়াছে, কোথায় বনফুল ফুটিয়াছে, কোন বাগানে আম পাকিয়াছে তাহারই অন্বেষণে ছুরি হাতে করিয়া এই দারুণ মধ্যাহ্নেও ঘুরিয়া বেড়াইতাম। ছাতি লওয়া অভ্যাস ছিল না। যখন রৌদ্রতাপে বড়ই কষ্ট হইত বোধ হইত, তখন আমরা পুকুরে নামিতাম। তথায় জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নাই। পুকুরের যেখান হইতে জল সরিয়া পড়িয়াছে, সেখানে কচি কচি ঘাস জন্মিয়াছে, শৈবাল ও জলীয় লতা পড়িয়া আছে; দুই একটা দলচরা ঘোড়া বা দুই একটা গরু চরিতেছে। মাঝে মাঝে দুই একটা দাঁড়কাক পাখা ঝট্ পট্ করিয়া স্নান করিয়া যাইত, মাঝে মাঝে তীরের গাছ হইতে মাছরাঙা পাখী ঝপ্ করিয়া জলে পড়িয়া মাছ ধরিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিত। আমরা উত্তপ্ত জলে নামিয়া, গা, হাত, পা, ধুইয়া মাথায় জল দিয়া পদ্মপত্র তুলিয়া মাথায় দিয়া আমবাগানের দিকে চলিতাম। তথায় কেহ বা গাছে উঠিয়া বৃক্ষ সংলগ্ন লতা নাড়িয়া আম পাড়িত, কেহ বা তলায় কুড়াইত, কেহ বা চাখিয়া দেখিত, কেহ বা ছাড়াইয়া খাইত ও সকলের জন্য ছাড়াইয়া রাখিত। কেহ বা বাগানের স্নিগ্ধছায়ায় আরামে ভূমিতলে নিদ্রা যাইত। দেখিতাম ছায়া যেন সেখানে আলোকের সহিত লতার ন্যায় জড়াইয়া আছে। মাথার উপরে গাছের ছায়ার ভিতরে বসিয়া কোকিল, পাপিয়া ও "বউকথাকও" পাখী ডাকিয়া ডাকিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিত। দক্ষিণ বাতাস ঝুর ঝুর করিয়া বহিয়া আমাদের শ্রান্তিদূর ও চিত্তবিনোদন করিত। আমগাছে তলায় কত বঁইচ ফলের ও অন্যান্য নানা প্রকারে কণ্টকময় গাছ, কতপ্রকার আগাছা, গাছে কত লতা জড়াইয়া আছে। এইরূপে সমস্ত মধ্যাহ্নকালটা বাগানে বাগানে কতই না আনন্দে কাটিয়া যাইত। রাখালেরা গরু চরাইয়া গরু লইয়া বাড়ী ফিরিত, আমরা তখন গায়ের ধুলা কাদা ঝাড়িয়া পুলকিত মনে বাড়ী ফিরিতাম। তখন প্রায় প্রত্যহ বৈকালে ঝড়বৃষ্টি হইত—তাহাকে "কাল বৈশাখী" বলে; উহা বৈশাখ হইতে আরম্ভ হইয়া জ্যৈষ্ঠ

মাস পর্য্যন্ত চলিত। সে ঝড়ের সময়ে আমরা আমতলায় ঘুরিতাম ও রাশি রাশি আম কুড়াইয়া আনিতাম; মা, ঐ সকল আমের উপর ও নীচে আম পাতা ও সোদাল পাতা দিয়া জাগাইয়া রাখিতেন। একদিন আমরা একটি গাছে উঠিতে পারি নাই। গাছটা পুরাতন, গুঁড়ি বড় মোটা ও লম্বা, কোন ডাল ধরিয়াও উঠিবার যো ছিল না। সে গাছটার আম বড় ভাল; একটা ডালে কতকগুলা আম পাকিয়া ঝুলিতেছে; আমাদের সকলের তাহা দেখিয়া বড়ই আনন্দ ও লোভ হইয়াছিল। গোটা কতক আম পাড়িতেই হইবে; আমাদের জেদ হইল। পার্শ্ববর্ত্তী আগাছা ভাঙ্গিয়া কত "এড়ো" মারিলাম। তবু আম পাড়িতে পারিলাম না। সেই সময়ে বাগানের পার্শ্বের, রাস্তা দিয়া একটী বৃদ্ধ (তিনি আমার জ্ঞাতি ঠাকুরদাদা হইতেন) প্রাতঃকালের তাগাদা কার্য্য শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। তিনি আমাদিগকে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর ও অকৃতকার্য্য দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া ছাতিটি রাস্তায় রাখিয়া আমাদের কাছে আসিয়া বলিলেন, "তোরা কোন কাজের নয়। এতক্ষণ ধরে এত কষ্ট করেও একটা আম পড়তে পাল্লিনে ?" আমাকে বলিলেন,—"হ্যাঁরে গাধা, তোর বাবা তোর বয়সে ইট মেরে গাছ থেকে ডাব নারিকেল পেড়েছে; তুই এতগুলো এড়ো মেরে একটা আমও পাড়তে পাল্লি নে।" আমরা ত ইট মারিয়া ডাব পাড়ার কথা শুনিয়াই সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "একটু গাঁজা টেনে এসেছেন নাকি ? আর কথায় কাজ নেই, নিজের মুরদ দেখা যাক্।" এই কথা শেষ হইতে না হইতেই কাছের আগাছা হইতে একটা এড়ো ভাঙ্গিয়া যেমন ছুড়িয়াছেন, অমনি তাহার আঘাত লাগিয়া ছড় ছড় করিয়া ১০।১৫টা ডাসা ও পাকা আম পড়িল। আমরা আহ্লাদে নৃত্য করিতে করিতে আমগুলা কুড়াইলাম, ও বুড়ো ঠাকুরদাদার ক্ষমতা দেখিয়া অবাক হইলাম। তিনি যাইবার সময়ে আমাকে বলিয়া গেলেন, "তোরা ইট মেরে ডাব পাড়বার কথা শুনে হেসে উঠেছিল, আমাকে গাঁজাখোর মনে করেছিলি, চল তোর বাপের সঙ্গে মুকাবিলা করে দিই।" আমরা আমগুলা গাছতলায় সাবাড় করিয়া যখন বাড়ী গেলাম, তখন তিনি বৈঠকখানার বারাণ্ডায় বসিয়া ছিলেন। আমাদিগকে দেখিয়া আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ, এ ছোঁড়াগুলার দশা কি হবে! এই বয়সেই এরা অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছে; আমার যা ক্ষমতা আছে তা ওদের নেই। তা ওদেরই বা দোষ দেব কি ? বেচারীরা পনের দিন অন্তর জ্বর ভোগ করে; মাসের অর্দ্ধেক দিন খেতে পায় না; যা খায় তাও হজম কর্ত্তে পারে না! দেখছি ক্রমে ক্রমে দেশটা নির্ম্মনুষ্য হবে! তোমার ইট মেরে ডাব পাড়ার কথা ওরা আদৌ বিশ্বাস করে না; ওদের কাছে ওটা অসম্ভব।" উত্তরে পিতৃদেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওদের কথাও এর পরে কেউ বিশ্বাস করবে না, তখন তাও সকলের কাছে ত গাঁজাখুরি অসম্ভব বলে বোধ হবে।" তখন গুলতি ও চিল দিয়াও আম পাড়া হইত; তাহাও আশ্চর্য্য জনক। এইরূপে কত আম জাম লিচু জামরুল গোলাপজাম পেয়ারা ঘরে ও বাইরে আমাদের উদরসাৎ হইত বলা যায় না। পাকা কাঁঠাল একটি একজনে খাইত। কাঁঠালের রস দুধ ভাত দিয়া খাইতে উপাদেয়। প্রত্যহ আম কাঁঠালের রস আহারের সময় বাটী বাটী খাওয়া হইত। রাত্রিতে ছাদে বা ঘরের দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া শয়ন করিতাম। সুদূর বংশীধ্বনি ও বউকথাকও পাখীর সুমধুর রব আমাদিগকে ঘুম পাড়াইত। বর্ষাকালে যখন কলিকাতায় আসি নাই বা কলিকাতার স্কুল হইতে ছুটি পাইয়া বাড়ী যাইতাম, তখনও আনন্দ বড় কম হইত না।

আলুলায়িত-কুন্তলা বর্ষা নবীন মেঘের নীল বস্ত্র পরিয়া বিদ্যুতের হাসি হাসিয়া চারিদিকে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। বর্ষার জলধারা ক্রীড়াকালে স্বর্গরমণীগণের মুক্তাহার ছিন্ন হইয়াই যেন ভূতলে পড়িতেছে। আউস ধান ও পাটের ক্ষেত জলে ভরা।

ভূমি বৈদূর্য্যমণির মত তৃণাঙ্কুর সমাচ্ছন্ন ও বর্ষার জলে অভিষিক্ত। নীরদ-শীকর-শীতল বায়ু কদম্ব, সর্জ্জ, অর্জ্জুন, নীপ ও কেতকী বৃক্ষ সকলকে কম্পিত করিয়া তাহাদেরই সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত করিতেছে। এক্ষণে বনের নানা ভাব। বনে যেন সঙ্গীত লহরী ছুটিয়াছে। ভ্রমরের গুণ গুণ রব উহার মধুর বীণা, ভেকের ধ্বনি কণ্ঠতাল ও মেঘগর্জ্জনই মৃদঙ্গ। বর্ষার ধারা ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িতেছে; পাখী সকল নিজ নিজ কুলায়ে বা বৃক্ষশাখায় বসিয়া কাঁপিতেছে, গুরু গুরু করিয়া মেঘ ডাকিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে কুশ গাছও তালে তালে নাচিতেছে, নবীন ধান্য আনন্দে দুলিতেছে, ধেনুগণ বৎস লইয়া বাড়ীর দিকে ছুটিয়াছে বা হেথায় সেথায় আশ্রয় লইতেছে। এই সকল দেখিয়া কদম্বের ন্যায় আমাদেরও হৃদয় যেন ফুটিয়া উঠিত; আমরা ময়ূরের ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে ভিজিতে ভিজিতে এদিক ওদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম। কে কোথায় মাছ ধরিবার জন্য "ঘুনি" পাতিয়াছে দেখিতাম ও তাহা হইতে মাছ ঝাড়িয়া লইয়া আবার "ঘুনী" ঠিক তদবস্থাতেই রাখিয়া আসিতাম; কখনও বা নিজেরাই "ঘুনী" পাতিয়া আসিতাম। বাড়ীর পাশে ও সম্মুখে যে ছোট খাট শাক সবজী ও ফুলের বাগান ছিল তাহা নিড়ান, পরিষ্কার করা কিংবা নূতন গাছ পোঁতা ইত্যাদি কাজ করিতাম। কোথায় কোন পুকুরে কোথা হইতে জল চুকিতেছে ও মাছ উঠিতেছে তাহা দেখিয়া দেখিয়া বেড়াইয়া কত কই, মাগুর, চ্যাং, সোল মাছ ধরিয়া আনিতাম। বৃষ্টিকে বৃষ্টি বলিয়াই মনে করিতাম না, ম্যালেরিয়া জ্বরকেও ভয় করিতাম না।

শরৎকাল; আকাশ পাণ্ডুবর্ণ, চন্দ্রমণ্ডল নির্ম্মল; রজনী জ্যোৎস্নাধবল। পদ্মাননা শরৎ ঋতু কাশ পুষ্পের শুভ্র বসন পরিধান করিয়া হংসরবে নূপুরধ্বনি করিতে করিতে নবীনা বধূর ন্যায় উপস্থিত হইয়াছেন। জল স্বচ্ছ, কমলদল সূর্য্যকিরণ-স্পর্শে বিকসিত, নিরবচ্ছিন্ন ক্রৌঞ্চের রব, বায়ু মৃদুগতি, চতুর্দ্দিকে ভ্রমররব চতুর্দ্দিকে সপ্তপর্ণের সুগন্ধ বিস্তৃত হইতেছে। উপবন সকল সেফালিকা পুষ্পরাগে রঞ্জিত হইয়া মনোহর শোভা বিকীর্ণ করিতেছে; বিহঙ্গমগণ মনঃ-সুখে তথায় অবস্থান পূর্ব্বক শ্রুতি-সুখকর গান করিতেছে। মাঠে আলবাল মধ্যে লহরী-লীলাবৎ পরিপক্ক শস্যচূড়া সমুদয় মারুত হিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে। চন্দ্রমুখী রজনী জ্যোৎস্নাবস্ত্র পরিধান করিয়া উন্মীলিত তারকা-নেত্রে শুক্লবসন-শোভিতা রমণীর ন্যায় চারিদিকে শিশিরকণা বর্ষণ করিয়া সকলকে শীতল করিতেছে। বসুন্ধরা এখন নবীনা, মনোহারিণী ও চতুর্দ্দিকে হরিৎ পত্রে মণ্ডিতা। ক্ষেত্র সকল পরিপক্ক ধান্যরাশি দ্বারা আবৃত, গোসমূহ সুখাবস্থিত; কুমুদকহ্লার পরিশোভিত, পরিপূর্ণ সুনির্ম্মল জলাশয়; চারিদিকে হংসকলরব দেখিয়া কৃষকগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে।

শরৎকাল পড়িলেই সকলের—বিশেষতঃ বালক বালিকাগণের—হৃদয়ে আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিত। ভাদ্রমাসের বাতাস যেন ৺শারদীয়া পূজার গন্ধ আনিয়া দিত। ভাদ্রের রৌদ্রে যেন পূজার ছবি সকলের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইত। বালকেরা অবসর পাইলেই গ্রামে কাহার কাহার বাড়ী পূজা হইবে, কাহার বাড়ী কাঠাম আরম্ভ হইয়াছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া আসিত। তাহারা সেই সময় হইতে পূজা পর্য্যন্ত, কাঠাম হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিমা সাজান পর্য্যন্ত সকল বাড়ীতে গিয়া দেখিয়া শুনিয়া আসিত। ৺দুর্গাপূজা আসিতেছে পূজা দেখিবে, পূজার সময়ে নূতন কাপড় ও নূতন জুতা পরিবে, যাঁহারা বিদেশে আছেন, তাঁহারা বাড়ী আসিবেন, কত কি জিনিস লইয়া আসিবেন ভাবিয়া, আর কে জানে কি জন্য, কেবল বালকের নহে, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নৃত্য করিত। সূর্য্যরশ্মিতে, বায়ুপ্রবাহে, প্রস্ফুটিত কুমুদকহ্লার শোভিত সরোবরে, শরতের জ্যোৎস্না-ধবল নৈশ-আকাশে, সেফালিকা পুষ্পে সর্ব্বত্রই যেন আনন্দ ছুটিয়া ছুটিয়া খেলা করিত এবং আনন্দময়ীর আগমন-

বার্ত্তা সকলের হৃদয়ে কহিয়া যাইত। সকলেরই হৃদয় প্রিয়-সমাগমাশায় উৎফুল্ল হইয়া নৃত্য করিত। প্রবাসে যিনি যেখানেই থাকুন, ষষ্ঠীর দিন সকলেই বাড়ী আসিতেন। সেদিন গ্রামে ভরপুর আনন্দ। সেদিন পিতা মাতা পুত্রের সহিত, পত্নী পতির সহিত, পুত্রকন্যা পিতার সহিত, ভাই বোন্ ভাইয়ের সহিত, বন্ধু বন্ধুর সহিত মিলিয়াছেন। পল্লীগ্রামে এমন আনন্দের দিন আর ছিল না। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইতর, কি ভদ্র সকল জাতির সকল শ্রেণীর আবাল বৃদ্ধ বনিতা এই আনন্দোৎসবে মাতিয়া উঠিত। পূজার তিন দিন যেন চারিদিকে আনন্দের উৎস ছুটিয়া বাহির হইত। কুলবধূগণ নানা রঙের নানাপ্রকারের বস্ত্র ও নানালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া শিশুসন্তান কোলে করিয়া হাসিতে হাসিতে পূজার স্থানে আসিয়াছেন; প্রাচীনেরা পূজার দ্রব্যাদি উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত; বালক বালিকা নূতন বেশে সাজিয়া পূজাবাড়ীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত। 'চারিদিক হইতে স্ত্রী পুরুষ ছোট ছোট ছেলে মেয়েদিগকে নূতন কাপড় পরাইয়া কাহাকেও কোলে করিয়া, কাহারও হাত ধরিয়া, কাহাকেও সঙ্গে করিয়া ঐ বাড়ী, ঐ বাড়ী বলিতে বলিতে পূজাপ্রাঙ্গণে সমুপস্থিত হইয়াছে। মায়ের পায়ে সচন্দন বিল্বপত্র, জবা, পদ্ম প্রভৃতি অসংখ্য ফুল; পূজার দালান ও চণ্ডীমণ্ডপ ধূপ ধুনার সুগন্ধি ধূমে আচ্ছন্ন; দুই পার্শ্বে ব্রাহ্মণ মাকে চামর বীজন করিতেছেন; পূজার দালানে চণ্ডীমণ্ডপে ও উঠানে লোকে লোকারণ্য; ঢোল, কাঁশী, সানাইয়ের বাদ্যে, শঙ্খ, ঘণ্টা কাঁসরের রবে চারিদিক মুখরিত। মা হাসিতেছেন, সকলেই হাসিতেছেন, সকলেই অন্তরে বাহিরে মা মা বলিয়া আর্দ্র নেত্রে ডাকিতেছেন। যখন পুরোহিত, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে,

"দেবী প্রপন্নার্ত্তি হরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য॥
আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈত
দাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে॥
ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ,
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥

ইত্যাদি বলিয়া মার স্তব করিতেন, তখন কি আনন্দ।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

অশ্রুকুমার

(উপন্যাস)

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

আলেকজাণ্ড্রার প্রেম ও ভক্তি।

আজ বাটী হইতে বৈকালিক ভ্রমণ জন্য বাহির হইয়া অশ্রুকুমার ধীরে ধীরে ডাক্তার দত্তের বাড়ীর দিকে চলিল। গতকল্য সে তথায় গিয়া ডাক্তার সাহেবের একটি সুন্দর পুস্তকাগার দেখিয়া আসিয়াছিল, সেই পুস্তকাগারের প্রলোভন তাহার মনে জাগিয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার দত্তের বাটীতে পৌছিয়া সে জানিতে পারিল যে, ডাক্তার বাটীতে নাই, রোগী দেখিতে বাহির

হইয়াছেন। সুতরাং পুস্তকাগার পরিদর্শনের প্রলোভন সম্বরণ করিয়া, সে তখনই বাটী ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিল।

কিন্তু ঠিক সেই সময় আলেক্জান্দ্রার মোটরগাড়ী গাড়ীবারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাতে আলেক্জান্দ্রা ও তাহার দুইটি ভ্রাতা ছিল। আলেকজান্দ্রা গাড়ী হইতে নামিল, কিন্তু ভ্রাতৃদ্বয় নামিল না। বালিগঞ্জে কোনও বন্ধুর বাড়ীতে চা পানের জন্য তাহাদের নিমন্ত্রণ ছিল; দিদির মোটগাড়ী চড়িয়া সেখানে যাইবার জন্য তাহারা অনুমতি পাইয়াছিল। দিদিকে বাটীতে পৌছাইয়া দিয়া, তাহারা মোটর লইয়া চলিয়া গেল। আলেকজান্দ্রা হলে প্রবেশ করিয়া, হঠাৎ সম্মুখে অশ্রুকুমারকে দেখিয়া অত্যন্ত খুসী হইয়া উঠিল।

তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনজন্য অশ্রুকুমার আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আলেকজান্দ্রা উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "বস, বস; আমি এখনই আসছি। ডাক্তার দত্তের মুখে শুনলাম, কাল তুমি এসেছিলে; কিন্তু আমি বাড়ী ফেরবার আগেই চলে গিয়েছিলে।"

অশ্রুকুমার কহিল, "আপনার বাড়ী ফিরতে দেরী হবে মনে করে চলে গিয়েছিলাম।"

আলেক্জান্দ্রা কহিল, "কিন্তু তুমি চলে যাবার পরই আমি বাড়ীতে ফিরেছিলাম। তুমি যদি আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে, তা হলে আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হত। আজ দৈবক্রমে একটু আগেই বাড়ী ফিরেছি, তাই তোমার সঙ্গে দেখা হল। তা না হলে আজও তোমার সঙ্গে দেখা হত না।"

অশ্রুকুমার বলিল, "আমি আবার আসতাম। আপনারা আমার জীবন রক্ষা করেছেন, আপনাদিকে কি আমি কখন ভুলতে পারি?"

আলেকজান্দ্রা হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা আচ্ছা এর পর দেখা যাবে, তুমি আমাকে ভুলে যাও কি না। চল, উপরে চল, সেখানে ড্রয়িংরুমে বসবে। আমি এই বাইরের কাপড়গুলো পরিবর্ত্তন করে এখনই তোমার কাছে আসব। এই বেহারা, আয়া কাঁহা? উস্কো পোষাক কামরামে জলদি ভেজো। আচ্ছা সবুর, সবুর। অশ্রু বাবু, তোমার জন্যে কি একটু চা আর দু'খানা বিস্কুট আনতে বলব?"

আলেক্জান্দ্রার চঞ্চল বাক্যে অশ্রুকুমার কিছু বিস্মিত হইয়া কহিল, "আমি কখনও চা খাইনি।"

আলেক্জান্দ্রা কহিল, "তবে থাক, অন্য কিছু জল খাবার আনতে বলি। এই বেহারা!"

অশ্রুকুমার কহিল, "না না, থাক। আমি বাড়ী থেকে জলখাবার খেয়ে বার হ'য়েছি; এখন আর কিছু খাব না।"

আলেকজান্দ্রা কহিল, "তবে থাক; সে পরে দেখা যাবে। বেহারা তোম্ যাও; আয়াকো জল্দি ভেজো। এস অশ্রু বাবু, আমার সঙ্গে উপরে এস।"

আলেক্জান্দ্রার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মসৃণ কাষ্ঠনির্ম্মিত ও মহার্ঘ কারপেট মণ্ডিত অধিরোহণী অতিক্রম করিয়া অশ্রুকুমার দ্বিতলে উঠিল। সেখানে সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া, আলেকজান্দ্রা অশ্রুকুমারকে আহ্বান করিয়া কহিল, "এস এইখানে বস। পাখাটা খুলে দেব কি? না থাক, একটু ঠাণ্ডা পড়েছে। আমি এখনই আসছি। দু'মিনিটও দেরী হবে না। যদি একটু দেরী হয়, তুমি যেন পালিও না। আমি দশ বার দিন তোমাকে দেখি নি—সে যেন একটা যুগ। তুমি চলে যাবার পর মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। একদিন মনে করলাম যে যাই ডেপুটী বাবুর বাড়ীতে গিয়ে তোমাকে দেখে আসি। কিন্তু হিন্দুর বাড়ীতে যেতে সাহস হল না। আমাদের জাত গিয়েছে; যদি তাঁরা আমাকে বাড়ীতে ঢুকতে না দেন। কিংবা ঢোকবার আগেই গায়ে গোবরজল ঢেলে দেবার ব্যবস্থা হয়? কাজেই যাওয়া হল না। অশ্রু বাবু দাঁড়িয়ে থেক না; আমি এখনই আসব! চুপ করে বসে থাকতে কষ্ট হবে? আচ্ছা, এই আলবাম্খানা দেখ।"

অশ্রুকুমার একটা বিচিত্র আসনে উপবিষ্ট হইয়া

আলেকজান্ড্রা প্রদত্ত চিত্র-পুস্তকের পাতা উল্‌টাইতে লাগিল।

আলেকজান্ড্রা বেশ পরিবর্ত্তন করিতে গেল। প্রসাধন কক্ষে প্রবেশ করিয়া, আয়ার হস্তে ওভার-কোটটি দিয়া, আলেক্‌জান্ড্রা দর্পণে আপনার মুখখানি দেখিল। সুন্দর মুখ; ললিত রক্তাধর, স্বাস্থ্য-পরিপুষ্ট রক্তাভ কোমল কপোল, লীলাচঞ্চল নয়ন।

সযত্ন প্রসাধনে আপন লাবণ্য আরও উজ্জ্বল করিয়া আলেকজান্ড্রা ড্রয়িংরুমে আসিয়া অশ্রুকুমারের নিকট অন্য আসনে উপবেশন করিল। কক্ষমধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইতেছে দেখিয়া, ভৃত্য বৈদ্যুতিক আলোকগুলি জ্বালিয়া দিল। তড়িতালোকে আলেকজান্ড্রার উজ্জ্বল লাবণ্য আরও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

আলেকজান্ড্রা জিজ্ঞাসা করিল, "গান বাজনার তোমার সখ আছে? তুমি গান গাইতে বা কোন বাজনা বাজাতে পার?"

অশ্রুকুমার কহিল, "একটুও না। আমাদের গ্রামে একজন লোক আছে; সে ভাল গান গাইতে পারে। তার গান শুনে আমার গান শিখতে ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু তার কাছে যেতে মা আমাকে বারণ করেছিলেন। আর আমার গান শেখা হল না।"

আলেক্‌জান্ড্রা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি গান শুনতে ভালবাস?"

অশ্রুকুমার কহিল, "খুব ভালবাসি।"

আলেক্‌জান্ড্রা আহ্লাদিত হইয়া কহিল, "আচ্ছা আমি তোমাকে গান শোনাব। রোজ রোজ শোনাব। আমাদের সমাজে গান শিখে তা ভদ্রলোককে শোনাবার প্রথা প্রচলিত আছে। চল ঘরের ঐ পাশে চল; ঐখানে আমার হারমোনিয়ম আছে।

অশ্রুকুমার আলেকজান্ড্রার সহিত ঘরের অন্তদিকে গেল। সেখানে একটা বড় অর্গ্যান হারমোনিয়ম ছিল; তেমন সুদৃশ্য বৃহৎ হারমোনিয়ম অশ্রুকুমার কখনও নয়নগোচর করে নাই। আলেক্‌জান্ড্রা হারমোনিয়মের নিকটবর্ত্তী চর্ম্মমণ্ডিত ক্ষুদ্র চক্রাকার আসনে উপবেশন করিল। অশ্রুকুমার নিকটবর্ত্তী অন্ত আসন অধিকার করিল। আলেক্‌জান্ড্রা হারমোনিয়মের কাষ্ঠাচ্ছাদন নির্ম্মুক্ত করিয়া, উহার চাবিগুলির উপর আপন রত্নাঙ্গুরীয়-ভূষিত অঙ্গুলি সকল সঞ্চালিত করিল। বৃহৎ কক্ষ মধুর গুঞ্জনে ঝঙ্কারিত হইয়া উঠিল। তড়িতালোকে আলেকজান্ড্রার অঙ্গুরীয়ের রত্ন সকল, মন্মথ-নিধনোদ্যত মহাদেবের চক্ষের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। হারমোনিয়মের সুরের সহিত আপনার মধুর কণ্ঠস্বর মিশ্রিত করিয়া আলেকজান্ড্রা গান গাহিতে লাগিল। কি মধুর গান! অশ্রুকুমার তেমন গান কখনও শুনে নাই। বুঝি আলেক্‌জান্ড্রাও তেমন গান কখনও গাহে নাই; আজিকার গানে তাহার হৃদয়োচ্ছ্বাস উচ্ছসিত হইয়া পড়িতেছিল। সে সঙ্গীতে যেন সমস্ত জগৎ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে সঙ্গীতে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের ব্যবধান অন্তর্হিত হইয়াছিল; স্বর্গ ও মর্ত্ত্যকে একটা সুরের বন্ধনে কে যেন বাঁধিয়া দিতেছিল।

সঙ্গীতাবসানে অশ্রুকুমার আলেকজান্ড্রার প্রেমোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; সে চাহনিতে অতি বিস্ময় ও অতি তৃপ্তি প্রতিফলিত হইতেছিল। অশ্রুকুমারের তৃপ্তি দেখিয়া, আলেকজান্ড্রাও আপনার প্রেমতপ্ত হৃদয়ে তৃপ্তি অনুভব করিল। সঙ্গীত-শ্রমে তাহার মুখ রক্তাভ ধারণ করিয়াছিল; সেই রক্তাভ মুখ তুলিয়া, সস্মিত অধর স্ফুরিত করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "অশ্রুবাবু, আমি কি তোমার মনে তৃপ্তি দিতে পেরেছি?"

অশ্রুকুমার কহিল, "আমি এমন গান কখনও শুনি নি। এ গানে এখনও যেন আমার কাণে মধু ঢেলে দিচ্ছে। আপনি এমন গান কোথায় শিখলেন?"

আলেকজান্ড্রা কহিল, "তুমি শিখবে অশ্রু বাবু? আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। এস, আজই তোমার হাতে খড়ি দিই। তোমার চেয়ারটা আমার আরও কাছে আন। হাঁ, এইখানে বস। এইবার তোমার হাত দুটা দাও; কোথায় কোন আঙুল কি ভাবে দেবে, তা আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব।"

অশ্রুকুমার আপনার করতলদ্বয় আলেক্জান্দ্রার করতলে সমর্পণ করিতে যাইতেছিল, এমত সময়ে আলেকজান্দ্রার পিতা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দেখিয়া আলেকজান্দ্রার মনে হইল, যেন কক্ষমধ্যে বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইয়া গেল; সঙ্গীতোচ্ছ্বাস-মধ্যে যেন শত বীণার তার এককালে ছিঁড়িয়া গেল। সে ললাট কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা কমিল, "বাবা আজ অসময়ে কেন?"

আলেকজান্দ্রার পিতা প্রোফেসার বানার্জ্জিকে বোধ হয় তোমরা বিস্মৃত হও নাই; তিনি ইংরাজি ভাষা ছাড়া আর কোনও ভাষায় কথা কহিতেন না। তাঁহার ইংরাজি কথার বাঙ্গলা অনুবাদ মাত্র আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম।

কন্যার প্রশ্নের উত্তরে প্রোফেসার বানার্জ্জি কহিলেন, "আ, হাঁ! ছেলেদিকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে মোটরখানা এমনই ফেরত আসছিল। আমি মনে করলাম, যাই একবার তোকে দেখে আসি। তোমাকে বোধ হয়, একযুগ দেখি নি। এই অর্দ্ধনগ্ন যুবকটি কে?"

আলেকজান্দ্রা বিরক্ত হইল। ললাট কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "বাবা, আমার বাড়ীতে যে ভদ্রব্যক্তি বসে থাকে, আর আমি যার সঙ্গে বাক্যালাপ করি, তার সম্বন্ধে প্রশ্নের প্রয়োগের ভাষা অন্য রকম।"

প্রোফেসর বানার্জ্জি কিছু অপ্রস্তুত ও কিছু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কিছু মনে করো না, আলেক্। আমার মনে হয় এই যুবকটি ইংরাজী জানে না। এ ব্যক্তি আমার কথা বুঝবে না, কাযেই আমার দোষ গ্রহণ করতে পারবে না।"

অশ্রুকুমার ইংরাজিতে বলিল, "না, তা নয় মশায়, আমি আপনার কথা বুঝি। কিন্তু আপনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ, আমি আপনার কোনও অপরাধ গ্রহণ করতে পারি না। বিশেষতঃ আমি বেশ বুঝেছি, আমার এই ধুতি ও পিরাণ বাস্তবিকই আমার সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে আবৃত করিতে পারে নি। কেবল মাত্র এই আমাদের স্বদেশবাসিদের পরিচ্ছদ বলে আমি এ ত্যাগ করতে পারি নি। আমার দেশবাসীদের প্রতি যতদিন আমার শ্রদ্ধা থাকবে, ততদিন হয়ত এ আমি ত্যাগ করতে পারব না।"

অশ্রুকুমারের বিশুদ্ধ ইংরাজি উচ্চারণ ও বাক্য-প্রণালী এবং তাহার বিনয় ও তেজস্বিতা দেখিয়া প্রোফেসার বানার্জ্জি ও আলেকজান্দ্রা উভয়েই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। আলেক্জান্দ্রা যাহাকে বিদ্যাহীন পল্লীযুবক বলিয়া জানিত, দেখিল সে বাস্তবিক বিদ্যাহীন নহে। দেখিয়া ব্রাহ্মণ অশ্রুকুমারের উপর তাহার শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গেল।

প্রোফেসার বানার্জ্জি অশ্রুকুমারের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "তোমার ইংরাজি কথা শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তুমি কি কোনও কলেজের ছাত্র?"

অশ্রুকুমার কহিল, "আমি কখনও স্কুল বা কলেজে পড়ি নি।"

প্রোফেসর বানার্জ্জি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এরকম ইংরাজি শিখলে কোথা থেকে?"

অশ্রুকুমার কহিল, "আমাদের গ্রামে একজন অত্যন্ত সুশিক্ষিত লোক বাস করেন; তিনি আমাকে ইংরাজী ও ল্যাটিন শিখিয়েছেন।"

আলেকজান্দ্রার প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে শ্রদ্ধা তাহার বিস্ফারিত চক্ষে ফুটিয়া উঠিল। সে বুঝিল যে অশ্রুকুমার তাহাদের চেয়ে সুশিক্ষিত।

প্রোফেসার বানার্জ্জি কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ হইয়া গেলেন, কেননা লাটিন সাহিত্যে তাহার অধিকার ছিল না। তাঁহার সম্মুখস্থ এই দীর্ঘাকার, সুন্দর ও সুগঠিতাবয়ব যুবক বিদ্যায় তাঁহা অপেক্ষা কোনও ক্রমেই হীন নহে জানিয়া, তাঁহার অহঙ্কার অত্যন্ত আঘাত পাইল। অতঃপর নম্রস্বরে তিনি কহিলেন, "আমার কন্যার সঙ্গে তোমার পরিচয় হল কি করে?"

অশ্রুকুমার তাহার বিপদের কথা, কঠিন পীড়ার কথা, ডাক্তার দত্তের ও আলেকজান্দ্রার যত্নের কথা বিশেষভাবে বিবৃত করিল। তাহার সুন্দর ভাষায়

বিনয় ও কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল। কথা শেষ হইলে, সে আলেকজান্ড্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

আলেকজান্ড্রা কহিল, "ও কি ? উঠছ কেন ?"

অশ্রুকুমার বলিল, "আপনারা অনুমতি করলে, এখন আমি বাড়ী ফিরব। গল্প করতে করতে কখন রাত হয়ে গেছে, বুঝতে পারি নি।"

আলেকজান্ড্রা অশ্রুকুমারের প্রতি মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "একটু অপেক্ষা কর। আমার মোটরখানা বাবাকে বাড়ী পৌছিয়ে দিয়ে ফেরত এলে, তুমি তাতে চড়ে অল্প সময়ের মধ্যে ডেপুটি বাবুর বাড়ীতে ফিরতে পারবে।"

অশ্রুকুমার কি বলিতে যাইতেছিল ; কিন্তু প্রোফেসর বানার্জ্জি তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, "আমি এখন বাড়ী ফিরব না। তোমার কাছে আমার কিছু কায আছে। ততক্ষণ মোটরখানা এই ভদ্রলোকটিকে বাড়ী পৌছিয়ে দিয়ে অনায়াসে ফেরত আসতে পারবে।"

পুরাকালে কপিল মুনির কটাক্ষপাতে সগরবংশ ধ্বংস হইয়াছিল ; মহাদেবের কটাক্ষপাতে কন্দর্প ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। এই কলিকালে কটাক্ষাঘাতে কেহ মরে না। তাই প্রোফেসার বানার্জ্জির জীবন রক্ষা হইল ; নতুবা তাঁহার বচন শুনিয়া, আলেকজান্ড্রা তাঁহার দিকে যে কটাক্ষপাত করিয়াছিল, তাহাতে আলেকজান্ড্রাকে পিতৃঘাতী হইতে হইত। সৌভাগ্যক্রমে প্রোফেসার বানার্জ্জি আপনার কাযের চিন্তায় এমন তন্ময় ছিলেন যে কন্যার সেই তীব্র তীক্ষ্ণ কটাক্ষ লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। পিতার এই কাযটা কি তাহা আলেকজান্ড্রা অবগত ছিল। কিছু অর্থ সংগ্রহের আবশ্যক হইলেই তিনি কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। আজও যে তিনি সেই সদুদ্দেশ্যেই আসিয়াছিলেন, তাহা বেশী বুদ্ধি ব্যয় না করিয়াও আলেকজান্ড্রা বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু পিতার প্রস্তাবের পর, সে প্রতিজ্ঞা করিল যে আজ এক কপর্দ্দকও সে তাঁহার জন্য ব্যয় করিবে না।

অশ্রুকুমার মৃদু কণ্ঠে কহিল, "মোটর গাড়ীর দরকার হবে না ; এই অল্প রাস্তা হেঁটেই যাব।"

আলেকজান্ড্রা কহিল, "পার্ক ষ্ট্রীট থেকে শিয়ালদা প্রায় দেড় মাইল রাস্তা ; এটা অল্প রাস্তা নয়। তার পর, এই অগ্রহায়ণ মাসের হিম ; এই হিম লাগান তোমার পক্ষে ভাল হবে না। কত কষ্টে তোমাকে আরোগ্য করেছি। বাবা, তুমি এইখানে একটু অপেক্ষা কর, আমি অশ্রুবাবুকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে এখনই আবার ফিরে আসব। চল, অশ্রু বাবু।"

অশ্রুকুমার প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। সে গাড়ীতে আরোহণ করিবার জন্য আলেকজান্ড্রার অনুসরণ করিল।

সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া, নিম্নে হল ঘরে আসিয়া, আলেকজান্ড্রা হঠাৎ অশ্রুকুমারের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইল।

গতিরোধ হওয়ায় অশ্রুকুমারও দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি আমাকে কিছু বলবেন ?"

আলেকজান্ড্রা কহিল, "হাঁ। সকল সভ্য দেশেই বিদায় গ্রহণের সময় একটা নমস্কার প্রতিনমস্কারের প্রথা প্রচলিত আছে। আমি সিঁড়িতে নামতে নামতে ভাবছিলাম, আমাদের দুজনের মধ্যে সেটা কি ভাবে সম্পন্ন হবে।"

অশ্রুকুমার কহিল, "কেন ? অতি সহজে। আপনি আমা অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও আপনি আমার পক্ষে সম্মানার্হ জীবনদাত্রী ; এজন্য আপনি সর্ব্বদা আমার নমস্যা ; আমি আপনাকে নমস্কার করব। আর, আর আপনি বোধ হয় আমাকে প্রতিনমস্কার করবেন ?"

আলেকজান্ড্রা কহিল, "না তুমি ব্রাহ্মণ ও বয়োজ্যেষ্ঠ ; আমি তোমার পায়ের ধূলা গ্রহণ করব। আমি জাতিচ্যুত ও পতিতা ; তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ করবে।"

কথাটা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই এবং অশ্রুকুমার একটুকু বাধা উত্থাপন করিতে না করিতে, আলেকজান্ড্রা হল ঘরের মর্ম্মর মণ্ডিত মেঝের উপর নতজানু

হইয়া বসিয়া পড়িল; এবং দুই হাতে অশ্রুকুমারের পাদুকাপ্রান্ত স্পর্শ করিয়া, অবনত মস্তকে প্রণতা হইল।

এই আকস্মিক ব্যাপারে অশ্রুকুমার অত্যন্ত বিস্মিত ও কতকটা লজ্জিত হইয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি আলেকজান্দ্রার হাত ধরিয়া কহিল, "উঠুন, উঠুন; আপনি এ কি করছেন? আমার মত সামান্য লোককে আপনি কখনও এভাবে প্রণাম করতে পারেন না।" এই বলিয়া সে চরণপ্রান্তে পতিতা আলেকজান্দ্রাকে উঠাইল।

অশ্রুকুমার যে হস্ত দ্বারা তাহাকে তুলিয়াছিল, আলেকজান্দ্রা তাহা দুই হস্তে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "তুমি চিরকাল আমার প্রণম্য থাকবে; আমার চক্ষে তুমি কখনও সামান্য হবে না। তুমি জান না, তুমি আমার কি। সে কথা হয়ত একদিন তোমাকে বলতে হবে। কিন্তু এখন তা তোমাকে বলতে পারব না; তুমিও তাহা জানতে চেষ্টা করো না। তুমি মাঝে মাঝে আমাকে দেখা দিও। দেবে ত?"

আলেকজান্দ্রার ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে, তাহার তপ্ত করতলের কোমল স্পর্শে, তাহার লপিত নয়নের বিলোল চাহনিতে কি ছিল বলিতে পারি না; কিন্তু তাহাতে অশ্রুকুমারের মনে ক্ষণকালের জন্য একটা সন্দেহের ছায়া পড়িল। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবিল, ছি ছি! এমন হইতে পারে না। এই পতিব্রতা জীবনদাত্রী কখনও এমন ধর্ম্মহীনা হইতে পারে না। সে কহিল, "যতদিন আমি কলিকাতায় থাকব, ততদিন, মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে আসব।"

অশ্রুকুমারের হস্ত তখনও আলেকজান্দ্রার হস্তমধ্যে ছিল। সে তাহা ঈষৎ আন্দোলিত করিয়া কহিল, "এইবার তুমি আমার প্রণামের প্রাপ্য আশীর্ব্বাদটা আমাকে দাও।"

অশ্রুকুমার কিছু ইতস্ততঃ করিয়া স্মিতমুখে কহিল, "আমি আশীর্ব্বাদ করছি, ধর্ম্মে আপনার অক্ষুণ্ণ মতি হোক। ধর্ম্মই সুখ; সেই সুখ আপনি চিরকাল ভোগ করুন।"

আলেকজান্দ্রা অশ্রুকুমারের হস্ত ছাড়িয়া দিল। লজ্জায় তাহার মুখ অবনত হইয়া পড়িল। ভাবিল, অশ্রুকুমার কি তাহাকে ধর্ম্মহীনা মনে করিয়াছে? নতুবা ঐ রূপ আশীর্ব্বাদ করিল কেন? সে নীরবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া, অশ্রুকুমারকে গাড়ীতে তুলিয়া দিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিল, "কাল কখন আসবে? গাড়ী পাঠাব কি?"

অশ্রুকুমার কহিল, "কাল কখন আসব, তাঁর ঠিক নেই। কিন্তু আসব। গাড়ী পাঠাবেন না।"

অশ্রুকুমারকে লইয়া গাড়ী দৃষ্টি পথের অতীত হইলে, আলেকজান্দ্রা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল; এবং অন্য মনে একটা আসনে বসিয়া পড়িল।

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বানার্জ্জি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ যুবকটি এখন কোথায় থাকে?"

আলেকজান্দ্রা অন্যমনস্কভাবে কহিল, "শেয়ালদর কাছে এক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে।"

আরও কিঞ্চিৎকাল নীরব থাকিয়া, বানার্জ্জি সাহেব কাযের কথাটা তুলিলেন—"গত মাসে শীতের কাপড় তৈরী করতে দিয়েছিলাম। সম্প্রতি দরজীর বিলটা পেয়েছি—দুশো টাকার চেয়ে বেশী। বাড়ীভাড়াও তিন মাসের বাকী পড়েছে; তাও প্রায় তিন শ টাকা। তুমি জান, আমি সর্ব্বদাই অর্থশূন্য, তাই ভেবে চিন্তে তোমার কাছে এসেছি। তোমরা বড় হয়েছ, তোমরা বাপের অভাবের সময় না দেখলে, কে দেখবে? এ মাসে পাঁচ-ছ শো টাকা পেলেই আমার চলে যাবে।"

আলেকজান্দ্রা কহিল, "বাবা, তোমার আয় মাসে পাঁচশো টাকা; তার উপর ভাই দুটোর ভার একপ্রকার সমস্তই আমি নিজ হাতে নিয়েছি। এতেও তোমার

খরচ 'কুলায় না কেন? স্বামীর টাকা চুরি করে, তোমাকে দেবার জন্তই কি তুমি এই অব্রাহ্মণের হাতে আমাকে সমর্পণ করেছিলে?"

প্রোফেসর বানার্জ্জি ঠিক এই প্রকার উত্তর শুনিবার প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি বলিলেন, "সে কি, আলেক? একে তুমি চুরি বল কি করে? তুমিই ত বলেছ যে তোমার স্বামীর মাসিক আয় চার পাঁচ হাজার টাকা, সবই তোমার হতে এসে পড়ে। তা থেকে তুমি তোমার সংসারের খরচ চালিয়ে বাকী টাকা তোমার ইচ্ছামত খরচ কর; তোমার স্বামী তার কোন খোঁজই রাখে না। তোমার খরচ করবার টাকা, তোমারই টাকা। তা থেকে যদি তুমি আমার জন্তে কিছু খরচ কর সেটা কি চুরি?"

আলেকজান্ড্রা জোরের সহিত বলিল, "সেটা চুরিরও বেশী;—সেটা চুরি আর বিশ্বাসঘাতকতা। টাকা আমার স্বামীর। তিনি বিশ্বাস করে আমাকে খরচ করতে দেন; সে টাকা আমাদের দরকারেই খরচ হওয়া উচিত। তা থেকে কোনও টাকা তাঁর অজ্ঞাতসারে তোমাকে দেওয়া আমার উচিত নয়। 'এতদিন অনুচিত কায করেছি! আর করব না।"

বানার্জ্জি সাহেব আতান্তরে পড়িয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আর কখনও দিও না; কিন্তু এবার দিতে হবে। না দিলে, দরজির ও বাড়ীওয়ালার ঋণটা আমি পরিশোধ করিতে পারব না।"

আলেকজান্ড্রা কহিল, "তুমি কাল সকালে এসে আমার স্বামীকে তোমার অভাবের কথা জানিও। তিনি অনুমতি করলে, আমি তোমাকে টাকা দেব। নতুবা কোন ক্রমেই তুমি আমার কাছে থেকে একটি টাকাও পাবে না।"

আলেকজান্ড্রার এই অদ্ভুত ও নিতান্ত যুক্তিহীন মত পরিবর্ত্তনের কোনও কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া, বানার্জ্জি সাহেব বিষণ্নমুখে বসিয়া রহিলেন। সান্ধ্যভোজের নিমিত্ত সজ্জিতা হইবার জন্ত আলেকজান্ড্রা যথাসময়ে আপন প্রসাধন কক্ষে চলিয়া গেল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

সৌদামিনীর বিবাহ।

মোটর গাড়ীতে চড়িয়া, বাটী ফিরিবার পথে অশ্রুকুমার কিয়ৎকাল আলেকজান্ড্রার আশ্চর্য্য আচরণের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। হঠাৎ সে ভক্তিপূর্ব্বক তাহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া, তাহাকে প্রণাম করিল কেন? প্রণাম করিয়া, আবেগময় কণ্ঠে সে যে কথাগুলা বলিয়াছিল, তাহার অর্থ কি? ভদ্রকন্তা, ভদ্র বধূ, সুশিক্ষিতা দয়াময়ী আলেকজান্ড্রা কি চরিত্রহীনার ন্যায়, হৃদয় মধ্যে তাহার প্রতি গুপ্তপ্রেম পোষণ করে? ছি ছি! তাহার জীবনরক্ষাকারিণী দেবী কি এত হীনা হইতে পারে? সে বলিয়াছে, অশ্রুকুমার তাহার কে, হয়ত সে তাহা একদিন বলিবে। কেন, অশ্রুকুমার তাহার কে?—সেই কি তাহার প্রেম-পাত্র? ছি ছি! অশ্রুকুমারের জন্ত কেন সে পাপের পঙ্কে পা দিবে? কি প্রলোভনে সে দাম্পত্য ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া, আপন মন কলুষিত করিবে? অশ্রুকুমার ভাবিল, তাহার কি আছে যে তাহার জন্ত এই দেবী আপনার সমস্ত গৌরব ত্যাগ করিয়া এই ধিক্কারজনক নরকে নামিয়া আসিবে? তবে অশ্রুকুমারের আশীর্ব্বাদ গ্রহণের পূর্ব্বে সেই কথাগুলা সে কেন বলিল? অশ্রুকুমার অনেক চিন্তা করিয়াও ইহার কারণ নির্ণয় কপিতে পারিল না। অবশেষে সে মনে করিল যে এইরূপ অবৈধ চিন্তা মনোমধ্যে পোষণ করা উচিত নহে। ইহা মনে করিয়া সে আলেকজান্ড্রার আচরণের চিন্তা ত্যাগ করিল।

আলেকজান্ড্রার চিন্তায় বিরত হইয়া, সে সৌদামিনীর কথা ভাবিল। ডেপুটী বাবু কি সেই পত্রখানা পড়িয়া, সেই জমীদারের সহিত সৌদামিনীর বিবাহ রহিত করিয়া দিবেন? এবং জামাতার ইচ্ছানুযায়ী তাহারই সহিত সৌদামিনীর বিবাহ দিবেন? ইহাই ত তাঁহার উচিত কার্য্য হইবে। কিন্তু সকলে কি সকল

সময়ে উচিত কার্য্য করিয়া থাকে ? ডেপুটী বাবু যদি এই উচিত কার্য্যটা না করেন ? হায় হায়! তাহা হইলে, তাহার কি সর্ব্বনাশ হইবে! সৌদামিনী অপরের পরিণীতা পত্নী হইয়া দুই দিন বাদে শ্বশুরালয়ে চলিয়া যাইবে। সৌদামিনী যদি তাহার প্রতি একটু অনুরাগিণী হইয়া থাকে, সে শ্বশুরালয়ে যাইয়া, শত সুখের মাঝে সেই ক্ষুদ্র অনুরাগের কথা ভুলিয়া যাইবে। কেন সে তবে সৌদামিনীর আশা বক্ষমধ্যে পোষণ করিবে ? কি অধিকারে ? যে দুইদিন বাদে পরস্ত্রী হইবে, তাহার চিত্র মনোরম হইলেও চিত্তমধ্যে রাখিবার অধিকার তাহার ত ছিল না। অতএব সে আলেকজান্দ্রার চিন্তার ন্যায়, সৌদামিনীর চিন্তাও ত্যাগ করিল।

বাটীতে অশ্রুকুমারকে প্রত্যাগত দেখিয়া, রামতনু বাবু ও ডেপুটী বাবু উভয়েই তাহাকে বৈঠকখানা ঘরে আহ্বান করিলেন।

অশ্রুকুমার উপবিষ্ট হইলে, রামতনু বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বইখানি আর এই খাতাখানি কি তোমার ?"

অশ্রুকুমার রামতনু বাবুর হস্তধৃত পুস্তক ও খাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "হাঁ, আমিই ওটা ভুল করে এখানে ফেলে রেখে গিয়েছিলাম।"

ডেপুটী বাবু। এই কেতাব তুমি কোথায় পেলে ?

অশ্রুকুমার। কাল ডাক্তার দত্তের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে ওখানা আমি তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এসেছিলাম। দুপুর বেলাটা চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগত না। তাই একটা কায নিয়ে সময় কাটাবার জন্যে কেতাবখানা চেয়ে এনেছি।

রামতনু বাবু। এখানি কি ভাষার কেতাব ?

অশ্রুকুমার। কেতাবখানি লাটিন ভাষায় লিখিত; আমি ওর বাঙ্গালা ইংরাজি অনুবাদ করতে চেষ্টা করছিলাম।

রামতনু বাবু। ঐ অনুবাদটা আমরা পড়ে বুঝেছি যে লেখাপড়া সম্বন্ধে কোন কাযে তোমাকে যদি আমরা নিযুক্ত করে দিতে পারি, তা হলে, তুমি তা অনায়াসে সম্পন্ন করতে পার। পার না কি ?

অশ্রুকুমার। বোধ হয় পারি। আমি কৃষ্ণনগরে কোন কোন আফিসে গিয়ে ভদ্রলোকদের কায দেখেছিলাম। ঐ কায দেখে আমার বিশ্বাস হয়েছিল যে, সে সকল কাযই আমি সহজেই করতে পারি। কিন্তু ঐ রকম কোন কাযে, আমাকে কেউ কখন ভর্ত্তি করতে চায় নি; কেন না আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হতে পারি নি। আপনারা যদি কোন উপায়ে আমাকে ঐরকম কোনও কাযে ভর্ত্তি করে দিতে পারেন, তা হলে আমার মনে হয়, আমি সে কায করতে পারব।

ডেপুটী বাবু। আমরা নিশ্চয়ই তোমার জন্যে একটি কায খুঁজে দেব। কিন্তু সে কথা পরে হবে। এখন তোমার সঙ্গে অন্য কথা আছে।

ডেপুটি বাবু ও রামতনু বাবু তখন অশ্রুকুমারকে তাহার সাংসারিক অবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন। বলা বাহুল্য অশ্রুকুমার অকপটে সকল কথারই উত্তর দিল।

অশ্রুকুমার কিয়ৎকাল তথায় উপবিষ্ট থাকিয়া মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উঠিয়া গেল।

রামতনু বাবু ও ডেপুটী বাবু অনেক তর্ক বিতর্ক করিলেন, প্রভাকরও তাহাতে যোগদান করিল। শেষে স্থির হইয়া গেল যে অশ্রুকুমারের সহিত সৌদামিনীর বিবাহ দেওয়া বাঞ্ছনীয়—কারণ উভয়েরই পিতা এই বিবাহ বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছিলেন। বয়সে রূপে, গুণে ও বিদ্যায়, সকল বিষয়েই অশ্রুকুমার সুপাত্র; কেবল সে দরিদ্র—তা অর্থোপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলে তার দরিদ্রতা থাকিবে না। আজই অশ্রুকুমারের মাতার নিকট ডেপুটি বাবু এই প্রস্তাব করিবেন। বোধ হয় তিনি সম্মত হইবেন,—না হইবার ত কোন কারণ নাই। শেষবার ধূমপান করিয়া রামতনু বাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ডেপুটী বাবু বাটীর মধ্যে যাইয়া অশ্রুকুমারের

মাতার কাছে প্রস্তাবটি করিলেন। তিনি সহজেই সম্মত হইলেন।

ইহা শুনিয়া সৌদামিনী অতি কষ্টে আপনার হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিয়া, তাহার দাদা মহাশয়ের নিকট যাইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে যাইয়া, ডেপুটী বাবুর চক্ষু দিয়া কয়েক ফোঁটা জল পড়িল। তাঁহার ভাব দেখিয়া সৌদামিনীও কাঁদিল। তাহার এই আনন্দের দিনে তাহার মা কোথায়? তাহার বাবা কোথায়? স্বর্গে বসিয়া, তাঁহারা কি আজ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন?

অশ্রুকুমারের মাতাও অশ্রুকুমারের প্রণত মস্তক আপন বক্ষের নিকট টানিয়া, তাহা নয়ন জলে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন। ভাবিলেন, আজ তাঁহার মৃত স্বামীর মৃত্যুকালের ইচ্ছা পূর্ণ হইল; আজ বাস্তবিকই অশ্রুকুমারের শুভ দিন। কিন্তু পুত্রের বিবাহে ব্যয় করিবার জন্য তাঁহার কিছু মাত্র অর্থ ছিল না। কিছুক্ষণ চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন যে, বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্ত দেশের বাড়ী বন্ধক রাখিয়া টাকা সংগ্রহ করিবেন।

মাতার নিকট হইতে বিদায় প্রাপ্ত হইয়া, অশ্রুকুমার নিভৃতে বসিয়া ভাবিল, ভগবানের আশীর্ব্বাদে এক দণ্ডের মধ্যে তাহার জীবনের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া গেল! এক দণ্ড পূর্ব্বে সে মোটর গাড়ীতে বসিয়া ভাবিয়াছিল যে সৌদামিনী পরস্ত্রী হইবে; সুতরাং সে তাহার মধুর চিত্র চিত্তমধ্যে গ্রহণ করিতে সাহসী হয় নাই। এখন সে চিত্র চিরদিনের জন্ত চিত্তপটে মুদ্রিত হইয়া রহিল।

পর দিন আহারের পর, অশ্রুকুমার মাতাকে ও শ্যামার মাকে লইয়া রঙ্গণঘাটে ফিরিল। মাতা সেখানে থাকিয়া পুত্রের বিবাহের জন্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া যথাবিহিত উদ্যোগ করিবেন।

অন্ত দেশে বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া যাইলেই ঔপন্তাসিকের সমস্ত কার্য্য শেষ হইয়া যায়। কিন্তু আমাদের এই মধুর বাঙ্গালা দেশে বিবাহের পরও ঔপন্যাসিকের অনেকটা কায বাকী থাকে। অন্ত দেশে বিবাহের পূর্ব্বেই প্রেমলীলার শেষ হইয়া যায়; অনেক সময় বিবাহান্তে প্রেমলীলার আর একটুও অবশিষ্ট থাকে না; বরং অন্ত লীলার অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়,—প্রেমরস বীভৎস রসে পরিণত হয়। আমাদের এই পুণ্য দেশে, ভগবানের কৃপায়, বিবাহের পরই বিচিত্র প্রেমলীলা আরম্ভ হইয়া থাকে। বিবাহের পরেই স্বামী-সেবায় রমণীর প্রেমলীলা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বিরাগে অনুরাগে, সন্দেহে, বিশ্বাসে, উহা শত শত বিচিত্র মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সংসারের সহস্র অভাবে, শত অভিযোগের ঘাত-প্রতিঘাতে উহা শত শত প্রেমমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া উঠে। নব বধূর মধুর সুপ্ত ভালবাসা সংসারের সহস্র কার্য্যে জাগিয়া উঠে। পানীয়ের শীতলতায়, খাদ্যদ্রব্যের মধুরতায়, শয্যার কোমলতায়, গৃহদ্রব্যের পরিচ্ছন্নতায় বঙ্গ-বধূর ভালবাসার সন্ধান পাওয়া যায়। অর্থ-রক্ষাকারিণীর অঞ্চল সংলগ্ন গুঞ্জিকার মধুর টুন্‌টুন্‌ গুঞ্জনে, তালবৃন্তবীজনরতার প্রকোষ্ঠ-বেষ্টিত কঙ্কণ গুচ্ছের ক্বণু ক্বণু রোলে, খাদ্য রন্ধন নিরতার তৈজসের মধুর শব্দে আমরা সেই ভালবাসার প্রথম সাড়া পাই। তাম্বুলরাগরক্ত সুধাপূর্ণ অধরের মধুর হাসিতে, আনত আননের গোপন কটাক্ষ বিক্ষেপে আমাদের কাছে সেই ভালবাসা প্রকটিত হইয়া উঠে। আমাদের এই পবিত্র ও প্রেমময় দেশে প্রেমের এই বিচিত্র লীলাগুলি সমস্তই বিবাহের পরেই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং এই বিবাহের পরক্ষণেই আমরা এই উপন্তাসের উপসংহার করিতে পারিব না। সৌদামিনীর ও অশ্রুকুমারের প্রেমলীলার ও সংসারলীলার কতকটা দৃশ্য পাঠককে না দেখাইয়া যদি আমরা আমাদের আখ্যায়িকা পরিসমাপ্ত করি, তাহা হইলে, উহা অসম্পূর্ণ থাকিবে।

তাহা ছাড়া এই গ্রন্থে উল্লিখিত অন্তান্ত নরনারীগণের কাহার কি হইল, সে সম্বন্ধেও আমার পাঠক পাঠিকাগণের কৌতূহল তৃপ্ত করিতে হইবে।

উপরিউক্ত সমস্ত বিষয় আমি আমার এই আখ্যায়িকার তৃতীয় ভাগে বিবৃত করিব। এই তৃতীয় ভাগের নামকরণ করিয়াছি "ধর্ম্ম"—কেননা ধর্ম্মই প্রেমের পূর্ণ পরিণতি। যথার্থ ভালবাসা মানুষকে ধর্ম্মের পথই দেখাইয়া দেয়। যে হীন ভালবাসায় বিধুভূষণ প্রভৃতির ন্যায়, মানুষকে কলুষিত করে, তাহা ভালবাসাও নহে, প্রেমও নহে—তাহা অত্যন্ত কলুষিত, অত্যন্ত অপবিত্র মনের অত্যন্ত হীন প্রবৃত্তি মাত্র। হে আমার যুবক পাঠকগণ! তোমরা যদি প্রেমের মর্য্যাদা রাখিতে চাও, তাহা হইলে কখনও ধর্ম্মের পবিত্র আশ্রয় ত্যাগ করিও না। যে উৎকৃষ্ট প্রেম আত্মবলিদান দিতে সমর্থ, তাহা কখনও ধর্ম্মের আশ্রয় ত্যাগ করে না।

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

মতভেদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমরা বলিয়াছি যে মত পরিবর্ত্তন না হইলে কোন সমাজের উন্নতি হইতে পারে না। একভাবে কোন মতই চিরদিন থাকে না, কারণ মানব মন চিরপরিবর্ত্তনশীল। যদি চিরদিন মত একভাবেই থাকিত তবে সমাজের উন্নতি সম্ভবপর হইত না। কিন্তু মত পরিবর্ত্তন মানবের প্রথমতঃ সহ্য হয় না। শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই মত পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারে না। এই হেতু প্রথমতঃ মতভেদ স্থলে অত্যাচার দ্বারা নবীন মতকে নষ্ট অথবা দমন করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু মত কখনও দমিত হইবার পদার্থ নহে। মত মনের কার্য্য এবং চিরপ্রচলিত প্রবাদ যুগযুগান্তর হইতে চলিয়া আসিতেছে—"হাত বাঁধবে, পা বাঁধবে, মন বাঁধবে কে?" অর্থাৎ মন কেহই বাঁধিতে পারে না। সুতরাং মত পরিবর্ত্তনও কেহই নিবারণ করিতে পারে না। এই নিমিত্তই কাল সহকারে ঐ পরিবর্ত্তিত মত হইতে পরিবর্ত্তিত আচরণ ও ব্যবহার উৎপন্ন হয়। যাহা হউক, মানব যখন শত অত্যাচারেও নবীন মতকে দমন করিতে সমর্থ হয় না, তখনও বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে, যেন মত পরিবর্ত্তিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে পরিবর্ত্তন হইয়া গেলেও মানব স্বয়ং একটি মিথ্যা জাল বুনিয়া তাহাতে আবদ্ধ হইতে ভালবাসে। সে মনে করে যেন পরিবর্ত্তন পরিবর্ত্তনই নহে; উহা প্রাচীন মতেরই অন্যবিধ মূর্ত্তি মাত্র, নবীন মত নহে। ডাক্তার স্লসন্ এই কথাটি পাশ্চাত্য সভ্যতার দিক হইতে বুঝাইয়াছেন। (১) নবীন মতের বিরুদ্ধে প্রাচীন মতাবলম্বিগণ যে ভাবে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতে উঠিতে ক্রমে তাহাকে গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই ভাবকে তিনি তিনটি স্তরে বিভাগ করিয়াছেন। প্রথম স্তরে, "প্রাচীন মতাবলম্বিগণ ঘোষণা করেন যে নবীন মতটি ভ্রান্ত।" দ্বিতীয় স্তরে, তাঁহারা বলেন যে "ঐ নবীন মতটি বস্তুত নবীন নহে; উহা সত্য হইলেও প্রাচীন সনাতন মতেরই বিকাশ মাত্র।" তৃতীয় স্তরে, তাঁহারা বুঝাইয়া ছেন যে "নবীন মত সত্য হইলেও উহাতে কিছু আসিয়া যায় না, উহাতে সমাজের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।" এই অবস্থায় সহিষ্ণুতা জাত হয়; পরিণামে নবীন মত ক্রমে গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে

---

(১) Easy Lessons in Einstein, by Edwin E. Slosson, M. s. Ph. D. (p. 103)

উৎপীড়ন প্রথম স্তর, সহিষ্ণুতা দ্বিতীয় স্তর, নবীন মত গ্রহণ তৃতীয় স্তর।

কিন্তু এই প্রকার স্তরভেদ ভারতবর্ষে প্রায় কোন কালেই দেখা যায় নাই। তমোগুণ ও রজোগুণ-প্রধান পাশ্চাত্য সমাজে এইরূপ স্তর বিভাগ সত্য হইতে পারে; কিন্তু সত্ত্বগুণ-প্রধান রজোগুণ এতদ্দেশের বিশিষ্টতা; সুতরাং এ ক্ষেত্রে ঐ প্রকার স্তরবিভাগ হওয়া সম্ভবপর নহে। এই সুসভ্য ও সাত্ত্বিক দেশে বিভিন্ন মত পরস্পরের সহিত "বিচার" করিয়াছে; যে মত বিচারে পরাস্ত হইয়াছে তাহার আদর ও সম্মান তখন হইতেই ক্রমে বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। অথবা বিভিন্ন মতের সমর্থনকারী ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গঠন করিয়া স্ব স্ব মত প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের উপর কখনও কঠোর আচরণ, কখনও নির্ম্মম ব্যবহারও করিয়া থাকিবেন, কিন্তু সাংঘাতিক অত্যাচার কখনও করেন নাই। এতদ্দেশে পাশাপাশি নানাবিধ মতভেদ যুগপৎ বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে আদর লাভ করিয়াছে। কালক্রমে যোগ্যতম মতের জয় অর্থাৎ বহুল প্রচার হইয়াছে; অন্য মত সকল লুপ্ত অথবা ক্ষুদ্র গণ্ডী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কোন ক্রমে আত্মরক্ষা করিয়াছে। ইহাই এতদ্দেশের সনাতন পদ্ধতি।

সভ্য সমাজে ও বর্ব্বর সমাজে প্রভেদ ইহাই। বর্ব্বর সমাজে হনন ও আঘাত দ্বারা বিরোধী মতকে দলন করা হয়। তদনন্তর কিঞ্চিৎ উন্নত অবস্থায় অবরোধ দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। অবশেষে ঐ সমাজে আরও উন্নত অবস্থায় আত্মবঞ্চনার দ্বারা মতসামঞ্জস্য কল্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু সভ্য সমাজে বিচার দ্বারা ভ্রান্ত মত পরিত্যক্ত হয়। তাহা হইলেও যে স্থলে স্বার্থ প্রবল থাকে সে স্থলে লোকে ভ্রান্তমতকেও আত্মবঞ্চনা দ্বারা পোষণ করিয়া থাকে। যে মত বিচারসহ নহে সে মত পোষণ করিবার নিমিত্ত সভ্য সমাজে "বিশ্বাস" নামে একটি স্বতন্ত্র ভাবের কল্পনা করা হয়। যেন বিশ্বাস আপনা হইতেই হয়; বিশ্বাসের যেন কোনই মূল থাকিবার প্রয়োজন নাই। এই অবস্থা মানবের প্রকৃতি হইতে জাত হয়। অনুকরণ মানবের মূল প্রকৃতি। বিশ্বাস অনুকরণেরই মানসিক বিকাশ। অনুকরণ কর্ম্মে প্রকাশলাভ করা যেরূপ স্বাভাবিক, মনোভাবে রক্ষিত হওয়াও তদ্রূপই। বিখ্যাত ডাক্তার ফেরে দেখাইয়াছেন যে অনুকরণ কর্ম্মে প্রকাশিত হইলে সুখ উৎপন্ন হয়। (২) জীব সুখই চায়। সুতরাং ক্রমে কর্ম্মে প্রকট হইতে হইতে অনুকরণ মনোমধ্যে ভাবরূপে স্থান প্রাপ্ত হয়। এস্থলে কর্ম্ম হইতে ভাব। কখনও বা অনুকরণ ভাবরূপে অর্থাৎ বিশ্বাসরূপেই সর্ব্বপ্রথমে আত্মপ্রকাশ করে। যাহাকে ভালবাসি, কিংবা ভক্তি করি, অথবা ভয় করি, সে যাহা বলে তাহাতে অবিচারে বিশ্বাস স্থাপন করা ইঁহারই অভিব্যক্তি। প্রথমে অনুকরণ দেহযন্ত্রের স্বতঃপ্রতিক্রিয়া (৩) মাত্র। যেমন কেহ হাই তুলিলে তাহা দেখিয়া অনেক সময় দর্শকেরও হাই উঠে। এইরূপ দৈহিক প্রতিক্রিয়ার সহিত মনোভাবের সংস্রব নাই। সে সংস্রব পরে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনই একের বিশ্বাস অপরে স্বতঃই গ্রহণ করে; বিচার বিবেচনার অপেক্ষা রাখে না। দেহযন্ত্র সকলের সমান নহে; সুতরাং যে সকল বিশ্বাস দৈহিক প্রতিক্রিয়া হইতে ক্রমে মনে প্রতিফলিত হয়, তাহা ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন, সম্প্রদায়-ভেদে বিভিন্ন, জাতি-ভেদেও বিভিন্ন হইতে পারে। এই হেতুবশতঃ যে সমস্ত মতভেদ হয়, তাহা অনিবার্য্য। তাহা কিছুতেই দলিত হইতে পারে না। ঈদৃশ মতভেদ সম্পূর্ণই মনোভাবে পরিণত। যে মতভেদ ভাব হইতে প্রথম জাত হয় তাহাকে ভাবজ মতভেদ বলিব। এ মতভেদ হত্যা

---

(২) Imitation is a biological phenomenon. The tendency to imitate is based upon an innate and constitutional inclination to find pleasure in reproducing the acts of others.—Evolution of the Sexual Instinc p. 4.

(৩) Reflex action.

দ্বারা ব্যতীত অন্য প্রকারে বিনষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু যে মতভেদ প্রধানতঃ বিচারবুদ্ধি হইতে জাত হয়, তাহা বিচার দ্বারাই নষ্ট হইতে পারে। তৎপরিবর্ত্তে পীড়ন দ্বারা ঈদৃশ মতভেদ নষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে পীড়ন হইতেই ভাবের উদ্রেক হয়। তখন ঐ বিরোধী মত ভাবজ মতের ন্যায় অদমনীয় হয়। এই হেতু পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে, কোন অত্যাচারী বিরোধী মতকে পীড়ন দ্বারা নষ্ট করিতে পারে নহে। অত্যাচারী স্বার্থান্ধ হইয়া পীড়ন অবলম্বন করে, কিন্তু অবশেষে নিজেই বিনষ্ট হয়; অথবা স্ব-মত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। উৎপীড়িতগণ অত্যাচার সহ্য করিয়া জীবিত থাকিতে পারিলেই অত্যাচারীর বিনাশ অথবা স্ব-মত পরিত্যাগ অবশ্যম্ভাবী।

বিচারবুদ্ধিজাত মতভেদ, বিচার দ্বারাই অপনেয়, পীড়ন দ্বারা নহে। এই বিধান অসভ্য (৩)সমাজের বোধগম্য হয় না; বর্ব্বর (৪)সমাজে কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইলেও স্বার্থবশতঃ গৃহীত হয় না। 'একমাত্র সভ্য সমাজেই ইহা সভ্য বলিয়া প্রতিভাত ও স্বীকৃত হয়।

ভাবজ মতভেদ অদমনীয়। ইহা নানাভাবে বিস্তৃত হইয়া যায়। মস্তিষ্ক যন্ত্রের কেন্দ্রগুলি বিবিধ তন্তু দ্বারা একে অপরের সহিত সংস্পৃষ্ট। সুতরাং ভাব হইতে সংস্রব-জনিত অপর ভাব সর্ব্বদাই জাত হইতেছে। একজনের রূপ মনে হইলে তাহার কণ্ঠস্বরও অনুভূত হইতে পারে। দৃষ্টি কেন্দ্র (৫) ও শব্দ কেন্দ্র (৬) পৃথক স্থানে অবস্থিত হইলেও তন্তু দ্বারা সংস্পৃষ্ট। ইহাকে ভাব সংস্রব (৭) বলে। এক্ষণে ইহা বুঝা যাইতেছে যে, যে ভাবজাত মতভেদ অদমনীয়, তাহার সংস্পৃষ্ট ভাব হইতে অন্য বিষয়ে মতভেদ হইলে তাহাও অদমনীয়। অনেক সময় ভাবজ মতভেদ এবং বিচারবুদ্ধি হইতে জাত মতভেদ পরস্পর জড়িত হইয়া যায়। তখন এই মিশ্র মতভেদও অদমনীয় হয়। একটি উদাহরণ দ্বারা এই কথা বিশদ করিবার চেষ্টা করিতেছি—কিন্তু আশা করি এই উদাহরণের কেহ কদর্থ করিবেন না। ভাবের উচ্ছ্বাসে কবি গাহিলেন—

চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান।

* * * *

ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়?

এই ভাব হইতে কেবলমাত্র অনুকরণ-বশেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার ইচ্ছা অথবা মত পোষণ করিতে পারে। তৎপরে যদি ক্ষুধার তাড়না, অকাল মৃত্যুর শোক-শেল, ব্যাধির যন্ত্রণা অর্থাভাবের দারুণ ক্লেশ, নানাবিধ লাঞ্ছনা এবং অপমান ইত্যাদি অনুভূত হইয়া ঐ ভাবজ ইচ্ছা অথবা মতের অনুকূলতা করে, তাহা হইলে এই সকল ভাব ঐ ভাবের সহিত যুক্ত হইয়া প্রবলতর হইয়া উঠে। তদনন্তর যদ্যপি বিচারবুদ্ধিও ইহা প্রতিপন্ন করে যে পরাধীনতা অথবা পরবশতা সমস্ত জীবরাজ্যেই অবসাদ, জড়ত্ব ও পরিণামে ধ্বংস উৎপন্ন করে, তখন ঐ অনুকরণমূলক স্বাধীন হইবার মত, বিচারজাত মতের সহিত যুক্ত হইয়া যে মিশ্র মত উৎপন্ন করে তাহাও অদমনীয় হয়। ব্যক্তির নাশ ব্যতীত সে মত নষ্ট হয় না; এবং ব্যক্তির নাশ হইলেও অনেক সময় দেখা যায় যে সে মত সেই আকারে কিংবা অন্য আকারে আত্মপ্রকাশ করে—কিছুতেই যেন ধ্বংস হয় না। শুধু বিচারজাত মত বিচার দ্বারা ভ্রান্ত প্রমাণিত হইলে বিনষ্ট হইতে পারে; কিন্তু ভাবজ মত অথবা বিচার এবং ভাবমিশ্রিত মত দমন করা যায় না। পীড়ন হইতে বিরোধী মত ভাবসঞ্চয় করে। সুতরাং পীড়ন হইতে বিরোধী মত (যদি প্রতিকূল ভাবজাত হয়) বিনষ্ট হইতে পারে না। যে অত্যন্ত ভীত, কাপুরুষ, সেও মত বিস্তারের ফলে বহুলোকের সঙ্গলাভ করিয়া সাহসী ও আশান্বিত হয়। সুতরাং ঈদৃশ স্থলে বহুজনের ভাবের এক-

---

(৩) Savage.

(৪) Barbarous.

(৫) Visual centre.

(৬) Auditory centre.

(৭) Association of ideas.

তাই বিরোধী মতকে প্রতিষ্ঠিত করে। একতাই মত বিস্তৃতির চিরসঙ্গী।

কিন্তু যদি কবি ঐ স্বাধীন হইবার ভাব না জাগাইতেন, ক্ষুধা ইত্যাদি অন্যান্য ভাব যদি সেই ভাবের অনুকূলতা না করিত, এবং বিচারবুদ্ধিও যদি ঐ ভাবজ মতের পোষক না হইত, তবে ঐ মত জাত হইত না—বিস্তৃতি ত দূরের কথা। সুতরাং একতা উৎপন্ন হইত না। তদ্রূপ ক্ষেত্রে ঈদৃশ মত জয়যুক্তও হইত না। একদিকে স্বাধীন হইবার মত, অন্য দিকে তাহার বিরোধী মত, এতদুভয়ের মধ্যে যে মত বিস্তৃতি লাভ করতঃ একতা উৎপন্ন করে তাহাই জয়যুক্ত হয়। সকল মত সম্বন্ধেই এই কথাই সত্য। এক মত বহুবিস্তৃতি লাভ করিলে বিরোধী মত ক্রমে সঙ্কীর্ণ ও অনাদৃত সুতরাং অপ্রচলিত হয়। কালসহকারে অধিকাংশ ব্যক্তি সে মতের কথাই ভুলিয়া যায়। যদি বা অত্যল্প সংখ্যক ব্যক্তি সমাজের এক কোণে বসিয়া সেই অপ্রচলিত মতকে পোষণ করে, তাহাতেও তৎকালে সমাজের উপর বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হয় না। সেই মত তৎকালে অনাদৃত এবং উপেক্ষিত হইয়াই পড়িয়া থাকে।

কিন্তু সত্যমেব জয়তে; ইহার উপর আর কথা নাই। উপেক্ষিত হউক, পদদলিত হউক, যদি সেই মত সত্য হয়, তবে তাহা কিছুতেই বিনষ্ট হইবে না। সে মত জয়যুক্ত হইবেই। কালসহকারে সে মত আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবেই। তখন পূর্ব্বের বহুবিস্তৃত মতই সমাজে অনাদৃত এবং পরিত্যক্ত হইবে। পূর্ব্বের সেই বহুবিস্তৃত মত সমাজকে এক পথে লইয়া যাইতেছিল, এখন তাহার বিরোধী মত জয়যুক্ত হইয়া সমাজকে অন্য পথে লইয়া চলিবে। সে মত সত্য হইলে এই অভিনব পথ মঙ্গলময় হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

যাঁহারা বিবর্ত্তন-বাদের আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিয়াছেন কেমন করিয়া প্রটোজোয়া হইতে ক্রমে উন্নত হইয়া মানবের আবির্ভাব হইয়াছে, কিরূপে মন, বুদ্ধি এবং অহংজ্ঞানের বিকাশ হইয়াছে, কিরূপে পরস্পর-নিরপেক্ষ জীব সমাজ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া নানাবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত হইতেছে। জীব বস্তুতঃ কোন পথে চলিয়াছে, তাহা আর বুঝিতে বাকী থাকে না। জীব কেন, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই একলক্ষ্য দৃষ্টিতে অনবরত কাল সেই পরম মঙ্গলময়ের চরণোদ্দেশে গমন করিতেছে। জগতের দৃষ্টি আর কোন দিকেই নাই, সেই একদিকেই জগতের দৃষ্টি আবদ্ধ। যাহা হইতে ব্যক্ত হইতেছে, আবার তাহারই মধ্যে ডুবিয়া অব্যক্ত হইতে চলিয়াছে। যে এই অনন্ত গতির বাধা দেয়, সে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না; কেবলমাত্র কিয়ৎকালের নিমিত্ত একটা উপদ্রব ও অশান্তি উৎপাদন করিবে; আর কিছুই তাহার সাধ্য হইবে না। দণ্ডনীয় হইলে সে-ই দণ্ডনীয়, অন্যে নহে।

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে কোন মতকেই পীড়ন দ্বারা নিরস্ত করিবার চেষ্টা করা সঙ্গত নহে; কারণ সেই মত কালক্রমে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া জগৎকে এক অভিনব মঙ্গলময় পথে লইয়া যাইতে পারে। এই সম্ভাবনা সকল মতেরই আছে। যখন পূর্ব্বে এই সম্ভাবনার পরিমাণ বুঝা যায় না, তখন যে অত্যাচারী বিরোধী মতকে উৎপীড়ন করে সে বর্ব্বর, সে স্বার্থপর, সে মানব সমাজের অপকারী। প্রতিদ্বন্দ্বী মত মধ্যে সেই মত জয়যুক্ত হয়, সেই মতই আত্মপ্রতিষ্ঠা করে, যে মত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমরা অন্ধ মানব, সত্য কি, সত্য কোথায় পূর্ব্বে তাহা কেমন করিয়া বুঝিব? সুতরাং কোন সাহসে প্রতিদ্বন্দ্বী মতকে পদদলিত করিব? যে ব্যক্তি জগতের মঙ্গল কামনা করে, সে কখনই অত্যাচার করিতে পারে না। হনন হউক, অবরোধ হউক সকলই তাহার সাধ্যাতীত।

কিন্তু যিনি এক, তিনিই বহু হইয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডে এক মূল অস্তিত্ব হইতেই নানাবিধ পদার্থের আবির্ভাব হইয়াছে। সেই মূল পদার্থ বস্তু কি অবস্তু,

তাহা বিজ্ঞান এখনই বুঝাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহা অবশ্যই প্রতিপন্ন হইতে চলিল। সেই এক অবস্থ হইতেই তথাকথিত জড় জীব সকলই জাত হইয়া নানা ভাবে স্বকর্ম্ম সাধন করিতেছে। এই বহুভাব এই বহুরূপ এই বহু শ্রেণীর ও প্রকারের বৈচিত্র্যময় পদার্থ ইহারা কেহই নিরর্থক নহে। ইহাদিগের সামঞ্জস্যেই পূর্ণ পরিণতি। যতক্ষণ পৃথক ততক্ষণ অপূর্ণ; ততক্ষণ "অন্ন" (৮) অন্নের সমষ্টিতে পূর্ণতা—ইহাই "ভুমা"।

মত সম্বন্ধেও এই কথাই সত্য; পৃথক পৃথক মত সকল পূর্ণ সত্যকে খণ্ডশঃ প্রকাশ করিতেছে; ইহাদিগের সামঞ্জস্যেই ইহাদিগের সমন্বয়েই সেই পূর্ণ সত্য প্রকট হয়। মানব সে সত্য জানে না। এই হেতু সে যে সময়ে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান প্রমাণ দ্বারা যাহা বুঝিতে পারে, তাহাকেই তৎকালের জন্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। বস্তুতঃ ইহার অধিক তাহার সাধ্যও নাই, সে পারেও না। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে সে ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সাময়িক সত্য বলিয়া যাহা বুঝিতে পারে তাহা পূর্ণ সত্যের একাংশ। সুতরাং তাহা তোমার প্রিয় হউক অপ্রিয় হউক, দলিত হইবার যোগ্য নহে। তাহাকে তাহার উপযোগী পুষ্টি লাভ করিতে দেওয়া আবশ্যক। যখন বিচার ভিন্ন মানবের সাময়িক সত্য বুঝিবার উপায় নাই, তখন বিভিন্ন মতাবলম্বিগণ বিচার দ্বারা স্বমতের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিবেন। তাহা হইলে কালে ভ্রান্ত মত পরিত্যক্ত হইবে এবং সত্য মত প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ইহাই প্রকৃত কথা। কিন্তু মতের প্রতিষ্ঠা অর্থে বহুজন কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়া বুঝায়। বহুজন ত এক প্রকৃতির নহে, এ নিমিত্ত সততই বিচার বিতর্কের সম্ভাবনা রহিয়াছে; নতুবা মতের প্রতিষ্ঠা হয় না। অপর দিকে ইহাও দেখিতে হইবে যে, নিয়ত বিচার বিতর্ক করিতে হইলে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। কিন্তু কর্ম্ম মানুষের সহজ বৃত্তি। কর্ম্ম সকল জীবেরই সহজ বৃত্তি। প্রটোজোয়া কর্ম্ম করে, পিপীলিকাও কর্ম্ম করে, মানবও কর্ম্ম করে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই সকল জীবই কর্ম্ম করে। পণ্ডিতবর লেব (Loeb) একথা বিশদ রূপেই বুঝাইয়াছেন। আমাদিগের ভগবদ্গীতাও এ কথা স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন। কর্ম্ম যদি সহজ বৃত্তি হইল এবং নিয়ত বিচার বিতর্ক দ্বারা কর্ম্ম যদি প্রতিহত হইল, তবে হতবুদ্ধি মানবের উপায় কি? সভ্য মানব কোন পথ অবলম্বন করিবে? সে ত বর্ব্বরের ন্যায় হত্যা অথবা পীড়ন করিতে পারে না। তাহাকে অন্য পন্থা অবলম্বন করিতেই হইবে। সে পন্থা মানব উদ্ভাবন করিয়াছে; কিন্তু সকল সময় অবলম্বন করে না। তাহা হইলেও আপৎকালে সেই পন্থাই অবস্থানুসারে প্রকৃত পন্থা।

দেশব্যাপী কর্ম্ম, বহুজন সাধ্য কর্ম্ম, যে কর্ম্ম মানব সমাজের অবস্থা এবং জাতি সম্পূর্ণ পৃথক পথে লইয়া যায়, সে কর্ম্মে বিচার বিতর্ক দ্বিধা সন্দেহ স্থান পাইতে পারে না। এই নিমিত্ত নেতার প্রয়োজন। আপৎকালে নেতার আদেশ বিনা বিচারেই গ্রহণীয়। কিন্তু নেতার নির্ব্বাচন অথবা নেতা বলিয়া গ্রহণ বিনা বিচারে হইতে পারে না। আপৎকালে বহুজন মিলিত হইয়া নেতা নির্ব্বাচন করিবার আবশ্যকতা অধিকাংশ স্থলেই হয় না। সেইরূপ সময়ে নেতা আপনা হইতে স্বপ্রকাশ হইয়া থাকেন। জনসমাজ তাঁহাকে নেতৃত্বে বরণ করিয়া লয়। নির্ব্বাচন অথবা বরণ উভয়ই বিনা বিচারে হইতে পারে না। যিনি চরিত্রবান, ধার্ম্মিক, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যিনি অতীতকালের ইতিহাস, বর্ত্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতের পরিণতি জানিতেছেন এবং বুঝিতেছেন, যিনি স্থিরলক্ষ্য এবং জনসমূহকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করতঃ স্বপথে পরিচালিত করিতে ক্ষমবান; যিনি স্বার্থশূন্য, ত্যাগী, যাঁহার প্রতি জনসমূহের শ্রদ্ধা আছে—বিশেষতঃ যিনি অনুরূপ কর্ম্মে বিশেষ কুশলতা পূর্ব্বেও প্রদর্শন করিয়াছেন, সেইরূপ মহদাশয় ব্যক্তিই দেশব্যাপী আপৎকালে নেতা হইবার যোগ্য। এইরূপে নেতা অথবা

---

(৮) বৈদান্তিক অর্থে বুঝিতে হইবে।

চালক মনোনীত অথবা স্বীকৃত হইলে পর তাঁহার আদেশ দ্বিধাশূন্য চিত্তে পালনীয়। কর্ম্মক্ষেত্রে জয়ী হইবার এই একমাত্র পন্থা। নেতা গুরু, তিনি পথ-প্রদর্শক, সুতরাং তাঁহার আজ্ঞা অবিচারণীয়া। জনসমাজের কল্যাণ সাধন পরম ধর্ম্ম। এ ধর্ম্মেও গুরুকরণ আবশ্যক, ইহাতেও সাধনা চাই। সে সাধনায় অধিকারী ভিন্ন অনধিকারীর সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। এ পথের গুরু মনোনীত অথবা স্বীকৃত হইলে তন্ময় হইয়া তাঁহারই পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে। ফলে মানুষের অধিকার নাই—তাহা শ্রীভগবানের হস্তে। মানুষের অধিকার কর্ম্মে। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" এই মহাবাক্য স্মরণ রাখিয়া অধিকারিগণ (কেবলমাত্র অধিকারিগণ অন্যে নহে) উল্লেখিত গুরুর আদেশ মত কর্ম্ম করিবেন, জীবন মরণের প্রতি লক্ষ্য করিবেন না, সহকর্ম্মীর সংখ্যা অল্প কি অধিক তৎপ্রতি লক্ষ্য করিবেন না; কারণ আজি যাহা অল্প, কালি তাহা অধিক হইবেই। কেবল গুরুনির্দ্দিষ্ট পথে অটল পাদক্ষেপে অগ্রসর হইবেন। এ পথে পরাজয় নাই, এ পথ সিদ্ধির পথ। ঈদৃশ সাধক, ঈদৃশ কর্ম্মী পরাজয়ের মধ্য দিয়াই সিদ্ধি লাভ করেন। একলক্ষ্য সাধনা সিদ্ধি আনিবেই, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত পাশ্চাত্য কর্ম্মিগণ যুদ্ধ বিগ্রহের ন্যায় অপকর্ম্ম সাধনকালেও এই বাক্যকে মূলমন্ত্র স্বরূপ গ্রহণ করে—

Theirs is not to reason why,
Theirs is but to do and die—

এই মন্ত্রকে স্মরণ করিয়া তাহারা অযোগ্য চালককেও জীবনপাত করতঃ অনুসরণ করিতেছে। উপরে যে সকল লক্ষণ দ্বারা গুরুনির্দ্দেশ করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহার কোন লক্ষণই নাই, অথবা অধিকাংশ লক্ষণই নাই; বরং ইন্দ্রিয়পরায়ণ, দুরাচার, স্বার্থপূর্ণ, পরস্বাপহারী, আততায়ী—ঈদৃশ ব্যক্তিকেও চালক অঙ্গীকার করিয়া অনুন্নত সমাজের জনসমূহ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম এবং আদেশ বিনা বিচারে পালন করিয়া যাইতেছে। হউক কুকর্ম্ম, হউক অযোগ্য নেতা, তাহাতে কিছু আসে যায় না। সাধন প্রণালী একই—বিনা বিচারে, দ্বৈধশূন্য মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কালব্যাপী চেষ্টা দ্বারা চালকের আজ্ঞা পালন করা। প্রণালী ইহা ভিন্ন অন্য নাই। তবে, সাধ্য কর্ম্ম অপকর্ম্ম হইলে তাহাতে সিদ্ধি লাভ অকল্যাণকর এবং পাপজনক; পক্ষান্তরে সাধ্য কর্ম্ম সুকর্ম্ম হইলে, উহা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহাতে সিদ্ধিলাভ জগতের মঙ্গলজনক হয়। এতদুভয়ে ইহাই প্রভেদ।

দ্বিধাশূন্য হইতে গেলেই বিরোধী মতকে গুরুর আদেশ দ্বারা পরাস্ত করিতে হয়। আদেশ দ্বারা, অর্থাৎ বিতর্ক বিতণ্ডা দ্বারা নহে। যে মুহূর্ত্তে বিরোধী মত পরাস্ত হইল, অথবা উপেক্ষিত হইল, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই গুরুকরণ দ্বারা মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার এবং কর্ম্মে একাগ্রতার আবির্ভাব হওয়া চাই। সিদ্ধি ইহারই পরিণাম ফল।

ক্রমশঃ

শ্রীশশধর রায়।

সেবার মূল্য

(গল্প)

রূপ? না, রং আমার দুধে আলতা ত নয়ই; তবে সামান্য একটু কটা হইলে যদি তাহাকে সৌন্দর্য্য বলা যায়, তাহা হইলে আমি সুন্দরী। কিন্তু, লোকের মুখে এই রূপের সুখ্যাতি ধরিত না। কেহ বলিতেন, আমার চোখ দুটী বেশ ডাগর, নাক নিখুঁৎ, কপাল খানি ছোট, ঠোঁট দুটী সুন্দর। কেহ বলিতেন আমার মত এমন দেহের গড়নটী খুব কমই দেখা যায়! আবার কেহ বলিতেন, আমার সারা দেহখানি লাবণ্যে ভরা! বাবা দেশে দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়াইতেন, তাঁর বন্ধুরা আমায় দেখিলেই ঐ সব বলিয়া আমার অনর্গল সুখ্যাতি করিয়া যাইতেন। বাবা শুধু মুখ টিপিয়া হাসিতেন।

কিন্তু এই রূপের মর্য্যাদা কি শুনিবে? একটা হাঁসপাতালের নাস গিরি। খ্রীষ্টান হই আর যাই হই, আমি বাঙ্গালীর মেয়ে। তাই বোধ হয় বাঙ্গালীর মেয়ের কুসংস্কারটুকুও আমার মন একেবারে বিসর্জ্জন দিতে পারে নাই। তাই এখনও সময়ে সময়ে আমার বুকের ভিতরটা গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠে যে, এই রূপের পসরা আমি কোনও দেবতাকে পূজার অর্ঘ্য সাজাইয়া দিতে পারিলাম না। আমার এই এত প্রকাণ্ড পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন মানুষ কি নাই, যে আদর করিয়া আমার এই অর্ঘ্যটুকু তুলিয়া লইতে পারে?

নাই কেন? আছে ত অনেকেই! কিন্তু দেওয়ারও যে একটা তৃপ্তি আছে, সে তৃপ্তি আমি পাই কই? বাবার মৃত্যুর পর অসহায় নিরাশ্রয় অবস্থায় যখন ছ'টা মাস এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, তখন কতজন আসিয়াছে—পথের মাঝে কতজন কৃতাঞ্জলি হইয়া আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু তারা সত্য কি আমায় চাহিয়াছিল? না, তারা চাহিয়াছিল আমার মুখের হাসি, আমার যৌবন-উচ্ছ্বাসিত দেহখানা! প্রকৃত রূপ ত তারা চাহে নাই। নহিলে কেন তাদের কাতর প্রার্থনা শুনিয়া আমার হৃদয়ের পিপাসাটুকু আরও প্রবল হইয়া না উঠিয়া, ক্রমশঃই ভিতরে লুকাইয়া পড়িত?

মোটের উপর আমি হাঁসপাতালে মন্দ ছিলাম না। হাঁসপাতালে রকমারি রোগীর জন্য অবিশ্রাম সেবা করিয়া যাইতাম। আর কিছু না হউক, এই সেবার আনন্দটুকু আমার তৃষিত নারী হৃদয়ের অন্তত; একটা বৃত্তি পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। কতদিন কত ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের শিয়রের কাছটিতে বসিয়া, কখনও কোলের উপর তাদের মাথাটী তুলিয়া নিয়া তাদের জননীর স্থান দখল করিতে হইত। কখনও কত বয়স্ক নর-নারীর ছেলেমেয়ের ছদ্মবেশ ধরিয়া তাহাদের রোগযন্ত্রণায় সান্ত্বনা দিতে হইত। এমনি অসংখ্য পীড়িতের মন জোগাইতে সময়ে সময়ে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও; প্রথম ছ'টা মাস কিন্তু নিতান্ত মন্দ কাটে নাই।

২

সেদিন রাত্রে আমরা ক'জন একটা ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময় বাহিরে কিসের একটা গোলমাল হইল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বিদ্যুৎ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। উঠিয়া গিয়া দেখি একজন নূতন রোগী আসিয়াছে। রাস্তায় মোটর গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। লোকটা তখনও অজ্ঞান। সেই অবস্থায় তাহাকে আনিয়া শোয়ান হইল। ডাক্তার সেইখানে হাজীর ছিলেন; আমায় ডাকিয়া বলিলেন, "মিস রায়, আজ রাত্তিরটা তুমি এইখানে থাক। তোমার জায়গায় আমি অপরকে পাঠাচ্ছি।"

এই ডাক্তারের দয়ায় আমি এখানে এই চাকরীটি

পাইয়াছি। কি জানি কেন সব নার্সদের মধ্যে তিনি আমাকেই সব চেয়ে পছন্দ করেন। বলেন, নার্সদের যা-যা গুণ থাকা দরকার, সবই নাকি আমাতে আছে। কিন্তু এ সুখ্যাতি ত আমি সুখ্যাতি বলিয়া ভাবিতে পারিতাম না। মনে হইত এই নার্সগিরি ছাড়া কি আর আমার কোন যোগ্যতাই নাই ?

প্রকাণ্ড হলের ভিতর নানা রকমের রোগী। অনেকেই ঘুমাইতেছে। যারা নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাদের ঘুমও নাই, থাকিয়া থাকিয়া কেবল কাতর যন্ত্রণাধ্বনি করিয়া উঠিতেছে। আমি এক-একবার তাদের কাছে গিয়া বসিতেছি। আমায় দেখিয়া কেহ আপনা আপনি চুপ করিতেছে ; কেহ আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিতেছে—"মেম সাহেব, আমি ভাল হব ত ?" আমি তাদের মনের মত কথাগুলি বলিয়া আশ্বাস দিয়া আবার নিজের জায়গাটিতে আসিয়া বসিতেছি।

একপ্রান্তে একটি খাটের উপর সেই নূতন রোগীটি অচেতন অবস্থায় পড়িয়া। একবার আমি তার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তখনও তাহার চেতনার কোন লক্ষণই নাই। আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই বিবর্ণ মুখখানার পানে চাহিয়া রহিলাম। যৌবনের পূর্ণ-জ্যোতিঃ যেন সেই ম্লানিমার নীচে হইতেও ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। হঠাৎ একবার মনে হইল, পুরুষকে এত সুন্দর আমি আজপর্য্যন্ত কখনও দেখি নাই। সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা করুণায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু সেই প্রথম দর্শনে আমার মনের ভাবটা ঠিক কি রকম হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা এখন খুবই কঠিন, কেন না পরের ঘটনাগুলার সঙ্গে সেটা এমন দুশ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে যে, আজ আবার নূতন করিয়া তাকে পৃথক করিয়া লওয়া আমার পক্ষে বুঝি একেবারেই অসম্ভব।

একটু পায়চারী করিয়া আমি আবার আসিয়া তার বিছানার একধারে বসিলাম। হঠাৎ মনে হইল, চোখের পাতাদুটি তার একবার কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ঠোঁট দুখানা একবার একটু নড়িয়া উঠিয়াই থামিয়া গেল। কাছেই দুধ ছিল। আমি এক চামচে দুধ লইয়া তার ঠোঁটের মাঝে ঢালিয়া দিলাম। সেটুকু গিলিয়া ফেলিতে, আমি আরও দু'চামচে তেমনি করিয়া খাওয়াইয়া দিলাম। ধীরে ধীরে তখন চোখের পাতা-দুটি খুলিয়া সে সর্ব্বপ্রথম আমার মুখের পানে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল। আমি আবার দুধ দিতে, ক্ষীণ জড়িতস্বরে বলিল, "কার বাড়ী এ ?"

আমি তার কপালে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলাম, "বাড়ী নয় বাবু, এ হাঁসপাতাল।"

সে একবার এদিক ওদিক দেখিয়া বলিল, "ওঃ!—তোমার নাম কি ?"

বলিলাম, "আমি একজন নার্স।" কিন্তু নাম না বলায় যেন তাহাকে একটু ক্ষুণ্ণ বলিয়া মনে হইল। যেন আমার নাম শুনিবার প্রত্যাশাতেই সে আমার মুখের পানে ক্যাল ক্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। আমি বলিলাম, "আমার নাম বেলা। মিস্ বেলা রায়।" সে তখন একবার চোখদুটী মুদিয়া আপনার মনেই বলিল, "বেলা—বেলা"— পরে আবার আমার পানে চাহিয়া বলিল, "আর একটু দুধ দেবে আমায় ? বড় খিদে—"

আবার দুধ দিলাম। বিশেষ তৃপ্তির সহিতেই যেন সে সেই দুধটুকু পান করিলেন। ধীরে ধীরে সে আবার ঘুমাইয়া পড়িল। আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া তার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলাম।

পর দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ডিউটিতে আসিয়া শুনিলাম, সকালে ডাক্তার আসিয়া বাবুটীর পা দেখিয়া বলিয়া গেছেন যে অস্ত্র ভিন্ন এ পা ভাল হইবে না। কাল ভোরে অপারেশন হইবে। আমি বরাবর তাহাকে দেখিতে গেলাম। সে তখন নিদ্রিত। নলিনী আমায় ডাকিয়া বলিল, "সকাল হতে বাবুটী কেবল তোমাকে খুঁজচেন। নাম বল্লে কে ?"

আমার প্রথম কেমন বড় লজ্জা হইল। পরে বলিলাম, "আমিই।" নলিনী একবার একটু মুচকি হাসিয়া, হেলিতে দুলিতে চলিয়া গেল।

কাছে গিয়া বসিতেই সে দুচোখ মেলিয়া একটা প্রবল নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কে, বেলা? আঃ বাঁচলুম।"

আমি একটু লজ্জিত হইয়া গিয়া বলিলাম, "কেন?"

"সকাল হতে তোমায় না দেখে আমি ভেবেছিলুম, তুমি বুঝি আর আসবে না।" একটু বিস্মিত হইলাম। কাল আমি এমন কি করিয়াছিলাম যে সে আমার জন্য এত উতলা হইয়াছিল! বলিলাম, "কেন বাবু, নলিনী তো ছিল!"

সে যেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, "তা ছিল। কিন্তু তুমি বেশ—বেশ! তুমি আমার কাছটিতে থেকো!"

এরকম কথা যে আমি ইহার আগে না শুনিয়াছি এমন নয়। কিন্তু এবার যেন কেমন একটা লজ্জায় আমার কাণ পর্য্যন্ত গরম হইয়া উঠিল। অপর কথা পাড়িয়া বলিলাম, "কেমন আছেন এখন?"

সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "ভাল নয় বেলা, ভাল নয়। কাল অপারেশন করবে। হয়ত এইখানেই শেষ হতে হবে। দেখ, যদি শেষ হয়ে যাই, আর বাড়ীর কেউ কোন খবরই না পায়!"

"কোথা আপনার বাড়ী?"

"সে অনেক দূর। পাটনার ওধারে আমাদের জমীদারী। এ খবর তারা কেউ জানে না। যদি বেঁচে যাই—বাঁচবো না বেলা?"

আমি তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলাম, "বাঁচবেন বৈ কি। তবু একখানা তার করে দিলে হত যে এই দুর্ঘটনা হয়েচে, বিশেষ ভয় নেই।"

সে হতাশভাবে বলিল, "কে করে দেবে?"

"বলেন ত আমিই সব ঠিক করে দিই!" তিনি আমার মুখের উপর তার দৃষ্টিটুকু তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "তুমি? তুমি আমার জন্যে এত করবে?"

ফিরিয়া আসিয়া বসিতেই সে হঠাৎ আমার একটা হাত টানিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, "বেলা! তোমার কথা আমি কখনো ভুলতে পারব না! তুমি না থাকলে আমার কি হত আজ!"

"উত্তর দিতে গিয়া আমার গলাটা কেমন একটু কাঁপিয়া উঠিল। বলিলাম, "আমাদের সকলেরই ত এই কায বাবু!"

সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না তা হোক। তবু, এমনটি কেউই করে না। তুমি বেশ—বেশ!" হঠাৎ আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "কি বেশ বাবু?"

"সব—সব! তুমি বেশ দেখতে, বেশ মিষ্টি তোমার কথাগুলি! তোমায় আমার ভারী ভাল লাগে!"

বুকের ভিতরটা যেন কেমন একবার উদ্বেল হইয়া উঠিল। কথা কয়টা যেন তাহার হৃদয় হইতে বাহির হইয়া আমার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত চলিয়া গেল। এই আঠারো বৎসরের মধ্যে একটা দিনও কখনও যে তৃপ্তিসুখ অনুভব করি নাই, আজ এই অপরিচিত রোগীর কথায় যেন তা আমি পূর্ণমাত্রায় অনুভব করিলাম। প্রকৃতিস্থ হইতে আমার একটু সময় লাগিল।

বেলা চারিটা হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত সেদিন আমার ছুটী ছিল। কিন্তু আমি তার জন্য সেখান হইতে নড়িতে পারিলাম না। শুধু সন্ধ্যার আগে বাহিরে ফাঁকা হাওয়ায় একটু বেড়াইয়া আসিয়া তার খাটের পাশে একখানি চেয়ারে বসিয়া বই পড়িতে লাগিলাম। ঘুম হইতে চোখ খুলিয়াই সে ডাকিল, "বেলা!"

আমি কাছে আসিতেই সে একটুখানি হাসিয়া বলিল, "বাঃ আজ তো বেশ লক্ষীটি! আজ তো একটিবারও সরে যাও নি? ওটা কি?"

"একখানা ম্যাগাজিন। শুনবেন?" তার মুখখানি হর্ষোজ্জ্বল হইয়া উঠিল।—"পড়বে? পড়না একটু! ভারী লক্ষী তুমি!"

তার এই আদরটুকুতে আমার মাথাটা অনেকখানি নুইয়া পড়িয়াছিল।

৩

অপারেশনটা ভালয় ভালয় শেষ হইয়া যাইতে

আমি যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। কিন্তু ক্লোরোফরমের ঘোরটুকু কাটিতে তার অনেকক্ষণ সময় লাগিল। তার পর যখন ধীরে ধীরে সে চোখ খুলিল, তখন আমি তাহার কাছে বসিয়া। আমার মুখের পানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, "কে ?" আমি তার মুখে একটুখানি stimulant ঢালিয়া দিয়া, আমার নাম বলিলাম। সে খানিকক্ষণ তেমনি চাহিয়া থাকিয়া, তার পর যেন আমার কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, "ওঃ বেলা ! বেলা ! আমি ত আর আর বাঁচবো না !"

সেই হতাশ করুণ কণ্ঠস্বরটুকু শুনিয়া হয়ত সকলেরই একটু আধটু দয়া হইত, কিন্তু আমার যেন বুকখানা একেবারে দমিয়া যাইবার মত হইল। দুটি চোখ ভরিয়া তারই নীরব ব্যথাটা তরল হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে যেন আমি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গেলাম যে সে একটা অজানা রোগী মাত্র—আর আমি একটা হাসপাতালের নার্স। আমার মনে হইল—কি মনে হইয়াছিল, সে কথা এখন আর মুখ ফুটিয়া বলা যায় না ; সে তরুণ উষালোক আজ এক চিরন্তন অমানিশায় ঢাকিয়া জন্মের মত নিবিয়া গিয়াছে।

তাড়াতাড়ি এ পোড়া চোখ দুটাকে রগড়াইয়া নিয়া কি বলিতে গেলাম, কিন্তু শুধু দু তিনটা ঢোক গিলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। সে বলিল, "কি, কথা কচ্ছনা কেন বেলা ? তা হলে সত্যিই কি আমি বাঁচব না ?"

আমি চমকিয়া উঠিলাম। "সে কি ! বাঁচবেন না কেন ? ভাল হয়েই ত গেছেন !"

সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "উঁহু, ভাল হইনি বেলা ! দেখ, যদি আমি না বাঁচি, তাহলে আমার লাসখানা যেন মুদ্দরফরাসে টেনে নিয়ে না যায় ! শেষ কাযটুকু তুমিই আমার করে দিও।" পরে হঠাৎ একবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বেলা ! সংসারে আমার নিজের বলতে কেউ নেই। তুমিই এখন আমার সব। তুমি আমার বড় আপনার !"

দুচোখের অশ্রু আমার গাল গড়াইয়া পড়িল। কোন রকমে ইঙ্গিতে তাহাকে কথা কহিতে বারণ করাতে সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না বেলা, একটু আমায় কথা কইতে দাও। তুমি আমার কাছটীতে বস। ভাল করে একবার তোমায় দেখি, বেলা ! তুমি বড় সুন্দর !" বলিতে বলিতে সে হঠাৎ আমার একটা হাত টানিয়া লইয়া নিজের বুকের উপর খুব জোরে চাপিয়া ধরিল। আমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সমস্ত রক্ত যেন কিসের একটা উত্তাপে টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। কোন কথা কহিতে পারিলাম না। শুধু বিহ্বলের মত তার মুখের পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হয়ত আমার মাথাটা একবার তার বুকের কাছেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, ঠিক জানিতে পারি নাই।

সে বলিল, "বেলা, যদি কখনো সেরে উঠি, তাহলে দেখাব আমি তোমায় কত ভালবাসি !"

সমস্ত হলের মধ্যে অপর সকল রোগী নিস্তব্ধ হইয়া ঘুমাইতেছিল ; শুধু এই এক কোণে আমরা দুটিতে জাগিয়া। অদূরেই উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল, কিন্তু তার দুই চোখে আমি তখন যে ভাবটুকু দেখিয়াছিলাম সে যেন তার চেয়েও ঢের বেশী উজ্জ্বল—ঢের বেশী মধুর ! সে দৃষ্টির সামনে আমার সমস্ত শরীরখানা যেন ক্রমশঃ অবশ হইয়া পড়িতেছিল। সেই একটা মুহূর্ত্তেই যেন আমার সমস্ত নারী জন্মটাকে একটা কৃতার্থতার পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল। কেমন করিয়া হঠাৎ আমার মনে হইল আমার বুকের সেই শূন্য ভগ্ন মন্দিরখানি জুড়িয়া কোথা হইতে হিন্দু মেয়েদের দেবারতির শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে।

সে তখনও আমার সেই হাতখানি বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "বল, তুমি আমায় ভালবাসবে বেলা ! যদি কখনও সেরে উঠি—তুমি আমার হবে ?"

আর আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। চির-পিপাসিতার কাছে এ যে তার বাঞ্ছিত সুধার নির্ঝর। আমার বুকের সমস্ত আনন্দাবেগ অশ্রু হইয়া তার বুকের ওপর নামিয়া পড়িল। আত্মহারা হইয়া একেবারে তার বুকের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি বলিতে

গেলাম, হঠাৎ দুহাতে সে আমার মাথাটা জড়াইয়া নিয়া একেবারে তার মুখের উপর চাপিয়া ধরিল। চেতনা আমার তখন হয়ত একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল—হয়ত বা হয় নাই—কিন্তু যেন একটা স্বপ্নের ভিতর দিয়া আমার মনে হইল কে যেন হঠাৎ আমায় এক পবিত্র স্নিগ্ধ ধারায় স্নান করাইয়া দিল, তারই সুগন্ধটুকু আমার গায়ে লাগিল—যেন আমার যাত্রার সমস্ত পথখানা ফুলময় করিয়া তুলিল!

চমক ভাঙ্গিয়া গেল, পিছন হইতে কে ডাকিল "মিস রায়!" ফিরিয়া দেখি, হলের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া নলিনী।

ধীরে ধীরে তার বাহুবন্ধন ছাড়াইয়া লইয়া বলিলাম, "আমি এখনি আসছি।" সঙ্গে সঙ্গে একটা অতি গভীর লজ্জায় আমার সমস্ত শরীর এমন শিহরিয়া উঠিতে লাগিল যে, মনে হইল হয়ত বা সেইখানেই আমি আছাড় খাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি।

নলিনী মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল। বলিল, "আমায় আজকে ছুটী দিচ্ছ নাকি বেলা।" তাই ত, এবার যে নলিনীর ডিউটি। আমি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, "না নলিনী, ছুটী একেবারে দিতে পারব না। কিন্তু উনি না ঘুমুলে ত আমি উঠতে পাচ্ছি না।"

"তা বেশ। আমি তাহলে একটু বিশ্রাম নিতে পারি?"

"নিশ্চয়। ঘুমুলেই আমি তোমায় ডেকে পাঠাব।" নলিনী তার রুমালটা দিয়া মুখখানা মুছিয়া বলিল, "তাহলে এখন আর আমি মিছে বিরক্ত করবোনা! এন্‌গেজ্‌মেণ্টটা কি এই রোগশয্যাতেই সুরু হয়ে গেল?"

তার ঠাট্টায় আবার দুচোখ ভরিয়া জল আসিয়াপড়িল। সে বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি মুস্কিল! এ যে দেখ্‌চি, তুমিও ফাঁদে পা দিয়েছ? আমি ভেবেছিলুম, তুমি শুধু অভিনয়ই করে যাচ্ছ;—না নয়?"

কোন কথাই আমার মুখে আসিল না। নলিনী বলিল, "তা যাই হোক্! আমরা সকলেই এতে সুখী! আর, এই বোধ হয় তোমার first love kiss? একজন বাঙ্গালী কবি এ বিষয়ে ভারি সুন্দর লিখেছেন, পড়েছ?—'প্রথম প্রণয় কথা—প্রথম চুম্বন"—বলিয়াই সে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

সর্ব্বশরীর আমার একবার থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। নিজের অস্পষ্ট স্মৃতিকে যেন ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। নলিনীর মুখের উপর তাকাইয়া বলিলাম, "কি বলছ নলিনী?" সে আমার গালে একটা ঠোনা মারিয়া বলিয়া উঠিল, "বুঝতে পাচ্ছ না? একেবারে আত্মহারা হয়ে ছিলে বুঝি? যাহোক্, আর তোমাদের পবিত্র সময়টুকু নষ্ট করব না আমি।"

আমি খানিকক্ষণ পাথরের মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

পরের দিনেই বেশ বুঝিতে পারিলাম, সমস্ত নার্সমহলে আমার কথা লইয়া একটা হাসাহাসি-কাণাকাণি চলিতেছে। কিন্তু, সে সব দিকে কাণ দিবার আমার তখন ফুরসৎ ছিল না, একটা অনির্ব্বচনীয় পূর্ণতার ভারে আমার হৃদয় তখন টন্‌টন্ করিতেছে। তাছাড়া সকাল হইতে তাঁর আবার ভয়ানক জ্বর আসিয়াছে; আমার একটু নড়িবার চড়িবার যোটী পর্য্যন্ত নাই। শুধু তাঁরই পাশটিতে বসিয়া আমি দিনরাত কায করিয়া চলিয়াছি। এ কাযের বিরাম নাই। কখন্ তিনি অধীর হইয়া একটু জল চাহিয়া পাইবেন না, কখন হয়ত পায়ের যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়িবেন, কখন আবার তাঁর বেদনাক্লিষ্ট চোখদুটী মেলিয়া হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া ডাকিবেন, "বেলা!" একটু তফাৎ হইলে কি আমার চলে? বাহিরে সারা বিশ্বজগৎ কেমন করিয়া চলিয়াছে, সমস্ত হাঁসপাতালের ছোট বড় লোকগুলা আমায় দেখিয়া কি মনে করিতেছে, সে সব ভাবিবার ত আমার অবকাশ ছিল না! কেমন করিয়াই বা থাকিবে বল? জীবন মরণের দ্বন্দ্বযুদ্ধের মাঝখানে যাহাকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইয়াছে, হ্যাঁগা, তার কি আর পিছন ফিরিবার কোন শক্তি থাকে?

না থাক। তোমরা হয়ত ভাবিবে আমি আমার সেবা করার গর্ব্ব করিতেছি। কিন্তু হায়, গর্ব্ব করিবার আমার কি আছে? যা আমি জীবনে কখনও পাই নাই —পাইব না,—তাই যে আমি তাহার কাছে পাইয়াছিলাম। তার বিনিময়ে দিবার মত আমার কি ছিল—কি আছে?

৪

আটদিনের পর তিনি বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। পা অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া আসিল। আমি একটা প্রবল আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। কিন্তু রোগের মধ্যে আমি যে মানুষটাকে পাইয়াছিলাম, হঠাৎ এক সময় চমক ছুটিয়া যাইতে দেখিলাম, সে মানুষটা যেন কেমন করিয়া আমার বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে। সেখান হইতে আমি তাহাকে দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু যেন দুষ্ট ছেলেটির মত সে আর সহজে ধরা দিতে চাহিতেছে না।

সেদিন বিকালের মিষ্ট হাওয়া তখন গাছের শিরের শেষ সোণালীটুকু আস্তে আস্তে কাঁপাইয়া তুলিতেছিল, ঘন নীল পাতার ঝোঁপের ভিতর হইতে এক ঝাঁক পাখীর শব্দটা কাণে আসিয়া লাগিতেছিল।—তিনি সেই দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে বলিলেন, "আজ কতদিন পরে, বেলা, ঐ পাখীর গানে আমার বাড়ীর কথা মনে পড়ছে। সেখানে রোজ এমনি সময়টিতে এমনি পাখীদের কমিটি বসে যায়। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলে মানুষটির মত তাই শুনতুম।"

একটুখানি স্বচ্ছ হাসি তাঁহার শুষ্ক ওষ্ঠ দুটি সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল। আমি শুধু তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। তিনি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "ডাক্তার বলেছেন, আর দুদিন বাদে আমি আমার যাবার ছুটী পেতে পারি। কিন্তু একদিকে বাড়ী ফিরে যাবার যেমন আনন্দ, তেমনি আবার তোমায় ছেড়ে যাবার কষ্টটুকুও ত আমি সহজে ভুলতে পারছি না বেলা! কি আশ্চর্য্য দেখ! এই ক'টা দিনেই তোমার উপর যে এতটা মায়া বসে' যাবে, তা কে ভেবেছিল?"

আমি একটুখানি মুচকি হাসিলাম। কিন্তু সে শুধু কান্না আসিল না বলিয়াই হাসিলাম। নহিলে বুকের নীচে আমার যে আকুলতা ফুলিয়া উঠিতেছিল, তাহাতে কি মানুষের মুখে হাসি আসে?

তিনি বলিলেন, "তাই আমার মনে হয় বেলা, আমার পরমায়ু এখনও শেষ হয়নি বলেই, তোমার মত একটী দেবকন্যাকে ভগবান্ আমার কাছটিতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। একথা আমার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত মনে থাকবে।"

মনে থাকবে—বেশ কথা! হঠাৎ কি কতকগুলা শক্ত কথা আমার ঠোটের আগে আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু চাপিয়া গিয়া মাথা নামাইয়া শুধু বলিলাম, "সে আমার সৌভাগ্য বলিয়াই।" একবার চোখ তুলিয়া দেখিলাম,—মুখখানা তাঁর কেমন একটু অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর হইয়া আসিয়াছে। তিনি তেমনি ভাবে অনেকক্ষণ দূর আকাশের পানে চাহিয়া থাকিয়া, হঠাৎ আমার পানে ফিরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বল বেলা! তুমি কি চাও? আমার কাছে চাইতে লজ্জা করো না!"

আমার দেহের সমস্ত রক্তটা যেন বুকের নীচে লাফাইয়া উঠিল। লজ্জা! চাহিতে লজ্জা করিব না? কিন্তু কি আমি চাই? চাইবার ত আমার কিছুই ছিল না। না না, ছিল। কিন্তু সে চাওয়া ত মুখের কথায় ফুটে না। সে চাওয়া যে বুকের প্রতি শোণিত-বিন্দুতে আঁকা।

কথাটা যেন আমার বুকে একটা বিদ্রূপের মত বাজিল। সেই মুহূর্ত্তেই হয়ত আমার সমস্ত দুর্ব্বলতা নিতান্ত নগ্নভাবেই তাঁর সামনে ধরা পড়িয়া যাইত। কিন্তু হঠাৎ ডাক্তারবাবু আসিয়া পড়িতে আমি পাশ কাটাইয়া পলাইয়া বাঁচিলাম।

আরও দুদিন তিনি সেখানে রহিলেন। কিন্তু তাহার ভিতর যতবার আমাদের দেখা হইয়াছে,

সামান্য দুচারটী কথা ছাড়া তিনিও কিছু বলেন নাই—আমিও না। মাঝে মাঝে আমার মনে হইত একবার আমার বুকের রুদ্ধ দুয়ারটা খুলিয়া ফেলিয়া ঐ পাষাণকে তার নিজের কীর্ত্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিই! দেখি তখন কেমন করিয়া কি ছলে ও আমায় পায়ে ঠেলিয়া পলাইয়া যাইতে পারে। কিন্তু আবার অভিমানের অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া ভাবিতাম,—এ ত তাঁর দোষ নয়। আমার মত একটা পথের কাঙ্গালী ঐ দেবমন্দিরে গিয়া কিসের স্পর্দ্ধায় দাঁড়াইবে?

৫

প্রভাতের আকাশখানা পাংশু বর্ণ মেঘে ডুবিয়া গিয়া বড় বিশ্রী হইয়া উঠিয়াছিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলেও আমি কিন্তু সহজে আমার জীর্ণ শয্যা ছাড়িয়া উঠিতে পারিলাম না। এমনি একটা জড়তা আমার দেহের প্রতি পরমাণুটি পর্য্যন্ত আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। হঠাৎ হাঁসপাতালেরই একটা মেথুয়ার ডাকে চমকিয়া উঠিয়া দেখি—দরজার কাছেই তিনি। ধরমড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। আজ বিদায়ের দিন তা আমি জানিতাম। শুইয়া শুইয়া আমি যে এতক্ষণ এইটুকু এড়াইবার ফন্দী আঁটিতেছিলাম! কিন্তু এ যে একেবারে শেষ মুহূর্ত্তটিকে সঙ্গে করিয়া তিনি আমার এই জীর্ণ ঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

আমি তাড়াতাড়ি একখানা চেয়ার দিয়া বলিলাম, "বসুন।" তিনি বসিয়া বলিলেন, "তোমার শরীর বেশ ভাল আছে ত বেলা?" বুকের স্পন্দনটা একটু সংযত করিয়া লইয়া বলিলাম, "আজ্ঞে, বেশ ত আছি।"

তিনি বলিলেন, "কিন্তু বড় শুক্‌নো দেখাচ্ছে তোমায়। বেলা, তোমায় ছেড়ে যেতে যেন কিছুতেই আর আমার মন সরচে না। বল তুমি আমায় মনে রাখবে?"

এর উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সহজ নয়, তাই স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। তিনি বলিলেন, "বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, আমি তা হলে চল্লুম বেলা। কিন্তু যাবার আগে তোমার কাছে আমার একটি স্মৃতিচিহ্ন রেখে যেতে চাই, যাতে তুমি আমায় না ভুলে যাও।"

এই বলিয়া তিনি একটী দামী নেকলেস বাহির করিয়া একেবারে আমার গলায় পরাইয়া দিলেন। এত দ্রুত যে আমি প্রতিবাদ করিবার সময়টুকুও পাইলাম না। একটা বিদ্যুতের শিহরণে আমার দেহখানা দুলিতে লাগিল। তিনি হঠাৎ আমায় ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "ও কি বেলা! এখনি পড়ে যেতে যে!"

আমি একবার সোজা তাঁর মুখের পানে দৃষ্টি তুলিয়া ধরিলাম। একবার মনে হইল, তখনি সেই নেকলেকসটা গলা হইতে টানিয়া খুলিয়া তাঁর পায়ের তলায় ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাই—কিন্তু তখনও আমার এই দেহখানা তাঁর বাহুর উপর সংলগ্ন। বিদায়ের দিনে এইটকুই যে আমার যথেষ্ট পুরস্কার। আমি তাহাকে কেমন করিয়া ব্যথা দিব গো! তা কি পারি?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল।

বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের মথুরা

বৈদিক যুগ—কোন্ স্মরণাতীত প্রাগৈতিহাসিক যুগে "মহাবলপরাক্রান্ত বীর্য্যবন্ত" পূজ্যপাদ ভারতীয় আর্য্য পিতামহগণ "এক হস্তে হলযন্ত্র ও অপর হস্তে রণশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পুত্র কলত্র দৌহিত্রাদির অগ্রণী হইয়া, উৎসাহিত ও অশঙ্কিত মনে স্নেহপালিত গোধন সঙ্গে লইয়া সিন্ধুনদীর পূর্ব্ব পারে পদার্পণ করিয়াছিলেন"* সে বিষয়ে প্রাচ্য প্রতীচ্য প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের

---

* অক্ষয়কুমার দত্ত।

মধ্যে মতভেদ থাকিলেও, ঋগ্বেদসংহিতা যে "আর্য্যজাতির আদিগ্রন্থ ও হিন্দুধর্ম্মের মূল গ্রন্থ" * সে বিষয়ে কাহারও মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। মানবজাতির সেই প্রাচীনতম লেখমালার প্রথম মণ্ডলে ১৩০ সূক্তে ৮ম ঋকে লিখিত আছে—

"মনবে শাসদব্রতাম্বচং কৃষ্ণামরংধয়ৎ।
দক্ষন্ন বিশ্বং ততৃষাণ মোষতি নার্শসানমোষতি ॥"

রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই ঋকের নিম্নলিখিত অনুবাদ দিয়াছিলেন—

"ইন্দ্র মনুষ্যের জন্য ব্রতরহিত, ব্যক্তিদিগকে শাসন করেন। তিনি (কৃষ্ণের) কৃষ্ণত্বক্ উন্মোচন করিয়া তাহাকে বধ করেন, তিনি উহাকে ভস্মীভূত করেন। তিনি সমস্ত হিংস্রকদিগকে দগ্ধ করেন এবং সমস্ত নিষ্ঠুর ব্যক্তিদিগকে দগ্ধ করেন।"

এই ঋকের ভাষ্য সায়নাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"অত্রেতিহাস মাচক্ষতে। অংশুমতী নাম নদী। তস্যাস্তীরে কৃষ্ণনামা সুরো বর্ত্তিশ্চ কৃষ্ণো দশ সহস্রৈরণুচরৈরুপেত্যস্তদ্দেশবর্ত্তিনঃ পীড়য়ন্নাস্তে। তত্রেন্দ্রো বৃহস্পতিনা প্রেরিতঃ সন্ মরুদ্ভিঃ সহিতঃ কৃষ্ণাং তদীয়ত্বচামুৎকৃত্য সানুচরমবধীৎ ॥"

রমেশ বাবু ইহার অর্থ করিয়াছেন—"প্রবাদ (মূলে কিন্তু ইতিহাস) এই যে, অংশুমতী নদীর তীরে কৃষ্ণনামে কৃষ্ণবর্ণ অসুর ছিল। তাহার দশ সহস্র অনুচর (তদ্দেশবাসী) লোকের প্রতি অত্যন্ত উৎপীড়ন করিত। বৃহস্পতি মরুদ্গণের সহিত ইন্দ্রকে তাহার বধের জন্য প্রেরণ করেন। ইন্দ্রও সানুচর কৃষ্ণাসুরকে বধ করিয়া উহাদিগকে নিরুপদ্রব করেন।"

(ঋগ্বেদ সংহিতার বঙ্গানুবাদ, ১ম খণ্ড, ৩০৭ পৃঃ)

আবার ১ম মণ্ডলে ১০১ সূক্তের ১ম ঋকে পাওয়া যায়, "যিনি ঋজিশ্বন রাজার সহিত কৃষ্ণের গর্ভবতী ভার্য্যাদিগকে হত করিয়াছিলেন সেই হৃষ্ট ইন্দ্রের উদ্দেশে অন্নের সহিত স্তুতি অর্পণ কর।"

ইহার টীকা—"কৃষ্ণ নামক একজন অসুর ছিল। ইন্দ্র, কৃষ্ণ অসুরকে হনন করিয়া, তাহার পুত্র না হয় এই জন্য তাহার গর্ভিণী স্ত্রীদিগকেও হনন করিয়াছিলেন।" (২২২ পৃষ্ঠা)

এখন কথা হইতেছে এই যে, উপরিলিখিত অংশুমতী নদী কোথায়? ভারতের ভূগোল বৃত্তান্তে এ নামে ত কোন নদী নাই। দুই একজন কৃতবিদ্য প্রত্নতাত্ত্বিকের মত এই যে, অংশুমান শব্দের অর্থ "সূর্য্য", অপত্যার্থে স্ত্রীলিঙ্গে "ঈ" প্রত্যয় করিয়া অংশুমতী হইয়াছে। সুতরাং অংশুমতী শব্দের অর্থে সূর্য্যতনয়া যমুনা নদীকেই বুঝায়। পুরাণের মতে যমুনাই সূর্য্যের কন্যা। সংস্কৃত কাব্য পুরাণাদিতে 'কলিন্দ নন্দিনী', 'ভানুজা', 'তপন-তনয়া' প্রভৃতি যমুনাবাচক শব্দ পাওয়া যায়। আমরা এইরূপ ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি। এই ঋক্ হইতে আমরা জানিতে পারিলাম যে, বৈদিক যুগে যমুনাতীরে অসুরগণের বাস ছিল। তবে অম্বালা, কুরুক্ষেত্র, হস্তিনাপুর বা মথুরা প্রভৃতি যমুনাতীরবর্ত্তী কোন্ স্থানে তাহাদের বাস ছিল তাহা ঠিক বুঝা গেল না। সেইটুকু আমরা রামায়ণ হইতে দেখাইব। দাস, দস্যু, দৈত্য বা অসুর প্রভৃতি শব্দে যে তাৎকালীন অনার্য্য আদিম অধিবাসীদিগকে বুঝাইত তাহা আজিকার দিনে আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

২য়—

ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলে ১১৬ ঋকে আছে, "হে নাসত্যদ্বয়, (অশ্বিদ্বয়) কৃষ্ণের পুত্র ঋজুতা পরায়ণ বিশ্বকায় নামক ঋষি তোমাদিগকে রক্ষণ ইচ্ছায় স্তুতি করিলে তোমরা স্বকীয় কার্য্য দ্বারা নষ্ট পশুর ন্যায় তাহার বিষ্ণাপু নামক বিনষ্ট পুত্রকে পুনরায় দেখিতে দিয়াছিলে।" ইহার টীকায় রমেশ বাবু লিখিতেছেন, "এ কৃষ্ণ ও তৎপুত্র বিশ্বকায় ও তাহার পুত্র বিষ্ণাপুর কে? সায়নাচার্য্যের টীকায় তাহার বিবরণ নাই। কেবল তাঁহারা ঋষি ছিলেন এই মাত্র জানা যায়।" (১ম খণ্ড ২৮৯ পৃষ্ঠা)

আমরা উপরি-উদ্ধৃত দুইটী ঋক হইতে আরও

---

* ডাঃ রমেশচন্দ্র দত্ত

জানিতে পারিতেছি যে, বৈদিক যুগে আর্য্য ও অনার্য্য উভয় জাতির মধ্যে লোকে "কৃষ্ণ" বলিয়া নামকরণ করিতেন। তবে এই দুই কৃষ্ণের সহিত পুরাণোক্ত বাসুদেব তনয় শ্রীকৃষ্ণের যে কোন সংস্রব নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

ত্রেতাযুগে—কবিগুরু মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে ৭৩ হইতে ৮৩ পর্য্যন্ত সর্গে লিখিত আছে যে, সীতা নির্ব্বাসনের পর রামচন্দ্র যখন অযোধ্যার সিংহাসনে বসিয়া 'অপ্রতিহত প্রভাবে অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন' করিতেছিলেন, সেই সময়ের ভার্গব ও চ্যবন প্রমুখ শতাধিক মহর্ষিগণ আসিয়া তাঁহার নিকট এই অভিযোগ জানাইলেন—"যমুনা তীরবর্ত্তী যে মধুবন নামক স্থান আছে তথায় লোলার পুত্র মধু [*] নামে একজন দৈত্য তপোবলে শিবের নিকট একটি মহাপ্রভাবশালী মহাবীর্য্য শূল পাইয়াছিলেন। সেই শূলের প্রভাবে তিনি দেবতা, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতি কাহাকেও ভয় করিতেন না। তাঁহার পত্নী রাবণের ভগিনী কুম্ভনসীর গর্ভে লবণ নামে মধুদৈত্যের একটি পুত্র জন্মে। প্রাচীন বয়সে মধুদৈত্য তাহার যুবা পুত্রকে সেই শিবদত্ত ত্রিশূল দিয়া বলিয়া যান যে, এই ত্রিশূল, যে কোন প্রবল ব্যক্তি যুদ্ধার্থে আসিবে, তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া পুনরায় তোমার হস্তে আসিবে। যতদিন সেই শূল তোমার করে থাকিবে কেহই তোমাকে পরাস্ত বা নিহত করিতে পারিবে না। ইহা বলিয়া মধুদৈত্য বরুণালয়ে প্রস্থান করিয়াছেন। অধুনা সেই দুষ্ট প্রকৃতি লবণ শূল পাইয়া অতিশয় অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ভয়ে ত্রিলোক সন্ত্রাসিত। বিশেষতঃ, তাপসগণকে নিরতিশয় ক্লেশ দিতেছে। আপনি রাবণকে বলবাহনের সহিত নিহত করিয়াছেন জানিয়া আমরা আপনার শরণাগত হইয়াছি। আপনি এই মহাভয় হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।"

তাঁহারা আরও জানাইলেন যে, সর্ব্বপ্রকার জীব, বিশেষতঃ তাপসগণই লবণের ভক্ষ্য, সে নিয়ত মধুবনে বাস করে, তাহার আচার রৌদ্র, সেই মাংসাশী নিয়ত সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, পক্ষী ও মনুষ্য প্রভৃতি বহুসহস্র প্রাণী বিনষ্ট করিয়া প্রতিদিন আহার সম্পাদন করে।

রঘুপতি ইহা শুনিয়া শত্রুঘ্নকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া লবণ বধের জন্য আদেশ করিলেন। শত্রুঘ্ন গঙ্গাতীরে সৈন্যগণের শিবির সংস্থাপন করিয়া একাকী রামদত্ত দিব্য শরাসন লইয়া মধুপুরীর দ্বারে যাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে সেই ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস বহুসংখ্যক প্রাণীর ভার বহন করিতে করিতে নিজ আবাসগৃহে ফিরিতেছিল। সেই সময় তাহাকে শত্রুঘ্ন শূলহীন অবস্থায় একাকী পাইয়া তীক্ষ্ণধার শিলীমুখ দ্বারা নিপাত করিলেন।

তাহার পর ৮৩ সর্গে এইরূপ লিখিত আছে, দেবগণ রাবণবধে প্রীত হইয়া রঘুনন্দন শত্রুঘ্নকে বলিলেন, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে এবং তোমার রমণীয় নগর শূরসেনায় অধিবাস হইবে, সংশয় নাই।" দেবগণ তাঁহাকে এইরূপ বলিয়া স্বর্গে আরোহণ করিলেন। তৎকালে মহাতেজা শত্রুঘ্নও গঙ্গাতীরস্থিত নিজ সৈন্যগণকে আসিতে অনুমতি করিলেন। সৈন্যেরা শত্রুঘ্নের আদেশ শ্রবণ করিয়া সত্বর আগমন করিল। শত্রুঘ্নও শ্রাবণ মাস হইতে নগর নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। শুভ দ্বাদশ বৎসরের প্রারম্ভে সেই দিব্যনগর প্রস্তুত হইল। অকুতোভয় শূরসেনাগণের দেশ সংস্থাপিত হইল। ঐ প্রদেশে ক্ষেত্র সকল শস্যশোভিত হইল। বাসব যথাকালে বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বীর পুরুষগণ শত্রুঘ্নের বাহুবলে সুরক্ষিত হইয়া রোগ-রহিত হইল। সেই নগর যমুনাতীরে অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি তাহার সমধিক সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিল। নগর-প্রাঙ্গণ আপণরাজি বিরাজিত ও নানাবিধ বাণিজ্য বস্তু দ্বারা সুশোভিত হইল। এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ এই নগরে বাস করিতে লাগিল। লবণ রাক্ষস পূর্ব্বে যে

---

[*] এই মধুদৈত্যের নাম হইতে মধুবন, মধুপুরী, মধুরা, ক্রমে মথুরা নাম হইয়াছে।

সকল বিশাল ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিল, শত্রুঘ্ন সেই আলয় সকলকে সুধাধবলিত করিয়া, নানাবিধ চিত্রকার্য্য দ্বারা তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। স্থানে স্থানে উত্তম উপবন, বিহারভূমি এবং অন্যান্য সুশোভন বস্তুজাত দ্বারা তাহার শোভা বৃদ্ধি করিলেন। দেব ও মনুষ্য দ্বারা শোভিত সেই দিব্যনগরে বণিকগণ নানা দেশ হইতে সমাগত হইয়া বিবিধ বাণিজ্য বস্তু ক্রয় বিক্রয় করত তাহার সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল। লক্ষ্মণোরথ ভরতানুজ শত্রুঘ্ন নগরের সমৃদ্ধি দর্শনে পরম প্রীত হইয়া নিরতিশয় হর্ষলাভ করিলেন। এইরূপে মথুরানগর সংস্থাপন করতঃ দ্বাদশ বর্ষের শেষে রঘুকুলবর্দ্ধন নরপতি শত্রুঘ্নের মনে রামপদ দর্শনের অভিলাষ হইল। সুতরাং তিনি নানাজনগণে পরিবৃতা স্বর্গোপমা সেই নগরী সংস্থাপন পূর্ব্বক রামচন্দ্রের চরণ দর্শন জন্য অযোধ্যায় প্রস্থান করিলেন।"

(উপরি উদ্ধৃত অংশটুকু বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত রামায়ণের অনুবাদ হইতে সংক্ষিপ্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে।)

ঋগ্বেদ সংহিতায় যে কথাটুকু জানিতে বাকী ছিল, রামায়ণের উদ্ধৃত অংশ হইতে আমরা তাহা বিশদ ভাবে জানিতে পারিলাম। যে সময়ে সূর্য্যবংশীয় আর্য্য নরপতি রামচন্দ্র, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক বহু যুগ পূর্ব্ব হইতে প্রতিষ্ঠিত সরযু সলিলসিক্ত উত্তরকোশল বা অযোধ্যাপ্রদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন পর্য্যন্তও যমুনা-জলপ্লাবিত মথুরাপ্রদেশ অনার্য্য, দৈত্য বা রাক্ষসগণের আবাস ও অধিকারভুক্ত ছিল। তৎসঙ্গে এই প্রদেশের স্থানে স্থানে স্বল্প সংখ্যক আর্য্য মুনি, ঋষি এবং তাপসগণও যে না থাকিতেন তাহা নহে। তখন এখানে অনার্য্যগণ প্রভু ছিল। সেই সকল অনার্য্যেরা বন্য পশুর সহিত মানুষগণকেও ধরিয়া খাইত। তাহারা Cannibal অর্থাৎ নরমাংস ভোজী। নিরীহ তাপসগণ পর্য্যন্ত তাহাদের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইতেন না। তবে সেই সকল অনার্য্যেরাও ব্রাহ্মণগণের দেবতা শিবের উপাসনা করিত। অন্য কথায়, এ প্রদেশে তখন শৈবধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। অনার্য্যগণ যে সকল বিশাল বাসভবনাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেগুলিকে কলি ফিরাইয়া চিত্রাদি আঁকিয়া আর্য্যগণ সুখে বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং সেই সকল অনার্য্যেরা আহারে আমমাংস ভোজী হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে আর্য্যদিগের শৈবধর্ম্ম এবং সুনিপুণভাবে গৃহনির্ম্মাণ প্রণালী জানিত।

রামচন্দ্রের সময় হইতে এই অনার্য্যসেবিত মথুরা প্রদেশ আর্য্যশাসনে আসিয়া চতুর্ব্বর্ণের বাসস্থান ও শিল্পবাণিজ্য-সমন্বিত সুরম্য নগরীতে পরিণত হইয়াছিল তাহাও জানিলাম।

আমরা আরও জানিলাম যে, এই সময় হইতেই মথুরার শূরসেন বলিয়া অপর একটি নাম হইয়াছিল। শূরসেন শব্দের অর্থ—শূর অর্থাৎ বলবতী সেনা যাহার।

মনুসংহিতায় শূরসেন দেশকে ব্রহ্মর্ষি দেশের অন্তর্গত বলা হইয়াছে।

এ প্রদেশের লোকেরা যে দৈহিক বলের জন্য যুদ্ধকালে সেনাদলে নিবদ্ধ হইত তাহাও নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে জানা যায়—

কুরুক্ষেত্রাংশ্চ মৎস্যাংশ্চপাঞ্চালান্ শূরসেনজান্।
দীর্ঘান্ লঘুংশ্চৈব নাবানগ্রানিকেষু যোধয়েৎ॥

মনুসংহিতা, ৭ম অধ্যায়, ১৯৩ শ্লোক।

অর্থ—কুরুক্ষেত্র (পাঞ্জাব), মৎস্য (জয়পুর বা রাজপুতনা), পাঞ্চাল (রোহিলখণ্ড) ও শূরসেন (মথুরা) বাসী লোকেরা দীর্ঘদেহ, ক্ষিপ্রকারী ও নৌচালনপটু, তাহাদিগকে যুদ্ধের অগ্রভাগে স্থাপন করিবে।

এই উক্তি হইতে বুঝা যাইতেছে যে শূরসেন দেশীয় লোকেরা বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় ও ক্ষিপ্রকারী ছিল বলিয়া তৎকালের রাজারা ইহাদিগকে নৌচালন কর্ম্মে ও যুদ্ধকালে সেনাবাহিনীর পুরোভাগে সন্নিবিষ্ট করিতেন।

এই শূরসেনদিগের ভাষাটীও অতিশয় মধুর এবং সংস্কৃত হইতে বিভিন্নরূপ ছিল। সেই জন্যই বুঝি সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা নাটকাদিতে ইহাদের ভাষা প্রয়োগের নিম্নলিখিতরূপ বিধান করিয়াছেন—

"পুরুষাণামনীচানাং সংস্কৃতং স্যাৎ কৃতাত্মনাম্।
শৌরসেনী প্রযোক্তব্যা তাদৃশীনাঞ্চ যোষিতাম্॥"

অর্থ—কৃতকর্ম্মা; অনীচ (উচ্চবংশীয়) পুরুষগণের ভাষা সংস্কৃত হইবে এবং তাদৃশী (সম্ভ্রান্ত বংশীয়া) মহিলাগণের মুখে শৌরসেনীভাষা প্রযুক্ত হইবে।

এই শৌরসেনী অথবা ব্রজ ভাষা যে অতি মধুর তাহা সকলেই জানেন।

শত্রুঘ্ন নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র সুবাহুকে এই মথুরা প্রদেশে রাজা করিয়া দিয়াছিলেন। এই পর্য্যন্ত রামায়ণ হইতে জানিতে পারা যায়। তাহার পর কতদিন পর্য্যন্ত এই মথুরা প্রদেশ সূর্য্যবংশীয় রাজগণের করতলগত ছিল, সে বিবরণ অপর কোনও পুরাণাদিতে আছে কি না জানি না। হয়ত বিস্মৃতিসাগরের অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে। আমরা বহু অনুসন্ধানেও তাহা খুঁজিয়া পাই নাই।

দ্বাপর বা মহাভারতীয় যুগে সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণ হীনপ্রভ হইয়া পড়িলে এই যুগে চন্দ্রবংশীয় রাজেন্দ্রবৃন্দ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া যমুনাজলপ্লাবিত প্রদেশ সমূহে আধিপত্য বিস্তার করেন। মহর্ষি বেদব্যাসই মহাভারত ও অপরাপর পুরাণাদিতে তাঁহাদের কীর্ত্তিগাথা গাহিয়া গিয়াছেন। তবে সকল পুরাণগুলি যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রচিত কি না, সে বিষয়ে আধুনিক কৃতবিদ্য প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ নানারূপ সংশয় প্রকাশ করেন। সেই সকল বিষয়ে বিচার করিবার এ স্থান নহে। আমরা কেবল পুরাণগুলির মধ্য হইতে যে যে স্থানে মথুরার উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপকরণপাইয়াছি, তাহাই এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিব।

হরিবংশের ২৬ অধ্যায়ে শেষ শ্লোকে লিখিত আছে—চন্দ্রবংশীয় প্রথম রাজা পুরোরবা গঙ্গা-যমুনা-সংযোগ স্থলে প্রতিষ্ঠানপুরে (প্রয়াগধামে) রাজ্য আরম্ভ করেন। তাহার পর ইঁহার বংশীয় রাজারা কোন্ সময়ে, কি সূত্রে ক্রমশ. উত্তরাভিমুখে যমুনাকূলে অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন তাহাও কতকটা তমসাচ্ছন্ন। তবে, এই চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতি বনগমনকালে তাঁহার পাঁচ পুত্রকে নিজ রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যদুকে দক্ষিণাপথ, তুর্ব্বসুকে পূর্ব্ব পথ, দ্রুহ্যকে পশ্চিম ও অনুকে উত্তরদিক প্রদান করিয়া, সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুরুকে চক্রবর্ত্তী বা সর্ব্বদেশাধিপতিরূপে বরণ করিয়া যান। (এই বিবরণ বিষ্ণুপুরাণের ১০ম অধ্যায়ে ও ব্রহ্মপুরাণের ১২শ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায় ।)

ইহাদের মধ্যে যদু ও পুরুর বংশীয় রাজারাই যমুনাতীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতেন। পুরুবংশীয় কুরু নামা রাজা কুরুক্ষেত্র, হস্তি রাজা হস্তিনাপুর, ও অজমেঢ় রাজা আজমীঢ় নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। এই পুরুবংশীয় কুরু হইতে কৌরব দুর্য্যোধনাদি ও পাণ্ডবয় যুধিষ্ঠিরাদি সমুৎপন্ন। তাঁহারা হস্তিনাপুরে রাজত্ব করিতেন। সুতরাং তাঁহাদের সহিত এ প্রবন্ধের কোন সংশ্রব নাই। যদুবংশীয় রাজগণের মধ্যে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নর্ম্মদাতীরে মহীতি নামে নগরী ও তাঁহার পৌত্র জয়ধ্বজ অবন্তী (উজ্জয়িনী) নামে নগরী. স্থাপন করেন। পরে এই যদুর বংশ মধু, সত্বত, অন্ধক, কুকুর, ভোজ ও বৃষ্ণি প্রভৃতি নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। যদুবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের সকলেরই নাম যাদব। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই যাদবেরা আসিয়া যমুনাকূলে এই মথুরা প্রদেশের নানাস্থানে বসতি করিয়াছিলেন। ঐ সকল যাদব শাখার মধ্যে ভোজ ও বৃষ্ণিবংশীয়েরাই সমধিক খ্যাতাপন্ন। তাঁহাদের নিম্নলিখিত বংশতালিকা দিলাম।

ভোজ বংশ

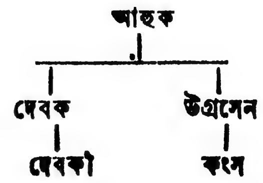

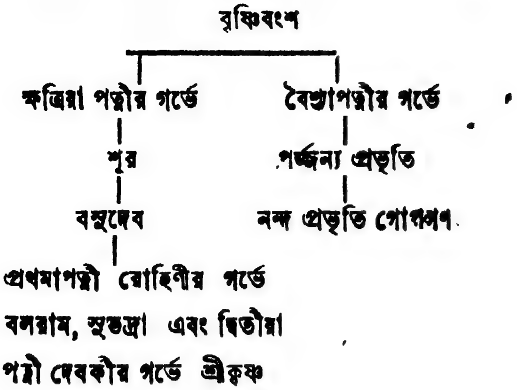

সে সময়ে মথুরায় আহুক নামে একজন রাজা ছিলেন।

ইঁহার দুই পুত্র, দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের দেবকী নামে একটি কন্যা মাত্র হইলে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। সেই জন্য উগ্রসেনই সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন। একদা উগ্রসেনের মহিষী পদ্মা একাকিনী উদ্যান মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে দ্রুমালীনামে একজন দৈত্য আসিয়া তাঁহাকে বলাৎকার করিল। সেই দৈত্যের ঔরসে উগ্রসেনের যে ক্ষেত্রজ সন্তান জন্মিয়াছিল, তাঁহারই নাম কংস। (কংস শব্দের অর্থ—মদ্যাদি পান পাত্র) কংস মগধাধিপতি জরাসন্ধের আপ্তি ও প্রাপ্তি নামে দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। এবং শ্বশুরের সাহায্যে অপরাপর যাদবগণকে উচ্ছেদ ও নির্য্যাতন করিয়া, পিতৃদ্রোহী ঔরঙ্গজেবের ন্যায়, উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করিয়া রাজমুকুট নিজ মস্তকে ধারণ করেন। ইহার কিছুদিন পরে কংস বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেবের সহিত নিজ পিতৃব্যকন্যা দেবকীর বিবাহ দিলেন। বর-বধূ বিদায়কালে ইনি স্বয়ংই রথের সারথি হইয়া সানন্দ চিত্তে তাঁহাদিগকে রথে করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। এমন সময়ে দৈববাণী হইল যে, দেবকীর সন্তান তাঁহার প্রাণহন্তা হইবে। কংস সেই ভয়ে দেবকী ও তাহার স্বামী বসুদেবকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তাঁহাদের প্রথম জাত সাতটী সন্তানকেই জন্মমাত্র নিহত করা হইল। অবশেষে অষ্টম গর্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি কংসকে বধ করিয়া উগ্রসেনকে পুনরায় মথুরার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

ভোজ বংশের এই মাত্র ইতিহাস জানিতে পারা যায়।

সেই সময়ে বৃষ্ণিবংশীয় শাখায় দেবমীঢ়ুস বা দেবমিত নামে একজন সম্ভ্রান্ত লোক মথুরায় বাস করিতেন। তাঁহার দুই পত্নী; একজন ক্ষত্রিয়ানী অপরা বৈশ্যা। ক্ষত্রিয়ানীর গর্ভে তাঁহার শূর বা শূরসেন * নামে পুত্র এবং বৈশ্যার গর্ভে পর্জ্জন্য ঘোষ নামে আর একটি পুত্র হয়। মাতার বংশগৌরব লইয়া শূরসেন ক্ষত্রিয় রহিয়া গেলেন এবং বৈশ্যার গর্ভসম্ভূত বলিয়া পর্জ্জন্য ঘোষ বৈশ্যজনোচিত গোপবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। শূরসেনের পুত্রের নাম বসুদেব। বসুদেবের অনেকগুলি পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে প্রথমা রোহিণীর গর্ভে বলদেব ও সুভদ্রার জন্ম। দ্বিতীয়া দেবকী শ্রীকৃষ্ণের মাতা। অপর পত্নীগুলির নাম হরিবংশে থাকিলেও তাঁহাদের সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। বসুদেব কংসভয়ে প্রথমা পত্নী রোহিণীকে সন্তানগণের সহিত যমুনার পূর্ব্ব পারে তাঁহাদের পরম আত্মীয় ও প্রিয় বান্ধব পর্জ্জন্য ঘোষের পুত্র নন্দ ঘোষের বাটিতে রাখিয়া দিয়াছিলেন। কোন কোন পুরাণের মতে শ্রীকৃষ্ণ মথুরার কারাগারে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিতে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পরে দ্বিভুজ হন।

ক্রমশঃ

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত।

---

* কেহ কেহ বলিয়া থাকেন এই শূরসেনের নাম হইতে মথুরার নাম শূরসেনপুরী হইয়াছে সেটা ঠিক নহে তৎপূর্ব্ব হইতেই যে এস্থানের নাম শূরসেন হইয়াছিল তাহা আমরা রামায়ণ ও মনুসংহিতা হইতে দেখাইয়াছি।

"প্রতাপসিংহ"-এর গান ।*

তৃতীয় গীত

[রচনা—স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

মেহেরউন্নিসা ।

মিশ্র ভীমপলশ্রী—মধ্যমান ।

বাঁধি যত মন ভালবাসিব না তায়,
ততই এ প্রাণ তাঁরই চরণে লুটায় !
যতই ছাড়াতে চাই, ততই জড়িত হই—
যত বাঁধি বাঁধ—তত ভেঙ্গে যায় ।

* * *

[স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

আস্থায়ী

	০						১				
II{	সঃ	মজ্ঞা	-জ্ঞমপঃ	পপা	-জ্ঞমপা	।	পা	-া	মমা	-জ্ঞমজ্ঞমপা	I
	বা	ধি ০	০ ০ ০	য ত	০ ০ ০		ম	ন্	ভাল	০ ০ ০ ০ ০	

	২´					৩				
I	পপা	পপা	-মা	-জ্ঞা	।	-জ্ঞমা	-পা	পা	-া	।
	বাসি	ব না	০	০		০ ০	০	তা	য়	

	০					১				
।	মপণা	-র্সর্রা	-র্সর্রা	-র্সা	।	-ণর্সা	-ণা	-পণা	-পা	I
	তা০০	০ ০	০ ০	০		০ ০	০	০ ০	০	

	২´					৩				
I	-মপা	-মা	-জ্ঞমা	-জ্ঞা	।	-রা	-সা	-ন্া	-সা	।
	০ ০	০	০ ০	০		০	০	০	য়	

---

* "প্রতাপসিংহ"এর গানের স্বরলিপি ধারাবাহিকরূপে "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে, এবং নাটকান্তর্গত গানগুলি অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গীত হয়, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হইবে।

—লেখিকা ।

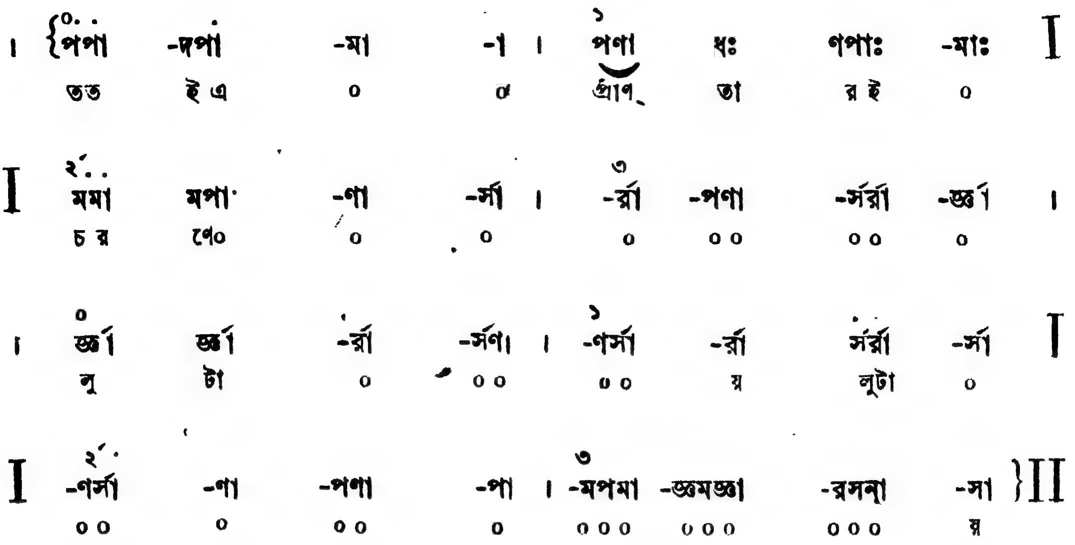
তত ই এ প্রাণ্ তা র ই
চ র ণে
লু টা য় লুটা
য়

অন্তরা

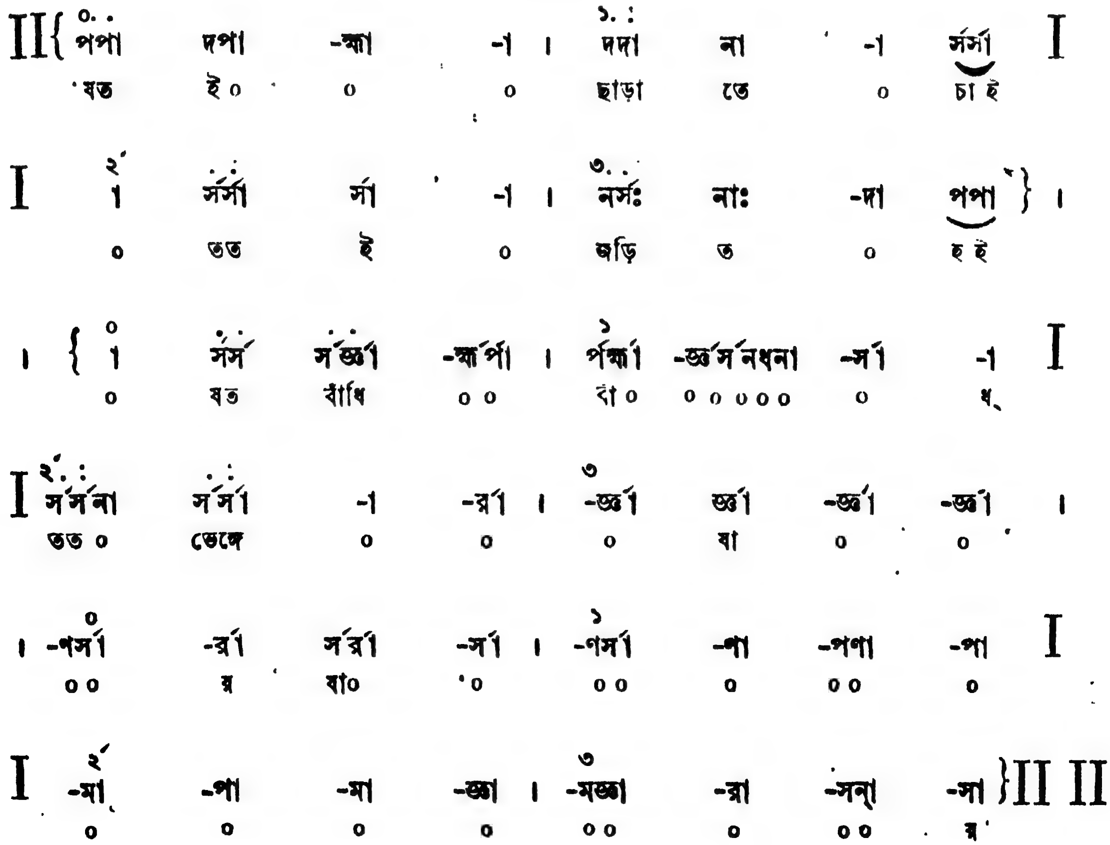
যত ই ছাড়া তে চা ই
তত ই জড়ি ত হ ই
যত বাঁধি বাঁ ধ্
তত ভেঙ্গে যা
য় যা
য়

এ গানখানি অভিনয়-মঞ্চাদির নিম্নলিখিত মধ্যমানের ঠেকার সহিত চলিবে ঃ—

২´ ৩
I ধা ধিন্ ধিন্ ধা । ধিন্ ধাগে -ঃ তেরেকেটেঃ ধিন্ ।

০ ১
। না তিন্ তিন্ তা । ধিন্ ধাগে -ঃ তেরেকেটেঃ ধিন্ I

—লেখিকা।

মনের মানুষ

(উপন্যাস)

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

দস্যু দলন।

কুঞ্জলাল যখন অদৃশ্যভাবে বৌবাজার ষ্ট্রীট ছাড়াইয়া সার্কুলার রোডে গিয়া পৌছিল, তখন অন্ধকার হইয়াছে, রাস্তার লণ্ঠনগুলি জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পথে জনতা অত্যন্ত অধিক, লোকের গায়ে পা ঠেকিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা—তাই তাহাকে অত্যন্ত সাবধানে পথ চলিতে হইল। ক্রমে সে ডাক্তার সরকারের বাসভবনের সম্মুখীন হইল। দেখিল, প্রাঙ্গণে ফটকের অনতিদূরে একখানা মোটরগাড়ী হর্ণ বাজাইয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে। অন্ধকারে মানুষ ঠাহর হইল না, কুঞ্জ ফটকের পাশে দাঁড়াইয়া ভাবিল—ঐ যাঃ ইন্দু বুঝি বেরুচ্চে। ক্ষণপরেই গাড়ীখানি ফটক পার হইয়া রাজপথে পড়িল, তখন কুঞ্জ দেখিল ডাক্তার সাহেব, স্ত্রী ও কন্যা মণিমালাকে লইয়া বাহির হইতেছেন। কুঞ্জ আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, বাঁচা গেল, ইন্দুকে তবে বোধ হয় বাড়ীতেই পাব।

কুঞ্জ তখন ভিতরে প্রবেশ করিল। রোগীর কক্ষের সম্মুখে চুকরীলাল ও দুইজন অন্য ভৃত্য বসিয়া গল্পগুজব করিতেছে, তামাক খাইতেছে। হল পার হইয়া সিঁড়ি দিয়া কুঞ্জ সটান উপরে উঠিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। ড্রয়িংরুম খোলা রহিয়াছে, তাহাতে একটি মাত্র বিদ্যুৎ জ্বলিতেছে, অপর সকল বাতিগুলি নিবানো ; ভিতর হলে প্রবেশদ্বার তালাবন্ধ। ভাবিল ইহারা সকলে মিলিয়া গেল কোথায় ? একটু এদিক ওদিক বেড়াইয়া, সম্মুখ বারান্দায় মুখে গেলাস ঢাকা এক সোরাই জল দেখিয়া প্রাণ ভরিয়া খানিক সে পান করিয়া লইল। বারান্দার প্রান্তে গোসলখানার দ্বারটি খোলা আছে দেখিয়া, তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া, শীতল জলে হাত পা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, তোয়ালে ভিজাইয়া গা মুছিয়া ফেলিয়া বড় আরাম অনুভব করিল। ভিতর দিকের দরজা ঠেলিয়া দেখিল, তাহা বন্ধ। তখন বাহির হইয়া আসিয়া, একটু বিশ্রাম করিবার অভিপ্রায়ে ড্রয়িংরুমের একটা বিদ্যুৎ-পাখা খুলিয়া দিয়া, তাহার নিম্নস্থ আরাম চেয়ার খানিতে বসিয়া বলিল, "আঃ।"

সারাদিন কলিকাতায় ঘুরিয়া তাহার শরীর যেন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এখন এই সুখাসনে বসিয়া বিদ্যুৎ পাখার হাওয়ায় তাহার শরীর যেন জুড়াইতে লাগিল। আরামে ক্রমে তাহার চক্ষু দুইটি মুদিয়া আসিল। ক্রমে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

এই ভাবে কতক্ষণ যে কুঞ্জ ঘুমাইয়া ছিল, তাহা সে বলিতে পারে না—নিদ্রাভঙ্গে দেখিল, ড্রয়িংরুমে খুব আলো হইয়াছে, অন্যান্য বিদ্যুৎ বাতিগুলিও জ্বলিয়া উঠিয়াছে, ঘরের মাঝখানে ডাক্তারগৃহিণী ইন্দুবালা ও মণিমালা দাঁড়াইয়া, গৃহিণী ছুকরীলালকে বলিতেছেন, "তুমকো এৎনা করকে বোলতা হায়, হামলোগ বাহার যানেসেই পাংখা বন্ধ কর দিও, তুমারা হুঁস নেই হোতা হায়! দেখোতো, সাঁঝ সে রাত এগারো বাজেতক্ পাংখাঠো চলা, ইস্কা লোকসান কৌন দেগা?" কুঞ্জ উপরে চাহিয়া দেখিল, পাখা বন্ধ।

ছুকরীলাল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "হামতো হুজুর বন্দ্ কিয়া থা।" "তোমার মুণ্ডু কিয়া থা"—বলিয়া গৃহিণী মেয়ে দুটির সহিত ভিতরে গেলেন। ক্ষণপরে কুঞ্জলালও উঠিয়া, সাবধানে পর্দ্দা সরাইয়া ভিতর হলে প্রবেশ করিল।

ইন্দু ও মণি দুই বোনে একটি সোফায় বসিয়া হাসিতেছে গল্প করিতেছে। তাহাদের মা, নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন। কথাবার্ত্তা হইতে কুঞ্জ এইটুকুমাত্র বুঝিল যে আজ সন্ধ্যায় ইহাদের কোথায় ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু কোথায় তাহা বুঝিতে পারিল না। ইন্দুকে বেশ প্রফুল্ল দেখাইতেছে। কোথায় নিমন্ত্রণ ছিল—সেই সিংহ সাহেবটার বাড়ীতে নহে ত? কিন্তু সিংহের কোনও উল্লেখ ত কুঞ্জ শুনিল না!

এই সময় চুরট মুখে ডাক্তার সাহেব আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ইনি এতক্ষণ কোনও কার্য্যে নীচে ছিলেন। আসিয়াই বলিলেন, "তোমরা এখনও শোওনি? যাও যাও আর গল্প কোরো না, শোওগে সব, অনেক রাত হয়েছে।" ইহা শুনিয়া ইন্দু ও মণিমালা উত্তরেই উঠিয়া গেল। ডাক্তার সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী, তাঁহাদের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

কুঞ্জ একটু দ্বিধায় পড়িয়া গেল। দুই বোনে এক ঘরে শুইতে গেল, উহারা ঘুম না আসা পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই গল্প করিবে। সেই বিশ্রম্ভালাপের মধ্যে, কুঞ্জ যাহা জানিবার জন্য এত কষ্ট করিয়া অদৃশ্য দেহ লইয়া এখানে আসিয়াছে, তাহার কিছু না কিছু আভাস থাকিতে পারে। ডাক্তার দম্পতীও গল্প করিবেন, কিন্তু দুই বোনের গল্পে, তাহার জ্ঞাতব্য বিষয়ের আভাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অধিক। কিন্তু এই রাত্রিকালে, ঐ যুবতী মেয়ে দুটির শয়ন কক্ষে অদৃশ্য ভাবে উপস্থিত থাকাটা কি ভদ্রোচিত কার্য্য হইবে? তার চেয়ে বরং বুড়াবুড়ির ঘরে গিয়া দাঁড়ানো ততটা দোষাবহ না হইতেও পারে। প্রলোভন—যাহা জানিতে আসিয়াছে তাহা জানিবার প্রলোভন—প্রবল আকর্ষণে কুঞ্জকে ইন্দু ও মণির শয়নকক্ষের দিকেই টানিতে লাগিল। সে নিজ চিত্তবৃত্তির মুখের লাগামটা কষিয়া টানিয়া ধরিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল—না না, আমি চোর নই, বদমায়েস নই—আমি ভাল লোক—ভদ্রলোক। ইন্দু ও মণিমালা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সোফাখানির উপর উপবেশন করিয়া সে এই মানসিক যুদ্ধে ব্যাপৃত হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, ডাক্তার গৃহিণী শয়ন কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলেন। ড্রয়িং রুমে গিয়া সিঁড়ির দ্বারটি বন্ধ করিয়া, বাতি নিবাইয়া আসিয়া, ভিতর হলের বাতিগুলি নিবাইলেন। সে কার্য্য শেষে, শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বারটি বন্ধ করিয়া দিলেন। ভিতরের হলটি প্রায় অন্ধকার হইয়া গেল। ইন্দু মণিমালার কক্ষে তখনও আলো জ্বলিতেছে; মুক্ত দ্বারপথের পর্দ্দা ভেদ করিয়া সামান্য একটু আলোক মাত্র বাহিরে আসিতেছে।

কুঞ্জলাল মহা ফাঁপরে পড়িল। ডাক্তার-দম্পতীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শোনার ত আর উপায় নাই। ইন্দু, মণির কক্ষে—না, ছি ছি; তাছাড়া, উহারাও এখনই হয়ত দ্বার বন্ধ করিয়া দিবে। আজ দিন এবং রাত্রি তবে নিষ্ফলই হইল।

কিয়ৎক্ষণ অন্ধকারে বসিয়া এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে কুঞ্জ বিলক্ষণ ক্ষুধা অনুভব করিল। গরমে, তাহার অত্যন্ত পিপাসাও পাইয়াছিল। উঠিয়া, নিঃশব্দ পদে ড্রয়িংরুম অতিক্রম করিয়া বাহিরের বারান্দায় গিয়া সেই সোরাই হইতে জল পান করিয়া, ড্রয়িং

রুমের একখানি সোফায় শয়ন করিল। পাখা খুলিতে সাহস হইল না—কেহ বাহিরে আসিয়া যদি পাখা চালবার শব্দ শুনিতে পায়!

কিছুক্ষণ নিদ্রার পরে সে আবার জাগিয়া উঠিল। ক্ষুধায় নাড়ী জ্বলিয়া যাইতেছে। একে এই বৈশাখের বায়ুশূন্য রাত্রির গুমট, তাহাতে ক্ষুধার তাড়না, কুঞ্জলালের প্রাণটা যেন ছটফট করিতে লাগিল। ভাবিল, নীচে যাই, খানাকামরায় গিয়া যদি কিছু পাই ত খাইয়া আসি।

কুঞ্জ আস্তে আস্তে উঠিয়া হাতড়াইতে হাতড়াইতে বিদ্যুৎ বাতির সুইচ্‌বোর্ড পাইয়া একটি বাতি জ্বালিল। ঘড়ি দেখিল, একটা বাজিতে দশ মিনিট বাকী আছে। বাতি নিবাইয়া, সিঁড়ির দ্বার খুলিয়া অন্ধকারে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে নীচের হলে পৌঁছিয়া, সে মনুষ্যকণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। কাহারা চুপি চুপি হিন্দীতে কথাবার্ত্তা কহিতেছে। শুনিয়া তাহার ভয়ও হইল, কৌতূহলও হইল। সে কাণ খাড়া করিয়া শুনিতে লাগিল।

একজন বলিতেছে, "আবদুল ভাই,—আর দেরী কি, এইবার তা হলে উপরে যাওয়া যাক্।"

অন্য জন বলিল, "তা চল, কিন্তু খুব সাবধান। যেন চিল্লাচিল্লি না করতে পারে।"

প্রথম ব্যক্তি বলিল, "সাধ্য কি? আমরা ঘরে ঢুকে প্রথমেই সাহেবটার ও মেমটার মুখ কাপড় দিয়ে আচ্ছা করে বেঁধে ফেলব। হাত পা দড়ি দিয়ে বেঁধে, তার পর, তোর কথামত আয়না টেবিলের দেরাজ থেকে চাবি নিয়ে আলমারি খুলব। গহনাপত্র সেই আলমারিতে থাকে তুই ঠিক জানিস ত?"

"ঠিক জানি। কিন্তু সাহেব মেম সাহেবের মুখে যে কাপড় বাঁধবি, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মরে যাবে না ত?"

"যায় যাবে, তাতে তোরই বা কি আমাদেরই বা কি?"

"আমার চাকরীটি যাবে যে!"

"উঃ—ভারি ত চাকরি। ষোল টাকা মাইনে পাস, আমাদের সঙ্গে থাকলে একরাত্রেই কত ষোল টাকা রোজগার করবি। চল্, এখন উপরে যাই, ঘরটা আমাদের দেখিয়ে দিবি চল্।"

"হুঁঃ—এক কথা ভুলে যাচ্চি। আগে খানাকামরার জানালা ভেঙ্গে ফেল্। নৈলে কাল সকালে পুলিস এসে বলবে, চোর ঢুকলো কোথা দিয়ে, নিশ্চয়ই কোনও চাকর দরজা খুলে দিয়েছে।"

"আচ্ছা, তা ভাঙ্গছি।"

পরক্ষণেই বিদ্যুৎবাতি জ্বলিল। কুঞ্জ দেখিল, তাহারা ছয়জন লোক—সকলকেই মুসলমান বলিয়া বোধ হইল। একজনের অঙ্গে ভৃত্যের বেশ—ইহাকে পূর্ব্বে কখনও কুঞ্জ দেখে নাই। এ সেই নব নিযুক্ত ভৃত্য আবদুল ভিন্ন আর কেহই নহে। অপর লোকগুলার খালি গা, লুঙ্গি পরা, চাদর কোমরে জড়ানো, চেহারা যেন এক একটা যমদূত। একজনের হাতে একটা থলিয়া, তাহাতে যন্ত্রপাতি আছে বলিয়া বোধ হইল—একটা করাতের অগ্রভাগ দেখা যাইতেছিল।

গৃহভৃত্য আবদুল তাহার কোমর হইতে চাবি লইয়া কামরার তালা খুলিল। সকলে খানা কামরায় প্রবেশ খানা করিল। কুঞ্জও তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে গেল।

হলের আলো নিবিল, খানাকামরায় আলো জ্বলিয়া উঠিল। দুইজন লোক জানালা ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইল। একজন একটা আলমারি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এটাতে কি আছে।"

আবদুল বলিল, "খাবার জিনিষ, বাসন-পত্র এই সব আছে।"

এক ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ আলমারির তালাটা মোচড় দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। সেই এই দলের সর্দ্দার বলিয়া বোধ হয়। ফল, বিস্কুট ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে চীনা মাটীর বাসন পত্র, প্লেটেড কাঁটা চামচ ইত্যাদি দেখিয়া সে বলিল, "ধেৎ।"

জানালা ভাঙ্গা শেষ হইলে, দ্বারের ভিতরদিকে বাহিরের পিতলের কড়া দুইটার দাণ্ডির মুখে যে বোলটু ছিল, সেই বোলটু একটা খুলিয়া, ডাণ্ডিটা ঢুকিয়া ভিতরে ঢুকাইয়া দিল। তার পর অপর দিকে

কড়াটা ধরিয়া টান মারিয়া তাহা খুলিয়া ফেলিল। আবদুল তালার মুখে সেই খোলা কড়া পড়াইয়া চাবি বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, "পুলিস এসে বলবে, জানালা ভেঙ্গে খানাকামরায় ঢুকেছে, বোলটু খুলে কড়া ঠুকে বের করে দিয়ে দোর খুলে উপরে গেছে।"

একজন বলিল, "ও ঘরটায় কি আছে? নেবার মত কিছু নেই?"

আবদুল বলিল, "ওটা দাওয়াইখানা।"

"দেখাই যাক্ না যদি কিছু মাল্ পাওয়া যায়"—বলিয়া তাহারা সে তালাও ভাঙ্গিল। দেওয়ালের গায়ে র‍্যাকের উপর, কাচের আলমারির মধ্যে, সাজানো বিবিধ ঔষধের শিশি ভিন্ন আর কোনও "মাল" দস্যুগণ দেখিতে পাইল না। কিন্তু কুঞ্জ একটি "মাল" দেখিল। "তীব্র নাইট্রিক এসিড—বিষ" লেবেল যুক্ত, কাচের ষ্টপার আঁটা একটি বোতল—কুঞ্জ সেটি মন্ত্রবলে অদৃশ্য করিয়া হাতে তুলিয়া লইল। পরে চোরগণের পশ্চাৎ সে বাহির হইয়া আসিল।

সিঁড়ির আলো জ্বলিয়া উঠিল।

দস্যুগণের অনুসরণে কুঞ্জও নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিতে লাগিল। উপরে উঠিয়া দস্যু সর্দ্দার অনুচ্চস্বরে বলিল, "এ কামরা ত খোলাই আছে। তবে যে আবদুল তুই বলেছিলি কপাট কাটতে হবে?"

আবদুল বলিল, "বোধ হয় আজ বন্ধ করতে ভুলে গেছে।"—কুঞ্জ আপন মনে হাসিল।

সকলে নিঃশব্দে ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিল। সে কক্ষে আলো জ্বলিয়া উঠিল। ভিতরের হলে প্রবেশ করিয়া আবদুল ডাক্তার-দম্পতীর কক্ষদ্বার দেখাইয়া বলিল, "এই।"

একজন কবাট কাটিবার যন্ত্রগুলি বাহির করিতে লাগিল। আবদুল তখন বলিল, "ভাই সব, আমি তবে এইবার শুতে যাই। তোরা খুব সাবধানে কায করিস। আর, সাহেবকে মেমসাহেবকে প্রাণে মারিসনে দোহাই তোদের। হাজার হোক নিমক খেয়েছি।"—বলিয়া সে সরিয়া পড়িল।

দস্যুগণ তখন যন্ত্র দ্বারা কবাটের কাষ্ঠ কাটিতে আরম্ভ করিল। প্রায় দশ মিনিট কাল পরিশ্রমের পর তাহাদের কৌশলে দ্বার মুক্ত হইল। ঘরের মধ্যে আলোক আছে—তবে তাহা অতি মৃদু 'নাইট লাইট" মাত্র। বৃহৎ পালঙ্কের এক পার্শ্বে পড়িয়া ডাক্তার সাহেব নাসিকাধ্বনি করিতেছেন; অপর পার্শ্বে তাঁহার পত্নী গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। দস্যুগণ প্রথমে সেই অল্প আলোকে কক্ষখানি উত্তমরূপে দেখিয়া লইল। তাহার পর, ডাক্তারের মুখ বাঁধিবার জন্য লম্বা পাট করা বস্ত্রখণ্ড হাতে লইয়া দুইজন লোক খাটের এধারে দাঁড়াইল, দুইজন ডাক্তার-পত্নীর দিকে চলিয়া গেল। পঞ্চম ব্যক্তি একটা পিস্তল উঁচাইয়া পালঙ্কের পাদদেশে দাঁড়াইল।

কুঞ্জ ভাবিল, আর বিলম্ব করা নয়। সে তখন বোতলটি খুলিয়া, খানিকটা অ্যাসিড এদিকের দস্যু দুইজনের নগ্ন পৃষ্ঠে ঢালিয়া দিল।

পৃষ্ঠে অ্যাসিড পড়িবামাত্র তাহারা পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল, উপর দিকে দৃষ্টিপাত করিল, শেষে পিঠে হাত দিয়া বলিল, "জল পড় কোথা থেকে?"

ইতিমধ্যে কুঞ্জ ক্ষিপ্রহস্তে পিস্তলধারী এবং বাকী দুইজনের পৃষ্ঠে অ্যাসিড ঢালিয়া দিয়া, ঘরের একটি কোণে গিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণ মধ্যেই দস্যুগণ ভীষণ যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল এবং দাঁত মুখ খিচাইয়া সেইখানে নৃত্য আরম্ভ করিল।

সেই চীৎকারের শব্দে ডাক্তার ও তাঁহার পত্নীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। হতবুদ্ধি দম্পতী ব্যাপার কি ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্ব্বেই, সেই পাঁচজন দস্যু "বাপরে বাপ জান্ গিয়া, জান্ গিয়া" বলিয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া, দুম দুম শব্দে সিঁড়ি দিয়া নামিতে আরম্ভ করিল।

ডাক্তার সাহেব উঠিয়া বিদ্যুৎবাতির সুইচ টানিয়া দিলেন। ডাক্তারগৃহিণী ভয়ে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাগা—এ কি? এ কি?"

ডাক্তার বলিলেন, "কিছুই ত বুঝতে পারছিনে। উঃ—কিসের একটা গন্ধ পাচ্ছ? নাইট্রিক অ্যাসিড্ নাকি! বিষাক্ত গ্যাস!" বলিয়া তিনি পালঙ্ক হইতে নামিয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া টানিলেন।

স্ত্রী ক্রন্দনের স্বরে কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "ওগো বেরিও না গো বেরিও না তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাদের ওরা খুন করে ফেলবে। ওগো দোর বন্ধ করে দাও।"

"ভয় কি, তারা পালিয়েছে।"—বলিয়া ডাক্তার বাহির হইয়া হলের আলো জ্বালিয়া দ্বারের নিকট ফিরিয়া বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ কাঠ ফুটো করে উপর নীচের ছিটকিনি খুলেছে, লোহার বার তুলে ফেলেছে।"

ডাক্তারপত্নী শয়ন কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "ওগো এই দেখ, এখানে কি সব পড়ে রয়েছে।"—বলিয়া দস্যুগণের যন্ত্রপাতির থলি ধরিয়া সেটি উপুড় করিলেন, নানা আকারের নানাবিধ যন্ত্র মেঝের কার্পেটের উপর পড়িল। তার পর, "ওগো ঐ দেখ একটা পিস্তল পড়ে রয়েছে।" বলিয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

গোলযোগ শুনিয়া ইন্দু ও মণি তাহাদের ঘরের দ্বার একটু ফাঁক করিয়া চীৎকার করিল, "মা, মা, কি হয়েছে?"

"চোর এসেছিল রে, চোর এসেছিল।"

"কি ভয়ানক! চোর আছে না চলে গেছে?"

"চলে গেছে।"

ইন্দু ও মণিমালা তখন সভয় পদক্ষেপে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রমে ভৃত্যেরাও ছুটিয়া আসিল। মহা হৈচৈ পড়িয়া গেল। ডাক্তার সাহেব ভৃত্যদের সঙ্গে লইয়া লাঠি হস্তে বাড়ী তদারক করিতে বাহির হইলেন। কুঞ্জ এই সময় ভিতর হলে আসিয়া অ্যাসিডের বোতলটি ঘরের কোণে নামাইয়া রাখিয়া, খোলা দরজার নিকট হাওয়ায় বসিল। প্রায় দশ মিনিট পরে ডাক্তার সাহেব ফিরিয়া আসিয়া, যাহা যাহা দেখিয়াছেন সব বলিলেন।

তখন আলোচনা আরম্ভ হইল, চোর চুরি করিতে আসিয়া চুরি না করিয়া বাপরে মারে করিয়া পলাইল কেন? সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া রহিল, কেহই কোনও সদুত্তর দিতে পারিল না।

ডাক্তার সাহেব সিগারেট খাইতে খাইতে হল ঘরের এদিক ওদিক বেড়াইতেছিলেন। হঠাৎ বলিলেন, "ও কি? ঐ কোণে ও বোতলটা কোথা থেকে এল?" বলিতে বলিতে তিনি সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। বোতলটি তুলিয়া তাহার ষ্টপারের কাছে নাক রাখিয়া বলিলেন—"কি সর্ব্বনাশ. এ যে ষ্ট্রং নাইট্রিক অ্যাসিড। এই অ্যাসিডের গন্ধই ঘরের মধ্যে পেয়েছিলাম। এ বোতল এখানে কে আনলে?"

গৃহিণী বলিলেন, "চোরেরাই এনেছিল, ফেলে গেছে।"

ডাক্তার বলিলেন, "আমাদের গায়ে ঢেলে দিয়ে বোধ হয় পুড়িয়ে মারবার জন্যেই এনেছিল। উঃ কি ভয়ানক! তারা জান্ গিয়া জান্ গিয়া বলতে বলতে পালালো, তাদের গায়ে নিশ্চয় অ্যাসিড পড়েছিল।"

মণি জিজ্ঞাসা করিল, "কে ঢাল্লে?"

গৃহিণী বলিলেন, "হঠাৎ কি রকমে বোধ হয়—"

ডাক্তার বলিলেন, "হঠাৎ কোন রকমে একজনের গায়ে পড়তে পারে। কিন্তু সবাই যে ঐ রকম চীৎকার করতে করতে পালালো তার কারণ কি?"

ইন্দু বলিল, "আমার বোধ হয় সেই চোরেদের একজনের সঙ্গে, অপর সকলের কোনও বিষয়ে বিবাদ বেধেছিল, সে-ই রেগেমেগে সবাইকের গায়ে অ্যাসিড ঢেলে দিয়েছে।"

ডাক্তার একটু ভাবিয়া বলিলেন, "এটা বরং সম্ভব।"

ক্রমে সকলেই স্বীকার করিল, খুব সম্ভব তাহাই হইয়া থাকিবে। কুঞ্জ আপন স্থানে বসিয়া, মুচকি মুচকি হাসিতেছিল।

এইরূপ নানাপ্রকার জল্পনা কল্পনায় রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল। কাল যাহা হউক করা যাইবে এই পরামর্শ স্থির হইলে, সকলে আপন আপন শয্যায় ফিরিয়া গেল।

কুঞ্জলালেরও চক্ষু ঘুমে ঢুলিয়া পড়িতেছিল। সে ড্রয়িং রুমে ফিরিয়া গিয়া একখানি সোফার উপর শয়ন করিল এবং অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

পাপের ধন।

যখন কুঞ্জলালের ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বেশ আলো হইয়াছে, বাগানের গাছে গাছে কাক কোকিল ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে উঠিয়া বসিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিল, বাড়ীর কেহ এখনও জাগে নাই। তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া, ডাক্তার সাহেবের গোসলখানায় গিয়া মুখাদি প্রক্ষালন ক্রিয়া শেষ করিয়া লইল। অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইতেছিল; তাই আহার অন্বেষণে নীচে গিয়া খানা কামরায় প্রবেশ করিল।

দস্যুগণ কর্ত্তৃক গতরাত্রে ভগ্ন আলমারি হইতে কিছু খাদ্য আহরণ ও ভক্ষণ করিয়া, কম্পাউণ্ডার বাবুর জন্য তৈরি-এক পেয়ালা চা কৌশলে পান করিয়া লইয়া, সারাদিনের প্রোগ্রাম চিন্তায় ব্যাপৃত হইল। একটা দিন একটা রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে, অথচ আসল কায কিছুমাত্র অগ্রসর হয় নাই। উপস্থিত এ বাড়ীতে আর অপেক্ষা করিয়াও কোনও ফল নাই—সন্ধ্যার পর আবার আসিলেই হইবে। কুঞ্জ বাহির হইয়া পড়িল।

শিয়ালদহের নিকটে আসিয়া দেখিল, খবরের কাগজওয়ালাদের চারিদিকে বিষম জনতা—ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার অঙ্কের প্রশ্নপত্র বাহির হইয়া গিয়াছে। কেহ বলিতেছে প্রশ্নপত্র গুলি জাল, কেহ বলিতেছেন আসল কেমন করিয়া যে হইল, সে সম্বন্ধে নানা লোকে নানা প্রকার জল্পনা কল্পনা করিতেছে। সে সকল একটু শুনিয়া, মনে মনে হাসিয়া, কুঞ্জ বৌবাজার ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিল। ইচ্ছা আজ ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে গিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিবে।

লালদীঘির নিকট যখন সে পৌঁছিল, তখন বেলা ৯টা মাত্র। ব্যাঙ্কগুলি খুলিতে এখনও দেড় ঘণ্টা বিলম্ব আছে। তাই সে দীঘির ধারে একখানি খালি বেঞ্চি পাইয়া বিশ্রামার্থ উপবেশন করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে দুইজন লোক আসিয়া, সেই বেঞ্চিখানির উপর বসিল। একজন বাঙ্গালী, বয়স আন্দাজ ত্রিশ বৎসর, অপর জন পশ্চিম দেশীয়, অঙ্গে কোট, মাথায় পাগড়ি, বয়স ৪০ বৎসর হইতে পারে। বেঞ্চিতে বসিয়া নির্জ্জন বোধে তাহারা সাবধানে নিম্নস্বরে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল।

বাঙ্গালীটি বলিল, "কাগজখানা একবার বের কর‍ত যমুনা বাবু, ভাল করে দেখি।"

যমুনা বাবু তাহার কোটের বুকপকেট হইতে চামড়ার একটি কেস বাহির করিল, এবং তাহার মধ্যে হইতে কি কাগজ বাহির করিয়া বাঙ্গালী বাবুর হাতে দিল।

বাবুটি কাগজখানি খুলিয়া তাহা বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিতে করিতে লাগিল। কুঞ্জ দেখিল, উহা হীরাচাঁদ শঙ্করমলের নামে ত্রিশ হাজার টাকার একখানি চেক, স্বাক্ষরকারীর নাম পড়িতে পারিল না।

বাবুটি অনেকক্ষণ কাগজখানি ভাল করিয়া দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির হস্তে ফেরৎ দিয়া বলিল, "সইটা ঠিকই মিলেছে। এটা আমি অনায়াসেই পাস করে দেব এখন। আমার বখরার টাকাটা এনেছ কি?"

যমুনা বলিল, "দুহাজার এনেছি।"

বাঙ্গালী বাবু বলিল, "মোটে দুহাজার! এই ত্রিশ হাজারের আমার দশহাজার, তোমার বিশ। আমার দশ হাজারের পাঁচ হাজার আগাম, বাকী পাঁচহাজার সন্ধ্যার পর দেবে, এই ত কড়ার ছিল!"

যমুনা বলিল, "তা ত ছিল রমেশ বাবু। কিন্তু সব টাকাটা আমি যে সংগ্রহ করতে পারিনি ভাই। আজি সন্ধ্যাবেলা বাকী আট হাজার নিশ্চয়ই পাবে।"

রমেশ আপত্তি করিতে লাগিল। বলিল, "তবে থাক্, এ সবের মধ্যে আমি নেই।"

যমুনা তাহাকে অনেক মিনতি করিতে লাগিল।

অবশেষে নিজ কথারক্ষা সম্বন্ধে কালীমাঈ, গঙ্গামাঈর দিব্য করায় রমেশ রাজি হইল। যমুনার হস্ত হইতে নেকড়ায় বাঁধা নোটের পুঁটুলি লইয়া বলিল, "সন্ধ্যার পর কোথা দেখা হবে?"

যমুনা বলিল, "আমার বাসাতেই। রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত আমি বাসাতেই থাকবো।"

রমেশ বলিল, "টাকা কিন্তু নিশ্চয় যেন পাই।"

যমুনা বলিল, "তা পাবে, তুমি নিশ্চিন্ত থেক। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। টাকাটা কি কাল পেলে তোমার চলবে না?"

"না, আজ সন্ধ্যাবেলাই চাই। এ দশ হাজারের একটি পয়সাও কি আমি ছুঁতে পারবো ভাই? সমস্তই সেই শ্রীচরণে ঢালতে হবে। কাশীপুরে একখানা বাড়ী বিক্রী ছিল, দশ হাজার টাকা দাম। সেই বাড়ীখানি হরি দেখে এসেছে, তারি পছন্দ হয়েছে, সেখানি কিনবে। তাই দশ হাজার টাকা তার দরকার। এ টাকা আমি তাঁকে না দিতে পারলে সে আর আমায় বাড়ী ঢুকতে দেবে না বলেছে। আজ দেব কাল দেব করে করে এক হপ্তা কেটেছে। কাল আমি তাকে বলে এসেছি, তোমার কাছে টাকাটা ধার চেয়েছি—তুমি দিতে রাজীও হয়েছ। সুতরাং আজ টাকা না দিতে পারলে রক্ষে থাকবে না।"

অতঃপর চেক ভাঙ্গানো সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিয়া রমেশ উঠিল। যমুনাবাবু বলিল, "আচ্ছা, আমি তাহলে দুটোর সময় যাব। তুমি এখন ব্যাঙ্কেই যাচ্ছ নাকি?"

রমেশ বুক পকেটে হাত রাখিয়া বলিল, "না, এই বমাল সুদ্ধ ব্যাঙ্কে গিয়ে কি হবে? টাকাটা হরির কাছে রেখে আসি। এখনও ব্যাঙ্ক খুলতে প্রায় দেড় ঘণ্টা দেরী আছে।"—বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ইহাদের কথাবার্ত্তা হইতে কুঞ্জ স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী রমেশের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া যমুনা জাল চেক ভাঙ্গাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। এবং তাহার বখরার দশ হাজার টাকা হরি নামক তাহার কোনও আত্মীয় বা বন্ধুকে বাড়ী কিনিবার জন্য দান করিবে। কি মনে করিয়া সে উঠিয়া রমেশের সঙ্গ লইল। রমেশ ফটক দিয়া বাহির হইয়া, চিৎপুর রোডগামী ট্রামে আরোহণ করিল। আপিস অঞ্চল ফেরতা ট্রামগুলি তখন প্রায় খালি; কুঞ্জও নির্ব্বিঘ্নে ট্রামে উঠিয়া বসিল।

নূতন বাজারের মোড়ে নামিয়া, রমেশ রামবাগানের একটা গলিতে প্রবেশ করিয়া এক বাড়ীতে গিয়া উঠিল। বাড়ীটির ভাব দেখিয়া কুঞ্জ বুঝিল, তাহা কোনও গৃহস্থের বাসস্থান নহে। রমেশের পশ্চাৎ দ্বিতলের একটী ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মেঝের উপর বসিয়া একটী স্ত্রীলোক, গন্ধতৈলের শিশি সম্মুখে রাখিয়া, চুল খুলিয়া তাহাতে চিরুণী দিতেছে। রমেশকে দেখিয়া সে স্ত্রীলোক হাসিয়া বলিল, "একি! অসময় রসময় কেন হলে হে উদয়!"

রমেশ তাহার কাছে বসিয়া বলিল, "কিছু টাকা এখন এনেছি হরি, এটা রাখ।"—এতক্ষণে কুঞ্জ বুঝিতে পারিল হরি কে এবং কি জাতীয় জীব।

হরি জিজ্ঞাসা করিল, "কত টাকা?"

"দু'হাজার।"

হরি—হরিদাসী বা হরিমতি বা হরিপ্রিয়া—মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "দু'হাজার?—আহা! দু'হাজারে আমার কি কোড়ন হবে?"

"এখন দু'হাজার রাখ ত! সন্ধ্যাবেলা বাকী আট হাজার পাবে।" বলিয়া পকেট হইতে রমেশ নোটের বাণ্ডিল বাহির করিল।

হরি বলিল, "আমার এখন তেল হাত, ছোঁব না। তুমি আমার সামনে গোণ।"

রমেশ উঠিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া আসিয়া, নোটগুলি হরির সামনে ধরিয়া গণিতে লাগিল। গণনা শেষে হরি বলিল, "আচ্ছা ঐ তাড়াশুদ্ধ ঐ তাকিয়ার নীচে রেখে দাও।"

"তাকিয়ার নীচে? চাবি দাও না, একবারে বাক্সে তুলে রাখি। তুমি এখন স্নান করতে যাবে, তাকিয়ার নীচে অতগুলো টাকা পড়ে থাকবে?"

"আমি ত ঘরে তালা বন্ধ করে যাব। নেয়ে এসে বাক্সে টাকা তুলব—এখন ঐখানে রাখ। বাকী আট হাজার আজ কিন্তু চা-ই চাই। নইলে আমি কুরুক্ষেত্র করব তা বলে রাখছি।"—বলিয়া হরি উঠিল।

টাকা যথাস্থানে রাখিয়া রমেশ বলিল, "পাবে পাবে। এখনই উঠছ? একটু বস না। আমার এখনও পনেরো বিশ মিনিট সময় আছে। ভিতরটা আগে স্নান করিয়ে নাও না, তাহলে বাইরের স্নানে বেশ আরাম হবে এখন।"—বলিয়া দেওয়াল আলমারি হইতে রমেশ একটি বোতল পাড়িল।

হরি বসিয়া বলিল, "নিজের খেতে ইচ্ছে হয়েছে তাই বল। তা ঢাল, বেশী ঢেল না।"

"পাগল! আমার এখনি আপিসে যেতে হবে।"—বলিয়া রমেশ গেলাসে কিঞ্চিৎ ঢালিয়া তাহাতে সোডা মিশাইল। উভয়ে তাহা পান করিতে লাগিল।

গেলাস খালি হইলে, ডাবর হইতে দুইটা পাণ লইয়া মুখে দিয়া রমেশ উঠিল। হরিও উঠিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া, নিজ ঘটি সাবান গামছা ইত্যাদি লইয়া বাহির হইল। কুঞ্জ কিন্তু যেখানে বসিয়া ছিল, সেখানেই বসিয়া রহিল।

হরি বাহির হইতে দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া দিল।

কুঞ্জ তখন নোটের তাড়াটি বালিসের তলা হইতে বাহির করিয়া, মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তাহা অদৃশ্য করিয়া নিজ পকেটে পুরিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল, "পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তেই যাওয়া ভাল।" দেওয়াল আলমারিতে হরির সিগারেট ছিল, একটি ধরাইয়া সে মনের সুখে ধূমপান করিতে করিতে, যমুনার সেই ত্রিশ হাজার টাকা কিরূপে হস্তগত হইতে পারে, সেই চিন্তায় ব্যাপৃত হইল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে হরি ফিরিয়া আসিয়া দ্বার খুলিল। কুঞ্জ তখন নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

প্রথমে সে রাধাবাজারের এক দোকান হইতে একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ সংগ্রহ করিয়া, নোটগুলি ও পূর্ব্বদিনের অলঙ্কারগুলি তাহার মধ্যে রাখিল। খাবারের দোকান হইতে কিছু খাবার লইয়া, লালদীঘির ধারে বসিয়া আহার ও বিশ্রাম করিয়া, পৌনে দুইটার সময় সেই ব্যাঙ্কের প্রবেশপথে গিয়া দাঁড়াইল। কিয়ৎক্ষণ পরেই একটি চামড়ার ব্যাগ হস্তে যমুনাপ্রসাদ আসিল। কুঞ্জ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভিতরে প্রবেশ করিল এবং চেক দাখিল করা হইতে টাকা লওয়া অবধি সমস্তক্ষণ তাহার সঙ্গ ছাড়িল না। কুঞ্জলালের ইচ্ছা ছিল, সুযোগ পাইলে পাপের ধন সে নোটগুলিও সে হস্তগত করিবে। কিন্তু সে সুযোগ মিলিল না। প্রাপ্তিমাত্র গণিয়া গণিয়া এক এক হাজার টাকার থাক যমুনাপ্রসাদ তাহার ব্যাগে ভরিতে লাগিল।

অবশেষে যমুনা ব্যাঙ্ক হইতে বাহির হইল। কুঞ্জলাল নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির সুযোগ পাইবার আশায় যমুনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

যমুনা রাস্তায় আসিয়া একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে আরোহণ করিল। কুঞ্জও সেই গাড়ীর পশ্চাতের পাদানে উঠিয়া বসিল।

গাড়ী দেখিতে দেখিতে সূতাপটির এক গলির মধ্যে আসিয়া পৌছিল। কুঞ্জ নামিয়া যমুনাপ্রসাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক বাড়ীতে গিয়া উঠিল। দেখিয়া বুঝিল, এ বাড়ীতে বহুলোক ভিন্ন ভিন্ন ঘর ভাড়া লইয়া বাস করে। যমুনা ত্রিতলে উঠিয়া, একটি ঘরের চাবি খুলিয়া ভিতরে গেল, কুঞ্জলালও তাহার অনুসরণ করিল। যমুনা দ্বার বন্ধ করিয়া, একটি গোপনীয় স্থান হইতে চাবি বাহির করিয়া একটি ট্রাঙ্ক খুলিল। ব্যাগ হইতে নোটগুলি বাহির করিয়া, একখানি কাপড়ে বেশ করিয়া সেগুলি বাঁধিয়া, ট্রাঙ্কের মধ্যে বস্ত্রাদির নিম্নে রাখিয়া, চাবিটি পূর্ব্বস্থানে লুকাইল। একটি বিড়ি ধরাইয়া, পুনরায় বাহির হইয়া দ্বারে তালা বন্ধ করিল—কুঞ্জ ভিতরেই বসিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সে ভিতর হইতে দ্বারটি অর্গলবদ্ধ করিয়া, সেই চাবি লইয়া ট্রাঙ্ক খুলিল, এবং নোটের বস্তা বাহির করিয়া তাহাকে অদৃশ্য করিয়া নিজ ক্যাম্বিসের

ব্যাগের মধ্যে ভরিয়া লইল। পরে চাবিটি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া, যমুনাপ্রসাদের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে, যমুনা ফিরিয়া আসিয়া দ্বার খুলিল; সঙ্গে তাহার একজন লোক—ভাড়াটিয়া গাড়ীর সহিস। যমুনা তাহাকে বলিল, "বাকস্ উঠাও।"

সহিস ট্রাঙ্ক মাথায় লইয়া বাহির হইল। যমুনা ঘরে তালা বন্ধ করিয়া বাক্সবাহীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। কুঞ্জও পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। সদর রাস্তায় নামিয়া দেখিল, একখানা ঠিকা গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। সহিস ট্রাঙ্ক গাড়ীর ছাদে রাখিতে যাইতেছিল, যমুনা বলিল, "ভিতরমে—ভিতরমে।" ভিতরে ট্রাঙ্ক রাখাইয়া, "হাওড়া ষ্টেশন" বলিয়া যমুনা গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

কুঞ্জ বুঝিল, লোকটা রমেশের প্রাপ্য বাকী আট হাজার টাকা ফাঁকি দিবার অভিপ্রায়ে উধাও হইতেছে। চুলায় যাক। তার বত্রিশ হাজার হইয়াছে, আজ লাখ পূরিতে এখনও অনেক বাকী। সুতরাং সে গাড়ীর পশ্চাতে পাদানে বসিয়া বড়বাজারে আসিয়া নামিল।

পদব্রজে যখন সে ব্যাঙ্ক অঞ্চলে গিয়া পৌছিল; তখন চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। একটি ব্যাঙ্কে প্রবেশ করিয়া দেখিল, অন্যান্য কাযকর্ম্ম হইতেছে; কিন্তু টাকাকড়ির লেনদেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সে তখন ক্ষুণ্ণ মনে রাস্তায় বাহির হইয়া দাঁড়াইল। ভাবিতে লাগিল, "আজ দেখ্‌ছি, আর কিছু হবার উপায় নেই। তা একদিনে বত্রিশ হাজার, মন্দই বা কি? রমেশের ব্যাঙ্কেই এখন যাওয়া যাক্—ছুটি হলে সে যমুনাপ্রসাদের বাসাতে গিয়েই বা কি করে, সন্ধ্যার পর হরিই বা তাকে কেমন আদর অভ্যর্থনাটা করে, সেগুলো স্বচক্ষে দেখে নিয়ে, তার পর ডাক্তার সরকারের বাড়ীতে যাওয়া যাবে।"

কুঞ্জ মনে মনে এই স্থির করিয়া, রমেশের ব্যাঙ্কে গিয়া তাহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

পুলিশের গল্প

গৌহাটীর কথা (৩)

আমি গৌহাটিতে বদলি হইবার পর টিউনন সাহেব স্থানান্তরিত হইলেন। তাঁহার স্থানে পিটার সাহেব ডেপুটি কমিশনর হইয়া আসিলেন। তিনি পূর্ব্বে কোথায় ছিলেন এবং এখনই বা কোথায় আছেন সে সংবাদ জানি না। তিনিও টিউনন সাহেবের মত পক্ষপাতশূন্য সুবিচারক ছিলেন। আমি তাঁহার সময়ে কিছুদিনের জন্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছিলাম। সেই সময়ে গৌহাটীর নিকটবর্ত্তী একটা নেপালী বস্তিতে একটা বড় রকমের হাঙ্গামা হইয়াছিল। তাহাতে দুই তিন জন হত এবং কয়েক ব্যক্তি আহত হয়। একজন আহত ব্যক্তিকে আমি হাঁসপাতালে পাঠাইয়াছিলাম। এক দিন পরে আমি হাঁসপাতালে গিয়া দেখিলাম যে তাহাকে অতি নির্দ্দয় ভাবে রাখা হইয়াছে। তাহার পরিহিত বস্ত্র মলমূত্রে

জড়িত দেখিলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে তাহাকে হাঁসপাতালে চিঁড়া খাইতে দেওয়া হয়। আমি তখনই পিটার সাহেবকে এই বৃত্তান্ত জানাইয়া লিখিলাম যে, এইরূপ তাচ্ছিল্যের ফলে লোকটির শীঘ্রই মৃত্যু হইবে এবং তাঁহাকে নিজে একবার হাঁসপাতালে গিয়া লোকটীর অবস্থা দেখিয়া আসিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি আমাকে লিখিলেন যে সেদিন তাঁহার মোটেই অবকাশ নাই, পরদিন দেখিতে যাইবেন। কিন্তু সেইদিনই লোকটির মৃত্যু হইল। পরদিন এই সংবাদ পাইয়া আমি ডাক্তার সাহেবের নিকটে পোষ্ট মর্টেম ফরম পাঠাইলাম। তাহাতে লিখিয়া দিলাম যে হাঁসপাতালে তাহাকে অতি অযত্নে রাখা হইয়াছিল এবং তাহাকে চিড়া খাইতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতেই সম্ভবত তাহার মৃত্যু শীঘ্র হইয়াছে। ডাক্তার সাহেব পোষ্টমর্টেম ফরমের ঘরগুলি পূর্ণ করিয়া, পরে আমার মন্তব্য পড়িয়া মহাক্রুদ্ধ হইয়া যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা সমস্ত কাটিয়া দিয়া পোষ্টমর্টেম ফরম ফিরাইয়া দিয়া লিখিলেন যে আমার মিথ্যা মন্তব্য প্রত্যাহার না করিলে তিনি ফরম পূরণ করিবেন না। আমি পিটার সাহেবকে এই কথা জানাইলাম। তিনি বলিলেন, আমি পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছিলাম, নূতন একখানা ফরমে ঠিক তাহাই লিখিয়া যেন ডাক্তার সাহেবকে পাঠাইয়া দিই। আমি তাহাই করিলাম। সেবারও ফরম ফেরত আসিল। পিটার সাহেবকে জানাইলাম। তিনি তখন আমাকে এবং তাঁহার আসিষ্টাণ্ট রীড সাহেবকে সঙ্গে করিয়া হাঁসপাতালে গেলেন। ডাক্তার সাহেব মহা উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, নেটিব পুলিস কর্ম্মচারী যে লিখিয়াছে মৃতকের বস্ত্র মলমূত্র জড়িত ছিল এবং তাহাকে চিড়া খাইতে দেওয়া হইয়াছিল তাহা মিথ্যা কথা। আমার প্রতি আরও অনেক কটুকাটব্য করিলেন।

পিটার সাহেব তখন তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি কাহার সঙ্গে এসব কথা বলিতেছেন তাহা জানেন কি? ইনি ডিস্‌ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।"

ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "তাই বলিয়া কি একজন ইংরেজ সিবিল সার্জ্জনের কথা অপেক্ষা একজন নেটিবের কথা সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে?"

পিটার সাহেব বলিলেন, "আমি আপনার সহিত কথা কাটাকাটি করিব না। আপনি এই ফরমের ঘরগুলা পূর্ণ করিয়া দিতে বাধ্য। পুলিসের রিপোর্ট বিষয়ে আপনার যাহা বক্তব্য থাকে তাহা আপনি লিখিয়া দিতে পারেন।"

ইহার পর ডাক্তার সাহেব ফরম লিখিয়া পাঠাইলেন। বলা বাহুল্য যে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা একথাও তিনি লিখিলেন। বোধ হয় ইহার দুই তিন মাস পরে পিটার সাহেব গৌহাটি হইতে স্থানান্তর হইবার পর একদিন ডাকে ডাক্তার সাহেবের এক পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে তিনি আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন সে জন্য তিনি দুঃখিত। আমার অনুমান এই যে, পিটার সাহেব ডাক্তার সাহেবের বিরুদ্ধে চীফ কমিশনরকে জানাইয়াছিলেন এবং চীফ কমিশনরের ধমকেই ডাক্তার সাহেব দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন চীফ কমিশনর ছিলেন স্যর উইলিয়াম ওয়ার্ড। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে মৃতকের তাচ্ছিল্য যাহা করা হইয়াছিল তাহা সিবিল সার্জ্জনের অগোচরেই হইয়াছিল। তিনি তাঁহার অধীন লোকদিগের সমর্থন করিয়াছিলেন মাত্র। তাঁহার বিরুদ্ধে আর কখনও কিছু শুনা যায় নাই।

আসামে দুই তিন জন সিবিল সার্জ্জন এরূপ দেখিয়াছি, যাঁহারা কোন ডাক্তারী পরীক্ষায় পাস হন নাই বলিয়া শুনিয়াছি। ইঁহাদের একজনের সম্বন্ধে জেলার ডেপুটি কমিশনর বলিতেন যে, সেই সিবিল সার্জ্জন যাহার চিকিৎসা করেন তাহাকে দুই দিনের মধ্যে বিষ খাওয়াইয়া মারেন। সেই ডেপুটি কমিশনর নিজে পীড়িত হইলে বাঙ্গালী ডাক্তারের চিকিৎসাধীন হইতেন, সেই সিবিল সার্জ্জনকে দিয়া কখনও চিকিৎসা করাইতেন না। সেই সিবিল সার্জ্জন ও আমি একই সময়ে আসামী ভাষায় পরীক্ষা দিয়াছিলাম।

তিনি ও আমি পরীক্ষাস্থলে পাশাপাশি বসিয়াছিলাম। তিনি একটা আসামী কথা জানিতেন না বলিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিয়া দিলাম। আমিও একটা আসামী শব্দের অর্থ জানিতাম না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তিনি এমনি ভাব প্রকাশ করিলেন যেন তিনি সম্পূর্ণ বধির। আর একজন সিবিল সার্জ্জন, বোধ হয় চিকিৎসা বিদ্যার কিছুই জানিতেন না। আমি পেন্‌সন লইবার পর সংবাদপত্রে দেখিয়াছি যে স্থানীয় লোকে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য কত প্রার্থনা করিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে ফল হয় নাই। ডিপার্টমেণ্টাল হেড আফিস হইতে এই সকল সিবিল সার্জ্জনকে যে পত্র লেখা হইত তাহাতে তাঁহাদিগকে ডক্টর না বলিয়া মিষ্টার বলা হইত।

ব্রহ্মপুত্রের উপর দিকে এবং নীচের দিকে যত ষ্টীমার যাইত, সবগুলিই রাত্রিতে গৌহাটির ঘাটে নঙ্গর করিয়া থাকিত। আমি প্রায়ই তাহা দেখিতে যাইতাম। কত পরিচিত অপরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ হইত। কখন কখন নূতন এবং দর্শনীয় বস্তুও দেখিতে পাইতাম। একদিন উপরগামী এক ষ্টীমারে গিয়া দেখিলাম একজন প্লাণ্টারের চারিটা কুকুর নীত হইতেছে। এত বড় কুকুর পূর্ব্বে বা পরে কখনও দেখি নাই এবং কুকুর যে এত বড় হয় তাহা কখন কল্পনায়ও আসে নাই। প্রত্যেকটাই বোধ হয় ন্যূনাধিক আড়াই হাত উচ্চ ছিল। ইহার একটাই বোধ হয় একটা রয়াল বেঙ্গল টাইগারকে পরাস্ত করিতে পারে। শুনিলাম ইহাদের খাদ্যের জন্য প্রত্যহ একটা বড় ভেড়া, দশসের দুধ এবং বহু পরিমাণে চাউল ও বিস্কুট লাগে। কুড়ি একুশ দিনের একটা বাচ্চা পাঁচ শত টাকায় অল্পদিন পূর্ব্বে বিক্রীত হইয়াছিল।

একদিন ষ্টীমারে গিয়া নগাঁয়ের ডেপুটী কমিশনর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি পুলিস সাহেবের কায করিতেছি সেজন্য তিনি আমাকে অভিনন্দন করিয়া বলিলেন যে আক্কাংকাচারীর মকর্দ্দমার সময় তিনি নগাঁয়ের পুলিস সাহেবের কথাতেই ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই নগাঁয়ের পুলিস সাহেবের মৃত্যু হয়। ডেপুটি কমিশনর সাহেবও এক বৎসরের মধ্যে দেহত্যাগ করেন।

আমি যখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, তখন জে ডি এণ্ডরসন ইনস্পেক্টর জেনারাল ছিলেন। এক দিন তিনি শিলং হইতে গৌহাটি হইয়া নিজের ষ্টীমারে অন্য কোন জেলায় যাইবার সময়ে আমি সেই ষ্টীমারে গিয়া সাক্ষাৎ করিলাম। দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি ও আমি এক সময়ে তেজপুরে ছিলাম। তখন আফিসের কথা ভিন্ন তাঁহার সহিত বড় অধিক আলাপ হয় নাই। কেবল একদিন প্রাতঃকালে নগরের বাহিরে বেড়াইতে গিয়া দৈবাৎ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। উভয়ে গল্প করিতে করিতে ফিরিয়া আসিলাম। কথা হইল প্রধানত মনুক্ত আট প্রকার বিবাহ সম্বন্ধে। তিনি বলিলেন, আট প্রকার বিবাহই শাস্ত্রসম্মত। মনু আমার মোটেই পড়া ছিল না, তথাপি বলিলাম, "কিন্তু পৈশাচ ও রাক্ষস বিবাহ উভয়কেই মনু নিন্দা করিয়াছেন এবং অবৈধ বলিয়াছেন।"

ইহা শুনিয়া তিনি আমার দিকে একবার আপাদ মস্তক চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পর কথায় কথায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা উঠিল। দেখিলাম তিনি কিছু কিছু বাদসাদ দিয়া বাইবেল বিশ্বাস করেন। তিনি বলিলেন যে বাইবেলের সকল কথা ইতিহাস ও বিজ্ঞান সম্মত নহে। আমি বলিলাম, "ঐতিহাসিক হিউম বলেন যে খৃষ্টের বিবরণে, ইতিহাস-বিরোধী কোন কথাই নাই কিন্তু সেই বিবরণ সর্ব্বাংশে বিজ্ঞানসম্মত নহে। অন্য পক্ষে বৈজ্ঞানিক হক্সলী বলেন যে সেই বিবরণে বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ কিছুই নাই কিন্তু তাহা সর্ব্বাংশে ইতিহাস-সম্মত নহে।" একজন দেশীয় পুলিস কর্ম্মচারীর মুখে হিউম ও হক্‌সলীর নাম শুনিয়া এণ্ডরসন্‌ সাহেব বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। বলা বাহুল্য তাঁহার এই বিস্ময় প্রকাশে আমি কিছু সন্তোষ লাভই করিলাম।

এণ্ডরসন সাহেব বাঙ্গালীদিগের প্রতি বড় সদয় ও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। কোন বাঙ্গালী কোন মকদ্দমায় পড়িলে তাহার প্রতি যতদূর সম্ভব অনুগ্রহ করিতেন। তেজপুরে যত বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার সৌজন্যের কথা বলিতেন এবং তাঁহার বাঙ্গলা ভাষায় সুন্দর কথা কহিবার ক্ষমতার প্রশংসা করিতেন। আমি কিন্তু তাঁহার বাঙ্গলা কথা কখনও শুনি নাই। একদিন কথায় কথায়, তিনি যে সকল বাঙ্গলা বই পড়িয়াছিলেন তাহার কতকগুলির নাম করিলেন। আমি দেখিলাম তাহার অধিকাংশ আমি পড়ি নাই।

এণ্ডরসন সাহেব আসাম হইতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর চট্টগ্রামের কমিশনর হইয়াছিলেন। তাহার পরই বোধ হয় পেন্সন লইয়া অবসর গ্রহণ করেন। পরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষকতা করিতেন এবং সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদিগকে বাঙ্গলা শিখাইতেন। প্রায় দুই বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সেই সময় পর্য্যন্ত তিনি সেই শিক্ষকের পদেই ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি আমাকে ন্যূনাধিক একশতখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। এই সকল পত্রে মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি নিজের কিছু কিছু পরিচয় দিতেন। বাঙ্গালী সাহিত্যানুরাগী অনেকেই বোধ হয় এণ্ডরসনের নাম শুনিয়াছেন। তাঁহার সহিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায়, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি খ্যাতনামা সাহিত্যিকদিগের পত্রব্যবহার ছিল। তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস পড়িয়া বড় আহ্লাদিত হইতেন। ইঁহারা সকলেই বোধ হয় তাঁহার কিছু পরিচয় জানিলে সন্তুষ্ট হইবেন। তাঁহার পিতা ছিলেন জেনারেল এণ্ডরসন। তিনি পঞ্জাবে ছিলেন। পঞ্জাবেই এণ্ডরসনের জন্ম হয়। তাঁহার প্রথম কর্ম্মক্ষেত্র ছিল নদীয়া জেলার মেহেরপুরে। তাঁহার ছয় পুত্র এবং একটী কন্যা। কন্যাটী যুদ্ধের কয়েক বৎসর যুদ্ধক্ষেত্রে শুশ্রূষাকারিণী ছিলেন। যুদ্ধের পর অত্যন্ত রুগ্ন হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। তিনটি পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া পুনঃ পুনঃ আহত হন। এই আহতদিগের একটি, যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার পর পাদরী হইয়াছেন এবং বিবাহ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে এক পুত্র পঞ্জাবের সিবিলিয়ান।

এণ্ডরসন বার্দ্ধক্যবশতঃ যুদ্ধ করিতে যাইতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া কতবার আমাকে চিঠি লিখিয়াছেন। আমার একটি পুত্রকে যুদ্ধে পাঠাইয়াছিলাম এবং সে বোগদাদে কারারুদ্ধ হইয়াছিল শুনিয়া তিনি এতই প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন যে, সে সংবাদটা স্যর ব্যামফিল্ড ফুলার সাহেবকে জানাইয়াছিলেন। ফুলার সাহেবও আমাকে অভিনন্দন করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু আমি যখন তেজপুরে থাকিতে মণিপুরের যুদ্ধে যাইতে চাহিয়াছিলাম তখন আমাকে যাইতে দেন নাই।

এণ্ডরসন কোন কোন পত্রের কিয়দংশ বাঙ্গলায় লিখিতেন। একখানি পত্রের সমস্তটাই বাঙ্গলায় লিখিয়া নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন "ইন্দ্র সিংহ"। আমি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম যে ইন্দ্র সিংহ অপেক্ষা তাঁহার নামের সহিত ইন্দ্রসেন নামের অধিক ঐক্য আছে, বিশেষতঃ ইন্দ্রসিংহ নামে কোন বিখ্যাত লোক কখনও ছিল না, অন্য পক্ষে ইন্দ্রসেন নামক এক ব্যক্তি যুধিষ্ঠিরের বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহার কথা মহাভারতে আছে। ইন্দ্রসেন নামের পক্ষে আর একটা যুক্তি এই দিয়াছিলাম যে, উহার শেষার্দ্ধ সেন শব্দটা অনেক দেশের অনেক বিখ্যাত লোকের নামের শেষে আছে যথা নানসেন, আনন্দ সেন, কেশবসেন, ইবসেন বল্লাল সেন, সন্যাৎসেন প্রভৃতি। ইহার পরই তিনি আর এক ব্যক্তিকে এক পত্র লিখিবার সময়ে "ইন্দ্রসেন" স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

শেষ পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে এণ্ডরসন আমাকে ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন কোন কথা লিখিতেন এবং তিনি যে খৃষ্টধর্ম্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন তাহা জানাইতেন।

এণ্ডরসন সর্ব্বদা নানাদেশের সাহিত্য চর্চ্চা করিতেন

এবং নানা ভাষা জানিতেন। খুব হাস্যরসপ্রিয় ছিলেন। তিনি মকদ্দমার রায় লিখিবার সময়েও কখন কখনও হাস্যরসের অবতারণা করিতেন এবং সময়ে সময়ে সেক্সপিয়ার প্রভৃতির বচন উদ্ধৃত করিতেন। প্রায় প্রতি বৎসরেই আসামের বন্য জাতির একটা না একটা ভাষায় পরীক্ষা দিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক পাইতেন। একবার গৌহাটী শিলং পথের এক টঙ্গার আড্ডায় একজন কাচারী একাকী সহিসের কায করিতেছিল। তিনি হঠাৎ সেখানে গিয়া তাহার সহিত কাচারী ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। লোকটা যখন মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল যে একজন সাহেব কাচারীতে কথা কহিতেছেন, তখন সে বোধ হয় তাঁহাকে ভূত ভাবিয়া দৌড়িয়া পলান করিতে আরম্ভ করিল। তিনি তাহাকে কোন মতে থামাইয়া তাহার সহিত কয়েক মিনিট আলাপ করিলেন। লোকটা ভয় সন্দেহ এবং বিস্ময়ে অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছিল। তিনি তাহার সেই সময়কার ভাবটা বর্ণনা করিয়া এমনি ভাবে গল্প করিতেন যে লোকে তাহা শুনিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিত না।

এণ্ডারসনের সম্বন্ধে আর কোন উল্লেখযোগ্য কথা মনে পড়িলে পরে লিখিব।

আমার "পুলিস সাহেবী" করার সময় অতীত হইলে ব্যাম্বার সাহেব পুলিস সাহেব হইলেন। তিনি আমাকে বড়ই উত্যক্ত করিয়াছিলেন। আমার সম্বন্ধে তিনি কয়েকটা মিথ্যা কথা শুনিয়াছিলেন। গৌহাটীতে গিয়াই আমাকে তাহা জানাইলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে তিনি যাহা শুনিয়াছেন তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। তাহার পর তিনি আমাকে বলিলেন যে তিনি ও আমি সর্ব্বদাই মফঃস্বলে ঘুরিয়া বেড়াইব, তিনি যখন ব্রহ্মপুত্রের উত্তর দিকে থাকিবেন তখন আমাকে দক্ষিণ দিকে থাকিতে হইবে, এবং তিনি দক্ষিণে থাকিবার সময়ে আমাকে উত্তরে থাকিতে হইবে। আমি বলিলাম, সেরূপ করিলে তিনি লাভবান হইবেন বটে যেহেতু তিনি ভাতা পাইবেন, কিন্তু আমার সর্ব্বনাশ হইবে—যেহেতু আমি একে অল্প বেতন পাই, তাহাতে ভাতা এক পয়সাও পাই না, এবং এরূপ করিলে কাযের ভয়ানক ক্ষতি হইবে। কিন্তু সে সকল কথায় তিনি কাণ দিলেন না। আমি যখন উত্তর পারে গৌহাটি হইতে ৩০।৩৫ মাইল দূরবর্ত্তী একস্থানে আছি, তিনি তখন হয়ত দক্ষিণ পারে প্রায় ৫০ মাইল দূর হইতে তাঁহার সহিত অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আর্জেণ্ট টেলিগ্রাফ করিতেন। আমি তাঁহার কাছে গেলে বলিতেন, বিশেষ কিছুই নহে আমার কাযকর্ম্ম কেমন চলিতেছে তাহাই জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমাকে ডাকিয়াছিলেন। এইরূপ কয়েকবার করার পর আমি মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম যে, এইবার মফঃসল হইতে ফিরিয়াই তাঁহার নামে অভিযোগ করিব। কিন্তু সেবার মফস্বল হইতে আসিয়া দেখি যে ব্যাম্বার সাহেব বদলি হইয়া গিয়াছেন। শুনিলাম, টেনিস খেলিবার সময়ে কমিশনর গডফ্রী সাহেবের সহিত কি বচসা হইয়াছিল, তাহারই ফলে তিনি আদেশ প্রাপ্তি মাত্র গৌহাটি ত্যাগ করিয়াছিলেন। আমি হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

পিটার সাহেবের পর ম্যাকেব সাহেব কামরূপে ডেপুটি কমিশনর হইলেন। তিনি পূর্ব্বে তেজপুরে ছিলেন। আমিও তখন তেজপুরে ছিলাম। তিনি অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং সকল বিষয়ে দক্ষ লোক ছিলেন। বিদ্যাবত্তা ও বক্তৃতাশক্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল। তাঁহাকে কয়েকবার পার্ব্বত্য দুর্দ্দান্ত জাতিদের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইয়াছিল। কি এইরূপ কার্য্য, কি বিচার কার্য্য, কি শাসন কার্য্য—সকল কার্য্যই তিনি ক্ষিপ্রহস্তে সুসম্পন্ন করিতে পারিতেন। ইহা ভিন্ন তিনি মিষ্টভাষী, সত্যবাদী, আমোদপ্রিয়, সুদর্শন, পরোপকারী ও দাতা ছিলেন। কিন্তু একবার কোন লোককে দাতা বলিয়া জানিতে পারিলে সংসার তাহাকে ঠকাইবেই ঠকাইবে। কত লোক অভাবের ভাণ করিয়া তাঁহাকে ঠকাইত। একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর

পত্নী কোন অভাব না থাকাতেও ম্যাকেব সাহেবের নিকটে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। ম্যাকেব সাহেব অতি অনিচ্ছায় তাঁহাকে একশত টাকা দিয়াছিলেন। একথা ম্যাকেব সাহেব নিজেই একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন। যাহারা তাঁহাকে এইরূপ ঠকাইত, তাহারা কোন্‌দেশীয় লোক তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই।

ড্রাইবর্গ সাহেব অবসর গ্রহণ করিবার পর ম্যাকেব সাহেব ইনস্পেক্টর জেনেরাল হইয়া শিলংএ গেলেন। সেখানে তিনি ভূমিকম্পের সময়ে গৃহমধ্যে নিদ্রিত ছিলেন। ভূমিকম্পে ঘর চাপা পড়িয়া তাঁহার মৃত্যু হইল।

গৌহাটিতে থাকিবার সময়ে ম্যাকেব সাহেব একবার একজন কেরাণীকে তাঁহার নিজ বেতনের বিল দিয়া, ট্রেজরি হইতে টাকা আনিতে পাঠাইয়াছিলেন। সুবুদ্ধি কেরাণী হয়ত ভাবিল যে সাহেব যখন কত লোককে কত টাকা দানই করিয়া থাকেন, তখন তিনি যদি সাহেবের বেতনের ১৮০০ টাকা আত্মসাৎ করেন তাহা হইলে সাহেব সন্তুষ্টই হইবেন। এই ভাবিয়াই হউক, বা অন্য কিছু ভাবিয়াই হউক, তিনি ট্রেজরি হইতে টাকা লইয়া সেদিন আর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না, এবং সেই রাত্রেই সমস্ত টাকা ব্যয় করিয়া ফেলিলেন। পরদিন সাহেব তাঁহাকে ডাকাইয়া টাকা চাহিলে তিনি বলিলেন যে তিনি তাহা খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন। সাহেব তখন তাঁহাকে আমার হাতে সমর্পণ করেন। আমি তাঁহাকে লকআপে বন্ধ করিয়া রাখিলাম। দুই এক দিনের মধ্যেই তাঁহার আত্মীয়েরা টাকার জোগাড় করিয়া তাহা সাহেবকে দিয়া সেই বুদ্ধিমান লোকটিকে উদ্ধার করিলেন।

ব্যাম্বার সাহেবের পর বেরিংটন সাহেব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলেন এবং ম্যাকেব সাহেবের স্থানে অন্য ডেপুটি কমিশনর আসিলেন।

একদিন রাত্রি ১০টার সময়ে ডেপুটি কমিশনরের আদেশে, তাঁহার চাকরেরা দুইজন লোককে ধরিয়া আমার নিকটে লইয়া আসিয়া জানাইল যে, সেই দুই ব্যক্তি তাহাদের মনিবকে অন্বেষণ করিবার ব্যপদেশে ডেপুটি কমিশনরের কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করিয়াছিল। লোক দুইটির হাতে লণ্ঠন ছিল। তাহাদিগকে ও ডেপুটি কমিশনরের চাকরদিগকে এবং অন্যান্য লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঘটনার বৃত্তান্তটা এইরূপ জানা গেল। দানেশ মহম্মদ নামক একটি ভদ্রলোক একটা সভায় যাইবেন বলিয়া সন্ধ্যার সময়ে বাড়ী হইতে বাহিরে গিয়াছিলেন। রাত্রি ৯টার সময় তাঁহার বাড়ী ফিরিবার কথা ছিল। কিন্তু ৯টার সময়ে তিনি ফিরিলেন না দেখিয়া তাঁহার মাতা সেই চাকর দুইজনকে লণ্ঠন দিয়া পুত্রকে অনুসন্ধান করিতে পাঠাইলেন। চাকরেরা পূর্ব্বে দেখিয়াছিল যে তাহাদের মনিব কখন কখন ডেপুটি কমিশনর সাহেবের কাছারীতে সমবেত সভায় যাইতেন। কিন্তু সেদিন রাত্রি হইয়াছিল সুতরাং কাছারীতে সভা বসিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাহারা ভাবিল যে হয়ত ডেপুটি কমিশনরের বাড়ীতে এবার সভা হইবে। এই ভাবিয়া তাহারা সেখানে গিয়া চাকরদিগকে তাহাদের মনিবের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। চাকরেরা তখনই তাহাদিগকে ধরিয়া সাহেবের কাছে লইয়া যায়। তাহারা স্পষ্টই অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া সাহেব তাহাদিগকে পুলিসে পাঠাইলেন।

আমি এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, থানার সব-ইনস্পেক্টরকে প্রথম সংবাদ রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া এবং আসামী দিগকে ছাড়িয়া দিয়া "সি" পাঠে শেষ রিপোর্ট দিতে আদেশ করিলাম, যেহেতু আমার বিবেচনায় আসামীরা কোন অপরাধ করে নাই। পরদিন সেই রিপোর্ট পাইয়া সাহেব আমাকে ডাকাইয়া, ডেপুটি কমিশনর যে মকদ্দমায় বাদী সেই মকদ্দমা আমি নিজে তদন্ত না করিয়া একজন দারোগাকে দিয়া তদন্ত করাইয়াছি বলিয়া বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং আমাকে তদন্ত করিতে বলিলেন। আমি তাহাই করিলাম, এবং পূর্ব্বের মত

কোন অপরাধ নাই বলিয়া রিপোর্ট করিলাম ; বেরিংটন সাহেব আমার মত সমর্থন করিয়া মন্তব্য লিখিলেন। তখন ডেপুটি কমিশনর আসামীদিগকে বিচারার্থ চালান দিতে আমকে আদেশ করিলেন। তাই করা গেল। বিচারক আসিষ্টাণ্ট কমিশনর—তাঁহার নামটা আমার মনে নাই। বোধ হয় ফ্রেঞ্চ সাহেব। তিনি আসামীরা নিরপরাধ বলিয়া তাহাদিগকে মুক্তি দিলেন। আমি তখন হইতেই ডেপুটি কমিশনর সাহেবের কোপে পড়িলাম।

বেরিংটন সাহেব পীড়িত হইয়া তিন মাসের বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমি তাঁহার স্থানে একটিনি পাইলাম। কিন্তু ইহা পাইবার দুই তিন দিন পূর্ব্বে আমার নিজের কোনও কার্য্যে একবার তেজপুরে যাইবার প্রয়োজন হইল। ডেপুটী কমিশনের সাহেবকে জানাইলাম। তিনি বলিলেন, আমি ছুটি লইলে, আমাকে পুলিস সাহেবের পদে নিযুক্ত হওয়া তিনি বন্ধ করিয়া দিবেন। আমি বেরিংটন সাহেবের কাছে দুই দিনের ছুটি চাহিলাম। তিনি তখনই ছুটি দিয়া বলিলেন যে, ডেপুটী কমিশনর জানিলে ছুটি রদ করিয়া দিবেন। তখনই ইনস্পেক্টর জেনেরালের কেষ্ট্রীল নামক ষ্টীমার তেজপুরে যাইতেছিল। আমি তাহাতে চড়িয়া পলায়ন করিলাম। তেজপুর হইতে একদিন পরে ফিরিয়া আসিয়া জানিলাম যে, ডেপুটি কমিশনর আমার ছুটি লওয়ার কথা জানিতে পারিয়া আমাকে ফিরাইবার জন্য ঘাট পর্য্যন্ত লোক পাঠাইয়াছিলেন। ইহাও বোধ হয় আমার প্রতি তাঁহার কোপবৃদ্ধির একটা কারণ হইল। যাহা হউক আমার একটিনি বন্ধ হইল না।

ইহার পূর্ব্বেই সার হেন্‌রী কটন আসামের চীফ কমিশনর হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার যশঃসৌরভ সমগ্র আসামে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি যেদিন গৌহাটিতে পৌঁছিলেন সেদিন গৌহাটিতে জনসাধারণের যেরূপ উল্লাস হইয়াছিল, তেমন পূর্ব্বে বা পরে আর কখনই দেখি নাই। তিনি যেরূপ লোকের সহিত মিশিতেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। তিনি কি রূপে মাণিকরাম বরুয়ার এবং আরও দুই একজন কালা আদমির গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, কি রূপে বাঙ্গালীরা "হরি হরি বোল" এবং আসামীরা "হরি হরি বোলা" ধ্বনি করিলে টুপি উঠাইয়া ধরিতেন, সেই সকল কথা বহুদিন গৌহাটিতে সকলের কথার বিষয় ছিল।

আমার পর পুলিস সাহেব হইয়া আসিলেন উইলিয়াম্‌সন সাহেব। বহু বৎসর পরে সংবাদপত্রে পড়িয়াছি যে তাঁহাকে আবরেরা হত্যা করিয়াছিল। তাঁহার সময়েই আসামে ভীষণ ভূমিকম্প হয়। তাহার তিন চারি মাস পূর্ব্বে ড্রাইবর্গ সাহেব পেন্সন লইয়া স্বদেশে গিয়াছিলেন। ভূমিকম্পের তিন চারি দিন পরে গৌহাটিতে কেবল শিশুদিগের ওলাউঠা হইতে লাগিল এবং তাহাতে বহু শিশুর মৃত্যু হইল। আমার একটি আড়াই বৎসরের কন্যা ওলাউঠায় আক্রান্ত হইল। তাহার মৃত্যুর কয়েক মিনিট পূর্ব্বে আমার নিম্নপদস্থ কয়েকজন কর্ম্মচারী দেখিতে আসিয়াছিলেন। সেই সময় উইলয়ামসন সাহেবও আসিলেন। তিনি বোধ হয় আমাকে কিছু বলিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু আমার কন্যাটীর মুমূর্ষু অবস্থা দেখিয়া আমাকে কিছু না বলিয়া সেই কর্ম্মচারীদিগকে ধমকাইয়া গেলেন। ইহার কয়দিন পরেই আমি শিবসাগরে বদলি হইবার আদেশ পাইলাম।

এখন এই ব্যক্তিগত কথা ছাড়িয়া দিয়া ভূমিকম্পের কথাটা আরও কিছু বলিব। জুন মাস, অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে। এমন সময়ে অপরাহ্নে আমার কয়েটী বন্ধু আমার বাসায় আসিলেন। আমার ঘরের সম্মুখে তাঁহাদিগকে বসিবার স্থান দিব বলিয়া একটা মাদুর বাহির করিলাম। তাঁহাদেরই একজন মাদুরটা বিছাইতেছিলেন, এমন সময়ে ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। পূর্ব্বেও অনেকবার ভূমিকম্প দেখিয়াছি, একবার একটা ধাক্কার পরই থামিয়া যাইত। কিন্তু এবারকার

কম্পটা যেন থামিবে না। অবিরত ভয়ানক কম্প হইতে লাগিল। আমার বাসার সম্মুখস্থ কয়েকটা আমগাছ হইতে সমস্ত আম পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আস্তর খসিয়া পড়িল। ঘরে যে দুই চারিটা কাচপাত্র ছিল তাহা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। আমার প্রতিবেশী একষ্ট্রা আসিষ্টান্ট কমিশনর হরিশ্চন্দ্র চাকী মহাশয়ের বাসাও সেই দশাগ্রস্ত হইল। একজন কনষ্টেবল দৌড়িয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে থানার ঘরগুলি সমস্তই পড়িয়া গিয়াছে এবং একজন কনষ্টেবল চাপা পড়িয়াছে। থানার ঘর কয়েকখানার দেওয়াল ছিল ইটের কিন্তু চাল ছিল কাঠের। আমার সেখানে যাইবার পর চাপা-পড়া কনষ্টেবলটী অক্ষত শরীরেই চালের নীচে হইতে বাহির হইল। তখনই সংবাদ পাইলাম যে কাছারী, ট্রেজরী, সাহেবদের বাড়ী সমস্তই পড়িয়া গিয়াছে। আফিস ঘর পড়িয়া যাওয়ায় এক মেম সাহেব চাপা পড়িয়াছিলেন, নিকটের একখানা ঘর পড়ায় একজন চাকর চাপা পড়িয়াছিল। কয়েকজন সাহেব আসিয়া উভয়কেই অক্ষত-শরীরে উদ্ধার করেন। তিন চারিজন ঘর চাপা পড়িয়া মারা গেল। শিলংএর দিকে ডাক লইয়া টঙ্গা রওনা হইল কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই রাস্তা ভাঙ্গিয়াছে দেখিয়া ফিরিয়া আসিল। শান্ত ব্রহ্মপুত্র নদ অতি ভয়ানক গর্জ্জন করিতে লাগিল। সেই গর্জ্জন চারি পাঁচ মাইল দূর হইতে শুনা গিয়াছিল। নদীর জল মসীবর্ণ ও দুর্গন্ধ হইয়া গেল। ব্রহ্মপুত্রের এই রুদ্রভাব দুই তিন দিন ছিল। আমার বাসার নিকটে নদীর ধারে বড় রাস্তার একস্থান ফাটিয়া গেল। তাহার মধ্য হইতে একটা মৃত নরদেহ বাহির হইয়া পড়িল। বোধ হয় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে লোকটিকে কেহ হত্যা করিয়া পুঁতিয়া রাখিয়াছিল। নানাস্থান হইতে দুই তিন হাত উচ্চ হইয়া জলধারা উঠিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি পুনঃ পুনঃ ভূকম্পন হইতে লাগিল। এক একবার কম্পনের পরই ভয়ানক তীব্র পচা গন্ধ বাহির হইতে লাগিল। পরদিন প্রাতঃকালে আমার বাসা হইতেই দেখিতে পাওয়া গেল যে, কামাখ্যা মন্দিরের চূড়াটা পড়িয়া গিয়াছে। পরে কয়েকদিনও কম্পনের নিবৃত্তি হইল না। ঘণ্টায় আট দশবা'র কম্পন হইতে লাগিল। হরিশ বাবুর সঙ্গে দেখা হইলে তিনি বলিলেন, "এ যে মশায়—'এখনো কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া!"

ভূমিকম্পের পর আর আমি মফঃসলে যাই নাই। কিন্তু মফঃসল হইতে যে সংবাদ পাইয়াছিলাম নিম্নে তাহার কতক লিখিতেছি।

গৌহাটি হইতে ২৬ মাইল দূরে ছয়গাঁও নামে একটা থানা আছে। তাহার নিকটবর্ত্তী রাস্তাটা কয়েক মাইল পর্য্যন্ত ফাটিয়া গিয়াছিল এবং সেই বিদীর্ণ স্থান হইতে শত শত বিষধর সর্প বাহির হইয়াছিল। নদীর অপর পারে গৌহাটি হইতে ৩০ মাইল দূরে পাগলাদীয়া নদীটা নলবাড়ী থানা হইতে প্রায় এক চতুর্থ মাইল দূরে ছিল। ভূমিকম্পের সময়ে আধ মিনিটের মধ্যে নদীর সেই খাতটা বন্ধ হইয়া গেল এবং থানার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইল। নলবাড়ীর অনেক স্থান ফাটিয়া গিয়া তাহা হইতে স্তূপীকৃত বড় বড় শাল কাঠ বাহির হইল। ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হয় যে পূর্ব্বে সেখানে নদী ছিল এবং সেই নদী দিয়া শালকাঠের মাড় নীত হইত। কামারকুচি নামক একটি গ্রাম পূর্ব্বে জলে ডুবিয়া যাইত, কিন্তু ভূমিকম্প গ্রামটাকে পাঁচ ছয় হাত উপরে তুলিয়া দিয়াছিল। বোকো নামক স্থানের একটা খুব বড় বিলও এক মিনিটের মধ্যে শুকাইয়া যাওয়ায় তাহার সমস্ত মাছ মরিয়া গিয়াছিল। আসামে যেখানে যত কূপ ছিল, ভূমিকম্পের পর দেখা গেল সেগুলি জলশূন্য ও বালুকাপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। বড়পেটায় নানাস্থান ফুটিয়া এমন জলধারা উঠিতে লাগিল যে, দশমিনিটের মধ্যে বড়পেটা দশ হাত জলের নিচে গেল। ভরলু নদীর উপর একটা লোহার পুল ছিল। দেখিলাম তাহা ভাঙ্গিয়া যায় নাই কিন্তু বাঁকিয়া রহিয়াছে। ইহাতেই বুঝা গেল যে নদীর প্রস্থটা পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে।

আমার সমসাময়িক কামরূপের উল্লেখযোগ্য কয়েক ব্যক্তির কথা কিছু বলিয়া এবং কামরূপের লোকের আচার ব্যবহারের কিছু বর্ণনা করিয়া আগামী বারে গৌহাটীর কথা সমাপ্ত করিবার ইচ্ছা রহিল। *

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

---

* শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভাদুড়ী মহাশয় কলিকাতা হইতে আমা-দিগকে লিখিয়াছেন—

"গত চৈত্রমাসের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয়ের লিখিত পুলিসের গল্প শীর্ষক প্রবন্ধে 'গৌহাটির কথা'তে একটি ভুল দেখিয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি।

সেন মহাশয় লিখিয়াছেন. আমার সময়ে মনোমোহন লাহিড়ীও এক প্রধান উকীল ছিলেন। তিনিও নিজ ব্যবসায়ে এবং চরিত্রগুণে খুব যশস্বী ছিলেন। তাঁহার পিতা হরিমোহন লাহিড়ী মহাশয় গৌহাটীতে, স্কুলের ডেপুটি ইনস্পেক্টর ছিলেন।"

প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত মনোমোহন লাহিড়ী মহাশয় কোনকালেই গৌহাটীতে উকিল ছিলেন না, এবং তাঁহার পিতার নামও হরিমোহন লাহিড়ী নয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন লাহিড়ী মহাশয় আসামের অন্তর্গত তেজপুর নামক স্থানের উকীল এবং এখনও সেখানে ওকালতী করিতেছেন।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় যাঁহার নাম লিখিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রমোহন লাহিড়ী। ইনি গৌহাটিতে এখনও ওকালতী করিতেছেন। ইঁহারই পিতার নাম হরিমোহন লাহিড়ী। তিনি গৌহাটিতে স্কুলের ডেপুটি ইনস্পেক্টর ছিলেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রমোহন লাহিড়ী ও মনোমোহন লাহিড়ী উভয়েই আমার নিকটাত্মীয়। সেই কারণেই আমি এই প্রতিবাদ করিলাম।"

দারার দুরদৃষ্ট

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যেদিন প্রাতঃকালে বহু সৈন্য ও সুদক্ষ সেনাপতি-গণের সহিত ব্যূহরচনা করিয়া ভারতের ভাবী সম্রাট্ সসজ্জ দারা সেকো সামুগড়ের সৈকতময় ক্ষেত্রে ঔরঙ্গজীবের অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেদিন তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিতে পারেন নাই যে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই তাঁহার আশা ভরসা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, ছত্রশাল প্রভৃতি বহুযুদ্ধের নায়ক রাজপুত বীরগণ অসামান্য বীরত্বপ্রকাশ করিয়াও ঔরঙ্গজেবের কামানের সম্মুখে কেবল নিরর্থক জীবনদানে প্রভুর ঋণ পরিশোধ করিয়া বীরস্বর্গে চলিয়া যাইবেন, সপুত্র তাঁহাকে নিতান্ত বিপন্ন অবস্থায় অনিচ্ছায় আগ্রাভিমুখে অশ্বচালনা করিতে হইবে। মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে যিনি চতুস্সমুদ্রবেষ্টিত বিশাল সাম্রাজ্যের তক্ত তাউসে উপবেশনের সুখস্বপ্নে নিমগ্ন ছিলেন, পরমুহূর্ত্তেই তিনি প্রাণভয়ে পলায়নপর! অদৃষ্টদেবতার এই নিদারুণ পরিহাস জগতের আদিকাল হইতে এইরূপ ভাবেই চলিয়া আসিতেছে! ইহার অন্ত নাই, শেষ নাই, বিরাম নাই। যদি কখনও বিধাতা মহা-প্রলয়ের পরে পুনঃসৃষ্টিতে বিরত হন, তবেই ইহার অবসান হইবে, নতুবা সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—যুগের পর যুগে নিরন্তর এই বিধানই বোধ হয় বিধাতার অভিপ্রেত।

সামুগড়ের নদী সৈকত আগ্রা হইতে অধিক দূরে নহে। যুদ্ধারম্ভের সময় হইতেই উভয়পক্ষের অনলো-দগারী শতঘ্নীর কর্ণবিদারী উৎকট ধ্বনি রাজধানী আগ্রা হইতে শুনা যাইতেছিল এবং দারার পক্ষাবলম্বী ভীরু সৈনিকগণ সামান্য উপলক্ষ্য অবলম্বন করিয়া

পটাবাসের দ্রব্যসম্ভার লুণ্ঠন করতঃ রাজধানী অভিমুখে পলায়ন করিতেছিল। তাহাদের মুখে দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই দারার পরাজয়বার্ত্তা রাজধানী আগ্রায় প্রচারিত হইয়া গেল। বাদশাহ শাজাহানের তাৎকালিক মনোভাব অনুভবের সামগ্রী, বর্ণনায় বুঝাইবার নহে। যে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তিনি হিন্দুস্থানের ভাবী সম্রাট্‌রূপে মনোনীত করিয়াছিলেন, প্রকাশ্য দরবারে যাহাকে নিজ দক্ষিণ পার্শ্বে অপর একটি মণিমুক্তাবিভূষিত স্বর্ণ সিংহাসনে বসাইয়া স্বীয় প্রতিনিধিরূপে তাহারই মুখ দিয়া রাজাদেশ প্রচারিত করিতেছিলেন, রণনির্জ্জিত সেই দারার দুর্গতির কথা শুনিয়া প্রাচীন সম্রাটের জীর্ণ পঞ্জরাস্থিগুলি ভেদ করিয়া যেন প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার উপক্রম করিতেছিল।

রাজপুত্রের রণশ্রান্ত তুরঙ্গম প্রাণপণে ছুটিয়া রাজধানীতে পঁহুছিল বটে, কিন্তু দুর্গত দারা রোষে ক্ষোভে লজ্জায় প্রাসাদ-দুর্গের দ্বারদেশে তাহাকে লইয়া গেলেন না—তাঁহার নিজের বাসের জন্য কালিন্দীকূলে যে একটি ক্ষুদ্রতর রাজনিবাস ছিল, দ্বাদশবর্ষীয় কনিষ্ঠ কুমার সিপার সেকোকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই রাজভবনের দ্বারদেশে অশ্বরশ্মি সংযত করিলেন। দুঃসংবাদ সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়াছিল। কুমার-মহিষী নাদিরা বানু এবং রাজপুত্রের অন্যান্য বিলাস-সঙ্গিনীগণ তৎপূর্ব্বেই ঔরঙ্গজীবের সহিত যুদ্ধে রাজবাহিনীর পরাজয়বার্ত্তা পাইয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখ সমরে দারার মৃত্যু আশঙ্কা করিয়াই তাঁহারা অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইতেছিলেন। দারা এবং সিপারকে প্রাণে প্রাণে ফিরিতে দেখিয়া সেই আনন্দেই তাঁহাদের অন্তর হইতে যেন পরাজয়ের ক্ষোভ এবং লজ্জা অনেক পরিমাণে কম হইয়া গেল। ধরমত এবং সামুগড়ের যুদ্ধে জয়ী হইয়া ঔরঙ্গজীব রাজধানী আগ্রা এবং দিল্লীর ক্ষমতাপন্ন হিন্দু মুসলমান ওমরাহগণের অন্তরে কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণ কিরূপে বুঝিবেন? এবং সে প্রভাবের ফলে দারার দুর্গতি কোথায় গিয়া শেষ হইবে, বৃদ্ধ সম্রাট্ শাজাহানের শেষজীবনে কি দুঃসহ দুঃখ সমুপস্থিত হইবে, তাহা বুঝিবার শক্তি তাঁহাদের ছিল না। তাঁহারা দারা এবং সিপার সেকোকে জীবিতাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়াই পরাজয়ের মনঃক্ষোভ অপেক্ষাকৃত অনায়াসে বিদূরিত করিতে পারিয়াছিলেন। দারার কথা স্বতন্ত্র—তিনি জানিতেন, উদীয়মান বালসূর্য্যের অরুণাভার প্রতি নিমেষহীন দৃষ্টি একাগ্রভাবে সংযোজিত করিয়া যোড় হস্তে স্তুতিবাদ করে না এমন লোক জগতে বিরল। অস্তশিখরীর অন্তরালে পতনোন্মুখ দিনশেষের শেষ রবিরশ্মির প্রতি নয়ন উন্মীলন করিয়া সহানুভূতির সহিত একবার নেত্রপাত করে এমন নির্ব্বোধ ইহসংসারে প্রায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঔরঙ্গজীব বারবার যুদ্ধে জয়ী হইতেছেন, বাদশাহ বার্দ্ধক্য হেতু জরাগ্রস্ত অবস্থায় কর্ম্মানর্হ, এরূপ অবস্থায় ঔরঙ্গজীবের বল পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধি হইতেছে, এবং দারার আশা ভরসা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে ইহা দারার বুঝিতে অধিক বিলম্ব হইবার কথা নহে।

রণপরাজিত দারার সহিত সাক্ষাতের জন্য শাজাহান উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন। মনে করিয়াছিলেন দারা আগ্রায় ফিরিয়া দুর্গে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন এবং অতঃপর কি কর্ত্তব্য তাহার পরামর্শ পিতাপুত্রে হইতে পারিবে। কিন্তু দারা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছিলেন যে, সামুগড়ের ক্ষেত্র হইতে ঔরঙ্গজীব তাহার বিজয়বাহিনীসহ আগ্রার দুর্গ অবরুদ্ধ করিবে, পিতা হয়ত বা কারারুদ্ধ হইবেন। সেই দুর্গে ফিরিলে ঔরঙ্গজীবের হস্তে তাঁহাকেও বন্দী হইতে হইবে ইহা একরূপ সুনিশ্চিত। মোগল রাজবংশের কুমার কুমারীগণের কারাজীবন কিরূপে শেষ হইয়া থাকে তাহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে প্রচুর রহিয়াছে। জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠপুত্র খস্রুর সপরিবারে বিনাশের ইতিহাস দারার অজ্ঞাত ছিল না। তাই তিনি পিতার সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রাসাদ-দুর্গে না আসিয়া, নিজের বাসভবনেই অন্নক্ষণের জন্য গিয়াছিলেন। ধনরত্ন

মণিমুক্তা যাহা অল্প আয়াসে বহিয়া লইয়া যাইবার সুযোগ হইতে পারে তাহাই মাত্র সংগ্রহ করিয়া, এবং পুত্র কলত্রগণকে সঙ্গে লইয়া সেই রাত্রিতেই আগ্রা ত্যাগ করিয়া গেলেন। যাইবার পূর্ব্বে শাজাহান-প্রেরিত দূতের দ্বারাই পিতার চরণে শেষ অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছিলেন। হয়ত রাজপুত্র তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে অনুভব করিয়াছিলেন যে, ইহজীবনে আর পিতার চরণবন্দনা তাঁহার অদৃষ্টে নাই। দূতমুখশ্রুত সেই বিদায়বাণী বৃদ্ধপিতার অন্তরতলে কি মর্ম্মবিদারী শল্যের আঘাত দিয়াছিল, আজ ইতিহাসপাঠে তাহার স্বরূপ নির্ণয় দুঃসাধ্য।

নয়নের উৎসবরূপী আনন্দ-দুলাল জ্যেষ্ঠনন্দনের সহিত একান্তই যখন মিলন অসম্ভব হইল, তখন স্থবির সম্রাট্ দিল্লীর পথে তাঁহাকে যাইতে অনুরোধ করিলেন এবং দিল্লীর ফৌজদারকে বাদশাহী ফৌজ সমস্তই দারার আজ্ঞাধীন করিয়া দিবার এবং ধনরক্ষক প্রধান কর্ম্মচারীকে রাজকোষ শূন্য করিয়া পুনর্যুদ্ধোপযোগী উপাদান সংগ্রহার্থ দারার ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিবার আদেশ পাঠাইলেন। পুনরায় সৈন্যসংগ্রহ হইয়াছিল, পুনরপি যুদ্ধার্থ দারার বাহিনী ঔরঙ্গজীবের বাহিনীর সম্মুখীন হইয়াছিল, কিন্তু ধরমত এবং সামুগড়ের মুক্ত প্রান্তরে দারার অদৃষ্টনেমির যে অধোগতি আরম্ভ হইয়াছিল, সহস্র চেষ্টাতেও তাহা আর ফিরিল না—ক্রমে নিম্ন হইতে নিম্নতর দিকে তাহার গতি দ্রুততর হইতে থাকিল এবং দারার দুরদৃষ্টই তাঁহাকে সুখ সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখর হইতে কোন্ গভীর অন্ধকার রসাতলের তলদেশে লইয়া গিয়া তাঁহার জীবলীলার অবসান ঘটাইল। সে সকল কথা যথাস্থানে জানাইবার ইচ্ছা রহিল।

এদিকে দিনদেবতা সামুগড়ের দিক্চক্রবালের অন্তরালে অন্তর্হিত হইবার পূর্ব্বেই, ঔরঙ্গজীবের রণজয় শেষ হইল। প্রাণভয়ে পলায়নপর দারার তুরঙ্গম আগ্রার পথে যাত্রা করিবামাত্র, ঔরঙ্গজীবের আদেশে তাঁহার পার্শ্বস্থিত রণভেরী এবং দামামা বিজয়বাদ্য বাজাইয়া দিল। দারার অদর্শনে তাঁহার পক্ষীয় বীরবৃন্দের মধ্যে তখনও যাহারা প্রাণপণে প্রভুর কল্যাণার্থ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, দারাকে না দেখিয়া তাহারাও ছত্রভঙ্গ হইয়া, যে যেদিকে পথ পাইল সেইদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ঔরঙ্গজীব তাঁহার হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া অনায়াসলব্ধ এই বিপুল বিজয়ের জন্য 'নমাজ' দ্বারা ভগবচ্চরণে তাঁহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করতঃ সেদিনের মত বিশ্রামার্থ শিবির সন্নিবেশ করিবার আদেশ দিলেন।

পর দিবস প্রত্যূষে ঔরঙ্গজীব এবং মুরাদের সম্মিলিত বাহিনী শিবির ভঙ্গ করিয়া আগ্রাভিমুখে 'কুচ' করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তে রাজধানীতে শাজাহানের নিকট সংবাদ পঁহুছিল যে তাঁহার বিজয়ী পুত্রদ্বয় পিতৃচরণ বন্দনার জন্য রাজধানী অভিমুখে সসৈন্যে আগমন করিতেছে। এই সসৈন্যে পিতৃপদ বন্দনার অর্থ শাজাহানের অজ্ঞাত ছিল না। পিতা জাহাঙ্গীরের জীবমানে স্বয়ং শাজাহান তাঁহার যৌবনে একদিন সসৈন্যে মুক্তপ্রান্তরে পিতার সাক্ষাৎ প্রার্থনায় প্রস্তুত হইয়াছিলেন; মহাবৎ খাঁর ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ বীর সেনাপতি না থাকিলে জাহাঙ্গীরের কি অবস্থা হইত তাহা জানিতেন এক বিধাতা পুরুষ, এবং আর জানিতেন শাজাহান নিজে। রাজ্যের প্রধান বীরগণ ইতিমধ্যে কেহ প্রকাশ্যে কেহবা অপ্রকাশ্যে ঔরঙ্গজীবের সহিত যোগ দিয়াছে এ সংবাদ চারচক্ষু রাজার অজ্ঞাত ছিল না।

যৌবনে শাজাহান বহুযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন সত্য, মেবার, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি জনপদ যাহা অপরাপর সেনাপতিগণ বহু আয়াসেও করতলগত করিতে পারেন নাই, শাজাহান সে সকল ক্ষেত্রেও বিজয়লক্ষ্মীর বরমাল্য পাইয়াছিলেন ইহাও সত্য; কিন্তু সে বীরকেশরী আজ জরাজীর্ণ, লক্ষযোদ্ধার অধিনায়ক হইয়া দৃঢ়মুষ্টিতে তরবারি ধারণের ক্ষমতা আজ তাঁহার নাই, হিন্দু মুসলমান সেনাগণের মধ্যে কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া ঔরঙ্গজীবের গতিরোধার্থ প্রেরণ করিতে পারেন এরূপ ব্যক্তি তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে কেহ ছিল না। অনন্যোপায়

হইয়া স্থবির সিংহ তাঁহার শরীররক্ষী অল্পসংখ্যক সেনা এবং দুর্গের খোজা প্রহরীগণের সহায়তায় দুর্গরক্ষা করিবার জন্য স্থিরসংকল্প হইয়া দুর্গদ্বার রোধ করিয়া দিলেন। একদিন চিরতুষারমণ্ডিত সুদূর বাহ্লীক প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া দাক্ষিণাত্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত যাঁহার অসির আলোক ঝলসিয়া উঠিত, বাপ্পারাও, হামীর, প্রতাপ প্রভৃতি স্বদেশপ্রাণ বীরচূড়ামণিগণের প্রবল প্রতাপ-রক্ষিত মেবার যাঁহার বীরত্বে ও ততোধিক সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া যে শাজাহানের সহিত বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল, আজ সেই সমগ্র হিন্দুস্থানের একাধিশ্বর বিপুল বিক্রমশালী স্থবির বীরসিংহ তাঁহারই পুত্রের হস্তস্থিত শৃঙ্খল হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য জরাগ্রস্ত বার্দ্ধক্যে কতিপয় মাত্র অনুচরের সাহায্যে দুর্গরক্ষার জন্য রোগদুর্ব্বল দক্ষিণ হস্তে অসিধারণ করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা করুণ দৃশ্য আর আছে কি? যে শাজাহান অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত মোগল পতাকা দিগ্‌বিদিকে হেলায় প্রোথিত করিয়া আসিয়াছেন, লক্ষ যোদ্ধার অধিনায়করূপে যে অসিহস্ত শাজাহানের হুঙ্কার রবে একদিন প্রবল প্রতাপ পারস্য সম্রাটের পর্য্যন্ত হৃৎকম্প উপস্থিত হইত;—সাম্রাজ্যলুব্ধ আততায়ী পুত্রের হাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারে কিংবা সে জন্য প্রয়াস করিয়া নিজের প্রাণ দিয়া প্রভুভক্তির আদর্শ দেখাইতে পারে, সমগ্র হিন্দুস্থানের প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য মধ্যে এমন একটি মানুষও আজ চক্ষুগোচর হয় না। ধিক্ মানুষের ক্ষণভঙ্গুর ভাগ্যে, ততোধিক ধিক্ মানুষের রাজ্যলিপ্সায় ও ক্ষমতার পিপাসায়—যাহার নিকট জ্ঞাতিত্ব ভ্রাতৃত্ব পিতৃত্ব সকল সম্বন্ধই মানুষ অকাতরে বলিদান করে! একই জননীর গর্ভবাসে বাস করিয়া, একই মাতার বক্ষ হইতে স্তন্যরস আকর্ষণ করতঃ প্রাণকে পুষ্ট করিয়া, সেই সহোদর ভ্রাতার শিরশ্ছেদের আদেশ মানুষ কেমন করিয়া দিতে পারে, ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে আজীবন যে পিতার স্নেহে লালিত বর্দ্ধিত হইয়াছে, রোগক্লিষ্ট জরাগ্রস্ত অক্ষম সেই বৃদ্ধ পিতাকে কারাগারে নিক্ষেপ করতঃ তাঁহার অশন বসন এবং গমনাগমনের সামান্য স্বাধীনতাটুকু পর্য্যন্ত হরণ করিবার আদেশ কেমন করিয়া দিতে পারে, সামান্য সন্দেহবশে স্বীয় দুহিতাকে চিরান্ধকার কারাগৃহবাসের আদেশ মানুষ কেমন করিয়া দিতে পারে, তাহা সাধারণ মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য। ইহার উত্তর বোধ করি ঔরঙ্গজীবের ন্যায় ধর্ম্মজীবী ও অসাধারণ স্বার্থপর মানুষেরাই দিতে পারে।

একান্ত প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপুত্র রণপরাজিত হইয়া রাজধানী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার সহিত জীবনে আর সাক্ষাৎ হইবে কি না তাহা বিধাতাই জানেন; রণজয়ী উদ্যতাস্ত্র ঔরঙ্গজীব সসৈন্যে দুর্গাবরোধ করিতে আসিতেছে, এই অবরোধের চরম ফল কে জানে? পিতার সহিত সাক্ষাৎ মাত্রই উদ্দেশ্য হইলে, পিতা যথার্থ জীবিত কি মৃত তাহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ মাত্র কারণ হইলে, ত্রিংশৎ সহস্রেরও অধিক সশস্ত্র চতুরঙ্গ বাহিনীর সহিত বলদর্পিত পদভরে মেদিনী কম্পিত করিয়া কেহ পিতৃসাক্ষাৎকার লাভ করিতে আইসে না। এ সাক্ষাতের উদ্দেশ্য যে গভীরতর, তাহা আবাল্য যুদ্ধব্যবসায়ী রাষ্ট্রতত্ত্বজ্ঞ প্রবীণ সম্রাট শাহাজাহানের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না। বিশেষতঃ শাজাহানও মানবের স্বাধীনতাপহারী শোণিত-লোলুপ নির্ম্মম নৃশংস তৈমুরলঙ্গেরই বংশধর, মোগল বংশ সম্ভূত, শার্দ্দূলবৎ হিংস্র চেঙ্গিস খাঁর শোণিতধারা শাজাহানের ধমনীতে—মৃদুস্রোতে হইলেও—প্রবাহিত হইতেছিল। সুতরাং ঔরঙ্গজীবের এই আগ্রাভিমুখে অভিযান যে স্নেহশীল ভক্ত সন্তানের পিতৃপদ বন্দনার একান্ত ইচ্ছা হইতে সম্ভূত নহে, তাহা প্রবীণ সম্রাট শাজাহান বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং বুঝিতে পারিয়াই, পুত্র কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইত না হয় কিংবা পুত্রের আদেশে জল্লাদের হস্তে পলিতকেশ মস্তকদান করিতে না হয়, সেই উদ্দেশ্যে, নিষ্ফল জানিয়াও কেবলমাত্র শরীররক্ষী খোজা প্রহরীর বাহুবলকে সম্বল করিয়া দুর্গরক্ষার জন্য পক্ষাঘাতগ্রস্ত দুর্ব্বল দক্ষিণ করে শিথিল মুষ্টিতে অসিধারণ করিয়াছিলেন। বোধ হয়

প্রাচীন সম্রাট মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাকে যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় দেখিলে অপরাপর সেনানায়কগণ কিংবা রাজপুতানার করদ মিত্র রাজগণ তাঁহার সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইতে পারেন, এবং সেরূপ ঘটিলে ঔরঙ্গজীব অধিক অগ্রসর নাও হইতে পারে। অথবা এই যুদ্ধোদ্যমে পুত্রপক্ষীয় সেনার কামান বন্দুকাদি অগ্নিপিণ্ডের আঘাতে, কিংবা অপর অস্ত্রাঘাতে বৃদ্ধের ক্ষীণপ্রাণ অবলীলায় বহির্গত হইয়া যাইবে—মৃত্যুলোকের তোরণপ্রান্তে আসিয়া স্বল্পাবশিষ্ট জীবনকালের জন্য পুত্রপ্রদত্ত কারাক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না—নরঘাতী জল্লাদের ক্ষুরধার কুঠারাঘাতে প্রাণত্যাগ করিবার ক্লেশ ও মনঃপীড়া—উভয়ের হস্ত হইতেই অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবেন; হয়ত ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। হিমশৈলকিরীটিনী পয়োধিপরিবেষ্টিতা সুবিশাল ভারতভূমির একচ্ছত্রাধিপের শেষ জীবনের এই সকরুণ পরিণাম জগতের ইতিহাস অন্বেষণ করিলে অধিক পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। প্রতীচ্য মহাদেশের শ্বেতদ্বীপাদি জনপদের ইতিবৃত্ত অন্বেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রথম দ্বিতীয় চার্লস্ প্রভৃতি নরপতিগণের শেষজীবনের কাহিনীও করুণ, কিন্তু ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতির হত্যাকারী নৃশংস ঔরঙ্গজীবের ন্যায় পুত্রের হস্তে শাজাহানের শেষজীবন যে ভাবে কাটিয়াছিল, পৃথিবীর ইতিকথায় তাহার দ্বিতীয় আছে কি না জানি না। শাজাহান যদিও ঔরঙ্গজীব কর্তৃক দুর্গাবরোধের প্রতিবিধানার্থ প্রস্তুত হইতেছিলেন, তথাপি দূতদ্বারা পুত্রের নিকট আদেশ পাঠাইলেন, তিনি যেন সসৈন্যে আগ্রায় উদ্ধতভাবে প্রবেশ না করিয়া, পিতৃআজ্ঞা শিরোধারণ করতঃ তাঁহার বাহিনীকে দাক্ষিণাত্যে প্রতিপ্রেরণ করেন, এবং তাঁহাদের নিজ নিজ সুবায় তাঁহারা প্রতিগমন করেন। তবে ইচ্ছা করিলে, স্বল্পপরিমিত অনুচরসহ পিতার চরণবন্দনার নিমিত্ত আগ্রায় আসিতে পারেন; এবং তাঁহার এই আদেশ প্রতিপালন করিলে, পিতার জীবমানে বিদ্রোহাচরণ করিয়া বাদশাহের নিকট যে অপরাধ করিয়াছেন তাহা বাদশাহ মার্জ্জনা করিবেন এবং তাঁহাদের নিজ নিজ সুবায় তাঁহাদিগকে বাহাল রাখিবেন। বিদ্রোহাচরণ করিলে, বাদশাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে, সমুচিত দণ্ড সকলেরই ভোগ করিতে হয়; এ ক্ষেত্রে তাঁহারা যে অপরাধ করিয়াছেন তাহা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ নিতান্ত নিন্দনীয় হইলেও, বাদশাহের এই আদেশ পালন করিলে তিনি রাজারূপে এবং পিতারূপে তাঁহাদিগের পূর্ব্বকৃত অপরাধের লঘুদণ্ড বিধান করিবেন।

শাজাহান-প্রেরিত এই আদেশ লইয়া দূত গেল, এবং জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী জাহানারা বেগম কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে সদুপদেশ দিয়া নিজ নিজ সুবায় প্রত্যাগমন করিবার অনুরোধ জানাইতে স্বয়ং ভ্রাতৃগণের সহিত সাক্ষাৎকার লাভের মানসে রাজধানী হইতে সামুগড় অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ঔরঙ্গজীব ইতিমধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন যে, পিতা শাজাহান মৌখিক শিষ্টাচার এবং স্নেহ দেখাইয়া ঔরঙ্গজীবকে কোন প্রকারে অরক্ষিতভাবে দুর্গের অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া, হয় তাঁহাকে বন্দী করিবেন, অথবা খোজা তাতার প্রহরীদ্বারা তাঁহাকে হত্যা করাইয়া, জ্যেষ্ঠপুত্র দারার পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দিবেন, এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে অরক্ষিত অবস্থায় দুর্গে যাইবার অনুরোধ করিতেছেন। ঔরঙ্গজীব ইহাও প্রচার করিয়াছিলেন যে, পিতার এই দুরভিসন্ধি তাঁহার মনঃকল্পিত নহে, শাজাহান দারাকে আশ্বাস দিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্র ঔরঙ্গজীবের হস্তগত হওয়ায় এ বৃত্তান্ত তিনি অবগত হইতে পারিয়াছেন। এই সকল কথা কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ বা বিশ্বাস করিল না। জাহানারা বেগম পুনঃ পুনঃ ঔরঙ্গজীবকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, ইহা কখনই সত্য হইতে পারে না। কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইল না—পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ ঘটিল না। ভগিনী বিফল মনোরথ হইয়া আগ্রাদুর্গে প্রত্যাগমন করিলেন।

ঔরঙ্গজীবের বাহিনী আগ্রা নগরে প্রবেশ করতঃ দুর্গের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া দুর্গাবরোধ করিল। দুর্গের বহিঃপ্রাচীরসংলগ্ন তোপমঞ্চে

আগ্নেয়াস্ত্র সন্নিবেশিত করিয়া, প্রাসাদ গৃহ লক্ষ্য করতঃ অগ্নিপিণ্ড বর্ষণ করিতে লাগিল। ক্ষুব্ধ রুষ্ট রুগ্ন বৃদ্ধ সম্রাট, মুষ্টিমেয় অনুচরবর্গের সাহায্যে যথাশক্তি দুর্গরক্ষার যত্ন করিতে লাগিলেন। আগ্রার অধিবাসীবৃন্দ কেহ বা আগ্রা ত্যাগ করিয়া প্রাণ বাঁচাইল, অপর সকলে দিবারাত্র শঙ্কিত চিত্তে কি হয় কি হয় ভাবিয়া উদ্বিগ্ন মনে দিন কাটাইতে লাগিল। বহুসৌধশোভা-সমন্বিত, অমর-বাঞ্ছিত আগ্রার আনন্দভবন মহাশ্মশানে পরিণত হইবার আশঙ্কায় নরনারী সভয়ে ত্রাহি ত্রাহি রব করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

খাদ্য-কথা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। স্বাস্থ্যসমাচার কার্য্যালয়, ৪৫ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, মূল্য ॥৹

খাদ্য সম্বন্ধে বাঙ্গলায় যে কয়খানি পুস্তক আছে, এই পুস্তকখানি তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায়ই দেখা যায় খাদ্য সম্বন্ধে ভাল মন্দ বিচার করিতে বসিয়া অনেকেই নিজ নিজ অন্ধ ধারণাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। মাংসপ্রিয় গ্রন্থকার মাংসের আর নিরামিষভোজী নিরামিষের গুণকীর্ত্তন করিতে ছাড়েন না। কিন্তু স্থানকালপাত্র ভেদে যে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের প্রয়োজন সে কথা আমরা বড় একটা ভাবিয়া দেখি না। আলোচ্য পুস্তকে বাঙ্গালীর ব্যবহার্য্য সকল প্রকার সাধারণ খাদ্যেরই বিশদ আলোচনা আছে। কোন্ খাদ্যে কি উপাদান কি পরিমাণে আছে, পুস্তকের শেষে তাহার একটা তালিকা দেওয়া হইয়াছে। আহার্য্য কেমন করিয়া হজম হয়, শরীরের পুষ্টি সাধনের জন্য খাদ্য কতটা আবশ্যক এই সব কথা সবিস্তারে পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। লেখকের ভাষা সহজ সরল। সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য কোন দুরূহ বিষয়ের আলোচনায় পুস্তকের কলেবর অযথা বৃদ্ধি করা হয় নাই। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

তৃণগুচ্ছ (গল্পগ্রন্থ)—শ্রীমতী গিরিবালা দেবী প্রণীত। ১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি কোং দ্বারা প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ১৭১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, বাঁধাই মূল্য ১।৹

ইহা একখানি গল্পপুস্তক। এই গল্পের বন্যায় সুগন্ধি ফুল খুব অল্পই আমরা পাইয়া থাকি। আলোচ্য পুস্তকখানি পাঠে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এই গ্রন্থে সংগৃহীত গল্পগুলি ইতিপূর্ব্বে মানসী ও মর্ম্মবাণী, উপাসনা, নারায়ণ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া পাঠক সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। পথহারা, পতিতা, নারীর অধিকার, পূজার গল্প, বারুণী প্রভৃতি গল্প কয়টি আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। পথহারা গল্পের নারীচরিত্র দুটী বেশ হইয়াছে, মহিমময়ী লক্ষ্মণা স্বামীকে সুখী করিবার জন্য তাঁহার তৃপ্তি সাধনের জন্য জয়াকেও হইতে আসিয়া বলিল, "আমার ত একজন্মেই ফুরিয়ে যাবে না। আমি পরজন্মে তাঁকে সুখী করবার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে তাঁকে সুখী দেখেই সুখী হব।" ছোট মেয়েটির মুখে এই নূতন কথা শুনিয়া পথহারা হতভাগিনী জয়া পথের সন্ধান পাইল, তাই সে সলিলকে বলিল, "এ দেবীকে চিনতে চেষ্টা করো।"

পতিতা গল্পের শেষে সন্ন্যাসিনী শচীর জন্য সমবেদনা ও সহানুভূতির অশ্রুতে চোখ দুটি ভরিয়া যায়। 'নারীর অধিকার' সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না, সকলকে ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 'বারুণী' বাঙ্গালীর মেয়ের বিবাহ সমস্যা মূলক গল্প হইলেও মাঝে মাঝে না হাসিয়া থাকা যায় না। 'পূজার গল্প পল্লীর একখানি নিখুঁত ছবি। যে সকল নবীন লেখক জমকাল প্লট না হইলে গল্প হয় না মনে করেন, তাঁহাদের এই গল্পটি পড়িতে বলি। গল্পগুলির ভাষা ও লিখনভঙ্গি সরল, চিত্তাকর্ষক। আমরা সকলকে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

কাগজের এই দুর্ম্মূল্যতার দিনে বইখানির দাম খুব কম হইয়াছে।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা
১৪এ, রামতনু বসুর লেন, "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ফুলরাণী

চিত্রকর—শ্রীজ্ঞানদাকান্ত দাশগুপ্ত

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

১৪শ বর্ষ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯

১ম খণ্ড
৪র্থ সংখ্যা

নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে আমরা বিদ্যার কেন্দ্রকে বুঝি। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণেরা বা বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই বিদ্যাদান করিতেন। পূর্ব্বে ইংলণ্ডেও বিদ্যা পুরোহিতদের এক চেটিয়া ছিল, তাঁহারা নিজেদের মঠে জনসাধারণকে বিদ্যাদান করিতেন। আমাদের দেশেও এক সময় বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে মঠকে বুঝিত। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সেই সব মঠ স্থাপনা করিয়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন। শিক্ষা যে কেবল ধর্ম্ম বিষয়ে দেওয়া হইত তা নয়, সমস্ত রকম বিষয়েই শিক্ষা দেওয়া হইত।

৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দীতে এই রকম একটি-বিদ্যার কেন্দ্র গঠিত হইয়াছিল। নালন্দার বর্ত্তমান নাম "বড়গাঁও"—ইহা পাটনা জেলার বিহার মহাকুমার মধ্যে অবস্থিত। (১) এখন পাটনা হইতে রেলপথে নালন্দাতে যাওয়া যায়।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়। হুয়েনসাং যখন নালন্দাতে পড়িতে আসেন, তখন তিনি অনেক জনরব শুনিয়াছিলেন, সেগুলি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ আছে ! নালন্দা মঠটী একটি আম্রকুঞ্জে অবস্থিত ছিল। হুয়েনসাং বলেন, সেই কুঞ্জের পুষ্করিণীতে নাকি একটি নাগ বাস করিত। সেই নাগের নাম হইতেই আম্রকুঞ্জটীর নাম হয় 'নালন্দা'। আবার কেহ কেহ বলেন, ভগবান তথাগত পূর্ব্বজন্মে এখানে তপস্যা করিতেন। জীবের দুঃখকষ্টে তাঁহার হৃদয়ে ব্যথা লাগিত, তাই তিনি দুই হাতে সব জিনিষ দীন দুঃখীকে বিলাইতেন। সেই জন্য তাঁর নাম হয় "না—অলম্ দা" অর্থাৎ "নালন্দা"—যার সর্ব্বস্ব বিলাইয়াও তৃপ্তি হয় না। (২)

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনা কবে হইয়াছিল, তাহার কোন স্থিরতা নাই। সম্ভবতঃ গুপ্তযুগেই ইহার

---

(১) Ancient Geography—Cunningham p. 468.

(২) Wattors—Yuan Chwang Vol. II p. 165.

প্রাদুর্ভাব হয়। ৫ম শতাব্দীতে ফাহিয়ান যখন এদেশে আসেন, তিনি মগধ ভ্রমণকালে নালন্দার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ৭ম শতাব্দীতে হুয়েনসাং যখন আসেন, তখন নালন্দার উন্নতির যুগ। তবেই মনে হয় ফাহিয়ানের আগমনের পর এ বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হইয়াছিল।

প্রাচীন ভারতে আমরা তিনটি শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখ পাই। সেগুলি—তক্ষশিলা, নালন্দা ও বিক্রমশিলার বিশ্ববিদ্যালয়। এই তিনটীর মধ্যে যেখানে বিদেশী ছাত্র আসিয়া সেখানকার দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন, সেইখানেই আমরা সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী উজ্জ্বল, একটী জীবন্ত ছবি পাইয়াছি। সেই হিসাবে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় খুব ভাগ্যবান, কারণ এখানে আমরা দুইটী প্রসিদ্ধ চীন পর্য্যটকের বর্ণনা পাইয়াছি। একজন হুয়েন সাং, আর একজন ইৎসিং। এই দুইজনের বর্ণনা একত্র করিলে আমরা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পূর্ণ চিত্র পাইব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি নালন্দা একটি প্রসিদ্ধ মঠ ছিল। সেই মঠে অনেক ভিক্ষু থাকিতেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, যিনি বিদ্যায় জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, তিনি মঠের অধ্যক্ষের পদ পাইতেন। তাঁহাকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারও বলিতে পারি, কারণ সকল বিষয়ে তাঁর মতই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইত। হুয়েনসাং যখন নালন্দায় পড়িতে আসেন, তখন শীলভদ্র নালন্দা মঠের সর্ব্বাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সমতটের রাজকুমার। শৈশবে তাঁর পাঠাসক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি অন্যান্য ছাত্রদের মত মঠে পড়িতে আসেন। তখন বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মপাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তা ছিলেন। শীলভদ্র তাঁহার কাছেই শিক্ষা পান। শুনা যায়, একবার নাকি এক মহাপণ্ডিত ধর্ম্মপালের সঙ্গে তর্ক করিতে রাজসভায় আসেন। শীলভদ্র তাঁহার গুরুকে যাইতে না দিয়া, নিজে সেই পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক করিতে যান। শেষে সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়া যান। সেই ঘটনা হইতে শীলভদ্রের পাণ্ডিত্যের কথা দে বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। (৩) পরে শীলভদ্র নালন্দা সর্ব্বাধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন।

এখানে আর যে সব পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদে মধ্যে চন্দ্রপাল, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রভামিত্র, জিনমি পদ্মসম্ভব—এই কয়জনের নাম উল্লেখযোগ্য।

বাঙ্গালার পালরাজারা যখন মগধ জয় করেন, তখ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁহাদের অধীনে আসে অনেক সময় পালরাজাই স্থির করিতেন কে সর্ব্বাধ্য হইবেন। আমরা দেখিতে পাই যে রাজা দেবপাল তাঁহা সময়ে বীরদেবকে মঠের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। (৪

এই সকল জ্ঞানতপস্বীদের পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হই দেশ বিদেশ হইতে ছাত্রেরা এখানে অধ্যয়ন করি আসিত। ভারতের সকল প্রদেশ হইতে, এমন কি সুদূর গান্ধার, তিব্বত ও চীন হইতেও ছাত্রেরা এখানে পড়িতে আসিত। ৭ম শতাব্দীতে হুয়েনসাং যখন এখানে সংস্কৃত শিখিতেছিলেন, তখন ছাত্র ও ভিক্ষু লইয়া সর্ব্ব সমেত দশহাজার লোক ছিল। (৫) যে সকল ছাত্র এখানে পড়িত, তাহাদের জন্য পৃথক পৃথক বাসগৃহ দেওয়া হইত। এখন যেমন হষ্টেলে এক একজন ছাত্রের উপযোগী স্বতন্ত্র ঘর আছে, সেকালেও সেইরূপ ব্যব ছিল। নালন্দাতে খনন করিয়া এখন আবিষ্কৃত হইয়া যে এক একটি ঘর ১২ ফিট দীর্ঘ ও ৮ ফিট প্রশস্থ ছিল। (৬)

প্রাচীন ভারতের আদর্শ ছিল যে বিদ্যা দান করিতে হইবে—বিদ্যা বিক্রয় করা ভারতের আদর্শের বিরুদ্ধ। সেজন্য এখানেও আমরা সেই প্রাচীন আদর্শ দেখিতে

---

(৩) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ।

(৪) গৌড়রাজমালা, ৪৮ পৃঃ

(৫) Beal's Life of Hiuen Tsiang. p. 110

(৬) Archeological Reports, Eastern Circle, (1915-16) p. 3

নাই। এখানে ছাত্রদের নিকট হইতে কোন রকম বেতন লওয়া হইত না। তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়েও, যাহারা অক্ষম তাঁহাদের নিকট হইতে কোন বেতন লওয়া হইত না। নালন্দার সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্ত রাজাদের নানারকম দান ছিল। ইৎসিং বলেন যে, তাঁহার সময়ে নালন্দার মঠের সম্পত্তি ২০০ গ্রাম ছিল, সেই সকল গ্রামের আয় হইতে মঠের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। (৭)

প্রত্যেক ছাত্রের বোধ হয় আহারের পৃথক বন্দোবস্ত ছিল, কারণ হুয়েনসাং বলিয়াছেন, তাঁহার জন্য প্রত্যেক দিন ১২০টি জম্বীর, ২০টি জায়ফল, ২০টি খেজুর, আড়াই তোলা কর্পূর, এক পোয়া মহাশালী ধান্যের চাউল দেওয়া হইত; আর মাসে তিন রাশি তৈল ও প্রত্যহ কিছু মাখন দেওয়া হইত।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানতঃ একটী বৌদ্ধ মঠ হইলেও, কখনও কার্য্যের মধ্যে একটুও শিথিলতা ছিল না। সকল কার্য্যই ঠিকমত নিষ্পন্ন হইত। প্রতিদিন প্রাতে ঘণ্টাধ্বনি হইলে ভিক্ষুরা ও ছাত্রেরা স্নানে যাইতেন। তাঁহারা যখন স্নানে যাইতেন তখন এক এক দলে ১০০টী বা ১০০০টী ছাত্র থাকিতেন। তাঁহাদের হাতে স্নানের জন্ত বস্ত্রাদি থাকিত, তাঁহারা পুষ্করিণীতে স্নান করিতেন। অধ্যয়নের সময় নানাস্থানে অধ্যাপকগণ ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। সন্ধ্যার সময় ভিক্ষুরা এক গৃহ হইতে অন্ত গৃহে সন্ধ্যাগীত গাহিয়া বেড়াইতেন।

নালন্দাতে সর্ব্বসমেত ৬টী মহাবিদ্যালয় বা কলেজ ছিল। নানাদেশের রাজারাই অর্থ দিয়া এই সব কলেজ স্থাপনা করিয়াছিলেন। প্রথম মহাবিদ্যালয়টি শক্রাদিত্য নামক রাজা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। দ্বিতীয়টী রাজা বুধগুপ্তের অর্থসাহায্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তৃতীয়টীর জন্ত তথাগতরাজ টাকা দিয়াছিলেন। চতুর্থটী বাণাদিত্য নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। পঞ্চমটী বজ্রনামে এক রাজার সাহায্যে প্রস্তুত হইয়াছিল। ষষ্ঠটী স্থাপিত করিয়াছিলেন মধ্যভারতের একটী রাজা। এই রকমে নানান্ দেশের রাজারা—যাঁহারা এখানে আসিয়া এখানকার কার্য্যকলাপ নিজেরা দেখিতেন—তাঁহারা টাকা দিয়া কলেজগুলির ভিত্তি স্থাপনা করান। সকলদেশের ইতিহাসে এ রকম ঘটনা দেখা যায়। ইংলণ্ডেও রাজা বা জমিদারেরা গির্জ্জাতে বা মঠে টাকা দিতেন, সেই দানের টাকার আয় হইতে শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। এখনও এদেশে রাজা বা জমিদারেরাই টোলের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্ত টাকা বা ব্রহ্মোত্তর জমি দেন। বর্ত্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও অনেক দানশীল মহাত্মার দানে জ্ঞানের প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষত্ব এই ছিল যে, যদিও এটী বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান, তথাপি এখানে অধ্যাপনা কেবল বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। যাহাতে মানুষের জ্ঞানের বিকাশ পূর্ণভাবেই হইতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সকল চেষ্টা, সকল যত্ন সেই উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত হইত। মানবের জ্ঞান যত কিছু বিদ্যা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, সেই সকল বিদ্যার শিক্ষা এই আশ্রমে দেওয়া হইত। সেই জন্ত হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা—সকল শাস্ত্রেরই অধ্যাপনা এখানে হইত। ইহা ব্যতীত বৌদ্ধদর্শন, ত্রিপিটক, জাতক ও তন্ত্রশাস্ত্রেরও অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল। আশ্রমটী বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান হইলেও, জ্ঞানী ভিক্ষুরা ব্রাহ্মণদিগের জ্ঞানভাণ্ডারকে অবহেলার চক্ষে দেখিতেন না। সেই জন্ত হিন্দুর শাস্ত্র—সাংখ্য, বেদান্ত ও অন্যান্য দর্শনের আলোচনাও এখানে যথেষ্ট হইত।

নালন্দার আর একটী বিশেষত্ব এই ছিল যে, প্রথমে এখানকার ছাত্রদিগকে কোন রকম উপাধি বিতরণ করা হইত না। কিন্তু ইহাতে কুফল ফলিতে আরম্ভ হয়। অনেক দুষ্টবুদ্ধি ছাত্র নানা স্থানে নিজেদের

---

(৭) Itsing—p. 65.

নালন্দার ছাত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া সাধারণের নিকট হইতে সম্মান লইত। এ কুপ্রথা দূর করিবার জন্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ একটী নূতন নিয়ম করেন। ইহার পর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি বিতরণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁরা যে প্রতিষ্ঠাপত্র দিতেন, তাহাতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শীল মোহর থাকিত। সেই শীল মোহরে লেখা থাকিত—"শ্রীনালন্দা-মহাবিহারী আর্য্য-ভিক্ষু-সংঘস্য।" তাহাতে একটী ধর্ম্মচক্র আঁকা থাকিত, আর ধর্ম্মচক্রের দুইপার্শ্বে দুইটী হরিণ উপরের দিকে মুখ করিয়া থাকিত। আজকাল নালন্দায় যে খনন কার্য্য চলিতেছে, তাহাতে এই রকম অনেক শীল মোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অনেকদিন ধরিয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে জল্পনা কল্পনা হইতেছিল যে নলান্দায় বিশ্ববিদ্যালয়টী কোথায় ছিল। কানিংহাম সাহেব প্রথমে বলেন যে পাটনা জেলায় বড়গাঁও গ্রামে সেই প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালটী ছিল। এতদিন এসম্বন্ধে আর কোন প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। অনেকেই বলিয়াছেন যে কানিংহামের অনুমানই সত্য, কিন্তু সেটীর সত্যতা প্রমাণের জন্য সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানটীর খননের আবশ্যক হইয়াছিল। ভারতগবর্ণমেণ্ট অপরস্থানে এত ব্যয়ভারে পীড়িত ছিলেন যে, তাঁহারা এস্থানে নূতন ভাবে খননের ব্যবস্থা করিতে অক্ষমতা জানাইলেন। শেষে বিলাতের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি এই খননের ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হইলে, গভর্ণমেণ্ট এ কার্যে হাত দেন। এখন নালন্দায় খননের ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং তাহার ফলে অনেক নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু।

ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনী ত্রয়োদশ বর্ষে ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণ]

বাঙ্গালার রাজাদের সময় লইয়াও অনেক গোলমাল। ধর্ম্মপাল, হরিবর্ম্মা ও বল্লালসেনের সময় এখনও ঠিক হয় নাই। ১৯১৭ সালে এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকায় বিজয়সেনের তাম্রশাসনে "৬১" রাজ্যাঙ্ক পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা "৩২" বলিয়া পাঠ করিয়াছেন। এই তাম্রশাসনের রাজ্যাঙ্ক "৬১" হইবে বলিয়া মনে হয়। এই রাজ্যাঙ্ক "৬১" হইলে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন, বিজয়সেন ১১১৮—১১১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আসিয়া পড়েন। তাহা হইলে এ পর্য্যন্ত স্বীকৃত লক্ষ্মণসেনের প্রথম রাজ্যাঙ্ক যে ১১১৮—১১১৯ খৃষ্টাব্দ, তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়। এদিকে আবার মিথিলার সমস্ত পঞ্জিকায় উল্লেখে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাঙ্কের আরম্ভ ১১০৬ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যাইতেছে। মিথিলার যাবতীয় পুথিতেও এই সময়ই পাওয়া যায়। লক্ষ্মণসেনের সময় বিচারকালে এ বিষয়টীও উপেক্ষিত না হইয়া আলোচনার সহায়ক হইতে পারে।

সম্প্রতি চন্দ্রবংশের রাজাদেরও কালনিরূপণ সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

কুলগ্রন্থকে কেহ কেহ একেবারেই ইতিহাসে স্থান দেন না। কুলগ্রন্থে যে সকল নৃপতির নাম আছে, সেগুলি ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গ্রহণ করেন না। কিন্তু যেমন পুরাণে ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা হইতে পারে, সেইরূপ কুলশাস্ত্রও একেবারে উপেক্ষার জিনিস নয়। ইহাতেও ঐতিহাসিক মালমসলা আছে। তবে সেগুলি অতি সতর্কতার সহিত বিশ্লেষণ করা চাই।

কুলগ্রন্থে বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ একেবারে নাই, এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। কুলগ্রন্থে অনেক সময় বিবরণে ভুল থাকে বটে,-কিন্তু তাহা হইতেও সময় সময় সত্য বাছাই করিয়া লইতে পারা যায়।

কয়েকজন ঐতিহাসিক কুলগ্রন্থে উল্লিখিত আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াছেন। তাঁহাদের সন্দেহ করিবার কারণও আছে। ভবদেবভট্টের ভুবনেশ্বর-প্রশস্তি আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মূল্যবান্ বলিয়াও কেহ কেহ লিখিয়াছেন। এই সমস্ত ঐতিহাসিক সমস্যার মীমাংসা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলিতে চাই যে, বাঙ্গালার ঐতিহাসিককে সব সময় মনে রাখিতে হইবে যে, ভারত-ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, তাঁহাকে বাঙ্গালার ইতিহাস রচনা করিতে হইবে।

এক্ষণে আমরা ইতিহাসের সংজ্ঞা ও প্রসার নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিব। আমাদের নিকট আজকাল যাহা 'ইতিহাস', খুব প্রাচীন কালে 'ইতিহাস' বলিলে ঠিক তাহা বুঝাইত না। পূর্ব্বকল্পে ঘটিয়াছিল, এইরূপ আখ্যায়িকা বুঝাইতে ঋগ্বেদে 'ইতিহাস' শব্দের প্রয়োগ আছে। শতপথব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদে ইতিহাসের যথেষ্ট উল্লেখ আছে। সুদূর অতীতে কোন ঘটনা ঘটিয়া থাকিলে, সেই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলা হইত—ইতি—হ—আস অর্থাৎ ইতি=ইহা, হ—নিশ্চয়, আস—হইয়াছিল। ঘটনা সত্য না হইলে কখনই তাহাকে ইতিহাস বলা হইত না। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই অর্থেরই ইঙ্গিত আমরা বুদ্ধঘোষপ্রণীত' "সুমঙ্গলবিলাসিনী"র "অম্বট্ঠ-সুত্ত-বণ্ণনা"য় এইরূপ পাই—"ইতিহাস-পঞ্চমং—অথব্বণবেদং। চতুত্থং কত্বা ইতি হ আস ইতি হ আসাতি ঈদিস-বচন-পতিসংযুত্তো পুরাণকথাসংখাতো ইতিহাসো পঞ্চমো এতে সন্তি ইতিহাসপঞ্চমা। তেসং ইতিহাসপঞ্চমানং বেদানং।" কোন প্রাচীন কথার শেষে "ইতি হ আস" এই কথাটি বলা হইত। ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায়, তখন প্রধানতঃ চারিটী প্রণালীতে ঘটনা বিবৃত হইত;—প্রথম ইতিহাস, দ্বিতীয় পুরাণ; তারপর আর দুইটী হইতেছে—"শ্লোকাঃ" ও "নারাশংসা"। কোন ঘটনা সমাবেশে বড়লোকের কথা বলিয়া বহুবচনান্ত "শ্লোকাঃ" এইরূপ বলা হইত। অন্য কোন একপ্রকারের আখ্যায়িকার নাম ছিল "পুরাণ"। "ইতিহাস-পুরাণ" এক সঙ্গেও কোথাও কোথাও আছে।

ইতিহাস-পুরাণের সকলের চেয়ে পুরাতন উল্লেখ আমরা পাই অথর্ববেদের পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষ দিকে। কোন কোন জায়গায় "পুরাতন ইতিহাসে"রও উল্লেখ আছে, তবে তাহা বৈদিক সাহিত্যের পরবর্ত্তী গ্রন্থেই পাওয়া যায়। অনুগীতায় নারদ ও দেবমতের "পুরাতন ইতিহাস" বিবৃত আছে। দেবমতের নাম বৈদিক সাহিত্যে কোথাও নাই। অনুগীতার সময় বৈদিক প্রবাদ পুরাণ' হইয়া যাওয়ায় সম্ভবতঃ "পুরাতন ইতিহাস" নাম হইয়া থাকিবে। বেদে "নারাশংসী" নামে একরূপ আখ্যায়িকা আছে। এগুলি অনেকটা "History"র মত। এগুলিতে প্রাচীন লোকদের বংশবিবরণ থাকিত, আর থাকিত তাহাদের গুণকীর্ত্তির গাথা। রাজপুতানা ও গুর্জ্জরের চারণদের গানে এগুলির কিছু আভাস পাওয়া যায়। নারাশংসীর ন্যায় "গাথা" বলিয়া একরূপ আখ্যায়িকার উল্লেখ আছে। এইগুলি বৈদিক যুগের পরে নারাশংসীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া "নারাশংসী গাথা" বা শুধু "গাথা"য় পরিণত হইয়াছিল। এই সমস্ত আখ্যায়িকার উপ-বিভাগও বৈদিক সাহিত্যে বিরল নয়। আখ্যান, অন্বাখ্যান, ব্যাখ্যান, অনুব্যাখ্যান প্রভৃতি যে এই সমস্ত আখ্যায়িকার কোনরূপ উপ-বিভাগ, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এগুলি কিরূপ ছিল, তাহা জানি না। প্রাচীন যুগের ইতিহাসের ধারা আলোচনা করিবার সময় এখনও হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে দিগ্দর্শন হিসাবে একটু ইঙ্গিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

ডিল্‌থে (W. Dilthey), ট্রএল্‌ট্‌শ্‌ (E. Troeltsch), ভুণ্ডট্ (W Wundt), এনান্‌ডেল্ (G. Annandale) ও জর্জ্জপ্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। ইতিহাস কি এবং তাহা কিরূপ হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই। এ বিষয়ে দশজন পণ্ডিতে যে সমস্ত কাজের কথা বলিয়া গিয়াছেন, আমি বিশেষ সাবধানতার সহিত বিচার করিয়া, তাঁহাদের উক্তির সার নিষ্কর্ষ করিয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিব।

গ্রীসদেশের সুপণ্ডিত হেরোডোটস্ ইতিহাস অর্থে ঘটনার বিবৃতি ও মানবের সামাজিক ও নাগরিক অবস্থার বর্ণনই বুঝিয়াছিলেন; বহু দিন ধরিয়া এই মনীষীর পথানুসরণ করিয়া পাশ্চাত্য জগৎ ইতিহাসের এই সংজ্ঞাই নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছিল। তারপর ইতিহাসের পরিসর আর একটু বাড়াইয়া দিয়া, পণ্ডিতেরা শৃঙ্খলাবদ্ধ ঘটনার বিবরণকে ইতিহাস নামে আখ্যাত করিতে লাগিলেন। প্রকৃতির অন্তস্তল তন্ন তন্ন করিয়া যে সমুদয় সত্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহাও প্রাকৃতিক ইতিহাস বা বিজ্ঞান নামে অভিহিত হইল। এই অর্থেই শিল্প-বাণিজ্যের ইতিহাস, আবিষ্কারের ইতিহাস, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস, এমন কি, জীবনবৃত্তও ইতিহাসের সুবিশাল গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশলাভ করিল। ক্রমে পণ্ডিতেরা বুঝিলেন, এই অতিব্যপ্তিদোষদুষ্ট সংজ্ঞাকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীমতে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ইহাকে সীমাবদ্ধ করিতে হইবে। অবশ্য উল্লিখিত বিষয়গুলির বিবৃতিকে যে ইতিহাস আখ্যা দেওয়া যায় না, তাহা নহে; ঐগুলি মানবের সহিত সংশ্লিষ্ট—সমাজবদ্ধ মানবের সুখদুঃখের অনুভূতির সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত; তাহা হইলেও বলিতে হইবে, এগুলি সমাজ-জীবনের তন্ত্রীতে যে ভাবে আঘাত দেয়, প্রকৃত ইতিহাস সে ভাবে আঘাত দেয় না। ইতিহাসের আঘাতে সমাজে যেরূপ সাড়া পাওয়া যায়, এগুলির আঘাতে সেরূপ সাড়া পাওয়া যায় না। তাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইতিহাসকে কেবল ঘটনার ফিরিস্তি, রাজতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্রের অধিনায়কদিগের জীবনের ঘটনার বিবৃতিতে পর্য্যবসিত না করিয়া, ইহার সীমা এইরূপভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন যে, সেই ঘটনাই ইতিহাসের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারিবে—যাহা দ্বারা সমবেত মানব সমাজ-গঠনপ্রয়াসী হইয়া, তাহার মঙ্গলকামনায় মানবসঙ্ঘের উন্নতি বা অবনতির কারণ হইবে—মানব-সম্মেলনের ভাবধারাকে বংশপরম্পরায় সঞ্জীবিত রাখিবে; অবশ্য সেই ভাবধারা যে অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে, তাহা নহে—অবস্থাবিশেষে তাহার পরিবর্ত্তন হইবে। এই সম্মিলিত সমাজের কার্য্যাবলী, জাতি, রাষ্ট্র, রাজ্য, প্রজাতন্ত্র, সাম্রাজ্য প্রভৃতির ভিতর দিয়া প্রকাশ হইয়া থাকে। আমরা কোন সমিতি-সম্পর্কে 'সমিতির ইতিহাস' এইরূপ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকি, কিন্তু সমিতি, ব্যবহারাজীব-সমিতি, নাগরিক কর্পোরেশন, প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনবৃত্ত বা বংশাবলীর কাহিনী প্রকৃত ইতিহাস-পদবাচ্য নহে। অবশ্য এগুলি যদি রাজনৈতিক উন্নতি বা অবনতির সহায় হয়, তাহা হইলে ইহারা ইতিহাস গঠনে উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে। ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, ঘটনাবলী ও অনুষ্ঠাতাদিগের সংখ্যা অগণিত। ইতিহাস কেবল সাধারণ ঘটনার সমবায় নহে। কোন ঘটনাই আকস্মিক কারণে উদ্ভূত হয় না। যখন এইরূপ কতকগুলি সাধারণ ঘটনা কেন্দ্রাতিগ হয়, কিংবা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাধন করে, তখনই বিশেষ বিশেষ ঘটনা উৎপন্ন হয়। ইতিহাসের আলোচ্য হইতেছে এই বিশেষ ঘটনা। শুধু এইগুলির বিবৃতি করিয়া ইতিহাস ক্ষান্ত থাকে না, ইহাদের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হয়। কোন ইচ্ছাশক্তির বলে ঘটনার সমবায় বা বিরোধ উপস্থিত হইল, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টার নামই কারণ—পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা ইহাকে Psychological motive বলিয়া থাকেন।

ঐতিহাসিক চিন্তা উদ্দেশ্যমূলক। অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সঙ্কল্প মানব-হৃদয়ে কেন উদ্ভূত হয়, তাহা বুঝিতে হইবে—আর বুঝিতে হইবে, কেনই বা মানব সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করে। বাস্তবিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ভিন্ন ঘটনা ও ঘটনার নায়কদিগের সঠিক বিবরণ জানা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কারণ, মানব যে ইচ্ছাশক্তি-প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে, তাহার সঠিক পরিচয় সহজে সকলে পায় না; কিন্তু অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি কেন সমাজে চলিয়াছিল, তাহা চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

একটা চলিত প্রবাদ আছে, ঐতিহাসিক ঘটনার দর্শন পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায় (History repeats itself)। কথাটা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে যতটা প্রযোজ্য, ততটা অন্য ঘটনা সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। কোন অবস্থাবশে কোন দেশে যে প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা হইয়াছিল, সেই অবস্থা-সমাবেশ যদি অপর দেশে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমরা আশা করিতে পারি, প্রাগুক্তরূপ অনুষ্ঠান শেষোক্ত দেশেও কার্য্যকর হইতে পারে। প্রকৃত ঐতিহাসিকের বহু দেশ ভ্রমণ করা কর্ত্তব্য। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সভ্যতা-ধারার অনুযায়ী অনুষ্ঠানগুলি কি অবস্থায় জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে। এমিল রাইখ (Emil Reich) সত্যই বলিয়াছেন,—"The untravelled historian is like a chemist who has no laboratory. Travel and sojourn in countries of different types of civilisation can alone give those object impressions of the forces of history without which the related facts can be neither interpreted nor co-ordinated" ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষাদ্বারা অবশেষে যেমন রাসায়নিক সত্য বাহির হইয়া থাকে, সেইরূপ বহু দেশের অনুষ্ঠানের পূর্ব্বাপর ঘটনা পরিদর্শন করিয়া আমরা তেমনই ঐতিহাসিক কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি। তর্কশাস্ত্রের মতে কারণ সেই অবশ্যম্ভাবী অপরিবর্ত্তনীয় পূর্ব্বঘটনা বা ঘটনার সমাবেশ, যাহা কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে। শুধু বর্ত্তমানের আলোচনা করিলে প্রকৃত ইতিহাস গড়িয়া উঠিবে না। বিগত শতকে আরনল্ডপ্রমুখ পণ্ডিতেরা বর্ত্তমানের উপর ইতিহাস গড়িবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। বর্ত্তমানের দ্বারা অতীতকে বুঝিতে হইবে, আবার অতীতই যে বর্ত্তমানের কারণ, তাহাও ভুলিলে চলিবে না। তাই ঐতিহাসিকের প্রধান কর্ত্তব্য, অতীত ও বর্ত্তমানের তুলনামূলক সমালোচনা করা। আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, অতীতের সমস্ত ঘটনা পরস্পর এক অবিচ্ছিন্ন সূত্রাকারে গ্রথিত—শৃঙ্খলাবদ্ধ। কোন একটী ঘটনাকে সেই শৃঙ্খলা হইতে বিচ্যুত করা যায় না। প্রত্যেক ঘটনাই সমগ্রের অংশ—সমগ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহার কোন অর্থই থাকে না। অধ্যাপক বুরী বলিয়াছেন, জীবদেহ হইতে কোন অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইলে যেমন সেই অঙ্গের কোন মূল্য থাকে না, শৃঙ্খলাবদ্ধ ঘটনা হইতে বিযুক্ত করিয়া কোন একটী ঘটনাকে পৃথক্ ভাবে দেখিলে তাহারও কোন মূল্য থাকে না। এ বিষয়ে আমরা দর্শনাভিমুখ ইতিহাস আলোচনাকালে বিশেষ ভাবে বলিব। সাধারণভাবে দেখিতে গেলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইতিহাসের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সত্য এবং এইগুলিই ইতিহাসের মুখ্য উদ্দেশ্য; কিন্তু ইতিহাসের কতকগুলি গৌণ উদ্দেশ্যও আছে। মানবের কার্য্যাবলী লইয়া যখন ইতিহাসকে নাড়াচাড়া করিতে হয়, তখন এই মানবের প্রকৃত তত্ত্ব বোঝাও আবশ্যক। নৃতত্ত্বে এই বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে। তার পর সমাজ বা রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচনাও ইতিহাসের বিষয়ীভূত।

প্রধানতঃ ভূগোল, জীবনবৃত্ত, ব্যবহারশাস্ত্র, পুরাবৃত্ত, ধর্ম্ম, আচার ও সাধারণ জ্ঞান ইতিহাস রচনার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। এগুলি গৌণভাবে ইতিহাস রচনার সহায়তা করিয়া থাকে।

তার পর প্রাচীন বংশাবলীর প্রশস্তি প্রভৃতির সহিত পরিচয় না থাকিলে, মুদ্রাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান না থাকিলে ইতিহাস রচনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

ইতিহাসের স্রোত ত্রিধা প্রবাহিত হইয়া থাকে। ইহার একটি ধারা কলাভিমুখী, অন্যটি বিজ্ঞানাভিমুখী, তৃতীয়টি দর্শনাভিমুখী। এই তিন ধারার প্রকৃত পরিচয় পাইতে হইলে ঐতিহাসিক প্রণালীর সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা আবশ্যক। মানবই ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার শক্তির একটা সীমা আছে; সেই শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে কলা বা আর্টের আবশ্যক। প্রকৃত ঐতিহাসিকের নিকট জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত থাকা চাই—তিনিই প্রকৃত ঐতিহাসিক হইতে পারিবেন, যিনি প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া জ্ঞানী হইয়াছেন। সাংসারিক বুদ্ধি যাঁহার যত বেশী, তিনি ঐতিহাসিক সত্য তত অল্প-আয়াসে নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন।’ ইতিহাসের লক্ষ্য সত্য নির্দ্ধারণ। ঘটনাবলী পাইলেই ঐতিহাসিক তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন না। তিনি তর্ক ও দর্শন-শাস্ত্রের কষ্টি-পাথরে সেগুলি যাচাই করিয়া দেখেন—তাহারা খাঁটি সত্য কি না। তাই বলিতেছিলাম, ঐতিহাসিক হইতে গেলে তাঁহাকে বিজ্ঞান, দর্শন ও সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হইতে হইবে। আধুনিক বিজ্ঞান ঐতিহাসিক আলোচনার পথকে দুর্গম করিয়া দিয়াছে। এখন শুধু ঘটনার তালিকা দিলেই ইতিহাস হয় না। অবশ্য ঘটনার তালিকা বা পৌর্ব্বাপর্য্য-সূচী যে ইতিহাসের অঙ্গ, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা ইতিহাসের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না বা কেবল মাত্র ইহার উপর ইতিহাসের সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতে পারে না।

চার্লস্ এনান্ডেল (C. Annandale) চিত্রবিদ্যার সহিত ইতিহাসের তুলনা করিয়াছেন। ‘বাস্তবিক চিত্রকর ও ঐতিহাসিকের কার্য্য কতকটা একই প্রকারের। প্রকৃতি চিত্রকরকে উপাদান-সম্ভার দিতে কখনই কুণ্ঠিত হন নাই; কিন্তু সৌন্দর্য্যশালিনী স্বভাবরাণী কোথাও সমগ্র চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখেন নাই। শ্রম ও অধ্যবসায়-সহকারে চিত্রকরকে উপাদানগুলির সদ্ব্যবহার করিয়া বিষয় নির্ব্বাচন করিতে হয়; তার পর তুলিকার সাহায্যে যথাযথ বর্ণ সংযোজন করিয়া, চিত্রাঙ্কন-বিদ্যার নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসারে চিত্র অঙ্কিত করিতে হয়; সেইরূপ সমাজ, ইতিহাস গঠনের উপাদান দিয়াই ক্ষান্ত থাকে, ঐতিহাসিককে ঐ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘটনা হইতে জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃত ইতিহাস রচনা করিতে হয়। ঐতিহাসিকের মনে রাখা উচিত, ঘটনার ফিরিস্তি করাই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য নয়; পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহার পুনরুক্তি আবার করি—ঘটনার কারণানুসন্ধান তাঁহার অন্যতম কার্য্য। কোন্ অবস্থায় কি করিয়া ঘটনাটী ঘটিল, তাহাও দেখা ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য। পটুয়া ও চিত্রকরে যেরূপ প্রভেদ, ঘটনার ফিরিস্তি-বিবৃতিকারী ঐতিহাসিক ও ঘটনার কার্য্যকারণ-আবিষ্কারক ঐতিহাসিকের মধ্যে প্রভেদও সেইরূপ। প্রথম শ্রেণীর চিত্রকর ও ঐতিহাসিক "যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং" শ্রেণীর নকলনবিশ মাত্র। চিত্রকর ও প্রকৃত ঐতিহাসিকের সাধারণ ও বিশেষ দুই প্রকার গুণ থাকা উচিত। সাধারণ গুণ অর্থে যে কেবল সাধারণ জ্ঞান বুঝিতে হইবে, তাহা নহে, অধিকন্তু বুঝিতে হইবে—প্রকৃষ্ট মানসিক শক্তি। যে শক্তিবলে ঐতিহাসিক মানবকে জ্ঞানের পথে সত্য-নির্দ্ধারণে সহায়তা করে—যে শক্তিবলে মানব তাঁহার নিকট হইতে ব্যাবহারিক জ্ঞানলাভ করিয়া ধন্য হয়, তাহাই এই প্রকৃষ্ট মানসিক শক্তি। দার্শনিক বেকনের মতে ইতিহাস স্মৃতির উপর, দর্শন জ্ঞানের উপর ও কবিতা কল্পনার উপর নির্ভর করে। বস্তুতঃ ইতিহাস যে স্মৃতির উপর কতকটা নির্ভরশীল, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না; কিন্তু এ কথাও মনে রাখিতে হইবে,

ঐতিহাসিককে মানবের ঘটনা লইয়া কার্য্য করিতে হইবে। মানবের প্রত্যেক ঘটনায় সহিত স্বার্থ বা বিরাগ ও অনুভূতি কতক পরিমাণে জড়িত থাকেই থাকে। প্রকৃত ঐতিহাসিককে এগুলির হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইবে। যুক্তিযুক্তির চালনায় সত্য নির্দ্ধারণই তাঁহার কর্ত্তব্য। ভাবাবেশে ঘটনাকে বিকৃত করিয়া দেখিলে চলিবে না। প্রমাণগুলিকে ব্যবহারাজীবীর মত দেখিলেও চলিবে না; তাহা হইলে ঐতিহাসিক একদেশদর্শী হইয়া পড়িবেন। তাঁহাকে সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা রাখিয়া, স্থিরচিত্তে সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে দেখিতে হইবে, প্রমাণগুলি বিচারসহ কি না। আর দেখিতে হইবে, কোন্ অবস্থাবশে মানব কোন্ কার্য্য করিতে পারে। মানবের সুখদুঃখের অংশভাগী তাঁহাকে হইতে হইবে—সহমর্ম্মী হইয়া তাঁহাকে ঘটনাবলি দেখিতে হইবে। সর্ব্বোপরি ঐতিহাসিকের চাই 'সু মতলব।' সু-মতলবে আপনার স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঘটনাকে বিকৃত না করিয়া অথবা ঘটনা হইতে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া সত্যসন্ধ ঐতিহাসিক কার্য্যে অগ্রসর হইবেন। বক্তব্য বিষয়কে হৃদয়গ্রাহী করিয়া বলাও ঐতিহাসিকের আর একটা সাধারণ গুণ। বর্ণনভঙ্গী অর্থে রচনা-প্রণালী বুঝিলে চলিবে না- ভাব ও চিন্তার ধারাকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করাই ঐতিহাসিকের বর্ণনভঙ্গী।

এই পর্য্যন্ত ইতিহাসের ধারা কলাভিমুখী। ঐতিহাসিকের বিশেষ গুণ আলোচনা করিতে হইলে বিজ্ঞানের সহিত ইতিহাসের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে। আজকাল বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীদ্বারা ইতিহাসের আলোচনা হউক, এ কথা আমাদের দেশে অনেকেই বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক কথা বলিতে গেলে বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত ইতিহাস আলোচনা সম্ভবপরই নয়। ঐতিহাসিক যে যুগের ইতিহাস লিখিবেন, সেই যুগের সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সহিত তাঁহার সম্যক্ পরিচয় থাকা আবশ্যক। সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠানগুলির আলোচনা ও দেশের অবস্থার বিবরণ বা statistics সংগ্রহ করা ঐতিহাসিকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তর্কশাস্ত্রের মতে ঘটনাপরিদর্শনজন্য যে সকল নিয়ম স্থিরীকৃত হইয়াছে, ঐতিহাসিককে সেগুলির প্রতি অবহিত হইতে হইবে। প্রমাণগুলির যথার্থ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে, প্রমাণ-উত্থাপনকারীর ঘটনাবলী দেখিবার কত দূর সুযোগ-সুবিধা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকেরা স্থির করিয়াছেন, ঘটনাপরিদর্শনকারী সমসাময়িক সাক্ষ্যের মূল্য পরবর্ত্তী কালের সাক্ষ্যের মূল্য অপেক্ষা অত্যন্ত বেশী। স্মৃতিস্তম্ভ, স্মৃতিফলক, দানপত্র ইত্যাদিতে উৎকীর্ণ লিপির মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলেও দেখিতে হইবে, কবে কাহাকর্ত্তৃক ঘটনার কত বৎসর পরে সেই স্তম্ভ উত্তোলিত হইয়াছে কিংবা লিপি বা ফলক উৎকীর্ণ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমি বিশেষভাবে আলোচনা করিতে চাই না। দেশবিখ্যাত শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় বর্দ্ধমান-সম্মেলনের সভাপতিরূপে এ বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। আমি এ স্থানে (Troeltsch) ট্রএল্‌ট্‌শের সুচিন্তিত গ্রন্থের দু' একটী কথার পুনরুল্লেখ করিব। তিনি বলিয়াছেন, অন্যান্য বিষয়েও যেমন, ইতিহাসেও সেইরূপ। প্রত্যেক বস্তু সাধারণ ভাবের উপর নির্ভর করে। সাধারণ ভাব কার্য্য-কারণের নিয়মবশে চালিত হইয়া থাকে। ইতিহাসের ব্যাবহারিক কার্য্যকরী দিকটা ছাড়িয়া দিলে, ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য—প্রত্যেক ঘটনা, কার্য্য, প্রণালী ও ঘটনার সূত্র কার্য্যকারণপরম্পরার নিয়মানুসারে নির্দ্ধারণ করা। এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের নামান্তর মাত্র।

জার্ম্মানদেশে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে বের্ন্‌হাইম (Bernheim) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিমতে ইতিহাস আলোচনার প্রথম সূত্রপাত করেন। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত জার্ম্মানেরা এ বিষয়ে যত দূর অগ্রসর হইয়াছেন, তত দূর অন্য কোন জাতির ঐতিহাসিকগণ হইতে পারেন নাই। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সেনোবো

(Seignobos) ও লাঙলোয়া (Langlois) সমাজবিজ্ঞানে এই পদ্ধতি কত দূর প্রযোজ্য, তাহা বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছেন। ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের আলোচনার বিষয় একই মানব। তবে সমাজতত্ত্বে মানবসংহিতার (Communialism) দিক্ হইতে ব্যক্তিত্বকে দেখিতে হইবে। এখানে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য কোনরূপ নাই। ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি এখানে কার্য্যকরী হয় না। সংহতির পূর্ণতার জন্যই ব্যক্তির আবশ্যকতা। সমাজই ব্যক্তির ইতিহাস, ব্যক্তিও তাহার কার্য্যাবলী লইয়াই ব্যস্ত। ব্যক্তির কার্য্য সমাজের পরিপন্থী কি না, তাহার বিচার ইতিহাস করিয়া থাকে। জার্ম্মান দেশের এই পদ্ধতি অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে অনুসৃত হয়। এখন সকল দেশের পণ্ডিতেরা একরূপ একবাক্যে এই পদ্ধতি, ইতিহাস আলোচনার সুষ্ঠু পদ্ধতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

এইবার দার্শনিক ইতিহাস সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে চাই। কার্য্যকারণপরম্পরার সূত্র ও ঘটনা একত্র সমাবেশ করিয়াই ইতিহাস নিশ্চেষ্ট থাকে না। জগতের যে কার্য্যকরী শক্তি সমুদয় সৃষ্টি করিতেছে, তাহার সহিত ইতিহাসের সম্বন্ধ কি এবং প্রত্যেক যুগধর্ম্ম ও তাহার কার্য্যকরী শক্তি ইতিহাসের দ্বারা কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, সে সমস্যা পূরণে সহায়তা করিবার জন্য ইতিহাস চেষ্টা করিয়া থাকে। দার্শনিক পর্য্যাবস্থায় "মানবাত্মার স্বরূপ," "জগতের আদিকারণ যিনি এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন ও ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার প্রকৃতি" ও "আত্মার স্বাভাবিক জীবন ও নৈতিক জীবনের পার্থক্য" প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় ইতিহাস কতটুকু সহায়তা করিতে পারে বা করিয়াছে, তাহা দেখিতে হইবে। এই সমস্যাগুলির সমাধান সম্বন্ধে জীবনের উদ্দেশ্য কি, ইতিহাস তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করে; যুগশক্তি কিরূপে মানবহৃদয়ে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারও একটা বিচার করিয়া থাকে। ইত্য বিষয়গুলি প্রকৃত ইতিহাসের বিষয়ীভূত নয় সত্য, কিন্তু ইতিহাস আলোচনা করিতে আমরা কেবল ঘটনা বা তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। আমাদের পূর্ব্বোক্ত দার্শনিক তত্ত্বগুলির মীমাংসা করিবার ইচ্ছা মনে স্বতই উদিত হইয়া থাকে। এই প্রশ্ন-সমাধান-চেষ্টাই ইতিহাসের দার্শনিক ধারা নামে কথিত হইয়া থাকে। পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে, এখনও আমাদের দেশে এ শ্রেণীর ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা হয় নাই, তবে আশা করিতে পারা যায়, শীঘ্রই কোন শক্তিশালী ঐতিহাসিক এ বিষয়ে মনোযোগ দিবেন। এই বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে রাজনীতি, আইন, সৌন্দর্য্যানুভূতি-নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নগুলির সমীচীন সিদ্ধান্ত দ্বারা ঐতিহাসিক প্রশ্নের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এইখানে দর্শনাভিমুখী ইতিহাস, ইতিহাসের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া, ঐতিহাসিক বিষয়ের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করে। ইহা নূতন একটা কিছুই নয়। চরিত্র-নীতির নিয়মবশে এ কার্য্য সহজেই সম্পাদিত হইতে পারে। পাশ্চাত্য পুরুষবরগণ এই পথ অবলম্বন করিয়া ঐতিহাসিক ঘটনার মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন; শ্লাইমাখের ও হেগেল প্রভৃতি জার্ম্মান মনীষীরা এই পথই অবলম্বন করিয়াছেন। এই প্রণালী অনুসৃত হইলে ইতিহাসের মূল্য আদর্শানুযায়ী নির্দ্ধারিত হইবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও একটু গোলমাল উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে। এই আদর্শের স্বরূপ কিরূপ হইবে—ভাবগত বা রূপরসগত বাস্তব আদর্শ? বাস্তব আদর্শকে ত একেবারে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। আবার কেবল চরিত্রের দিক্ হইতে মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিলে সফল হইবার সম্ভাবনা কমই দেখা যায়; কারণ, চরিত্রের মাপকাঠি কোথা হইতে পাওয়া যায়?—ঐতিহাসিক ঘটনার আলোচনা করিয়াই ত চরিত্রের মাপকাঠি নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। তাহা হইলেই সেই তর্কশাস্ত্রের চক্রাবর্ত্তে (Reasoning in a circle—petitio principii) পড়িতে হইল। তাই বলিয়া যে এ বিষয়ের আলোচনায় কোন ফললাভ হইবে না, তাহা বলা যায় না। ঐতিহাসিক, ঘটনার জনয়িত্রী শক্তির যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে না পারিলেও ভগবদ্দত্ত সামর্থ্যবলে যে কতকটা পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। এখানে চরিত্রের বিকাশ সম্বন্ধেও একটা কথা উঠিবে। এই জীবনেই কি আমরা আত্মানুভূতি করিতে পারি? যদি আমাদের চরিত্রের বিকাশ আদর্শানুযায়ী এই জন্মেই না হয়, তা হইলে কি হইবে?—পরজন্মে আমরা সেই সূত্র ধরিয়া আত্মদর্শন করিতে কি পারিব না? এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ও আমাদের দেশের দার্শনিক মত আলোচনা করিয়া আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাই না। তবে একটা কথা এখানে বলিতে চাই, ইতিহাস মানবের উন্নতি ও অবনতি লইয়া ব্যস্ত। দার্শনিক ইতিহাসে জাতির শুধু উন্নতির দিক্ই আলোচিত হইয়া থাকে। কিন্তু আর একটা কথাও এখানে বিচার করিতে হইবে। আত্মদর্শন করিতে হইলে আদর্শ ভাবের পশ্চাতে ছুটিতে হয় সত্য, কিন্তু এই ভাবকে আপনার করিবার চেষ্টাও চাই। এই ভাবকে আয়ত্ত করিতে হইবে। এই আদর্শকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা ও উন্নতি-প্রবণতা-বলে জগৎ যাহার অভিমুখে ছুটিয়া আপনাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য ব্যগ্র—পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সেই সার্ব্বজনীন আদর্শের অনুসরণ—এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে সত্য; আর এই দু'য়ের সমন্বয় করাও বড় সহজসাধ্য ব্যাপার নয়;—তথাপি বলিতে হইবে, প্রত্যেক ঐতিহাসিক ঘটনা, সার্ব্বজনীন ভাবের দিকে কতটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, তাহা দেখিয়াই তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। সীমাবদ্ধ ও অসীমের ভাবটা একটু ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। বুঝিতে হইবে—সীমাবদ্ধের সংহতি অসীম নহে; অসীম সীমাবদ্ধের ভিতর রহিয়াছে, কিন্তু ব্যষ্টি বা সমগ্রভাবে নাই, অংশতঃ আছে; আর অসীম সর্ব্বদাই সীমাবদ্ধ জিনিসের উৎপাদন করিয়া আপনার অপরিমিত শক্তির পরিচয় দিতেছে। ইতিহাস সীমাবদ্ধ ঘটনার বিবৃতি দিয়া অসীমের দিক্ হইতেও তাহাকে দেখিবার চেষ্টা করিবে। দার্শনিক ইতিহাস ও ইতিহাসে আর একটু পার্থক্য এই, দার্শনিক ঐতিহাসিকেরা সাধারণ ঐতিহাসিকের ন্যায় স্থান, কাল, পাত্রের দিকে মনোযোগী হন না। তাঁহারা স্থান, কাল, পাত্রের অতীত অসীমের সন্ধানেই ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রের দিকে অবহিত হওয়া দার্শনিক ঐতিহাসিকেরও কর্ত্তব্য। সুখের বিষয়, এ শ্রেণীর ঐতিহাসিকদিগের অগ্রণী জোসেফ ফেরারি (Joseph Ferrari) এ দিকে মনোযোগী হইয়াছেন।

আজকাল দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের সঙ্গে দু'এক জন পণ্ডিত আখ্যানকল্প বা romantic ইতিহাসেরও ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মেকলে ও ফ্রুড্ এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক। তবে ইঁহাদের লেখা ঐতিহাসিক আখ্যান নয়। আখ্যানকল্প ইতিহাস ও ঐতিহাসিক আখ্যান এক জিনিস নয়। ঐতিহাসিক আখ্যানে ঐতিহাসিক উপাদান চিত্রের backgroundরূপে ব্যবহৃত হয়। মূল চিত্রটী কিন্তু একেবারে অমূলক কাল্পনিক থাকিয়া যায়। কিন্তু আখ্যানকল্প ইতিহাসে ঐতিহাসিক প্রকৃত ঘটনার অনুসন্ধান-রীতি ও প্রকৃত দৃশ্যের অবতারণপদ্ধতিতে গল্পকথকের ভঙ্গীবিলাসের চরম নৈপুণ্য অবলম্বন করিয়া, আখ্যানবস্তুটী জগন্ত ও জীবন্ত করিয়া থাকেন। এইরূপ ঐতিহাসিকের উদ্দেশ্য—ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ, জীবন্ত ব্যাপার করিয়া তোলা, এবং অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে বর্ণনার সেতু নির্ম্মাণ করিয়া ব্যবধানের দূরত্ব মন হইতে অপসারিত করিয়া দেওয়া। অতীতের ঘনান্ধকারের মধ্যে ক্ষীণালোকে ভীতি-চকিত—আড়ষ্ট পাঠকের সানন্দ আগ্রহকে সজাগ করিয়া তুলিবার জন্য এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক বিভ্রান্ত বর্ত্তিকার মাধুরীতে তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন। এইটুকুই তাঁহার প্রধান গুণপণা। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক বলেন,

"History is not a shilling shocker"; ইতিহাসে প্রকৃত ঘটনার সত্যসন্ধ বিবৃতি থাকা চাই—ঘটনা যেমনটি পাইবে, ঠিক তেমন করিয়াই তাহা চক্ষুর সম্মুখে ধরিবে—তুমি যে সত্যানুসন্ধিৎসু, এ কথা ভুলিয়া, শুধু পাঠকের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইয়া, অনুমানের সাহায্যে নাটকীয় পদ্ধতির সার্থকতা সম্পাদন করিলে চলিবে না। দার্শনিক ঐতিহাসিক কিন্তু অনুমানের একেবারে অপক্ষপাতী নন। তিনি বলেন, অনুমানের দরকার—ঘটনাকে নাটকীয় পদ্ধতিতে বর্ণনা করিবার জন্য নয়, সেই সমুদয় হইতে আমাদের উপকারে আসিতে পারে, এইরূপ ভাব নিকর্ষ করিবার জন্য। আখ্যানকল্প ইতিহাসে ঘটনা নাটকীয় আকার ধারণ করে, বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে সেই ঘটনা শ্রেণীবিভক্ত হয় এবং দার্শনিক ইতিহাসে তৎসমুদয় হইতে সাধারণ সিদ্ধান্ত করা হয়।

বাঙ্গালার ইতিহাস-প্রণয়ন-কার্য্য এই তিন প্রণালী-দ্বারাই সম্ভবপর হইবে। আপাততঃ প্রথম ও দ্বিতীয় পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া আমাদের কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। তারপর যখন কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে পারিব, তখন ইতিহাসের দর্শনের দিক্ আলোচিত হইবার আশা করিতে পারি। বাঙ্গালীর সর্ব্বাঙ্গীন ইতিহাস এখনও হয় নাই। জ্ঞানের বর্ত্তিকা ধারণ করিয়া, তমসাবৃত যুগে আলোক-সম্পাত করিবার জন্য যাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন—যাঁহাদের সাধনার ফলে বাঙ্গালার ইতিহাস-চর্চ্চা প্রসারলাভ করিয়াছে, সেই সকল অক্লান্তকর্ম্মীদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রামপালের ভূমিকায় ও ধর্ম্মঠাকুরের ব্যাখ্যানে, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় গৌড়লেখমালায় ও পাল-রাজগণের আলোচনায়, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ গৌড়-রাজমালায় ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় "Palas of Bengal" ও বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রাচীন বাঙ্গালার অনেক কথাই আলোচনা করিয়াছেন। তথাপি ভাবিতে হইবে—প্রাচীন বাঙ্গালার অনেক কথাই আজিও সম্যক্ আলোচিত হয় নাই। আমার বোধ হয়, এ কার্য্য সময়-সাপেক্ষ। বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন জেলার প্রকৃত ইতিহাস সঙ্কলিত না হইলে বাঙ্গালার ইতিহাস আশা করা যাইতে পারে না।

কয়েকখানি প্রাদেশিক ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে। বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে বাঙ্গালার সকল জেলার ইতিহাস লিখিত হউক, ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা। এখানে একটা কথা বলিতে চাই। কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে হইলে যে সকল জাতি সেই দেশে বাস করিয়া থাকে, তাহাদের বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে—তাহাদের চরিত্রগত বিশেষত্ব কোথায়, তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে—তাহাদের সভ্যতার ধারা কোন্ খাতে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে, আর বুঝিতে হইবে, কোন্ অবস্থাবশে সমাজ-বদ্ধ হইয়া তাহারা উন্নতি বা অবনতির পথে চলিয়াছে। গ্রীসের ইতিহাসে তাহাদের শিল্পানুরাগের চিত্র না থাকিলে তাহা গ্রীসের ইতিহাস বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে না, রোমের ইতিহাস বুঝিতে হইলে তাহাদের প্রচারিত আইন-কানুন না বুঝিলে রোমের ইতিহাসের কথা অজ্ঞাতই থাকিবে। বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে হইলে বাঙ্গালীর প্রাণ, ধর্ম্ম ও সমাজকে না বুঝিলে, বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে যাওয়া বিড়ম্বনা হইবে। কারণ, বাঙ্গালী ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই দাঁড়াইয়া ছিল ও আছে—আর বাঙ্গালী সমাজের সুশীতল ছায়ায় একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত হইয়া থাকিতে যতটা ভালবাসে, ততটা অন্য কোন জাতি বাসে না।

অনুসন্ধানের উপর যখন ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে, তখন বাঙ্গালার একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস প্রণয়ন করিতে হইলে একজনের চেষ্টায় যে হইবে, তাহা বলিয়া আমাদের মনে হয় না; সমবেত চেষ্টা চাই। আপনাদের ন্যায় সুধী সজ্জনকে নূতন করিয়া বলিতে হইবে না যে, সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা। জেলায় জেলায় বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির ন্যায় সমিতির

সৃষ্টি হউক। সমবেত চেষ্টায় ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে সত্যসন্ধ সাহিত্যিকবৃন্দ বদ্ধপরিকর হউন। সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিতে হইলে হিংসা-দ্বেষ দূর করিতে হইবে, যশের মুকুট আপনার মাথায় ধারণ করিবার লোভ সংবরণ করিতে হইবে, আপনার কৃতিত্ব প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলে চলিবে না। সুধু সত্যের দিকে চাহিয়া, আত্মাভিমান ভুলিয়া, কর্ত্তব্যের প্রেরণায় কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে।

মনের ভিতর কোন সংস্কার লইয়া কার্য্য করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। অনুসন্ধিৎসুর মন স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় থাকা উচিত। যে চিত্র তাঁহার সম্মুখে পতিত হইবে, তাহারই নিখুঁৎ ছবি যেন উহাতে প্রতিবিম্বিত হয়। দর্পণের উপমা ছাড়িয়া ফটোগ্রাফের উপমা দেওয়াই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত। কারণ, দর্পণের চিত্র বিপরীতমুখী হয়—তাহার পর বিচার-বুদ্ধির দ্বারা আমরা তাহাকে ঠিক করিয়া লই। ফটোগ্রাফ যন্ত্রে চিত্রের অবিকল প্রতিলিপিই পাওয়া যায়। সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা থাকা উচিত; কিন্তু তাই বলিয়া কোন কর্ম্মীর ভুল-ভ্রান্তি দেখিলেই তাহার উপর খড়্গহস্ত হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। ত্রুটি-বিচ্যুতি মানুষেরই হইয়া থাকে। দশ জনের আলোচনার ফলে মিথ্যা-মেঘ কাটিয়া গিয়া, ইতিহাসের আকাশে সত্য-সূর্য্য প্রকাশিত হইবে। বিরুদ্ধ মতগুলিকে যুক্তির নিকষে যাচাই করিয়া লইতে হইবে। ভ্রান্ত মত পোষণ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের বিরুদ্ধ-মতাবলম্বীকে ঘৃণার চক্ষে দেখা কখনই কর্ত্তব্য নয়। কারণ, এ কথাটা মনে রাখা উচিত, মানুষ আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। মনে রাখা উচিত, সুযোগ ও সুবিধার অভাবে পরীক্ষিত ঘটনাগুলির সম্যক্ পরিদর্শন না করিয়াই বা বিচার-বুদ্ধির প্রকৃত চালনা না করিয়াই তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অসদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,এ কথা মনে স্থান দেওয়া উচিত নয়। আর আজ যিনি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, অপরের অনুসন্ধানফলে প্রকাশিত ঘটনাগুলি তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলে তিনি যে মত পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন, এরূপ দৃষ্টান্তও ইতিহাসে বিরল নয়।

অনুসন্ধান-সমিতির পরিচালনভার সুদক্ষ ঐতিহাসিকদিগের হস্তে ন্যস্ত করিতে হইবে। তাঁহাদিগের নেতৃত্বে ও পরামর্শমতে কার্য্য করিলে সুফল যে হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। শরৎকুমার, অক্ষয়কুমারের নেতৃত্বে পরিচালিত বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির কার্য্যাবলীর দ্বারা বাঙ্গালা দেশে ইতিহাস-রচনায় যে প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা ইতিহাস অনুশীলনকারীকে আর বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। এই সঙ্গে গভীর পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে, প্রায় ৮ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের রাঢ় দেশে একটি এইরূপ অনুসন্ধানসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া বেশ কার্য্য করিতেছিলেন। সম্প্রতি তাঁহাদের কার্য্যের গতি কিঞ্চিৎ শ্লথ হইয়া গিয়াছে। আশা করি, তাঁহারা পূর্ব্বেকার উদ্যমের সহিত পুনরায় আপনাদের উদ্দিষ্ট পথে চলিবেন। নবপ্রতিষ্ঠিত অনুসন্ধান-সমিতিগুলির জন্য কলাভবন নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে সংগৃহীত ঐতিহাসিক দ্রব্য-সম্ভার কোথায় থাকিবে? কলিকাতায় সাহিত্য-পরিষদে, রঙ্গপুর ও কুমিল্লা শাখায় ভবনে ও বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির চিত্রশালায় এইরূপ অনেক প্রাচীন নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে। জেলায় জেলায় এইরূপ চিত্রশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐতিহাসিক উপাদান সংগৃহীত হইতে থাকুক, সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের আলোচনার প্রসারও বর্দ্ধিত হউক।

আমার বক্তব্য যাহা, তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছি। ইতিহাস-প্রণালী কিরূপভাবে চালিত হওয়া উচিত, তাহারই একটা দিঙ্‌নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি—নূতন কিছু বলি নাই; বলিবার স্পর্দ্ধাও রাখি না। তবে সুধী-সজ্জন-প্রদর্শিত বিভিন্ন পথ-সকলের আলোচনা করিয়া, যে পথ ধরিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে সুফল ফলিতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি, সেই পথপরিচয় আপনাদিগের নিকট দিলাম মাত্র।

আপনারা সুধী জন, এ পথ ধরিয়া চলা উচিত কি না, তাহার বিচার করিয়া দেখুন।

পরিশেষে ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন আমরা কার্য্য করিবার শক্তি—সমবেতভাবে কার্য্য করিবার শক্তি ও অটুট স্বাস্থ্য লাভ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হই। স্বার্থসিদ্ধির জন্য অর্থলাভ বা যশোমাল্যে বিভূষিত হইবার জন্য যেন আমরা সত্যকে বিকৃত করিয়া বা মিথ্যাকে সত্যের আবরণে আবৃত করিয়া দশের নিকট উপস্থাপিত না করি। প্রাচীন কালে জগতের অন্যান্য দেশবাসীরা আমাদের সত্যানুরাগের যে উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—সে চিত্র যেন আমরা কোনরূপে মসী মলিন হইতে না দিই। বংশানুক্রমপ্রভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট যে সত্যনিষ্ঠা আমরা লাভ করিয়াছি, তাহা যেন চির উজ্জ্বল থাকে। আর সত্যের প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়া যেন আমরা সগর্ব্বে দণ্ডায়মান থাকিতে পারি। সবল মনের অধিকারী হইয়া, বাহিরের প্রভাবে চালিত না হইয়া বা ঐতিহাসিক দলবিশেষের আজ্ঞানুবর্ত্তী না হইয়া, কেবলমাত্র বিবেক-বুদ্ধির প্রেরণায় ধ্রুব সত্যের প্রতি অচলা নিষ্ঠা রাখিয়া, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা হিংসাকে হৃদয়ে স্থান না দিয়া—কর্ম্ম করিতে পারি। সত্যভাষণে যেন আমাদের কখনও কুণ্ঠা না আসে। আমরা যেন বৈদিক ঋষির ন্যায় ঐতরেয় আরণ্যকের বাণী প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিতে পারি,—

“ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু।
তদ্বক্তারমবত্ববতু বক্তারমবতু বক্তারম্॥”

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

অশ্রুকুমার

(উপন্যাস)

তৃতীয় ভাগ—ধর্ম্ম

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রেমের মর্য্যাদা।

মাষ্টার মহাশয়কে বরকর্ত্তা করিয়া এবং রঙ্গণঘাটের অন্যান্য কতকগুলি লোককে লইয়া অশ্রুকুমার সৌদামিনীকে বিবাহ করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিল। বিবাহের পরদিবস সে সৌদামিনীকে এবং সহযাত্রীদিগকে লইয়া আবার রঙ্গণঘাটে ফিরিয়াছিল। সৌদামিনীর সহিত তাহার বৃদ্ধা ঝি গিয়াছিল; ডেপুটী বাবুও তাহার অনুরোধে তাহার সহিত যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রঙ্গণঘাটে পাকস্পর্শের উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। এই উৎসবে গ্রামের সমুদয় লোক জমীদার বাড়ীতে আহারে আহূত হইয়াছিলেন।

উৎসবান্তে ডেপুটী বাবু প্রস্তাব করিলেন যে সৌদামিনী ও অশ্রুকুমারকে লইয়া অষ্টাহ বাসের জন্য কলিকাতায় যাইবেন। সৌদামিনী কহিল যে অশ্রুকুমারের মাতাকে ও শ্যামার মাকেও লইয়া যাইতে হইবে; তাঁহাদিগকে রঙ্গণঘাটের বাটীতে অসহায় অবস্থায় রাখিয়া যাওয়া ঠিক হইবে না। পুত্রের অদর্শন-আশঙ্কায় কাতরা মাতা, সৌদামিনীর কথানুযায়ী কার্য্য করিতে সহজেই স্বীকৃতা হইলেন।

২৫শে অগ্রহায়ণ সন্ধ্যাকালে তাঁহারা সকলে কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলেন।

২৬শে অগ্রহায়ণ প্রাতঃকালে অশ্রুকুমার ভাবিল যে বিবাহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় তাহার অবসরাভাব ঘটিয়াছিল; এজন্য সে আলেকজান্দ্রাকে কল্য আসিব বলিয়া দশ বারদিন পূর্ব্বে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া-

ছিল, তাহা প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয় নাই। অতএব তজ্জন্য অদ্যই তাঁহার নিকট যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। ইহা স্থির করিয়া সে প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হইল।

ডাক্তার দত্তের বাটীতে আসিয়া অশ্রুকুমার দেখিল, ডাক্তার দত্ত ও আলেক্জান্দ্রা দত্ত উভয়েই বাটী আছেন।

ডাক্তার দত্ত তাহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন; এবং একপাত্র চা খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

অশ্রুকুমার চা পান করিত না, আলেকজান্দ্রা তাহা জানিত। সে কহিল, "অশ্রুবাবু চা খান না।"

ডাক্তার দত্ত বলিলেন, "ওঃ ওঃ! তা হলে অন্য কিছু?—কিছু মিষ্টান্ন আর এক গেলাস জল? কেমন?"

অশ্রুকুমার কহিল, "আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমি সকালে কিছু জলযোগ করিনে।"

ডাক্তার দত্ত কহিলেন, "ভাল—খুব ভাল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমরা যত কম বার আহার করি, ততই ভাল। সুস্থ শরীরে দিন রাতের মধ্যে দুবার আহারই শরীর রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের দেশে পুরাকালে ঋষিরা একাহারী হয়ে দীর্ঘজীবন লাভ করতেন। এখনও হিন্দু ঘরের বিধবারা দিনান্তে একবার আহার করে বলে, সুস্থ শরীরে বেশী দিন বেঁচে থাকে। আর আমরা, ছ'ঘণ্টা অন্তর আহার করে আমাদের হজম শক্তিকে জেরবার করে দিই। এর ফলে শরীরটা ব্যাধিমন্দির হয়ে পড়ে।"

কিয়ৎক্ষণ আহার-তত্ত্ব আলোচনার পর ডাক্তার দত্ত কহিলেন, "যাক, আহারের কথা যেতে দাও। এখন আমি তোমার সঙ্গে একটু কাযের কথা ক'য়ে ডাকে বেরুব। ব্রেকফাষ্টের আগে তিনটে রোগী দেখতে হবে।"

অশ্রুকুমার কাযের কথা শুনিয়া একটু কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কাযের কথা কি জিজ্ঞাসা করবেন?"

ডাক্তার দত্ত কহিলেন, "মিসেস দত্তের মুখে শুনলাম যে লাটিন ভাষায় তুমি একজন উচ্চ শ্রেণীর পণ্ডিত।"

ডাক্তার দত্তের এই উক্তিতে কি কিছু বিদ্রূপ মিশ্রিত ছিল? আলেকজান্দ্রা তীব্র দৃষ্টিতে তাঁহার মুখভাব লক্ষ্য করিল; কিন্তু তাঁহার মুখে শান্ত সরলতা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইল না। আলেকজান্দ্রার মনে পড়িল যে কয়েকদিন পূর্ব্বে স্বামীর নিকট অশ্রুকুমারের বিদ্যাশিক্ষার পরিচয় দিতে যাইয়া, মহোৎসাহে সে আপন বাক্য সংযত রাখিতে পারে নাই।—অশ্রুকুমারের গুণগ্রাম জ্ঞাপনকালে তাহার বাক্য যেন শত ধারায় উৎসারিত হইয়া উঠে; সে আপনার বাক্যস্ফূর্ত্তি প্রশমিত করিতে পারে না।

অশ্রুকুমার ডাক্তার দত্তের উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝিতে না পারিয়া বিনীত স্বরে কহিল, "আমি লাটিন ভাষা সামান্য জানি; তাতে পাণ্ডিত্য লাভ করতে পারি নি।"

ডাক্তার দত্ত অশ্রুকুমারের বাক্যে মনোযোগ না দিয়া কহিলেন, "মিসেস দত্ত লাটিন জানেন না; লাটিন শিখতে ওঁর বোধ হয় ইচ্ছা আছে। তোমার যদি অন্য কায না থাকে এবং অসুবিধা না হয়, তাহলে তুমি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এক ঘণ্টা ওঁকে লাটিনভাষা শিখিও। এই কার্য্যের জন্য আমি তোমাকে মাসিক একশ টাকা দিতে প্রস্তুত আছি।"

ডাক্তার দত্তের এই প্রস্তাবে আলেকজান্দ্রা কোন কথাই কহিল না; আনত মুখে নীরবে বসিয়া রহিল। বুঝি একবার ভাবিল যে তাহার স্বামী হয়ত, অশ্রুকুমারের প্রতি তাহার মনের আকর্ষণের সন্ধান পাইয়াছেন; তাই তাহার মনস্তুষ্টির জন্য এই ব্যবস্থার বিধান করিতেছেন।

অশ্রুকুমার ভাবিল, উপস্থিত অভাবের সময় একশত টাকা বেতনের এই চাকুরী গ্রহণ করিলে, তাহাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হয় বটে, কিন্তু যাঁহারা তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি

কৃতজ্ঞতা দেখান হয় না। অতএব বেতনের প্রলোভনটা ত্যাগ করাই ভাল। এই ভাবিয়া সে প্রকাশ্যে বলিল, "লাটিন ভাষা আমি সামান্য যা জানি, তা মিসেস দত্তকে শেখাব। কিন্তু এর জন্যে আমি টাকা না নিয়ে অন্য কিছু নেব।"

ডাক্তার দত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি নেবে?"

অশ্রুকুমার কহিল, "সেদিন মিসেস দত্ত বলেছিলেন যে আমাকে গান শেখাবেন।"

ডাক্তার দত্ত কহিলেন, "ওঃ—তা আমি জানতাম না; মিসেস দত্ত সে কথা আমাকে বলেন নি।"

আলেকজান্ড্রা ডাক্তার দত্তের বাক্যে একটু প্রচ্ছন্ন শ্লেষের সন্ধান পাইল। সে আনতাননে ধীরস্বরে কহিল "হাঁ, আমি অশ্রুবাবুকে গান শেখাতে প্রতিশ্রুত আছি।"

ডাক্তার দত্তের মুখমণ্ডলে একবার মাত্র বেদনার ভাব ফুটিয়া উঠিল; আলেকজান্ড্রা আনতাননে থাকায় তাহা লক্ষ্য করিতে পারে নাই। পরক্ষণে ডাক্তার দত্ত মুখে স্বাভাবিক প্রফুল্লতা আনিয়া শান্ত স্বরে কহিলেন, "এ খুব ভাল কথা। অশ্রুকুমার তোমাকে লাটিন শেখাবে; তার বিনিময়ে তুমি অশ্রুকুমারকে গান শেখাবে। শিক্ষা গ্রহণ ও দান বিনা খরচে হয়ে যাবে;—আমার পকেটের পয়সা পকেটেই থাকবে। এখন আমি তোমাদিকে এখানে কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত রেখে, আমার রোগীর অনুসন্ধানে বার হব।"

অশ্রুকুমার কহিল, "আমিও বাড়ী ফিরব। কাল থেকে রোজ সন্ধ্যার সময় এসে গান শিখব।"

ডাক্তার দত্ত কহিলেন, "না না, এখনই যেও না। আমি বাড়ী ফিরে যেন দেখতে পাই যে তোমরা উভয়ে মিলে গল্প করছ। বস বস, অশ্রুকুমার।"

অশ্রুকুমার গমনোদ্যত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; ডাক্তার দত্তের অনুরোধে আবার আসন গ্রহণ করিল। পরক্ষণেই ডাক্তার দত্ত কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেলেন।

আনতাননা আলেকজান্ড্রা অশ্রুকুমারের দিকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, আবার আনত আননে বসিয়া রহিল। তাহার হৃদয়মধ্যে একটা ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছিল; এজন্য সহসা তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া সে হৃদয়বেগ প্রশমিত করিল; তাহার পর অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "অশ্রুবাবু, তুমি সেদিন কি বলে গিয়েছিলে, মনে আছে?"

আলেকজান্ড্রা যখন নীরব ছিল, অশ্রুকুমারের দৃষ্টি তখন পার্শ্বস্থ টেবিলের উপরিস্থিত একখানি সংবাদ পত্রে আকৃষ্ট হইয়াছিল। আলেকজান্ড্রার প্রশ্ন শুনিয়া সে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলেছিলাম?"

আলেকজান্ড্রা কহিল, "বলেছিলে যে পরদিন নিশ্চয় আসবে।"

অশ্রুকুমার কহিল, "বিশেষ একটা প্রয়োজনে আবদ্ধ হয়ে পড়ায় কথামত আসতে পারি নি। ক্ষমা করবেন। কাল সন্ধ্যা বেলা কলিকাতায় ফিরেছি, সন্ধ্যাবেলা আসতে পারিনি; আজ সকালে উঠেই এসেছি।"

আলেকজান্ড্রা কহিল, "সেই প্রয়োজনীয় কাষটা কি, তা কি আমাকে বলবে না?"

অশ্রুকুমার বলিল, "কেন বলব না? সেই সেদিন আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ডেপুটি বাবুর বাড়ীতে গিয়ে শুনলাম যে, ডেপুটি বাবু ঠিক করেছেন তাঁর নাতনীর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন।"

আলেকজান্ড্রার হৃৎপিণ্ডে কে যেন মুদ্গরাঘাত করিল। সে মনে করিল, অশ্রুকুমার তাহাকে যেন একটা অমঙ্গল সংবাদ শুনাইবার জন্য উদ্যত হইয়াছে। ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর?"

অশ্রুকুমার কহিল, "আমি যেদিন আপনার কাছে এসেছিলাম, তার পরদিনই মাকে নিয়ে রঙ্গণঘাটে যেতে হয়েছিল। সেই অবধি রঙ্গণঘাটেই ছিলাম; কেবল একদিন মাত্র বিয়ে করতে কলকাতায় এসেছিলাম।"

আলেকজান্ড্রার মুখ অত্যন্ত ম্লান হইয়া গেল; সে যেন আপন প্রাণদণ্ডাজ্ঞা তখনই শ্রবণ করিল। ব্যথা-বিজড়িত কণ্ঠে অস্পষ্ট স্বরে কহিল, "তাহলে অশ্রুবাবু, তোমার বিয়ে হয়ে গেছে? একটা অচ্ছেদ্য

বন্ধনে তোমার মুক্ত জীবনটা চিরদিনের জন্যে বাঁধা পড়েছে?"

আলেকজান্দ্রার হৃদয়রহস্য পরিজ্ঞাত থাকায় এই বিবাহের সংবাদটা তাহার ব্যথিত হৃদয়কে পাষাণভারের ন্যায় নিপীড়িত করিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। সে কহিল, "অশ্রু বাবু, আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব। জানি না, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অধিকার আমার আছে কি না। তবু প্রশ্নটা আমি করব। তুমি যথার্থ উত্তর দিও।"

অশ্রুকুমার তাহার বিশাল নয়নে কৌতূহল পূরিয়া, আলেকজান্দ্রার দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

আলেকজান্দ্রা কহিল, "ব্রাহ্ম সংসারে প্রতিপালিত হয়ে, এবং কতকগুলো ইংরেজি ভাবাপন্ন লোকের সঙ্গে মিশে আমার মনে বিশ্বাস জন্মেছে যে, স্বামী স্ত্রীকে আর স্ত্রী স্বামীকে পছন্দ করে বিয়ে না করলে, পরস্পরের মধ্যে প্রণয়সঞ্চার হবার সম্ভাবনা নেই। হিন্দু বিয়েতে এরকম ঘটে না; মা বাপ বা অন্য আত্মীয়স্বজনের পছন্দ অনুযায়ী বিয়ে করতে হয়। এতে প্রণয় জন্মাবার আশা থাকে না, বিয়েটা যেন গুরুজনের আদেশ পালন মাত্র হয়ে দাঁড়ায়। তুমি এরকম বিয়ে করে কি সুখী হয়েছ? সত্যি বলো, এরকম প্রণয়হীন বিয়েতে কি তুমি কোন আনন্দলাভ করতে পেরেছ?"

অশ্রুকুমার কহিল, "আমি সুখী হয়েছি; আর বোধ হয়, আমার পরিণীতাও আমারই মত সুখলাভ করেছে।"

আলেকজান্দ্রা আর কথা কহিল না। মৌন থাকিয়া আপন মনে ভাবিতে লাগিল, 'অশ্রুকুমার সুখী, এবং অশ্রুকুমার যাহাকে বিবাহ করিয়াছে সেও সুখী। সুখ হইবারই কথা। তবে আমি কে? ওরে দুর্দ্দমনীয় বাসনা! একটি নির্ম্মল চরিত্রকে পাপের পঙ্কে নামাইয়া আনিও না! যে পবিত্র ও পূজ্য, সে চিরপূজ্য থাকুক; আমি আমার পাপ লইয়া তাহার পুণ্যপথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইব। আমার দেবতা স্বর্গে থাকুক; তাহাকে নরকে নামাইয়া আমি কি সুখলাভ করিব? এই ব্রাহ্মণ জিতেন্দ্রিয় থাকুন; ইঁহাকে আমার পাপ সংস্পর্শে আমি কেন হীন করিব? এই দেবোপম আদর্শপুরুষকে সম্মুখে রাখিয়া আবার আমার ধর্ম্মের পথে ফিরিতে হইবে। এখন সেই চেষ্টা আমার কর্ত্তব্য।"

বাহিরে প্রভাতালোক হাসিতেছিল। বাটীর সম্মুখে ক্ষুদ্র পুষ্পবাটিকায় ফুটন্ত মরসুমী ফুলগুলি কোমলাঙ্গে সোণার রৌদ্র মাখিয়া হাসিতেছিল। পুষ্পাঙ্গে ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুগুলি মৃদু প্রভাতবায়ু সংস্পর্শে দুলিতেছিল, আর কিরণময় হাসি হাসিতেছিল। সমস্ত পৃথিবী যেন প্রেমময়ের সুখকর করস্পর্শে প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই হাস্যময় শুভ মুহূর্ত্তে আলেকজান্দ্রা প্রেমের মর্য্যাদা বুঝিয়াছিল। বুঝিয়াছিল যে, যথার্থ প্রেম মানুষকে অধর্ম্মের পথ হইতে দূরে রাখে। প্রেম প্রেমপাত্রকে ভোগের জিনিষ মনে করে না; পূজার পবিত্র জিনিষ মনে করে। পূজার জিনিষ মনে করিয়া, সেই পূজনীয়কে অপবিত্রতার দিকে টানিয়া আনে না। যে প্রেমিকা ভালবাসিতে জানে, সে প্রেমপাত্রের নিকট কখন কিছু কামনা করে না; সে হৃদয় উৎসর্গ করে, কিন্তু বর প্রার্থনা করে না।

আলেকজান্দ্রাকে কিয়ৎকাল মৌন দেখিয়া অশ্রুকুমার বাড়ী ফিরিবার কথা ভাবিল। কহিল, "বেলা হয়েছে; আপনি অনুমতি করলে আমি বাড়ী ফিরব।"

অশ্রুকুমারের বাক্যধ্বনিতে আলেকজান্দ্রার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হওয়াতে সে চমকাইয়া উঠিল। তাহার পর স্থির হইয়া, সে স্নিগ্ধ প্রেমপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "বাড়ী যাবে অশ্রু বাবু? যাও; আবার কবে আসবে? যতদিন কলকাতায় থাকবে, এক একবার দেখা দিও।"

অশ্রুকুমার কহিল, "কেন, এ ত ঠিক হয়ে গেছে যে রোজ সন্ধ্যাবেলা এসে আমি আপনাকে লাটিন শেখাব; আর আপনি আমাকে গান শেখাবেন।"

আলেকজান্দ্রা ভাবিল, প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা নির্জ্জনে অশ্রুকুমারের কমনীয় কান্তি দেখিলে, তাহার উপর,

তাহার সহিত সাহিত্য ও সঙ্গীতের আলোচনা করিলে আবার তাহার চিত্তবিভ্রম ঘটিতে পারে। অতএব সে কহিল, "না অশ্রুবাবু, তুমি রোজ এস না। রোজ বাড়ীতে বদ্ধ থেকে আমি আর এই বয়সে স্কুলের ছাত্রী সাজতে পারব না। লাটিন শিক্ষায় আমার তত প্রবৃত্তি নেই; তা দুই একমাস পরে অবসর মত তোমার কাছে শিখে নেব। আর গান? গান তুমি আমার কাছে শিখো না। আমি আর গান গাব না।"

অশ্রুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "কেন: আপনি আমাকে গান শেখাবেন না কেন?"

আলেকজান্ড্রা কহিল, "তোমার মনে আছে কি, তুমি একদিন আমাকে বলেছিলে যে তুমি তোমার গ্রামের এক গায়কের কাছে গান শিখতে চাওয়ায় তোমার মা তোমাকে বারণ করেছিলেন?"

অশ্রুকুমার কহিল, "আমাদের গ্রামের সেই গায়ক দুষ্ট লোক, তাই বারণ করেছিলেন।"

আলেকজান্ড্রা হাসিয়া কহিল, "আমিও দুষ্টলোক, ভয়ানক দুষ্টলোক, তার চেয়ে দুষ্ট লোক!"

আলেকজান্ড্রার বাক্যকে একটা হাস্যোদ্দীপক অত্যুক্তি মাত্র মনে করিয়া সরল অশ্রুকুমার হাসিতে হাসিতে বিদায়গ্রহণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রোরপতি।

সুবর্ণশস্যশীর্ষ হৈমন্তিক ক্ষেত্রের ন্যায় কার্পেটের উপর, পূর্ব্বদিকের জানালা দিয়া হৈমন্তিক প্রভাতের রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছিল। বেলা তখন সাতটা বাজিয়া গিয়াছে, বাটীর সকলের চা খাওয়া শেষ হইয়াছে। তখন তারকবাবু একটা ড্রেসিং গাউন পরিয়া একটা আরাম চৌকিতে শুইয়া ছিলেন। নিকটে কার্পেটের উপর গৃহিণী বসিয়া ছিলেন। গৃহিণীর ক্রোড়ে একটি সুকুমার শিশু শুইয়া ছিল। গৃহিণী তাহার মুখের উপর মুখ আনত করিয়া, তারক বাবুকে কহিলেন, "দেখ, খোকা তোমাকে এখনি দাদা বলবে। বল ত, খোকা, দা দা দা।"

শিশু তাহার নবনীতনিন্দিত সুগোল বাহু দুটি তুলিয়া গৃহিণীর চিবুকপ্রান্তে হস্তার্পণ করিল।

সুকোমল স্পর্শে গৃহিণীর শিরায় শিরায় স্নেহধারা প্রবাহিত হইল; গৃহিণী পৌত্রের লালাপ্লাবিত মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "দা দা দা।"

এই পৌত্রের অন্নপ্রাশনে কি কি উদ্যোগ করিতে হইবে, তাহার পরামর্শ করিবার জন্য তারকবাবু অন্য কাম ছাড়িয়া গৃহিণীর নিকট আসিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মাসতুতো বোনদের বাড়ীর সকলকে নিমন্ত্রণ করতে হবে না কি?"

গৃহিণী পৌত্রের অধর নাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "ও মা! তা করবে না? তোমার প্রথম পৌত্রের ভাত দিচ্ছ, সকলকেই নিমন্ত্রণ করতে হবে।"

তারক বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকলে এলে এই বাড়ীতে সকলের স্থান সংকুলান হবে কেন?"

গৃহিণী কহিলেন, "দু' চারদিন বই ত নয়? মাথা গোঁজাগুঁজি করে এক রকম কেটে যাবে। আর পুরুষ কুটুম্বদের জন্য কাছাকাছি একটা বাড়ী ভাড়া নিলেই চলবে।"

বাড়ীভাড়া লইবার কথা শুনিবামাত্র তারকবাবু চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বৃহৎ বাটীর কথা মনে করিলেন। মোক্তারপুরের মহারাজা চলিয়া যাওয়ায় তাহা তখন খালি ছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীর সহিত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিরুদ্দিষ্ট উত্তরাধিকারীর কথাও মনে পড়িল। শত চেষ্টা করিয়াও তিনি অশ্রুকুমারের কোন সন্ধান প্রাপ্ত হন নাই। অশ্রুকুমারের চিন্তায় বিমর্ষ হইয়া তিনি কহিলেন, "দেখ, আমার হাতে এমন একটা বড় বাড়ী আছে, যাতে অনেক লোক বেশ স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারে। আমার ইচ্ছে হচ্ছে যে সেই বাড়ীতে গিয়ে কিছু দিনের জন্য বাস করি, আর খোকার অন্নপ্রাশনের ব্যাপারটা সেইখানেই সম্পন্ন করি।"

গৃহিণী কহিলেন, "পোড়া কপাল! শুভকর্ম বাড়ী ছেড়ে অন্যলোকের বাড়ীতে করব কেন? তুমি পুরুষ কুটুম্বদের জন্যে কাছে একটা বাড়ী নিলেই, এই বাড়ীতেই সব কায সুশৃঙ্খলায় হয়ে যাবে।"

শিশু তারক বাবুর মুখের দিক চাহিয়া চাহিয়া, দুইটি শিশিরকণার ন্যায় দুইটি দন্ত বিকশিত করিয়া, হাসিল। সে হাসি পৃথিবীর নয়; স্বর্গ হইতে আসিবার কালে সেই হাসি সে শিখিয়া আসিয়াছিল; এই পৃথিবীতে আট মাস বাস করিয়াও সে এখনও সেই স্বর্গীয় হাসি ভুলিয়া যায় নাই। হাসিয়া, পুষ্পদলবিগঠিততুল্য করতল তুলিয়া বলিল, "দা দা দা।"

গৃহিণী কহিলেন, "ঐ দেখ, তোমাকে দাদা বলে ডাকছে। দেখ, তোমার কোলে যাবে বলে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।"

তারক বাবু পৌত্রকে আপন অঙ্কে তুলিয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "পাজি!"

পাজি, পিতামহের গালাগালিতে প্রফুল্ল হইয়া লালাপ্লাবিত মুখ তুলিয়া তাঁহার নাসিকাগ্রভাগের স্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইল। তারক বাবু তাহাকে দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাজি, কি গহনা নিবি বল।"

গৃহিণী কহিলেন, "ঐ কচি হাত দুটিতে রিং ছোলা বালা কেমন মানাবে বল দেখি?"

একে একে গৃহিণী অনেকগুলি গহনারই নাম করিলেন। স্বামী স্ত্রীতে সে বিষয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া কত আলোচনা চলিল। গহনার ফর্দ্দ স্থির হইলে তারকবাবু, বলিলেন, "এখন তবে আমি উঠিতে পারি?"

গৃহিণী পৌত্রের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "নিমন্ত্রণ পত্রগুলো কবে পাঠাবে? ভাল কথা মনে পড়েছে। বিয়ে পৈতের আর ভাতের নিমন্ত্রণ পত্রের কতকগুলো নমুনা সরকার কাল সন্ধ্যাবেলা আমাকে দিয়েছিল। আমি তা তোমাকে দেখাতে ভুলে গেছি। আনছি, দেখ, দেখে বল কোন কাগজে কি ভাবে, কি কালীতে আমাদের গুলো ছাপা হবে।" এই বলিয়া গৃহিণী পৌত্রকে কোলে লইয়া কক্ষান্তরে উঠিয়া গেলেন; এবং অল্পকাল মধ্যে নমুনাগুলি লইয়া আসিয়া, বসিয়া বলিলেন, "এই দেখ, এই একখানি পত্র—সবিনয় নিবেদন,—আগামী ৭ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার—"

তারক বাবু কহিলেন, "থাক থাক, পত্র আর পড়তে হবে না। এই সাদা কাগজের উপর সোণালি লতাপাতা; তার মধ্যে সোণালী প্রজাপতির লেখা—কিছুই পছন্দ হল না।"

গৃহিণী কহিলেন, "আচ্ছা, তবে ঐখানি—তোমার হাতে ঐ আসমানি কাগজের উপর ঐ রূপালি অক্ষর, যেন আকাশে তারা ফুটে রয়েছে, বেশ ত ওখানি।"

তারকবাবু কহিলেন, "কিন্তু শুভ কার্য্যে আসমানি রঙটা আমি পছন্দ করলাম না।"

শিশু ইতিমধ্যে নমুনাগুলি দুইহাতে ধারণ করিয়া, সেগুলি ভোজনের চেষ্টা করিতেছিল। গৃহিণী পৌত্রের হস্ত হইতে একখানা পত্র কাড়িয়া লইয়া কহিলেন, "এই দেখ, আর একখানা পত্র, গোলাপী রঙের কাগজের উপর লাল কালীতে ছাপা, সম্মান পূর্ব্বক নিবেদন, আগামী ৯ই আশ্বিন আমার নবজাত পুত্রের—"

তারকবাবু কহিলেন, "কর কি! পত্রগুলো পড়ে সময় নষ্ট কর কেন?"

গৃহিণী কহিলেন, "আর এই একখানা হলদে রঙের কাগজের উপর লাল কালীতে ছাপা;—সম্মান পুরঃসর সবিনয় নিবেদন—আগামী ২০শে অগ্রহায়ণ বুধবার রঙ্গণঘাট—থাক্, আর পড়ব না। তুমি অমন করে উঠলে কেন?"

তারক বাবু উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, "না, না, পড় পড়,—রঙ্গণঘাট কি পড়ছিলে পড়।"

গৃহিণী পড়িলেন, "রঙ্গণঘাট নিবাসী ৺ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ অশ্রুকুমার চক্রবর্ত্তীর

সহিত আমার দৌহিত্রী ৺হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী সৌদামিনী দেবীর শুভ বিবাহ হইবে। মহাশয়—"

তারক বাবু পত্রখানা আর পড়িতে দিলেন না; উহা গৃহিণীর হস্ত হইতে একপ্রকার কাড়িয়া লইলেন। পরক্ষণে কক্ষদ্বারাভিমুখে ধাবিত হইয়া হাঁকিলেন, "ওরে, কে আছিস রে? শীগ্‌গির! শীগ্‌গির! এখনই আমার গাড়ী তৈরী করতে বল। যেন এক মিনিটও দেরী না হয়। ব্যস, এইবার বমাল সমেত পলাতক আসামীকে ধরব।"

গৃহিণী বুঝিলেন যে তাঁহার এটর্ণি স্বামী ঐ পত্র হইতে বুঝি কোন নিরুদ্দিষ্ট আসামীর সন্ধান পাইয়াছেন।

তারক বাবু পোষাক পরিয়া গাড়ীতে উঠিলেন; এবং পত্রের ঠিকানা দেখিয়া, কয়েক মিনিটের মধ্যে ডেপুটী বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তখন অশ্রুকুমার আলেকজান্দ্রার বাড়ী হইতে ফিরিয়া বৈঠকখানা ঘরে ডেপুটি বাবুর নিকট বসিয়া ছিল। রামতনু বাবু চল্লিশ টাকা বেতনের একটি চাকুরীর সন্ধান আনিয়া অশ্রুকুমারকে তৎকার্য্যে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিতেছিলেন। প্রভাকর দৈনিক রন্ধন সামগ্রী বাজার হইতে আনিবার জন্য চিন্তামণিকে আহ্বান করিতেছিল। তারক বাবু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া, সকলেরই মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়া দিলেন। সকলেই প্রশ্নপূর্ণ নয়নে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অশ্রুকুমার আনন্দের সহিত রামতনু বাবুর প্রস্তাবিত চল্লিশ টাকা বেতনের চাকরিটি গ্রহণে সম্মত হইতে যাইতেছিল; তারক বাবুকে সহসা কক্ষে সমাগত দেখিয়া সেও আপনার বাক্য সংযত করিল।

তারক বাবু বলিলেন, "আমার নাম শ্রীতারকনাথ ভট্টাচার্য্য।"

অশ্রুকুমার বিবাহোপলক্ষে রঙ্গণঘাটে যাইয়া তাহার মাষ্টার মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিল যে, তারকনাথ ভট্টাচার্য্য নামে তাহার জ্যাঠা মহাশয়ের এক বন্ধু তাহারই অনুসন্ধানে রঙ্গণঘাটে গিয়াছিলেন। সে কথা তাহার স্মরণ ছিল। সে কহিল, "আপনিই কি আমার সন্ধানে রঙ্গণঘাটে গিয়েছিলেন?"

তারক বাবু কহিলেন, "হাঁ, আমি রঙ্গণঘাটে আর অন্যান্য জায়গায় অনেক অনুসন্ধান করেছি; কোথাও তোমার সন্ধান পাই নি। আজ দৈবক্রমে এই পত্রখানা হস্তগত হওয়ায়, তোমার সাক্ষাৎ পেলাম।"—এই বলিয়া, তারক বাবু পকেট হইতে হলদে রঙের পত্রখানা বাহির করিয়া দেখাইলেন।

অশ্রুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কেন আমাকে খুঁজেছিলেন? আমায় কি আপনার কোন প্রয়োজন আছে?"

তারক বাবু কহিলেন, "তোমায় বিলক্ষণ প্রয়োজন আছে। প্রয়োজনটা কি তা তোমাকে বুঝিয়ে বলি, শোন। আমি তোমার পরলোকগত জ্যেঠা মশায়ের একজন বন্ধু; আর হাইকোর্টের একজন এটর্ণি। কেদারেশ্বর আমাকে তাঁর অনুগত বন্ধু ও আইন ব্যবসায়ী জেনে, মৃত্যুকালে আমার উপর এক গুরুভার অর্পণ করে গেছেন। তুমি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আর আসন্ন আত্মীয়। তুমি ছাড়া তাঁর অন্য কোনও উত্তরাধিকারী নেই।"

অশ্রুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, জ্যেঠামশায়ের কি কোন ছেলে মেয়ে নেই?"

তারক বাবু কহিলেন, "একটিও না। তোমার জ্যেঠাইমাও অনেক দিন হল মারা গিয়েছেন। মৃত্যুকালে তুমিই তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলে। তিনি মৃত্যুকালে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আমার তত্ত্বাবধানে রেখে তোমাকে তা বুঝিয়ে দেবার জন্যে বলে গিয়েছিলেন। গত ১৬ই ভাদ্র তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তার পরই তোমাকে তোমার সম্পত্তিটা বুঝিয়ে দেওয়া আমার কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু দুটো কারণে তা ঘটে নি। প্রথম তোমার কাছে আমার পত্র পৌঁছায় নি; তারপর পূজার ছুটীতে আমি দারজিলিং যেতে বাধ্য হয়েছিলাম।

দারজিলিং গিয়ে আমি পীড়িত হয়েছিলাম। ভাল হয়ে কলকাতায় ফিরে তোমার অনুসন্ধানে বার হইলাম। কিন্তু কোথাও তোমার সাক্ষাৎ পেলাম না।"

অশ্রুকুমার বিষাদপূর্ণ স্বরে কহিল, "আমি কোনও সংবাদ পাই নি বলে আসন্নকালে জ্যেঠামশায়ের কাছে থেকে তাঁর সেবাও করতে পারি নি।"

তারক বাবু কহিলেন, "মৃত্যুকালে তাঁর কাছে আসবার জন্যে কেদার বোধ হয় তোমাকে কোন পত্র লেখেন নি। লিখলে অবশ্যই তা আমি জানতে পারতাম।"

তোমাদের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, চক্রবর্ত্তী মহাশয় মৃত্যুকালে অশ্রুকুমারকে আসিবার জন্য দুইখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সে পত্র শ্যালকত্রয় দ্বারা কিরূপে ভস্মীভূত হইয়াছিল তাহাও তোমরা জান। কিন্তু তারক বাবু এসকল সংবাদ অবগত ছিলেন না। তিনি বলিলেন, "যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। এখন অতীত ঘটনার জন্যে বিলাপ করা বৃথা। এখন তোমার সাক্ষাৎ পেয়েছি। তুমি আমার সঙ্গে চল। আমি তোমার সম্পত্তি তোমাকে বুঝিয়ে দিয়ে, আমার মৃত বন্ধুর প্রতি আমার শেষ কর্ত্তব্য প্রতিপালন করি।"

ডেপুটি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁর কত সম্পত্তি ছিল?"

তারক বাবু কহিলেন, "তাঁর সম্পত্তির বার্ষিক আয় দশ লক্ষ টাকারও বেশী।"

ডেপুটি বাবু মহা বিস্ময়ে, বিস্ফারিত নেত্রে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। ভাবিলেন, তাঁহার দিদিমণি কি শুভ অদৃষ্টের নির্দ্দেশে, অত্যন্ত দরিদ্র জানিয়াও, অশ্রুকুমারকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। আর এই অশ্রুকুমার, যাহাকে তিনি একদিন বিদ্যাহীন দীন পল্লীযুবক মনে করিয়া ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, যে রামতনু বাবুর কৃপায় একটি চল্লিশ টাকা বেতনের চাকুরী গ্রহণ করিতে পারিবে বলিয়া নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিতেছিল, প্রকৃত পক্ষে সে আজ ক্রোরপতি!—তাহার সম্পত্তির মূল্য দুই কোটি টাকারও বেশী! সে ক্রোরপতি হইয়া, রাজপ্রাসাদ তুল্য প্রকাণ্ড অট্টালিকাতে বাস করিবে। তাঁর দিদিমণি ক্রোরপতির স্ত্রী হইয়া, রাজরাণীর ন্যায় মণিমুক্তায় অলঙ্কৃতা হইয়া, সেই রাজপ্রাসাদ আলো করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে। কি সুখ! কি আনন্দ! কি শুভক্ষণে তাঁর দিদিমণি এই অশ্রুকুমারকে দেখিয়াছিল। অশ্রুকুমার আজ ক্রোরপতি! তাহার দিদিমণি আজ ক্রোড়পতির স্ত্রী!

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের মথুরা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

খ-মাণিক্য নামক জ্যোতিষগ্রন্থে লিখিত আছে যে, দ্বাপর যুগের শেষে ভাদ্রমাসে, কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে, রোহিণী নক্ষত্রে বুধবারে ব্রহ্মক্ষণে নিশীথ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রকটিত হন। বসুদেব সেই ঘোর অন্ধকার রজনীযোগে কৌশলে নিজ সদ্যপ্রসূত পুত্রকে লইয়া, যমুনার অপর পারে নন্দগৃহে রাখিয়া দিয়া, নন্দ ভবন হইতে যশোদার গর্ভসম্ভূতা যোগমায়া দেবীকে আনিয়া দৈবকীর পার্শ্বে রাখিলেন। পরদিন কংস পূর্ব্ব প্রথামত পাষাণে সবলে নিক্ষিপ্ত করিয়া সেই শিশুকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে, যোগমায়া দেবী তাঁহার হস্তচ্যুত

হইয়া গগনমার্গ হইতে বলিলেন—"আমাকে মারিবি কি, তোকে যে বধ করিবে সে গোকুলে বাড়িতেছে।" এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা আর বাঙ্গালীকে বলিয়া দিতে হইবে না। তবে কত বৎসর বয়সে, কোন স্থানে থাকিয়া কি কি লীলা তিনি করিয়াছিলেন আমরা তাহারই সংক্ষিপ্ত তালিকা দিব। তিনি গোকুল গ্রামে আড়াই বৎসর পর্য্যন্ত ছিলেন। পুতনাবধ, শকটভঞ্জন, বদনে ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন, তৃণাবর্ত্তবধ, উদূখলে বন্ধন ও যমলার্জ্জুন ভঞ্জন পর্য্যন্ত এই স্থানে হয়। তৎপরে নন্দ প্রভৃতি গোপগণ কংস প্রেরিত দৈত্যগণের উপদ্রব ও ব্যাঘ্র-ভয়ে এইস্থান ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে নন্দগ্রামে চলিয়া যান।

আজকাল যেস্থানকে আমরা বৃন্দাবন বলিয়া দেখিতে যাই, পৌরাণিকযুগে সে স্থানকে রাসস্থলী বলিয়া গোস্বামী-পাদেরা স্থির করিয়াছিলেন। পুরাণের মতে গোবর্দ্ধন সন্নিহিত পঞ্চযোজন বিস্তৃত নন্দগ্রাম প্রভৃতিই বৃন্দাবন বলিয়া উল্লিখিত। সে কথা আমার 'বৃন্দাবন কথা' নামক পুস্তকে ২০৯ পৃষ্ঠায় প্রমাণ সহ বিবৃত করিয়াছি। সেই বৃন্দাবনে অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণ বৎসাসুর, বকাসুর ও অঘাসুর বধ, ব্রহ্মমোহন, দাবানল পান, কালীয়নাগ দমন, ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ, গোবর্দ্ধন-ধারণ বনভোজন, সর্পগ্রাস হইতে নন্দকে মুক্তিদান, শঙ্খচূড় বধ, অশ্বরূপী গোরূপী অরিষ্টাসুর বধ, বস্ত্রহরণ ও রাস —এই লীলাগুলি সম্পন্ন করেন।

একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মথুরাপতি কংস ধনুর্ম্মখ নামক যজ্ঞের ছল করিয়া অক্রূর নামক একজন যাদবকে পাঠাইয়া, কৃষ্ণ ও বলদেবকে মথুরায় লইয়া আইসেন। এই মথুরাতেই কুবলয়াপীড় নামক হস্তী বধ, পরে চানূর মুষ্টিক নামক মল্লদ্বয়কে ও কেশাকর্ষণে মঞ্চ হইতে পাতিত করিয়া কংসকে সংহার করেন। এই স্থানেই কুব্জার সহিত মিলন। কংসবধের পর শ্রীকৃষ্ণ উগ্রসেনকেই পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহার পর কৃষ্ণ ও বলরাম অবন্তীনগরে যাইয়া শস্ত্র ও শাস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। মগধাধিপতি জরাসন্ধ শোকার্ত্তা কন্যাদ্বয়ের (কংসের পত্নীদ্বয়ের) অনুরোধে অষ্টাদশ বার মথুরা আক্রমণ করিয়া যাদবগণকে উৎসন্ন করিতে চেষ্টা করে। তাহার প্রিয় বন্ধু কালযবন আসিয়া মথুরা আক্রমনে যোগ দিয়াছিল। মথুরার যাদবেরা এই উভয়ের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। তখন শ্রীকৃষ্ণের বয়স কোন মতে ষোল বৎসর, কোন মতে উনিশ বৎসর। তিনি দেখিলেন, মথুরায় থাকিয়া যাদবেরা শত্রুসেনার আক্রমণে দিন দিন ক্ষীণ ও হীনবল হইতেছে। অবশেষে তিনি মথুরা পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমসাগর তীরে মনোহর দ্বারকাপুরী স্থাপন করিয়া যাদবগণকে তথায় লইয়া গেলেন। সেই দ্বারকাপুরী রক্ষার জন্য সন্নিহিত রৈবতক পর্ব্বতোপরি দুর্গাদিও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবেরা চলিয়া গেলে মথুরাপুরী প্রায় জনশূন্য ও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িল।

শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় বাস করিতেছিলেন, সেই সময়েই ভীষ্মকতনয়া রুক্মিণীকে হরণ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ-রাজ নরক বধ ও তাহার ১৬১০০ পত্নীকে হরণ, পারিজাত হরণ, বাণাসুর বধ, বারাণসী দাহ, গান্ধার, পাণ্ড্য কলিঙ্গ শাল প্রভৃতি দেশ বিজয়, স্যমন্তক মণি আহরণ, সত্যভামাকে বিবাহ ও জাম্ববতী প্রভৃতি অপরাপর মহিষীগণকে বিবাহ করেন। ঐ সকল মহিষীর গর্ভে তাঁহার অসংখ্য সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে প্রধানা মহিষী রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্ন নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ, বাণরাজ-তনয়া উষাদেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্রের নাম বজ্রনাভ। এই বজ্রনাভই যাদবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত মথুরায় পুনরায় রাজধানী স্থাপন ও ব্রজমণ্ডলে দেবমূর্ত্তিগুলি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। দ্বারকায় অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের সাহায্য করিয়াছিলেন—সে সকল কথা এ প্রবন্ধের বর্ণনীয় বিষয় নহে। শ্রীকৃষ্ণের যখন ১২৫ বৎসর বয়স, তখন তিনি অপরাপর যাদবগণকে

সঙ্গে লইয়া দ্বারকার সন্নিহিত প্রভাসতীর্থে উৎসব করিতে গিয়াছিলেন। তথায় যাদবেরা সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া পরস্পরের প্রাণ সংহার করিয়াছিল। যদুবংশ ধ্বংস হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখিলেন যে, তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট; তাঁহার মুখবিবর হইতে একটি সহস্র ফণাবিশিষ্ট মহাসর্প বিনির্গত হইয়া পশ্চিমসাগরে ডুবিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বলদেবের জীবনহীন দেহ মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। শ্রীকৃষ্ণ তখন নিজের বংশের এইরূপ দুর্গতি দেখিয়া মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ বাসনায় মহাযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক ধরাশয্যায় শয়ান রহিলেন। এমন সময়ে জরা নামে একজন ব্যাধ আসিয়া মৃগভ্রমে তাঁহার চরণকমলে বিষদিগ্ধ শরাঘাত করিল। তিনি নরদেহ পরিত্যাগ করিয়া নিজধামে চলিয়া গেলেন। সমস্ত যদুকুল এইরূপে ধ্বংস হইয়া গেল—এই বংশের মধ্যে কেবল বজ্রনাভই জীবিত রহিলেন। তিনি তখন প্রভাসে উপস্থিত ছিলেন না। এইটুকু হইল বৃষ্ণিবংশ শাখার ইতিহাস।

তাহার পর স্কন্দ পুরাণে বিষ্ণুখণ্ডে ভাগবত মাহাত্ম্যে দেখিতে পাই যে, মহাপ্রস্থান সময়ে রাজা যুধিষ্ঠির বজ্রনাভকে সমগ্র মথুরা প্রদেশে এবং স্বীয় পৌত্র পরীক্ষিতকে হস্তিনানগরে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া যান। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকায় চলিয়া গেলে পর এইস্থান প্রজাশূন্য ও জনহীনপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। বজ্রনাভ, নন্দ গোপাদির পুরোহিত ঋষি শাণ্ডিল্যের উপদেশ মত ও সম্রাট পরীক্ষিতের সাহায্যে "ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে দলে দলে সহস্র সহস্র প্রজাগণকে আনয়ন করিয়া সেই জনশূন্য মথুরানগরে স্থাপিত করিলেন। এবং তত্রত্য মাথুর ব্রাহ্মণ ও প্রাচীন বানরগণকে সম্মানার্হ জানিয়া সেই মথুরারাজ্যে রাখিয়া দিলেন। এদিকে নৃপতি বজ্র ও পরীক্ষিতের সাহায্য লাভ করিয়া ঋষি শাণ্ডিল্যের অনুগ্রহে গোবিন্দ, গোপ ও গোপীদিগের লীলাভূমি অবলোকন পূর্ব্বক কৃষ্ণলীলার নামানুসারে এক একটি নাম দিয়া বহু গ্রাম ও নগর প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। তিনি কোথাও কুণ্ড, কূপ ও পূর্ত্ত প্রতিষ্ঠা, কোথাও শিবলিঙ্গাদি স্থাপন এবং কোথাও গোবিন্দ হরি ও অন্যান্য নামে দেবাদি প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বীয় রাজ্যে কৃষ্ণের প্রতি একনিষ্ঠা ভক্তি বিস্তার করতঃ একান্ত হৃষ্ট হইলেন। তৎপরে তাঁহার প্রজাগণ কৃষ্ণকীর্ত্তনে তৎপর হইয়া অত্যন্ত আমোদ প্রাপ্ত হইল। এবং তাহারা পরমানন্দ চিত্তে তাঁহার রাজ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল।" (বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত স্কন্দপুরাণ, ২য় অধ্যায়, ১২৮৬ পৃষ্ঠা।)

উপরি-উদ্ধৃত অংশ হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে বজ্রনাভই প্রথমে মথুরা মণ্ডলে দেবমূর্ত্তি, শিবলিঙ্গ, কুণ্ড কূপাদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে এখানে কোনরূপ দেবমূর্ত্তি ছিল কি না ঠিক বোঝা যায় না।

এই পুরাণে কেবল গোবিন্দদেব ও হরিদেবের নাম মাত্র রহিয়াছে। কিন্তু বৃন্দাবনবাসী গোস্বামীপাদেরা বলিয়া থাকেন যে, বজ্রনাভ এখানে ১৬টী বিগ্রহ স্থাপিত করিয়াছিলেন। সেই গুলি এই—৪টী দেব, যথা, বৃন্দাবনে গোবিন্দ দেব, মথুরায় কেশব দেব, গোবর্দ্ধনে হরিদেব এবং মহাবনে বলদেব; ৪টী গোপাল যথা—গোবর্দ্ধনে শ্রীনাথ গোপাল, বৃন্দাবনে সাক্ষীগোপাল, গোপীনাথগোপাল ও মদনগোপাল; ৪টী শিবলিঙ্গ যথা—বৃন্দাবনে গোপীশ্বর, মথুরায় ভূতেশ্বর, গোবর্দ্ধনে চক্রেশ্বর ও কাম্যবনে কামেশ্বর; ৪টী দেবীমূর্ত্তি যথা মথুরায় মহাবিদ্যা, বৃন্দাবনে বৃন্দাদেবী, চীর বা বস্ত্রহরণ ঘাটে কাত্যায়নী এবং সঙ্কেত গ্রামে সঙ্কেতবাসিনী।

ইঁহাদের বিস্তৃত বিবরণ "বৃন্দাবন কথা" পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। এই স্কন্দ পুরাণ হইতে আমরা আরও একটি বিষয় জানিতে পারি তাহা এই—খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে রূপ সনাতন প্রভৃতি চৈতন্যদেব প্রেরিত যে সকল গোস্বামীরা বনজঙ্গলের মধ্য হইতে বৃন্দাবনধাম ও কৃষ্ণলীলা প্রচার জন্য যখন গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই আপনাদিগকে শ্রীরাধার সখী

ভাবে ভাবিত করিয়া রাধাকৃষ্ণ উপাসনা করিতেন। সেই জন্য তাঁহাদের "সখীভাবক" নাম হইয়াছিল। এই স্কন্দপুরাণে এ বিষয়ে নিম্নলিখিতরূপ আভাস পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যমুনা কৃষ্ণ-পত্নীগণকে বলিতেছেন, "আত্মারাম কৃষ্ণের আত্মা রাধিকা। আমি তাঁহার দাসী। তাঁহারই দাস্য প্রভাবেই কাতরতা আমাকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ সন্দেহ নাই। কৃষ্ণের যে সকল নায়িকা, তাঁহারাও সেই রাধিকার অংশ-বিস্তার জানিবে। রাধিকার সহিত নিত্য কৃষ্ণের সম্ভোগযোগ বিদ্যমান। অতএব রাধিকাযোগে অপর নায়িকারাও কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হন।" ইহার উত্তরে কৃষ্ণ-পত্নীগণ বলিতেছেন, "হে সখি ! তুমি ধন্যা, কেন না, কান্তের সহিত তোমার বিচ্যুতি ঘটে নাই; যে রাধিকা হইতে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে—আমরাও তাঁহার দাসী হইব" ইত্যাদি।

এই উক্তিগুলি হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে, রাধিকার দাসী হইলে তবে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। আধুনিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরাও রূপসনাতন প্রভৃতি গোস্বামিগণের অবলম্বিত সখীভাব মতে আপনাদিগকে প্রেমময়ী শ্রীরাধার দাসী রূপে ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলাভের প্রয়াসী। শাস্ত্রদর্শী গোস্বামিগণ বলিয়া থাকেন যে শ্রীমদ্‌ভাগবতই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কৃষ্ণোপাসনার মূল ভিত্তি। তৎপরে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতে তাঁহাদের রাধাকৃষ্ণ লীলাত্মক প্রেম ভক্তির বা সখীভাবক মত তদুপরি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্কন্দ পুরাণের এই অংশের নাম যখন ভাগবত মাহাত্ম্য, তখন এটি যে ভাগবতের পরে রচিত হইয়াছে তাহাতে সংশয় নাই। এবং যখন ইহাতে রাধামাহাত্ম্য ও সখীভাবের কথা পাওয়া যাইতেছে, তখন স্কন্দপুরাণ যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের পরে রচিত তাহা সহজেই অনুমিত হয়।

এই স্কন্দপুরাণে পুরুষোত্তম, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি অনেক তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। সেই জন্য এই পুরাণখানিকে অনেকে তীর্থপুরাণ বলিয়া থাকেন।

এবার আমরা পদ্মপুরাণ খুঁজিয়া দেখিব। ইহার পাতালখণ্ডে হরপার্ব্বতী সংবাদে গৌরীর প্রশ্নে শঙ্কর এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন,—"রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা গুহ্য অপেক্ষাও গুহ্যতর, পরমানন্দকারক এবং অত্যন্ত অদ্ভুত রহস্যেরও রহস্য।" তৎপরে সদাশিব (প্রথম অধ্যায়ে) বলিতেছেন যে, মথুরা বিষ্ণুচক্রে পরিবর্দ্ধিত। এখানে দ্বাদশটী বন, ৩০টি উপবন, এবং গোপীশ্বর নামে তাঁহার লিঙ্গমূর্ত্তি আছে। ২য় অধ্যায়ে গোবিন্দ, সখী, সখা, দ্বারকার মহিষীরা ও লক্ষ গো-সকলের কথা; ৩য় অধ্যায়ে নারদ কর্ত্তৃক দিগম্বর বালকৃষ্ণ দর্শন ও ভানুসুতা রাধার দর্শন; ৪র্থ অধ্যায়ে সুনন্দা মুনি, সত্যতপা মুনি এবং বহুমুনি ও নরপতিরা ব্রজ-বালিকার রূপে রাসে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা হইয়াছিলেন; ৫ম অধ্যায়ে মথুরার ভূতেশ্বরের নাম পাওয়া যায়। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে দেখি, বৃন্দাবনের গোপীগণ পূর্ব্বে মুনিঋষি ছিলেন। উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরীরা পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে আসিয়া গোপীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ৭ম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে নারদ অমৃত সরোবরে স্নান করিয়া নারীরূপ লাভ করেন এবং ললিতা সখীর সংঘটনায় এক বৎসর কৃষ্ণের সহিত রমণ করেন। বৎসরান্তে অমৃত সরোবরে স্নানে পুনরায় পুরুষদেহ লাভ করিয়াছিলেন। দুর্গা, ললিতা ও রাধা এক। এই সকল গুহ্যকথা "মাতৃজারবৎ গোপনীয়"। ৯ম অধ্যায়ে দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণের প্রথমে বালগোপাল পরে কৈশোরে মদনগোপাল, যৌবনে মদনমোহন নাম হয়। ১২শ অধ্যায়ে বৈষ্ণব পর্ব্বদিনের বিবরণ আছে। সুতরাং আমরা পদ্মপুরাণ হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে, বজ্রনাভ ব্রজমণ্ডলে দেবমূর্ত্তিগুলি প্রতিষ্ঠা করিলে পর এখানি রচিত হইয়াছে। বৃন্দাবনে গোবিন্দ নাম অনেক পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গোপেশ্বর, ভূতেশ্বর ও মদনগোপাল মদনমোহন প্রভৃতি নামে দেবমূর্ত্তির নাম এই পুরাণে প্রথম পাওয়া যায়। দেবর্ষি নারদ ও মুনিঋষিরা এবং অপ্সরোগণ, এমন কি দেবর্ষি নারদ পর্য্যন্ত যখন কৃষ্ণসঙ্গসুখ লাভ করিবার জন্য

গোপীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া লেখা হইয়াছে, তখন এখানে স্কন্দপুরাণ অপেক্ষা আরও স্পষ্টভাবে গোপীভাব বা সখীভাবের কথা পাইতেছি। বৃন্দাবনে রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরাই এই পদ্মপুরাণের মতে শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষা অধিকতর প্রাধান্য দিয়া সেবার্চ্চনা করিয়া থাকেন।

ইহার পর আমরা বরাহ পুরাণ ধরিব। দশন-শিখরাসীনা বসুমতীর প্রশ্নে বরাহদেব স্বয়ং এ পুরাণ বলিতেছেন। এ পুরাণখানিতে অনেকগুলি ব্রত ও তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এই পুরাণের মতে মথুরা মণ্ডল বিংশতি যোজন, মথুরা মাহাত্ম্য তাঁহাদের অন্যতম। ইহার ভিতর মথুরার ২৪টি ঘাটের এবং শিব কুণ্ড, বিমলকুণ্ড প্রভৃতি কুণ্ডের নাম পাওয়া যায়। সে সকলের বিষয় “বর্ত্তমানযুগের মথুরা” প্রবন্ধে দিব। এই পুরাণের ১৬৩ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, মথুরামণ্ডল-রূপ পদ্মের মধ্য কর্ণিকায় (কেন্দ্রস্থানে, শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে) কেশব দেবের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। উত্তর দলে বা পত্রে গোবিন্দ মূর্ত্তি, পূর্ব্বদলে বিশ্রান্তি মূর্ত্তি, দক্ষিণ দলে বরাহ মূর্ত্তি, ও পশ্চিমদলে হরিদেব মূর্ত্তি অবস্থিত আছে। এবং সংসঙ্গে দীর্ঘবিষ্ণু স্বয়ম্ভু, মহাবিদ্যা ভূতেশ্বর প্রভৃতি মথুরার প্রাচীন দেবতাগুলির নামও পাওয়া যায়। এই সকল দেবতা দর্শনে এবং মথুরার কোন্ ঘাটে স্নান করিলে কি ফললাভ হয় তাহাও লিখিত আছে। যেমন পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ধ্রুব মথুরার এক ঘাটে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া সেই ঘাটের নাম ধ্রুবঘাট হইয়াছে। বলি রাজা পাতালে কুটুম্বগণের ভরণ-পোষণে অক্ষম হইয়া মথুরার একটি ঘাটে আসিয়া সূর্য্যের উপাসনা করিয়া চিন্তামণি নামে সূর্য্যের মুকুটমণি লাভ করেন, সেই জন্য সেই ঘাটের নাম সূর্য্যঘাট ইত্যাদি।

• বরাহ পুরাণে বুদ্ধ দ্বাদশী ব্রতের কথায় লিখিত আছে যে, শ্রাবণ মাসে শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে নব বস্ত্রাবৃত ঘাটের উপর কাঞ্চনময় বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবে। পরে সেই কাঞ্চনময় মূর্ত্তি বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে দিবে। বোধি বলিয়া একটি ঘাটের নামও এ পুরাণে আছে, সুতরাং এই পুরাণখানি যে বুদ্ধদেবের জন্মের পরে রচিত হইয়াছে তাহা যেন স্বতঃই মনে হয়। রূপ, সনাতন প্রভৃতি গোস্বামীরা যখন মথুরা মণ্ডলে লুপ্ত তীর্থ ও গুপ্ত দেববিগ্রহগুলির উদ্ধার মানসে তথায় গিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা এই বরাহ পুরাণোক্ত মথুরা মাহাত্ম্য দেখিয়াই শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থানগুলি অনুসন্ধান করিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন। একথা চরিতামৃতে পাওয়া যায়। সমস্ত পুরাণ ও উপপুরাণের মধ্যে মথুরার ঐতিহাসিক উপাদান কোথায় কি পাওয়া যায় সে সমস্ত অনুসন্ধান করা আমার সাধ্যাতীত। আমি কেবল মোটামুটিভাবে যাহা পাইয়াছি তাহাই সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

এই বরাহপুরাণ মতে যমুনা “গঙ্গাশতগুণাপুণ্যা” এবং মথুরা “কৃষ্ণপাদরজোমিশ্র বালুকা পূতবীথিকা॥”

ইহার পর ভূতশুদ্ধিতন্ত্রে লিখিত আছে যে—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব, সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা॥

তাহার কারণ—

অযোধ্যা রামনগরী মথুরা কৃষ্ণপালিতা।
এতাস্তু পৃথিবী মধ্যে ন গণ্যন্তে কদাচনঃ॥

শৈবেরা বলিয়া থাকেন যে শিবের ত্রিশূলোপরি বারাণসী সংস্থাপিতা। বৈষ্ণবগণের মতে মথুরা “কেশবোৎসৃষ্ট সুদর্শন বিধারিতা॥”

মহাভারতের মধ্যে মথুরা তীর্থ বলিয়া গণ্য হয় নাই। বিষ্ণুপুরাণে ৬ষ্ঠ ও ৮ম অধ্যায়ে দেখা যায় যে জৈষ্ঠ মাসে শুক্লা দ্বাদশীতে যমুনানদীতে স্নান করিলে মহাফল লাভ হয়। কিন্তু মথুরার মাহাত্ম্য বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই। কেবল পদ্মপুরাণে পাতাল ও বৈষ্ণব খণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড, বায়ু, সৌর পুরাণে কিছু কিছু মাহাত্ম্য কথিত আছে। বেদ ও রামায়ণের যুগে যেস্থান নরমাংসভোজী অনার্য্য রাক্ষসগণের আবাসভূমি ছিল, পরবর্ত্তীকালে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও লীলা প্রসাদে সেইস্থান মোক্ষদাত্রী পুরী হইয়াছে। এই দ্বাপর যুগে যে মথুরা-

নগরী শিল্প বাণিজ্য প্রাসাদাদিতে রামায়ণ বর্ণিত অবস্থা হইতে অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়াছিল সে কথা 'নানা পুরাণ হইতে জানা যায়। এবং উত্তরকালে যদুবংশীয় বৃষ্ণিশাখার বজ্রনাভের বংশধরেরাই মথুরা প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সে সকল কথা প্রবন্ধান্তরে বলিব।

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত।

দুঃস্থা জননী

(গ্রীষ্মে)

তুমি কি আমার অন্নপূর্ণা শ্যামলা মাতৃভূমি ?
কোথা মাগো তব শ্যাম সম্পদ, কি রূপ ধরেছ তুমি ?
ধূ ধূ করে মাঠ মরুভূর প্রায় মরীচিকা নাচে খালি,
হুহু করে' বয় তপ্ত সমীর উড়াইয়া ধূলি বালি।
পথের দুপাশে দূর্ব্বাটি নাই, গোষ্ঠ শস্পহীন,
কাসারে নাহিক পদ্ম কুমুদ, তড়াগে নাহিক মীন।
মহিষ গিলিছে কর্দ্দম জল, মেষ চাটিতেছে পাঁক,
অশথের তলে গাভীগুলি শুয়ে শুনিছে মরণ ডাক।
নালার কাদায় শূকর লুটায়, কাক নির্ব্বাক্ চালে,
তৃষ্ণা-আতুর বিড়াল কুকুর ধুঁকিতেছে ঢেঁকিশালে।
চারা গাছ যত মুড়ায়ে খেয়েছে ক্ষুধিত ছাগলগুলি,
উপাড়ি খেয়েছে গলঘেমে গুলো মুথা-মূল সহ তুলি।
রয় না তিলেক পাতাটি খসিয়া পড়িলে বটের তলে,
ধুঁকিতেছে তরু নয়ন মুদিয়া লতার রজ্জু গলে।
ঝলসিয়া পড়ে তুলসীকুঞ্জ, ধুতুরাও মূরছায়,
শুষ্ক লতায় শূন্য মাচান খাঁ খাঁ করে আঙিনায়।
শুকানো পুকুরে মাছরাঙা ডাকে, ঘুঘু ডাকে ভাঙা ছাদে,
খাঁচায় খাঁচায় ময়না কুকারে, আকাশে চাতক কাঁদে।
কাঠঠোক্‌রারে বকিয়া উঠিছে থেকে থেকে টাকসোনা,
ফুটো চালে করে আহারের লোভে গিরগিটি আনাগোনা,
প্রাণহীন হয়ে পক্ষিশাবক তরুমূলে গড়াগড়ি,
অহি-নকুলের কলহ বেধেছে মৃত-দেহটির 'পরি।
কাৎরাণি উঠে তাল্-বাগ্‌ড়ায় ঝন্‌ঝন্ শন্‌শনে,
নারিকেল-গুটি বোঁটা হতে টুটি' খসে' পড়ে খনে খনে।
বাসা বাঁধিবারে পায় না কপোত তৃণ খড় একগাছি,
নাহি প্রজাপতি মৌমাছি অলি, নাহি ভনভনে মাছি।
নীরস মাটীতে ফাটল ধরেছে পথে পথে ঘাটে মাঠে,
সন্তান লাগি' তোমার জননি, আজি কি হৃদয় ফাটে ?
রোগীর শিয়রে বসে আছ, মুখে নাহি সান্ত্বনা ভাষা,
পুত্রেরা তব কৌপীনধারী, কন্যারা চীর-বাসা !
ক্ষুধিতের মুখে আজিকে অন্ন পারনিক যোগাইতে,
শুষ্ককণ্ঠে সলিল বিন্দু—তাও পারনাক দিতে।
তাই কি মা তুমি যোগিনী সেজেছ শ্মশান করি এদেশ
শ্যামল বসন ছাড়িয়া এবার পরেছ গেরুয়াবেশ ?
কণ্ঠে পরেছ রুক্ষ কঠোর রুদ্রাক্ষের মালা,
নয়নে তোমার ক্ষরিছে রুদ্র ঝলকে ঝলকে জ্বালা !
তোমার শীর্ণ অঙ্গ আজিকে চিতার ভস্ম মাখা,
ললাটে লোহিত চন্দনে হেরি ললাটিকা আজ আঁকা,
চাঁচর চিকুর হয়েছে আজিকে কপিশ পিঙ্গ জটা,
তব নির্ম্মম ত্রিশূল জ্বলিছে বিথারি বহ্নি ছটা।
কালো ঢালা কৃশ সন্তানগুলি অস্থিচর্ম্মসার,
প্রেতরূপে আজ অট্টহাস্যে ঘেরিয়াছে চারিধার !
তুমি কি মা সেই অন্নপূর্ণা শ্যামলা মাতৃভূমি ?
তোমাকে আজি ত চিনিতে পারি না; কি বেশ ধরেছ তুমি?
বিশ্বে অন্ন বণ্টন করি নিঃস্ব হয়েছ বলে
তেয়াগিয়া মণি হিরণ ভূষা কি শ্মশানবাসিনী [illegible]লে ?

শ্রীকালিদাস রায়।

সেকালের পল্লীচিত্র

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

পূজার বলিদানের সময় দুই তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রাম সকল হইতে বিস্তর লোক বলিদান দেখিতে আসিত। বাড়ীর ও গ্রামের লোকের ভারি আমোদ, তাঁহারাও যে যেখানে থাকিতেন বলিদানের বাজনা বাজিলেই সকলে আসিয়া হাজির হইতেন। উঠানে লোক ধরিত না; গলি, ঘুঁচি ছাদের উপর লোক ভরিয়া যাইত। গ্রামের ঘোষ ও মিত্র মহাশয়দের বাড়ীতেই বলিদানের জাঁকজমকটা বেশী হইত। আখ, কুমড়া, ছাগল, ভেড়া, মহিষ পর্য্যন্ত বলি হইত। এবং সংখ্যায় তাহা এত বেশী হইত যে শেষে বড়ই বীভৎস হইয়া পড়িত; পশুর রক্তে উঠান দালান ভাসিয়া যাইত।

তাহার পরে আরতি। এই আরতি অপেক্ষা, সন্ধ্যার পরে যে আরতি হইত তাহা আরও সুমধুর ও মনোহর। উপরে শরতের চাঁদ, নির্ম্মল হাস্যময় আকাশ, নীচে ধূপ ও ধূনার গন্ধময় ধূমাকীর্ণ দালানে কুলবধূ ও প্রাচীনাগণ গললগ্নীকৃতবাস করযোড়ে মার মুখ চাহিয়া মার আরতি করিতেছেন; চারিদিকে শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর ঢাক ঢোল প্রভৃতির বাদ্যধ্বনি বড়ই ভাল লাগিত।

এইরূপে ছেলে মেয়েরা সকলে পূজার তিন দিন বড়ই আনন্দ উপভোগ করিত। গ্রামে যে যে বাড়ীতে পূজা হইত তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ মহাশয়দের বাড়ীতে অন্নক্ষেত্র—দিবারাত্রি দীয়তাং ভুজ্যতাং চলিত। কায়স্থেরা লুচি চিনি ও নানাবিধ মিষ্টান্ন করিয়া গ্রামের সকলকে খাওয়াইতেন। ইতর শ্রেণীর লোকদিগকে ফলাহার, কেহ বা তৎসঙ্গে ২।৪ খানা লুচিও দিতেন। বলাবাহুল্য এই নিমন্ত্রণ ব্যাপার সকলের মধ্যে, বিশেষতঃ ছেলে মহলে পূজার আনন্দ বর্দ্ধন করিত।

তাহার পরে প্রতিমা বিসর্জ্জন। পূজা ফুরাইয়াছে, সকলেই নিরানন্দ। গ্রামের উত্তরভাগে সিংহ মহাশয়দের এক বড় পুকুর আছে, সেইখানেই বরাবর প্রতিমা বিসর্জ্জন হইত। বৈকাল হইতে বালকেরা কাপড় চোপড় পরিয়া সাজিতে আরম্ভ করিত; কেহ বা প্রতিমার সঙ্গে দলের সহিত যাইত; কেহ বা আগেই বড় পুকুরের ঘাটে বা পাড়ে গিয়া বসিয়া থাকিত। প্রতিমা জলে ফেলিবার পূর্ব্বেই প্রতিমার গায়ের রাংতা মুকুট, আঁচলা প্রভৃতি সংগ্রহে বালকদের বড়ই আনন্দ ও উৎসাহ হইত। তথায় বিস্তর লোকসমাগম হইত।

তাহার পরে বিজয়া দশমীর প্রণাম ও কোলাকুলি। ইহাতে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও সুখ ছিল। ইহা যে বালকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে। সকল বয়সের সকল শ্রেণীর নরনারীর মধ্যে ইহা পরিব্যাপ্ত ছিল। প্রতিমা বিসর্জ্জনের ঘাট হইতেই উহা আরম্ভ হইত। ফিরিয়া আসিতে আসিতে যে যাহাকে দেখিতে পাইত, প্রণাম ও কোলাকুলি করিত। ভদ্রাভদ্রের ইতর বিশেষ ছিল না। কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, ময়রা, মুদিকেও প্রণাম করিত। কায়স্থের কাছে, এমন কি ব্রাহ্মণের কাছেও উহারা যে কেহ দাদা, দিদি, খুড়া জ্যাঠা বলিয়া সম্বোধন পাইত।

তখন প্রকৃতই মা আসিতেন। মা আমার বিশ্বপ্রসবিনী অনন্তসুন্দরী আনন্দময়ী ও অনন্তলীলাময়ী। পুষ্পসাজ-সজ্জিতা, শুভ্র বস্ত্র পরিহিতা আমাদের জন্মভূমি, হীরক খচিত কেশজাল আলুলায়িত করিয়া, হাসিমুখে যুক্তকরে মায়ের শ্রীচরণে জবা, পদ্ম, কহ্লার প্রভৃতি পুষ্প অজস্র ঢালিতেছেন। চারিদিকে হাসি ও আনন্দ; প্রত্যেক নরনারীর মুখে হাসি ও হৃদয়ে আনন্দ। সকলের চক্ষে চারিদিক সুন্দর। মা আমার ব্যষ্টিভাবে সকলের ভিতর দিয়া আসিতেন, আবার সমষ্টিভাবে মৃণ্ময়ী প্রতিমার অধিষ্ঠাত্রী হইতেন।

এইরূপে কালীপূজা প্রভৃতিতেও বালকেরা বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিত। কালীপূজার রাত্রিতে সকল পূজাবাড়ীতেই সকলের নিমন্ত্রণ হইত। সকলেই বিশেষ যত্নের সহিত লুচি, চিনি মাংস ও নানাবিধ মিষ্টান্ন সকলকে খাওয়াইতেন। ইতর শ্রেণীর লোকেরা কলায় ও তৎসঙ্গে গৃহস্থের অবস্থানুসারে লুচি পাইত।

কিছুদিন পূর্ব্বে "নায়কে" "পূজার পূর্ব্বক্রম" ও "পূজার ব্যসন" শীর্ষক দুইটি অতি সুন্দর সন্দর্ভ বাহির হইয়াছিল। আমি এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"সমাজের রুচি-প্রবৃত্তির ছায়া আমাদের দুর্গোৎসবে যুগে যুগে পতিত হইয়া আসিতেছে। ইংরেজের গোড়ার আমলে দুর্গোৎসব প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের পক্ষে নিত্যকর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত, উহা না করিলে পাপ, করিলে বিশেষ পুণ্য নাই, কর্ত্তব্য কর্ম্মের হিসাবে করিতেই হইত। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ এই তিন জাতির মধ্যে উহা অতিপ্রচলিত ছিল। অন্য জাতির মধ্যে দুর্গোৎসব অপ্রচলিত ছিল না, এখনকার তুলনায় খুবই প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক গ্রামে অন্ততঃ একটা চণ্ডাল গৃহস্থের ঘরে বিল্ববরণ এবং বোধন করিতে হইত।

"এখনকার মত বাঙ্গালী নরনারী পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এত সেলাই করা জামা জোড়া পরিতেনই না। ব্রাহ্মণগৃহে ব্রাহ্মণী সকল ত সেলাই করা ছেঁড়া এক খানা কাপড়ও পরিতেন না—সিমিজ সেনুকা ছায়া বডিস ব্লাউস ত দূরের কথা—কারণ ব্রাহ্মণ কন্যা এবং মহিলাদিগকে নিয়মিত নিত্য রন্ধন করিতে হইত, পূজার কয়দিন ত পাকশালার বাহিরে আসিবার অবসরই তাঁহাদের প্রায় মিলিত না। সেলাই করা জামা বা অঙ্গরক্ষা পরিয়া রন্ধন করিলে তাহা দেবীর ভোগে দেওয়া চলিত না; যাহা মায়ের ভোগে চড়িত না তাহা ব্রাহ্মণ সজ্জনে খাইতেন না। অতএব ব্রাহ্মণ কন্যাদিগের সেলাই করা জামা পরিবার সময় হইত না; জামা জোড়া অপেক্ষা রন্ধন কার্য্যটাকে তাঁহারা শ্লাঘ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। সে কালে সকল গৃহস্থের মহিলাই রন্ধন করিতেন; মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পত্নী, মহারাজ রাজবল্লভের পত্নী নিত্য নিয়মিত রন্ধন করিতেন। নাটোর, পুটিয়া প্রভৃতির রাজবাড়ীতে মহারাণীদের রন্ধন করা পঞ্চাশ ব্যঞ্জন সমেত খিচুড়ি ও শাদা ভোগ জগদম্বাকে নিবেদন করিয়া দিতে হইত। এই উদ্দেশ্যে—ভোগ রন্ধন করিতে অবাধে পাইবেন বলিয়া—প্রত্যেক ব্রাহ্মণকন্যা ষোড়শ বর্ষ উত্তীর্ণ হইতে না হইতে দীক্ষিতা হইতেন। বাঙ্গালার বড় বড় ব্রাহ্মণ পরিবারে এখনও সে ধারার কতকটা বজায় আছে। বাটিতে পূজা হইলে এখনও ব্রাহ্মণ কুলমহিলাদের দর্ব্বী হস্তে পাকশালায় প্রবেশ করিতে হয়। নাটোরে ও কৃষ্ণনগরে এখনও রাজপুরমহিলা সকল রন্ধন করিতে ভুলেন নাই। আধুনিক বাবু জাতীয় বড়লোকের মধ্যে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী লেডী যোকাঞ্জী রন্ধনকার্য্যে পটীয়সী, আচার নিষ্ঠাপরায়ণা এবং বাটীতে দুর্গোৎসব হইলে ভোগ রন্ধনে অগ্রগামিনী। স্যর গুরুদাসের গৃহে এখনও সেকালের ছাঁচ বজায় আছে। স্যর নলিনীরঞ্জন হাইকোর্টের জজ হইলেও ব্রাহ্মণ আচার-পদ্ধতি সম্পন্ন। উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহনের পত্নী বেশ রন্ধন কারতেন এবং পূজা পার্ব্বণে পাকশালায় প্রবেশ করিতেন। সোজা কথা এই, দুর্গোৎসব সম্বন্ধে এখনও পুরাতন ধারার অনেকটা বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ গৃহস্থলীতে বজায় আছে।

"পূজার সময়ে আর একটা মজার ব্যাপার ছিল—পরিবেষণ। গলায় পৈতা থাকিলেই যে-সে ব্রাহ্মণ বিধায় থালা ধরিয়া পরিবেষণ করিতে পারিত না। সুপরিচিত কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান না হইলে থালা ধরিয়া পরিবেষণ করিতে কেহ পারিত না। সাবর্ণ চৌধুরীদের বাটীতে দুর্গোৎসব বা অন্য ক্রিয়া কর্ম্ম হইলে কুলীন দৌহিত্র সন্তানগণ থালা না ধরিলে নির্ব্বিবাদে ব্রাহ্মণ পংক্তি ভোজনে বসিতেন না। কেবল এইটুকুই নহে, ব্রাহ্মণগণ ভোজন উদ্দেশ্যে সমবেত হইলে প্রথমেই

জিজ্ঞাসা করিতেন পাকশালায় কাহারা প্রবেশ করিয়াছিল। কুলীন ব্রাহ্মণ মহিলা দীক্ষিতা এবং সধবা না হইলে দুর্গোৎসবের ভোগ রন্ধনে অন্য কোন ব্রাহ্মণীর অধিকার ছিল না। তাহার পর ভোজন; মায়ের ভোগ ফেলিয়া রাখিতে নাই, যাহা পাতে দিবে তাহাই খাইতে হইবে; তাই ভোগ পরিবেষণে বড়ই হিসাব করিয়া চলিতে হইত।

"কাঙ্গালী ভোজন না করাইতে পারিলে দুর্গোৎসবের অঙ্গহানি ঘটিত। ব্রাহ্মণের গৃহে দুর্গোৎসব হইলে সকল জাতিই আসিয়া অবাধে ভোগপ্রসাদ পাইত। ব্রাহ্মণের বাটীর পূজায় ভাতের খরচ অতিমাত্রায় অধিক হইত। এখনও উত্তরপাড়ায় রাজা প্যারীমোহনের বাটীতে পূজার তিনদিন প্রায় পঁচিশ মণ চাউল সিদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণ গৃহে দুর্গোৎসব হইলে ব্রাহ্মণেতর অন্য জাতীয় কেহই নিমন্ত্রণের অপেক্ষা করিতেন না, নিমন্ত্রণ হউক আর নাই হউক ব্রাহ্মণ প্রাঙ্গণে যাইয়া দাঁড়াইলে খাইতে দিতেই হইবে। কেবল উপস্থিত ব্যক্তিগণকে ভোজন করান নহে, তাহারা আবার মহাপ্রসাদের ছাঁদা লইয়া যাইত,—যে যত চাহিত তাহাকে তাহাই দিতে হইত। তখন এত অধিক সংখ্যায় পূজা হইত যে, প্রত্যেক ব্রাহ্মণ গৃহস্থের পূজাবাটীতে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ পাওয়া কঠিন হইত, শতাষ্টক কাঙ্গালীও জুটিত না। দুর্গোৎসব প্রধানতঃ পান ভোজনের উৎসব ছিল, কেবল দীয়তাং ভুজ্যতাং রবে গগন পবন তিন দিন মুখর হইয়া থাকিত। ব্রাহ্মণেতর জাতি সকলের মধ্যে এই ধারণা ছিল যে, পূজার তিন দিন ব্রাহ্মণ বাটীর ভোগ প্রসাদ পাইতেই হইবে।

"আমাদেরই শৈশবে পূজার সময় একখানা নীল বুলু দেওয়া কাপড় এবং শান্তিপুরে জরী পাড়ের একখানা চাদর পাইলে আমরা আনন্দে আটখানা হইতাম। সাত আট বৎসর বয়স হইলে বেনারসী কিংখাবের জামা, পায়জামা, জরীর টুপী ও জুতা আমরা পূজার সময়ে পাইয়াছিলাম। তখনকার জরী বিদেশের জাল মাল ছিল না, সে সকল জরীর পোষাক খারাপ হইলে, তাহা গলাইয়া দুইচারি ভরি চাঁদী পাওয়া যাইত। আমরা জরীর পোষাক পাইতাম বাপ খুড়াদের সোহাগে, তাঁহারা উপার্জ্জনশীল ছিলেন, সন্তানদিগকে মনের সাধে সাজাইতেন; পরন্তু গত ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সর্ব্বত্র ঐ নীল বুলু দেওয়া ধুতি ও চাদরই পুরুষদের পূজার সাজ ছিল; বাপ খুড়া জ্যাঠাদের বুড়া বয়স পর্য্যন্ত নীল বুলু দেওয়া দেশী বস্ত্র পূজার ষষ্ঠীর দিন পরিতে দেখিয়াছি; কারণ পিতামহী সেকেলে বুড়ী, তিনি তাঁহার কালের রুচি অনুসারে তাঁহার পুত্রদিগকে সাজাইতেন। মহিলাদের পূজার শাটী তিন রকমের ছিল; বেনারসী; বালুচরী চেলী এবং ঢাকাই গুল দেওয়া জামদানী অথবা শান্তিপুরের কল্কে শাটী। জ্যেষ্ঠমাতা, মাতা, খুল্লমাতা এমনই একখানা করিয়া শাটী পাইতেন বটে, পরন্তু পূজার তিন দিন উহা তোলা থাকিত, পরিবার অবসর ছিল না। এ তিন দিন মা, খুড়িমার মুখ দেখিতেই পাইতাম না, তাঁহারা পাকশালায় পাচটা জ্বলন্ত উনানের সম্মুখে বসিয়া উদয়াস্ত রন্ধন করিতেন। কেবল ষষ্ঠীর দিন ও বিজয়ার দিন আগমনী ও বিদায়ী বরণের সময়ে মাতৃসকল সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা হইয়া বেনারসী চেলী পরিয়া চণ্ডীমণ্ডপে আসিতেন। সে বরণের স্মৃতি এখনও মনে জাগিয়া আছে, সে বিজয়া বরণের রোদন এখনও মনে হইলে চোখ ফাটিয়া জল পড়ে। আসল কথা এই, এখন পূজার সাজ পোষাকে, কাপড় চোপড়ে যত খরচ হয়, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তত ব্যয় হইতই না। তেমন আঁচলা দেওয়া বালুচরে চেলী ত এখন দেখিতেই পাই না, তেমন বানারসী ট্যাড়চা শাটী আর ত মিলে না। সে সব বস্ত্র এক একখানা করিয়া থাকিলে এক শতাব্দী কাটিয়া যায়। কাপড়ের ব্যয় ছিল না আর এক কারণে; তখন মেয়েদের মধ্যে সিমিজ সেলুকা বডিস জ্যাকেট প্রভৃতির রেওয়াজ হয় নাই। ব্রাহ্মণগৃহের মেয়েরা ত সেলাই করা জামা পরিতেই চাহিত না। রন্ধন পরিবেষণ পূজা জপ প্রভৃতি সমাপন করিয়া বিবি সাজিবার অবসর তাঁহাদের থাকিত না।

স্বামী ইংরাজীনবীশ নবীন বাবু সাজিয়া তাহার পত্নীকে বিবি সাজাইবার চেষ্টা করিলে ব্যর্থ হইত। তবে এখন অপেক্ষা তখন গরদ তসর বেনারসী কাপড়ের প্রচলন অধিকতর ছিল।”

পূজার খোরাক।

“এইবার পূজার খানাপিনার পরিচয় দিব। প্রথম জলপান, তাহাতে চিড়ে মুড়কী, টানা মিঠাই, রসকরা ও লাড়ুর অধিক কিছু থাকিত না। পরন্তু এই জলপান সকলকেই দিতে হইত; ব্রাহ্মণ গৃহে আহার্য্য সম্বন্ধে ‘না’ বলিবার অধিকার কাহারও ছিল না। আমরা ছেলে ছোকরার দল এই জলপান বিতরণে, পুরোহিতের ঘণ্টা ধ্বনি শুনিলেই ছুটিয়া গিয়া কাঁসর ঘণ্টা বাজাইতে সারাদিন ব্যস্ত থাকিতাম। মুড়কী, টানা মিঠাই, রসকরা এবং আনন্দলাড়ু বাড়িতে ভিয়ান করিয়া তৈয়ার হইত। পূজার সময়ে কোন আচমনীয় খাদ্য সামগ্রী বাজার হইতে খরিদ হইত না। যাহা জলে সিদ্ধ বা ভর্জ্জিত, যাহা খাইলে হাত মুখ ধুইতে হয়, তাহাকেই আচমনীয় খাদ্য সামগ্রী বলা হয়। এক কাঁচা গোল্লা, বা চিনিতে ছানাতে মিশান দেদো মণ্ডা ছাড়া আর সকল খাদ্য সামগ্রীই আচমনীয়। সে টানা মিঠাই আর ত দেখিতে পাই না, ব্যাশমে তৈয়ারী গুড়ের রসে টানা মিঠাই কতই মিষ্ট লাগিত! এখন জনাই ছাড়া আর ত কোথাও ভাল রসকরা হয় না। তখন প্রত্যেক ব্রাহ্মণ গৃহে তোফা সুস্বাদু রসকরা হইত। নারিকেলকোরা ছানা এবং চিনির রস এই তিনের সমবায়ে রসকরা হইত। মায়ের ভোগের খাদ্য ছিল—কড়াইয়ের দালের খিচুড়ি, মুগের দালের খিচুড়ি, আতপ তণ্ডুলের ভাত, নানাবিধ ভাজা, শাক, শুক্ত, দালনা, মাছের তরকারী এবং টক। পূজার ভোগে মাছের তরকারী ঘৃত বর্জ্জিত করিয়া রন্ধন করিতে হইত। মাছের সহিত ঘি মিশাইত না, মিশাইলে বিষম খাদ্য হয়; বিষম খাদ্য ব্রাহ্মণের খাইতে নাই। তাহার পর পাঁঠা—নিরামিষ পাঁঠার মাংসের ঝোল, অর্থাৎ লশুন, পেয়াজ, হিঙ্গ বর্জ্জিত—কেবল আদ্রক সাহায্যে পাক করা পাঁঠার মাংস। এখনও কালীঘাটে এই পদ্ধতিক্রমে ছাগলের মাংসের ঝোল নিত্য মা কালীকে ভোগ দেওয়া হয়। ইহা অতি সুখাদ্য এবং উপাদেয়। এই অন্ন ব্যঞ্জনের পরে দধি, বোঁদে, মুণ্ডী ও গোল্লা মিষ্টান্ন বরাদ্দ ছিল। ব্রাহ্মণ গৃহে একটা পায়সান্ন হইত। এই প্রসাদ বিতরণ ও ব্রাহ্মণ ভোজন বেলা বারোটা হইতে রাত্রি বারোটা একটা পর্য্যন্ত চলিত। যে পাতা হাতে করিয়া, আসিয়া দাঁড়াইবে তাহাকেই খাইতে দিতে হইবে। ব্রাহ্মণ গৃহের পূজায় তিন দিন নাচ গান যাত্রা হইত না। বিজয়ার পরে ছেলেদের তুষ্টির জন্য, বিশেষতঃ কোজাগরের রাত্রিতে নাচগান হইত। ব্রাহ্মণ, অতিথি, অভ্যাগত ও কাঙ্গালী ভোজনে রাত্রিদিন কাটিয়া যাইত।”

পূজার আমোদ-প্রমোদ।

“একটা কথা বলিয়া রাখি, পূজার বাদ্যভাণ্ডে বাঁশী চলিত না, ঢাক, ঢোল, কাড়া-নাগারা, তুরী, ভেরী সবই ব্যবহৃত হইত, পরন্তু বংশধ্বনি দুর্গোৎসবে নিষিদ্ধ ছিল। দুর্গোৎসব সাময়িক উৎসব, মহাঘোরা মহাভীমা সিংহবাহিনীর পূজা, উহাতে মধুর রসের—আদি রসের কোন উপাদান ব্যবহৃত হইবার নহে। নর্ত্তকীর নৃত্য, গান, হাবভাব, কালীয়দমনের যাত্রার মান মাথুরের পালা, গোষ্ঠবিহার প্রভৃতির অভিনয় দুর্গোৎসবে হইত না। কলিকাতার কায়স্থ বাবুর দল প্রথমে এই বিধির ব্যত্যয় ঘটান। মহারাজ স্যর যতীন্দ্রমোহন যতদিন জীবিত ছিলেন, তিনি তিন দিন রাজনারায়ণের চণ্ডীর গানই দিতেন, অন্য নাচগান পূজার প্রাঙ্গণে হইত না। শোভাবাজার রাজবাটীতেই সর্ব্বাগ্রে নাচগানের প্রচলন হয়। পূজার আমোদ ছিল বলিদানের সময়ে, বিশেষতঃ নবমীর বলিদানের সময়ে কাদামাটি মাখিয়া, কর্ত্তারা ঢোল কাঁধে করিয়া কবির হিসাবে গান করিতেন। সে গালাগালি ব্যঙ্গ রঙ্গরস এখন লোপ পাইয়াছে। মাইকেল মধুসূদনকে

আমরা এই নবমীর উৎসবে যোগ দিতে শুনিয়াছি। রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নাটুকে রামনারায়ণ, প্যারী মুখুয্যা প্রভৃতি নবমীর গান বাঁধিতেন। হালিসহরে একবার বঙ্কিমচন্দ্রকে লইয়া নবমীর দিন নাস্তানাবুদ করিয়াছিল, তখন হালিসহর পত্রিকার দল খুব প্রবল ছিল; বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয় পক্ষে হালিসহরের জামাতা ছিলেন।

"হায় পূজা! সে আমোদ নাই, সে উৎসব নাই, সে উল্লাস নাই। থাকিবে কোথা হইতে? সে অন্নে তুষ্টি ও তৃপ্তি নাই, জাতির আপামর সাধারণের প্রতি সে প্রগাঢ় মমত্ব বুদ্ধি নাই, সে স্বাধীন জীবন নাই। আমরা বাঙ্গালীর দুর্গোৎসবের শেষটা একটু দেখিয়াছি, বাঙ্গালী চাকুরিজীবি হইবার গোড়ার অবস্থা দেখিয়াছি, তাই সুখস্বপ্নের মত এখনও পূজার স্বপ্ন মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। শরতের দুর্গা, শরতের চন্দ্র দেখিলেই মনে পড়ে এমনই দিনে বাঙ্গলার মৃন্ময়ী রূপশালিনী মা —আমাদের বাঙ্গালার মাটিতে বাঙ্গালীর মা—টি হইয়া কত শোভায় বিরাজ করিতেন। সে সুখের স্মৃতি আছে বলিয়াই এখনও বাঁচিয়া আছি; যেদিন সে স্মৃতির দীপ নির্ব্বাণ হইবে, সেই দিন চলিয়া যাইব। জয় মা!"

শীতকালে খেজুর রস পানে বালকদের বড়ই ধুম পড়িত। তখন বড়ই শীত পড়িত। রাত্রে গরম জলে আমাদিগকে আচমন করিতে হইত। এত শীতেও আমরা খুব ভোরেই উঠিয়া সমবয়স্কদের বাড়ীতে যাইতাম বা তাহারা আমাদের বাড়ীতে আসিত। আমরা এক দলে রাস্তায় বেড়াইতে, পকেটে কাঁচের গেলাস লইয়া বাহির হইতাম। আমাদের চেয়ে যাঁহারা বয়সে বড়, তাঁহারাও প্রত্যুষে দল বাঁধিয়া বেড়াইবার জন্য বাহির হইতেন। আমরা নানাস্থানে ঘুরিয়া একটা "বাইনে" (যেখানে হাঁড়ি করিয়া খেজুর রস জাল দেওয়া হয়) দলবলে গিয়া উপস্থিত হইতাম। যাহার বাইন সে আদর করিয়া আমাদিগকে এক নাগরী জিরান কাটের রস পান করিতে দিত। প্রয়োজন হইলে আরও বেশী দিত। আমরা যে যেমন পারিতাম পকেটস্থ কাঁচের গেলাসে করিয়া তাহা পান করিয়া, বাড়ী গিয়া মা, খুড়ি, জেঠাই ছাদের উপরে যেখানে বসিয়া নানাপ্রকার বড়ি দিতেন, সেখানে গিয়া রোদ পোহাইতাম। এক দিন একটা বাইনে আমাদের যথোপযুক্ত ভাল রস দেয় নাই; আমরা চাহিলাম, তবু দিল না। বাড়ী আসিলাম এবং সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিলাম যে বেটাকে জব্দ করিতে হইবে। রাত্রি আটটার সময় জ্যোস্না ফুটিয়াছে, সকলে মিলিয়া কেহ পাকাটি, কেহবা পেঁপের পাতার নল হাতে করিয়া, যে অঞ্চলে তাহার খেজুরগাছ সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সকলেই গাছে উঠিয়া নল দ্বারা রস খাইলাম। সন্ধ্যার রস, বিশেষতঃ জিরানকাটের রস বড়ই মধুর; আমরা ঐরূপ করাতে গাছের নাগরী ও কাঠি নড়িয়া যাইত বলিয়া আর রস ভাল পড়িত না। যাহার গাছ সে উহা নিবারণের জন্য নাগরীতে তেকাটা সিজের গাছ ঢুকাইতে লাগিল। আমাদের রস খাওয়া বন্ধ হইল। কাযেই আমাদের অন্য পরামর্শ করিতে হইল। পরামর্শ স্থির হইল যে সকলেই কোচড়ে ঢিল লইয়া নাগরী ভাঙ্গিতে যাইতে হইবে, নহিলে বেটা ত জব্দ হইতেছে না। আবার জ্যোস্না রাত্রে আমরা সকলে কোচরে ঢিল লইয়া সেই অঞ্চলে চলিলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক মধ্যে তাহার দুইশত নাগরী ছেঁদা করিয়া আসিলাম। সে তৎপরদিন মাথায় হাত দিয়া বসিল। এক ফোটা রসও নাই। সে অনুমান করিয়াছিল এসকল কাহাদের কায; তাই সেই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আমার পিতৃদেবের নিকট আসিয়া নালিস করিল। তখন আমার একজন জ্ঞাতি ভ্রাতা তথায় উপস্থিত ছিলেন; তাঁহার বাড়ী আমাদের বাড়ীর পাশে। আমার জ্ঞাতি ভ্রাতা গোপনে আমাকে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিলাম; তিনি হাসিতে লাগিলেন; যে নালিশ করিয়াছিল, উল্টে তাহাকে বিস্তর ধমক দিলেন। শেষে নিষ্পত্তি হইল যে সে প্রত্যহ প্রাতে একনাগরী জিরানকাটের রস এই বাড়ীতে আনিয়া হাজির করিবে; আর আমাদের হুকুম

হইল আমরা বাইনে গিয়া রস পান করিতে পাইব না। আমাদের আমোদ বন্ধ হইল। আমাদের ঐ আমোদ বন্ধ হইল দেখিয়া সেই বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা মহাশয় (যাঁহার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি) আমাদের প্রতি সদয় হইয়া বলিলেন—"তোরা আমার বাইনে যাস, যত পারিস রস খাবি।"

আমরা দ্বিগুণ আনন্দের সহিত তাঁহার বাইনে গিয়া রস পান করিয়া আসিতাম। তিনি বৃদ্ধ হইলেও আমাদিগকে রস খাওয়াইয়া আমাদের আনন্দে যোগ দিতেন। তাঁহার নিজের বিস্তৃত খেজুরবাগান ছিল; তিনি পূর্ব্বাঞ্চল হইতে সিউলী আনাইয়া গুড় তৈয়ার করাইয়া বিক্রয় করিতেন। উহা তাঁহার বেশ লাভজনক ব্যবসায় ছিল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

মাঝির ব্যথা

হয়নাক ঘুম রাত্রে আমার
ভাবছি নিরবধি।
কোথায় আমার না, কোথায় আমার নদী!
পড়ছে মনে রে সেই সে খেয়া ঘাট,
নিবিড় তরুতল মখমলেরি মাঠ,
দেশ ছেড়ে আজ বিদেশেতে
আনলে মোরে বিধি।

ছিলাম মাঝি, আজকে আমি
পাথর ভেঙ্গে যাই,
কোমলতার বার্ত্তা হেতা নাই।
জলের পাখী রে ডাঙ্গায় এসে আজ,
পেটভরে না যে চরতে লাগে লাজ,
পড়ছে মনে ছাতিম তলের
ঘাটটী একাযাই।

ঈশান কোণে মেঘ উঠেছে
ডাকছে অবিরত,
কোথায় আমার রে, সেই সে সাদা পাল,
নূতন জোড়া দাঁড়, শক্ত বাঁধা হাল,
নদীর ধারে ঘুরছে যে মন
পান'ভূতেরি মত।

পরদেশী ভাই, আমার গ্রামে
যাও যদি ত বলো
পাণকৌড়ি কাঠঠোকরা হলো।
ব্যাপার ছিল যার বাতাস জলের সাথ,
সইছে আজি সে পাষাণ রবির তাত।
টোপাপানা বালীর বেলায়
জল বিহনে মলো।

সচল সরল তরল মাঝে
ছিল আমার ঘর,
ভাগ্যে এল গরল অতঃপর।
কল্লোল নাই আর, নাইক সারী গান
হট্টগোলে ভাই গুমরে মরে প্রাণ
জলদেবতায় করলে ভেঙ্গে
চকমকি পাথর।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

প্রবাসীর পত্র

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

বুধবার ২০শে জুলাই।

আমাদের কমিটীর অনুসন্ধানের ফলে চারিদিকের নানা গলদ বাহির হইয়া পড়াতে "কর্ত্তাগণের" কেহ কেহ সে সমস্ত চাপিয়া দিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কাজ আদায়ের চেষ্টা করিবার উপক্রম করিতেছেন। এ কমিটির উপর আমার বিবেচনায় গুরুতর ভার অর্পিত হইয়াছে। অতএব চারিদিকে না দেখিয়া শুনিয়া সমস্ত অবস্থা আলোচনা না করিয়া এরূপ চোখ রাঙ্গাইয়া কাজ হাসিল করিয়া লইবার অবকাশ কাহাকেও দেওয়া হইবে না ইহা স্থির। এই কথা লইয়া কোন কোন "কর্ত্তা"র সহিত হাতাহাতির উপক্রম হওয়াতে বোধ হয় তাঁহারা উহা বুঝিতে পারিয়া সাবধান হইবার চেষ্টা করিতেছেন। এই সমস্ত কারণে আমার কাজ ও যন্ত্রণা ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইতেছে। কিন্তু ছাত্রগণের যাহাতে যথার্থ মঙ্গল হয়, তাহা যেমন করিয়া হউক করিতেই হইবে—এটা স্থির। তাহার জন্য বন্ধুবিচ্ছেদ অথবা অশান্তির সৃষ্টি হয় ত আমি নাচার।

প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ছাত্রবৎসল জেম্‌স্‌ সাহেব প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রবিদ্রোহ উপলক্ষে কর্ত্তৃপক্ষগণের বিরাগভাজন হইয়া কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার প্রতি যে রূঢ় ও অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে, আমি তাহার বরাবর বিরোধী। এই তেজস্বী আচার্য্যের অবকাশগ্রহণে ভারতের শিক্ষাবিভাগ বহু পরিমাণে বলহীন হইয়াছে। রয়েল ক্লাবে তাঁহার সঙ্গে আজ দেখা হইল। (এই ক্লাব এবং অ্যান্‌থেনিয়াম ক্লাব আমাকে "অনারারী মেম্বার" নির্ব্বাচিত করিয়া বিশেষ সম্মানিত ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন।) মিঃ জেম্‌স্‌ আমাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখেন এবং তাঁহার সহিত বরাবর আমার পত্রব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। তিনি সুরেশকেও অত্যন্ত সম্মান করিতেন। তাঁহার অকালে মৃত্যুতে কত শোক প্রকাশ করিলেন, বন্ধুভাবে কত সান্ত্বনার কথা আমায় বলিলেন। নানা পুরাতন কথার আলোচনা হইল। যাহাতে শিক্ষাজগতে গ্রীক ও ল্যাটিনের প্রভাব হ্রাস না হয়, তাহার জন্য যে চেষ্টা হইতেছে, জেমস্‌ তাহার বিশেষ পৃষ্ঠপোষক—সে সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থ যন্ত্রস্থ; শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এখানে আসিয়া কিছুদিন অধ্যাপনার কার্য্য করিয়াছিলেন। এখন কেবল অনুশীলন লইয়াই ব্যস্ত আছেন। ভারতের শিক্ষাবিস্তারের ভবিষ্যৎ ও ইউনিভারসিটী কোর প্রভৃতির ন্যায় সাধু অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা সম্বন্ধেও অনেক কথা হইল। ইনি একজন যথার্থ ভারত-হিতৈষী ছাত্রবন্ধু। ইঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় আনন্দে অনেক সময় কাটিল।

আজ লর্ড লিটনের ভগিনী এমিলী লিউটন্‌স্‌ তাঁহার বাড়ীতে মিসেস বেশান্তের বক্তৃতা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেখানে মিষ্টার মণ্টেগুর সঙ্গে দেখা হইল; তিনি স্বতন্ত্র দেখা করিবার জন্য বলিলেন। লর্ড হ্যালডেন প্রভৃতি গণ্যমান্য অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। ইংলণ্ডের গণ্যমান্য লোকদিগের মধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে অজ্ঞতা কুসংস্কার ও অন্যায় বিদ্বেষভাব আছে, তাহা দূর করিবার জন্য সম্প্রতি সহৃদয়া যথার্থ-ভারতহিতৈষিণী মহিলাগণ সময়ে সময়ে উদ্যোগ করিতেছেন। অদ্যকার আয়োজন এই শ্রেণীর। মিসেস বেশান্ত বিশদভাবে ভারতের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের কথা বুঝাইয়া দিলেন—নব শাসনপ্রণালীর সুফল কুফলের বিষয় নির্ভীক ভাবে আলোচনা করিলেন এবং সম্মুখে যে

বিপদ রহিয়াছে, তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। অভিজাতগণের মধ্যে এই শ্রেণীর আলোচনায় ভারতবর্ষের উপকারের সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয়।

সম্রাট বাহাদুর বৃহস্পতিবার বাকিংহাম প্যালেসে বাগানপার্টির নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সন্ধ্যার পর কার্লটন হোটেলে League of Nations সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আগামী বুধবার লণ্ডনের লর্ড মেয়র মহোদয় মধ্যাহ্ন ভোজের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সার ডেনিয়্যাল হ্যামিল্টন ও সার উইলিয়াম মেয়রও আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। Shakespeare Festival উপলক্ষে লর্ড লিটনের আগ্রহে শনিবারে Stratford on Avonএ যাইবার ব্যবস্থা আছে। মহারাজা কচ ও শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে লণ্ডন কর্পোরেশন Freedom of the City দিবেন। বুধবার সমারোহে এই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইবে, তাহার পর মধ্যাহ্ন ভোজ। ইহাতেও নিমন্ত্রণ হইয়াছে। কিন্তু একা মনুষ্য কতদিক সামলাইব বুঝিতে পারিতেছি না।

গরম কোন দিন কম, কোন দিন বেশী। গরম কাপড় ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত হইবার যো নাই। সময়ে সময়ে হঠাৎ একদিন এমনই ঠাণ্ডা আসিয়া পড়ে যে, অসাবধানে থাকিলেই অসুখে পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা।

ষ্ট্র্যাট্ ফোর্ড অন্ এভন্, ২৬শে জুলাই।

কবি হেমচন্দ্র গাহিয়াছেন "ভারতের কালিদাস জগতের তুমি"।

যদি কেবল "টেম্পেষ্ট" (Tempest) অনুবাদ করিয়াই হেমচন্দ্র নিরস্ত হইতেন, তাহা হইলেও "নলিনী বসন্ত" তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যে উচ্চস্থান দিত। সেই অনুবাদের ভূমিকা রূপে সেক্সপিয়রকে উপলক্ষ করিয়া কবি গাহিয়াছিলেন—

"ভারতের কালিদাস জগতের তুমি।"

যেখানে ইংরাজী ভাষা প্রচলিত, শুধু সেখানেই নয়—জগতের যেখানে সাহিত্যের আদর, সেই খানেই হেমচন্দ্রের এই মহান্ উক্তি রূপান্তরে প্রতিধ্বনিত। জর্ম্মাণদিগের মহাক্ষোভ যে, সেক্সপিয়র জর্ম্মাণ ছিলেন না। সেক্সপিয়র রসের পরম রসজ্ঞ, সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের পরম অনুরাগী জর্ম্মাণ জাতি মহাযুদ্ধের সময় মহাবর্ব্বরতার পরিচয় দিল কি করিয়া? জর্ম্মাণ প্রাসিয়ানের মিশ্র সমস্যা ত্রেতাযুগে রাবণ বিভীষণ কতক করিয়াছিলেন, এখনও ঘরে ঘরে বংশে বংশে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

সেক্সপিয়রের নাট্যাবলী বেকন রচিত ইত্যাদি সাহিত্যিক আজগুবী কথা এখন সাহিত্য জগৎ হইতে প্রায় লোপ পাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সেক্সপিয়রের হরিণ-চুরি প্রভৃতির উপকথা, কালিদাসের মহামূর্খতার কথার মত লোপ পাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত মূর্খের মূর্খতা খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু এখন লোকে সেক্সপিয়র পড়ে কম, বোঝে কম—চায় কম; দেশের চেয়ে বরং বিদেশে সেক্সপিয়রের আদর বেশী। কলিকাতায় সেক্সপিয়র অভিনয়ে ইংরাজ অপেক্ষা বাঙ্গালী দর্শক অধিক হয়। ইংরাজের অপেক্ষা জর্ম্মাণ, ডচ, ডেন, আমেরিকান সেক্সপিয়রের আদর অধিক করে। এইরূপ রবীন্দ্রনাথের কবি-কীর্ত্তি ইয়োরোপে—বিশেষতঃ জর্ম্মাণি ও ফ্রান্সে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে।

প্রকৃত সাহিত্যানুরাগী যথার্থ স্বদেশভক্ত কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ইংরাজ বিশেষ চেষ্টায় সেক্সপিয়রের জন্মস্থান ইত্যাদির জীর্ণসংস্কার করিয়া ও তাঁহার গ্রন্থের সুলভ সংস্করণ প্রচার করিয়া তাঁহার কীর্ত্তি জাগাইয়া: রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রতিবৎসর এই সময়ে প্রসিদ্ধ অভিনেতৃগণ ষ্ট্রাট্‌ফোর্ডে আসিয়া সেক্সপিয়রের নাটকাবলী অভিনয় করিয়া Shakespeare festival সম্পন্ন করে। মহোৎসব ফেলিবার নয়। আমাদের খেতুরী, কেঁদুলীর মহোৎসবের মত সেক্সপিয়র মহোৎসবের ধূমধাম অধিক না হউক, অনেক কাছাকাছি।

আমরাও কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাসের ভিটা এখন খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছি; কালিদাসও গোয়াড়ী

কৃষ্ণনগরের অধিবাসী ছিলেন কি না, তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। এ সমস্ত যে যুগলক্ষণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাঁহারা সেক্সপিয়রের কীর্ত্তি উজ্জ্বল রাখিবার জন্য চেষ্টিত, তাঁহাদের মধ্যে লর্ড লিটন অন্যতম। তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ও আগ্রহে এবারের এই মহোৎসবে যোগদান করা সম্ভব হইল। তিনি অনুগ্রহ করিয়া সমস্ত বন্দোবস্তই সুচারুরূপে করিয়া দিলেন।

শনিবার সকালের ট্রেণে লেমিংটন (যাহার Leafy Leamington অর্থাৎ পত্রপল্লবাবৃত লেমিংটন বলিয়া খ্যাতি) হইয়া ষ্ট্রাটফোর্ডে আসিয়া "সেক্সপিয়র হোটেলে" উঠিলাম। পরে নিকটস্থ সেক্সপিয়র মেমোরিয়াল থিয়েটারে "Midsummer Night's Dream" অভিনয় দেখিতে যাওয়া গেল। জেনারেল ম্যানেজার ব্রিজেস্ এডাম্‌স অভিনেতাদিগের কর্ত্তা—সুশিক্ষিত, ভদ্র ও বিনয়ী। লর্ড লিটনের পরিচিত অতিথি বলিয়া বিশেষ যত্ন সমাদর করিলেন; এক হোটেলে বাস উপলক্ষে যথেষ্ট রূপ দেখা সাক্ষাৎ হইবার অবকাশ প্রার্থনা করিলেন। সেক্সপিয়র অভিনয় সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বিস্তর হইল। তাঁহার বন্ধু মিষ্টার ও মিসেস ফ্লাউয়ার ও লর্ড স্যাণ্ডউইচের শাশুড়ী মিসেস লেগেটের সহিত পরিচয় হইল। তাঁহারা লর্ড লিটনের বন্ধু বলিয়া যথেষ্ট আপ্যায়ন করিলেন। ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড বাসের তিন দিন রাত্রির আহার, মধ্যাহ্ন ভোজন, চা পান প্রভৃতি ইঁহাদের আগ্রহাতিশয়ে ইঁহাদের কাহারও না কাহারও বাড়ীতেই সমাধা হইয়াছে। ইঁহাদেরই পরিচয়সূত্রে, সেক্সপিয়রের হরিণচুরির ভূমিকা যেখানে কল্পিত সেই সার টমাস লুসি ওরফে জষ্টিশ শ্যালোর বাড়ী Charlecoteএ যাওয়াও ঘটিল। সেখান হইতে আর্ল অব ওয়ারউইক (King Maker) এর দুর্গ ওয়ারউইক ক্যাসেলেও যাওয়া হইল। মিসেস মার্শ নামে আমেরিকান ধনকুবেরপত্নী ওয়ারউইক ক্যাসেল আট বৎসর ভাড়া লইয়া আছেন। মিসেস্ মার্শ ও তাঁহার ভগিনী লেডী ফেয়ারফক্স লুসী, মিসেস ফ্লাউয়ার ও মিসেস লেগেট বিশেষ সৌজন্য দেখাইলেন। তাঁহারা সকলেই সেক্সপিয়র-প্রেমিক; কবির কীর্ত্তি বজায় রাখিবার জন্য, জনসাধারণে প্রচার জন্য শুধু চেষ্টিত নয়, উন্মত্ত।

বহু সহস্র ক্রোশ দূর হইতে একজন "বর্ব্বর" বিদেশী তাঁহাদের বরেণ্য কবির স্মৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ সম্মান দেখাইতে ইচ্ছুক, ইহাতে এই সহৃদয় মহিলাগণের মনে কি ভাবের উদয় হইল এবং তাঁহারা কতদূর যত্ন করিলেন ও দীর্ঘকাল তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া সেক্সপিয়র আলোচনায় তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্য বারংবার কত অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তাহা বলিবার নয়।

ইঁহারা সকলেই ধনাঢ্য মহিলা—ইঁহাদের ঘরবাড়ীর ঐশ্বর্য্য অপরূপ। এত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহাদের এই আশ্চর্য্য সাহিত্যপ্রীতি বাস্তবিকই অপূর্ব্ব। এভন্ নদীর তীরে ফ্লাউয়ার পরিবারের প্রদত্ত জমিতে Shakespeare Memorial প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নদীর শোভা সুন্দর—মেমোরিয়ালে নদীর শোভা বাড়াইয়াছে, আবার নদীও মেমোরিয়ালের শোভা শতগুণ বাড়াইয়াছে।

ষ্ট্র্যাটফোর্ড বড় সহর নয়—সেক্সপিয়র-স্মৃতি-বিজড়িত সমস্ত বাড়ীই পূর্ব্বাপর যে ভাবে ছিল, সেই ভাবেই রক্ষিত হইয়াছে। যে বাড়ীতে তাঁহার জন্ম, যেখানে তিনি শেষ বয়সে বাস করিয়াছিলেন, যেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়, যে বিদ্যালয়ে তাঁহার বাল্যশিক্ষা হয়, যে গির্জ্জায় তিনি উপাসনা করিতেন, যে গির্জ্জায় তিনি তাঁহার পরিবারবর্গ সমাহিত—ক্রোশাধিক দূরে তাঁহার পত্নী অ্যান হাথওয়ে বিবাহের পূর্ব্বে যে কুটীরে বাস করিতেন, তাঁহার কন্যা সুজানা (মিসেস হল) যে বাড়ীতে বাস করিতেন, নাত জামাই ন্যাশ্ যে বাড়ীতে ছিলেন, তাহারই পাশে যে বাড়ীতে তাঁর বসা দাঁড়া হইত, সকল জায়গাই যত্ন ও মর্য্যাদার সহিত সংরক্ষিত। সমস্ত পুরাতন ঠাট বজায় আছে—আধুনিক ভাব কোথাও আসিতে দেওয়া হয় নাই। তাহাতেই স্থানের শোভা ও মাহাত্ম্য বাড়িয়াছে।

অধুনা (মিসেস হলের) বাড়ী "Crofts Hall" মিসেস লেগেট কিনিয়া লইয়া রক্ষা করিতেছেন ও তথায় বাস করিতেছেন। সেক্সপিয়রের থিয়েটার সংলগ্ন সুন্দর যে উদ্যান ছিল, তাহাও ঠিক পুরাতন ভাবে সযত্নে সংরক্ষিত। অধিকাংশ স্থানেই তাঁহার স্মৃতির সহিত বিজড়িত ও তৎসাময়িক বহু দ্রব্যও যত্নের সহিত রক্ষিত হইতেছে। যে তুঁত (Mulberry) গাছের তলায় সেক্সপিয়র বসিতেন, তাহার জীবিত ভগ্নাবশেষ ইস্পাতের বেড়া দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আমরা পুরীর সিদ্ধবকুলের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অক্ষম। দিগ্‌ দিগন্তর হইতে তীর্থযাত্রী দলে দলে আসিয়া প্রতিবৎসর মহাকবির স্মৃতির পূজা করে এবং মহোৎসব উপলক্ষে আনন্দ করে।

ইংলণ্ডের এই অংশের নামই হইয়া গিয়াছে Shakespear Country; যাহা দেখিলাম, তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা সম্ভব নয়—দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ভাবে বিভোর হইয়া যাইতে হইল। দেশ কাল পাত্র সব ভুলিয়া গিয়া "Sweetesh Shakespear fancy's Child"-Miltonএর এই মধুর মহাবাক্য কর্ণে প্রতিক্ষণ ধ্বনিত হইতে লাগিল। মিল্টন, নিউটন, স্কট যে সকল স্থান ধন্য করিয়া তাঁহাদের স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন, কেম্ব্রিজ এডিনবার্গ প্রভৃতি স্থানে তাহার কিছু কিছু দেখিয়াছি; কিন্তু এমন মোহ ত কোথাও আচ্ছন্ন করে নাই। জীবন্ত সেক্সপিয়র রস যেন ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে—যেন তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য সমস্ত সহরটা তাঁহার সময়ে যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটি থাকিবার অটুট আনন্দ পাইতেছে। মিসেস. লেগেটের বাড়ী পূর্ব্বে যাঁহাদের অধিকারে ছিল, তাঁহারা বাড়ীর যে সকল পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন মিসেস লেগেট্ তাহা দূর করিয়া বহু অর্থব্যয়ে পুরাতন ছাঁচ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সংস্কার করিয়াছেন।

শনিবার বৈকালে Midsummer Night's Dream, রাত্রে Macbeth, সোমবারে Antony and Cleopatra অভিনয় দেখা হইল।

অভিনয় খুব উচ্চশ্রেণীর নয়—কিন্তু সকল অভিনেতাই সেক্‌সপিয়র-রসের রসিক। বিশেষ যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত, 'এই মহোৎসবে কবির পূজায় অর্ঘ্যদান করিতেছি' এই ভাব মনে লইয়া অভিনয় করে বলিয়া অভিনয় এত হৃদয়গ্রাহী হয়। বড় বড় অভিনেতারা আজকাল সেক্সপিয়রের অভিনয় করিয়া সময় নষ্ট করে না; কেন না তাহাতে পয়সা কম, কারণ রসগ্রাহী দর্শক ও শ্রোতা কম; কাজেই তাহারা হীনশ্রেণীর অভিনয়ে অধিক অর্থ উপার্জ্জন করে। তাই বেনসন, বির্‌বোম্ ট্রি, ফর্ব্বস্, রবার্টসন ইত্যাদিকে প্রতিবৎসর এ মহোৎসবে পাওয়া যায় না। তাহারা সে সময় আমেরিকাতে অর্থোপার্জ্জনে ব্যস্ত। কিন্তু যাহারা মহোৎসবে যোগ দেয় তাহারা ভাবুকের ন্যায় অভিনয় করে,—নূতন নূতন শোভাসম্ভার আবিষ্কারের চেষ্টা করে। আমার চক্ষে এই অভিনয়ে সেক্‌সপিয়রের অনেক নব সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হইল, তাহাতে প্রচুর আনন্দ পাইলাম। মৃত্যুশয্যায় শুইয়াও পিতৃদেবের Romeo and Juliet হইতে আবৃত্তির কথা মনে পড়িল; সেই কাহিনী ও বি-এ পরীক্ষার বৎসর পরীক্ষার পূর্ব্বদিন ব্যাণ্ডম্যান সাহেবের হ্যামলেট অভিনয় দেখিয়া ফেল হইবার উপক্রমের গল্প বন্ধুগণকে শুনাইলাম।

রবিবার অভিনয় বন্ধ—সেই অবকাশে সহরটি দেখিয়া বেড়াইলাম। পথে প্রোফেসর বরসন ও তাঁহার পত্নীর সহিত অ্যান হ্যাথওয়ে কুটীরের নিকট আলাপ হইল। ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ নীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। সন্ধ্যার আহারের সময় মিসেস ফ্লাউয়ারের বাড়ীতেও এই কথায় বিস্তৃত সমালোচনা হইল, তাঁহারা বিশেষ যত্ন ও আগ্রহের সহিত এসকল কথা শুনিলেন।

সোমবার টৌডিংটন, ওয়ারউইক, লেমিংটন, কভেণ্ট্রি ইত্যাদি হইয়া মোটর বাস করিয়া Kennilworth Castleএর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে গেলাম।

কেনিলওয়ার্থ কাসেল, সাইমন ডি মণ্টফোর্ট, আরল্ অব লিষ্টার, কুইন এলিজেবেথ প্রভৃতির নামের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। সার ওয়াল্টার স্কটের কেনিল্ওয়ার্থ উপন্যাস সাধারণ পাঠকের নিকট এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দুর্গকে বিশেষ পরিচিত করিয়া রাখিয়াছে। বিজয়ী ক্রমওয়েল রাজবংশের অবমাননার জন্য এই প্রসিদ্ধ দুর্গকে ধ্বংস করিয়া বিজয়দর্পের চূড়ান্ত পরিচয় দিয়াছিলেন। শুধু কালাপাহাড় আরংজেবই ভারতবর্ষ কলঙ্কিত করে নাই। সকল দেশেই সকল সময়েই এই সব কালাপাহাড়ের কীর্ত্তির সাক্ষ্য রহিয়াছে। এককালের সুন্দর ঘরের দেওয়ালগুলি মাত্র দাঁড়াইয়া আছে—ছাদ মেঝে দরজা জানালা কিছুই নাই। ধ্বংসাবশেষ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আরল্ অব্ ওয়ারউইক চারি মাইল দূরে নিজের দুর্গের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। King Maker Warwick সময় বুঝিয়া ক্রমওয়েলের সঙ্গে যোগ দিয়া নিজের দিন কিনিয়াছিলেন। Restorationএর পূর্ব্বে ওয়ারউইকের মৃত্যু হওয়ায় সম্রাট দ্বিতীয় চার্লসের কোপে পড়িতে হয় নাই। সার ওয়াল্টার স্কটের Kennilworth পুস্তকে উল্লিখিত এমি রবসার্ট তাঁহার ক্রুর প্রণয়ী Earl of Leicesterএর চক্রান্তে ও রাজ্ঞী এলিজেবেথের প্ররোচনায় এইখানে প্রাণ দিয়াছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী। স্কট কেনিলওয়ার্থ দুর্গের যে ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার কিছুই এখন নাই। চারিশত বৎসরে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কাল তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। আধুনিক ঐতিহাসিকের মতে এমি রবসার্টের কেনিল ওয়ার্থে এরূপ মৃত্যুর কথা কাল্পনিক। ইতিহাস এখন এইরূপ প্রচলিত অনেক কিম্বদন্তীকে কাল্পনিক সাব্যস্ত করিয়াছে। ইহাতে ইতিহাসের মর্য্যাদারক্ষা হইতেছে, কিন্তু লোকপ্রসিদ্ধির ও তদানুসঙ্গিক সাহিত্যিক মাধুর্য্যের হয়ত হানি ও গ্লানি হইতেছে।

ষ্ট্র্যাট্ফোর্ড ও কেনিলওয়ার্থের নিকটস্থ গ্রামে বিলাতের যথার্থ "পাড়াগাঁ"র আভাস দেখিতে পাইলাম। কিন্তু অতি সামান্য গ্রামেও হোটেল, মোটর বাস, ট্রাম, ইলেক্ট্রিক লাইট, ড্রেণ পায়খানার অভাব নাই। সব রাস্তাই আমাদের চৌরঙ্গি রাস্তাকে প্রায় হার মানাইয়া দেয়।

ষ্ট্র্যাটফোর্ড হইতে সেক্সপিয়রের শ্বশুরবাড়ী Shotteryতে অ্যান্ হ্যাথওয়ের কুটীর দেখিতে যাইবার সময় মাঠ, যবের ক্ষেত, আলু ক্ষেত ইত্যাদির উপর দিয়া হাঁটিয়া গিয়া পল্লীগ্রাম-ভ্রমণের কতকটা সুখ অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু প্রতি গ্রামের মধ্যেই চটি অথবা হোটেল অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার কারণ হয়ত এই যে, সেক্সপিয়রের স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য অনেক যাত্রী এই পথে সর্ব্বদা যাতায়াত করে। Charlecoteএ সার টমাস লুসি ওরফে জুষ্টিস্ শ্যালোর বাড়ীতে সেক্সপিয়রের কীর্ত্তি সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত অনেক সুন্দর ছবি আছে। যে হলে হরিণ চুরির অপরাধে তদানীন্তন জমিদার লুসির বৈঠকখানায় সেক্সপিয়রকে তাঁহার অনুচরগণ ধরিয়া আনিয়া দাঁড় করাইয়াছিল, আজ সেই হল সেক্সপিয়রের প্রস্তর মূর্ত্তি, তৈলচিত্র ও অন্যান্য স্মৃতিচিহ্নে পরিপূর্ণ। যেখানে একদিন অপমানের পরাকাষ্ঠা জীবিত সেক্সপিয়রকে সহ্য করিতে হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেইখানেই আজ সেই জমিদারের বংশধরগণ তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে কত যত্নবান্। এই বংশধরগণই এখন মুক্তকণ্ঠে বলেন যে, সেক্সপিয়রের হরিণ-চুরির গল্প কাল্পনিক। তখনকার দিনে যখন ভেড়া চুরি অপরাধে প্রাণদণ্ড হইতে পারিত, তখন জমিদারের হরিণ চুরি করিলে অন্তত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হানি হইত নিশ্চয়। সেক্সপিয়রকে তাঁহার শত্রুপক্ষের অনুচরগণ ধরিয়া বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল; তাহার কারণ বোধ হয় যে, দুই ঘরের মধ্যে জমি জমা লইয়া কিছু বিবাদ ও মনোমালিন্য ছিল। সেক্সপিয়রের নাটকে লুসি পরিবারের প্রতি অনেক হাসি ঠাট্টা, বিদ্রূপের ইঙ্গিত আছে; দুই বংশের মধ্যে চিরন্তন মনো-

মালিন্যই বোধ হয় ইহার কারণ। সেক্‌স্‌পিয়র দরিদ্র-সন্তান ছিলেন না—Little Latin ও Less Greek দলের গণ্ডমূর্খ ছিলেন না—বড়মানুষের ঘোড়ার জিম্মায় থিয়েটারের দরজায় দাঁড়াইয়া পয়সা রোজগার করিতেন না, ইহা এখন স্থির হইয়াছে। তাঁহার বাটীতে যে সকল দলিল দস্তাবেজ ও তাঁহার পঠিত পুস্তকের প্রদর্শনী রহিয়াছে, তাহা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

চিত্র, পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র, পুরাতন রাজ-রাজড়া ওমরাওদিগের আসবাব ইত্যাদির গৌরবে ওয়ারউইক ক্যাসেল Beautiful Homes of England এর মধ্যে প্রধানতম। লর্ড লিটন ও মিসেস স্টুয়ার্টের সৌজন্যে আমি এ সকল স্থান বিস্তারিতভাবে দেখিবার সুযোগ পাইয়া পরম আনন্দ পাইলাম। সেক্‌স্‌পিয়র-তীর্থদর্শন এ যাত্রা এখানেই শেষ হইল।

লণ্ডন, ২৯শে জুলাই—

Shakespeare ountry হইতে লণ্ডনে ফিরিয়া দেখি হঠাৎ আজ কমিটির কাজ বন্ধ—আমার পক্ষে হঠাৎ। শুনিলাম যে, আজ কাজ বন্ধ থাকিবে এ কথা পূর্ব্ব হইতে প্রচারিত হইয়াছিল, কেবল আমার অনবধানতায় আমারই ইহা জানা হয় নাই। এই সকল সামান্য অনবধানতায় জীবনের বড় বড় অনেক ক্ষতি হইতেছে। শুধু দাঁত হারাইয়া যায়, চশমা পড়িয়া থাকে, ছড়ি খুঁজিয়া পাই না তাহা নয়, অনেক বড় বড় লোকসান, কষ্ট, লাঞ্ছনা এই সকল সামান্য ত্রুটিতে ঘটিতেছে। তাহার সমষ্টি করিলে লোকসানের ভাগ বড় কম হইবে না। আমার স্বর্গগত ভ্রাতা এই সকল বিষয়ে সর্ব্বদা মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া অনেক উপকার করিত। আর যাহার সর্ব্বদা সস্নেহ সযত্ন সশ্রদ্ধ সেবায় এই জীর্ণ ক্ষীণ অকর্ম্মণ্য দেহ এখনও গুরুভার বহিতে সমর্থ, চিন্তাক্লিষ্ট ভারাক্রান্ত মন শক্তিসঞ্চয় করিতে পারে, তাহার অক্লান্ত চেষ্টাতেও এবিষয়ে বহু উপকার হয়। সে শক্তি এখন বহুদূরে। কাজেই সময়ে সময়ে লাঞ্ছনার চূড়ান্ত হইতেছে। তবু "হোটেল যাত্রা" হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া ক্লাবে স্থান পাইয়া যন্ত্রণার কতকটা উপশম হইয়াছে। ঘর বাড়ী ছাড়িয়া, ডাক্তারের সীমা অতিক্রম করিয়া, প্রবাস-বাসের সময় গিয়াছে। বড় গুরুতর কর্ত্তব্যের দায়েই এ বোঝা মাথায় লইতে স্বীকার করিতে হইয়াছে।

আশ্চর্য্য এই যে, এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও কুত্তা ঘাটেরও নয় ঘরেরও নয় বলিয়া সাব্যস্ত হইতেছে। এখানকার বাবাজীগণের কেহ কেহ নিজ প্রয়োজন-সিদ্ধি উদ্দেশ্যে প্রচার করিতেছেন যে, আমরা (অর্থাৎ কমিটির সভ্যেরা) একদম "সরকারী" লোক। সাধারণ পক্ষের প্রতিনিধি হইয়া আমাদের কথা কহিবার কোন অধিকার নাই ; আমাদের কথার, মন্তব্যের, বিচারের, নিন্দার, প্রশংসার কিছুমাত্র মূল্য নাই—তাঁহারা নিজেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা। তাঁহাদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার আমাদের কোন প্রয়োজন বা অধিকার নাই, তাঁহাদের ভার তাঁহাদের দায়, তাঁহারা বুঝিবেন, আমাদের মাথাব্যথার প্রয়োজন নাই। ঘরের বাবাজীদেরই মুখে ও মুখভঙ্গিতে ইহার সম্যক পরিচয় সর্ব্বদা পাওয়া যায়। বাহিরের বাবাজীদের এতাদৃশ ভাব হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ?

এই ত গেল "যার জন্য করি চুরি" তাদের কথা। অপরপক্ষে অর্থাৎ "কর্ত্তা"দের মনের—শুধু মনের নয় মুখেরও—ভাব যে আমরাও বিদ্রোহীদলের অন্তর্গত। বিদ্রোহের উৎসাহ উত্তেজনাই আমাদের কাজ এবং সেই উপলক্ষে ও সেই জন্যই আমরা "সরকারী" লোকদিগকে বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টায় তাহাদের নিত্য দোষানুসন্ধান করিতেছি, জেরা করিতেছি, ছিদ্রান্বেষণ করিতেছি ইত্যাদি। এই সব ব্যাপার লইয়া ইতিমধ্যেই শুধু বচসা নয়, কোন কোন সরকারী পুঙ্গবের সঙ্গে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইয়াছে এবং তাহার প্রমাণ "নথির সামিল"ও হইয়াছে। অন্ততঃ নথির সামিল হইবার দরখাস্ত হইয়াছে।

আবার অন্যদিকে অন্যদল আত্মীয়তার ভাণে অথচ শত্রুতার উদ্দেশ্যে নানা সম্ভব অসম্ভব চাকরীর

সৃষ্টি করিয়া তাহাতে উন্নীত করিতেও ত্রুটি করিতেছে না। দেশে এমন চাকরী নাই, যাহা আকাশের চাঁদের মত ইঁহারা হাতে আনিয়া দেন নাই; বিদেশেও সে চেষ্টার ত্রুটি নাই।

এমন অবস্থায় কমিটীর কাজ যেরূপ ঢিমে তেতালায় চলিয়াছে, তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিলেই গোলযোগ ঘটিতেছে। হঠাৎ কারণে অকারণে কাজ বন্ধ হইতেছে—কাজের শৃঙ্খলা নাই, নিয়ম নাই, বাঁধাবাঁধি নাই। এখানকার গবর্ণমেণ্ট ও ভারতের গবর্ণমেণ্টের মধ্যে মনের মিল নাই। যেন সমস্ত ব্যাপারটা ছেলেখেলায় দাঁড়াইবার উপক্রম হইতেছে।

হঠাৎ আজ কাজ বন্ধ থাকাতে এই সকল কথা বিশেষভাবে মনে হইতেছে। পূর্ব্বে জানা থাকিলে এই চারদিন ছুটি পাইয়া হয়ত বাহিরে কোথাও ঘুরিয়া আসিলে এ সকল কথা মনে এমন বিশেষভাবে স্থান পাইত না। সোমবার Bank Holiday আমাদের দুর্গাপূজা অপেক্ষা বিরাট ব্যাপার। চারিদিকে এত লোকের দৌড়াদৌড়ি হুড়াহুড়ি হইবে যে, পূর্ব্বে বন্দোবস্ত না করিয়া Bank Holiday মাথায় বাহিরে যাইতে সকলেই বারণ করিল। চারিদিন এইরূপে অকারণ আলস্যে লণ্ডনে আবদ্ধ থাকিবার আশঙ্কাতেই বোধ হয় মনের কলকব্জা খারাপ হইয়া (অথবা ভাল হইয়া) গিয়া আসল কথা এরূপভাবে মানসিক আলোচনার অবকাশ হইয়াছে।

কাজটা অতি বৃহৎ, অতি গুরুতর, অতি প্রয়োজনীয়। অথচ সরকার পক্ষ ও সাধারণ পক্ষ উভয়েই ব্যাপারটাকে নিতান্ত "মধুপর্কের বাটী" আকারে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছে। সুকুমারমতি বহু সংখ্যক বালক ও যুবক নানাবিদ্যা শিক্ষা উপলক্ষে বহু সহস্র ক্রোশ দূরে বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় স্বীকার করিয়া পিতা, মাতা, আত্মীয়জনকে বহু উৎকণ্ঠায় ফেলিয়া, স্থলবিশেষে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া এই দীর্ঘ প্রবাসে আইসে। বহু বৎসর বহু ভয় বিপদ বিভীষিকা ও প্রলোভনের মধ্যে তাহাদিগকে জীবন যাপন করিতে হয়। যাহাদের না আসিলে নয় শুধু তাহারাই আসে না, যাহাদের না আসিলেও চলে, যাহারা না আসিলেই ভাল হয়, তাহাদেরও অনেকে আসে। ইহাতেই সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিতেছে। এ সমস্যার সম্যক মীমাংসা বড় কঠিন। বিশেষতঃ নূতন প্রণালীর শাসনতন্ত্রের সৃষ্টির জন্য অধিকতর সংখ্যক ও শ্রেষ্ঠশ্রেণীর শিক্ষার্থীর এখানে আসা প্রয়োজন হইবে। অথচ এখানকার লোকেরই উত্তরোত্তর বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষা-স্পৃহা ও প্রয়োজন যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে আমাদের ছেলেদের স্থান হওয়া দুরূহ। সমস্যা ইহাতে আরও জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। উভয় পক্ষই "অবুঝ"। বিচারে যাহাই প্রতিপন্ন হইবে, তাহাই উভয় শ্রেণীর নিকট অপ্রীতিকর হইবে।

মধ্য পথ অবলম্বন করিতে গিয়া চিরদিনই "অপদস্থ" হইতে হইয়াছে। এবারেও না হয় তাহাই হইবে। তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু সহযোগিবর্গের নিকট সম্যক্ সাহায্য ও উৎসাহ না পাইলে কাজ ত কিছুতেই অগ্রসর হইতেছে না। সেই জন্যই এত বিব্রত হইয়া পড়িতে হইয়াছে। সংসার, রাজনীতি ও বিষয়-কর্ম্মক্ষেত্রে "কাজ" "কাজ" করিয়া জীবনের সায়াহ্ন বেলায় ত প্রায় পৌঁছান গেল। কিন্তু "কাজ" যে কি, তাহা এখনও বুঝিতে পারিলাম না। সবই ত অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। অথচ এ বয়স পর্য্যন্ত "কাজের" দোহাই দিয়া "ইতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্" দলের সংখ্যা বাড়াইয়া আসল কাজের কত কাছাকাছি পৌঁছিলাম তাহা ত ভাবিয়া পাই না। যখনই যাহা করিতে গিয়াছি, সুবোধ হিতৈষী গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "এতে হবে কি, ফল কি?" ঠিক উত্তর দিতে পারি নাই, কিন্তু তাই বলিয়া হাতের কাজ ত্যাগও ত করিতে পারি নাই। যখন যে কাজ উপস্থিত হয়, সেটা নিজের জ্ঞান বুদ্ধি ক্ষমতা মত প্রাণপণে করিয়া যাই, ফলাফল মহত্তর হস্তে। প্রাণের ভিতরে যথার্থ এ ধারণা আনিতে পারিলে কাজ সরল হইয়া আসে।

হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় দুঃখ প্রকাশ করেন, সহানুভূতি প্রকাশ করেন যে "হলো না কিছু"। কথাটা ঠিক। কিন্ত "কিছু হবার" আশায় যেখানে কাজ আরম্ভ নয়, সেখানে "নিবৃত্তি" তদনুরূপ হইলে "প্রবৃত্তি"তে আঘাত ত বড় পড়ে না। যা হল তাই ভাল, তাই চের। আর কত লোকের এর চেয়েও কত কম হয়, তবু তারা সুখী। যাদের জন্ত নিত্য ভাবিতে হয়, বিব্রত হইতে হয়, মাথা হেঁট করিতে হয়, মুখ ম্লান করিতে হয়, তারা এটুকু ভাবিয়া ব্যথায় ব্যথী, দুঃখের দুঃখী, সুখের সুখী হইলেই দুঃখের ভাত সুখ করিয়া খাইলেই ত সব জ্বালা যন্ত্রণা মিটিয়া যায়। জুতার অভাবে একদিন যাহার বড় ক্ষোভ হইয়াছিল, আর একজনের জুটা পা-ই নাই দেখিয়া তাহার শান্তি যদি সম্ভব হইয়াথাকে, ত ইহাদের হয় না কেন?

নিত্য প্রশ্ন "Quo Vadis, whither away, চলেছ কোথায়?" জগদ্ব্যাপী, অনন্তকালব্যাপী এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে, কবে কে কোথায় দিতে পারিয়াছে? পলায়নপর, কর্ত্তব্যচ্যুত সেণ্টপল এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই। শেষে মাথা দিয়া অমর হইয়াছিলেন। যাহা করেন মঙ্গলময়, তাহাই মঙ্গল—যবে এ মহাবাক্য শুধু বাক্যে পরিণত না হইয়া হৃদয়ে স্থান পাইবে, আত্মার সহিত মিলিয়া যাইবে, তবেই এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। পাইবে।

ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ডে সেক্‌স্‌পিয়র উৎসবে যোগদানে আজ কাল সেক্‌স্‌পিয়র আলোচনা আবার কিছু বাড়িয়াছে। সেখানে একখানা নূতন করিয়া বই কিনিবারও দরকার হইয়াছিল। Antony and Cleopatra নাটকে Pompeyর অনুচর জলদস্যু ,Menecratusএর মুখে মহাকবি মহা সত্যের প্রচার করিয়াছেন—

Pom.—If the great Gods be just, they shall assist
The deeds of justest men.
Men.—Know, worthy Pompey,
That what they do delay they not deny.
Pom.—While we are suitors to their throne, decays
The thing we sue for.
Men.—We ignorant of ourselves
Beg often our own harm, which the wise powers
Deny us for our good, so find we profit
By losing of our prayers.

ভগবচ্চরণে সকল পক্ষ হইতে নিত্য যে সকল বীভৎস প্রার্থনা পৌছায়, তাহা মঞ্জুর হইলে ভগবানের সৃষ্টি অচিরে লোপ পাইত।

দেশের মহাকবি গাহিয়াছেন—

"মানব-মনের কথা, হে অন্তর্যামিনী,
তুমি যত জান দেবী, মানব-রসনা
পারে কি কহিতে তাহা?"

কথা ঠিক। মানব-মনের কথা মানব-দেবতা যেন নিজের সম্মুখে বলিতেও হয়ত কুণ্ঠিত হয়, অথচ সে প্রার্থনা মঞ্জুর হইল না বলিয়া খেদ করিতেও ছাড়ে না।

ক্রমশঃ

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

চিরমুক্তি

(গল্প)

ভোরের আলো সবেমাত্র ধরার বক্ষে নামিয়া আসিতেছে। কুলায়ে কুলায়ে পাখীগুলি প্রভাতী গানে দিনদেবের আগমন বিশ্ববাসীকে জানাইয়া দিতেছে। তরুছায়ান্বিত ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী নদীটি আপনার অসংখ্য কল্যাণ-কার্য্য-সাধনে দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। তীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র অট্টালিকাখানি সুপ্তিমগ্ন। তাহাতে জাগরিত জীবের কোন চিহ্নই তখন পাওয়া যাইতেছে না, কেবল একটি জানালার নিকট রাণী তাহার ব্যথিত হৃদয়খানি লইয়া চিত্রিত প্রতিমার ন্যায় পূর্ব্বগগনের দিকে পলকহীন নেত্রে চাহিয়া আছে। মাঘ মাসের শেষে আম্রমুকুলের গন্ধ বহিয়া উৎফুল্ল বাতাস ধীরস্পর্শে তাহার কয়েকটি কেশ লইয়া খেলা করিতেছিল, সেই সঙ্গে তাহার মনের মধ্যে কেমন একটা ব্যথাও জাগাইয়া তুলিতেছিল। তাই সে ভাবিতেছিল, কিসের ব্যথা এ? পিতা ত তাহাকে সেইরূপই স্নেহ ও যত্ন করেন, দিদির ভালবাসাও সেই আগেকার মতই আছে, সেই তাহার শৈশবের শান্তিনিকেতন পিতৃগৃহ—কিছুরই ত পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবু কেন মনে হয় এসব সুখ বুঝি সম্পূর্ণ নয়, যেন অশান্তির ক্ষীণ রেখা তাহার হৃদয়ে লাগিয়াই আছে?

নিজের ব্যথায় সে যে পিতা ও দিদিকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে। পিতার চিরপ্রশান্ত ললাটে চিন্তার রেখা যে দিন দিন ফুটিয়া উঠিতেছে—সে যে কেবল তাহারই জন্য। তাহাকেই সুখী করিবার জন্য যে তিনি পূর্ব্বের অধিক স্নেহ যত্ন দিতেছেন, কিন্তু অভাগিনী সে ত প্রসন্নচিত্তে নিঃসঙ্কোচে তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। দিদি যে তাহার সামান্য নিশ্বাস-পতনেও চমকিয়া উঠেন—সে একটু নির্জ্জনে থাকিলেই দিদির চোখে জল আসে।

"রাণী!"

"কি দিদি?"

রাণী শয্যার উপরে তাহার দিদির নিকটে গিয়া বসিলে দিদি বলিলেন, "তুই কি রাতে ঘুমুসনি রাণী?"

রাণী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "ঘুমিয়েছি ত দিদি। শেষরাত্রে মাথাটা কেমন একটু ধরেছিল, তাই একবার জানালার কাছে গিয়া দাঁড়িয়েছিলুম!"

দিদি সস্নেহে তাহার মাথাটা কোলের উপর টানিয়া লইলেন।

২

সে আজ প্রায় তিন বৎসরের কথা। রাণী যখন সুবর্ণালঙ্কারমণ্ডিতা ও দাস-দাসী-পরিবেষ্টিতা হইয়া নব বিবাহের পর স্বামিগৃহ হইতে পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল, তখন প্রতিবেশীরা ও তাহার সমবয়স্কারা সকলেই তাহাকে ঈর্ষার চক্ষে দেখিল। দুই একজন প্রতিবেশিনী আসিয়া বলিলেন, "রাণীর মা, তোমার রাণীর তপিস্যে ভাল ছিল গো, তাই এমন বরে ঘরে পড়েচে।" জননী সস্নেহে কন্যাকে বক্ষে লইয়া বলিলেন, "তাই বল মা, তোমরা সবাই আশীর্ব্বাদ কর যেন রাণী আমার রাজরাণী হয়।"

আবার ভাগ্যহীনা কন্যা কল্যাণীর দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণে আসায় সে সময়ে তাঁহার চোখে একবিন্দু জলও আসিয়াছিল। রাণীর অমঙ্গল আশঙ্কায় ত্বরিতে তাহা মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন।

সে দিনটা রাণীর চোখ দিয়া কিভাবে কাটিয়া গেল রাণী তাহা জানিতেও পারে নাই। দরিদ্রের কন্যা রাণী আজ বিধির বিধানে জমীদার-পুত্রবধূ। যে সব জিনিষ সে কখন চক্ষেও দেখে নাই বা কল্পনাতেও আনিতে পারে নাই, সেই যখন দুই চারটা

ট্রাঙ্ক বোঝাই করা জরি বেনারসী শাড়ী ও একরাশ সোণার ও হীরামুক্তার গহনা তাহার একবারে নিজস্ব হইয়া গেল, তখন তাহার বালিকাহৃদয়খানি আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছিল। শ্বশুরের অপরিসীম স্নেহ, খাশুড়ীর যত্ন এবং ছোট ছোট দেবর ননদগুলির প্রীতি তাহার সেই হৃদয়খানি বিভোর করিয়া রাখিয়াছিল। সবার উপর তাহাদের বাড়ীটা কত বড়, কত লোকজন, কত দাস দাসী, কত আসবাবপত্র—এই সব কথা পিতা মাতা ও দিদিকে বারংবার শুনাইয়াও তাহার তৃপ্তি হইতেছিল না।

রাত্রে অন্ধকার কক্ষে শয্যায় শয়ন করিয়া কল্যাণী যখন রাণীকে বক্ষে লইয়া স্নেহপ্লুত কণ্ঠে বলিয়াছিল, "আচ্ছা রাণী, সব কথাই ত বলি ভাই, কিন্তু যতীশের কথা ত কিছুই বলিস নি। এইবার আমার সেই কথা বল না ভাই!"

রাণী লজ্জায় রক্তিম হইয়া দিদির বুকে মুখ লুকাইল। পরে অনেক পীড়াপীড়িতে রাণীর নিকট হইতে কল্যাণী যাহা শুনিল তাহাতে সে মোটেই সুখী হইতে পারিল না। কয়দিনের মধ্যে যতীশ যে রাণীর সহিত একবারে কথাই বলে নাই, ইহা জানিয়া কল্যাণী আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

পরদিন যখন রাণীর সঙ্গিনীরা আসিয়া বর কি বলিয়াছে জানিবার জন্য রাণীকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল, তখন সে মহাবিপদে পড়িল। সে তাহাদের কাছে কি বলিবে, স্বামী ত তাহার সহিত একটিও কথা কহেন নাই! তাহার মনে পড়িল, ফুলশয্যার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান শেষ করিয়া রমণীগণ রাণীকে শয্যায় শয়ন করাইয়া চলিয়া যাইবার পর সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল রাত্রের আর কোন খবর সে জানিতে পারে নাই। রাত্রিশেষে পাখীদের প্রভাতী গানে যখন তার ঘুম ভাঙ্গিল তখন অপরিচিত ঘর ও অপরিচিত শয্যা তাহাকে তাহার নূতন জীবনের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। সে বিস্মিত হইয়া উঠিয়া বসিতেই চোখে পড়িল শয্যার অপর প্রান্তে স্বামী ঘুমাইয়া আছেন। প্রভাতের আলো ম্লান করিয়া সে গৌরতনুর অমল লাবণ্য যেন রাণীর চোখে উপকথার রাজপুত্রের মত অপূর্ব্ব সুন্দর বলিয়া মনে হইয়াছিল। পরে নিজ লজ্জিত দৃষ্টি তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া লইয়া সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর যে কয়দিন সেখানে ছিল, সে কয়দিনের মধ্যেও আর তাহার স্বামী সাক্ষাৎ একবারও ঘটে নাই। তবে সে লোকের কাছে স্বামীর পরিচয় কি করিয়া দিবে?

রাণীর পিতা রজনীনাথ জামাতাকে আনিবার জন্য দুই তিন বার গিয়াছিলেন, কিন্তু জামাতা নানা রকম ওজর দেখাইয়া একবারও আসেন নাই। রজনীনাথ প্রথমে বড় ঘরে কন্যার বিবাহ দিতে রাজী হন নাই। পত্নী ও কন্যা কল্যাণীর একান্ত জিদে শেষে তাঁহাকে মত দিতে হইয়াছিল। জামাতাকে আনিতে গিয়া যেটুকু জানিয়া আসিলেন, তাহাতে রজনীনাথ, তাঁহার পত্নী এবং কল্যাণী কেহই বড় খুসী হইতে পারিলেন না। রাণীর ভবিষ্যৎ জীবন সুখের হইবে কি না কেবল এই কথাই সকলে ভাবিতে লাগিলেন।

শ্বশুর রাণীকে লইয়া যাইতে চাহিলে পিতামাতা একটু আপত্তি তুলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সে আপত্তি মোটেই টিকিল না। জোর তলব আসিল বধূমাতাকে পাঠান চাই-ই। পিতামাতা কন্যাকে শ্বশুরগৃহে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। শত কার্য্যের মধ্যেও মনে পড়িতে লাগিল, রাণী চলিয়া যাইবে। এই যে একটি সামান্য বালিকার হাসি কান্নায় সমস্ত বাড়ীটাকে বিভোর করিয়া রাখিয়াছে, সেই রাণীর অভাবে বাড়ীতে তাহারা কেমন করিয়া থাকিবে? কল্যাণীর আজ কোন কাযে মন বসিতেছে না। রাণীকে দিন রাত্রি বুকের কাছে টানিয়া লইয়াও, যেন মনে হইতেছিল তাহাকে পর্য্যাপ্তরূপে পাওয়া যাইতেছে না। রাণী যে তাহার ব্যর্থ জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা—সেই রাণীও আজ তাহার কাছছাড়া হইয়া গেল! চিরদিনের মতই তাহার উপর দাবী ফুরাইল। অন্তরের বেদনা সে কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

আবার মনকেও চোখ রাঙাইয়া বলিতেছিল, এদিন যে একদিন আসিবে, সে ত জানাই ছিল, তবে এ ব্যাকুলতা কেন? রাণী আর একবার হাসিমুখে স্বামিগৃহ হইতে ফিরিয়া আসুক, সে খুব সুখী হইয়াছে এইটুকু জানিতে পারিলেই তার খুসি হওয়া উচিত। রাণীর সুখেই যে কল্যাণীর সুখ, একি সে ভুলিয়া যাইতেছে? তবু মনে হয় রাণীকে পাঠাইয়া সে এই দীর্ঘ দিনগুলা কেমন করিয়া কাটাইবে?

রাণী কাঁদিয়া বলিল, "দিদি আবার শীগ্‌গির এনো, তোমাদের ছেড়ে আমি কোথাও থাকতে পারবো না।"

রজনীনাথের চিরপ্রসন্ন শান্ত মুখখানিও আজ অন্তর্নিহিত বেদনায় কালো হইয়া উঠিয়াছে। প্রণতা কন্যাকে বুকে টানিয়া লইয়া মনে মনে কহিলেন, যে ঘরে আজ চলিলে সেই ঘরই তোমাকে লক্ষ্মীর আসনে বরণ করিয়া লউক। তাঁহার মনে পড়িল আর এক দিনের কথা, সেও একদিন কি বিধ্বস্ত হৃদয়েই এমনি একখানি শুভ্র মুখ বুকে চাপিয়া ধরিয়া আশীর্ব্বাদ ধারায় সিঞ্চিত করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন। মনে হয় সে ত এই সেদিনের কথা, বালিকা কল্যাণী যখন শাঁখা সিন্দুর ফেলিয়া পিতামাতার চরণতলে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তখন পিতামাতার মনের উপর দিয়া একটা প্রলয়ের ঝড় বহিয়া গিয়াছিল।

স্বামিগৃহে গিয়া রাণী ঠিক লক্ষ্মীরূপে অভিনন্দিত হইয়াছিল কি না সেটা ঠিক করিয়া না বলা গেলেও, সে যে শ্বশুর শাশুড়ীর নিকট খুব আদরে গৃহীত হইয়াছিল সে কথা বলা যাইতে পারে। রাণী সেখানে গিয়া দুই এক দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিল যে স্বামী তাহার প্রতি বড় সন্তুষ্ট নহেন। তিনি যেন সর্ব্বদা রাণীকে এড়াইয়া চলিতে চাহেন। স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ তাহার খুব কমই হইত।

যতীশ নিজের অধিকৃত ঘরখানি পত্নীকে ছাড়িয়া দিয়া নিজে গিয়া বাহির মহলে আশ্রয় লইল। সকল দেখিয়া শুনিয়া রাণীও স্বামীর সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া চলিত। স্বামীই যদি তাহাকে চাহিলেন না, স্ত্রীর অধিকার কোনদিন দিলেন না, তবে আত্মমর্য্যাদাভিমানিনী রাণী নিজের দীনতা প্রকাশ করিয়া কেন গিয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াইবে? কিন্তু তাহার দীর্ঘদিনগুলাই বা কাটে কি করিয়া?

সংসারে অসংখ্য লোকজন, তাহাকে ত কোন কাযেই দরকার হয় না। এত বড় বাড়ীখানার মধ্যে মনে হয় যেন সে সম্পূর্ণ একা। শুধু দিন ত নয়, ততোধিক দীর্ঘ রাত্রিটা যে আর কিছুতেই কাটিতে চাহে না।

স্বামী তাহার প্রতি কেন এমন বিমুখ তাহা ত সে জানে না। তবে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা যুক্তি খুঁজিয়া বাহির করিল—বোধ হয় রাণীকে তাঁহার পছন্দ হয় নাই, অযোগ্য বোধে স্বামী ভালবাসেন না। তাহাতে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না, সে যে তার নিজের মন্দ অদৃষ্টেরই দোষ। তিনি তাহাকে নাইবা ভাল বাসিলেন। সে যে শৈশব হইতে শুনিয়া আসিতেছে স্বামী সম্মান ও পূজার পাত্র, তাই সেও মনে মনে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে।

মধ্যে রজনীনাথ কন্যাকে লইয়া যাইতে চাহিলেন, কিন্তু রাণীর শ্বশুর রাজী হন নাই। রাণী এখন আর সে সরলা বালিকা নাই। অবস্থা তাহাকে বয়সের অধিক অভিজ্ঞতা আনিয়া দিয়াছে। স্বামীর ব্যবহার যে সাধারণের অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাহা সে ভালই বুঝিতে পারিয়াছে। দিনান্তে একবার করিয়া দূর হইতে স্বামী সন্দর্শনেই সে সন্তুষ্ট থাকিত। এইভাবে বিবাহিত জীবনের দিনগুলির দীর্ঘ দুই বৎসর কাটিয়া গেল। বোধ হয় চির জীবনটা এই ভাবে গেলেও তাহার পক্ষে ভাল হইত।

সেদিন রাণীর ননদ তাহাকে যে সংবাদ দিয়া গেল তাহাতে সে একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। রাণীর ননদ বলিল—যতীশ যখন মেডিকেল কলেজে পড়ে, তখন সেই কলেজেরই অণিমা নাম্নী একটি ছাত্রীকে সে ভালবাসে এবং তাহারই সহিত বিবাহের আবেদন লইয়া

মাতার নিকট আসিয়া দাঁড়ায়। পিতা জননীর নিকট সকল শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। পুত্রকে খুব একচোট তিরস্কার করিয়া লইলেও মনের আশঙ্কাটা একেবারে গেল না। কি জানি আজকালকার ছেলেদের ত বিশ্বাস নাই, হয়ত কোন দিন পিতার অমতেই বিবাহ করিয়া বসিবে! তাই তিনি তাড়াতাড়ি পুত্রের মত পরিবর্ত্তনের মানসেই, শুভ বা অশুভক্ষণে রাণীকে গৃহে লইয়া আসেন। বিবাহের পরেও যতীশ অণিমার প্রার্থী হইয়া অণিমার পিতার নিকট গিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা ত আর সতীনের ঘরে মেয়ে দিবেন না। সেই হইতে যতীশের এই পরিবর্ত্তন।

রাণীর আজ প্রথম মনে হইল সত্যই সে দুর্ভাগিনী, স্বামী-প্রেমে বঞ্চিতা অনাদৃতা। তাহার মনে হইল সে আর এ গৃহের কেহ নহে—তাহার এখানকার কর্ত্তব্য দায়িত্ব সব ফুরাইয়া গিয়াছে। শুধু সে স্বামীর গলগ্রহ, জীবনপথের বিষম বিড়ম্বনা। স্বামী ভালবাসেন না ইহা যদি সহিয়াছিল, তবে তিনি অন্যাসক্ত ইহাও কেন সহিবে না এ কথা বুঝিতে না পারিলেও, তাহার কেবলই মনে হইতেছিল—যদি মরণেও তাঁহাকে মুক্তি দিতে পারিতাম। এই অভাগিনীকে ঘরে আনিয়াছেন বলিয়াই ত অণিমাকে বিবাহ করিতে পারিলেন না।

তাহার পর একদিন অকস্মাৎ কোন্ অজানা নূতন রাজ্যের ডাক শুনিয়া রাণীর শ্বশুর চলিয়া গেলেন। সেই সঙ্গে রাণীরও শ্বশুরগৃহের বাস উঠিয়া গেল। শাশুড়ী বলিলেন যে ছেলেই যদি ঘরবাসী হইল না, তবে ও অপয়া অলক্ষণা বউ লইয়া তিনিই বা কি করিবেন। রাণী পিতার গৃহে ফিরিয়া গেল।

৩

আরও দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। রাণী এখন আর সে রাণী নাই, শৈশবের সেই হাস্যবদনা লাস্যবদনা রাণীর ছায়াটুকুও আর তাহাতে দেখা যায় না। তাহার চিন্তাজর্জ্জরিত দেহে এখন যক্ষ্মা রোগ আসিয়া আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। রোগ দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে। রাণীর মাতা ইতিপূর্ব্বে একদিন কালের অকাল আহ্বানে ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। রজনীনাথ ভাবিলেন, রাণীও বুঝি মায়ের পশ্চাদনুসরণ করে।

রাণীর চিন্তাক্লিষ্ট বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া কল্যাণী একদিন তাহাকে বলিল, "রাণী! যতীশকে একবার আসতে বলব? তাকে দেখবি?"

রাণী পাশ ফিরিয়া শুইয়া স্বর নামাইয়া বলিল, "এখন থাক্ দিদি। যদি পারত সেই শেষ দিনে একবার দেখিও।"

বর্ষা শেষে রাণীর অবস্থা আরও খারাপ হইয়া উঠিল। চিকিৎসকের উপদেশানুযায়ী আশ্বিনের প্রথমে রজনীনাথ কন্যাকে মধুপুরে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় করিলেন।

তখনও পৃথিবীর বক্ষ হইতে বর্ষার শেষ চিহ্ন মুছিয়া যায় নাই। শরৎ-প্রভাতের স্বর্ণবর্ণ সূর্য্যকিরণে জল স্থল উদ্ভাসিত। মাঠে ঘাটে কমলার হরিদ্বর্ণের স্বর্ণাঞ্চলের উপর শেফালিগন্ধামোদিত প্রভাত পবন বহিয়া যাইতেছে। গৃহে গৃহে বৈষ্ণবেরা আগমনী গাহিয়া বেড়াইতেছে। আনন্দময়ীর আগমনে সকলেই আনন্দমগ্ন। কেবল কল্যাণী ও রজনীনাথের হৃদয়ে এ আগমনী গানে আশার আলোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল না। তাঁহাদের হৃদয়ে আগমনীতেই বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিয়া উঠিতেছিল।

রজনীনাথ কন্যাকে লইয়া মধুপুরে আসিলেন। কিন্তু রাণীর তৈলহীন জীবনদীপ আর উজ্জ্বল হইল না। তাহার সে অনিন্দ্য মুখে মৃত্যুছায়া আঁকিয়া দিতেছিল। রাণী যে একবার যতীশকে দেখিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছে ইহা কল্যাণী বুঝিতে পারিয়াছিল। সেই জন্য সে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, রাণী যে কেবল তাহাকে একবার দেখিবার জন্যই এখনও প্রাণ রাখিয়াছে ইহা বার-বার জানাইয়া, যতীশের নিকট এক পত্র দিয়াছিল। কিন্তু তাহার কোনই জবাব আসিল না।

কয়দিন হইতে রাণীর অসুখ বাড়াবাড়ি যাইতেছিল। রাত্রে তাহার অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া উঠিল। রজনীনাথ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রকাশ একবারও শয্যা গ্রহণ করেন নাই। ভোর বেলা প্রকাশ ডাক্তারের বাড়ী চলিয়া গেলে রাণী বলিল, "দিদি! রাত কি শেষ হল ভাই?"

কল্যাণী উঠিয়া জানালা খুলিয়া দিতেই ভোরের আলো আসিয়া রাণীর মুখের উপর পড়িল। রাণী পাশ ফিরিয়া শুইয়া আস্তে আস্তে বলিল, "একবার দেখাতে পারলেনা ভাই দিদি?"

কল্যাণী আর চোখের জল ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। ওগো নিষ্ঠুর! ওগো পাষাণ! একবার এস। শুধু চোখের দেখা একটু দিলে তোমার রাজ-ভাণ্ডার খালি হইয়া যাইবে না!

বাহিরে একখানা গাড়ী আসিয়া থামিতেই প্রকাশ আসিয়া কহিল, "কাকা বাবু! রমেশ বাবু এলেন না। তাঁর এক বন্ধু তাঁর কাছে এসেছেন—তিনিও ডাক্তার—তাঁকেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। রমেশ বাবু আর এক জায়গায় গেলেন।"

রজনীনাথ কহিলেন, "তাঁকেই নিয়ে এস।" রজনীনাথ বাহিরে গিয়া সম্মুখে ডাক্তারকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার সে বিস্ময়াপন্ন ভাব কাটিয়া গেলে বলিলেন, "কল্যাণী! যতীশ এসেছে রে।"

যতীশ যখন গিয়া রাণীর কাছে দাঁড়াইল, তখন রাণী আকাশপানে চাহিয়া, নীল আকাশের বুকে পাখীর দল ঝাঁক বাঁধিয়া সাদা কালো ডানা মেলিয়া কেমন চক্রাকারে উড়িয়া চলিতেছে তাহাই একমনে দেখিতেছিল।

"রাণী!"

চমকিয়া পাশ ফিরিতেই রাণী যাহা দেখিল তাহাতেই সে আপনার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। ভাবিতে লাগিল সে, জাগিয়া আছে কি স্বপ্ন দেখিতেছে? কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটিয়া গেলে রাণী যতীশের উন্নত দৃষ্টির তলে আপনার ক্ষীণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া কহিল, "এতদিনে বুঝি ভগবানের দয়া হল? তোমাকে আমার বলবার কিছুই নেই, খালি এইটুকু প্রার্থনা যে, অনেক কষ্টই ত তোমায় দিয়েছি, তার জন্যে, এই শেষ দিনেও কি আমায় ক্ষমা করতে পারবে না?"

রাণীর কথা বোধ হয় যতীশের কাণেও যায় নাই। সে কেবল ভাবিতেছিল—এই কি তাহার সেই উপেক্ষিতা অনাদৃতা পত্নী!

রাণী ডাকিল—"দিদি?"

কল্যাণী আসিয়া কাছে বসিতেই, রাণী দিদির হাতখানা টানিয়া কপালে রাখিয়া বলিল, "এইবার চল্লুম ভাই! ' বড় কষ্ট দিয়ে যাচ্ছি, না দিদি? বাবাকে একবার ডাকনা দিদি।"

রজনীনাথ কাছে আসিতেই রাণীর শীর্ণ হাতখানা পিতার পায়ের ধূলা লইবার জন্যই যেন তাঁহার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। রাণী গভীর ঘুমে ঘুমাইয়া পড়িল। কল্যাণী রাণীর বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। যতীশ পলকহীন স্থির নেত্রে রাণীর সুপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

হায়রে অবোধ মানুষ। রাণী যে তার স্বামীকে চিরমুক্তি দিয়া তার অশান্ত আত্মা লইয়া শান্তির সন্ধানে অসীমের পথে যাত্রা করিয়াছে, কাঁদিয়া কি আর তাহাকে ফিরাইতে পারিবে?

শ্রীসূর্য্যমুখী দেবী।

"প্রতাপসিংহ"-এর গান। *

চতুর্থ গীত

[রচনা—স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

রেবা।

হাম্বির—মধ্যমান।

(ওগো) জানিস্ ত, তোরা বল্ কোথা সে, কোথা সে।
এ জগৎ মাঝে আমারে যে প্রাণের মত ভালবাসে।
নিদাঘ নিশীথে, ভোরে, আধ-জাগা ঘুমঘোরে,
আশোয়ারি তানের মত, প্রাণের কাছে ভেসে আসে।
আসে যায় সে হৃদে মম, সৈকতে লহরী সম,—
মন্দার-সৌরভের মত বসন্ত বাতাসে;
মাঝে মাঝে কাছে এসে, কি বলে' যায় ভালবেসে,
চাইলে পরে যায় সে মিশে ফুলের কোণে, চাঁদের পাশে॥

[স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

আস্থায়ী

০ ১
II{ নঃ নাঃ র্সঃ র্সাঃ। নর্সর্রর্সনা -ধনর্সনধা -পধনধপক্ষাপা গমা I
ও গো জা নিস্ ত ০ ০০০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ তোরা

২ ৩
I ধা -া ননা র্সা। নর্সর্রা র্সনা ধপক্ষা -পা }।
ব ল্ কোথা সে কো০০ থা০ সে০ ০ ০

০ ১
।{ সমা মঃ মাঃ মগমা। রর -রগরগা সন্া সা I
এ ০ জ গৎ মাঝে আমা ০ ০ ০ ০ রে যে

---

* "প্রতাপসিংহ"এর গানের স্বরলিপি ধারাবাহিকরূপে "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে, এবং নাটকান্তর্গত গানগুলি অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গীত হয়, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হইবে।

—লেখিকা।

২´.. ৩...
I নধা -পক্ষাপধা -পক্ষাপা গমা । ধনধা পধনর্সা -র্রসনধা -প পা }II
প্রাণে ০০০০ ০০র্ মত ভালবা সে০০০ ০০০০ ০০০

অন্তরা

০.. ১..
II{ পপা ধপা -ধনঃ -র্সা র্সঃ । র্সর্সা -ধনর্সা র্সঃ র্সাঃ I
নিদা ঘ০ ০০০ ০ নি শীথে ০০ ভো রে

২´ ৩
I নর্সনা ধা নর্রঃ র্রাঃ । র্সনা -র্সনর্সনা ধঃ পাঃ ।
আ০০ ধ আ০ গা ঘুম ০০০০ ঘো রে

০ ১..
। পঃ ক্ষাঃ পঃ পাঃ । মগগা -মগমগা রা সা I
আ শো য়া রি তানের ০০০০ ম ত

২´ ৩...
I নধা -পক্ষাপধা -পক্ষাপা গমা । ধনধা পধনর্সা -র্রসনধা -পক্ষাপা } ।
প্রাণে ০০০০ ০০র্ কাছে ভেসেআ সে০০০ ০০০০ ০০০

০ ১
। { সঃ রাঃ মমা মা । মঃ মাঃ মঃ মাঃ I
আ সে যার সে স্ব দে ম ম

২´ ৩..
I গমা গমা রগা রা । সরা -পা পঃ পাঃ ।
সই ক০ ত০ ল হরী ০ স ম

০ ১..
। মমা পা ধা পপা । মমা -মগমগা রা সা I
মন্ দা র সউ রভে ০০০র্ ম ত

২´ ৩
I নঃ সাঃ রা গা । সরা -সরগমা মা -া } ।
ব সন্ ত বা তা০ ০০০০ সে ০

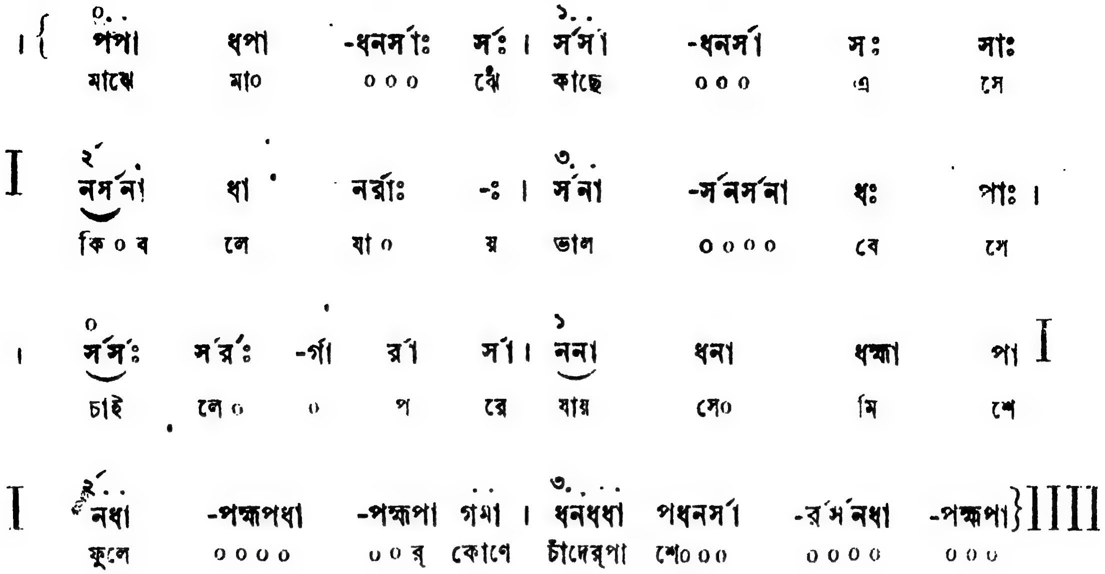

। { পপা ধপা -ধনর্সাঃ র্সঃ । র্সর্সা -ধনর্সা সঃ সাঃ
মাঝে মা০ ০০০ ঝেঁ কাছে ০০০ এ সে
I নর্সনা ধা নর্রাঃ -ঃ । র্সনা -র্সনর্সনা ধঃ পাঃ ।
কি০ব লে যা০ য় ভাল ০০০০ বে সে
। র্সর্সঃ র্সর্রঃ -র্গা র্রা র্সা । ননা ধনা ধক্ষা পা I
চাই লে০ ০ প রে যায় সে০ মি শে
I নধা -পক্ষাপধা -পক্ষাপা গমা । ধনধধা পধনর্সা -র্রর্সনধা -পক্ষাপা } IIII
ফুলে ০০০০ ০০র্ কোণে চাঁদের্পা শে০০০ ০০০০ ০০০

এ গানখানি বিভিন্ন অভিনয়ালয়ে যখন গাওয়া হয়, তখন দুইটি বিভিন্ন সুরে গীত হয় বলিয়া, অপর সুরটির স্বরলিপি পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

—লেখিকা।

কাশ্মীর-ভ্রমণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৭ই অক্টোবর—গত রাত্রির অসহ্য শীতের পর সকালবেলা উঠিয়া যখন দেখিলাম যে সেই একই ভাবে টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে তখন মন একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। চাকরের সহিত দুধ আনিবার জন্য বর্ষাতি চাপাইয়া বাহির হইলাম।

কেনালের ধার দিয়া যাইতে যাইতে দেখি যে একটি মুসলমান এই দারুণ শীতেও অবগাহন করিয়া স্নান করিতেছে। আমরা এ জলে নামিলে বোধ হয় তৎক্ষণাৎ ডবল নিউমোনিয়া হয়। বাজার ছাড়াইয়া আমরা একটা বস্তির মত জঘন্য পাড়াতে গোয়ালার বাড়ীতে পৌছিলাম। গোয়ালা অবশ্যই মুসলমান। একটি ঘোর অন্ধকার ঘরে ৮।১০টি গরু জাব খাইতেছে; ঘর খানিতে আলো এবং বাতাস দুইয়েরই প্রবেশ নিষেধ। গোয়ালা মহাশয় তাহারই এক কোণে বসিয়া এক মাটির হাঁড়িতে দুগ্ধ দোহন করিতেছেন। অনেক লোক দুধ লইতে আসিতেছে। প্রায় সকলেই মুসলমান এবং অধিকাংশের পায়েই উঁচু খড়ম। কদাচিৎ কেহ চামড়ার জুতা পায়ে দিয়াছে। মেয়েরা এবং অনেক পুরুষও ফেরণের আবরণে কাংরী লইয়া চলিয়াছে। ঘরখানি অন্যান্য ঘরের মত দেওয়ালের উপর কাঠের চাল এবং ঘোর অপরিস্কার।

বাসায় ফিরিতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল, আর সেই বৃষ্টি

শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা

চেনার বাগ—শ্রীনগর

ছাড়িল একেবারে অপরাহ্নে! তখন আকাশ একটু পরিষ্কার হইতেই দেখিলাম যে প্রায় ৪ মাইল দূরে গুপকর পাহাড়ও বরফে সাদা হইয়া গিয়াছে। শুনিতে পাইলাম যে গত রাত্রে শ্রীনগর সহরেও সামান্য তুষারপাত হইয়াছিল, তবে তাহা মাটীতে পড়িতেই গলিয়া গিয়াছিল। আজ আর বাহির হইলাম না, গল্প গুজবেই দিন কাটিয়া গেল।

১৮ই অক্টোবর—সকাল বেলা উঠিয়া দেখি আর বৃষ্টি নাই, আকাশও পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। চা-পান শেষ করিতে প্রায় ৯টা বাজিয়া গেল। তবুও বাহির হইয়া পড়িলাম।

শঙ্কর পর্ব্বত।

৯-২৫ মিনিটে পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। এখন বেশ রৌদ উঠিয়াছে। শঙ্করের তিনটি পাহাড়। রাস্তা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাধারণ পার্ব্বত্য পাকদণ্ডির ন্যায় উপরে উঠিয়াছে। প্রথম পাহাড়ের মাঝামাঝি উঠিয়া একবার পশ্চিমদিকে বিস্তৃত শ্রীনগর সহরখানি দেখিয়া লইলাম। এখান হইতে সহরের সমস্তই বেশ পরিষ্কার ও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে এবং মাঝে মাঝে অস্ফুট জনকোলাহলও কাণে আসিতেছে। ঝেলমের দৃশ্যটি এখান হইতে বড়ই সুন্দর। পাহাড়ের পাদদেশে অসংখ্য কবর, আর তাহার উপর একখানি করিয়া পাথর দিয়া চিহ্ন রাখা হইয়াছে। তাহারই মধ্যে কতকগুলি ভেড়া চরিতেছে। খানিকটা দাঁড়াইয়া পুনরায় উঠিতে আরম্ভ করিলাম। এ কয়েক দিনের বৃষ্টিতে রাস্তা কিছু পিচ্ছিল হইয়াছে, কোথাও বা উপর হইতে পাথরের টুকরা .ধসিয়া রাস্তা একেবারে বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। সন্তর্পণে লাঠিতে ভর দিয়া উঠিতে লাগিলাম। ৯-৫০ মিনিটে প্রথম পর্ব্বতের শিরোদেশে উপস্থিত হইলাম। শ্রীনগর এখন 'রিলিফ ম্যাপে'র মত হইয়া উঠিয়াছে। মানুষগুলি

পুতুলের মত দেখাইতেছে। বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে এক দিকে ঝোলম বৃহৎ অজগর সর্পের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে, অন্যদিকে হরিপর্ব্বত দুর্গ মস্তকে সদর্পে দাঁড়াইয়া আছে। পাঁচ মিনিট দাঁড়াইয়া একটু অন্যমনস্কভাবে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। এখান হইতে দ্বিতীয় পর্ব্বতে যাইতে কতকগুলি পাথরের সিঁড়ির মত আছে। এই পর্ব্বতটি অতিশয় প্রস্তরময়। হঠাৎ কিসের শব্দে চমকিয়া দেখি, ঝাঁকে ঝাঁকে তিতির পক্ষী আমার আগমন শব্দে পর্ব্বতগাত্র হইতে উড়িয়া পলাইতেছে। এই সুস্বাদু পক্ষীগুলিকে বধ করা নিষেধ আছে, নতুবা এতদিন ইহাদের চিহ্নও থাকিত না।

১৫ মিনিট চলিয়া দ্বিতীয় পর্ব্বতের মাথায় পৌছিলাম। এখন লোকজনগুলিকে নিতান্তই পুতুলের মত বোধ হইতেছে। পর্ব্বতের নিম্নেই বিস্তৃত ডাল হ্রদ, তাহার জলে অপর পারের পাহাড়ের ছায়া সুন্দর দেখাইতেছে।

দ্বিতীয় পর্ব্বত হইতে তৃতীয় পর্ব্বত বোধ হয় ২০০ ফিটের অধিক উচ্চ হইবে না, কিন্তু খানিকটা নামিয়া আবার উঠিতে হয়। এই পর্ব্বতের মাথায় উঠিতে আবার পূর্ব্বের মত সিঁড়ি। পর্ব্বতের মস্তকে দুর্গপ্রাকারের মত মন্দির প্রাকারের পাদদেশে পৌছিলাম। রেলিং ঘেরা একটি ছোট কাঠের সেতুর উপর দিয়া মন্দিরের চত্বরে ঢুকিতে হয়। পর্ব্বতের মাথা কাটিয়া বোধ হয় এই চত্বর প্রস্তুত হইয়াছিল। একটু ঘুরিয়া মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। পর্ব্বতের একেবারে মাথায় প্রকাণ্ড পাথর দিয়া এই মন্দির নির্ম্মিত। সম্মুখের খোলা যায়গায় আর একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। মন্দিরের সিঁড়ির নিকট পৌছিয়াই দেখি, ইংরাজীতে এক নোটিস None but

সজীর নৌকায় কাশ্মীরী রমণী

Hindus are allowed and shoes not allowed (হিন্দু ব্যতীত অন্য কাহারও প্রবেশ নিষেধ ও জুতা লইয়া যাওয়া নিষেধ)। আমাকে দেখিয়া উপর হইতে পুরোহিত বলিলেন 'আপ জুতি খোলকে আনে শকতে।' তখন জুতা খুলিয়া টুপি রাখিয়া একটি ক্ষুদ্র দরজার মধ্যে দিয়া পাথরেরর সিঁড়ি ধরিয়া একেবারে দরজায় উঠিয়া গেলাম। মন্দিরে মসৃণ কৃষ্ণ প্রস্তরের শিবলিঙ্গ স্থাপিত। মন্দিরের মাথাটা ইটের গাঁথনি। পুরোহিত বলিলেন যে মুসলমানেরা ঔরঙ্গজীবের সময় ইহা ভাঙ্গিয়াছিল, পরে কাশ্মীরের হিন্দু রাজা ইহার সংস্কার করেন। অপর যে ভগ্নস্তূপটি রহিয়াছে পুরোহিত মহাশয় বলিলেন উহা সারদার মন্দির ছিল। মুসলমানেরা উহা ভাঙ্গিয়া উহার উপর এক ইমারত প্রস্তুত করেন এবং তাহার নামকরণ করেন "তক্ত-ই-সলিমান।' সে ইমারতও আজ ভগ্নস্তূপে পরিণত। পুরোহিত আরও বলিলেন যে, কাল রাত্রি এখানে সামান্য তুষারপাত হইয়াছিল, কিন্তু তখনই তাহা গলিয়া যায়। উপরে তিনি একাকীই থাকেন। শীতের সময় পাহাড়ের মাথা বরফে ঢাকিয়া যায়। আরও সাধু সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহারা পাহাড়ের গায়ে থাকেন।

পাথরের কার্ণিশের উপর দিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলাম। পূর্ব্বোক্ত কাঠের পোলের উপর একটি পাথরের আর্চের গায়ে একটা বিরাট ঘণ্টা ঝুলিতেছে। ঘণ্টার গায়ে দেবনাগরী অক্ষরে লেখা রহিয়াছে 'সাধু কাপলানন্দ।' কে এই সাধু কাপলানন্দ বুঝিতে পারিলাম না।

দুইটি রমণী একটি উদূখলে ধান ভানিতেছে

এই কার্ণিশের উপর হইতে সমস্ত কাশ্মীর উপত্যকা দেখা যায়। পর্ব্বতের পাদদেশে হইতে দূরে পির পাঞ্জাল ও অন্যান্য উচ্চ পর্ব্বতরাজি পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমতলক্ষেত্র। কোথাও ফলের বাগান, কোথাও চাষবাস, কোথাও বা জলাভূমি। এই প্রান্তরের মধ্য দিয়া বক্রগতিতে ঝেলম কোথায় কোনদিকে যাইতেছে তাহা বুঝা যাইতেছে না। এ কয়দিন যে তুষারপাত হইয়াছে, আজ রৌদ্রের উত্তাপে তাহা গলিতেছে; সুতরাং চারিদিকের পর্ব্বতরাজি অনেকটা মেঘে ঢাকা।

কদাচিৎ সেই মেঘের ভিতর হইতে তুষারশৃঙ্গগুলি উঁকি দিতেছে। এ লুকোচুরি কবির চক্ষে দেখিবার মত।

নিম্নে বিস্তৃত ডাল হ্রদে ইতস্তত ভাসমান উদ্যান; আর কচিৎ দুই একখানা ক্ষুদ্র নৌকা চলাফেরা করিতেছে। হরিপর্ব্বতকে এখন নিতান্তই ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইতেছে।

আমি থাকিতে থাকিতেই একদল পাঞ্জাবী বালক ও যুবক আসিয়া পৌছিল। আজ আকাশ পরিষ্কার দেখিয়া অনেকেই বাহির হইয়াছে। পুরোহিত মহাশয়ের মুখ একটু প্রসন্ন হইয়া উঠিল—প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে।

প্রায় একঘণ্টা এখানে বসিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া সমস্ত দেখিলাম। তাহার পর নামিতে আরম্ভ করিলাম। বাম দিকে পর্ব্বত গাত্রে বিরাটাকৃতি কতকগুলি প্রস্তর বাহির হইয়া রহিয়াছে। সেগুলিতে শেওলা পড়িয়া ভয়ঙ্কর দৈত্যের মত দেখাইতেছে। পাহাড়ের গায়ে ভেড়া চরিতেছে, আর দুই তিনটি ক্ষুদ্র বালক তাহাদের সহিত অবলীলাক্রমে ছুটাছুটি করিতেছে। একটু পা সরিয়া গেলে ৫০০ ফিট নিম্নে পতন। কুড়ি মিনিট নামিয়া আসিলাম। পাহাড়ের নীচেই একটী ছোট বস্তি। নামিতেই একদল ছেলেমেয়ে 'সাহেব সেলাম' বলিয়া ঘিরিয়া হাত পাতিল। একটী বৃদ্ধাও আসিয়া তাহাদের সহিত যোগ দিল। আমি সকলকেই একটী করিয়া পয়সা দিয়া নামিয়া আসিলাম, তাহারা খুব আনন্দ করিতে লাগিল। আমিও সোজা রাস্তা ছাড়িয়া বস্তির রাস্তা ধরিলাম। অতি অপরিষ্কার কর্দ্দমাক্ত ছোট রাস্তা। লোকগুলিও বেজায় অপরিষ্কার। বাধ্য হইয়া পুনরায় বড় রাস্তায় ফিরিতে হইল। এখন বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। বহুলোক পথ চলিতেছে। ফুলের মত ছোট ছোট সুন্দরী বালিকারা রাস্তায় পাতা কুড়াইতেছে। এই পাতায় তাহারা শীতের জ্বালানি কাষ্ঠের

শালি কুটা বা ধান ভানা

ডাল হ্রদ—কাশ্মীর

কাষ চালায়। বাসায় ফিরিয়া আহারাদি করিয়া উঠিতেই দেখি যে Mr J. আসিয়াছেন। স্থির হইল এখনই বাহির হইতে হইবে এবং শিকার করিয়া ডাল হ্রদের মধ্য দিয়া "নিষাদ ও সালেমার বাগ" দেখিতে যাইব। তখনই বাহির হইয়া 'মাইসুমা' বাজারের মধ্য দিয়া ঝেলমের তীরে উপস্থিত হইলাম। এ কয়েক দিনের বৃষ্টিতে জল ঘোলা হইয়াছে এবং স্রোতও বাড়িয়াছে। তিন টাকায় চারিজন হাঁজি সমেত এক শিকারা ভাড়া করিয়া উঠিয়া বসিলাম।

১—৪৫ মিঃ মধ্যে মীর কদল (1st Bridge) হইতে নৌকা ছাড়িল। মহারাজার প্রাসাদ ও স্বর্ণমণ্ডিত মন্দিরের পাশ দিয়া তিন চার মিনিটে কেনালে পড়িলাম। কেনালের মধ্যে মাঝে মাঝে বাঁধা ঘাট, তাহাতে অনেক সুন্দরী বসিয়া কাপড় কাচিতেছে ও হাত পা ধুইতেছে। শরীরের যে অংশেই জল লাগিতেছে, তাহাই রক্তপদ্মের মত লাল হইয়া উঠিতেছে। কেনাল ক্রমেই চওড়া হইতে লাগিল। পার্শ্বে অসংখ্য উইলো বৃক্ষ—ইহারই শাখা দিয়া কাশ্মীরীগণ বেতের কাংরী ঝুড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত করে।

চেনার বাগ।

ডানদিকে জলের ধার দিয়া খানিকটা সমতল যায়গায় অনেকগুলি অতি সুন্দর ছায়াবহুল চেনার গাছ। মধ্যে মধ্যে ফাঁকা যায়গা—কোথাও বা ২।১ খানা বসিবার বেঞ্চ। আবার কোথাও নালি কাটিয়া জল লইয়া নৌকা যাইবার রাস্তা করা হইয়াছে। স্থানটি বেশ নির্জ্জন। দার্জ্জিলিংএর বার্চ্চহিলের মত শ্রীনগরের এই চেনার বাগ নাকি অবিবাহিত যুবক যুবতীর প্রেমাভিনয়ের স্থান।

খালের জলে ছোট ছোট নৌকায় ডাল হ্রদ হইতে তরিতরকারী আসিতেছে। ক্বচিৎ বা ২।১ খানা ডুঙ্গাতে এক একটি পরিবার ভাসিয়া আসিতেছে। সঙ্গে ২।১টা ছাগল। ক্রমে বড় বড় House Boat-এর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল।

২—১৮মিনিটে আমরা sluice gateএ পৌছিলাম। এইটির নাম 'ডাল দরওজা'—নামেই পরিচয়। এই দরওজা পার হইতেই পরিস্কার নীল জল। ডান দিকে শঙ্কর পর্ব্বত।

একটু দূরেই খালটি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা বামদিকের শাখা দিয়া চলিলাম। আর একটু দূরে আবার দুই শাখা!—আমরা বড়টা দিয়া সিধা চলিলাম। এখন চারিদিকেই ছোট ছোট শাখা, আর দুই পাশেই সব্জী বাগান। মাঝে মাঝে ২।১টি কৃষকের মৃণ্ময় কুটীর। ২।১টি কৃষকপত্নী ক্ষুদ্র নৌকায় সব্জী বোঝাই করিয়া সম্মুখে বসিয়া বৈঠা দিয়া নৌকা চালাইয়া আসিতেছে। এখন দুই পাশেই কৃষকদের ছোট ছোট বাড়ী, উত্তর বঙ্গের বিলের পাশের গ্রামের কথা মনে করাইয়া দিতেছে। পার্থক্য এই যে সেখানকার লোকগুলি কালো—আর ইহারা দেবকান্তি। মাঝে মাঝে ফলের বাগানও দেখা যাইতেছে।

এইবারে আমরা একটা বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের ভিতর দিয়া চলিতেছি। খালের গর্ভ হইতে সিঁড়ি একটি টিনের ডোমযুক্ত মন্দিরে উঠিয়া গিয়াছে। লেখা রহিয়াছে Fishing is strictly prohibited—মাছধরা নিষিদ্ধ। গ্রামখানি খালের দুইধারেই আছে। পারাপারের জন্য একটি ক্ষুদ্র সেতু আছে ২।১টি দোকানও আছে। গ্রামের নাম 'রেনওয়ারী'। পরীর মত সুন্দরী দুই একটি মেয়ে খালের পারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই গ্রাম ছাড়াইলেই হরিপর্ব্বত। ডান দিকে একখানি এতদ্দেশীয় House Boat বা ডুঙ্গা। তাহারই পাশে ২টি রমণী একটি উদুখলে ধান ভানিতেছে। ইহাদের ধান ভানিবার ভঙ্গিটি বড় সুন্দর। সেই কবি-বর্ণিত গোপাঙ্গনাদের দধি মন্থনের ন্যায়। কেমন একটা নৃত্যের ভঙ্গিতে এই সুগঠিত সুগৌর দেহলতা আন্দোলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে। দুটি যুবতী অতিশয় সুশ্রী। কাশ্মীর নর্ত্তকীর নাচ দেখিবার সাধটা এইখানেই মিটাইয়া লইলাম।

এখন ডান দিকে ডাল হ্রদের অপর পার্শ্বের পর্ব্বতরাজি ও তাহাদের পৃষ্ঠে সম্পতিত তুষাররাশি বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। মহাদেব পর্ব্বতের মস্তক বরফ গলিয়া ধুমায়মান বোধ হইতেছে।

ডাল হ্রদ।

প্রায় ৩টার সময় আমরা হ্রদে পৌছিলাম। প্রথমেই এক পদ্মবন। আর আশে পাশে কাশ্মীরের সেই প্রসিদ্ধ ভাসমান উদ্যান। গাছগাছড়া ভাসাইয়া

নিষাদ বাগ—কাশ্মীর

তাহার উপর মাটী চাপা দিয়া এই সমস্ত ভাসমান উদ্যান প্রস্তুত হইয়াছে। কালে আর সেই শুষ্ক গাছগাছড়ার চিহ্নও থাকে না, সমস্তটাই যেন একটি মাটির ভাসমান বাগান বলিয়া বোধ হয়। এখন ঠাণ্ডা বাতাসে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। যদি একখানা র‍্যাগ আনিতাম! ডালের জল অতি স্বচ্ছ, নীচের সমস্ত জলজ উদ্ভিদ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

হ্রদের প্রথম খণ্ড পার হইতেই আর একখানি গ্রাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ আর রৌদ্র উঠিল না। মাঝি বলিল, "ডাল্‌মে ধুপ হোনেসে মজা হ্যায়। ধুপ হোনেসে কিন্ আনা হুজুর।" বামদিকে এক বিরাট সুন্দর চেনার বৃক্ষ। একখানা সুন্দর বাংলো ছাড়াইয়া হ্রদের দ্বিতীয় খণ্ডে পড়িলাম। দুই ধারেই পদ্মবন, এখন পদ্ম নাই কেবল পাতাই আছে। এইবারে বিস্তৃত পরিষ্কার জলরাশি চারিদিকে পাহাড়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পাহাড়ের তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গগুলি এই স্বচ্ছ জলে প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব্ব সুন্দর দৃশ্যের অবতারণা করিতেছে।

দূরে বাম পারে একখানি গ্রাম। মাঝি বলিল ঐ গ্রামই 'হজরত বাগ'। মুসলমানদের বিশ্বাস যে এখানকার মসজিদে হজরত মহম্মদের কেশ রক্ষা করা হইয়াছে। মেলা উপলক্ষে তাহা প্রদর্শন করা হয়। এ তাহাদের এক পবিত্র তীর্থ।

আর খানিকটা গিয়া একটি অতিক্ষুদ্র দ্বীপ—পাথরে বাঁধান একটু যায়গা আর ৫।৬টি চেনার বৃক্ষ। এটা 'রূপ লঙ্কা'। অপর পাশে এইরূপ আর একটি দ্বীপ আছে তাহার নাম 'সোনালঙ্কা'। পদ্মবনের মধ্য দিয়া সরু রাস্তা ধরিয়া আমরা চলিতেছি। কতকগুলি ছোট ছোট হাঁসের মত পাখী হ্রদের জলে ভাসিতেছে। নৌকা দেখিয়া ডুবিয়া বোধ হয় পদ্মবনের মধ্যে চলিয়া গেল। ২।৩ মিনিট আমি লক্ষ্য করিলাম, কিন্তু তাহারা উঠিল না। বোধ হয় পদ্মবনের মধ্যে গিয়া ঠোঁট বাহির করিয়া ডুবিয়া রহিল।

ক্রমে হ্রদ পার হইয়া একটি সরু খালে ঢুকিলাম। দুই দিকেই কতকগুলি "পরিবার নৌকা" রহিয়াছে। খাল ক্রমেই সরু হইতে লাগিল। দুই দিকেই উইলো বা বেতের বন।

সালেমার বাগ।

এইখানে নৌকা রাখিয়া আমরা তীর ধরিয়া একটি সুন্দর রাস্তায় উইলো বনের পাশ দিয়া চলিলাম। খানিক গিয়াই চেনার বৃক্ষের সারি। প্রায় ৩ মাইল গিয়া আমরা বিখ্যাত সালেমার বাগানে পৌছিলাম। সম্রাট শাজাহান এই সুন্দর বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। লাহোরের সালেমার বাগান দেখিয়াছি। এ বাগানও সেইরূপ এক এক চত্বর করিয়া উপরে উঠিয়াছে। মধ্য দিয়া একটি বাঁধান নহর। এক একটি চত্বরের শেষে এক একখানি ঘর। তৃতীয় চত্বরের শেষে একখানি বৃহৎ দরবার ঘর। এই ঘর মসৃণ কৃষ্ণ প্রস্তরে প্রস্তুত, ছাদে নানা রংএর কারুকার্য্য। এই ঘরের চারিদিকে অসংখ্য ফোয়ারা। ইহার পরের চত্বর অনেকটা উঁচু। সকলের শেষে দেওয়াল। তাহার পর মাঠ পর্ব্বতগাত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ইহার একটু পরেই শুপকর ও মানসবলের পর্ব্বত বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। মধ্যে একটি ক্ষুদ্র নদী। বাগানে ঘাসের মধ্যে ২।৪টি daisy ফুল দেখা যাইতেছে। যে মাসে এই সমস্ত ফুটিয়া সমস্ত বাগান বরফের মত সাদা করিয়া ফেলে। চারিদিকে এখনও অগণিত season flower, আর মধ্যে মধ্যে কাশ্মীরের প্রধান সৌন্দর্য্য চেনার বৃক্ষ। চারিদিকে একটু দূরেই উচ্চ পর্ব্বতমালা স্থানটিকে বড় মনোরম করিয়াছে। আমরা ফিরিয়া নৌকায় উঠিলাম।

নিষাধ বাগ।

নৌকা আবার পদ্ম বনের মধ্য দিয়া বিভিন্ন পথে নিষাধ বাগের দিকে রওনা হইল। মাঝে মাঝে যেখানে শেওলা পদ্ম নাই, সেখানে হ্রদের জলে উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের ছবি বড়ই সুন্দর দেখাইতে লাগিল। অনেক কৃষক নৌকা করিয়া পদ্মের মৃণাল তুলিয়া লইতেছে। এগুলি তরকারী হিসাবে বাজারে বিক্রয় হয়। হ্রদের জলের ৩।৪ ইঞ্চি নীচে হইতেই জলজ উদ্ভিদ ও শেওলা।

এই বারে আমার হ্রদের মধ্যেই কিনারা হইতে ৫।৬ শত গজ দূরে একটি সরু রাস্তার নিকট পৌছিয়া একটি খিলানের ভিতর দিয়া রাস্তা পার হইয়া কিনারার দিকে চলিলাম।

৫—৩০ মিনিটে নিষাধের ঘাটে নৌকা লাগিল। হ্রদের পারেই রাস্তা। রাস্তা পার হইতেই প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানাবলী দিয়া উঠিয়া একখানি দ্বিতল গৃহ। তাহার পর হইতেই বাগান চত্বরে চত্বরে উঠিয়া গিয়াছে। নিষাধ, সালেমার অপেক্ষা বৃহৎ এবং সুন্দরও বটে। জলের উপর এক চত্বর হইতে অপর চত্বরে পড়িতে নানা ভঙ্গীতে নামিয়া নূতন নূতন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতেছে।

প্রতি রবিবার এখানকার নহর ও জলের ফোয়ারা খোলা থাকে। কিন্তু কি জানি কেন আজও কতক ফোয়ারা খোলা ছিল। ক্রমে উঠিতে উঠিতে যেমন পর্ব্বত গাত্রের দিকে অগ্রসর হইতেছি, অমনি সঙ্গে সঙ্গে ফুলের বাগান ফলের বাগান ও পরে বৃহৎ চেনারের বাগানে পরিণত হইয়া পর্ব্বতের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে। ফলতঃ নিষাধ বাগ সেই সৌন্দর্য্য-প্রিয় সম্রাটের এক অক্ষয় কীর্ত্তি। কোথাও গম্ভীর মহান বিরাট চেনার শ্রেণী, আবার কোথাও বা অগণিত ফুলে ফুলে বাগান আলোকিত। নিম্নে বিস্তৃত ডাল হ্রদ, আর পশ্চাতে উন্নত তুষার মণ্ডিত শৃঙ্গ।

বাহির হইতেই একটি মালী-বালক দৌড়িয়া আসিয়া ২টি তোকে ও সেলামের বদলে দক্ষিণা লইয়া বিদায় হইল। বাহির হইয়া নিকটবর্ত্তী একটি দোকান হইতে কিছু ফলাদি লইয়া নৌকায় ফিরিলাম। পুনরায় সেই খিলানের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া বৃহত্তর ডালে পৌছিলাম। সন্ধ্যার ছায়া তখন সুন্দর ডালের পদ্মবন ও জলের উপর ঘনাইয়া আসিতেছে।

আমার সঙ্গী হাজিদের সহিত গল্প আরম্ভ করিলেন। হাঁজিরা আমাদিগকে বোধ হয় মুসলমান সাব্যস্ত করিয়া 'পণ্ডিত'দিগের নিন্দা করিতে লাগিল। বলিল যে দরকার হইলে তাহারা ভাল হাউসবোট 'মজাকাওয়াস্তে "চিজ বিচ" সহকারে হুজুরকে ভাড়া দিতে পারে। তাহারা আরও বলিল যে পণ্ডিতানী অপেক্ষা কাশ্মীরী অর্থাৎ মুসলমানী অনেক সুশ্রী। পরে বুঝিয়াছি যে তাহাদের এ বক্তৃতার উদ্দেশ্য ছিল—কিন্তু সফল হইবার সম্ভাবনা না থাকায় বাধ্য হইয়া তাহারা নিবৃত্ত হইল।

আমরা সোজা শঙ্কর পর্ব্বতের দিকে চলিতে লাগিলাম। হাজি বলিল, বামদিকের দ্বীপটির নাম সোনালঙ্কা, এবং "বাদশা হওয়া খানেকো ওয়াস্তে এ দোনো লঙ্কা বানায়া।" আর ঐ যে পরীমহল, "উস্‌মে বাদশাকা হরেক কিসমকা আওরৎ থি।" একজনের জন্য এক এক মহল ছিল। ডালের এই তৃতীয় অংশটাও নিতান্ত কম নয়। এখানে পদ্মবন নাই, জল অতি পরিস্কার।

এখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। আমরা ডাল অতিক্রম করিয়া কেনালে পড়িলাম। শীতে হাত পা জমিয়া যাইবার উপক্রম বুঝিতে পরিয়া হাঁজিরা তাহাদের লুই দিয়া আমাদের ঢাকিয়া দিল। হাউস বোট হইতে নিঃসৃত আলোক ব্যতীত আর চারিদিকেই অন্ধকার। আর একটু যাইয়া আমরা আবার ডাল দরওজায় পৌছিলাম। আরও আধ ঘণ্টা চলিয়া নৌকা আলোকোজ্জ্বল প্রাসাদের সম্মুখে ঝেলম বক্ষে পড়িল। ৭—২৫ মিনিটে মীরাকদলের সম্মুখের ঘাটে নামিয়া বাজারের মধ্য দিয়া বাসায় পৌছিলাম।

১৯শে অক্টোবর—কাল বড় বেশী ভ্রমণ হইয়াছিল। তাই আজ সকাল বেলা আর বাহির হইলাম না। একেবারে স্নানাহার সারিয়া বেলা ১২টায় বাহির হইলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে রৌদ্র উঠে নাই। সুতরাং শীতও বেশী।

Mr. J.র বাড়ী 'জম্মু'। ইতি ডোগরা জাতীয়। উভয়ে একত্রে যাইতে বৃষ্টি হইবার উপক্রম দেখিয়া বাজারের মধ্যে তাঁহার বাসায় উঠিলাম।*

শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়।

---

* গত সংখ্যায় প্রকাশিত অংশে ১১১ পৃষ্ঠায় 'মানস বন' স্থলে 'মানসবল' ও ১৭৮ পৃষ্ঠায় M r. I.স্থলে Mr J. এবং কেবল' স্থলে কেমণ হইবে।

হেমচন্দ্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

‘স্মৃতিসুখ’ ও ‘ব্রজবালক’ শীর্ষক কবিতাদ্বয়ে খাঁটি স্বদেশী ভাব পরিলক্ষিত হয়। হেমেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, “এদেশে লোক কথায় বলে ‘কানুবিনা গীত নাই, এদেশে বিদ্যাপতি হইতে বহু কবি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা গান করিয়াছেন। সে প্রেমকাহিনী বাঙ্গালীর বড় প্রিয়; ইহাকে দুর্ব্বলতা বলিতে হয় বল। জাতীয় কবি হেমচন্দ্রের কবিতায় এই দুর্ব্বলতার চিহ্ন দেখিয়াছি; ‘সুহৃৎ সমাগম’ শীর্ষক কবিতায় পড়িয়াছি, “শ্যামের বাঁশীতে যমুনা উজান,—বহিল উল্লাসে ভাসায়ে কূল। ‘চিত্তবিকাশে’ একাধিক কবিতায় এই ‘জাতীয় দুর্ব্বলতা’ প্রকাশিত হইয়াছে—’

মোহন মূরতি চিকণ কালা,
রূপের ছটায় জগ উজলা।

* * *

যাহার মধুর বাঁশীর তানে
যমুনার জল চলে উজানে।”

হেমেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, “কল্পনা” শীর্ষক কবিতায় কবি কল্পনার অতি মোহন চিত্র আঁকিয়াছেন—

চাঁদের মণ্ডল হতে
উঠিছে আকাশ পথে,
অসীম মাধুরী অঙ্গে পড়িতেছে ঝরি

* * *

বিচিত্র বসন পায়,
ইন্দ্রধনু শোভা পায়
বিবিধ বরণে ফুটে কিরণে খেলায়।
যেখানে উদয় হয়—
সুগন্ধি মলয় বয়,
অঙ্গের সৌরভে দিক আমোদে পুরায়।

তাঁহার অসাধারণ প্রভাব। কবি বলিয়াছেন,—

এহেন প্রভাব যার
প্রসাদ লভিতে তার
কি দুঃখ এ জগতের-ভুলিতে না পারি!
প্রতিদিন কল্পনারে
পাই যদি পুজিবারে
নিরানন্দ মাতৃভূমি চিরানন্দ করি।
এ চির মনের সাধ
মিটিল না অপরাধ
লয়োনা দুঃখিনী মাগো দৈব প্রতিকূল,
কমলা ঠেলিলা পায়,
রোষ কৈল সারদায়,
শুষ্ক আশাতরু মম বিনা ফল ফুল।

কল্পনা তাঁহাকে প্রসাদ হইতে বঞ্চিত করেন নাই, পরন্তু যে ‘অপার্থিব ধন’ দিয়াছেন, ‘রাজ্য বিনিময়ে আহা! কেঁহ নাহি পায় তাহা’ কবি তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীদিগকে প্রচুর আনন্দ দান করিয়াছেন। আশা করি, এখন এই কর্ম্মশ্রান্ত জীবনের নানা কার্য্য হইতে অবসর লইয়া তিনি কবিতার সেবায় তাঁহার নিরানন্দ মাতৃভূমি চিরানন্দময় করিবেন।”

‘চিত্তবিকাশে’র শেষ কবিতাটির নাম “কবিতাসুন্দরী।” প্রভাতকুমার বলেন, “উহা মূর্ত্তিমতী কবিতাদেবীর বর্ণনা—

অশোকের তলে, যেন শশী জলে,
হেন রূপবতী নারী
ভাবিছে একাকী করে গণ্ড রাখি
অপূর্ব্ব শোভা প্রসারি।

“হেমবাবু কবিতাসুন্দরীকে অশোকতরুতলে কল্পনা করিয়াছেন। কাব্যসাহিত্যে অশোকতরুর একটু প্রাচীন সম্মান আছে। কবিতার মহীয়সী কন্যা সীতাদেবীকে অনেক দিন হইতে আমরা মানস চক্ষে অশোকের তলে দেখিয়া আসিতেছি। উপরে উদ্ধৃত

পংক্তিগুলি পাঠ করিয়াই আমার মনে ত অবনতমুখী, অশ্রুনয়না জনকনন্দিনীর ছবি উদিত হইয়াছিল। হেমবাবু কবিতাসুন্দরীকেও সেইখানে আনিয়া বসাইয়াছেন। মায়ে ঝিয়ে অপূর্ব্ব সম্মিলন হইয়াছে। ইহার পর শকুন্তলাসুন্দরীর একটু বর্ণনা আছে। "সুনিবিড় কেশ" তাঁহার পৃষ্ঠদেশ ঢাকিয়া "ছড়ায়ে পড়েছে এলা"। নব তৃণদলের কোমল আসনে তিনি পা দুখানি মেলিয়া দিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার চারিদিকে কত না শোভা কত না সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়াছে। এই বর্ণনা সংস্কৃত সাহিত্যের শান্তরসসিক্ত তপোবন-বর্ণনাগুলি স্মরণপথে আনয়ন করে। 'আবৃত রঞ্জিত লোমে' মনোহর তনু কত বনচর নির্ভয়ে সুখে দূরে ও সন্নিধানে অবিরত ভ্রমণ করিতেছে। হরিণীসুন্দরী আপনার শিশুটি লইয়া নৃত্য করিতেছে। করিণী পদ্মের মৃণাল তুলিয়া শাবক-মুখে দিতেছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। সে স্থানে চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক শোভাও অতি মনোহর—

সেথা পরকাশে— প্রমত্ত উল্লাসে
কবিপ্রিয় ঋতুচয়,
বসন্ত, বরষা, সরস সুরসা
শরৎ সৌন্দর্য্যময়।
নিকটে উদ্যান অতি রম্য স্থান,
দেবতা গন্ধর্ব্ব ভুলে,
সুগন্ধে মোদিত সদা সুশোভিত
নানাজাতি তরু ফুলে।
ফুল রেণু গায় সদা জমে তায়
মন্দ মন্দ সমীরণ।
আকাশে সৌরভ, মাটীতে সৌরভ,
সুগন্ধ বর্ষে কোন।
গাছে মধু ক্ষরে, লতা পত্রে ঝরে,
উড়ে ভৃঙ্গ মধুকর।
সুষমা সুঘ্রাণ ভরিয়া উদ্যান
গন্ধে ভরা সরোবর।
সে দেব উদ্যানে মহিমা কে জানে,
নিত্য চন্দ্রোদয় হয়।
নিত্য ষোল কলা শশাঙ্ক উজ্জ্বলা
চির জ্যোৎস্না ফুটে রয়
ভ্রমে কত সেথা, অপ্সর বনিতা,
গীত বাদ্য নৃত্য করি।
কত নিরজনে, নির্ঝর দর্পণে,
নিজ নিজ বিম্ব হেরি।"

হেমেন্দ্রপ্রসাদ বলেন, "এই মধুর কবিতার শেষাংশ বড় করুণ, বড় বিষাদময়। ভক্তকবি বিপদে—বিষাদে আরাধ্যা কবিতাকে বলিতেছেন,—

অয়ি নিরুপমে, মম হৃদিধামে,
বাসনা আছিল কত
তব আরাধনা, তোমার সাধনা,
করিব জীবন-ব্রত।
ভুলে নিজ ভ্রমে, বৃথা পরিশ্রমে,
জীবন ফুরায়ে এল।
না লভিনু ধন, না সাধিনু পণ,
দুকূল ভাসিয়া গেল।
এবে নহে সাধে, পড়িয়া বিপদে,
আবার তোমারে ডাকি,
হয়োনা নিদয়া, কর দাসে দয়া,
ভক্ত বলে মনে রাখি,
তুমি ক্ষেমঙ্করী, নিজে ক্ষমা করি,
ভুলনা মায়ের মায়া
ক্ষমি অপরাধ, পুরাইও সাধ,
দিও দেবি পদছায়া।

"মধুসূদনের জন্য বিলাপগীতিতে কবি বলিয়াছিলেন—

হায় মা ভারতী, চির দিন তোর,
কেন এ কুখ্যাতি ভবে?
যেজন সেবিবে, ও পদযুগল
সেই সে দরিদ্র হবে।

"আমরাও কবির কথায় কবিতাদেবীকে বলি,—

কেমনে কহগো দেবী অনলের তাপে
তাপিবে ও কলেবর আশৈশব নিরন্তর
স্নেহে ভিজায়েছ যায়!

"শারীরিক কষ্ট বা দারিদ্র্যপীড়ন জগতের যাতনা—প্রতিভা স্বর্গের আলোক। জগতের যাতনায় স্বর্গের আলোক হীনপ্রভ হয় না। অন্ধ কবি মিল্‌টন হৃদয়ের

ভাব "কবিতা তরঙ্গে ঢালি" বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। কবি বলিয়াছেন, কবিতার প্রসাদ পাইলে 'নিরানন্দ মাতৃভুমি চিরানন্দ করি'। আশা করি, কল্পনার প্রসাদে তাঁহার সে বাসনা পুর্ণ হইবে।"

কাব্যামোদী ব্যক্তি মাত্রেই চিত্তবিকাশ পাঠে এক দিকে যেমন হেমচন্দ্রের গীতিকবিতার ক্ষেত্রে পুনরাবির্ভাব দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন, অপর দিকে তেমনই তাঁহার শেষ জীবনের অশান্তি ও দুঃখের পরিচয় পাইয়া ব্যথিত হইয়াছিলেন। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্তবিকাশ পাঠ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

Narikeldanga
21 Jany. 1899.

My Dear Hem Babu

I beg to acknowledge with thanks the receipt of your kind present of a copy of your চিত্তবিকাশ। The poems collected in this volume are the effusions of a truly noble and poetic mind amid the trials of life. They not only delight and edify the reader as all your other writings do, but they also have a highly chastening effect on the mind. Your songs of sorrow will be a lasting lesson to your countrymen amidst prosperity and adversity.

Deeply sympathising with you in your hour of tribulation

I remain, Yours sincerly
Gooroo Dass Banerjee.

হেমচন্দ্র কবিতার ক্ষেত্র হইতে এক প্রকার অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে অন্ধাবস্থায় তিনি যে পুনরায় 'চিত্তবিকাশে'র ন্যায় কাব্যগ্রন্থ রচনা করিবেন ইহা কেহ আশা করেন নাই। চিত্তবিকাশ প্রকাশের সহিত বঙ্গীয় পাঠক সমাজে নূতন আশার সঞ্চার হইল। প্রভাতকুমার লিখিয়াছেন, "আমরা ত হেমবাবুকে খরচের খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলাম বলিলেই হয়। কিন্তু চিত্তবিকাশ পাঠ করিয়া হেমবাবুর সম্বন্ধে আবার আমাদের হৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার হইল। বুঝি বা তাঁহার বীণা আবার সেকালের সুরে ঝঙ্কার দিবার আয়োজন করিতেছে।" বাহিরের আলোকের অভাব সত্ত্বেও তিনি যে অন্ধকবি মিল্‌টনের ন্যায় হৃদয়ের আলোকের সাহায্যে দেশবাসীকে নূতন অদৃষ্ট জগতের শোভা দেখাইতে পারিবেন এ আশা অনেকেই করিয়াছিলেন। সুকবি বরদাচরণ মিত্র লিখিয়াছিলেন—

বৃত্রসংহারের কবি! এ বৃদ্ধ বয়সে
আবৃত কি অন্ধকারে ও মুগ্ধ নয়ন?
সে তিমির ব্যূহ ভেদি নাহি কিগো পশে
আলোকের শরজাল—শোভার শ্রাবণ
বিদারি উদার গর্ব্বে হৃদি-শতদল
কাঁপাইয়া তায় তীব্র সুখের বেদনে
উৎসারি শতেক রন্ধ্রে কবি-পরিমল—
রকত উচ্ছ্বাস শত উষ্ণ প্রস্রবণে?
কি কঠোর পরিতাপ! কিম্বা দেখ স্মরি
শ্বেতদ্বীপ-মহাকবি-জীবন কাহিনী
বাহিরের সূর্য্য যবে আলো নিল হরি,
ভাতিল সে মহানিশা চিৎ-সৌদামিনী।
নয়ন সসীম দেখে মায়িক অসার,
আলোকের পূর্ণভাই মহান্ আঁধার।

কিন্তু বাঙ্গালী পাঠকগণের এ আশা সফল হয় নাই। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ যেমন নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে একবার জ্বলিয়া উঠে, হেমচন্দ্রের প্রতিভাপ্রদীপও নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে এই একবার মাত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

পুলিসের গল্প

গৌহাটির কথা (৪)

চৈত্রের 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রমোহন লাহিড়ী মহাশয়ের নামের স্থলে ভ্রমক্রমে মনোমোহন লাহিড়ী হইয়া গিয়াছিল। বৈশাখ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী মহাশয় এই ভ্রম প্রদর্শন করায় আমি তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। মহেন্দ্র বাবু ও মনোমোহন বাবু উভয়েই আমার সুপরিচিত। অথচ তাঁহাদের নাম উল্‌টা পাল্‌টা হইয়া গিয়াছে। বৈশাখের পত্রিকায় মেরুদেশ ভ্রমণ কারী Amundsen এর নামটা আনন্দ সেন হইয়া গিয়াছে।

নামে ভুল হওয়া সম্বন্ধে একটা হাস্যকর দৃষ্টান্ত দিতেছি। গৌহাটি জেলার মধ্যে আমরাঙা নামে একটা গ্রাম আছে। আমি এই নামটা অবগত হওয়ার পর, এই ছাব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত কামরাঙা ফলের নামটা কামরাঙা কি আমরাঙা ইহা ঠিক করিয়া লইতে আমাকে এখনও একটু ভাবিতে হয়।

আমরাঙাতে একজন অতি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ গোস্বামী ছিলেন। তিনি এবং তাঁহার যুবক পুত্র উভয়েই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। আমি তাঁহাদের নাম ভুলিয়া গিয়াছি। একবার গোস্বামী মহাশয় জঙ্গলে গিয়া দাঁতের লোভে একটা বড় বন্য হস্তীকে গুলি করিয়া বধ করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে একটা মকদ্দমা উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। আমি তাহা তদন্ত করিবার জন্য আমরাঙায় গিয়াছিলাম। এরূপ মকদ্দমা ঘটনার ছয় মাস পরে চলিতে পারে না। আমার যতদূর মনে আছে, গোস্বামীর বিরুদ্ধে যে মকদ্দমা হইয়াছিল তাহাও সময়াতিক্রম হওয়ায় চলে নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট দাঁত দুইটা বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। বিনাযুদ্ধে করী বধ নিষিদ্ধ ও পাপকার্য্য—সে সম্বন্ধে গোস্বামীর সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। সেই পাপের জন্য তিনি প্রায়শ্চিত্তও করিয়াছিলেন। হাতীটা মারিয়া তিনি বাস্তবিকই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। গুলি করিবার পর হাতীটার অবস্থা দেখিয়া তিনি অনেক অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন ইহা আমি তদন্ত কালে জানিয়াছিলাম।

আমরাঙার পণ্ডিত গোস্বামীর কথায় গৌহাটির আরও কয়েকটি পণ্ডিতের কথা মনে পড়িল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নামোল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। তিনি একজন প্রকৃত ধার্ম্মিক এবং কর্ম্মবীর। ভগবদ্গীতায় উক্ত আছে যে ভাল করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাই ধর্ম্ম—"যোগঃ কর্ম্ম সুকৌশলম্।" অথবা "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।" মনুষ্য সামাজিক ও পারিবারিক জীব। সুতরাং সমাজের প্রতি এবং পরিবারের প্রতি তাহার কর্ত্তব্য সাধন করিলেই ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য করা হইল। জয়চন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় সর্ব্বদা প্রফুল্লভাবে সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করেন; সমাজের দীন দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, এবং সমাজের আনন্দ বর্দ্ধন জন্য সর্ব্বপ্রকার বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদে যোগ দেন। পারিবারিক সুখ বৃদ্ধির জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেন এবং সন্তানদিগকেও সেইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার বাড়ী ঘর কেবল পুত্রদের সাহায্যে স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স বোধ হয় এখন আশী বৎসর হইবে। অথচ এই বয়সে মিস্ত্রীর সাহায্য না লইয়া, গত এক বৎসরের মধ্যে বড় একখানা ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পুত্রেরাও সকলেই কৃতবিদ্য হইয়াছে। তাঁহার দুই কি তিনটি পুত্র ব্রাহ্ম হইয়াছেন, এবং বোধ হয় একজন বিলাতে গিয়াছেন। এই জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে খেদ করিতেন এবং বলিতেন যে তিনি এবং তাঁহার বংশের সকলেই নিষ্ঠাবান হিন্দু, অথচ তাঁহার

পুত্রেরা হইয়া গেল ব্রাহ্ম। আমি তাঁহাকে এক দিন বলিলাম, "তা হলে ত আপনার ছেলেরা দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।" তিনি এই আমোদটা খুব উপভোগ করিলেন।

আর একজন ধর্ম্মবীর গৌহাটিতে ছিলেন, তাঁহার নাম কৈলাসচন্দ্র সেন। শুনিয়াছি তিনি লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ সেই সম্পত্তি পাইবার জন্ত জ্ঞাতিদিগের সহিত কিছুমাত্র বিরোধ না করিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু একথা তিনি আমাকে কখনও বলেন নাই। তাঁহার মত সত্যপরায়ণতা আমি অল্পই দেখিয়াছি। তেজস্বিতা ও সাহস এবং উপচীকির্ষাও তাঁহার অসাধারণ। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার উপযুক্ত পত্নী ছিলেন। পতি পত্নী উভয়েই শিক্ষকতা করিতেন। কৈলাস বাবু সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী এবং অতি সুকণ্ঠ। অল্পদিন হইল তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হইয়াছে। কৈলাস বাবু এখন মুক্তাগাছার গুণগ্রাহী রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুরের বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি ব্রাহ্ম হইলেও এখনও মধ্যে মধ্যে আমাকে প্রীতিপূর্ণ পত্র লিখিয়া থাকেন। এরূপ কথা লিখিবার হেতু এই যে, আমি স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছি যে যাঁহারা ব্রাহ্ম, যাঁহারা গীতা পাঠ করেন, এবং যাঁহারা শ্রীহট্টজেলাবাসী—তাঁহারা কাহাকেও বড় একটা পত্রাদি লেখেন না। কৈলাস বাবুর সম্বন্ধে আমি আরও দুই একটা কথা পরে বলিব।

মফঃসলের এক পাঠশালায় একজন পণ্ডিত ছিলেন; একদিন তাঁহার ছাত্রেরা একখানা বইয়ে পড়িল যে "প্রবল প্রভঞ্জন কর্ত্তৃক বনের অনেক বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইল।" তাহারা পণ্ডিত মহাশয়কে প্রভঞ্জন শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিল। পণ্ডিত মহাশয় স্থানটা পড়িয়া বলিলেন, প্রভঞ্জনের অর্থ হাতী। ইহার পর সকলেই তাহাকে প্রভঞ্জন পণ্ডিত বলিয়া ডাকিত। ইহাতে তিনি উত্যক্ত হইয়া কার্য্য ত্যাগ করিলেন।

গৌহাটির নলবাড়ী ও পলাসবাড়ী অঞ্চলে নানা স্থানে সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইত। কিন্তু পুলিস কর্ম্মচারীর সহিত সরস্বতীর দলাদলি চিরপ্রসিদ্ধ। সুতরাং সেই দেবতার অধিষ্ঠিত কোন স্থানেই আমার যাওয়া ঘটে নাই। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় ধীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। সংস্কৃত বেদ ভিন্ন অন্য বহু শাস্ত্রে তাঁহার বহু দর্শন ছিল। সর্ব্বদা সকলের সঙ্গে সংস্কৃতে কথা কহিতে ভালবাসিতেন। যাঁহারা অতি অল্পও সংস্কৃত জানিতেন, তাঁহাদের সঙ্গেই তিনি সংস্কৃতে কথা কহিতেন। তাঁহার সংস্কৃত উচ্চারণ প্রায় সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ছিল। ঋ, ণ, ং এবং বিসর্গের উচ্চারণ তিনি ঠিক করিতেন —যাহা বাঙ্গালীরা মোটেই করিতে পারেন না বলিলেই হয়! কিন্তু কখন কখন স স্থলে শ উচ্চারণ করিতেন। তিনি ছন্দ সম্বন্ধে একখানি অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। অতি দ্রুতভাবে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। বালকের মত সরল ছিলেন। আসামের বাহিরেও একাধিক স্থানে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। অল্পদিন হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

আসামে স্থানে স্থানে সংস্কৃত বিদ্যার চর্চ্চা হয় বটে, কিন্তু আসামীদের সংস্কৃত উচ্চারণ বাঙ্গালীদের সংস্কৃত উচ্চারণ অপেক্ষাও বিকৃত এবং অপকৃষ্ট। ভালর মধ্যে এই যে আসামীরা কতক পরিমাণে বিসর্গের উচ্চারণ শুদ্ধরূপে করিতে পারেন, যাহা বাঙ্গালীরা মোটেই পারেন না,—বরং বিসর্গের শুদ্ধ উচ্চারণ কেহ করিলে সেই উচ্চারণকারীকে ঠাট্টা করিয়া থাকেন।

কিন্তু পণ্ডিত নামে অভিহিত না হইয়াও, গৌহাটিতে এমন একজন বাঙ্গালী ছিলেন যাঁহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল। চন্দ্রমোহন গোস্বামী মহাশয় প্রথমে একষ্ট্রা অ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনর ছিলেন। পরে ইচ্ছা করিয়া সে কার্য্য ত্যাগ করিয়া, শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করিয়া প্রথমে ডেপুটি ইনস্পেক্টর, পরে হেডমাষ্টার হইয়াছিলেন। ইংরাজী সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। তিনি

চারি বৎসর হইল মারা গিয়াছেন। ভূমিকম্পের দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি পেন্সন লইয়া, মৃত্যু পর্য্যন্ত গৌহাটিতেই ছিলেন। আসামে তাঁহার মত বিদ্বান কেহ নাই বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। বাস্তবিকও বোধ হয় তাহাই ছিলেন। তিনি কি হিন্দু কি খৃষ্টান কি ব্রাহ্ম, সকলেরই কুসংস্কারের প্রতি ভল্‌টেয়ারের মত অতি কঠোর বিদ্রূপ করিতেন। কিন্তু ভলটেয়ারের সহিত তাঁহার পার্থক্য এই ছিল যে, ভল্‌টেয়ার বিদ্রূপ করিয়া অনেক সময়ে মার খাইতেন, কিন্তু চন্দ্রমোহন গোস্বামীকে সকলেই শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। ইহার একটা কারণ বোধ হয় এই ছিল যে, তাঁহার পদবী ছিল গোস্বামী। আসামীই হউন বা বাঙ্গালীই হউন, গোস্বামী উপাধিক ব্যক্তি মাত্রেই আসামবাসীর শ্রদ্ধার পাত্র।

একবার মান্দ্রাজ কি বোম্বাই হইতে গোরক্ষণী সভার এক বিখ্যাত প্রচারক গৌহাটিতে গিয়াছিলেন—তাঁহার নামটা বোধ হয় শ্রীরাম স্বামী। তিনি একদিন কথায় কথায় চন্দ্রমোহন বাবুকে বলিলেন যে, আরও দুই বৎসর চেষ্টা করিয়াও যদি তিনি ভারতবর্ষ মধ্যে গোহত্যা নিবারণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে হিমালয়ে গিয়া তপস্যা করিয়া লোকের মন এমনভাবে ফিরাইয়া দিবেন যে, আর খৃষ্টান বা মুসলমান কাহারও গোহত্যা করিতে প্রবৃত্তিই হইবে না। চন্দ্রমোহন বাবু তাঁহার এই বালোকোচিত কথা শুনিয়া বলিলেন, "একবার একজন লোক তাহার বন্ধুদিগের নিকট বলিয়াছিল যে, সে বড় একটা উত্তম স্বপ্ন দেখিয়াছিল। স্বপ্নটা এই—সন্দেশ, মিঠাই পোলাও কালিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া, মুড়ি মুড়কী পর্য্যন্ত সর্ব্ব প্রকার উৎকৃষ্ট খাদ্যবস্তু রাশি রাশি তাহার সম্মুখে স্থাপিত রহিয়াছে, এবং সে পেট ভরিয়া মুড়ি মুড়কী খাইতেছে।" এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিয়া শ্রোতাদের একজন তাহাকে ঠাস করিয়া এক চড় মারিয়া বলিল, "শা— তুই স্বপ্নে খাবি তাও মুড়ি মুড়কী? সন্দেশ পোলাও কালিয়া খেতে পারলি না?" আপনিও কি তপস্যা বা যোগ করিয়া গোহত্যা নিবারণ ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য কোন উচ্চতর উপকার করিবার কল্পনাও করিতে পারিলেন না?"

চন্দ্রমোহন বাবুর সহিত ভল্‌টেয়ারের রূপগত কিছু সাদৃশ্য ছিল বলিয়া আমার মনে হয়। আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে আমি চন্দ্রমোহন বাবুর মহা বিদ্যাবত্তার কথাই শুনিয়াছিলাম; তিনি যে হাস্যরসপটু তাহা শুনি নাই। তিনি পেন্সন লইয়া গৌহাটিতে আসিলে আমি তাঁহাকে দেখিতে যাইবার ইচ্ছা করিয়া, কাহার সহিত যাইব তাহাই ভাবিতেছিলাম; এমন সময়ে তিনিই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি ইহাতে তাঁহার সৌজন্য ও মহত্বে অভিভূত হইয়াছি এইরূপ একটা কথা তাঁহাকে বলায়, তিনি বলিলেন, "আমি পশুশালা দেখিতে গিয়া থাকি।"

তাঁহার এই এক পরিহাসে আমার মন হইতে সঙ্কোচ দূরে গেল এবং তাঁহার সহিত আমার বয়সের বিশ বৎসরের ব্যবধানটাও যেন তিরোহিত হইল। ইহার পর হইতে যখনই আমার অবকাশ হইত, তখনই তাঁহার সঙ্গে গিয়া মিলিতাম। অথবা তিনিই আমার বাসায় আসিতেন। অনেক সময়ে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেন মহাশয় আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইত। কখন কখন আমাদের তিনজনের অধিবেশনটা কৈলাস বাবুর বাসাতেই হইত। সেই বাসা এবং আমার বাসার ব্যবধান ১০।১২ হাতের অধিক ছিল না। আমরা তিনজনে মিলিত হইলে হাসি তামাসার কথা মোটেই উঠিত না, গম্ভীরভাবে আলাপ চলিত।

চন্দ্রমোহন বাবুর কোন কোন মত কিছু বিশেষ প্রকারের ছিল। বিবাহে ও আহারাদিতে দেশের জাতিভেদ উঠিয়া না গেলে দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে না তিনি ইহা সর্ব্বদাই বলিতেন। অথচ দেশের লোক যে হিন্দুনাম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম বা খৃষ্টান হইবে ইহা তিনি অনুমোদন করিতেন না।

তিনি বলিতেন, সংসারে ধর্ম্মের নামেই যত অধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গৌহাটির উকীল শ্রীযুক্ত ললিতমোহন লাহিড়ী মহাশয় ব্রাহ্ম বা খৃষ্টান নাম গ্রহণ না করিয়াও মুসলমান পাচক রাখিতেন, এবং বিবাহে জাতিভেদ মানেন নাই, এজন্য চন্দ্রমোহন বাবু তাঁহার প্রশংসা করিতেন। তিনি কতক আন্তরিক ভাবে কতক আমোদ করিয়া বলিতেন যে, দেশে মদ খাওয়াটার প্রচলন বিস্তৃতভাবে হইলে জাতিভেদটা অতি শীঘ্রই উঠিয়া যাইবে। তান্ত্রিকেরাও বোধ হয় এইপ্রকার বিশ্বাস দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই মদ্যপান প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। কেন না তন্ত্রেই আছে যে, "নিবৃত্তে ভৈরবী-চক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্।"

বঙ্গবাসী যন্ত্র হইতে শাস্ত্র প্রকাশ হইতেছিল। তৎসম্বন্ধে চন্দ্রমোহন বাবু বলিতেন যে, লোকে যাহা ভাল করিয়া জানে না তাহার প্রতি তাহাদের ভক্তি শ্রদ্ধা অধিক হইতে থাকে; এতদিন শাস্ত্রে কি আছে লোকে তাহা অল্পই জানিত বলিয়া শাস্ত্রে ভক্তিমান ছিল; এখন বাঙ্গলায় শাস্ত্র পড়িয়া তাহাদের শাস্ত্রের প্রতি ভক্তি কমিয়া যাইবে।

একটা বিষয়ে বোধ হয় চন্দ্রমোহন বাবু পরস্পর-বিরোধী দুই মত পোষণ করিতেন। এক পক্ষে তিনি বলিতেন যে, যাহারা ইংরাজী জানে না অথচ কেবল সংস্কৃতে যাহাদের খুব অধিকার আছে, তাহাদের তুলনায় এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়া লোকও অধিক সুশিক্ষিত; অন্য পক্ষে একটা প্রকাশ্য সভায় তিনি বলিয়াছিলেন যে আমাদের দেশে লোকের ইংরাজী পড়া উচিত নহে।

মোটের উপর চন্দ্রমোহন গোস্বামী প্রকৃত দেশ-হিতৈষী ছিলেন এবং দেশের শিক্ষিত লোকের শিক্ষানুযায়ী বিশ্বাস এবং বিশ্বাসানুযায়ী সাহস নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেন।

তিনি মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে খঞ্জ হইয়া শয্যাগত ছিলেন। কিন্তু তথাপি সর্ব্বদা প্রফুল্ল চিত্ত থাকিতেন এবং অধ্যয়ন করিতেন। পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে বহু ভক্ত তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন, এবং তিনি দুই তিন ঘণ্টা তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র রায় বাহাদুর শুভ্রেন্দুমোহন গোস্বামী পূর্ত্তবিভাগে রাঁচির এক্জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার। চন্দ্রমোহন বাবুর একজন ভক্ত ছিলেন কালীরাম বড়ুয়া। তিনি শিক্ষাবিভাগে কায করিতেন এবং বাড়ী তাঁহার গৌহাটিতেই ছিল। তিনি অতি সজ্জন ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। আমার মতামত জানিয়াও তিনি দুই একবার আমার আহারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনিও আমাকে তাঁহার বাড়ীতে আহারও করাইয়াছেন। তিনি একবার আমাকে আসামে প্রচলিত একটা প্রথার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। একদিন একটি নিম্নশ্রেণীর মুসলমান আমার বাসায় আহার করিয়াছিল। তাহার ভাত উঠানে দেওয়া হইয়াছিল, এবং সে নিজের উচ্ছিষ্ট নিজেই মুক্ত করিয়াছিল। তাহার আহারের পর আমার যুবক পাচক ব্রাহ্মণ তাহাকে মুসলমান জানিতে পারিয়া, জাত গেল ধর্ম্ম গেল বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্রাহ্মণ ভিন্ন হিন্দু অন্য জাতির ভাত খাইলে ত ব্রাহ্মণের জাতি যায়, কিন্তু তাহাদিগকে ভাত দিলেও কি পাপ হয়?"

সে বলিল, "তা কেন হবে? তারা যে হিন্দু।" আমি তখন পাচককে খুব এক ধমক দিলাম। সে কাঁদিতে লাগিল। ইহার পর আমি কয়েকজন আসামী হিন্দু ভদ্রলোককে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহারা সকলেই পাচককে সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, কোনও হিন্দু, মুসলমানকে কোনও আহার্য্য বা পানীয় দিলেই তাহার পাপ হইবে। কিন্তু কেন হইবে এ প্রশ্নের উত্তর তাঁহারা দিতে পারিলেন না। অবশেষে একদিন কালীরাম বাবু আমার বাসায় আসিলে তাহাকে এতৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলাম। তিনি বলিলেন যে অন্ন ও পানীয় হিন্দু মাত্রেরই প্রথমে

দেবতাকে নিবেদন করা উচিত। সেই নিবেদিত অন্ন দেবদ্বেষী মুসলমানকে দিলে তাহার অপব্যবহার করা হইল সুতরাং পাপ হইল। অনিবেদিত অন্ন পানীয় মুসলমানকে দেওয়া উচিত নহে কেন না তাহাতে যাহা দেবতার প্রাপ্য তাহা দেবদ্বেষী মুসলমানকে দেওয়া হয় সুতরাং পাপ অবশ্যম্ভাবী। অন্য পক্ষে হিন্দু যে জাতিই হউক তাহারা দেবদ্বেষী নহে সুতরাং তাহাদিগকে দিলে কোন পাপ হয় না। ইতর জীবজন্তু দেবতাকে জানেই না সুতরাং তাহারা দেবদ্বেষী নহে। সুতরাং তাহাদিগকে অন্ন পানীয় দিলে পাপ হইতে পারে না।

সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গদেশে এই "বৈজ্ঞানিক" যুক্তি কেহ জানে না। বঙ্গদেশে ক্রিয়াকর্ম্মের সময়ে মুসলমান-বন্ধুবান্ধব, হিতৈষী, প্রজা, অনুগত ব্যক্তিদিগকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করা হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পঞ্জাবেও কোন হিন্দু কোন মুসলমানকে কিছু আহার্য্য দিলে পাপভাগী হয়। লাহোরে একদিন পথিপার্শ্বেই এক জলসত্রে আমি জল পান করিতে গিয়াছিলাম। জলদাতা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হিন্দু না মুসলমান?" আমি যখন বলিলাম যে আমি হিন্দু তখন আমাকে জল দিল।

আমার আর এক আসামী বন্ধু রায়-বাহাদুর শ্রীযুক্ত চিদানন্দ চৌধুরী। তিনি এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার বয়স আশীরও অধিক। এখন সর্ব্বদা ভগবানের ধ্যান করিয়া দিনযাপন করেন। তিনি দাতা, পরোপকারী ও বন্ধুবৎসল। বাঙ্গালীদের সহিতই তাঁহার বন্ধুতা অধিক ছিল। একজন উচ্চপদস্থ সাহেব, যিনি বাঙ্গালী-দিগের প্রতি সদয় ছিলেন না, তিনি চিদানন্দ বাবুর মনে বাঙ্গালীদের প্রতি দ্বেষভাব জন্মাইতে চেষ্টা করিতেন; চিদানন্দ বাবু সে কথা তাঁহার বাঙ্গালী বন্ধুদের কাছে বলিয়া দিতেন। তিনি যৌবনকালে বড় মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। কিরূপ অসাধারণ সাহসিকতার সহিত বাঘ ভালুক মারিতেন, কিরূপে হরিণ শিকার করিতেন, কিরূপে একটা বাঘকে ষ্ট্রিক্‌নিয়া খাওয়াইয়াছিলেন, কিরূপে সেই বাঘটার দাঁত ও লোম পড়িয়া গিয়াছিল এবং চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং কিরূপে সেই অবস্থায় তাহাকে বহু সংখ্যক হনুমান আক্রমণ করিয়াছিল, চিদানন্দ বাবু সেই সকল গল্প করিতেন। তিনি আহার ও সর্ব্বপ্রকার আমোদ প্রমোদে বাঙ্গালীদের সহিত যোগ দিতেন।

আসামী ভাষার কোষকার ৺হেমচন্দ্র বরুয়ার সহিত আমার একদিন মাত্র সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি প্রকাশ্যভাবে আহার বিষয়ে জাতিভেদ মানিতেন না বলিয়া, মৃত্যুর পর তাঁহার শব বহন করিতে তাঁহার স্বজাতীয়েরা প্রথমে অসম্মত হইয়াছিলেন। পরে যখন আমরা কয়েকজন বাঙ্গালী সেই কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইলাম, তখন কয়েকজন ভাড়াটিয়া আসামী শববাহক পাওয়া গেল। ৺মাণিকরাম বরুয়া রাজনীতিক্ষেত্রে বিচরণ করিতেন। ইঁহারা উভয়েই আসামীদের নামের পূর্ব্বে "বাবু" শব্দ প্রয়োগের বড় বিরোধী ছিলেন। "বাবু"র পরিবর্ত্তে হয় শ্রীযুত না হয় মিষ্টার শব্দ প্রয়োগই তাঁহাদের এবং প্রায় যাবতীয় আসামী ভদ্রলোকের মত। রাজকীয় পত্রে তাঁহাদের নামের পূর্ব্বে বাবু শব্দ ব্যবহৃত হইত। তাঁহারা কটন সাহেবের সময়ে ইহার প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হন নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী চীফ কমিশনর তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

গৌহাটির ফুকন পরিবার অতি সম্ভ্রান্ত। আমার সময়ে সেই পরিবারের প্রধান ছিলেন শ্রীযুক্ত নবীনরাম ফুকন। তিনি সদালাপী, বিনয়ী, সঙ্গীতজ্ঞ লোক। বাঙ্গালীদের সঙ্গে বেশ মিশিতেন। আমার সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তরুণরাম ফুকন উদীয়মান ব্যারিষ্টার ছিলেন। তখন তিনি অতি সুপুরুষ ছিলেন এবং সম্ভবত এখনও সেইরূপ আছেন। তাঁহারা দুই ভ্রাতাই স্বরাজের গোলযোগে পড়িয়াছিলেন বলিয়া সংবাদপত্রে দেখিয়াছি।

উত্তর গৌহাটি-নিবাসী ৺পীতাম্বর শর্ম্মা পলাসবাড়ীর পুলিস সবইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। তিনি বড় ভাল মানুষ ছিলেন। একবার তিনি একটা চুরির তদন্ত

করিতে একজন হিন্দুস্থানীর খানাতালাসী করিতে গিয়াছিলেন। সেই লোকটা দৌড়িয়া গৃহ মধ্য হইতে একখানা তরবারি লইয়া বাহিরে আসিয়াই পীতাম্বরের মস্তকে তাহা দিয়া আঘাত করে। সেই এক আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। লোকটার ফাঁসী হইল। দারোগার পুত্রকে গবর্ণমেণ্ট একটা পেন্‌সন দিলেন।

কামরূপ জেলার ভূমি উর্ব্বরা। ধান্য, ইক্ষু, কমলা লেবু প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যই অনায়াসে বহু পরিমাণে উৎপাদিত হয়। অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোকও শস্যক্ষেত্র এবং ফলের বাগান করিয়াছেন। নেপালী এবং মণিপুরী লোকও স্থানে স্থানে উপনিবেশ করিয়া শস্য উৎপাদন করে। মাছ, ছাগ, হংস, পারাবত, কুক্কুটও এই জেলায় খুব সুলভ। এই জেলায় যদি 'কলা আজর' অর্থাৎ কালাজ্বর না থাকিত, তাহা হইলে এখানকার অধিবাসীরা সর্ব্বপ্রকারেই সুখী হইত। কালাজ্বরে বহু গ্রাম অধিবাসীশূন্য হইয়া গিয়াছে। আমি দেখিয়াছি যেখানে জল বদ্ধ হইয়া থাকে সেখানেই কালাজ্বর হয়। মাড়োয়ারিদের কালাজ্বর হয় না, ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন মাছ মাংস না খাইলে কালাজ্বর হয় না।

কামাখ্যা ভিন্ন গৌহাটীতে আরও অনেক তীর্থস্থান আছে। গৌহাটি হইতে ১৫ মাইল দূরে হাজো নামক স্থানে হয়গ্রীব মাধবের একটা বড় মন্দির আছে। একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী একবার কয়েক দিন হাজোতে গিয়া ছিলেন এবং মন্দিরের প্রসাদ খাইতেন। প্রসাদের মধ্যে ছাগমাংস থাকিত। ছাগ বলির প্রথা আসামে নিতান্ত বর্ব্বরোচিত। সেখানে পশুর শিরশ্ছেদ করা হয় না—ঘাড় মুচড়িয়া মারা হয়। আমি সেই সন্ন্যাসীকে বলিলাম যে এরূপে নিহত পশুর মাংস খাইতে হিংস্র পশু ভিন্ন অন্য কাহারও প্রবৃত্তি হওয়া অনুচিত। আমার সেই কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী সেখানকার পাণ্ডাদিগকে বলিলেন যে তাহারা যেরূপ পশুবধ করে তাহা বড় অপকর্ম্ম। পাণ্ডারা এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া সেই সন্ন্যাসীকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল।

হাজো স্থানটা বড় কদর্য্য ও অস্বাস্থ্যকর। সর্ব্বদাই এখানে লোকের জ্বর হয়। সমস্ত গ্রামটা নিবিড় জঙ্গলে আচ্ছন্ন। মনুষ্য এবং অন্য জীবের মূত্র পুরীষের গন্ধে গ্রাম পরিপূর্ণ। গ্রাম মধ্যে সূর্য্যকিরণ ও বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না, অথচ জ্বর কিরূপে প্রবেশ করে ইহা অধিবাসীরা ভাবিয়া পায় না।

গৌহাটির অপর পারে ব্রহ্মপুত্রের তীরে অশ্বক্রান্ত প্রভৃতি তীর্থ। গৌহাটি নগরের মধ্যেও তারাবাড়ী নামে একটা তীর্থ আছে। গৌহাটি হইতে সাত মাইল দূরে বশিষ্ঠাশ্রম নামে আর একটা তীর্থ আছে। এই স্থানটি বড় মনোরম। যাঁহারা মনে করেন যে নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ভগবানের ধ্যান করাই ধর্ম্ম, তাঁহারা যে এমন একটা স্থানকে তীর্থে পরিণত করিবেন তাহা মোটেই আশ্চর্য্য বিষয় নহে। কে কোন্ সময়ে বশিষ্ঠ ঋষির নামে এই স্থানটাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা জানি না। কিন্তু এখানকার লোকের বিশ্বাস যে স্বয়ং বশিষ্ঠই এখানে আসিয়া তপস্যায় শেষ জীবন কাটাইয়াছিলেন। এই জনশ্রুতি বিশ্বাস করিলে পুরাণে অবিশ্বাস করিতে হয়। কেন না পুরাণে বলে যে বশিষ্ঠ পঞ্জাব ও অযোধ্যায় বাস করিতেন।

হাজো এবং আসামের আরও দুই তিন স্থানে নট নামে এক জাতি আছে। নটেরা অন্য জাতীয় লোকের কন্যা বিবাহ করে। নটদিগের কন্যাগণের বিবাহ হয় না। তাহারা মৃত্যু পর্য্যন্ত "দেবদাসী" হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের জীবনচরিত না লিখিলেও সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

গৌহাটি জেলায় কটকী উপাধিক একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রবাদ এই যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কটক হইতে আসামে আসিয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস যে আসামের প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণের পূর্ব্বপুরুষেরাই উড়িষ্যা হইতে আসিয়াছিলেন। উড়িষ্যার সহিত আসামের যে সম্বন্ধ ছিল তাহা দুই একটা শব্দ হইতে অনুমান হয়। উড়িষ্যায় চালতাকে ঔ বলে।

আসামেও চালতাকে ঔ বলে। উড়িষ্যায় তামাককে ধুয়া পত্র বলে। উপর আসামে বলে ধপাৎ এবং নিম্ন আসামে বলে ধুয়া পাত।

গৌহাটীর মধ্যে পলাসবাড়ী ও নলবাড়ী নামে দুইটা প্রসিদ্ধ স্থান আছে। রাজা নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধ সময়ে এই পলাসবাড়ী হইতে কলা ও অন্যান্য ফল প্রেরিত হইয়াছিল। এখন সেখানে ষ্টীমার ঘাট হইয়াছে। স্থানীয় লোকেরা ষ্টীমারের লোকদিগের নিকট প্রত্যহ দুইবার বহু হাঁস, পায়রা, মুরগী, কলা, কাঁঠাল, আম বিক্রয় করিয়া প্রচুর উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

নলবাড়ীতে বহু ব্রাহ্মণ ও জলচল শূদ্রের বাস। বালক ও যুবক ব্রাহ্মণেরা, এবং জলচল শূদ্র বালকেরা আসামের সর্ব্বত্র এবং উত্তরবঙ্গেরও নানা স্থানে পাচক ও চাকরের কাজ করে। চাকরদিগকে আপা বলে। পাচকদিগকে কি বলে তাহা মনে নাই—বোধ হয় বটু বলে। পাচক এবং আপারা যাহা বেতন পায় তাহা মনিঅর্ডার করিয়া বাড়ীতে পাঠাইয়া দেয়। এইরূপ মনিঅর্ডার নলবাড়ী ডাকঘরে আমার সময়ে মাসে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার হইত। আমাদের বঙ্গদেশ হইতে উড়িয়া পাচক ও চাকরেরা এবং হিন্দুস্থানী দারোয়ান, মুটে মজুরেরা বোধ হয় প্রতি মাসে দশ কোটি টাকা পাঠাইয়া থাকে। আমাদের দেশের ছোটলোক "বাবু" হইয়াছে। তাহারা আর চাকর বামুনের কাজ করিতে চাহে না। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে ভদ্রবংশীয় যুবকেরা দলে দলে যেমন মুটের কাজ, শুশ্রূষার কাজ করিতেন, এখনও যদি সেইরূপে সেবাব্রত গ্রহণ করেন তাহা হইলে সেই কোটি কোটি টাকা বাঙ্গালা দেশেই থাকিয়া যায়। তাঁহাদেরও পড়াশুনার সাহায্য হয়। আমেরিকার ছাত্রেরা শুনিয়াছি এইরূপ করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের লোকে কি এই কথাটার প্রতি মনোযোগ দিবেন?

অনেকবার আসামী ভদ্রলোকের বাড়ীতে আহার করিয়াছি। পাক উত্তম হয়। বিশেষতঃ অড়হর দালটার আস্বাদ বড় উপাদেয় হয়। শুনিয়াছি অড়হর ডালে লবণের পরিবর্ত্তে ক্ষার দেওয়া হয়। কেবল অম্বলটা যে 'অম্বল' তাহা কেহ না বলিয়া দিলে বুঝা যায় না। সেই অম্বলের একটা তুলনা হইতে পারে বাঙ্গালা মাসিকপত্রের 'প্রাচ্যকলা'র ছবির সঙ্গে। কেন না সেই ছবিতে যে সৌন্দর্য্য আছে তাহা যেমন চিত্রপরিচয় লিখিয়া না দিলে বড় কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না, তেমনি বলিয়া না দিলে বাঙ্গালীরা আসামীদের বাড়ীর অম্বলের অম্লত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না।

ভূমিকম্পের কিছুদিন পরে আমি তিনমাসের ছুটি লই। দেশে পরিবার রাখিয়া তিন মাস পরে শিবসাগরে গেলাম। সেখানকার কথা আগামী বারে লিখিব।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

সুবোধ

না বুঝে তোমরা সুবোধে আমার বলোনা কুলাঙ্গার,
সুবোধই মোদের কুলপ্রদীপ, তুলনা নাহিক তার।
চারি ভাই তার বিদ্বান্ বটে—চাকুরিয়া বড় বড়,
আপন আপন করিয়াছে বাড়ী টাকাকড়ি করে' জড়।
সুবোধ আমার শিখিতে পারেনি লেখাপড়া বেশী কিছু,
বেশীদূর তাই আগাতে পারেনি সে আছে সবার পিছু।
মূর্খ সুবোধ আছে বলে তবু দুই মুঠো খেতে পাই,
তাহার ভগিনী ভাগিনারা সব পায় দাঁড়াবার ঠাঁই।
সুবোধ আমার আগুলি রয়েছে বাপপিতামোর ভিটে
সুবোধ আমার সিঁদুর যোগায় কুললক্ষ্মীর পীঠে।
সে না হলে হত এ গৃহে নিয়ত শিয়াল পেঁচার বাস.
বাজিত না শাঁখ, পড়িতনা সাঁজ, উঠানে গজাত ঘাস।
সে না হলে হায় পিতাপিতামহ পেত না পিণ্ডজল,
বংশের 'পরে নামিয়া আসিত তৃষিতের শাপানল।
পূজাপার্ব্বণ, কৌলিকপ্রথা, বাপ পিতামোর ধারা
কে রাখিত বল এ গৃহে নিত্য আমার সুবোধ ছাড়া?
সে না হলে গৃহে বন্ধ হইত গৃহদেবতার সেবা,
ভিখারী অতিথি অভ্যাগতেরে এ গৃহে তুষিত কেবা?
স্বজন বন্ধু পাড়াপ্রতিবেশী গুরু পুরোহিত সনে
প্রীতিবন্ধন সেই রাখিয়াছে সেবি তুষি প্রতিজনে।
সুবোধ না হলে ঘরদুয়ারের চিহ্ন যাইত ঘুচে,
গ্রাম হতে রায়বংশের নাম একেবারে যেত মুছে।

আহারে বিহারে, আমোদে, প্রমোদে নানা উৎসব দিনে,
বিপদে আপদে তোমাদের দেখি চলেনা সুবোধ বিনে।
সঙ্কটে সে যে সকলের আগে দাঁড়ায় বক্ষ পাতি,
সকলের শোকে দুখে সহভাগী, শ্মশানে ব্যসনে সাথী!
বিদ্বান্ যারা, একে একে তারা ছেড়েছে দেশের মায়া,
মূর্খ পুত্র না থাকিলে হায় হইতাম অসহায়া।
সকাল বিকাল করে মোর পায় ভক্তিতে প্রণিপাত,
অসুখে বিসুখে শিয়রে বসিয়া জেগে রয় সারা রাত।
শোকের দিনে সে সান্ত্বনা দিয়ে মুছায় নয়ন জল,
মোর মুখ যদি ম্লান দেখে কভু, আঁখি করে ছলছল।
তীর্থের পথে হাত ধরে ধরে নিয়ে যায় সারাখন,
সকল পুণ্য কর্ম্মে আমার করে দেয় আয়োজন।
এমন ছেলেরে মূর্খ বলিয়া বলিলে কুলাঙ্গার,
সংসার খুঁজি কুলপ্রদীপ কোথায় মিলিবে আর?

সুবোধ আমার করিতে পারে না বেশী কিছু রোজগার;
নিজে খেটে, চাষে মুনিষ খাটিয়ে চালাতেছে সংসার।
তাই বলে তারে বলিতে পারোনা নেহাৎ লক্ষ্মীছাড়া,
তাহার বাড়ীতে লক্ষ্মীর পীঠ জানে তাহা গোটা পাড়া।
গোরুগুলি তার বড়ই লক্ষ্মী, দুধ ঢালে কেঁড়ে কেঁড়ে,
কলার বাগান, বাঁশ ঝাড় তার ক্রমেই যেতেছে বেড়ে।
লবণ মশলা ভিন্ন কিছুই কিনিতে হয়না তার,
ধরিতে পারে না আম, নারিকেল গাছগুলি ফলভার।
মাছে ভরপুর দুইটি পুকুর, গোলাভরা থাকে ধান;
সারাটি বছর ভোগ করে আর দুই হাতে করে দান।
বৌমাটি মোর লক্ষ্মীস্বরূপা, নাহি সৌখীন সখ,
বাড়ীখানি তবু তার গুণে করে তকতক ঝকঝক,
ব্যারামের ভয়ে অন্য ছেলেরা ত্যাগ করিয়াছে দেশ,
এখন তাদের খড়ো ঘরে নেই বাস করা অভ্যেস।
পাড়াগাঁয়ে সব জিনিস মেলেনা, কাদাভরা পথ ঘাট,
নানান্ কারণে উঠায়ে দিয়াছে গ্রামে আসিবার পাট।
না আসুক তারা, যেখানে থাকুক সেখানেই সুখে রোক,
প্রার্থনা করি, দিন দিন আরো বাড়বাড়ন্ত হোক।
জিজ্ঞাস যদি কোন্ ছেলেটির গৌরব বেশী করি,
তবে সে করিব সুবোধের নাম মুখ ভরি বুক ভরি।
জনমে জনমে শ্রীগুরুর পায় এই মোর অনুনয়,
একটিও ছেলে অন্ততঃ যেন সুবোধের মত হয়।
শতেক বিজ্ঞ অবোধের চেয়ে, মূর্খ সুবোধ ভালো,
শত তারা নয়, একটী চন্দ্রে বিশ্ব করে যে আলো।

শ্রীকালিদাস রায়।

মনের মানুষ

(উপন্যাস)

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

কর্ম্মফল।

পাঁচটা বাজিবার কয়েক মিনিট পরেই অন্যান্য কর্ম্মচারীর সহিত রমেশও ব্যাঙ্ক হইতে বাহির হইল। পদব্রজেই সে সুতাপটীর দিকে অগ্রসর হইল। কুঞ্জ অদৃশ্যদেহে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

সেই বাড়ীতে পৌছিয়া বরাবর ত্রিতলে উঠিয়া যমুনাপ্রসাদের ঘরে গিয়া রমেশ দেখিল তাহা তালাবদ্ধ। কিয়ৎক্ষণ বারান্দার রেলিং ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। অস্ফুট স্বরে বলিল, "গেলেন আবার কোন চুলোয়?" খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া, বারান্দায় এদিক ওদিক একটু পায়চারি করিতে লাগিল। অন্যান্য ঘরের ভাড়াটিয়ারা কেহ হুঁকার জল ফিরাইতেছে, কেহ ভৃত্যের সহিত বচসা করিতেছে, কেহ জলযোগে প্রবৃত্ত। কিছুক্ষণ পদচারণার পর সিঁড়ির নিকট আসিয়া, নিম্নে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া রমেশ দাঁড়াইল। এই সময় একজন ফিটফাট মাড়োয়ারী বাবু আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কিসকো খোঁজতেহেঁ বাবু?"

"যমুনাপ্রসাদ বাবুকো।"

সে ব্যক্তি বলিল, "যমুনাপ্রসাদ? উও তো মুলুক চলা গিয়া।"

রমেশ ভাবিল, এ নিশ্চয় অন্য কোনও যমুনার কথা বলিতেছে। এত বড় বাড়ীতে দুইটা যমুনা থাকা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। তাই সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ ঘর দেখাইয়া বলিল, "ঐ ঘরমে যে যমুনা প্রসাদ রহতা হায়?"

"হাঁ হাঁ—মুলুক চলা গিয়া।"

শুনিয়া রমেশের মুখ শুকাইয়া গেল। সিঁড়ির রেলিং ধরিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "মুলুক চলা গিয়া? কব্?"

"আজ চার বাজেকে পাসিঞ্জার মে। হাম ইস্ মকানকা মনেজর হাঁয়। কোই তিন সাড়ে তিন বাজে যমুনা আয়া, ঘরকা কেরায়া যো বাকী থা সো দিয়া, এক মহিনাকা কেরায়া পেশ্‌গী দিয়া, আপনা চিজবস্ত্ লেকে চলা গিয়া।"

"উস্‌কা মুলুক কাঁহা?"

"জিলা রায়বরেলী।"

"কোন গাঁও?"

"সো তো মালুম নেহি। জাতকো অম্বষ্ট্ কায়স্থ্ হায়।"

রমেশ ভাবিল, "তার জাত নিয়ে ত আমি ধুয়ে খাব।" ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কব্ আবেগা?"

"উস্‌কী লেড়্‌কিকী সাদী হায়। মহিনা রোজ বাদ আওয়েগা কহা।"—বলিয়া বাবুটি আপন কার্য্যে চলিয়া গেল।

রমেশের এতক্ষণ বোঝা উচিত ছিল যে যমুনা তাহাকে ফাঁকি দিয়াছে। কিন্তু তাহা সে বুঝিল না—অমন সর্ব্বনাশের কথা বিশ্বাসই হইল না। ভাবিল, এইখানেই কোনও প্রয়োজনে কোথাও গিয়াছে, ৮টার মধ্যে নিশ্চয়ই সে ফিরিয়া আসিবে—আসিয়া আমার টাকা দিবে। ধীরে ধীরে সিঁড়ি নামিয়া, কিছু দূরে একটা চায়ের দোকান পাইয়া, চা খাইতে বসিল। দুই পেয়ালা চা পানের পর, মূল্য দিয়া, আবার সেই বাড়ীর দিকে চলিল। তখন অন্ধকার হইয়াছে, রাস্তার গ্যাসপোষ্টগুলি জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। আবার সিঁড়ি উঠিয়া যমুনাপ্রসাদের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। দ্বার পূর্ব্ববৎ তালাবদ্ধ। দেখিয়া রমেশ রুমাল দিয়া রেলিঙের কার্ণিসের ধূলা ঝাড়িয়া, তাহার উপর বসিয়া পড়িল।

তাহার গা দিয়া দরদর করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল।

প্রায় পনেরো কুড়িমিনিট কাল এইভাবে বসিয়া থাকিয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রমেশ উঠিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া কুঞ্জলালের দুঃখ হইতে লাগিল। আবার ইহাও মনে হইল, বেশ হইয়াছে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল!

রমেশ নামিয়া, বরাবর চিৎপুর রোডের দিকে চলিল। কিয়দ্দূরে আসিয়া একটা ফিরিওয়ালার নিকট হইতে একঠোঙা লঙ্কামাখা কাবুলী মটর কিনিয়া পকেটে ফেলিয়া, নিকটস্থ দেশী মদের দোকানে প্রবেশ করিল। এক গেলাস "থার্টি" লইয়া দাঁড়াইয়া তাহা পান করিতে লাগিল। কুঞ্জ সে দুর্গন্ধে তিষ্ঠিতে না পারিয়া, নাকে কাপড় দিয়া, রাস্তায় নামিয়া দাঁড়াইয়া রমেশের পানে নজর রাখিল।

দেখিল, গেলাস হাতে করিয়া রমেশ ক্রমে একখানা বেঞ্চিতে বসিল। দোকানের ঘড়িতে তখন প্রায় সাড়ে সাতটা। গেলাস খালি হইলে রমেশ উঠিয়া আরও মদ লইয়া আসিল। পৌনে আটটার সময়, রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইল, এবং টলিতে টলিতে যমুনাপ্রসাদের বাসার দিকে চলিল।

সিড়ির রেলিং ধরিয়া ধরিয়া উপরে গিয়া দেখিল, তালা সেইরূপ বন্ধই আছে। দেখিয়া, "মাই গড্!" বলিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া, যমুনাপ্রসাদের উদ্দেশে বিড়বিড় করিয়া হিন্দী ও বাঙ্গালায় গালিগালাজ করিতে লাগিল। কত লোক সেই পথে যাতায়াত করিতেছিল। একজন বলিল, "এই বাবু, হিঁয়া বৈঠা হায় কাহে?"

রমেশ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বুক চিতাইয়া মাথা হেলাইয়া বলিল, "হামারা রূপিয়া দেও!"

সে ব্যক্তি বলিল, "রূপিয়া? রূপিয়া কৈসা?"

রমেশ সম্মুখদিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া, আবার সামলাইয়া লইয়া বলিল, "রূপিয়া আবার কৈসা? হেঁহেঁ—জাননা বাবা? চক্‌চকে চক্রাকার—আটটি হাজার ঠনাট্‌ঠন! একটি আধটি নয়। সে আও—জল্দি!" বলিয়া রমেশ তাহার মুখের অত্যন্ত কাছে মুখ লইয়া গেল।

সে লোকটা পিছু হটিয়া, নাসিকায় দুই তিনবার ঘ্রাণ লইবার শব্দ করিয়া বলিল, "রাম রাম! ইয়ে তো দারু পিয়া মালুম হোতা হায়। যাও যাও বাবু, আপ্‌না ঘর যাও।"—বলিয়া সে ব্যক্তি ভৃত্যকে ডাকিয়া রমেশকে রাস্তায় নামাইয়া দিতে আদেশ করিল।

রমেশ কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিল, "কি বাবা, রূপিয়া দেগা নেই? ফাঁকি দেগা? তব্ হরির কুঞ্জে হাম কৈসে আজ যাগা? কেয়া বোলকে মুখ দেখায়গা?"

লোকটি বলিল, "যাও যাও, কৌন্ জানতা হায় তুমারা রূপিয়া? যাও, নয়তো পুলিশ বোলায়েঙ্গে।"

"চলো বাবু, চলো।"—বলিয়া ভৃত্য রমেশের হাত ধরিল।

রমেশ হাত ছিনাইয়া লইয়া বলিল, "হাম আপনি চলা যাতা বাবা! দেক্ করতা কেঁউ?"—বলিয়া টলিতে টলিতে সিঁড়ি নামিতে লাগিল।

রাজপথে নামিয়া রমেশ রামবাগানের দিকে চলিল। নূতন বাজারের মোড়ের নিকট পৌঁছিয়া একটু হইলেই সে মোটর চাপা পড়িয়াছিল আর কি! কিন্তু কুঞ্জ সাবধান ছিল, ক্ষিপ্রহস্তে তাহাকে টানিয়া লইল। কে টানিল—কে তার প্রাণ বাঁচাইল—সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া, নেশার ঝোঁকে রমেশ আপন মনেই চলিতে লাগিল।

তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পূর্ব্ববর্ণিত ঘরে প্রবেশ করিয়া কুঞ্জ দেখিল, হরি একখানা আধময়লা কাপড় পরিয়া, বসিয়া সিগারেট খাইতেছে। রমেশ তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "এ কি? আজ হেন বেশ কেন পি—পি—প্রিয়ে? সাবান, পাউডার, ভেজুয়া সব ফুঃ—ফুরিয়ে গেছে? ধোবা আসে নি? আহা কি পরিতাপ! কী পরিতাপ! কাঈঈ পরিতাপ!

একাকিনী শোকাকুলা এ রামবাগানে
কাঁদেন পেঁচার বাচ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরব!"

—বলিয়া রমেশ ধপাস করিয়া তাহার কাছে বসিয়া বলিল, "হরি বাবু, প্রিয়ে! আছ কেমন বন্ধু? বল হরি—হরিবোল!"

স্ত্রীলোকটা একটু সরিয়া বসিয়া সরোষ কটাক্ষে বলিল, "কোথায় গিলে এলে?"

"আমার বাড়ী—আঃ বেশী খেয়ে গলাটা গেছে। বোতলটা বার কর ত—ঢাল একগ্লাস!" বলিয়া হরির হাত হইতে সিগারেটটা কাড়িয়া লইয়া ধূমপানে প্রবৃত্ত হইল।

হরি তাহার পকেটগুলির পানে খর দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "বাকী আট হাজার টাকা এনেছ?"

রমেশ নীরবে মাথা নাড়িয়া, সিগারেট ফুঁকিতে লাগিল।

"আননি? দেখি।"—বলিয়া হরি তাহার পকেটগুলি একে একে খুঁজিয়া দেখিল। রমেশ বলিল, "টাকা নেহি মিলা বিবিজান!"

"কেন, কি হল?"

"যে আজ সন্ধ্যাবেলা টাকা দেবে বলেছিল, সে আজ চারটের প্যাসেঞ্জারে পলায়ন—রাজ্য ছেড়ে পলায়ন!"

হরি গম্ভীর ভাবে বলিল, "হুঁ! সে আমি আগেই জানি। আচ্ছা, সকাল বেলা যে ৬'হাজার দিয়ে গেলে, সে টাকা কোথায় রেখে এসেছ বল দেখি?"

সিগারেট ফেলিয়া দিয়া রমেশ বলিল, "আমি কোথায় রেখে আসবো? ঐখানে ত তোমার তাকিয়ার নীচে রেখে গেলাম।"

হরি দাঁত মুখ খিচাইয়া বলিল, "রেখে ত গেলে! আবার এসে নিয়ে গেলে কেন?"

রমেশ বিস্মিত হইয়া বলিল, "কখন আবার নিয়ে গেলাম?"

হরি তীক্ষ্ণ স্বরে বলিল, "কখন আবার নিয়ে গেলে? আমি যখন কলঘরে ঢুকে নাইছিলাম, তখন পা টিপে টিপে এসে, তোমার কাছে যে দোহারা চাবি আছে তাই দিয়ে ঘর খুলে ঢুকে, নোটগুলি নিয়ে গেলে না?"—শেষের দিকের কথাগুলি প্রায় চীৎকারের মত শুনাইল। হরির নাসিকা স্ফীত হইয়া উঠিল, নিশ্বাস জোরে পড়িতে লাগিল, চোখ দুটা জ্বলিয়া উঠিল।

রমেশ বলিল, "দুস্‌শালী! আমি কেন টাকা নিয়ে যাব?"

হরি চীৎকার করিয়া বলিল, "তুই নিসনি ত কোন্ যমে নিলে রে হারামজাদা! * * *।"—হরির মুখনিঃসৃত অপর মিষ্ট সম্বোধনগুলি অভিধানে নাই, এবং তাহা এস্থলেও মুদ্রণযোগ্য নহে।

গালি শুনিয়া রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চোপরাও শালী হারামজাদী! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! যার খাস তাকেই অপমান! পাজি বেটি নচ্ছার বেটি—আমি তোকে ত্যাগ করলাম।"

"ইস্! বীরপুরুষের আবার রাগ দেখনা! ত্যাগ করাচ্ছি দাঁড়াও।" বলিয়া হরি চট করিয়া কোমরে আঁচল জড়াইয়া, বারান্দায় বাহির হইয়া, একগাছা ঝাঁটা আনিয়া, দুইহাতে ধরিয়া রমেশের পিঠে সপাসপ মারিতে লাগিল। হতবুদ্ধি রমেশ ব্যাপারটা বুঝিবার পূর্ব্বেই হরি ঝাঁটা ফেলিয়া বারান্দা হইতে একখানা আঁষ বটী আনিয়া, রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে দ্বারপথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া, চীৎকার করিয়া বলিল, "আমার টাকা দিবি কিনা বল্। ভাল চাস ত আমার টাকা দে, নইলে এই বঁটির ঘায়ে তোকে আজ খুন করে তবে ছাড়ব!" তাহার চোখ দুটা বাঘের মত জ্বলিতে লাগিল।

ঝাঁটা খাইয়া রমেশের নেশা একদম ছুটিয়া গিয়াছিল। এই দেখিয়া সে তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, চক্ষের নিমেষে অপর দিকের দ্বারের হুড়কাটা বিপুলবেগে মড় মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া লইয়া, তাহা হাতে করিয়া আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। সে বাড়ীর অন্যান্য স্ত্রীলোক কোলাহল শুনিয়া ইতিপূর্ব্বেই নিজ নিজ ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দুইজন ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "বঁটি ফ্যাল হরি, বঁটি ফ্যাল! নৈলে এক্ষুণি আমরা পুলিস ডাকবো।"

হরি বঁটিখানা মাথার উপর আস্ফালন করিতে করিতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল, "বঁটি আমি ফেলচিনে। আমার টাকা দিগ, লে ওকে আজ আমি কেটে কুচি কুচি করবো।"

সেই স্ত্রীলোকগণ তখন কেহ কেহ "ওমা কি হবে গো!" বলিতে বলিতে নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া খিল দিল, কেহ কেহ "পুলিস! পুলিস! খুন হয়া খুন হয়া!" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া সিঁড়ি নামিতে লাগিল।

অদৃশ্য কুঞ্জ বসিয়া গুটি গুটি অগ্রসর হইয়া, হরির পা ধরিয়া এক হেঁচকা টান মারিল। হরি তৎক্ষণাৎ চিৎপাত হইয়া পড়িয়া গেল। এই আকস্মিক অপ্রত্যাশিত সুযোগ পাইয়া রমেশ এক লম্ফে তাহাকে ডিঙাইয়া সিঁড়ির দিকে ছুটিল।

"উহুহু। ওরে বাপরে, মারে, খুন কল্লেরে!"—বলিতে বলিতে হরি সেই অবস্থায় পড়িয়া প্রবলবেগে হাত পা ছুড়িতে লাগিল। কুঞ্জ দেখিল, তাহার বাম বাহুমূল বঁটিতে কাটিয়া, তৎসংলগ্ন বস্ত্রাংশ রক্তসিক্ত হইয়াছে। অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ ছুটিয়া আসিয়া হরিকে উঠাইয়া বসাইল।

কুঞ্জ তখন সিঁড়ি নামিয়া গলিতে বাহির হইয়া উভয়দিকে দৃষ্টিপাত করিল, রমেশকে কোথাও দেখিতে পাইল না। সদর রাস্তায় বাহির হইয়াও তাহার কোনও চিহ্ন দেখিল না।

কুদৃশ্য দেখিয়া, কুভাষা শ্রবণ করিয়া, কুপল্লী কুস্থান হইতে বাহির হইয়া কুঞ্জলালের মনে হইল যেন সে অসাবধানে একটা নর্দ্দামায় পড়িয়া গিয়াছিল, নিজেকে অত্যন্ত অশুচি বোধ হইল, দেহটা যেন "ঘিন ঘিন" করিতে লাগিল। তাই সে ভাবিল, এখন বড় জোর সাড়ে আটটা কি পৌনে নয়টা। গঙ্গা ত নিকটেই, যাই একটা ডুব দিয়া পবিত্র হইয়া, তারপর ডাক্তার সাহেবের বাড়ীতে গেলেই হইবে; সাড়ে নয়টার মধ্যেই সেখানে পৌছিতে পারিব। এই স্থির করিয়া ব্যাগটি হস্তে, নূতন বাজারের পাশ দিয়া একটা রাস্তা ধরিয়া কুঞ্জলাল গঙ্গা অভিমুখে চলিল।

চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল, গঙ্গাস্নানে ত যাইতেছি, ব্যাগটি রাখিব কোথা? যদি এটি তীরে রাখিয়া জলে নামি, আমার হস্তচ্যুত হইবামাত্র আর ত ইহা অদৃশ্য থাকিবে না। তখন, কেহ যদি এটি লইয়া চম্পট দেয়? তার চেয়ে বরং একটু গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া, মুখটা হাতটা ধুইয়া আসা যাউক।

আর কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া কুঞ্জ দেখিল, সেই সঙ্কীর্ণ পথটি মানুষ ও মোটর গাড়ীর ভীড়ে ভরিয়া গিয়াছে। পথিপার্শ্বে উজ্জ্বল আলোকমালায় ভূষিত একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকা। ফুলের মালা গলায় সুসজ্জিত কয়েকটি ভদ্রলোক গাড়ী বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। মোটর গাড়ীগুলি সারিবন্দি হইয়া অতি ধীরে ধীরে একে একে ফটকের ভিতর প্রবেশ করিতেছে, আরোহী ও আরোহিনীগণ গাড়ীবারান্দায় নামিবামাত্র সে গাড়ী অপর ফটক দিয় বাহির হইয়া যাইতেছে, পশ্চাতের গাড়ীখানি বারান্দায় লাগিতেছে।

ফটকে একজন কনষ্টেবল দাঁড়াইয়া ছিল, পথচারী একব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হিঁয়া ক্যা হোতা হায় জী?"

কনষ্টেবল বলিল, "ডাক্তার সাহেবকী বেটিকী সাদী হায়।"

কথাটা শুনিয়া কুঞ্জলালের মনে হইল, কোন্ ডাক্তার সাহেবের মেয়ের বিবাহ হইতেছে কে জানে! ভিতরে গিয়া দেখাই যাউক না।

সে তখন সাবধানে অগ্রসর হইয়া গাড়ীবারান্দায় উঠিল। একখানি মোটর গাড়ী হইতে কয়েকজন পুরুষ ও জুতা-মোজা পরিহিত মহিলা সেই সময় নামিলেন। যাঁহারা সেখানে দাঁড়াইয়া অভ্যাগতগণকে "রিসীভ" করিতেছিলেন, তাঁহারা বলিলেন "উপরে যান।" কুঞ্জও এই দলের পশ্চাৎ ভিড়িয়া গিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া দেখিল, একটি সুন্দরী ছোট মেয়ে, গোলাপের "বোকে" ভরা একখানি ট্রে দুই হাতে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সকলকে এক একটি লইতে বলিতেছে। এক ভদ্রলোক প্রত্যেক অভ্যাগতের গলদেশে বেল

ফুলের মালা পরাইয়া দিতেছেন। কুঞ্জ মন্ত্র পড়িয়া একটি বোকে তুলিয়া লইল বটে, কিন্তু কেহ তাহার গলায় মালা পরাইয়া দিল না।

অভ্যাগতগণ একটি বৃহৎ হলে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া কুঞ্জও গুটি গুটি অগ্রসর হইয়া সেই হলের মধ্যে প্রবেশ করিল।

হলের অপর প্রান্তে বড় বড় টবে পাম, ফার্ণ প্রভৃতি বেষ্টিত বেদী নির্ম্মিত হইয়াছে—সেখানে বিবাহ আরম্ভ হইয়াছে। অনেক লোকের হস্তে লাল কালীতে ছাপা একখানি চটি বহি। কুঞ্জ ঝুঁকিয়া দেখিল, তাহার মলাটে ছাপা রহিয়াছে।

ওঁ

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্

শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবী
ও
শ্রীমান্ যোগেন্দ্রনাথ দত্তের
শুভবিবাহ-পদ্ধতি

ইন্দুবালা নামটা দেখিয়া কুঞ্জলালের মনে হইল, এ কোন্ ইন্দুবালা? ডাক্তার সরকারের কন্যা ইন্দুবালা নহে ত! এ বাড়ীই বা কার? নিজ গৃহে এত অধিক নিমন্ত্রিত লোকের স্থান সঙ্কুলান হইবে না ভাবিয়া ডাক্তার সাহেব কি তাঁহার কোনও ধনী বন্ধু বা মক্কেলের বাড়ীতে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন?—যাই, বেদীর নিকট গিয়া দেখি উঁহারা কারা।

অতি সন্তর্পণে ভীড় হইতে আত্মরক্ষা করিয়া কুঞ্জ অগ্রে অগ্রে হলের অপর প্রান্তে পৌঁছিল। দেখিল বেদীর সম্মুখস্থ কয়েক সারি চেয়ারে বহুসংখ্যক সুসজ্জিতা মহিলা—যেন চাঁদের হাট বসিয়া গিয়াছে। রঙবিরঙের বারাণসী ও সোণা হীরা জহরতের রাশি হইতে যেন একটা আলোকের ঝলক উঠিতেছে। আর দেখিল এক আশ্চর্য্য দৃশ্য—স্বয়ং ডাক্তার সরকার সাহেব একখানা কোঁচান সাদা ধুতি পরিয়া, পাঞ্জাবী গায়ে দিয়া, একখানি কোঁচানো উড়ানি গলায় ঝুলাইয়া বেদীর উপর কন্যা সেটীতে, বিবাহসাজে সজ্জিতা কন্যা ইন্দুবালার পার্শ্বে বসিয়া আছেন। কুঞ্জ জন্মাবচ্ছিন্নে কখনও ডাক্তার সাহেবের অঙ্গে বাঙ্গালী পোষাক দেখে নাই, তাই সে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল; তিনি তখন কি কথা বলিতেছেন তাহা শুনিতে পাইল না। কিছুক্ষণে তাহার চমক ভাঙ্গিলে শুনিল, বরকর্ত্তা সেই পদ্ধতিখানি হাতে করিয়া চশমা চোখে দিয়া গম্ভীর স্বরে পড়িতেছেন—

"ধর্ম্মেতে, অর্থেতে, অথবা ভোগেতে তুমি ইহাকে অতিক্রম করিবে না?"

সম্মুখস্থ সেটীতে উপবিষ্ট বারাণসী-যোড় পরিহিত অনুমান পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্ক এক যুবক উত্তর করিল, "আমি অতিক্রম করিব না।"—কুঞ্জ বুঝিল এই পাত্র—কিন্তু এ ত সিন্‌হা সাহেব নহে!

তাহার পর কন্যাকর্ত্তা বলিলেন—"এই শুভ কন্যাভার সম্প্রদান সাঙ্গতার্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম শ্রীমান্ যোগেন্দ্রনাথ, তোমাকে আমি এই সকল স্বর্ণ, রজত উপহার এবং তোমার ব্যবহারার্থ এই সমুদয় বিবিধ প্রকারের গৃহসামগ্রী প্রদান করিতেছি।"

পাত্র। আমি কৃতজ্ঞ হইয়া এ সকল গ্রহণ করিলাম। স্বস্তি।

তাহার পর আচার্য্যের নির্দ্দেশ অনুসারে পাত্র আপনার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পাত্রীর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিলেন। আচার্য্য ফুলের মালা দিয়া সেই হস্তদ্বয় বেষ্টন করিয়া "প্রেমগ্রন্থি" বাঁধিয়া, বর কন্যাকে "উদ্বাহ-প্রতিজ্ঞা" পাঠ করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বর। শ্রীমতী ইন্দুবালা, অদ্য পবিত্র পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া, আমি তোমাকে বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করিলাম।

কন্যা। শ্রীমান্ যোগেন্দ্রনাথ, অদ্য পবিত্র পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া, আমি তোমাকে বৈধ পতিরূপে গ্রহণ করিলাম।

বর। সম্পদে বিপদে,সুখে দুঃখে, সুস্থতা অসুস্থতায়, তোমার মঙ্গলসাধনে আমি যাবজ্জীবন যত্নবান থাকিব।

কন্যা। সম্পদে বিপদে,সুখে দুঃখে,সুস্থতা অসুস্থতায়, তোমার মঙ্গলসাধনে আমি যাবজ্জীবন যত্নবতী থাকিব।

বর। আমার হৃদয় তোমার হউক, তোমার হৃদয় আমার হউক, এবং আমাদের উভয়ের হৃদয় এইরূপে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের হউক।

কন্যা। আমার হৃদয় তোমার হউক, তোমার হৃদয় আমার হউক, এবং আমাদের উভয়ের হৃদয় এইরূপে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের হউক।

বর। তুমি আমার সখী হও, আমি যেন তোমার সখা হই, আমাদের উভয়ের সখ্যতা যেন কখনও ভঙ্গ না হয়।

কন্যা। তুমি আমার সখা হও, আমি যেন তোমার সখী হই, আমাদের উভয়ের সখ্যতা যেন কখনও ভঙ্গ না হয়।

কুঞ্জ মনে মনে বলিল, "যাক্। চুকে গেল। এ ব্যাপার তবে এইখানেই শেষ।"

উদ্বাহ প্রতিজ্ঞা শেষ হইলে বরকন্যা একে একে একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা, বহি দেখিয়া পাঠ করিলেন। তাহার পর আচার্য্য মহাশয় উপদেশ ও কল্যাণ প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন।

উপদেশ দিতে দিতে প্রবীণ আচার্য্য মহাশয়ের ভাবোচ্ছ্বাস পরতে পরতে উঠিয়া ক্রমে এতই প্রবল হইল যে, অবশেষে তিনি কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। কুঞ্জ দেখিল, শ্রোতৃগণ অনেকেই তাঁহার সেই ক্রন্দন ও হাতমুখ নাড়া দেখিয়া এবং উপদেশ শুনিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছে। তাহার আর সহ্য হইল না, সে পাশ কাটাইয়া নীচে নামিয়া রাজপথে বাহির হইয়া পড়িল।

ডাক্তার সাহেবের বাড়ীতে যাওয়ার আর প্রয়োজন নাই। গঙ্গাজল স্পর্শের কথাও আর তাহার মনে ছিল না। ক্ষুধাটা বিলক্ষণ অনুভব করিতে লাগিল।

নূতন বাজারের একটা খাবারের দোকান হইতে সুযোগমত গোটাকতক মিহিদানা, এবং পানের দোকান হইতে এক বোতল লেমনেড ও একদোনা মিঠা পানের খিলি উঠাইয়া লইয়া কুঞ্জ বীডন বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

বুড়াবুড়ীর প্রেম।

বাগানে একখানি খালি বেঞ্চের উপর বসিয়া জলযোগ শেষ করিয়া, কুঞ্জ উঠিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় একজন নগ্নপদ কৃশদেহ প্রৌঢ়বয়স্ক এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক আসিয়া সেই বেঞ্চের প্রান্তভাগে বসিয়া, দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "হা ভগবান্! তোমার মনে এই ছিল?"—বলিয়া বাবুটি বেঞ্চের হাতলে হাত রাখিয়া তদুপরি নিজ মস্তক স্থাপিত করিয়া বসিয়া রহিলেন। লোকটি কি করে দেখিবার জন্য কুঞ্জ অপেক্ষা করিল।

কিয়ৎক্ষণ কাটিলে কুঞ্জ একটা ফোঁস ফাস শব্দ শুনিতে পাইল। চাহিয়া দেখিল, বাবুটি কাঁদিতেছেন। প্রায় পাচ মিনিট কাল ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া, কোঁচার প্রান্তভাগ তুলিয়া বাবুটি চক্ষু মুছিতে লাগিলেন। আরও কিয়ৎকাল শূন্যে দৃষ্টি করিয়া বসিয়া থাকিবার পর, উঠিলেন।

ইঁহার অবস্থা দেখিয়া কুঞ্জলালের মনে প্রথমাবধি একটা সহানুভূতি জাগিয়াছিল; তাই, লোকটির কিসের এত দুঃখ জানিবার অভিপ্রায়ে সে তাঁহার অনুসরণ করিল।

বাবুটি বাগান হইতে বাহির হইয়া, বীডন ষ্ট্রীট ধরিয়া চলিলেন। পথে বিপরীত দিক হইতে এক ব্যক্তি আসিতেছিল, তাহার সম্ভাষণে কুঞ্জ জানিতে পারিল, ইনি ব্রাহ্মণ, নাম কেদারনাথ। কেদার বাবু ক্রমে গলির ভিতর ঢুকিয়া দর্জ্জিপাড়ার একটি ক্ষুদ্র দ্বিতলগৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দরজার কড়া নাড়িতে লাগিলেন। ভিতর হইতে শব্দ হইল—"যাই।"

অর্দ্ধ মিনিট পরে, দ্বারের নিকট হইতে শব্দ হইল "কে?" কেদার বলিলেন, "আমি, খোল।"—দ্বার

খুলিয়া গেল। কুঞ্জ দেখিল লণ্ঠনহস্তে একটি গৌরাঙ্গী মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছেন। কেদার বাবুর পশ্চাৎ সেও নিঃশব্দে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

স্ত্রীলোকটি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু হল ?"

কেদার বাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "না মৃণা, কিছু হল না। চল।"

কুঞ্জ যথার্থই অনুমান করিল, স্ত্রীলোকটির নাম মৃণালিনী এবং ইনি কেদার বাবুর সহধর্ম্মিণী। মৃণালিনী আগে আগে চলিলেন। পশ্চাৎ কেদার বাবু, তৎপশ্চাৎ কুঞ্জ দ্বিতলে উঠিয়া একটি কক্ষে প্রবেশ করিল।

দেখিল, কক্ষটির অবস্থা নিরতিশয় দরিদ্রতাব্যঞ্জক! আসবাবপত্র কিছুই নাই। এক প্রান্তে একটি ছিন্ন মাদুরের উপর একটি ১৩।১৪ বৎসরের মেয়ে শুইয়া, তাহার দুই পাশে দুইটি বালক ঘুমাইতেছে। বারান্দায় মাটীর কলসীতে জল, একটি টিনের মগ ছিল ; কেদার বাবু হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া, গামছায় মুছিতে মুছিতে ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেপিলে খেয়েছে ?"

গৃহিণী ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "খাইয়েছি। তুমি এখন খাবে, ভাত বাড়বো ?"

"আমার তো তেমন ক্ষিদে নেই।"

গৃহিণী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, কিয়ৎক্ষণ নতনেত্রে মেঝের পানে চাহিয়া রহিলেন। শেষে মুখখানি তুলিয়া বলিলেন, "খাও। চাল যা আছে, কালকের দিনটাও চল্‌বে।"

"তার পর ?"

"তার পর ঈশ্বর আছেন।"

কেদার বাবু সেই মাদুরের উপর শুইয়া পড়িলেন। গৃহিণী লণ্ঠনটি লইয়া বারান্দায় বাহির হইয়া, একখানি ছেঁড়া কুশাসন আনিয়া ঘরের মাঝখানে বিছাইলেন। এনামেলের গেলাসে এক গেলাস জল আনিয়া, কিছু জল মেঝের উপর ছিটাইয়া "ঠাঁই" করিলেন। শেষে আবার বারান্দায় গিয়া, এনামেলের থালায় এক থালা মোটা লাল চাউলের ভাত আনিয়া সেখানে রাখিলেন—ডাল নাই, তরকারী নাই, মাছ নাই—এক পার্শ্বে খানিকটা লবণ মাত্র।

কেদার তখন উঠিয়া, আসনে গিয়া বসিলেন। গেলাস হইতে ভাতে কিঞ্চিৎ জল ঢালিয়া, নুণ দিয়া বেশ করিয়া মাখিয়া, ভাত খাইতে লাগিলেন। তাঁহার খাওয়ার ধরণ দেখিয়া কুঞ্জ বেশ বুঝিতে পারিল, লোকটি ক্ষুধায় একান্ত কাতর আছেন।

অর্দ্ধেকগুলি ভাত খাইয়া, কেদারবাবু জলের গেলাস ধরিলেন। মৃণালিনী বলিলেন, "ওকি, এখনই জল খাচ্ছ যে ? ও ভাত ক'টি খেয়ে ফেল।"

কেদার বলিলেন, "আর খেতে পারছিনে।"

"না না, খাও ওক'টি। আমার ভাত আছে। সত্যি বলছি আছে। হাঁড়ি এনে দেখাব ?"

কেদার বলিলেন, "না, দেখাতে হবে না। ভাত যদি কিছু বাঁচে, জল দিয়ে রেখে দিও, কাল সকালে উঠে ছেলেপিলে খাবে।"—বলিয়া তিনি জল খাইয়া উঠিয়া পড়িলেন।

বারান্দায় বাহির হইয়া কেদার বাবু আঁচাইতে লাগিলেন। গৃহিণী গোপনে বসনাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

আঁচাইয়া আসিয়া কেদারবাবু মাদুরখানিতে বসিলেন। গৃহিণী কুলুঙ্গি হইতে একটি কাগজের মোড়ক পাড়িয়া স্বামীর হস্তে দিলেন। কেদার তাহা খুলিলে কুঞ্জ দেখিল কয়েকটুকরা কাটা হরীতকী রহিয়াছে। কেদার তাহাই দুই একটা লইয়া মুখে দিলেন। গৃহিণী বসিয়া স্বামীর জন্য তামাক সাজিতে লাগিলেন।

হুঁকা লইয়া কেদার বলিলেন, "হাঁড়ি থেকে আর চারটি ভাত ঢেলে নাও—নিয়ে খেতে বস।"

"বস্‌ছি।"—বলিয়া গৃহিণী স্বামীর পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। ক্ষণপরে কহিলেন, "আহা, পা দুখানি ফেটেছে। একটু সর্ষের তেলও ঘরে নেই যে মালিস করে দিই। কখনও শুধু পায়ে চলা অভ্যেস নেই। এই দুঃখের দিনে জুতোযোড়াটিও গেল হারিয়ে।"

কেদার বাবু হুঁকায় দুই তিন টান টানিয়া, হুঁকা

নামাইয়া বলিলেন, "দেখ মিনা, কাল তোমায় একটি মিথ্যে কথা বলেছি। তোমায় কখনও মিথ্যে বলিনে—কিন্তু কাল বলেছি। আমার জুতো হারায়নি। ঘরে একটি চাল ছিল না, একটি পয়সা ছিল না, সকাল বেলা উঠে তিন চারজন সেকালের বন্ধুর কাছে গিয়ে টাকা ধার চাইলাম, কেউ দিলে না। প্রথমে একটাকা চেয়েছিলাম, তার পর আট আনা—তাও কেউ দিলে না। সকলেই বল্লে, টাকা ত কতবার ধার নিয়ে গেলে, উবুড়হস্ত ত কখনও করনি; আজ হবে না, অন্য কোথাও চেষ্টা দেখ।—আমি তখন হতাশ হয়ে, একজন মুটেকে আট আনা পয়সায় জুতো যোড়াটি বেচে, কাল বাজার কিনে এনেছিলাম।"

গৃহিণীর চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। স্বামীর পায়ে তাঁহার উভয় হস্ত নিয়োজিত ছিল, চোখ মুছিবার অবসর হইল না। কেদারবাবু হুঁকা রাখিয়া, কোঁচার কাপড়ে সাদরে পত্নীর চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "কেঁদ না, কেঁদে আর কি হবে? কত কষ্ট ভগবান কপালে যে লিখেছেন, দেখাই যাক্।"

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কেদার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কেউ এসেছিল?"

"বাড়ীওয়ালার ছেলে এসেছিল। আমি বল্লাম, বাবু টাকার চেষ্টায় বেরিয়েছেন, কিছু টাকা পাওয়া গেলেই একমাসের ভাড়া দেবো। ছেলেটা মুখ ঘুরিয়ে বল্লে, 'চার মাসের ভাড়া পাওনা, এক মাসের দেবে কি রকম? এ বাড়ীর অন্যান্য ভাড়াটেরা মাসের ৫ তারিখের মধ্যেই ভাড়া ফেলে দেয়, তোমাদের ভাড়া এরকম করে আমরা বাকী রাখতে পারব না। সাত দিনের মধ্যে চার মাসের ভাড়া চুকিয়ে দিতে হবে, বাবু এলে বোল।' আমি বল্লাম, 'বাবা, অবস্থা ত দেখছ, একসঙ্গে পারব না, ক্রমে ক্রমে শোধ করব।' ছেলেটা বল্লে, 'বাবা বলেছেন আর একটা মাস দেখে, ভাড়া আদায় হোক না হোক তোমাদের বের করে দেবেন। তোমরা এই ঘরখানির ৮৲ টাকা ভাড়া দিচ্চ, কত লোক ১২।১৪ টাকা ভাড়ায় এ ঘরখানি নেবার জন্যে সাধাসাধি করছে। ভাড়া দেবার ক্ষমতা না থাকে, খোলার ঘরে যাওনা কেন, ৩।৪ টাকায় ঘর পাবে।'—বলে গজগজ করতে করতে চলে গেল।"

পারিবারিক দুঃখের কথা আরও অনেক হইল। সে সকল শুনিয়া, এই হতভাগ্য দম্পতীর সঙ্গে সঙ্গে কুঞ্জও অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। সে মনে মনে স্থির করিল, যাইবার পূর্ব্বে ব্যাগ হইতে কিছু নোট বাহির করিয়া এই ঘরে ফেলিয়া যাইবে।

অবশেষে স্বামীর কাতর অনুরোধে গৃহিণী উঠিয়া পাতের কাছে বসিলেন। কেদারবাবু বলিলেন, "হাড়ি থেকে আর চারটি ভাত নিয়ে বস, ওক'টিতে কি হবে?"

"এতেই ঢের হবে।" বলিয়া তিনি খাইতে লাগিলেন।

আহারান্তে স্বামীর কাছে আসিয়া গৃহিণী বলিলেন, "শোও, তোমার পা দুটি টিপে দিই।"

"না, আমার এখন শুলে চলবে না, একটু কায আছে। তুমি শোও।"

"কি কায?"

"একখানা চিঠি লিখবো।"

দুর্দ্দশায় পড়িয়া স্বামী মাঝে মাঝে দূরদেশস্থ আত্মীয় বন্ধুগণকে পত্র লিখিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন, গৃহিণী তাহা জানিতেন। মনে করিলেন, সেইরূপ কোনও পত্র স্বামী এখন লিখিবেন। বলিলেন, "বেশী রাত কোরো না। সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়েছ।"—বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কেদার বাবু নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খুকী ঘুমিয়েছে?"—বলিয়া তিনিও উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

গৃহিণী কক্ষের অপর প্রান্তে শয্যার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "ঘুমুচ্চে।"

কেদার বাবু স্ত্রীকে সবলে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন, "মিনু, আমার হাতে পড়ে কি কষ্টটাই তোমায় পেতে হল! আমায় তুমি মাফ কর মিনু!"

মৃণালিনী স্বামীর স্কন্ধে মাথাটি রাখিয়া বলিল,

"তোমায় কিচ্ছু দোষ নেই। আমারই পোড়া অদৃষ্টের দোষ।"

কেদার বাবু বলিলেন, "তোমায় আমার দুজনেরই অদৃষ্টের দোষ। আমাদের যখন বিয়ে হয়েছিল, নতুন নতুন আমরা যখন সংসার পেতেছিলাম, তখন কি কেউ আমরা স্বপ্নেও জানি যে একদিন এই দারুণ কষ্টে আমাদিকে পড়তে হবে? তুমি আমায় মাফ কর মিনু, বল মাফ করলে।"

মিনু স্বামীর স্কন্ধ হইতে মুখখানি তুলিয়া, সজল নয়নে ঈষৎ হাসিমুখে বলিল, "আচ্ছা, সেকালে তুমি আমায় যেমন করে' আদর করতে, সেই রকম একটিবার কর—আমি তোমায় মাফ করবো।"

বাবুটি তখন স্ত্রীকে পুনরায় বক্ষে বাঁধিয়া স্নেহভরে তাহার ওষ্ঠে গণ্ডে, চক্ষে বক্ষে, ললাটে কুন্তলে এক একটি প্রগাঢ় চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিয়া, তাহার বাহুতে আদরে হাত বুলাইতে লাগিলেন। অনশনক্লিষ্টা ছিন্নবসনা এই রমণীর মুখখানি সে সময় দেখিয়া কুঞ্জলালের মনে হইল, যেন তাহার সর্ব্বশরীর সিঞ্চিত করিয়া একটি অমৃতধারা বহিতেছে। এই পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া সে ভাবিল—ইহাই যথার্থ খাঁটি প্রেম; যুবক-যুবতীর প্রেম যতই প্রবল হউক, তাহাতে অন্য জিনিষের অল্পবিস্তর খাদ আছে এ সন্দেহ কিছুতেই যায় না।

স্বামী বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত দিলে, মৃণালিনী গলবস্ত্র হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, চক্ষু মুছিয়া, তামাক সাজিতে বসিল। শেষে কলিকাটি সেখানে রাখিয়া বলিল, "যখন খেতে ইচ্ছে হবে, টিকে ধরিয়ে নিও। এই দেশলাই রইল।"—বলিয়া হাত ধুইয়া পুত্রকন্যাদের বিছানায় গিয়া শয়ন করিল।

কেদার বাবু লিখনোপকরণগুলি সংগ্রহ করিয়া একটি টিনের বাক্সের উপর কাগজ রাখিয়া চিঠি লিখিতে বসিলেন। কুঞ্জ ভাবিল, আর এখানে রাত্রি করিয়া কি হইবে, একতাড়া নোট একস্থানে ফেলিয়া রাখিয়া, আস্তে আস্তে সরিয়া পড়ি। কত টাকা দিয়া যাইবে ইহাই কুঞ্জ চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ তাহার নজর পড়িল, কেদার বাবু চিঠি আরম্ভ করিয়া লিখিয়াছেন—প্রিয়তমা মৃণালিনী! কুঞ্জ আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল এ কি! যে মানুষ ঘরের ওপাশে শুইয়া রহিয়াছে, তাহাকে চিঠি লেখা কেন? বুড়ার মনে কোনও কুমৎলব নাই ত? ভাল করিয়া সরিয়া বসিয়া চিঠিখানি কুঞ্জ দেখিতে লাগিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব।

কেদার বাবু ভাবিয়া ভাবিয়া, একটু একটু করিয়া লিখিতে লাগিলেন, কুঞ্জ পড়িতে লাগিল। খানিকটা লেখা হইলে কুঞ্জ বুঝিল, ইনি পূর্ব্ব কথা লিখিতেছেন। ইঁহার একটি ব্যবসায় ছিল, তাহা হইতে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া যাইত, কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে ব্যবসায়টি আজ চারিবৎসর যাবৎ ফেল হইয়া গিয়াছে। দেউলিয়া আদালত তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া, পাওনাদারগণের দাবী আংশিক ভাবে মিটাইয়া দিয়া, তাঁহাকে অব্যাহতি (discharge) দিয়াছেন। তাহার পর হইতে ইনি চাকরির চেষ্টায় নানাস্থানে ঘুরিয়াছেন, চাকরি কোথাও জুটে নাই; আর একটি ব্যবসায় ফাঁদিবার জন্য বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের কাছে মূলধন কর্জ্জ চাহিয়াছিলেন, কেহ কিছু দেয় নাই। স্ত্রী কন্যার অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া একবৎসরের অধিক কাল সংসার চালাইয়া, এখন এই ঘোর দুর্দ্দশায় উপনীত হইয়াছেন। "মিনু, তুমি ত জান"—বলিয়া কেদার বাবু এক একটি অংশ আরম্ভ করেন, এবং দুর্দ্দশার গহ্বরে নামিবার এক একটি সোপান সংক্ষেপে চিত্রিত করেন। এইরূপে প্রায় চারি পৃষ্ঠা চিঠি লেখা হইয়া গেল।

তারপর কেদার বাবু লিখিলেন—

"আজ সারাদিন ঘুরিয়া কোথাও কিছু না পাইয়া, সন্ধ্যার পর শ্রান্তদেহে বীডন বাগানে প্রবেশ করিয়া একখানি খালি বেঞ্চি দেখিয়া বসিলাম। সেই অন্ধকারে, নিজ অন্ধকার অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতে

করিতে সহসা যেন একটা আলো দেখিতে পাইলাম। দশ হাজার টাকায় আমার ত জীবনবীমা করা রহিয়াছে—লাভের অংশ সহ এতদিনে বোধ হয় আরও ৫।৬ শত টাকা আমার প্রাপ্য হইয়াছে—সেই টাকা পাইলে এখন কিছুকাল ত তোমাদের অশন বসনের কোনও ক্লেশ থাকে না, খুকীর বিবাহটাও হইয়া যায়। দেউলিয়া হইয়াও, এত দুঃখদৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াও সেই জীবনবীমার প্রীমিয়মটি গত পূজা পর্য্যন্ত আমি দিয়া আসিয়াছি; কেবল এদিকে আটমাস দিতে পারি নাই। আমার মৃত্যু হইলে, প্রাপ্য টাকা হইতে এই আট মাসের প্রীমিয়ম তাহারা কাটিয়া লইবে, লইলেও দশ হাজারের উপর পাওয়া যাইবে। সুতরাং —ঐ একমাত্র উপায় আছে যাহাতে আমার স্ত্রী পুত্র কন্যার ভরণপোষণের একটা উপায় আমি করিতে পারি। সেইখানে বসিয়া অনেক চিন্তা করিয়া আমি মনস্থির করিলাম যে, সকল কথা চিঠিতে তোমায় লিখিয়া, আজ আমি গঙ্গাগর্ভে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব।

"কিন্তু জন্মের মত তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, ইহা ভাবিতে আমার দুই চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় জল পড়িতে লাগিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া ছেলেমানুষের মত কাঁদিলাম। অবশেষে একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

"প্রিয়তমে, ভাবিয়া দেখিও, প্রতিদিন তোমার ও ছেলেমেয়েগুলির যে দারুণ ক্লেশ আমি দেখিতেছিলাম, তাহাতে আমার মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা হইতেছিল। তবু এতদিন এক বেলা হউক, দুইবেলা হউক, দুটি নুণভাত তোমাদের মুখে যোগাইতে পারিয়াছিলাম। অবশেষে জুতা বিক্রয় করিয়া দুই দিনের আহারের সংস্থান করিতে হইল। যে চাউল ক'টি আছে, কাল সেগুলি শেষ হইবে। তার পর, পশু? আর কি আছে যে বিক্রয় করিব? তখন যে একেবারে অনাহার। মেয়েটি, ছেলে দুটি, তুমি—আহার অভাবে আমার চোখের সামনে ছটফট করিয়া মরিয়া যাইবে—তাহা দেখিয়াও কি আমি বাঁচিয়া থাকিতে পারিব? আমার হৃদয় কি এতই কঠিন যে সে দৃশ্য দেখিয়াও ফাটিয়া গিয়া আমার মৃত্যু হইবে না? সুতরাং মৃত্যু ত আমার অনিবার্য্য। ওরূপ ভাবে দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া না মরিয়া, মা গঙ্গার শীতল ক্রোড়ে শুইয়া যদি মরিতে পারি—এবং সেই সঙ্গে যদি তোমাদের অন্নসংস্থান হয়,—তবে তাহাই কি আমার একান্ত কর্ত্তব্য নয় মিনু?"

লিখিতে লিখিতে মাঝে মাঝে কেদার বাবু কোঁচার খুঁটে চক্ষু মুছিতে লাগিলেন; কুঞ্জলালও তাহাই করিতে লাগিল। সে মনে মনে বলিল, "তোমায় আমি মরিতে দিব না বন্ধু! মরিলে তুমি যে দশ হাজার টাকা পাইতে, সেই দশহাজার টাকাই আমি তোমায় দিব। তুমি মেয়ের বিবাহ দিও, নূতন ব্যবসা ফাঁদিয়া তোমার মিনুকে লইয়া, তোমার ছেলেমেয়েদের লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিও। আমার বত্রিশ হাজার আছে, তোমার আশীর্ব্বাদে কালও কিছু সংগ্রহ করিতে পারিব সন্দেহ নাই—তোমায় দশ হাজার দিতে কুঞ্জশর্ম্মা কাতর নহে।"

তাহার পর কেদারবাবু লিখিয়া যাইতে লাগিলেন—

"আমার লাস কল্য কোনও সময়ে সরকারের লোক জল হইতে উদ্ধার করিবে। এ বিপুল কলিকাতা সহরের নীচে আমার লাস যে লোকচক্ষুর অগোচরে ভাসিয়া যাইবে তাহার কোনও সম্ভাবনা নাই। লাস তুলিয়া আনাইয়া সনাক্ত জন্য তাহা মেডিক্যাল কলেজে রাখিবে। তুমি পারিবে না—বাড়ীর অন্য ভাড়াটিয়াদের অথবা আমাদের পরিচিত অন্য লোকদের পাঠাইয়া দিও, তাহারা আমার লাস দেখিয়া সনাক্ত করিয়া আসিবে, তাহা হইলেই আমার মৃত্যু প্রমাণিত হইবে। এ চিঠি খানিও করোনার কোর্টে দাখিল করিও। হাতবাক্সে আমার জীবনবীমার পলিসিখানি রহিল, সেখানি লইয়া কোনও ভাল উকীলের নিকট যাইও, তিনি টাকাটা বাহির করিবার জন্য যাহা যাহা করিতে হয় সমস্ত করিয়া দিবেন। টাকার ওয়ারিশ ছেলে দুটি। তাহারা সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি তাহাদের গার্জ্জেন হইবার জন্য আদালতে দরখাস্ত দিও। যা করিবার

উকীলবাবুই করিয়া দিবেন। টাকার হেফাজতও আদালত হইতেই হইবে। জজ সাহেবের আদেশ লইয়া, সেই টাকা হইতে একহাজার কি দেড় হাজার খরচ করিয়া খুকীর বিবাহ দিও। বাকীটাকাগুলি খুব সাবধানে রাখিয়া, খুব বুঝিয়া সুঝিয়া খরচ করিয়া, ছেলে দুটিকে মানুষ করিয়া তুলিও। ভগবানের কৃপায় উহারা মানুষ হইলে তোমার দুঃখ ঘুচিবে।”

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া কেদার বাবু কলম ফেলিয়া বাহিরের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইয়া, নিঃশব্দে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলেন। শেষে মুখে চোখে জল দিয়া, ঘরে আসিয়া টিকা ধরাইয়া, পত্নীহস্তের শেষ সেবাটি উপভোগ করিতে লাগিলেন।

তামাক খাওয়া হইলে, পুনরায় কলম লইয়া চিঠি শেষ করিতে বসিলেন। কাযের কথা সব লেখা হইয়া গিয়াছিল, এখন শুধু ভাবের কথা। বেশী লিখিতে পারিলেন না—চোখের জলে অক্ষর দেখিতে পাওয়া দায়। কুঞ্জও সেই অংশ পড়িয়া নীরবে কাঁদিল।

লেখা শেষ করিয়া, কাগজগুলি পাটপিট করিয়া, কেদার বাবু তাহা কুলজিতে রাখিলেন। রিংশুদ্ধ নিজের চাবিগুলি তাহার উপর চাপা দিলেন। কুঞ্জ ইতিমধ্যে তাহার ব্যাগটি খুলিয়া, যমুনাপ্রসাদের সেই নোটগুলির দশটি থাক গণিয়া বাহির করিল।

চিঠি রাখিয়া, যেখানে স্ত্রী পুত্র কন্যা শুইয়া ছিল, কেদার বাবু সেইখানে গিয়া ঘুমন্ত পুত্রকন্যাগুলির গালের উপর এক একটি চুম্বন করিলেন। মাথায় হাত রাখিয়া, মনে মনে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অবশেষে পত্নীর মুখে বিদায় চুম্বন অর্পণ করিয়া, ধীরে ধীরে দ্বারটি খুলিয়া বাহির হইলেন। কুঞ্জও তাঁহার পশ্চাতে বাহির হইল। ইতিমধ্যে কুলজি হইতে পত্রখানি সে তুলিয়া লইয়া, সেই স্থানে নোটগুলি রাখিয়া, চাবি চাপা দিয়াছিল।

কেদার বাবু অন্ধকারে সাবধানে সিঁড়ি নামিতে লাগিলেন। নীচে তলায় একটি ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, দ্বারে মৃদু মৃদু করাঘাত করিতে করিতে ডাকিলেন, “মোক্ষদা—ও মোক্ষদা।”

মোক্ষদা এ বাড়ীর ভাড়াটিয়াগণের ভাগের ঝি। রাত্রে এই ঘরে শুইয়া থাকে। সে উঠিয়া দ্বার খুলিয়া বলিল, “কেন বাবু?”

“আমি একবার বাইরে যাচ্ছি, সদর দরজটা বন্ধ করে দেবে এস দিকিন।”

মোক্ষদা বলিল, “এতরাত্রে কোথায় যাচ্ছেন বাবু?”

“একটু দরকার আছে।”—বলিয়া তিনি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং দ্বার খুলিলেন। মোক্ষদা জিজ্ঞাসা করিল, “কতক্ষণে ফিরবেন বাবু?”

“তা বলা যায় না।”—বলিয়া কেদার বাবু বাহির হইলেন।

“আচ্ছা, যখন আসবেন, এসে কড়া নাড়বেন এখন, আমি উঠে খুলে দেবো।” বলিয়া মোক্ষদা দ্বার বন্ধ করিল।

কেদার বাবু গলিপথে চিৎপুর রোডের দিকে অগ্রসর হইলেন। ক্রমে বড় রাস্তা পার হইয়া, আহিরীটোলার ভিতর দিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন।

ঘাট তখন একেবারে জনশূন্য। জলপ্রান্তে দাঁড়াইয়া, একটু গঙ্গাজল লইয়া মাথায় গায়ে ছিটাইয়া দিয়া “গঙ্গে! গঙ্গে!” বলিতে বলিতে কেদার বাবু জলে নামিলেন।

একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইয়া, কোমর জলে গিয়া দাঁড়াইলেন। “গঙ্গে! মা!”—বলিয়া হাত দুইটি যোড় করিয়া, স্থির অকম্পিত স্বরে, পঝ্‌টিকাছন্দে শঙ্করাচার্য্য কৃত গঙ্গাস্তোত্রটি পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহার পর, প্রণাম মন্ত্র পাঠ করিয়া অনুচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন:—“পতিত পাবনী পতিত উদ্ধারিণী মা আমার, আমি আজ যে কায করতে এসেছি তা মহা অন্যায়—মহাপাপ—আমি জানি। কিন্তু তুমি যে মা, কলুষবিনাশিনী নরকনিবারিণী—এমন্ কোন্ মহাপাপ আছে, যা তোমার জলের মাহাত্ম্যে

নাশ হয়ে না যায়? আমার আর কোনও উপায় ছিল না মা, তাই আমি এ কায করছি। মা! অন্তিম কালে তোমার চরণে এই আমার প্রার্থনা, যাদের রেখে যাচ্ছি তারা যেন কোনও কষ্ট না পায়। আর আমার কিছুই বলবার নেই—এইবার আমি তোমার কোলে আশ্রয় নিই—পায়ে ঠেল না মা!"—বলিয়া কেদার বাবু সম্মুখে এক পদ অগ্রসর হইবামাত্র, সহসা কোথা হইতে একটা ধীর গম্ভীর স্বর শুনিলেন—

"বৎস, স্থিরো ভব!"

এই স্বর শুনিয়া, চমকিয়া উঠিয়া, কেদারবাবু সম্মুখে, উভয় পার্শ্বে, পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিলেন। স্থানটা নিতান্ত অন্ধকারও নয়, জেটি হইতে কিছু পরিমাণ আলোক সেখানে আসিতেছিল—কিন্তু কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তীরের দিকে চাহিলেন, সেখানও জনমনুষ্য নাই। ভাবিলেন—নিশ্চয়ই ইহা আমার মনের ভ্রম মাত্র; মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।

ক্ষণপরেই আবার সেই গম্ভীর স্বর—"বৎস কেদারনাথ!"—স্বর খুব নিকট হইতে আসিতেছে—কেদার বাবুর যেন মনে হইল, জলের ভিতর হইতেই স্বরটা উঠিতেছে।

ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া তিনি যেন জড়পদার্থের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। আবার অতি স্পষ্ট স্বর শুনিলেন—"বৎস, ওঠ, বাড়ী যাও।"

এইবার কেদার বাবু সাহস সংগ্রহ করিয়া, সকাতরে বলিলেন, "কে আমায় ডাকছেন? কোথায় আপনি?"

উত্তর—"এই জলে!"

"কে আপনি?"

"আমি গঙ্গা—জহ্নুকন্যা—ভাগীরথী।"

শুনিয়া কেদার বাবুর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁটা দিয়া উঠিল। তাঁহার চৈতন্যলোপের উপক্রম হইল। সেই বুকজলে দাঁড়াইয়া ঠকঠক করিয়া তিনি কাঁপিতে লাগিলেন। একটি কথাও তাঁর মুখ দিয়া বাহির হইল না।

পুনরায় শব্দ শুনিলেন—"ওঠ বৎস, গৃহে যাও। তুমি আজ প্রাণত্যাগ করলে, তোমার সতীলক্ষ্মী স্ত্রী সে শোক সইতে পারবে না—সেও মরে যাবে। তখন তোমার অসহায় পুত্রকন্যাদের কি হবে বৎস? এ পাপ-সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর—ওঠ, ঘরে যাও।"

কেদার বাবু জড়িত কম্পিত স্বরে বলিলেন, "ঘরে গেলে, আমার দিন চলবার উপায় কি হবে মা?"

"ভয় কি বৎস? তোমার স্তবে আমি তুষ্ট হয়েছি, তোমার উপায় করে দিচ্ছি। আমি অন্তর্য্যামিনী—সবই জানি। জীবনবীমার দশ হাজার টাকার জন্য তুমি প্রাণত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছ। তা তোমার করতে হবে না—ঘরে যাও, আমার বরে দশ হাজার টাকাই তুমি সেখানে পাবে।"

কেদার বাবুর মনে দারুণ সন্দেহ হইল, এ সকল কথা যাহা শুনিলেন, সমস্তই বোধ হয় তাঁহার নিজের মস্তিষ্ক-বিকৃতির ফল মাত্র। পূর্ব্ব অভিপ্রায় অনুসারে গভীর জলের দিকে অগ্রসর হইবেন, অথবা তীরে উঠিবেন, কিছুই ঠিক করতে পারিলেন না।

এই অবস্থায় শুনিলেন—এবার স্বরটা তেমন কোমলতা-ব্যঞ্জক নহে, যেন রোষযুক্ত—"মূর্খ নির্ব্বোধ পাপী! এখনও তোমার মনে অবিশ্বাস হচ্চে? তবে এই দেখ।"

কেদার দেখিলেন, জল হইতে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে শুভ্রবর্ণ কি একটা পদার্থ নিরালম্বে নিশ্চলভাবে রহিয়াছে।

শব্দ হইল—"নাও, ধর।"

কেদার হস্ত প্রসারণ করিয়া সেই দ্রব্য গ্রহণ করিয়া দেখিলেন, কাগজ। শব্দ শুনিলেন, "না, ওখানা দশহাজার টাকার নোট নয়। অত বড় নোট তুমি ভাঙ্গাবে কি করে? খুলে দেখ—আসবার সময় তোমার স্ত্রীকে যে চিঠি লিখে রেখে এসেছিলে, সেই চিঠি।"

কেদার বাবু কম্পিত হস্তে কাগজগুলির ভাঁজ খুলিলেন। জেটি হইতে যে আলোক আসিতেছিল, তাহার সাহায্যে, লেখাগুলি পড়িতে না পারিলেও,

বেশ বুঝিতে পারিলেন ইহা তাহারই লেখা সেই চিঠিখানি।

স্বর বলিল, "তোমার ঘরের কুলুঙ্গি থেকে এই চিঠিখানি নিয়ে, সেইখানে দশ হাজার টাকার নোট, চাবি চাপা দিয়ে রেখে এসেছি। তাহাতে পাছে তোমার অসুবিধা হয় বলে, কেবল দশ টাকার নোট দিয়েছি। যাও, সেই টাকা থেকে মেয়েটির বিয়ে দিও। বাকী টাকার অর্দ্ধেকটা জমা রেখে, অর্দ্ধেকটা কেলে একটি ব্যবসা কোরো, তাহলেই তোমার স্বচ্ছন্দে দিনপাত হবে। এ পাপ-চিঠিখানা এখনই টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে, আমার জলে ভাসিয়ে দাও—আর কখনও এ রকম দুর্ম্মতি কোরো না খবর্দ্দার।"

কেদার বাবু চিঠিখানি কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া জলে ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন, "মা! শত শত জন্মের পুণ্যফলে আপনার এ কৃপালাভ আজ আমার হল,—আমি স্বকর্ণে আপনার প্রত্যাদেশ শুনলাম। একবার আমায় চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দেখা দাও মা, দেখে জন্ম সার্থক করি।"—বলিয়া তিনি হাত দুটি যোড় করিলেন।

"মা" বলিলেন, "সে পরিমাণ পুণ্য এখনও তোমার সঞ্চয় হয়নি বাছা। তবে বেশী দেরীও নেই। আর তিনশো তেত্রিশ জন্ম পরে, তোমার মৃত্যুকালে, আমি চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে তোমার নিকট স্বপ্রকাশ হব; তোমায় কোলে তুলে নিয়ে বৈকুণ্ঠে রেখে আসবো।"

কেদার বাবু ডাকিলেন—"মা!"

উত্তর নাই।

"চলে গেছ মা?"

উত্তর নাই।

কেদার বাবু তখন তাঁহার সিক্ত বস্ত্রপ্রান্ত গলায় জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে, পুনরায় গঙ্গার প্রণাম মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে ডুবের পর ডুব দিতে লাগিলেন। স্নানান্তে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে পৈতা জড়াইয়া দশবার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিয়া, জল হইতে উঠিলেন এবং কম্পিত স্বরে গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে, কম্পিত পদে আহিরীটোলা লেনের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

কুঞ্জ এতক্ষণ তাহার ব্যাগটি স্কন্ধোপরি ধারণ করিয়া কোমর জলে দাঁড়াইয়া ছিল। কেদার বাবু তীরে উঠিলে মনে মনে সে বলিল, "গঙ্গার অভিনয়টা করা গেল মন্দ নয়। বাঃ—আমি ত বেশ একৃট করতে পারি দেখ্ছি! দাঁড়াও, গ্রামে ফিরে যাই—সেখানে একটা সখের থিয়েটার পার্টি খুলতে হবে।"

কেদার বাবু অন্তর্হিত হইলে কুঞ্জ ভাবিল, "আমিও যাই, জলে দাঁড়িয়ে আর কি করব? ডুব একটা দেবো নাকি? ব্যাগটা কিন্তু ভিজবে তা হলে। তা, ভিতরে বোধ হয় জল ঢুকবে না। আর ঢোকেই যদি—পার্চ্চমেণ্টের নোট, কোনও ক্ষতি হবে না। গঙ্গায় নেমে স্নান না করে ফিরে যাওয়াটা নিতান্তই আহিন্দুয়ানি হবে যে!" বলিয়া ব্যাগটি দুই হস্তে উত্তমরূপে ধরিয়া কুঞ্জ গোটা চার-পাঁচ ডুব দিয়া তীরে উঠিল।

সিক্ত বস্ত্রে তাহার বেশ শীত করিতে লাগিল। উপরে যেখানে উড়িয়া ব্রাহ্মণেরা পয়সা লইয়া লোকের কপালে ফোঁটা দেয়, সেইখানে গিয়া একটা তক্তপোষে বসিয়া কাপড় জামা খুলিয়া বেশ করিয়া সেগুলি নিংড়াইতে লাগিল। হু হু করিয়া গঙ্গার শীতল বাতাস বহিতেছে। বেশ শীত করিতে লাগিল। তক্তপোষে দাঁড়াইয়া উঠিয়া ধুতিখানির খুঁট ধরিয়া হাওয়ায় মেলিয়া দিল। দারুণ-গ্রীষ্ম, অল্পক্ষণেই তাহা শুকাইয়া গেল। সারাদিনের পরিশ্রমে, এখন স্নানান্তে তাহার অত্যন্ত ঘুম পাইতে লাগিল। সর্ব্ব শরীরে শীত করিতেছে, কিন্তু মাথাটা দিয়া যেন আগুন ছুটিতেছে। কোট ও গেঞ্জি অত শীঘ্র শুকাইবে না; তাই ভিজা ব্যাগটি মাথায় দিয়া, ভিজা কোট ও গেঞ্জি মাথায় জড়াইয়া, সেই তক্তপোষের উপর শুইয়া কুঞ্জ অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল।

কতক্ষণ ঘুমাইল তাহা সে জানে না, কিঞ্চিৎ চেতনা-সঞ্চার হইলে, মনুষ্যকণ্ঠের মৃদুস্বর যেন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। চাহিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ঘুমে চোখ এমন জড়াইয়া গিয়াছে যে চোখের পাতা ভাল করিয়া

খুলিতে পারিল না; অল্প একটু খুলিয়া, দিবালোক দেখিয়া, পুনরায় নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

আবার কতক্ষণ ঘুমাইয়া ছিল, কুঞ্জ তাহাও জানে না। যখন চক্ষু খুলিল, দেখিল উড়িয়া বামুনদের সে তক্তপোষ কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, কোমল পরিস্কার শয্যায় সে শয়ন করিয়া রহিয়াছে; গঙ্গার ঘাট নহে—গোপালপুরে তাহার শয়নকক্ষেই সে রহিয়াছে; পার্শ্বে একখানি চেয়ার পাতিয়া ডাক্তার সরকার সাহেব (ইংরাজি বেশে) উপবিষ্ট। তাহার জেঠাইমা ঘরের মেঝেয় দাঁড়াইয়া আকুলনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া আছেন।

কুঞ্জ মাথার নিম্নে হাত দিয়া দেখিল তাহার সে ব্যাগ নাই—এ বালিস। বলিয়া উঠিল, "ব্যাগ? ব্যাগ কি হল?"

সরকার সাহেব বলিলেন, "আইস্ ব্যাগটা জল হয়ে গিয়েছিল, কিরণ তাতে তাজা বরফ ভরে আনতে গেছে। এখন কেমন আছ কুঞ্জ? কোনও কষ্ট আছে কি?"

কুঞ্জ ফ্যালফ্যাল করিয়া ডাক্তার সাহেবের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। জেঠাইমা নিকটে সরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমায় চিন্‌তে পারছিস্ বাবা?"

কুঞ্জ ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "চিনতে পারবো না কেন, কি হয়েছে?"

ডাক্তার সাহেব ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "শোও শোও—উঠনা উঠনা।"—বলিয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিলেন।

শুইয়া কুঞ্জ বলিল, "আমায় এখানে কে আনলে? আমি ত গঙ্গাতীরে শুয়ে ছিলাম।"

জেঠাই মা ক্রন্দনের স্বরে বলিলেন, "ঐ দেখ ডাক্তার, আমার বাছা ভুল বকছে। বালাই ষাঠ ষষ্ঠীর দাস আমার! ও কথা কি বলতে আছে বাবা? তুমি গঙ্গাতীরে শুয়ে থাকবে কেন? তুমি তোমার ঘরে শুয়ে আছ।"

"কখন থেকে?"

"আজ তিন দিন হয়ে গেল যে বাবা। 'কাল ভোরে উঠে কলকাতায় যাব' বলে সেই যে সন্দেশ খেয়ে শুলে, সকালে উঠে দেখি জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য হয়ে তুমি বিছানায় পড়ে রয়েছ—গা একেবারে আগুন।"

"তার পর?"

"তারপর রমেশ ডাক্তার এল, কেদার ডাক্তার এল, কত ওষুধ বিষুধ খাওয়ালে, কিন্তু সারাদিনেও তোমার চৈতন্য হল না দেখে ভয়ে আমাদের প্রাণ শুকিয়ে গেল। রাত্রে কিরণ বল্লে, এখানকার ডাক্তারেরা কিছু করতে পারবে না মাসিমা, কলকাতায় ইন্দুদিদির বাবা সরকার সাহেব আছেন, তিনি খুব বড় ডাক্তার, তাঁকেই টেলিগ্রাফ করে আনাও। সকালে এসে কেদার ডাক্তার টেলিগ্রাফ লিখে দিলে, ইষ্টিশনে লোক গিয়ে দিয়ে এল। কাল রাত বারোটার সময় ডাক্তার সাহেব এসে পৌঁছলেন। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে একমণ বরফ সঙ্গে করে এনেছিলেন—সেই তখন থেকে মাথায় বরফ চাপিয়ে এতক্ষণে তোমার জ্ঞান হল বাবা।"

কুঞ্জ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বিছানায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে বলিল, "আমি কি কলকাতায় যাই নি?"

"না বাবা—কলকাতায় গেলে আর কৈ?"

কুঞ্জ আপন মনে বলিল, "তবে কি এ ক'দিন যা দেখলাম সমস্তই স্বপ্ন?"

সরকার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনেক স্বপ্ন দেখেছ না কি?"

কুঞ্জ বলিল, "উঃ—আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য স্বপ্ন! লিখলে একখানা বই হয়।"

ডাক্তার সাহেব তাঁহার ব্যাগ খুলিয়া এক টুকরা শুষ্ক কলাপাতা বাহির করিয়া বলিলেন, "এই কলা পাতা ঘরের মেঝেয় পড়ে ছিল। এতে কি ছিল কুঞ্জ?"

কুঞ্জ বলিল, "ও একটা মোদক।"

"তুমি খেয়েছিলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কেন খেলে? এতে মরফিয়া রয়েছে—ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকারও গন্ধ পাচ্ছি—হাশীস্ কি একেই বলে? কে জানে! সে যাক্। কিন্তু তুমি নিজে

ডাক্তার হয়ে এসব খেলে কেন? তিন দিন অজ্ঞান থাকায় আর অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখার যথেষ্ট কারণ ত রয়েছে!"

কুঞ্জ ডাক্তার সাহেবের তিরস্কার কাণে তুলিল কি না বলা যায় না। খোলা জানালাপথে আমবাগানের পানে চাহিয়া থাকিয়া আপন মনে বিড়বিড় করিয়া বলিতে লাগিল—"গোটা দু'দিন দু'রাত্তির ধরে এত যে কাণ্ড—হীরা পান্না চুনি মুক্তা, চোর ডাকাত নাইট্রিক এসিড, জাল জুয়াচুরি নোটের গাদা, বিবাহ বর-কনে আচার্য্যের উপদেশ, বুড়াবুড়ির প্রেম, বিপদের উদ্ধার, গঙ্গাজলে গঙ্গাভিনয়—ধারাবাহিক এত যে কাণ্ড-কারখানা—বিলকুল কি স্বপ্ন হয়ে গেল? ধুত্তোর!"

কিরণ এই সময় আসিয়া কুঞ্জলালের মাথার শিয়রে বসিয়া, তাহার ব্রহ্মতালুতে আইসব্যাগ চাপিয়া ধরিল। অল্পে অল্পে কুঞ্জ আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

আলোচনা

"রবীন্দ্রনাথ ও বস্তুপন্থা।"

শ্রাবণের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন রায় মহাশয়ের প্রবন্ধ সম্বন্ধে গত মাঘের পত্রিকায় আমি দুই চারটি কথা বলিয়াছিলাম, গত চৈত্রমাসের "মানসী"তে তিনি তাহার উত্তর দিয়াছেন। তাঁহার এই প্রতিবাদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

আমার মত অল্পবুদ্ধি লোক যে ভ্রম করিবে, তাহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। কিন্তু রায় মহাশয়ও দেখিতেছি ভুল করিয়াছেন, "মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।" কিছু বলিবার পূর্ব্বে আমি একটা কৈফিয়ৎ দিতে চাই। কিছুদিন হইতে আমি ভারতের বিভিন্ন স্থান পর্য্যটন করিতেছি। মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের অনুরোধে, শিবাজীর জীবনের কোন বিশেষ ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের জন্য গত শ্রাবণ মাসে আমি বরোদা যাই, সেইখানেই সুখরঞ্জন বাবুর প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলাম। উহা পাঠে খটকা লাগে, কিন্তু প্রতিবাদ করিবার উপযুক্ত পুস্তকাদি বরোদায় পাওয়া অসম্ভব জানিয়া তখন কোন উচ্চবাচ্য করি নাই। পরে দিল্লী আসিয়া প্রতিবাদ করি এবং দিল্লী হইতেই উহা "মানসী"তে পাঠাই এবং পরে গোয়ালিয়র কাশি ইত্যাদি স্থানে যাইয়া, প্রত্যেক স্থান হইতেই পূজনীয় মানসী সম্পাদক মহাশয়কে পত্র দিয়াছি। এই ভ্রমণের গোলমালের মধ্যে সুখরঞ্জন বাবুর মাত্র একটি প্রবন্ধ ছাড়া, শেষ প্রবন্ধগুলি পাঠের সৌভাগ্য আমার হয় নাই। গত পৌষ মাসে সমগ্র প্রবন্ধটী পড়িয়াছি। সুতরাং তাঁহার রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের আলোচনার প্রতিবাদ আমি কেমন করিয়া করিতে পারি? আমি তাঁহার "রবীন্দ্রপূর্ব্ব বঙ্গসাহিত্যে বস্তুপন্থা" প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে বস্তুপন্থার আলোচনা আমার প্রতিবাদের অন্তর্ভুত নহে; এ কথা তিনি মনে রাখিতে পারেন নাই, পারিলে এত কথা বলিবার অবসর পাইতেন না।

বস্তুপন্থা অর্থ লইয়া আমি ভুল করি নাই। সুখরঞ্জন বাবু তাঁহার উক্ত প্রবন্ধে বিশ্বসাহিত্যকে টানিয়া আনিয়া বস্তুপন্থার যে ব্যাপক অর্থ করিয়াছিলেন, আমিও উহা সেইভাবে গ্রহণ করিয়াছি এবং সেই ধারায়ই ভবভূতির শ্লোক তুলিয়াছিলাম। এইরূপ করায় ভুল হইয়াছে বলিয়া ত আমার মনে হয় না। তা ছাড়া সমাজের জনগণের ক্ষুদ্র সুখদুঃখকে কেন্দ্র করিয়া দারিদ্র্যের রিক্ততা ও পাপের কালিমায় যেখানে বীভৎস কালো কুৎসিৎ কিছু আছে, ঠিক সেই সমাজে তাহাদেরই মধ্যে এবং পাশে, সৌন্দর্য্য মঙ্গল ও পুণ্যের অম্লান জ্যোতি অপূর্ব্ব গৌরবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মানব ও সমাজ-জীবনে দুইটি বস্তুই অপরিহার্য্য। অন্ধকার না থাকিলে আলোকের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব হইত। মানবজীবনের সুখ দুঃখ আলো ও ছায়ার সংমিশ্রণেই বস্তুপন্থার বিকাশ, কোন সাহিত্যই এই ধারাটির ব্যতিক্রম করিতে পারে না। এই গণতন্ত্রী বস্তুপন্থা বিশেষ করিয়া আধুনিক যুগের জিনিষ স্বীকার করি, কিন্তু প্রাচীন (?) সংস্কৃত সাহিত্যেও ইহার ছিটেফোঁটা ছিল।

সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত 'প্রাচীন' বিশেষণটি যুক্ত হওয়ায় আমি সুখরঞ্জন বাবুর বক্তব্য ঠিক বুঝিতে পারি নাই। সংস্কৃত

সাহিত্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,বৈদিক পৌরাণিক ও মাধ্যমিক। এই তিনটি পর্য্যায়ের মধ্যে তিনি কোন্‌টিকে প্রাচীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন? পৌরাণিক সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারতে সর্ব্বত্রই বস্তুরসের বিকাশ আছে। মাধ্যমিক সংস্কৃত সাহিত্যের বস্তু রসকেও নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলেনা। মৃচ্ছকটিক, কর্পূরমঞ্জরী, মুদ্রারাক্ষস, মালতীমাধব ইত্যাদি অনেক গ্রন্থে আমরা বস্তুরসের উদাহরণ পাই। পুনরায় রায় মহাশয়কে আমি সংস্কৃত সাহিত্য অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করি। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের অগৌরব প্রচার করেন নাই জানিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু মনে পড়ে, তিনি সংস্কৃতকে বিলাসীদের সখের সাহিত্য বলিয়া নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত যেন: উপহাস করিয়াছিলেন।

বস্তুরসের দিক দিয়া বৈষ্ণব সাহিত্য যে রবীন্দ্র-সাহিত্যকে পরাজিত করিয়াছে একথা আমি বলি নাই, বলিবার স্পর্দ্ধাও রাখি না। সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যকে বস্তুপন্থী রসের ভাণ্ডার বলিয়া আমি তাহার বিশিষ্টতাও নষ্ট করি নাই, মাত্র বলিয়াছি বৈষ্ণব সাহিত্যের সর্ব্বত্র বস্তুপন্থী রসের প্রাচুর্য্য না থাকিলেও অভাব নাই। সুখরঞ্জন বাবুও প্রকারান্তরে একথা স্বীকার করিয়াছেন। বিভিন্ন দিক হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দিতাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় সে জন্য যে সকল পুস্তকের প্রয়োজন তাহা উপস্থিত আমার কাছে নাই। এখন আমি বিদেশে।

গুপ্ত কবির রচনা বস্তুবিষয় অবলম্বনে রচিত হইলেও সুখরঞ্জন বাবুর কাছে তুচ্ছ, কারণ বস্তুপন্থার পরিভাষা তাঁহার অনুরূপ। তাই মুকুন্দরামের সহিত তুলনা করিবার পরামর্শ দিয়া তিনি পাশ কাটাইয়াছেন। সময় ও সুযোগ পাইলে তাঁহার উপদেশ কাযে লাগাইবার চেষ্টা করিব।

রঙ্গলাল, বিহারীলাল, দীনবন্ধু প্রভৃতির নাম করা হইয়াছে বৃথা। আর মাইকেলের নাম করিয়া আমি প্রবন্ধে "প্রহসনের সৃষ্টি" করিয়াছি। কিন্তু রায় মহাশয় ইহার উপর এক পোচ রং ফলাইয়া নূতন প্রহসনের সৃষ্টি করিলেন কেন বুঝিতে পারিলাম না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের আলোচনায় প্রতিবাদ আমি করি নাই, সে কথা তিনি খতাইয়া দেখেন নাই। তাঁহার যে প্রবন্ধের প্রতিবাদ আমি করিয়াছিলাম, তাহাতে সংস্কৃত, বৈষ্ণব ও বঙ্গসাহিত্যের অগণ্য লেখকের নাম করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, কয়েকজন পাশ্চাত্য সাহিত্যিকের উদ্ভট নামের তালিকাও দিয়াছিলেন। এবং সকলেরই সম্বন্ধে প্রায় একই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, —ইহাদের মধ্যে কিছুই নাই। মাইকেলের নাম করিয়া আমি প্রহসন করিলাম, অথবা সে কথার পুনরুল্লেখ করিয়া তিনি প্রহসন করিলেন তাহাই ভাবিতেছি।

"আধুনিক যুগের কাব্যসাহিত্যের কথা যদি পাড়িতেই হইল" —উহা কি এখনও সিকায় তোলা আছে? সুখরঞ্জন বাবু পূর্ব্বেই সে কথা তাঁহার প্রবন্ধে পাড়িয়া ফেলিয়াছেন। "হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি" ইত্যাদি ছয় ছত্র কবিতা ও রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতার ফিরিস্তি তাঁহার প্রবন্ধেই আছে। বিহারীলালের কাব্যে বস্তুপন্থা আছে কি না তাহা উপস্থিত দেখাইতে পারিলাম না, যদি সময় পাই ভবিষ্যতে দেখাইব। "রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের শিষ্য, কাযেই" ইত্যাদি উদ্ভট কল্পনাটি সুখরঞ্জন বাবু জোর করিয়া আমার মুখে গুঁজিয়া দিয়াছেন কেন তা তিনিই জানেন। বস্তুসাহিত্যে দীনবন্ধু শ্রেষ্ঠতার দাবী করিতে পারেন কি না এবং তাঁহার রচনায় সৌন্দর্য্য ও মঙ্গল আছে কি না সে সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিব না। "বঙ্গসাহিত্যে দীনবন্ধু" প্রবন্ধে তাঁহার সাহিত্য প্রতিভা সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনাও করিয়াছি, তাহা শীঘ্রই পত্রান্তরে প্রকাশিত হইবে।

বঙ্কিমের কোন্ উপন্যাসখানা খাঁটি ঐতিহাসিক? আর ঐতিহাসিক উপন্যাস যে খাটি ইতিহাস এ কথাই বা কে বলিল? ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাসের পার্থক্যের কথা আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি; অতীতের কাহিনী হইলেও তাহার মধ্যে বিচিত্র বা অস্বাভাবিক কিছুই নাই। তাহাও মানব জীবনের দৈনন্দিন সুখ দুঃখেরই চিত্র এবং তাহা কেবল রাজাবাদশা ও রাণী বেগমদের সঙ্গে রাজ্য ভাঙ্গা গড়ার ছবি ফুটাইয়া তোলে না, সমাজের জনগণের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের ছবিও ফুটাইয়া তোলে। তাহার মধ্যে বর্ত্তমানের স্থান না থাকিতে পারে,কিন্তু বাস্তব এবং তার ক্ষুদ্র সুখদুঃখের স্থান যথেষ্ট আছে। বঙ্কিমের প্রতিভা কি শুধু ঐতিহাসিক উপন্যাসেই খুলিয়াছে? তাঁর বিষবৃক্ষ, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল প্রভৃতি উপন্যাসের পাশে বর্ত্তমান উপন্যাস-প্লাবিত বঙ্গসাহিত্য হইতে একখানি উপন্যাসও দাঁড়াইতে পারে কি? যেমন লাঠি সোটা লইয়া মারামারি করা চলে, তেমনি সমালোচকের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তর্ক করা চলে, কিন্তু কালোকে শাদা করা যায় না।

বস্তুপন্থা বলিতে আমি একটা অস্বাভাবিক কিছু বুঝি নাই। সুখরঞ্জন বাবু আমার বক্তব্য অন্য অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, কাযেই আমার প্রবন্ধের কোন পরিচয়ও পান নাই। বিস্তৃত ভাবে সুখরঞ্জন বাবুর প্রতিবাদের উত্তর দিতে পারিলাম না; এখন আমি বিদেশে রহিয়াছি—পুস্তকাভাব।

রবীন্দ্র-প্রতিভার অমর্য্যাদা করিবার ঔদ্ধত্য ও স্পর্দ্ধা আমার

নাই। সুখরঞ্জন বাবু তাঁহার প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যিকগণের নাম করিয়া তাঁহাদের মধ্যে কিছু নাই বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, আমি সেই সম্বন্ধেই অনুযোগ করিয়াছিলাম এবং সেই দায়ে পড়িয়াই রঙ্গলাল, বিহারীলাল, দীনবন্ধু, মাইকেল প্রভৃতির নাম করিয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের আলোচনার সহিত আমার প্রতিবাদের কোন সম্বন্ধ নাই।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

এপ্রিল ফুল

(গল্প)

প্রত্যেক বৎসর নূতন ক্যালেণ্ডার দেওয়ালে টাঙ্গাইবার সময় ১লা এপ্রিল তারিখটির চারিদিকে বেশ করিয়া লাল কালির দাগ দিয়া তাহার উপর বড় বড় অক্ষরে "ফুল" কথাটা লিখিয়া রাখি। উদ্দেশ্য All fools' Dayতে আর কোনও দিন ফুল হইব না—সেদিনকার প্রত্যেক কাযটি আগে ভাবিয়া করিব; যে চিঠিখানাই আসুক মাথা ঠাণ্ডা করিয়া পড়িব। কে জানে পাজি মাধবটা আবার কবে কি খেলা খেলিয়া বসে!

ব্যাপার কি জানেন? একবার এই পয়লা এপ্রিলে যাহা ঠকিয়াছিলাম, ভদ্রলোকের কাছে তাহা বলিবার নহে। ঘটনাটি পড়িয়া আপনারা হাসিতে পারেন, কিন্তু তখন আমাদের যাহা হইয়াছিল তাহাতে হাসি মাথায় থাক্ সমস্ত শরীরের রক্ত হিম হইয়া যায়।

আমরা চারিজন সমবয়স্ক বড় অন্তরঙ্গ ছিলাম—মাধব, শ্যামানন্দ, অতুল এবং আমি (সত্যেন্দ্র)। ছোট বেলা হইতেই বন্ধুত্ব, সুতরাং কখনও প্রণয়, কখনও তর্ক, কখনও বা একটু অভিমান বা একটু রাগারাগি পরস্পরের মধ্যে হইত। সব চেয়ে আমাদের আনন্দ ছিল বিকালে বেড়াইবার সময়। কখনও বাইসিকেলে, কখনও পদব্রজে আমরা সহরের এক প্রান্ত হইতে অন্ত-প্রান্ত, কখনও মাঠের মধ্যে নদীর ধারে, কখনও বা রেলওয়ে ইয়ার্ডের ভিতরে বেড়াইতে যাইতাম। এই সময় আমাদের আরও কয়েকটি সঙ্গী জুটিত। কোনও দিন খোস গল্প, কোনও দিন তর্ক, কোনও দিন বা উভয় প্রকারেই আমাদের সময় কাটিত। বড় সুখে কাটিত।

একদিন রেলওয়ে ইয়ার্ডের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে মাধব এবং শ্যামানন্দের মধ্যে, নদীর দুই পাড় ভাঙ্গে কি না তর্ক উঠিল। শ্যামা বলিল, ভাঙ্গে। মাধব বলিল, ভাঙ্গে না। শ্যামা বলিল, আমি দেখিয়াছি। মাধব বলিল, তাও কি হয়? যাহা যুক্তিযুক্ত (reasonable) নয় তাহা বিশ্বাস করিব কেন?

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। শ্যামানন্দ কাযের লোক গোছের মানুষ। মাধব ভাবপ্রবণ। শ্যামানন্দর মাথায় হঠাৎ একটা কিছু খেলিত না, কিন্তু লোকটি বড় সাদা। মাধবের মাথা খুব খেলিত। তর্কের সময় শ্যামা বলিত, আমি দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি কিংবা আমি জানি। মাধবের মস্তিষ্ক ন্যায়শাস্ত্রে ভরপুর—তর্ক উঠিলেই সে বিষয়টা "যুক্তি"র মারপেঁচের মধ্যে আনিয়া ফেলিত। ফলে শ্যামা চটিয়া যাইয়া মাধবকে বলিত—তুমি এম-এ পাশ করিয়াছ, তুমি ভাব আমাদের চেয়ে সব বেশী জান, বেশী বোঝ; কিন্তু সব যায়গায় অমন "যুক্তি" চলে না। আমি বলিতেছি আমি নিজে দেখিয়াছি, তবু যুক্তি তর্ক ছাড়িবে না? তোমার সঙ্গে তর্ক করে কোন গাধা! মাধব হটিবার পাত্র নয়, সে বলিত—তুমি লেখাপড়া শিখিয়া একটা পণ্ডিতমূর্খ হইয়াছ—কেমন করিয়া তর্ক করিতে হয় জান না। আর তোমার সঙ্গে তর্ক করিব না।

সেদিনও তাহাই হইল। আমি আর অতুল প্রথমে ততটা গা দিতেছিলাম না। কিন্তু চলিতে চলিতে যখন মাধব ও শ্যামা দু'জনে হঠাৎ থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া মুখোমুখি হইল, তখন কতকটা মজা দেখিবার জন্য, কতকটা কৌতূহলের তাড়নায় আমরাও তর্কে যোগ দিলাম। তর্কে নূতন কিছু ছিল না, যাহা হইয়া থাকে তাহাই। দু'জনেই বিলক্ষণ চটিয়াছিল। শ্যামানন্দর মাথাটা হঠাৎ গরম হইয়া যায়,—সে একটু বেশী চেঁচাইতে লাগিল। মাধব অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা, কিন্তু আজ সেও বড় রাগিয়া গিয়াছে। অবশেষে রাগের মাথায় শ্যামা মাধবকে খুব কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিল। মাধব যে সব সময় তাহাকে জ্ঞানে ও বিদ্যায় ছোট বলিয়া মনে করে তাহাও বলিল। তাহা না হইলে সে যে-কোন কথা বলে, মাধব অম্‌নি তাহার প্রতিবাদ করিয়া তর্ক বাধাইয়া দেয় কেন? এই জন্য সে মাধবের সঙ্গে মিশিতে চায় না; তবু মাধব রোজ বেড়াইবার সময় তাহাকে ডাকিতে যায় কেন? এই জন্য মাধব আর কাহারও সঙ্গে মিশিতে পারে না। ইত্যাদি।

মাধব বিলক্ষণ চটিয়াছিল, কিন্তু শ্যামার শেষ কথাগুলি শুনিয়া সে হঠাৎ থামিয়া গেল। মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "তা'তো ভাই এতদিন জানতাম না যে আমার সঙ্গ তোমাদের এত খারাপ লাগে; যা'হোক, যা হয়েছে তার জন্য ক্ষমা কোর।"

শ্যামা আর কিছু বলিল না। দু'জনে ছাড়াছাড়ি হইয়া, শ্যামা একটু আগে, মাধব সবার শেষে, আবার চলিতে লাগিল।

সেদিন বাকি সময়টুকু একটা অশান্তির মধ্যে কাটিয়া গেল। আর কোন তর্ক অবশ্য উঠে নাই, কিন্তু মাধবকে যেন একটু বেশী রকম গম্ভীর বোধ হইতেছিল।

সন্ধ্যার সময় রোজই শ্যামাদের বাড়ীতে আমাদের আড্ডা জমিত। কিন্তু সেদিন মাধব কায আছে বলিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। আমরা বুঝিলাম এবার তর্কটা একটু বেশী দূর গড়াইয়াছে। কিন্তু তখনও বুঝিতে পারি নাই যে এতদূর গড়াইবে।

পরদিন বিকালে মাধব আসিল না। আমরা তিনজনে নদীর দিকে বেড়াইতে গেলাম। প্রথমেই শ্যামা একটু অনুতপ্তভাবে বলিল যে কাযটা তাহার বড় অন্যায় হইয়াছে। কিন্তু মাধব যে তাহার পাগলামীটা এত গুরুতর ভাবে ধরিবে তাহা সে ভাবে নাই। আমরা তাহাকে বুঝাইলাম—ওসব কিছু নয়; অমন তো কতদিনই হইয়াছে; দল ছাড়িয়া মাধব কতদিন থাকিবে? শ্যামা বলিল, মাধবের সঙ্গে দেখা হইলে সে ক্ষমা চাহিবে।

সেদিনও সন্ধ্যার পর আর আড্ডা বসিল না। যে যাহার বাড়ীতে ফিরিয়া গেলাম। বাড়ীতে যাইয়া দেখি, টেবিলের উপর একখানা চিঠি রহিয়াছে। খামে আমারই নাম লেখা। মাধবের হাতের লেখা দেখিয়া তাড়াতাড়ি খুলিলাম। মাধব লিখিয়াছে;—

"ভাই সুত্যান—

তোমাদের কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। কাল্ যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য আমিই দোষী। শ্যামাকে বলিও (আমি তাহারও কাছে চিঠি লিখিলাম—তবু তোমরা বলিবে) সে যেন আমাকে ক্ষমা করে। আমার মত হতভাগ্য আর নাই। যে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে অমন সামান্য কারণে চটাচটি করে সে মনুষ্যনামের অযোগ্য।

ভাই, বিদায়। তোমাদের কিছু দোষ নাই। শ্যামার কোনই দোষ নাই। এ হতভাগ্যের জীবনে আর কায কি? যাহার সঙ্গ কেহই চায় না, তাহার সংসারে থাকিবার প্রয়োজন কি?—

Philosophy and science, and all the springs
Of wonder, and the wisdom of the world.
I have essay'd,..................
But they avail not:
Forgetfulness—
......................Oblivion,...............

—কিছু নয় তাই সব ফাঁক।

শ্যামানন্দদের বাড়ীর দক্ষিণে যাইয়া ইঁটকাটা যে গর্ত্ত আছে, তাহার মধ্যে আজ সন্ধ্যার সময় আমার মৃতদেহ পাইবে। আমি বিষ খাইয়াছি। অন্ত কেহ আমার দেহ ছুঁইবার আগে তোমরা তুলিও। তাহা হইলে পরলোকে আমি সুখী হইব। তাহার পর আমার বাড়ীতে খবর দেওয়া ইত্যাদি যাহা হয় করিও।

বিদায়, ক্ষমা করিও। ইতি।

হতভাগ্য মাধব।"

ছুটিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। অন্ধকার রাত্রি, তবু প্রাণপণে দৌড়াইতে লাগিলাম। তখন মনের মধ্যে যে কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা মনে নাই। প্রায় পাগলের মত হইয়াছিলাম। রাস্তায় দু' একজন লোকে কি জিজ্ঞাসা করিল, কিছুই শুনিতে পাই নাই। দৌড়িয়া শ্যামার বাড়ী ফেলিয়া ইটকাটা গর্ত্তের কাছে উপস্থিত হইলাম। পৌঁছিয়া দেখি, শ্যামা আর অতুল সেখানে। গর্ত্তে বন জঙ্গল, আর প্রায় এক কোমর জল; শ্যামা তাহার মধ্যে নামিয়া অন্ধকারে হাতড়াইতেছে, আর বলিতেছে, "কি হলরে, কি হলরে; আমিই যত নষ্টের মূল। ওরে অতুল, শীগ্‌গির খোঁজ, এখনও বোধ হয় বেঁচে থাক্‌তে পারে, এখনও বোধ হয় চেষ্টা কল্লে বাঁচতে পারে।" অতুলও জলে নামিয়াছিল। দুজনেই আমার কথা শুনিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। শ্যামার যেন বুক ফাটিয়া কথা বাহির হইতেছে।

আমাদের চীৎকারে পাড়ার লোক জড় হইল। কেহ কেহ লণ্ঠন লইয়া আসিল। কেহ জলে নামিল, কেহ উপরে থাকিয়া নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কেহ বলিল, পুলিসে খবর দাও। কেহ বলিল, "নরহরি বাবুকে (মাধবের দাদা) এখনই খবর পাঠাও।"

এইরূপে কেহ খুঁজিতে লাগিল, কেহ চেঁচাইতে লাগিল, কেহ দুঃখ করিতে লাগিল। কিন্তু লাস কিছুতেই পাওয়া যায় না। চার পাঁচ জন লোক তন্ন তন্ন করিয়া, হাত পনরো লম্বা হাত দশেক চওড়া সেই গর্ত্তটি খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু কেহই কিছু পাইল না। শ্যামা কাঁদিয়া ফেলিল। অতুল ও আমার চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল। অনেকেই হায় হায় করিতেছিল।

তখন একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে। হঠাৎ "এ কি" বলিয়া শ্যামা জল হইতে হাত তুলিল। সকলে কি কি বলিতে বলিতে আলো লইয়া সেদিকে গেল। একখানা আস্ত ইঁটে বাঁধা একটা বার্লির কৌটা, ঢাকনির মুখে মোম দেওয়া। ঢাকনিটা খুলিয়া ফেলিল। ভিতর হইতে, কাগজে জড়ান একখানা মোটা সাদা খাম বাহির হইল। শ্যামা হঠাৎ থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। আমি তাড়াতাড়ি খামখানা তাহার হাত হইতে লইয়া দেখিলাম, তাহার উপর বড় বড় ছাপার অক্ষরে APRIL FOOL লেখা। সকলের মুখে চাওয়াচায়ির মধ্যে চিঠিখানা খুলিয়া ফেলিলাম। তাহাতে লেখা ছিল;—

"ভাই শ্যামা, অতুল, সত্যেন—রাগ করিও না। তোমাদের একটু April fool করা গেল। তোমরা যতক্ষণ ইঁটকাটা গর্ত্তে আমার লাস খুঁজিতেছ, আমি ততক্ষণ ঘরে বসিয়া সুস্থশরীরে দাদার ছেলেদের ম্যাজিক লণ্ঠন দেখাইতেছি। তোমাদের অবস্থা ভাবিয়া একটু একটু হাসিও আসিতেছে।

"আজ রাত্রে আমাদের বাড়ীতে তোমাদের অর্থাৎ সত্যেন, শ্যামা, অতুলের—ম্যাজিক লণ্ঠন দেখিবার ও লুচি মাংস খাইবার (বেশ ঠাণ্ডার দিন আছে) নিমন্ত্রণ। পত্র পাঠ মাত্র চলিয়া আসিবে।

ইতি ১লা এপ্রিল।

তোমাদের মাধব।

"পাজি, ছুচো, নচ্ছার,"—বলিয়া শ্যামা লাফাইয়া উঠিল। "এমনি করে বিষ্টি জলে অন্ধকারে—একটু আক্কেল নেই—আমি যাব না—নেমন্তন্ন?—বড় রসিকতাই কল্লে—আমার এমন ফর্সা কাপড় খানা একেবারে—হষ্টপিট কোথাকার!"

অনেক কষ্টে তাহাকে একটু শান্ত করিলাম। হাসিতে হাসিতে কে কাহার গায়ে পড়ে! সকলে যত হাসে, শ্যামা তত রাগে।—"ভারি জব্দ কল্লে—এমন 'জব্দ সবাই করতে পারে—উল্লুক কোথাকার।"

আর কি করিব? অতি কষ্টে তাহাকে থামাইয়া তিনজনে বাড়ী গেলাম। সেইদিন হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, প্রত্যেক বৎসর ১লা এপ্রিল তারিখে সাবধান হইয়া থাকিব—ওয়াল ক্যালেণ্ডারে ১লা এপ্রিলটি বেশ করিয়া লাল কালিতে দাগ দিয়া রাখিব, যেন আর কোন দিন ঠকিতে না হয়।

শ্রীসুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়।

মতভেদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গুরুর লক্ষণ পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। গুরুই পথপ্রদর্শক; তা ঐহিক বিষয়েই হউক অথবা পারত্রিক বিষয়েই হউক। লক্ষণ দেখিয়া গুরু করিতে হয়। কিন্তু দেখিতে সময় আবশ্যক। এই নিমিত্তই তন্ত্রশাস্ত্রে ভাবী গুরু ও ভাবী শিষ্যের এক বৎসরকাল একত্র বাস করিবার বিধান আছে। শিষ্যেরও বিশেষ বিশেষ লক্ষণ থাকিতে হয়। গুরুর এবং শিষ্যের লক্ষণ উভয়ের মধ্যে আছে কি না তাহা স্থির করা বিচার-সাপেক্ষ। এই অবস্থায় বিচারের প্রয়োজনীতা আছে। যাকে তাকে গুরুও করা যায় না—এ কার্য্য বিচার দ্বারাই করিতে হয়। কিন্তু যিনি স্বীয় মাহাত্ম্য-প্রভাবে স্বপ্রকাশ হইয়াছেন, তাঁহার নিকট আসিয়া বিচার বুদ্ধি লুপ্ত হইয়া যায়। তাঁহাকে জনসাধারণ স্বতঃই গুরু বলিয়া স্বীকার করে; তাঁহার নিকট মানবের মস্তক আপনা হইতেই নত হইয়া যায়। তাঁহার বিরোধী কেহই থাকে না, এমত বলিতেছি না। কিন্তু জনসাধারণ স্বতঃই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহাকে পথপ্রদর্শক বলিয়া স্বীকার করে। তাঁহার অসামান্ত ত্যাগ ও সহিষ্ণুতা জগৎ জয় করে। বিরোধিগণ অচিরে প্রতিহত হইয়া যায়।

যাহা হউক লক্ষণ দ্বারা গুরুকরণ বিচার-সাপেক্ষ সন্দেহ নাই। কিন্তু একবার গুরুকরণ হইয়া গেলে তাঁহার আদেশ অবিচারে পালনীয়, আর বিচারের স্থল নাই। তখন তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিতেই হইবে। তখন—আজ্ঞা গুরূণাং হরিচারণীয়া। এইরূপ পথপ্রদর্শকের মত্ মানব-সমাজে বিস্তৃতভাবে অনুসৃত হইবে; এবং কর্ম্মে অনুষ্ঠিত হইতে হইতেই মনেও ভাবরূপে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবে। ঐ পথপ্রদর্শককেই নেতা বলে। তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অনুকরণ দ্বারা জনসাধারণ কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। তাঁহার প্রদর্শিত পথ জনসাধারণ স্বতঃই গ্রহণ করিবেন। তাঁহার অনুগণের সংখ্যা যতই অধিক হইবে, ততই একতামূলক শক্তিও বৃদ্ধি হইবে। এই শক্তিই পরিণামে মুক্তিদাত্রী হইয়া থাকে। ইহপরকালের বন্ধমুক্তির পন্থাই এই। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী দেখাইয়াছেন, কিরাতে বহুদেবতার ব্যষ্টি শক্তি সমবেত হইয়া এক মহাশক্তি জাত হয়। সে শক্তি দুর্ব্বল নারীমাত্র হইলেও অসুরগণের প্রবল-পরাক্রান্ত বিশাল বাহিনী তাহার নিকট পরাস্ত হইয়া যায়। এ পরিণাম অতিপ্রাকৃত নহে, কিংবা কেবলমাত্র দেবাসুর সম্প্রদায় মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। সর্ব্বত্রই একতা দ্বারাই শক্তিসঞ্চয় হয় এবং মত বিস্তৃত হইয়া থাকে। উহারই ফলে সিদ্ধি; অর্থাৎ ঐ বিস্তৃত মতের জয়লাভ। কিন্তু ঐ মত সত্য হইলে, মঙ্গলজনক হইলে, এ ফল অনিবার্য্য; অসত্য অথবা অকল্যাণকর হইলে, উহার সাময়িক জয় হইলেও উহা অস্থায়ী। স্থায়ী কখনই হইবে না। মত বিস্তৃত এবং সত্য

হইলে বিজয়ী হইবেই। এ কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি।

আমরা সকলেই জানি যে আমাদের মতের অধিকাংশই বিচারলব্ধ নহে। পৃথিবী ত্রিকোণ কি গোলাকার এ বিচার না করিয়াই এক সময়ে জনসাধারণ বলিত "তিন কোণা পৃথিবী।" সূর্য্য ঘোরে কি পৃথিবী ঘোরে এ বিচার না করিয়াই জনসাধারণ বলিত সূর্য্য ঘোরে। জন্মজন্মান্তর আছে কি নাই এ বিচার না করিয়াই বহু ব্যক্তি আছে বলিয়া স্বীকার করে। এ সকল দৃষ্টান্ত উচ্চ শ্রেণীর। নিম্ন শ্রেণীর দৃষ্টান্তও অনেক দেওয়া যাইতে পারে। এ সকল স্থলে একজন বলিল, অপরে অবিচারে তাহা গ্রহণ করিল; এইরূপই মানব-প্রকৃতি। প্রত্যেক বিষয়ে নিজে বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া মত পোষণ করিতে হইলে কোনও কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। অধিকাংশ স্থলেই অনুকরণ দ্বারা কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। তৎপর সেই কর্ম্ম মনে সংস্কাররূপে প্রতিফলিত হয়। বিচারবুদ্ধি এই সংস্কারের পোষক হইলে ভালই; নচেৎ অনুকরণ মাত্রেই রহিয়া যায়।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, অনুকরণ একটি স্বাভাবিক বৃত্তি। এবং এ বৃত্তির অনুশীলনে সুখ আছে। কিন্তু সুখ এবং মঙ্গল এক কথা নহে। যাহা প্রেয়ঃ তাহাই শ্রেয়ঃ নহে। সমাজবদ্ধ মানব কেবলমাত্র নিজের মঙ্গল চেষ্টা করিবে, অথচ সামাজিক শৃঙ্খলা ক্রমোন্নত হইবে, এরূপ হইতেই পারে না। মানব পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা প্রায় সর্ব্বদাই নিয়মিত হইতেছে। সে অবস্থা অথবা পারিপার্শ্বিক বেষ্টনী অনুন্নত থাকিলে মানব উন্নত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত যিনি মানব সমাজের উন্নতি কামনা করেন, তিনি মানব সমাজের উপর স্বমত বিস্তৃত করিতে চেষ্টা করিবেন। সে চেষ্টা পীড়ন অথবা অবরোধ নহে। বলপূর্ব্বক দমনও নহে। সে চেষ্টা বিচার। বিরুদ্ধ মতের উপর স্বমতকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে বিচারই একমাত্র সুসঙ্গত উপায়।

বিবর্ত্তনবাদী স্বীকার করেন যে, জীব অনুন্নত অবস্থা হইতে ক্রমে উন্নত হইয়াছে। এ উন্নতি যে প্রণালীতে সিদ্ধ হইয়াছে, ডারুইন তাহার নাম দিয়াছিলেন 'প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন'। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে জীবনসংগ্রাম দ্বারাই ঐ নির্ব্বাচন সিদ্ধ হয়। এ সকলের মর্ম্ম এইরূপ যে, জীবে জীবে সংগ্রাম হইয়া যে জীব জয়ী হইল, সে-ই জীবিত থাকিল এবং বংশবৃদ্ধি করিল; যেন প্রকৃতি তাহাকেই বাঁচাইবার নিমিত্ত বাছিয়া লইলেন, কারণ জীবন-সংগ্রামে সে জয়ী হইয়াছে এবং বিজিত জীব ধ্বংস হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিকগণ জীবন সংগ্রাম অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপর পূর্ব্ববৎ আস্থা স্থাপন করেন না। এক্ষণে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে সকল জীব পরস্পরের সহিত একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়, যাহারা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিবশতঃ একে অন্যের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার ত্যাগস্বীকার করিতে প্রস্তুত, তাহারাই ধরাপৃষ্ঠে জয়যুক্ত হয়; অর্থাৎ জীবিত থাকে, বংশ বৃদ্ধি করে এবং উন্নত সমাজ গঠন করে। অন্যে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ঈদৃশ বিলুপ্ত জীবের দেহাবশেষ অথবা কঙ্কাল ধরাগর্ভে বহু স্থানে বিদ্যমান আছে। এ সকল লুপ্ত জীবের বিনষ্ট হইবার কারণ যাহাই হউক, সমাজবদ্ধ একভাববিশিষ্ট স্বার্থত্যাগ-পরায়ণ জীব প্রবলতর শক্তিশালী জীবের পীড়নে অথবা অত্যাচারে বিনষ্ট হওয়া কোথাও দেখা যায় না। অতিকায় প্রবল পরাক্রান্ত অস্ত্রাদি বিশিষ্ট দেহগঠন পাইয়াও ম্যাষ্টোডন বংশ লুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু প্রায় নিরস্ত্র ক্ষুদ্রকায় দুর্ব্বল হংসশ্রেণী অথবা পিপীলিকা, সমাজ গঠনে ক্রমোন্নত হইয়া ধরাপৃষ্ঠ ছাইয়া ফেলিয়াছে। এরূপ হয় কেন? যে বনে ব্যাঘ্র বাস করে সে বনে নিরীহ হরিণ জীবিত থাকে কেন? বরং ব্যাঘ্রকুল নির্ম্মূল হইতে চলিল, কিন্তু হরিণবংশ ধ্বংস হইতেছে না। এরূপ হয় কেন? প্রবল দুর্ব্বলকে টিপিয়া মারিতে পারে না কেন? এসকল প্রশ্নের একই উত্তর—দুর্ব্বল একতাবদ্ধ হইয়া এক লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়; বিনা

বিচারে দলপতির আদেশ ও ইঙ্গিত অনুসরণ করে—অন্যান্য নানা উপায়ের মধ্যে এই উপায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জীবশ্রেষ্ঠ মানবও এই উপায় অবলম্বন করিয়া ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতি সাধন করিবে। নির্দ্দিষ্ট মানব সমাজ স্বীয় প্রকৃতির অনুযায়ী অনুষ্ঠান ও কর্ম্ম দ্বারা অগ্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবে। প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজের সহিত তাহার সংস্রব যত কম থাকে ততই মঙ্গলজনক। এইরূপে সে সমাজ আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া, পরে বিশ্বমানবের অর্থাৎ অপর মানব সমাজের মঙ্গল সাধনে তৎপর হইবে। নচেৎ প্রথম হইতেই সে আপনাকে বিস্তৃত হইলে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতেই পারিবে না।

কিন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠা কি? ইহা আপন প্রকৃতির প্রতিষ্ঠা। সহজ কথায় বলিতে গেলে ইহা আপনার মত্ প্রতিষ্ঠা। কর্ম্ম এবং অনুষ্ঠান যদ্দ্বারা মানব আত্মপ্রতিষ্ঠা করে, তাহা মত হইতেই জাত হয়। অগ্রে মত, পরে কর্ম্ম। আমার মত প্রতিষ্ঠা হইলেই আমার প্রতিষ্ঠা হইল। বর্ত্তমান যুগে প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজের মধ্যে মতের জয়ই জয়। অস্ত্রের জয় জয় নহে; কারণ তাহা অতীব অস্থায়ী।[*] সভ্য সমাজে মত প্রতিষ্ঠা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা একই কথা। বরং আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া যিনি মত প্রতিষ্ঠা করিতে না পারেন, তাঁহার ঐ প্রতিষ্ঠার মূলে অস্ত্রবল মাত্র রহিয়াছে ইহা নিশ্চিত। সুতরাং সে প্রতিষ্ঠা ক্ষণস্থায়ী হইবেই।

আমরা বলিয়াছি, অত্যাচার কখনই বিরোধী মতকে নষ্ট করিতে পারে না। আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে, যে মত বিস্তৃতি লাভ করে এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা মানব সমাজের মঙ্গলজনক। সুতরাং তাহা জয়যুক্ত হইবে। সত্যং শিবং সুন্দরম্। ইহাই এ দেশের সনাতন কথা। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অন্য প্রসঙ্গে সার্ জন্ উড্রফ্ এই কথাই বুঝাইয়াছেন।[*] মত অভিনব হইলেও, স্থূলদৃষ্টিতে ব্যক্তিবিশেষের অথবা সম্প্রদায় বিশেষের অমঙ্গলজনক বিবেচিত হইলেও, তাহা পরিণামে মানব মঙ্গলের অগ্রদূত হইতে পারে। এ নিমিত্ত ঐ মতকে বলপূর্ব্বক বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করা বর্ব্বরতা মাত্র আর কিছুই নহে।

তাহা হইলেও পরবশ দেশে চিরদিনই বলপ্রয়োগের চেষ্টা হইয়া আসিতেছে। পরবশ দেশে প্রভুসম্প্রদায় স্বীয় অন্যায্য স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত এবং অধীন মানবগণকে চিরকাল অধীন রাখিবার নিমিত্ত বলপ্রয়োগ ব্যতীত বিস্তৃত মতকে নষ্ট করিবার উপায়ান্তর দেখে না। প্রভু-সম্প্রদায় সুসভ্য হইলে এবং ন্যায়বান হইলে পৃথক্ কথা; নচেৎ বলপ্রয়োগ ব্যতীত তাহারা স্বার্থ রক্ষার উপায়ান্তর জানে না। হত্যা, আঘাত, অবরোধ এই সকলই তাহাদিগের অবলম্বনীয় হয়। এ সকল অনুন্নত জন্তুসমাজ হইতে তাহারা উত্তরাধিকার-ক্রমে প্রাপ্ত হয় এবং অনুশীলন করে। ধীরতা, সহিষ্ণুতা, ন্যায়পরায়ণতা, মানবের প্রকৃত মঙ্গল বাসনা—এ সকল তাহাদিগের স্বার্থপূর্ণ হৃদয়ে স্থান পায় না। কারণ তাহারা জীব হিসাবে অনুন্নত। উৎপীড়িতগণ এই কথা স্মরণ রাখিলেই সেই কৃপার্হ উৎপীড়কের প্রতি বিদ্বেষ অথবা ক্রোধ ত করিবেনই না; বরং তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া তাহাদিগের মানসিক পশুভাবের উন্নতির নিমিত্ত ভগবচ্চরণে ভক্তিভাবে প্রার্থনা করিবেন। যে মহাত্মা অবিচারে অন্যায়রূপে শূলে[†] বিদ্ধ হইয়াও অত্যাচারীর মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তিনি মানব মঙ্গলের অগ্রদূত, তিনি জগতে শান্তির

---

[*] The future struggles for supremacy will be contests between minds, and weapons will be at a discount.—Nature. 9 th May 1902, p. 36.

[*] Truth in whatever form needs nothing but itself to fill the minds and hearts of man. Is India Civilized p 45-6 (1918)

[†] Cross

প্রতিষ্ঠাতা। তাদৃশ একটী ব্যক্তিও মানব জাতির যতদূর সহায়তা করিতে পারে, ততদূর সহায়তা সহস্র কোটি ব্যক্তির সমবেত চেষ্টাতেও হইতে পারে না।

কিন্তু সমাজবদ্ধ এক একটী জীব বিভিন্ন সমাজে বিভক্ত হইয়াছে। এক পিপীলিকা জাতি কত বিভিন্ন সমাজ গঠিত করিয়াছে; এক হংস জাতি, একশ্রেণীর বানর জাতিও কত বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সমাজের পূর্ব্বাভাস। এক মানব জাতিও কত বিভিন্ন সমাজ গঠন করিয়াছে। ঈদৃশ স্থলে প্রত্যেক সমাজের ব্যক্তিগণ মধ্যে মতভেদ হইতে পারে এবং বিভিন্ন সমাজেও মতভেদ হইতে পারে। স্ব-সমাজে মতভেদ স্থলে উৎপীড়ন বর্ব্বর সমাজেও অপেক্ষাকৃত কম অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু পর-সমাজের সহিত মতভেদ হইলে বর্ব্বরগণ অন্য উপায় না জানাতেই অথবা অন্য উপায়ে বিশ্বাস না থাকাতেই উৎপীড়ন করা আবশ্যক বোধ করে। ঈদৃশ ব্যবহার ইতর জন্তুদিগের মধ্যে দেখা যায়। এক শ্রেণীর পিপীলিকার বাসায় অন্য শ্রেণীর পিপীলিকা ছাড়িয়া দিলে তাহাকে পূর্ব্বোক্তগণ তৎক্ষণাৎ হত্যা করিয়া ফেলে। কিন্তু ঐ আগন্তুকের গাত্রে প্রথমোক্ত পিপীলিকার রস মাখাইয়া দিলে তাহাকে কেহই হত্যা করে না। এই সকল অনুন্নত সমাজে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই আপন পর চিনাইয়া দেয়। স্ব-সমাজের ঘ্রাণযুক্ত রস দেহে মাখাইলে পর-সমাজের পিপীলিকাও আপন হইয়া যায়। তেমনই অনুন্নত মানব সমাজেও পরকে প্রায় আপন করিয়া লইতে দেখা যায়, যদি সেই পর ঐ অপর সমাজের ন্যায় পরিচ্ছদধারী হয়। তাহার উপর যদি ঐ সমাজের আচার ব্যবহার ধর্ম্ম বিশ্বাস এবং ঐ সমাজের মঙ্গল চিন্তা পর সমাজের কোন ব্যক্তি মধ্যেও লক্ষিত হয়, তবে অনেক স্থলেই সেই পর আপন হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু নিতান্ত তমোগুণাচ্ছন্ন মানব এ [illegible] থাকিলেও পরকে আপন বিবেচনা করিতে পারে না। তাহারা আদ্যোপান্ত স্বার্থ পরিপূর্ণ, সুতরাং প্রকৃত মানব অভিধান হইতে বহুদূরে। ইত্যাকার অনুন্নত সমাজ যদ্যপি অতীব উন্নত নানাবিধ সত্বগুণের অধিকারী অপর মানব সমাজের উপর প্রভুত্ব লাভ করে, তবে বুঝিতে হইবে যে সে বহু দুরাচার দ্বারাই ঐ পদলাভ করিয়াছে; সুতরাং উৎপীড়ন দ্বারা তাহাকে আত্মরক্ষা করিতে হয়। সে ধর্ম্মাধর্ম্ম ন্যায় অন্যায় কিছুই বুঝে না, কথঞ্চিৎ বুঝিলেও আচরণ করিতে অভ্যস্ত নহে। সে বুঝেও স্বার্থ, জানেও স্বার্থ, আর কিছু সে বুঝে না।

কিন্তু ঈদৃশ জনগণ হইতে উন্নত মানবের আত্মরক্ষার উপায় কি? সে তো বর্ব্বরতা করিতে পারিবে না। তাহার উপায় কি? যে পরশপাথর স্পর্শ করাইলেই সমস্ত লোহা এক মুহূর্ত্তে সোণা হইয়া যায়, তাহাই তাহার একমাত্র উপায়। তাহা সত্য ও প্রেম। প্রেমে সমস্ত ভেদ এক হইয়া যায়। তাহাকে এই উপায়েই জয় করিতে হয়। সত্যে সমস্ত অন্ধকার আলোকিত করে। সমস্ত মতভেদ, সমস্ত বিরোধী তর্ক, সমস্ত উৎপীড়ন এই উপায়েই নিবৃত্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বর্ব্বরও উন্নত হয়, উন্নত মানব তো পতিত হয়ই না। জগতের ইতিহাসে এই উপায় বিস্তৃতরূপে অনুষ্ঠিত হয় নাই। তথাপি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমামধ্যে যুগে যুগে মহাপুরুষ কর্ত্তৃক যখনই এই উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তখনই ইহা জয়যুক্ত হইয়াছে। সুতরাং বিস্তৃতরূপে এই অনুষ্ঠান করিতে নিষ্ফলতার কোনই আশঙ্কা নাই। বরং প্রকৃত ত্যাগী সাত্ত্বিক অধিকারী কর্ত্তৃক সেইরূপ অনুষ্ঠিত হইলে মানবের ইতিহাস অন্যরূপে লিখিত হইবে। ভবিষ্যতের বিরাট গ্রন্থ শান্তির অক্ষরে প্রেমের ভাষায় লিখিত হইবে।

যে মহাপুরুষ এ পথের অগ্রদূত, সহস্র উৎপীড়নেও তাঁহাকে কিছুই করিতে পারিবে না। আজই হউক কালই হউক, বিরোধী মত তাঁহার পদে আত্মসমর্পণ করিবেই; এবং উৎপীড়ন তাঁহার মঙ্গলস্পর্শে মানব হিতে পরিণত হইবেই ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শ্রীশশধর রায়।

প্রথম সেনরাজ ও তাঁহার সময়

বঙ্গের পালরাজগণের সৌভাগ্যসূর্য্য যখন অস্তগমনোন্মুখ, সেই সময় শনৈঃ শনৈঃ বঙ্গে আর এক শক্তিশালী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, ইতিহাসে এই রাজগণ সেন রাজবংশ নামে প্রসিদ্ধ। বঙ্গের সেন উপাধিধারী বৈদ্যগণ, নিজেদের বঙ্গেশ্বর বল্লাল সেনের বংশ বলিয়া থাকেন। জেনারেল কানিংহমও এইরূপ অনুমান করেন। তাঁহার মতে বঙ্গের সেন রাজগণ বৈদ্য ছিলেন। পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর ওঝা বলেন, বৈদ্য বল্লাল সেন ও সেনরাজ বল্লাল সেন, উভয়ে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ওঝা মহাশয়ের বক্তব্যই সত্য বলিয়া ধারণা হয়। বঙ্গে বল্লাল সেন নামে বৈদ্য জাতীয় এক জমিদার বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। গোপাল ভট্ট লিখিত "বল্লাল চরিত" নামে ইঁহার এক জীবনচরিতও আছে। এই গোপাল ভট্ট উক্ত বল্লাল সেনের গুরু ছিলেন; তিনি তাঁহার শিষ্যকে বৈদ্য জাতি বলিয়াছেন। এই গ্রন্থ হইতে ইহাও জানিতে পারা যায় যে, বৈদ্য বল্লাল সেন, রাজা বল্লালের ২৫০ শত বৎসর পরের লোক। ইহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল যে, রাজা বল্লালসেন ও বৈদ্য বল্লালসেন এক ব্যক্তি নহেন এবং উভয়ের স্থিতি কালেও যথেষ্ট ব্যবধান রহিয়াছে। রাজা বল্লাল সেনের চরিত্র ও বল্লাল চরিত্র স্বতন্ত্র গ্রন্থ, উভয় গ্রন্থের নামসাদৃশ্যে ভ্রম হওয়া বিচিত্র নহে। আবুল ফজলও এইরূপ ভ্রমবশতঃ সেন-রাজগণকে বৈদ্য বলিয়াছেন। শিলালিপি ও দানপত্রাদিতে সেন রাজগণকে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে—"রাজত্রয়াধিপতি সেন-কুল-কমল-বিকাশ-ভাস্কর সোম-বংশ-প্রদীপ।" (১) অন্যত্র—"ভুবঃ কাঞ্চোলীলাচতুর চতুরম্ভোধিলহরী পরিতায়াভর্তাহজনি বিজয়সেনঃ শশিকুলে।" (২)

আবার দেবপরে প্রাপ্ত বিজয় সেনের দ্বাদশ শতাব্দীর শিলালিপিতে ইঁহাদের ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে—

> "তস্মিন্সেনান্ববায়ে প্রতি সুভট পতোৎসাদন ব্রহ্মবাদী
> সব্রহ্মক্ষত্রিয়ানামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ॥ ৩

যাহা হউক সেনরাজগণ যে ক্ষত্রিয় ছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ কর্ণাট হইতে বঙ্গে আগমন করেন এবং গঙ্গাতটবর্ত্তী স্থানে বাস করিতে থাকেন। অনেকের মতে, ইঁহারা সর্ব্ব প্রথম নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, এই বংশের প্রথম রাজা সামন্ত সেন কর্ণাট হইতে বঙ্গে আসিয়াছিলেন। কিন্তু এই উক্তি যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। কারণ বিভিন্ন লিপিতে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ বীরসেনের নাম দৃষ্ট হয় এবং আমার এক আত্মীয় ভাটপাড়া (ভট্টপল্লী) হইতে সাত মাইল দূরে এক নিম্নশ্রেণীর কৃষকের নিকট হইতে অপ্রত্যাশিত ভাবে একখানি দানপত্র পাইয়াছেন, উহাতে সামন্ত সেনের পিতা বিশ্বসেনের নাম আছে। সুতরাং সামন্তসেনের কর্ণাট হইতে বঙ্গে আগমন মানিয়া লওয়া যায় না। খুব সম্ভব বীরসেন কিংবা তাঁহার পিতা সর্ব্ব প্রথম কর্ণাট হইতে বঙ্গদেশে আসেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে সেন রাজগণের শিলালিপিতে কথিত বীর সেনের অন্য নাম শূর সেন এবং ইঁহার দ্বারাই বঙ্গদেশে কুলীন ব্রাহ্মণগণ আনীত হইয়াছিলেন। শূর ও বীর উভয় শব্দই একার্থবাচক, বোধ হয় সেই জন্যই মিত্র মহাশয় এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, বঙ্গেশ্বর শূর সেন, সামন্ত সেন ও বীরসেনের স্থিতিকালের বহুপূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন এবং সেন বংশীয়

---

১ Asiatic Society Journal of Bombay, 1896.p. 13

২ অদ্ভুতসাগর,—৪র্থ শ্লোক।

৩ Epg. Ind. Vol I, p. 307.

বীর সেন দক্ষিণ ভারত হইতে পরাজিত হইয়া বঙ্গে আসিয়াছিলেন। ঘটক হরি মিশ্রের কারিকায় (বংশাবলী) লেখা আছে, "মহারাজ আদিশূর কোলাচন্দেস (কনোজ) হইতে ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি নামক পাঁচজন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে সপরিবারে বঙ্গদেশে লইয়া আসেন। ইহার কিছুদিন পরে গৌড়দেশে দেবপাল রাজা হন। অতঃপর বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন গৌড়ের সিংহাসনে উপবেশন করেন এবং আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশজগণকে ভূমি ও গ্রামাদি দান করেন।" ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, আদিশূর পালবংশীয় রাজা দেবপালের পূর্ব্ববর্ত্তী। পাল রাজবংশের বর্ত্তমান বংশাবলী ও ইতিহাসানুসারে দেবপাল উক্ত বংশের পঞ্চম রাজা। ইহার সঠিক রাজত্বকাল নির্দ্দেশ করা কঠিন, তবে অনুমান ও প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে ৮৮৫ হইতে ৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী সময় ইঁহার রাজত্বকাল বলা যাইতে পারে। মুঙ্গের হইতে দেবপালের রাজত্বের ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষের একখানি তাম্র পত্র পাওয়া গিয়াছে (৪) তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ইনি রাজা ধর্ম্মপালের পুত্র। নারায়ণ পালের সময়ের ভাগলপুরে প্রাপ্ত তাম্রলিপিতে ইঁহাকে ধর্ম্মপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাক্‌পালের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। (৫) পুত্রই হউন বা ভ্রাতুষ্পুত্রই হউন ধর্ম্মপালের রাজ্যের উত্তরাধিকারী ইনিই হইয়াছিলেন। ৮৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কানিংহম ধর্ম্মপালের রাজত্বকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে, ৮৭৫ হইতে ৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধর্ম্মপাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং ৮৮৫ হইতে ৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী সময় দেবপালের রাজত্বকাল বলিয়া মনে হয়। আদিশূর দেবপালেরও পূর্ব্বে বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন, সুতরাং আদিশূর বা সুরসেন ও বীর সেন যে এক ব্যক্তি নহেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি এই সুরসেনকে সেন বংশের আদি পুরুষ বীরসেন মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে বঙ্গের পাল ও সেন রাজ বংশের ধারাবাহিক ইতিহাসে একটা বিশৃঙ্খলা ও বৈষম্যের সৃষ্টি হয়।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও কানিংহম সামন্ত সেনকে বীর সেনের পুত্র বলিয়া অনুমান করেন, কিন্তু মহারাজ বিজয় সেনের লিপিতে এইরূপ লিখিত আছে—

"ক্ষৌণীন্দ্রৈর্বীরসেন প্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্বভূবে
তস্মিন্সেনান্ববায়ে * * * অজনি কুলশিরোদাম
সামন্তসেনঃ ॥"

অর্থাৎ—উক্ত বংশে বীরসেন আদি রাজা হন এবং এই সেন বংশে সামন্ত সেন জন্মগ্রহণ করেন। ইহা হইতে বীর সেন ও সামন্তসেনের মধ্যে অন্যান্য সেন রাজগণের অস্তিত্বের সূচনা পাওয়া যাইতেছে, সুতরাং সানন্তসেন কিরূপে বীর সেনের পুত্র হইতে পারেন? বর্ত্তমানে সামন্ত সেনের স্থিতিকাল ও পিতার নাম সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ঐতিহাসিকগণ একাদশ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে সামন্ত সেনের স্থিতিকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের নব প্রাপ্ত দানপত্রখানি হইতে সামন্তসেনের পিতার নাম ও স্থিতিকাল সম্বন্ধে একটা স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যাইবে, আশা করা যায়।

প্রায় ১০ ইঞ্চি লম্বা ৭ ইঞ্চি চওড়া ও আধ ইঞ্চি মোটা একখানি তাম্রফলকে সংস্কৃত ভাষায় এই দান পত্রখানি লিখিত। অধিকাংশ অক্ষরই অস্পষ্ট, কষ্টে কিয়দংশ পাঠ করা যায়। মহারাজ সামন্ত সেন সুরিশ্বর নামে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কোন ব্রাহ্মণকে ছয়খানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন, এখানি তাহারই দানপত্র। সামন্ত সেন হইতেই সেন রাজবংশের শৃঙ্খলাবদ্ধ ইতিহাস এপর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছিল। ইঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সেন রাজগণ সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব। মাত্র বীরসেনের নাম কোন কোন শিলালিপিতে দৃষ্ট হয়। কিন্তু অদ্যাবধি ইঁহার

[illegible] Arch. Ropdrt Vol I. p. 123. and Ind. Antq. Vol. XXI. p. 254.

৫ Ind. Antq. Vol, XV. p. 305. Also Asiatic Society Journal of Bengal, p. 47-48

সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। আমাদের উপরিউক্ত তাম্রফলকখানিতেই সর্ব্বপ্রথম সামন্ত সেনের পিতা বিশ্বসেনের নাম পাইলাম।

সামন্ত সেনের পিতা বিশ্বসেনকে হয়ত অনেকে লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপ সেন বলিয়া ভ্রম করিতে পারেন। কিন্তু বিশ্ব সেন ও সামন্ত সেনের স্থিতিকালের সহিত বিশ্বরূপ সেনের স্থিতিকালের মধ্যে প্রায় দুই শতাব্দীর ব্যবধান রহিয়াছে এবং উক্ত তাম্রফলকে স্পষ্টাক্ষরে বিশ্বসেনকে সামন্তসেনের পিতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষের একখানি তাম্রলিপিতে বিশ্বরূপ সেনকে লক্ষ্মণ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র বলা হইয়াছে, এবং বিশ্বরূপ সেনের রাজত্ব কালের দুইখানি তাম্রলিপিতে (৬) তাঁহার নামের পূর্ব্বে এই সকল উপাধি পাওয়া যায়—"অশ্বপতি গজপতি নরপতি রাজত্রয়াধিপতি পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহা রাজাধিরাজ অরিরাজ বৃষভাঙ্ক শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীবিশ্বরূপসেনঃ।" সুতরাং বিশ্বসেন ও বিশ্বরূপ সেন একই ব্যক্তি নহেন।

মাত্র তেরটি ছত্রে উপরিউক্ত দানপত্রখানি শেষ হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথম পাঁচটি পংক্তির কোন চিহ্নই নাই, রেখাবশেষ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এগুলি লিপি ছিল। ষষ্ঠ পংক্তি হইতে কষ্টে যেটুকু পাঠোদ্ধার করিয়াছি, নিম্নে তাহা যথাযথ উদ্ধৃত করিলাম। এই ছত্রগুলির মধ্যেও যে সকল স্থান্ পাঠ করিতে পারি নাই, সেস্থানে ... চিহ্ন দিলাম।

"... শাণ্ডিল্য গোত্রঃ দ্বিজো সুরিশ্বরো... ...
পুণ্যহেতোঃ দানং ... হষষ্ঠগ্রামা ... ধনো ...
ধর্ম ... ... ইষাস্য
শুক্ল প্রতি ... বসে ... ... দিত্য নৃপাব্দ্যতীতে
হষষ্ঠাশ (৭) ... সহস্রে ... ... র মহিমাংশু
চন্দ্রমঃ ... ... ত্রৈর্বীরসেন ... তস্মিন্বযায়ে ...
প্রবল প্রতাপ ... রাগ্র ... প শ্রী...মন্ত সেনঃ ...
বিশ্বসেনঃ সু ... ... র্ম ... ভাসু।"

উপরের পংক্তিত্রয় অসম্পূর্ণ এবং ছত্রভঙ্গ হইলেও স্পষ্টই জানিতে পারা যায় যে, মহারাজ সামন্ত সেন ধর্ম্মার্থে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় সুরিশ্বর নামক ব্রাহ্মণকে ছয় খানি গ্রাম ও ধনরত্নাদি দান করেন। তৃতীয় চরণের শেষাংশ হইতে পরবর্ত্তী ছত্রভঙ্গ পংক্তিগুলি পূর্ণ করিলে দানপত্রখানির লিপিকাল দিনের আলোকের মত স্পষ্ট হইয়া যায়। "ইষাস্য শুক্ল প্রতি"র পর "পদাদি" যদি বসান যায় তাহা হইলে পূর্ণ বাক্যটি হয়, "ইষাস্য শুক্ল প্রতিপদাদিবসে"। ইহার পর "আদিত্য নৃপাব্দ" আছে এই আদিত্য নৃপাব্দ পূর্ণ করিবার জন্য "বিক্রমাদিত্যাব্দ অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারা যায়, কারণ খ্রীষ্টপূর্ব্ব হইতে বিক্রমাব্দ ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত ও প্রচলিত হইয়াছিল। ইহার পর "ষষ্ঠাশ"শব্দ পূর্ণ করিলে, ছত্র কয়টির প্রকৃত পাঠ দাঁড়ায় এইরূপ, "ইষাস্য
শুক্ল প্রতিপদাদিবসে বিক্রমাদিত্যনৃপাব্দ্যতীতে
ষষ্ঠাশীরতি পূর্ণ সহস্রে।"

সুতরাং এই দানপত্রখানি যে ১০৮৬ বিক্রমাব্দের আশ্বিন মাসের শুক্লা প্রতিপদের দিন লিখিত বা প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ এবং তদনুযায়ী ১০৮০ বিক্রমাব্দের (১০২৩ খৃঃ) পরবর্ত্তী সময় রাজা সামন্ত সেনের স্থিতিকাল।

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে স্থানে স্থানে আশ্বিন মাসের অর্থে "ইষঃ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ভারতের সর্ব্বত্র বৎসরে তিনবার শষ্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই তিনটি ফসলের মধ্যে শারদীয় ফসলই প্রথম ও শ্রেষ্ঠ। এই সময়ের ফসল পরিপক্ক হইলে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ উহা গৃহে আনিয়া তদ্দ্বারা যজ্ঞ করিতেন। দেবতাকে না দিয়া নূতন দ্রব্য বা খাদ্যসামগ্রী ব্যবহার করা তৎকালে পাপ বলিয়া গণ্য হইত। এই জন্য বৈদিক ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে স্থানে স্থানে "ইষঃ" শব্দ আশ্বিন মাসের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে।

---

৬ A. S. J. of Bengal, Vol. VII. p, 43 and Vol. LXV, Pt. I, p. 9.

৭। দানপত্রে সংস্কৃত "শ"এর বিন্দু ছাড়া কোন চিহ্ন নাই, অনুমানে শ লিখিত হইল।

দানপত্রের অন্তান্ত পংক্তিগুলি পূর্ণ করিয়া পাঠ করিলে এইরূপ হয়—"মন্ত" শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী অধুনা-লুপ্ত অক্ষরটিকে "সা" বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে—

"মহিমাংশু
চন্দ্রমঃ অন্বায়ে—ক্ষৌণীন্দ্রৈর্বীরসেন তন্বিষবায়ে
প্রবলপ্রতাপ বীরাগ্রগণ্য নৃপ শ্রীসামন্ত সেনঃ
বিশ্বসেনসুতঃ ধর্ম্মং কৃতান্‌ু।"

অর্থাৎ মহিমাসম্পন্ন চন্দ্রবংশে বীরসেন প্রভৃতি রাজা হন, সেই বংশে বিশ্বসেনের পুত্র বীরশ্রেষ্ঠ শ্রীসামন্তসেন কর্ত্তৃক ধর্ম্মার্থে এই সকল দান করা হইল।

সুতরাং এখন আর সামন্ত সেনকে সেন বংশের প্রথম রাজা বলা যায় না। ইঁহার পিতা বিশ্বসেনই বঙ্গের প্রথম সেন রাজ এবং সামন্ত সেনের উক্ত তাম্রপত্রানুযায়ী ১০৫৫ সংবৎ হইতে ১০৮০ সংবতের মধ্যে ইহার স্থিতি কাল ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। *

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

---

* ১৩২১ বঙ্গাব্দ বৈশাখে মেদিনীপুরে ত্রয়োদশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ইতিহাস শাখায় পঠিত। প্রবন্ধটি অনূদিত হইয়া দানপত্রের ফটো চিত্র সহ শীঘ্রই বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণাল পত্রে প্রকাশার্থ প্রেরিত হইবে।

সাহিত্য-সমাচার

শোক-সংবাদ

বিগত ২৫শে বৈশাখ মঙ্গলবার বেলা প্রায় দশ ঘটিকার সময়, স্বনামধন্য ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র রায় বাহাদুর মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বারাণসীধামে দেহত্যাগ করিয়াছেন। "অনাথ-বন্ধু" উপন্যাস, তিন খণ্ডে পূর্ণ "সদালাপ," "ভূদেব জীবনী" প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যাদ্বয়—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, উপন্যাস লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে যশস্বিনী হইয়াছেন। আগামী আষাঢ় সংখ্যা পত্রিকায়, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত মুকুন্দদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী তাঁহার ফটো চিত্রসহ আমরা প্রকাশ করিব।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রণীত "কান্তকবি রজনীকান্ত" (জীবনী গ্রন্থ) প্রকাশিত হইল, মূল্য ৪৲

শ্রীযুক্ত রসময় বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত গল্পগ্রন্থ "দেবীর দুয়ারে" যন্ত্রস্থ, জ্যৈষ্ঠমাসে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত নূতন উপন্যাস "নূতন বধূ" প্রকাশিত হইল, মূল্য ১৷৹

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি-এ প্রণীত কবিতাগ্রন্থ "পর্ণপুট" ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইল, মূল্য ১৷৹

কলিকাতা
১৪এ, রামতনু বসুর লেন, "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা

চিত্রকর—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

১৪শ বর্ষ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩২৯

১ম খণ্ড
৫ম সংখ্যা

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের উত্থান ও পতন

শাক্যসিংহ গৌতম প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম তাৎকালীন জনগণের রুচিকর হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার জীবনকালেই সেই ধর্ম্মের বহুল প্রচার হইয়াছিল; কি প্রকারে তাহা সংসাধিত হইয়াছিল তাহা বিস্তারিতভাবে "বিনয়" নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। তিনি সম্বোধি লাভ করিয়া স্বয়ং উদ্ভাসিত হইয়াছিলেন; যাহাতে জনসাধারণ আলোক-রাজ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারে, যাহাতে ধর্ম্মের জ্যোতিঃ বিকীরিত হইতে পারে, সেই নিমিত্ত তিনি নিরলসভাবে ধর্ম্মের অববাদ করিতেন। তাৎকালীন প্রখ্যাত নরপতিগণ শাস্তার ধর্ম্মব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার জন্য ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার জন্য সরথ সপারিষদ উপস্থিত হইতেন। মগধরাজ বিম্বিসার ও তৎপুত্র অজাতশত্রু, কোশলাধিপতি প্রসেনজিৎ, বৎসরাজ উদয়নপ্রভৃতি রাজগণ তাঁহার কাছে আসিতেছেন, বসিতেছেন, কুশলপ্রশ্ন করিতেছেন, মন্ত্রণা লইতেছেন, উপদেশ প্রার্থনা করিতেছেন ইত্যাদি বিষয় "নিকায়" গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। যখন স্মরণ করি যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের দৌরাত্ম্যে মুক্তির দ্বার শূদ্রদের পক্ষে রুদ্ধ ছিল, যখন ব্রাহ্মণেতর কোন বর্ণ মোক্ষানুসন্ধি হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে পারিত না, ও জাতিবিচারের নিগড়ে ক্লিষ্ট পিষ্ট হইয়া তাহারা স্বচ্ছন্দগতি হারাইয়া ফেলিতেছিল, তখন মুক্তির বাণী প্রচারিত হইলে যে তাহারা তৎপ্রতি সমধিকভাবে আকৃষ্ট হইবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তিক্ত আস্বাদের পর মধুর আস্বাদ আরও মধুরতর হয়; নৈরাশ্য-তমিস্রার পর মুক্তির ও আশার আলোক ভাস্বর হইয়া উঠে। তাই যখন অন্যায়ের পীড়ন প্রতিরুদ্ধ করিয়া, জাতিবিচারের সঙ্কীর্ণ বাধার জাল ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়া, বেদের প্রামাণিকতাকে উপেক্ষা করিয়া মুক্তির সংবাদ ঘোষিত হইল, তখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে ব্রাহ্মণেতর হইলেও তাহারা মানুষ, ও একমাত্র সেই অধিকারেই তাহারাও মুক্তির অধিকারী—সে পথ, সে দ্বার তাহাদের পক্ষে খোলাই রহিয়াছে। সেই হেতু এই

ধর্ম্মের প্রচার বেগবান নদের মত অপ্রতিহত গতিতে চলিতে লাগিল, নূতনরূপ মুক্তিস্নানে স্নাত হইয়া তাহারা অভিনব শুচিতার জ্ঞান লাভ করিল।

নিম্নবর্ণের নৃপতিগণ ব্রাহ্মণদের নিকট [illegible] শ্রদ্ধা পাইতেন না। বৌদ্ধধর্ম্মে জাতিবিচারের বালাই ছিল না; সেই জন্য তাঁহারা বৌদ্ধদের নিকট সম্মানভাজনই ছিলেন; নৃপতিগণও বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ সমাদর করিতেন। এই কারণেই মৌর্য্য সম্রাটদিগের সময় এই ধর্ম্ম বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। মৌর্য্যবংশের তৃতীয় সম্রাট্ এই ধর্ম্মকে সাম্রাজ্য ধর্ম্মের আসনে সংস্থাপিত করেন। যেমন রোমান্ সম্রাট্ কন্‌ষ্টান্‌টাইন ইশাই ধর্ম্মকে সাম্রাজ্য ধর্ম্মের আসনে উন্নীত করিয়াছিলেন, সেইরূপ বৌদ্ধধর্ম্মকে সাম্রাজ্য ধর্ম্মে অভিষিক্ত করার নিমিত্ত, অশোককে ভারতের কনষ্টানটাইন বলা হইয়াছে, এবং তাহা ন্যায়সঙ্গতই হইয়াছে। সম্রাট্ অশোক সিংহাসনে বসিয়াও প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসীই ছিলেন, এবং ধর্ম্মের উপদেশ, আচরণ সম্যক্ প্রতিপালন করিতে যত্নবান ছিলেন। ধর্ম্মের জন্য তিনি কি কি করিয়াছিলেন, বিস্তারিতভাবে তাহার আলোচনা এই প্রবন্ধে করা চলে না। সংক্ষেপে দুই এক কথা বলিতে পারা যায়। বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের কতকগুলি বিশিষ্ট বিশিষ্ট বিধানের প্রতি প্রজাবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত তিনি ভাব্রু অনুশাসন প্রচারিত করেন। সৃষ্ট জীবের প্রতি তাঁহার করুণা অসীম ছিল, জীবের জীবন রক্ষার জন্য ও তাহাদিগকে মানবের হিংসা হইতে বাঁচাইবার নিমিত্ত তিনি অনেকগুলি অনুশাসন প্রচারিত করেন। অবশ্য এই জীবে দয়া অথবা জীবে অহিংসা কোন কোনও স্থলে এরূপ বিপরীত মাত্রায় উঠিত যে, মানব জীবহিংসা করিয়া প্রাণিবধ করিলে অথবা মাংস ভক্ষণ করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত। প্রথম জীবনে বোধ হয় তিনি শিবের উপাসক ছিলেন; তখন সমাজের (উৎসবের) নিমিত্ত অগণিত পশু বলিদান হইত। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পর এই প্রাণিহত্যা কমিয়া গিয়া অবশেষে লুপ্ত [illegible] পরধর্ম্ম-সহিষ্ণুতার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন; এবং অন্যান্য তিথিয়গণ (পরধর্ম্মাবলম্বিগণ) তাঁহার করুণা অথবা দানে বঞ্চিত হয় নাই। আজীবক সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এবং তাঁহার পৌত্র কতকগুলি গুহাবাস দান করিয়াছিলেন। সম্বুদ্ধের বাণী প্রচারের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মপ্রচারকগণ গিয়াছিলেন। বহির্ভারতে সিরিয়া, কাইরিণি মিশর, ম্যাসিডন ও ইপাইরাসে প্রচারকগণ গিয়াছিলেন। কম্বোজ, ভোজ, পুলিন্দ প্রভৃতি অর্দ্ধসভ্য জাতিদিগের নিকটও বুদ্ধের বাণী পৌঁছিয়াছিল। চোল, পাণ্ড্য, কেরল, সতিয়পুত্ত প্রভৃতি প্রত্যন্ত প্রদেশও বাদ যায় নাই। মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রার উদ্যোগে তাম্রপর্ণ দ্বীপ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। অধ্যাপক মাহাফি বলিয়াছেন—"Buddhist monks preached in Palestine and Syria a couple of centuries before Christ. He is said to have sent 84,000 missionaries to different parts of India and dominions beyond."

যে ধর্ম্ম বুদ্ধদেবের সময় মগধ ও নিকটবর্ত্তী প্রদেশে সীমাবদ্ধ ছিল, সম্রাট্ অশোকের উদ্যোগ ও প্রযত্নে তাহা ভারতের অনেকাংশে ও বহির্ভারতে প্রচারিত হইয়া ক্রমশ এসিয়া মহাদেশের ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজাদের মত অশোক যে পরধর্ম্ম-সহিষ্ণু ছিলেন, তাহা তাঁহারই অনুশাসন হইতে জানা যায়। অতএব বৌদ্ধধর্ম্মের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও জৈনধর্ম্ম নির্ব্বিবাদে ছিল। বেদবিধিসম্মত যজ্ঞানুষ্ঠানে পশুবলির প্রয়োজন হইত। অহিংসা মন্ত্রের প্রচারে তাহা নিবারিত হওয়ায় বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যাহত হইল, অতএব ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের তেমন আর মাহাত্ম্য রহিল না। এদিকে বৌদ্ধধর্ম্ম সাম্রাজ্য-ধর্ম্মে উন্নীত হওয়ায় তদানীন্তন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সমূহের পুরোভাগে অধিষ্ঠিত হইল।

কিন্তু শীঘ্রই ইহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অশোক পশুজীবনকে এতই শ্রদ্ধা করিতেন যে, শ্রদ্ধার মাত্রা কখন কখনও বিপরীত হইয়া দাঁড়াইত। যে যজ্ঞ পশুর রক্তপাত বিনা অনুষ্ঠিত হইত না, তাহা তিনি বজ্রহস্তে দমন করিয়া দিলেন।

যে সমস্ত অনুশাসন পশুজীব সংরক্ষণার্থে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল তাহা যাহাতে সম্যক্ প্রতিপালিত হয় তাহা দেখিবার জন্য ‘ধর্ম্ম মহামাত্র’গণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কোনও শ্রেণী বা ধর্ম্ম সম্প্রদায় তাঁহাদের অধিকারক্ষেত্র হইতে অব্যাহতি পায় নাই। সম্রাটের পরিবারবর্গও এই প্রভুত্বের বহির্ভূত ছিলেন না। অনুশাসনগুলি সম্যক প্রতিপালিত হইতেছে কি না সন্ধান করিবার জন্য তদ্বির সুরু হইল, সেই তদ্বিরের জন্য চারপ্রয়োগ আরম্ভ হইল, এবং সেই চারপ্রয়োগের অত্যাচার ও দৌরাত্ম্য অনেকাংশে প্রজার জীবনকে তিক্ত করিয়া দিল। ভিক্ষুগণ সম্রাটের বিশেষ শ্রদ্ধা সম্মান ও আদরের পাত্র ছিলেন; অতএব সহজেই অনুমান করা যায় যে ব্রাহ্মণগণ তদনুরূপ সম্মান হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্ষুব্ধ হইতেন। অতএব তাঁহারা যে এই ব্যবস্থার উচ্ছেদের নিমিত্ত সুযোগ অনুসন্ধান করিবেন তাহা স্বাভাবিক। সে সুযোগও উপস্থিত হইল। অশোকের বংশধরগণ তাঁহার মত তেজস্বী ছিল না; দুর্ব্বল হস্ত হইতে রাজদণ্ড স্খলিত হইয়া পড়িল। এই অবকাশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিকূল ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অনুকূল প্রতিক্রিয়া চলিতে লাগিল। অতিজিজ্ঞাসু ধর্ম্মমহামাত্রগণের উপদ্রবে যে সমস্ত লোক বিরক্ত হইয়া গিয়াছিল তাহারা এই আন্দোলনে জোট বাঁধিল। অবশেষে একদিন মৌর্য্যবংশের শেষ বংশধর প্রতিজ্ঞা-দুর্ব্বল বৃহদ্রথকে অনার্য্য মহাসেনাপতি পুষ্পমিত্র বলদর্শন ব্যপদেশে সৈন্য পরিদর্শন কালে পেষণ করিয়া ফেলিলেন। মৌর্য্যবংশের উচ্ছেদ হইল।

পুষ্পমিত্র রাজা বলিয়া গৃহীত হইলেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। যজ্ঞক্ষেত্র পশুরক্তে পুনরায় রঞ্জিত হইল। অহিংসা মন্ত্রের প্রতিবাদস্বরূপ যাজ্ঞিক কর্ম্মানুষ্ঠানসমূহ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিজয়-কেতনরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল।

এই সময়ে ব্যাকট্রিয়াধিপতি ইউক্রাটাইডিসের কুটুম্ব মেনান্ডার ভারত আক্রমণ করিলেন ও সাকেত (অযোধ্যা) পর্য্যন্ত আসিলেন; রাজধানী পাটলিপুত্র আক্রমণের বিশেষ ভয় রহিল। কিন্তু তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল—ভারতীয়দের দৃঢ় প্রযত্নে সে আক্রমণ প্রতিরুদ্ধ ও ব্যর্থ হইয়া গেল। মেনান্ডার বৌদ্ধধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন; বৌদ্ধ গ্রন্থে তাঁহার নাম বিশেষ করিয়া আছে। নাগসেনকে তিনি যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সেগুলি লিপিবদ্ধ হইয়া মিলিন্দ প্রশ্ন (পালি মিলিন্দ পঞ্‌হো) নামে স্মরণীয় হইয়া আছে। পুষ্পমিত্র অনার্য্যের মত স্বীয় প্রভুকে হত্যা করিয়া সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন; ইহাতে এককালে বৌদ্ধধর্ম্ম সিংহাসনচ্যুত হয় ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সেই আসনে অধিষ্ঠিত হয়। মিলিন্দের অভিযান কি পুষ্যমিত্রের বিরুদ্ধে ধর্ম্মাভিযান?

এই তো মোটে প্রতিক্রিয়ার আরম্ভ। জীবে অহিংসা এই মন্ত্রের প্রতিপালন-কল্পে মানবের জীবনও কখন কখনও সংশয়াপন্ন হইয়া পড়িত তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। জীবহিংসা ও মাংস ভক্ষণের জন্য চরম দণ্ড যে প্রাণদণ্ড তাহাও মানুষকে লইতে হইয়াছে। পরবর্ত্তী নৃপতিগণ—যথা হর্ষ ও কুমার পাল—এই অহিংসা বিষয়ে অশোকের পদানুসরণ করিয়াছিলেন। একবার একটী ব্রাহ্মণ অতি কুক্ষণেই একটা উৎকুণকে নখদ্বারা পেষণ করিয়া তাহার জীবলীলা সাঙ্গ করিয়া দেন; সেই দুর্ব্বৃত্তকে জৈনরাজ কুমার পাল তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত করিয়া পথের ভিখারী করিয়া ছাড়েন। অহিংসামন্ত্রের প্রতিপালন যখন এমনি করিয়া চলিতে লাগিল, তখন তাহার প্রতিফল ফলিতে বেশী বিলম্ব হইল না। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি ব্রাহ্মণদের বিতৃষ্ণা বাড়িয়া গেল। কেহ কেহ বলেন যে পুষ্যমিত্র বৌদ্ধধর্ম্মের পীড়ক ছিলেন। যখন ইতিহাসে মিহিরগুপ্ত ও শশাঙ্কের বর্ব্বরোচিত ধর্ম্ম-পীড়নের কথা লিখিত আছে, তখন পুষ্যমিত্রের বৌদ্ধধর্ম্মদ্বেষ ও ধর্ম্মপীড়ন কেনই বা অবিশ্বাস্য হইবে?

সুঙ্গবংশের পর কাণ্বায়ন বংশও হিন্দু ছিল। অন্ধ্র বংশও হিন্দু ছিল; কিন্তু সেই বংশের নৃপতিগণ ধর্ম্ম বিষয়ে উদারমত পোষণ করিতেন; প্রাচীন ভারতীয় নৃপতিদিগের মত তাঁহারাও পরধর্ম্ম-সহিষ্ণু ছিলেন। দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহারা হিন্দু নামে পরিচিত

হইলেও বৌদ্ধমঠ ও অন্যান্য বৌদ্ধ অনুষ্ঠানের নিমিত্ত প্রভূত দান ও সাহায্য করিয়াছিলেন।

কিন্তু এতদিনে বৌদ্ধ ধর্ম্মে কিছু পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছিল। কনিষ্কের সময়ে যে ধর্ম্ম ছিল, তাহা গৌতম-প্রচারিত ধর্ম্ম ত নহেই, অধিকন্তু অশোকাচরিত ধর্ম্মও নহে। বুদ্ধদেব এখন একজন দেবতার মত পরিগণিত হইয়া দেবতারই মত পূজিত হইতেছিলেন। স্বয়ং বুদ্ধদেব কখনও চাহেন নাই যে তিনি পূজিত হন; কিন্তু কালচক্রে তাহাই ঘটিল। বুদ্ধ হইলেন দেবতা; আর অসংখ্য ভক্তের ভক্তি, প্রাণের আরাধন—রূপ ধরিয়া প্রবাহিত হইল। সেই ভক্তি বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিতে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল, এক অভিনব ভাস্কর্য্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। এই নববিধানের বৌদ্ধ ধর্ম্ম মহামান্য ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হয়। ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বলেন যে নানা সংমিশ্রণে এই ধর্ম্মের উৎপত্তি নানা উপাদানে ইহার অবয়ব গঠিত। স্মরণ রাখিতে হইবে যে আলেকসন্দর ভারত বিজয় করিয়াছিলেন, তাহার পরে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, এবং রোমীয় জগতের সহিত ভারতের সংস্পর্শ ছিল। অতএব ভারতীয় জরাথুষ্ট্রীয়, খৃষ্টান, হেলেনীয় ও **Gnostic** উপাদান সমূহের বিচিত্র মিলনে এই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইল। এই নবধর্ম্মের ঋষি গৌতম হইলেন দেবতা; তিনি বোধিসত্ত্ব পরিবৃত ও সেবিত হইলেন। পাপীর আর্ত্ত স্বরে তাঁহার শ্রুতিযন্ত্র পরিপূরিত হইতে লাগিল, বোধিসত্ত্বগণের করুণোচ্ছ্বসিত প্রার্থনা তাঁহার চরণপ্রান্তে অহরহ নিবেদিত হইতে লাগিল—পাপীদের মুক্তিও সংঘটিত হইল। কনিষ্কের সুবিস্তৃত রাজ্যে নানা জাতি বাস করিত; সর্ব্বভয়পরিত্রাতা, সর্ব্বমুক্তিদাতা, করুণার প্রতিমূর্ত্তি এই নববুদ্ধদেবকে সকলেই বরণ করিয়া লইল। এই মহাযান তন্ত্রের বিচিত্র পুরাণ ও দেবপরিষৎ গড়িয়া উঠিল।

যখন বিদেশীয়গণ দেখিলেন যে এই ধর্ম্মের সহিত তাঁহাদের ধর্ম্মমতের কিছু কিছু মিল আছে, তখন তাঁহারা অতি অনায়াসেই এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। দেবদেবীর ধারণা হিন্দুদের ছিল; এই নব বৌদ্ধধর্ম্মে দেবতার স্থান হইল; অতএব দেখা যাইতেছে যে হিন্দুপ্রভাব সংক্রমিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার নিদর্শন দেখুন—কনিষ্কের কিছু পরবর্ত্তী এক রাজা বাসুদেব নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার যে মুদ্রা ছিল তাহার একদিকে শিবের মূর্ত্তি ও অন্যদিকে শিববাহন নন্দির (বৃষভের) প্রতিমূর্ত্তি লিখিত ছিল।

গুপ্ত সাম্রাজ্য কালে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় বেশ একটু তেজ করিয়া উঠিল। আবার যজ্ঞভূমি বৈদিক মন্ত্রে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, আবার যূপকাষ্ঠ পশুরক্ত-রঞ্জিত হইয়া উঠিল, আবার হোমবহ্নে গগন উদ্ভাসিত হইল। সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয় করিয়া ফিরিলেন—আজ অনেক দিনের পর—সেই পুষ্পমিত্রের যজ্ঞানুষ্ঠানের পর বোধ হয় আবার অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের গৌরবের দিন ফিরিয়া আসিল সত্য; কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রতিকূলতাচরণ হইল না; কেন না গুপ্ত সম্রাটগণ পরধর্ম্মাসহিষ্ণু ছিলেন না। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে চীন পরিব্রাজক ফা হিয়েন ভিক্ষু-জীবনের নিয়ামক বিনয়নামক ধর্ম্মগ্রন্থের অনুসরণে চীন হইতে সুদূর ভারতে আসিয়াছিলেন। উত্তর ভারতে, বিশেষতঃ মথুরার সন্নিধানে, শত সহস্র ভিক্ষু-অধ্যুষিত সারি সারি বহু সঙ্ঘারাম তিনি দেখিয়াছিলেন, এবং সেই সকলের বর্ণনাপাঠে এই ধারণাই হয় যে সেগুলি বিশেষ সমৃদ্ধই ছিল। তিনি বলেন যে বৌদ্ধধর্ম্মমন্ত্র অংহিসা পরমোধর্ম্ম সাধারণতঃ অনুচরিত হইত। ভারতীয়দিগের নৈতিক জীবনও বেশ উন্নত ছিল—"সমগ্র দেশে প্রাণিহত্যা জীবহিংসা কেহ করে না, সুরাপান নাই; পেঁয়াজ রশুন খাইবার বালাই নাই; কাহাকেও কুক্কুট অথবা বরাহ পুষিতে দেখি নাই; গবাদি পশুর বিকিকিনি নাই; হাটে বাজারে কষাইখানা নাই, মদের ভাটিও দেখা গেল না।" রাজা সঙ্ঘে প্রভূত দানও করেন। কিন্তু এস্থলে একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে; তিনি ছিলেন একজন প্রবল বুদ্ধভক্ত; অতএব তাঁহার কিঞ্চিৎ একদেশদর্শন বিচিত্র নহে। ভিনসেণ্ট স্মিথ বলিতেছেন,

“ফা হিয়েন ছিলেন একজন গভীর ভক্ত ধার্ম্মিক শিরোমণি; অতএব যাহা তিনি দেখিয়াছেন অবশ্য বৌদ্ধের চশমা পরিয়াই দেখিয়াছেন; কাযেই তাঁহার নজরের ঠিক ছিল না। তাঁহার বিবরণী পড়িয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের যতটা ঐশ্বর্য্য ছিল বলিয়া মনে হয় বাস্তবিক ততটা ছিল না; কেননা সাম্রাজ্য যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছিল তখন নিশ্চিতই তাহারই প্রাধান্য সমধিক হইবে ইহাই সমীচীন ও সহজেই অনুমেয়; কিন্তু তাহার বিবরণী পাঠে ঠিক এই ধারণা হয় না।” বস্তুতঃ ফা হিয়েনের ভারত পরিব্রজনের বহু পূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিকূল তরঙ্গ উত্থিত হইয়াই চলিতেছিল। চীন পরিব্রাজক ফা হিয়েনের নজর এড়াইলেও যথার্থতঃ বৌদ্ধধর্ম্মে ভাটা পড়িয়াছিল—অধোগতি বহু পূর্ব্ব হইতেই সুরু হইয়াছিল।

প্রাচীন নৃপতিবৃন্দের মত গুপ্ত সম্রাটগণ সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়কেই অনুগ্রহ করিতেন; গোঁড়া হিন্দু হইলেও সর্ব্ব সম্প্রদায়ে তাহারা মুক্তহস্তে দান করিতেন। তাম্রফলকে লিখিত দানপত্রের কথা আমরা পাঠ করি। তাঁহারা সংঘারামে এবম্বিধ প্রভূত দান করিয়াছিলেন। তাম্রফলকে লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে যাহাতে সেগুলি থাকে ও দানপত্রে লিখিত সর্ত্তগুলি পরবর্ত্তী নৃপতিগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হয়। ইহা হইতে মনে হয় সে সংঘারামগুলি বেশ সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু সম্রাট অশোকের সময় যে স্থানগুলির বিশেষ খ্যাতি ছিল, ফা হিয়েনের সময় সে সকল স্থান জনশূন্য ও হিংস্র-শ্বাপদ ও বন্য মাতঙ্গের আবাসভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে—যেমন গয়া, কপিলাবস্তু ও শ্রাবস্তি।

খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভূত প্রভাব ছিল। আফগানিস্থান, সোয়াট, কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত তাবৎ প্রদেশে অসংখ্য সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ ও সহস্র সহস্র লিপি তাহার স্মৃতিচিহ্ন বহন করিয়া আছে। মৌর্য্যদের রাজত্বের সময় এই ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই বংশের পরধর্ম্মাসহিষ্ণুতার জন্য গোঁড়া হিন্দুধর্ম্মের দুরবস্থা থাকিলেও তাহা বেশ টিকিয়াছিল। পরে সুঙ্গ ও কাণ্বায়ন বংশের রাজত্বকালে তাহার পুনরভ্যুদয় ঘটিল। কুশানদিগের রাজা দ্বিতীয় ক্যাডফাইসিস শৈব ছিলেন, ও তাঁহার মুদ্রায় শিবমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। কনিষ্ক মহাযানতন্ত্রে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে, এমন কি পরেও, শিবের অর্চ্চনা করিতেন। হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাণপণ যুঝিতেছিল, এবং অতি অল্পে অল্পে স্বাধিকৃত ভূমি ত্যাগ করিতেছিল। কি ধর্ম্মনীতি, কি পৌরাণিক দেবসমাজ এই উভয় বিষয়েই মহাযানতন্ত্র ও হিন্দুধর্ম্মে অনেক সামঞ্জস্য ছিল। কখনও কখনও বিশেষজ্ঞদিগকেও কোনও ধর্ম্মমত বা মূর্ত্তি হিন্দুর না মহাযানতন্ত্রের এই লইয়া বিষম গোলমালে পড়িতে হইত—এই দুইয়ের মধ্যে এতই সৌসাদৃশ্য ছিল। ক্রমে গতি হিন্দুধর্ম্মের দিকেই চলিতে লাগিল। কনিষ্ক, বশিষ্ক ও হুবিষ্কের পরে আমরা পাই বাসুদেবের নাম; বাসুদেব নামটি সম্পূর্ণ হিন্দু। তিনিও শৈব ছিলেন। সুরাষ্ট্রের শক সাত্রাপ (Satrap, ক্ষত্রপ) গণ বৌদ্ধধর্ম্মের অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মকেই বিশেষ মানিতেন, এবং হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। ব্রাহ্মণদের ভাষা সংস্কৃতেই তাঁহাদিগের লিপিসমূহ লিখিত হইত। রুদ্রদামনের কীর্ত্তিকলাপ সংস্কৃতেই রচিত হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে এই যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল তাহার হেতু কি—ইহার সমাধান করিতে চেষ্টা করা যাউক। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে সম্রাট অশোকের মহামাত্রা ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের (censors) অত্যাচারে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের তথা ব্রাহ্মণগণের অবমাননা হইতেছিল। পুষ্পমিত্রের সিংহাসনারোহণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠারই দ্যোতক। অসূয়া-প্রণোদিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ পুষ্পমিত্রকে বৌদ্ধধর্ম্ম নির্য্যাতনে প্ররোচনা দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সাময়িক। অবশেষে ভারতের শাশ্বত পরধর্ম্মসহিষ্ণুতাই জয়লাভ করিল। বৌদ্ধধর্ম্ম কেন যে জনগণকে আর তেমন আকৃষ্ট করিতে পারিল না, হ্যাভেল সাহেব তাহার কয়টি কারণ দেখাইয়াছেন। বিদেশীয় নরপতিগণ যখন ভারতের সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন, তখন, বিশেষতঃ কুশান সম্রাটদিগের সময়ে, বৌদ্ধ মহাযানতন্ত্রের

প্রাদুর্ভাব হইল। কিন্তু মনে হয় না যে ভারতের প্রাচীন আর্য্য অভিজাত শাসক সম্প্রদায় বিদেশীদিগের এই রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিনা প্রতিবাদে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন; অথবা আর্য্যদিগের অনুষ্ঠান, আর্য্যদিগের 'ট্রাডিশন'-অনভিজ্ঞ বিদেশীয়দিগকে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তদ্ব্যতিরেকে বৌদ্ধ সংঘের উচ্চ উদ্দেশ্য সম্যক্ সার্থক হয় নাই। হ্যাভেল বলিতেছেন যে—যেমন দেখা যায় যখনই কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় রাজসরকার দ্বারা প্রতিপালিত ও পরিপুষ্ট হইয়া বেশ প্রতাপান্বিত হইয়া পড়িয়াছে, তখনই উচ্চ আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে 'পাটোয়ারী বুদ্ধি' প্রবেশ করিয়া তাহাকে সংসারী করিয়া তুলিয়াছে। বৌদ্ধ সংঘের সেই দশা হইল। সংঘের স্বার্থ ও একচেটিয়া সুবিধা বজায় করিতে গিয়া তাহারা তথাগত-নির্দ্দিষ্ট নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের সিদ্ধিলাভের বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়িল। আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। পূর্ব্বেও যে সংঘ স্বীয় পরিধি অতিক্রম করিয়া রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিত, অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিপত্তি-বিস্তারক সম্রাট অশোক ও কণিষ্ক সংঘের প্রভাব বর্দ্ধিত করিতে গিয়া অবশ্যই কিয়ৎ পরিমাণে রাজদণ্ডের সঙ্কোচ ঘটাইয়াছিলেন। সেই অবকাশে নানা উপায়ে সংঘ তদ্বহির্ভূত সম্প্রদায় সমূহকে স্বল্পাধিক নির্য্যাতিত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অত্যাচার যদি অত্যাচার বলিয়া অনুভূত হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধ সংঘের অত্যাচার অত্যাচার বলিয়া কেন না অনুভূত হইবে? ব্রাহ্মণগণের ন্যায় বৌদ্ধগণ প্রাকৃতজনের অবলম্বন ও সহানুভূতি পাইবার নিমিত্ত তৎসুলভ নানাবিধ কুসংস্কারের পরিপোষণ ও পরিবর্দ্ধন করিতেছিল। ইহা হইতেই তথাগত ও অন্যান্য মহাপুরুষদিগের দেহাবশেষ পূজা (relic worship) সুরু হইল। কল্পিত নয়নপক্ষ্ম, কল্পিত দন্ত, কল্পিত নখাগ্রের মহাসমারোহ করিয়া পূজার্চ্চনা চলিতে লাগিল।

সংঘ-প্রচারিত অহিংসা মন্ত্র—জীবে দয়া ও আত্মসংযম এই সকলে পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তকে জাতিহীন বিদেশীয়দিগের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। অপর পক্ষে এই অহিংসা মন্ত্রে এ দেশের লোককে নিরীহ ও নির্ব্বীর্য্য করিয়া তুলিতেছিল। বিদেশীয়দিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার শক্তি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। হ্যাভেল বলেন—"ভিক্ষুর জীবনকে লোকে এত অধিক পরিমাণে শ্রদ্ধা করিত ও ক্ষত্রিয় যুবকগণের নিকট ইহার আকর্ষণ এত অধিক ছিল যে, দুর্ভাগ্যক্রমে আর্য্যাবর্ত্তের রণশক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িতেছিল। জাতির তথা রাজ্যের সংরক্ষণের নিমিত্ত যে শক্তি একান্ত আবশ্যক তাহা সহস্র সহস্র সংঘারাম শোষণ করিয়া লইতেছিল। যাহাদের অসিধারণ করিয়া দেশ ও দেশের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার কথা ছিল, তাঁহারা কাষায় ধারণ করিয়া দলে দলে বিহার পরিপূর্ণ করিতেছিল।"

আর্য্যাবর্ত্তের ভাবী বিপদের সম্ভাবনা কখনও কখনও আর্য্য ক্ষত্রিয়গণ উপলব্ধি করিতেন। এবম্ভূত কোনও ক্ষত্রিয়বংশে গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের উৎপত্তি হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মেরও পুনরুত্থান হয় সেই সময়ে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের এই নবজীবন প্রসঙ্গে হ্যাভেল সাহেব বলেন যে, আর্য্য বংশাবতংস রাজপুত্র সিদ্ধার্থ যে মৌলিক ধর্ম্মের প্রচার করেন, বাস্তবিকপক্ষে ব্রাহ্মণগণ তাহার প্রতিরোধ করেন নাই। অধিকন্তু সর্ব্বাগ্রে তাঁহারাই বৌদ্ধধর্ম্মের মূল মতবাদগুলি সাদরে গ্রহণ করিয়া (গোঁড়া) হিন্দুধর্ম্মের সহিত অবিমিশ্র ভাবে একাঙ্গীভূত করিয়া দেন। তুর্কি পাঠান ও সিথীয়দিগের নায়কত্বে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে নানাবিধ কুসংস্কার, অন্তর্দুষ্টতা ও অপরিচ্ছন্নতার ভিত্তির উপর যে সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতেছিল, আর্য্যগণের জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি তাহারই বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল।

ক্রমে মহাযানতন্ত্রে ও হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য এতই স্বল্প হইল যে স্কন্দগুপ্ত, যিনি পরম বৈষ্ণব ও বিষ্ণুভক্ত বলিয়া পরিগণিত হইতেন,—বৌদ্ধেরাও তাঁহাকে বিখ্যাত মহাযানতন্ত্র-গুরু বসুবন্ধুর ভক্ত শিষ্য বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভারতে পঙ্গপালের মত হূণগণ আসিয়া পড়িতে লাগিল। ৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে স্কন্দগুপ্ত

তাহাদিগকে কোনও প্রকারে ঠেকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু তাহাদের গতি রুদ্ধ হইল না! সে স্রোতে বাধা দিবার প্রয়াস পাইলেন পুরগুপ্ত ও নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য। তৃণগুচ্ছের মত সেই বাধা ভাসিয়া গেল। ইতিমধ্যে হূণগণ ভারতের ভাবগতি হৃদয়ঙ্গম ও আত্মসাৎ করিবার প্রয়াস পাইল। তোরামণের পুত্র মিহিরগুপ্তকে বৌদ্ধ-দ্বেষী ও প্রজাপীড়ক বলিয়া তাঁহারা বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ভারতের তিতিক্ষা ও ভারতের উদারতার প্রতিদানে মিহিরগুপ্ত আশ্রয়তরুর মূলোৎপাটন করিয়া গান্ধার রাজকুলকে ধ্বংসমুখে প্রেরণ করিলেন।

তাহার পর গান্ধারে বৌদ্ধধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক হর্ষবর্দ্ধনের কথা পাই। সুবিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হিউয়েন স্যাং সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকের দেশ এই ভারতে তাঁহারই রাজত্বকালে আসেন। ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া হর্ষ হিউয়েনসাঙের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ বিবরণী হইতে দেখা যায় যে বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক অবনতি হইয়াছে। ফা হিয়েন যতগুলি বৌদ্ধবিহারের উল্লেখ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছিল। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে একটা কাহিনীর উল্লেখই যথেষ্ট হইবে। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন শাস্তার উপদেশাবলীর প্রচার নিমিত্ত, কান্যকুব্জে একটী সমিতির আয়োজন করেন। সেই উপলক্ষ্যে একটা প্রকাণ্ড বৌদ্ধ বিহার সেই সময়ের জন্য নির্ম্মিত হয়। হঠাৎ তাহাতে আগুন লাগিয়া তাহার অধিকাংশ ধ্বংস হইয়া যায়। বেশ বুঝা যায় যে সম্রাটের প্রাণবধের নিমিত্ত পূর্ব্বে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, অতএব হঠাৎ অগ্নিসংযোগ একেবারে হঠাৎ নহে। এক ব্যক্তি তাঁহাকে ছুরিকাঘাতে বধ করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। সে ধরা পড়িয়া স্বীকার করে যে, কয়েকজন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সে সম্রাটকে বধ করিবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল। সম্রাট বৌদ্ধদিগকে অতিরিক্ত পরিমাণে সম্মান প্রদর্শন করিতেন ও প্রভূত দান করিতেন। পরশ্রীকাতরতা ও ঈর্ষায় দগ্ধ হইয়া হইয়া, ব্রাহ্মণগণ এই দানের উৎসকে একেবারে লুপ্ত করিতে প্রয়াস পান। এই কাহিনী হইতে প্রতীয়মান হয় যে কি উত্তর ভারতে, কি দক্ষিণ ভারতে, লৌকিক ধর্ম্ম হিসাবে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিপত্তি কমিয়া আসিতেছিল। এই স্থলে বিশেষ করিয়া স্মরণ করিতে হইবে যে সম্রাট হর্ষ সর্ব্ব ধর্ম্মসম্প্রদায়কেই সমান চক্ষে দেখিতেন। সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে দান করিতেন ও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন—শিব, সূর্য্য ও বুদ্ধদেব এই তিনেরই অনেক মন্দির রচিত হইয়াছিল। অবশ্য শেষ বয়সে সর্ব্বধর্ম্মমত অপেক্ষা মহাযানতন্ত্রেরই উপর তাঁহার আস্থা বাড়িয়াছিল। অহিংসা মন্ত্রের তীব্র পরিপালন বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে উপরিউক্ত ভীষণ প্রতিক্রিয়া আনয়ন করিয়াছিল।

অতএব ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ হইতে যখন প্রবলপ্রতাপ সম্রাট হর্ষ তিরোহিত হইলেন, তখন হইতেই গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পক্ষে পূর্ব্বগরিমা ফিরিয়া পাওয়া সহজসাধ্য হইয়া উঠিল। ইহারই কাহিনী আগামী সংখ্যায় সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীকালীপদ মিত্র।

৺মুকুন্দদেধ মুখোপাধ্যায়

দীনের বন্ধু, বিপন্নের উদ্ধারকর্ত্তা, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা, অনাড়ম্বর স্বদেশসেবী,শাস্ত্রবিশ্বাসী, স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, ব্রাহ্মণ্যের জ্বলন্ত অবতার, পিতৃভক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়া বিগত ২৬শে বৈশাখ দিবা সাড়ে দশ ঘটিকার সময় কাশীস্থ নিজের গৃহে দেহত্যাগ করিয়াছেন। দুর্দ্দান্ত কাল আজ বাঙ্গালার একটি অমূল্য রত্ন অপহরণ করিল। বাঙ্গলার একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র নিজের পথে আলোক ছড়াইয়া দীর্ঘপথ আলোকিত করিয়া কোন্ দূরদেশে কোন্ ঊর্দ্ধদেশে হঠাৎ চলিয়া গেল। মুকুন্দদেবের সমস্ত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান যেমন অনাড়ম্বরে সম্পন্ন হইত, কিছুতেই কোনও আড়ম্বরের চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই, আজ দেহান্তের সময়েও সেইরূপ কোনপ্রকার আড়ম্বর হয় নাই। ডাক্তার কবিরাজের গাড়ী পাল্‌কী মোটরে, বন্ধুবান্ধবের গাড়ী পাল্কী মোটরে বাড়ী ভরিবার অবসর হয় নাই।

২৪শে বৈশাখ তাঁহার পিতৃদেব ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মৃততিথি, সেইদিন তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে মত যথাবিধি পিতৃশ্রাদ্ধ করেন। অধ্যাপক পণ্ডিতদিগকে গ্রীষ্মাতিশয় জন্য গৃহে আহ্বান করা হয় নাই—তৈজস দক্ষিণা বিদায় ও ফল তাঁহাদিগের বাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। "বিশ্বনাথ বৃত্তি" ও "ভূদেব বৃত্তি"র অধ্যাপকদিগের ও ছাত্রদিগের প্রার্থনা-পত্রের বিচার ও সেই বৃত্তিদ্বয়ের বজেট পাশ করিবারও সেইদিন পদ্ধতি আছে; তাঁহাও তিনি করিয়াছিলেন।

পরদিবস পূর্ব্বাহ্ন সাতটার সময়ে একটি সমিতি ছিল; তাহাতেও তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন। যে সকল মহাত্মারা সমাজে স্ত্রীজাতির নিপীড়ন দেখিয়া অশ্রুতে বুক ভাসাইয়া বড়গলায় সভায় বক্তৃতা দিয়া থাকেন, প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে সাময়িক পত্রিকার কলেবর পুষ্ট করিয়া থাকেন, সেই গুণধর পুত্র ও পুত্রস্থানীয়েরা মাতা ও মাতৃস্থানীয়াদিগের পরলোকে সদ্‌গতি লাভের জন্য (বিশেষতঃ গৃহিণীর সাধু পরামর্শে) একেবারে অধীর হইয়া পড়েন, এই কল্যাণকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে মুহূর্ত্তের জন্যও আর পশ্চাৎপদ হইতে পারেন না, তাঁহাদিগের ভরণপোষণ বাড়ীভাড়া প্রভৃতির সম্পূর্ণ সহায্যের জন্য মাসিক উচ্চহারে পাঁচ টাকা করিয়া মাসে মাসে মণি-অর্ডার যোগে পাঠাইবার স্বীকার করিয়া কোন অপরিচিত বন্ধু বা সেইরূপ কোন ভৃত্যের সহিত তাহাদিগকে পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীতে পাঠাইয়া দিয়া নিষ্কৃতিলাভ করেন। অবশ্য কিছুকাল সেই নির্দ্দিষ্ট টাকা আসে, পরে অনেক স্থলে টাকা বন্ধ হইয়া যায়। তখন সেই কাশীবাসিনী বিধবাদিগের দুর্দ্দশার একশেষ হয়। প্রধানতঃ তাঁহাদিগের এই দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য কাশীতে একটি "মহিলা আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়" স্থাপিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয় সমিতির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়। ২৫শে বৈশাখ পূর্ব্বাহ্নে সেই বিদ্যালয়-সংক্রান্ত একটি সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে তিনি উপস্থিত হয়েন, আমিও উপস্থিত হই। সদর রাস্তায় গাড়ী রাখিয়া গলিতে কিছু দূর যাইতে হয়। আমি সেইটুকু হাঁটিয়া একেবারে হাঁপাইয়া পড়ি, উপরে না উঠিয়া শ্রান্তিদূর করিবার জন্য নীচে বসিতে হয়, মাথায় পাখার বাতাস করিতে হয়। মুকুন্দদেবের কষ্ট হয় নাই বলিতে পারি না, তিনি পূর্ব্বেও যেমন কোনদিন নিজের কষ্ট কাহাকেও জানিতে দেন নাই, সেদিনেও সেইরূপ কাহাকেও জানাইয়া ব্যথিত করেন নাই।. কার্য্যান্তে ১০টার সময়ে আবার উপর হইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নামিতে হয়। আমি নামিয়া পূর্ব্ববৎ বিশ্রামার্থ উপবেশন করি, মুকুন্দ বাবুকেও বসিতে অনুরোধ করি। তিনি না বসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমি উঠিবার সময়েও এক এক ধাপ উঠিয়াছি আর গায়ত্রীমন্ত্র স্মরণ করিয়াছি, নামিবার সময়েও এক এক ধাপ নামিয়াছি আর গায়ত্রীমন্ত্র স্মরণ করিয়াছি।" মুকুন্দদেবের বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখিলেও

৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়

বিস্মিত হইতে হয়। তিনি পূর্ব্ববৎ পদব্রজে গলি ভাঙ্গিয়া গাড়ীতে চড়িয়া গৃহে প্রস্থান করেন; গলি পথ আমায় পার করিয়া দিবার জন্য পাল্কীর বন্দোবস্ত করিতে হয়। অপরাহ্নে তিনি আবার স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ধর্ম্মমহামণ্ডলে গিয়াছিলেন। ইহাতে কি করিয়া বুঝিব যে পরদিবসেই তাঁহার দেহান্ত হইবে? কেহ কি বুঝিয়াছিলেন? কেহই না; এমন কি তিনি যাহাদিগকে একটু আভাষ দিয়াছিলেন তাঁহারাও বুঝিতে পারেন নাই।

কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহার কন্যা শ্রীমতী অন্নরূপাকে বলিয়াছিলেন, "বাবার শ্রাদ্ধান্তে সেইদিনই আমার যাইতে ইচ্ছা করে।" কিন্তু শ্রাদ্ধান্তে সেই দিনই অপরাহ্নে বলিয়াছিলেন, "একাদশীতে গেলে বাড়ীর লোকের ও অন্যান্য লোকের কষ্ট হইবে; দ্বাদশী তিথি ভাল নয়, সর্ব্বসিদ্ধা ত্রয়োদশী—ত্রয়োদশীই ভাল; তবে দক্ষিণে যোগিনী,—কাশীতে দক্ষিণে যাইবার আশঙ্কা নাই।" ২৬শে বৈশাখ দিবা দশ ঘটিকার সময়ে ঠিক সেই শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে, অবিমুক্ত বারাণসীক্ষেত্রে গঙ্গাতীরে

সেই মহাপুরুষ পুণ্যশ্লোক মুকুন্দদেব নশ্বর দেহ রাখিয়া বিশ্বনাথে বিলীন হইলেন,—তাঁহার কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে ফলিল। কিছু পূর্ব্বে ডাক্তার আসিয়া হাত দেখিয়া আত্মীয় আত্মীয়াদিগকে বলিয়াছিলেন নাড়ী নাই। অল্প ক্ষণের জন্য একবার সুফল দেখাইয়া পরক্ষণেই অকস্মাৎ সব ফুরাইল। আত্মীয়জন আকাশ হইতে মাটীতে পড়িয়া গেলেন। আদর্শচরিত্র মুকুন্দদেবের সৎশিক্ষার গুণে কেহই হাউমাউ করিয়া উঠেন নাই, কেহই চীৎকার করিতে পারেন নাই; সকলেই নিঃস্পন্দভাবে শূন্য নয়নে মুকুন্দদেবের দিকে তাকাইয়া ছিলেন। মুকুন্দদেবও নিশ্চিন্ত প্রসন্ন মনে [illegible]জননীর ক্রোড়ে নিঃস্পন্দ ভাবে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সেই সময়ের মুখ চোখ দেখিয়া কে বলিবে যে মুকুন্দদেবের মৃত্যু হইয়াছে! তিনি যেন বিভোর ভাবে সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার সেই সময়ের ফটো লওয়া হইয়াছে—সে ফটোতেও কোনরূপ মৃত্যুচিহ্ন লক্ষ্য করা যায় না,—মুখে যেন তাঁহার সুখসুপ্তি লাগিয়া রহিয়াছে। বঙ্গের উজ্জ্বলরত্ন, “পার্থাশ্বমেধের” কবি, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের অনুবাদক, সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, ষড়দর্শনের সমন্বয়কারী, “মহাপ্রস্থানের” রচয়িতা, অগ্নিহোত্রী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি মুকুন্দদেবের শবানুগমন করিয়া মণিকর্ণিকাপর্য্যন্ত গিয়াছিলেন; [illegible]বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ”—ইঁহারা প্রকৃত বন্ধুর [illegible] করিয়াছিলেন।

বিশ্বনাথ তর্কভূষণের পৌত্র মুকুন্দদেব ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বন্ধু, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বড় ভক্ত ছিলেন। ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহার পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের নামে “বিশ্বনাথ বৃত্তি” স্থাপন করিয়া যান। মুকুন্দদেব সেই টাকা ক্রমে নানা প্রকারে বাড়াইয়া, সেই বিশ্বনাথ বৃত্তির বৃত্তিভোগী অধ্যাপকের সংখ্যা ক্রমে বাড়াইয়াছেন। এখনও যে বাঙ্গালায় সংস্কৃত অধ্যাপক দেখিতে পাইতেছি, এখনও যে পূর্ব্বের ন্যায় অধ্যাপকবৃন্দ টোলে ছাত্র রাখিয়া তাহাদিগকে আহার দিতেছেন, ইহার মূলে কোন মহাপুরুষ অধিষ্ঠিত? একদিকে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন উপাধি-পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়া বাঙ্গলার টোলগুলি রক্ষা করিয়াছিলেন, অন্যদিকে এই বিশ্বনাথ বৃত্তির প্রবর্ত্তনা হইয়া সেই টোলগুলি পূর্ব্ববৎ উজ্জীবিত হইয়া অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় একলক্ষ বাষট্টি হাজার টাকা দিয়া বিশ্বনাথ বৃত্তির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। মুকুন্দদেব সেই ভিত্তির উপরে প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যাহার ছায়া সমস্ত বঙ্গদেশে—বঙ্গের বাহিরে বিহার ও উড়িষ্যা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে, ছাত্রবৃন্দের সহিত অধ্যাপকবৃন্দ সুখে সেই ছায়ায় বসিয়া নিশ্চিন্তমনে শাস্ত্রানুশীলন করিতেছেন। মুকুন্দদেব নিজে আবার পিতা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নামে একটি বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। কাশীবাসী অধ্যাপকগণের মধ্যে সেই বৃত্তিগুলি বিতরিত হয়। মুকুন্দদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দদেবের নামেও একটি বৃত্তি স্থাপিত হইয়াছে,—সেটি নাগপুরে দেওয়া হয়। বেহার ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে হিন্দীভাষার জন্য “ভূদেব মেডেল” দেওয়ারও তিনি ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদিগের আদি নিবাস কান্যকুব্জ; সেই কান্যকুব্জে সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পুনঃ-প্রবর্ত্তনের জন্য সেখানে মুকুন্দদেব একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। বিদ্যালয়ে একটি উপযুক্ত অধ্যাপকও নিয়োজিত হইয়াছেন। গোজাতির রক্ষার জন্য তাঁহার প্রবর্ত্তিত গোকুণ্ড সমিতি স্থাপন তাঁহার শেষ কীর্ত্তি। এই গোকুণ্ড সমিতির উন্নতি ও কান্যকুব্জ বিদ্যালয়ের উন্নতি তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

এই কাশীক্ষেত্রে তাঁহার তৃতীয় পুত্র সোমদেবের দেহান্ত হইলে মুকুন্দদেব তাহার নামে “সোমদেব সৎকর্ম্মভাণ্ডার” নামে একটি ফণ্ড স্থাপন করেন। সেই ভাণ্ডারের অর্থ হইতে জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে দরিদ্র বিপন্ন ও আর্ত্তের সাহায্য ও অন্যান্য সৎকার্য্যে দান করা হইতেছে।

মুকুন্দদেব শাস্ত্রবিশ্বাসী আনুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার কোনরূপ কুসংস্কার ছিল না। তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। বরং যে স্ত্রীশিক্ষা হিন্দুর সদাচার শিক্ষা দিয়া, শাস্ত্রে ও ধর্ম্মে রমণীগণের মনে ভক্তির দৃঢ়তা জন্মাইয়া দেয়, সেই স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তনার তিনি একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। নিজের গৃহে সেইরূপ আদর্শের সৃষ্টিও করিয়াছিলেন, যাহার ফলে বহুগ্রন্থ প্রণেত্রী ইন্দিরা ও অনুরূপার ন্যায় বিদুষী কন্যাদ্বয়ের উদ্ভব হইয়াছে। তিনি নিজে একজন বড় সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার লিখিত "অনাথবন্ধু" সাহিত্যক্ষেত্রে আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে। সে সময়ের ইংরাজী বাঙ্গলা সমস্ত পত্রিকায় সমস্বরে এই পুস্তকের প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। মুকুন্দ বাবু নিজেকে গোপনে রাখিতে ভালবাসিতেন, অনাথবন্ধুতে তাঁহার নাম ছিল না। এডুকেশন গেজেটের অধিকাংশ সুচিন্তিত প্রবন্ধ তাঁহারই লিখিত। "ভূদেব চরিত" লিখিতেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। "ভূদেব চরিত"এর উপাদান সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। বাঙ্গলায় "ভূদেব চরিত" তিনিই লিখিয়াছেন; সংস্কৃতে "ভূদেব চরিত" মহাকবি মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি দ্বারা লেখাইয়াছিলেন। নির্ব্বাচন করিবার শক্তিও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণির ন্যায় সে সময়ে কেহ সংস্কৃতে মহাকবি ছিলেন না। অবশিষ্ট অংশ শ্রীযুক্ত অন্নদা চূড়ামণি কর্ত্তৃক লিখিত। জানি না তাঁহাদিগের পবিত্র লেখনী হইতে আবার সংস্কৃত মুকুন্দদেব চরিত বাহির হইবে কি না। ভূদেব যেমন মুকুন্দদেবকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, মুকুন্দদেবও সেইরূপ পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র ও বিদুষী কন্যা রাখিয়া গেলেন। পণ্ডিতদ্বয় তাঁহাদিগের অনুরোধ কখনই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। তাহা হইলে ভারতে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা মুকুন্দদেবের আদর্শ চরিত্র বুঝিতে পারিবেন, পারিয়া মুগ্ধ হইবেন। মাতা অনুরূপার লিখিত "মুকুন্দদেব চরিত" পাঠ করিয়া বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকাও সেইরূপ পরিতৃপ্ত হইবেন।

সেই আদর্শচরিত্র মহাপুরুষের চরিত্র আমি আর টাইতে পারিব না। ভূদেব মুখোপাধ্যায় যেমন কথায় কথায় তাঁহার পিতার কথা উল্লেখ করিতেন, তিনি যেমন তাঁহার পিতাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি যেমন তাঁহার পিতার ছায়ায় আত্মগোপন করিতেন, মুকুন্দদেবও সেইরূপ পিতৃছায়ার মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকিতেন।

মুকুন্দদেব আত্মগোপন ভালবাসিতেন, কিন্তু আত্মমতের কখনও গোপন করিতেন না। কর্ত্তৃপক্ষের নিকটেই হউক, মহামান্য ধুরন্ধর ব্যক্তির নিকটেই হউক, নির্ভীকভাবে আত্মমত প্রকাশ করিতেন।

তাঁহার অশনে বসনে কোনরূপ জাঁকজমক ছিল না। ভাল জিনিষ তিনি কখনও মুখে দিতেন না। পাতে ভাল জিনিষ পড়িলে তিনি কখনও খাইতে চাহিতেন না। তিনি বলিতেন, "দরিদ্র ভারতে এমন বহুলোক আছে যাহাদের একবেলাও অন্ন জোটে না, আমি কোন সুখে মেওয়া খাই?" তিনি কাশীর এখানে সেখানে প্রত্যহ পদব্রজে যাইতেন। যাইবার সময় লাঠি লইয়া যাইতেন। কোনও যষ্টিশূন্য অন্ধকে পথে দেখিলে, তাহাকে সেই যষ্টী দান করিয়া আসিতেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "লোকে কথায় বলে 'অন্ধের যষ্টী'। আমার ত চোখ আছে।" ন্যায়নিষ্ঠ সৎসাহসী মুকুন্দদেবকে তাঁহার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটির সময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট ন্যায়ের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে বলিয়া কোনদিন বিব্রত করিতে সাহস করেন নাই—তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা কর্ত্তৃপক্ষের এতই সুবিদিত ছিল।

মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত স্বদেশ-সেবার বহুপূর্ব্ব হইতে মুকুন্দদেব স্বদেশসেবা-ব্রতে দীক্ষিত ছিলেন। স্বদেশের উন্নতিকল্পে যে যে কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশেই মুকুন্দদেবের শেয়ার আছে। পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে স্বদেশী শিল্পের উন্নতিকল্পে স্বাধীন ব্যবসায়ে নিয়োজিত করিয়াছেন।

আমরা মুকুন্দদেবকে হরিসভার বক্তৃতায়, কথকের কথকতায়, কীর্ত্তনীয়ার সংকীর্ত্তনে সর্ব্বত্র দেখিতে পাইতাম। তিনি কখন কোন্ দিক দিয়া আসিয়া সভার এক পাশে নিভৃতে বসিয়া পড়িতেন তাহা লক্ষ্য করিতে

পারা যাইত না। মুকুন্দদেব ধনিসন্তান, উত্তরকালে ম্যাজিষ্ট্রেট পদও পাইয়াছিলেন, তথাপি পারিতপক্ষে তিনি কখনও গাড়ী পাল্কীতে উঠিতেন না। কোথায় অসি কোথায় গোধূলিয়া, প্রয়োজন পড়িলে সেই অসির বাসা হইতে পদব্রজে গোধূলিয়া যাইতেন। তিনি পাকা হিন্দু ছিলেন, সন্ধ্যা-বন্দনা না করিয়া কখনও জলগ্রহণ করিতেন না। তাঁহার সহাধ্যায়ী বিলাতপ্রত্যাগত ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার চৌধুরীর সহিত তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। কাশী ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি তাঁহার বাসা ঠিক করিয়াছিলেন। গোধূলিয়ায় অনেকদিন তাঁহাকে তাঁহার বাসায় দেখিয়াছি, কিন্তু কোন দিনও তিনি সেখানে জলপান করেন নাই। সে জন্য চৌধুরী কখন কখনও মুকুন্দ বাবুকে ঠাট্টা তামাসা করিতেন। উত্তরে মুকুন্দ বাবু হাসিয়া বলিতেন, "ভালবাসা কি বাহিরের না মনের? মন কি লুচি মিষ্টি খায়? আবার খাইলেই ভালবাসা বাড়ে এটা ঠিক নয়, মিথ্যা কথা। কুকুরেরা আস্তাকুড়ে একত্র আহার করে, অথচ একমুষ্টি অন্নের জন্য পরস্পর লড়াই বাধাইয়া দেয়, কামড়াকামড়ি করে, রক্তারক্তি করে। ইয়ুরোপীয় জাতিরা এক টেবিলে খায়, অথচ পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ সর্ব্বদাই দেখিতেছি। মোগল পাঠান সকলেই মুসলমান, কিন্তু মোগল পাঠানে যেমন যুদ্ধ বাধিয়াছিল, হিন্দু মুসলমানেও তেমন হয় নাই। আমাদিগের বিধবা মাতারা আমাদিগের ছোঁয়া ভাত খান না, আমাদিগের উপরে তাঁহাদিগের স্নেহ কি কম?" ইত্যাদি ইত্যাদি। বিশ্বনাথ তর্কভূষণের হাতে গড়া একটি মানুষের মত মানুষ ভূদেব মুখোপাধ্যায়। আবার ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের হাতে গড়া মানুষের মত মানুষ মুকুন্দদেব।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

সূফীধর্ম্ম

সূফী ধর্ম্ম ইসলাম ধর্ম্মের একটী শাখা, মুসলমানগণ শুদ্ধ ভাষায় ইহাকে তসৌবুফ বলিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে মুসলমানদের মধ্যে সূফী ধর্ম্মের প্রভাব অধিক। সূফী শব্দের ও ধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মুনি নানা মত প্রচার করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন সফা হইতে সূফী শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, কারণ সূফীধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধি। কেহ বলেন, 'সূফ' হইতে সূফী শব্দের উৎপত্তি, ফার্সী ভাষায় উলকে সূফ বলা হয়, উল মুসলমান সাধুগণের ভক্তিপবিত্র সরল জীবন যাপনের প্রধান চিহ্ন।

প্রোফেসার ব্রাউনের মতে, সূফীধর্ম্ম ভারতবর্ষের বেদান্তের রূপান্তর, সূফী ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ উপদেশ গুলির দর্শনের সহিত, বিশেষতঃ বেদান্ত দর্শনের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই জন্য সূফী ধর্ম্মোপদেশের সহিত ইসলামধর্ম্মের বিরোধ পরিলক্ষিত হয়; প্রোফেসার ব্রাউন সূফীধর্ম্মকে Non-Mohamedan বলিয়াছেন। মহম্মদ একবাল এম-এ, পি-এইচ-ডি মহাশয় তাঁহার The Development of Persian Mysticism in Persia নামক গ্রন্থে ব্রাউন সাহেবের মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন সূফী ধর্ম্ম মুসলমানগণের নিজস্বধর্ম্ম।

প্রোফেসার মার্কস্ ও প্রোফেসর নিকলসনের মতে Neo-Platonism হইতে সূফী ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। বিখ্যাত সম্রাট্ নৌশেরবার রাজত্বকালে এই ধর্ম্ম প্রচারিত হয় এবং প্রায় সকলেই ইহা গ্রহণ করেন। মুসলমানগণের বিশ্বাস, হজরৎ মহম্মদই এই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা, সূফীগণও কোরাণের আয়তকেই তাঁহাদের ধর্ম্মের মূল ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করেন। "মন অরফ্ নফসহু ফকদ্ অরফ্ রব্বহু।" অর্থাৎ—যে নিজের আত্মাকে চিনিতে পারিয়াছে, সে পরমাত্মাকে চিনিয়াছে।

সূফীধর্ম্ম আমাদের বঙ্গদেশে প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুরূপ। বৈষ্ণব ধর্ম্ম যেমন প্রেমের ভিতর দিয়া বাঞ্ছিতকে পাওয়ার সন্ধান বলিয়া দিয়াছে, সূফীধর্ম্মও তেমনি প্রেম ও সৌন্দর্য্যের ভিতরই বিশ্বপিতাকে পাইবার কামনা করে। বৈষ্ণবগণ যেমন শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আধার, মাধুর্য্যের প্রস্রবণ বলিয়াছেন, সূফীগণও তেমনি বলিয়াছেন—

সুরতে হক্ তো হৈ হর আইনে মে জলবানুমা।
দীদএ হৈরাণী সে নাহি মকৃত্বর হমে॥

অর্থাৎ—ঈশ্বরের অসীম সৌন্দর্য্যে বিশ্ব সৌন্দর্য্য একত্রীভূত, প্রত্যেক বস্তু তাঁহার সৌন্দর্য্যের রশ্মিরেখায় সমুজ্জ্বল।

বৈষ্ণবগণ যেমন ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যের কণামাত্র পাইয়া তাঁহার স্নেহমধুরতার একটী ধারায় স্নান করিয়া ধন্য হইতে, পবিত্র হইতে চান, সূফীগণও তেমনি বিশ্বপিতার সৌন্দর্য্য ও করুণা লাভে পবিত্র হইতে চাহেন সূফীধর্ম্মে হিংসাদ্বেষের স্থান নাই, সে ধর্ম্ম সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিয়া প্রেমানন্দে ধন্য হইতে চায়। মুসলমান ধর্ম্ম সাংসারিক সুখভোগ ও বিলাস ব্যসনকেই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়াছে; মৃত্যুর পর স্বর্গের সুসজ্জিত উদ্যানে বিশ্রাম, প্রাসাদে বাস, হুরীগণের কোকিলকণ্ঠের গীত ও চঞ্চল চরণের লঘু নৃত্যই মৃত আত্মার উপভোগের সামগ্রী। সূফীধর্ম্ম ইহার বিরুদ্ধে, এ সমস্তই তাহার নিকট অসার। বিশ্বপিতার দর্শনই সুফীর স্বর্গপ্রাপ্তি। সূফী ধর্ম্মাবলম্বী বিখ্যাত কবি মীর বলিয়াছেন—

শেখ তুঝে জন্নৎ মুঝে দীদার।
বাঁ ভী হর এককী জুদা কিসমৎ॥

অর্থাৎ—তোমরা স্বর্গে গিয়া সুখী হও,—ঈশ্বরের দর্শনই আমাদের স্বর্গ!—ঈশ্বরের চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা সূফীর হৃদয়ে স্থান পায় না। তাঁহাদের উপদেশ—

তলিবে দুনিয়া মোঅন্নস তালিবে ওকবা মুখন্নস
তালিবে হক্ মুজক্কর।

“সংসারাসক্ত ব্যক্তি নারীর ন্যায়, স্বর্গকামী পশু অপেক্ষাও অধম; ঈশ্বরের কামনাই মানুষের শ্রেষ্ঠ কামনা।” নমাজ, রোজা প্রভৃতি লোক-দেখান ভড়ঙের উপর সূফী অত্যন্ত চটা। একজন সূফী সাধু বলিয়াছেন, মূর্খ মসজীদ নির্ম্মাণ করায়, কিন্তু সে নিজের হৃদয় মন্দিরকে অনাদৃত ভাবে ফেলিয়া রাখে। সূফীগণ ঈশ্বরকে সর্ব্বসৌন্দর্য্যের সর্ব্ব মাধুর্য্যের আধার বলিয়াছেন; সূর্য্য যেমন এক, কিন্তু তাহার প্রতিবিম্ব অসংখ্য, তেমনি সর্ব্বসৌন্দর্য্যাধার ভগবান এক, কিন্তু তাঁহার অসীম সৌন্দর্য্য নানা স্থানে নানাভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

সূফী ধর্ম্ম প্রেমের এক অখণ্ড সাম্রাজ্য। এ প্রেমের ধারা মাতার বক্ষ হইতে উৎসারিত হইয়া, বিশ্বপিতার চরণে লীন হইয়া যায়। কবি নিশাত বলিয়াছে—

ব হকীকৎ নবুঅদ দরহম আলমজুজ ইশ্‌ক।
জোহদো রিন্দী ও সমো শাদী অজোনামে চন্দ্॥

অর্থাৎ এ বিশ্বে প্রেমছাড়া কিছুই নাই, ঈশ্বরোপাসনা, শোক, আনন্দ ইত্যাদি প্রেমেরই রূপান্তর, ভগবদ্ভক্তিই প্রেমের চরম পরিণতি। ভগবানের বিরহে সূফী মহাদুঃখিত হয়, আর তাঁহার মিলনে পরমানন্দ লাভ করে।

কৌনসী হৈ বহ্ জুদাইকী ঘড়ী জো উম্রভর।
আরজুএ বস্‌ল মে ইয়ে দিল ভটকতাহী রহা॥

অর্থাৎ তাঁহাকে পাইবার জন্য হৃদয় উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে; জীবনে কি এমন শুভ মুহূর্ত্ত আসিবে না, যেদিন তাঁহার মিলনানন্দে ধন্য হইব? সুফীকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, তুমি তোমার বাঞ্ছিতকে দেখিয়াছ? সে অমনি গদ্গদ্ কণ্ঠে উত্তর দেয়,—

য়ারকো হমনে জাবজা দেখা।
কহীঁ জাহির কহীঁ ছিপা দেখা॥

বিশ্ববন্ধুর অপার করুণা সম্বন্ধে সূফী কবি বলিয়াছে—

শরাবে লুৎফে খুদাবন্দ রা কিনারে নেস্ত।
বগর কিনার তুমায়দ্ কুসুরে জাম বুঅদ্॥

অর্থাৎ ঈশ্বরের করুণার কুল তল পার কিনারা নাই, আর যদি তাহার কিনারা দৃষ্টিগোচর হয় ত সে দোষ পেয়ালার। সূফীর কাছে ঈশ্বর প্রেমময়, তাই—

দরিয়া এ ইশ্‌ক বহরহা হৈ লহরোঁসে বেশুমার।

প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে ঈশ্বরের আরাধনায় সূফীর পরমানন্দ। কবি বলিয়াছেন—

সাকীনে অপনে হাথ দিয়া ভরকে জাম সোজ।
ইস জিন্দগীকে কৈফকা টুটা খুনার আজ ॥

সাকী সহস্তে প্রেমপাত্র পূর্ণ করিয়া দিল, তাহা পান করিয়া জীবনের নেশা কাটিয়া গিয়াছে। তাই সূফী প্রেমবিহ্বল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

সাকী তেরী সরাপ যো শীশে মে থী ভরি।
সাঁচে মে ঢলকে ঔরভী রঙ্গত বদল্ গয়ী ॥

এই প্রেম মদিরা পান করিয়া সূফী ঈশ্বরকে পাইয়াছে, তাঁহার অসীম সৌন্দর্য্য হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়াছে। সূফী এই প্রেমমদিরা পানের পর বলিল—

দেখা যো হুস্ন (১) য়ারকা তো অং (২) মচল (৩) গয়ী।

মুক্তির জন্য সূফীগণ পুরোহিত, আচার্য্য বা নবীর কাছে যায় না, সূফীধর্ম্মের উপদেশ পালন করিলেই তাহারা মুক্তিলাভ করে। নিজের চেষ্টায় মুক্তিমার্গের কয়েকটী সোপানমাত্র সূফীকে অতিক্রম করিতে হয়। ইহার প্রথম সোপান "শরীঅৎ," এইখানে সূফী প্রকৃত মুসলমান, মুসলমান ধর্ম্মের প্রত্যেক নিয়ম পালন জন্য সে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত। দ্বিতীয় সোপান "তরীকৎ"—এই অবস্থায় সূফী তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়, নির্জ্জন স্থানে শাস্ত্র অধ্যয়ন করা, আত্মসংযম ও মৌনব্রত ধারণ করিয়া সূফীগণ এই সময় ঈশ্বরোপাসনা করেন। তৃতীয় সোপান "মাফৎ" অর্থাৎ জ্ঞান। এইবার সূফী আপনার অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ করিতে ব্যস্ত হয়। সৎসঙ্গে থাকিয়া জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি করিতে যত্নবান হয়। এখন আর সূফী কেবল ধর্ম্মগ্রন্থ কণ্ঠস্থ করে না, ধর্ম্মোপদেশের প্রত্যেক শব্দের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা পায়; সংসার তাহার কাছে নূতন বলিয়া বোধ হয়, এবং অসীম আনন্দে মগ্ন হইয়া সূফী সংসারের অস্তিত্ব ভুলিয়া যায়—

বহ্ বেখবর হৈ মহফিলে কোনৈন সে মিসলে সরাজ।
জো হুয়া হৈ বেখুদীকে জামসে সরশারে ইশ্ক ॥

ঈশ্বরের উপাসনায় মগ্ন সূফী বিশ্বের কোন খবরই রাখে না। ইহার পরই সূফী ঈশ্বর সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে, সে হৃদয় দিয়া ভগবানের পূজায় প্রবৃত্ত হয়।

সূফী মতাবলম্বীর কাছে সকল ধর্ম্মই সমান। তাঁহাদের মতে বিভিন্ন ধর্ম্মের ধারা একই ঈশ্বরের চরণে গিয়া লয় হইয়াছে, সব ধর্ম্মই এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতে বলে। সূফীগণ অন্য ধর্ম্মকে বিষদৃষ্টিতে দেখেন না, তাঁহাদের সব ধর্ম্মেই সমভাব।

ঈশ্বরকে পাইতে হইলে সাংসারিক সুখ, বিলাস-ব্যসন তুচ্ছ করিতে হইবে; কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার সমস্ত হৃদয় হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া, ভক্তি-পবিত্র প্রাণে, একাগ্র চিত্তে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে। তাই সূফী কবি বলিয়াছেন—

গুনকর খুদী কো তো তুঝে হাসিল কমল হো।

ডেভিস সাহেব বলিয়াছেন, সূফীধর্ম্ম লম্পট ও কামাতুরের বিলাস লালসা চরিতার্থ করিবার প্রশস্ত পথ ছাড়া আর কিছুই নহে। আমরা বলি, সূফীধর্ম্ম মহৎ ও উদার। এ ধর্ম্ম সরল, ভক্তিপ্রণত ধর্ম্মপিপাসু জাতির হৃদয়ের সাধনা। সূফীকবি সাদী, নিজামী, রুমী, হাফিজ প্রভৃতির কবিতায় সরাপের ঘড়া আর সাকীর পল্টনের ছড়াছড়ি ও শৃঙ্গার রসের আধিক্য দেখিয়া, অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া সূফীধর্ম্মের ললাটে কলঙ্কের ছাপ পরাইয়া দেন। কিন্তু সূফীধর্ম্ম সরল প্রেমের ধর্ম্ম, এ ধর্ম্মের ভিত্তি সৌন্দর্য্য ও প্রেমের উপর স্থাপিত। অশ্লীলতায় ইহার বিকাশ নহে; প্রেমেই ইহার পূর্ণ পরিণতি! সৌন্দর্য্য ইহার সাধনার বস্তু, প্রেম তাহার মন্ত্র; আর ঈশ্বরানুভূতিই ইহার সিদ্ধি। ইহা একমাত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত তুলনীয় প্রেমময় ধর্ম্ম।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

১। রূপ, সৌন্দর্য্য, ২। অঙ্গন. বন, ৩। বৃক্ষ।

অশ্রুকুমার

(উপন্যাস)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অর্থপ্রাপ্তি।

অশ্রুকুমারের আকস্মিক ভাগ্য পরিবর্ত্তনে ডেপুটী বাবুর ন্যায় রামতনু বাবুও বিস্ময়াবেগে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বিস্ময়াবেগ কতকটা প্রশমিত করিয়া, তিনি তারক বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়, এই সমস্ত সম্পত্তিরই উত্তরাধিকারী কি একা অশ্রুকুমার?"

তারক বাবু কহিলেন, "মৃত কেদারেশ্বরের আর কোনও উত্তরাধিকারী নেই। ভ্রাতুষ্পুত্র অশ্রুকুমারই তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী। তাঁর উইলের নির্দ্দেশ অনুযায়ী অশ্রুকুমার কেবল মাত্র সামান্য দুই লক্ষ টাকা সৌদামিনীকে দেবে। কিন্তু এখন সৌদামিনীর সঙ্গে বিয়ে হওয়ায়, দেওয়া না দেওয়া সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

রামতনু বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, সৌদামিনীকে দুই লক্ষ টাকা দেবার উপদেশ উইলে কেন লেখা হল?"

তারক বাবু বলিলেন, "মৃত্যুকালে কেদারেশ্বরের বিশ্বাস জন্মেছিল যে আগে কোনও কালে তাঁর দোষে, হেমচন্দ্রের অর্থের ক্ষতি হয়েছিল। তিনি হিসাব করে দেখেছিলেন, সেই অর্থ এতদিন সুদসুদ্ধ, প্রায় দুই লক্ষ টাকা হয়েছে। এই টাকা, হেমচন্দ্রের অবর্ত্তমানে তিনি তার কন্যা সৌদামিনীকে দিয়ে গেছেন।"

অশ্রুকুমারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তারকবাবু আবার বলিলেন, "এখন আর দেরী না করে, চল অশ্রুকুমার, আমার সঙ্গে চল। আমি এখনই তোমাকে সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে আমার স্কন্ধের বোঝা নামাব। ডেপুটী বাবু, আপনারা সকলেই চলুন। আমি আপনাদের সমক্ষেই সম্পত্তিতে অশ্রুকুমারকে দখল দেব।"

ডেপুটী বাবু কহিলেন, "উঠুন, রামতনু বাবু; চল অশ্রুকুমার।"

অশ্রুকুমার এতক্ষণ নীরবে বসিয়া, তারকবাবুর কথা শুনিতেছিল। এক্ষণে সে ধীরে ধীরে বলিল, "এই সম্পত্তি আমি আমার মাতার অনুমতি ব্যতীত গ্রহণ করতে পারিনে। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি বাড়ীর ভিতর গিয়ে তাঁর মত জেনে আসি।"

অশ্রুকুমারের কথা শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। সকলেই বিস্ফারিত নেত্রে মাতৃউদ্দেশে গমনোদ্যত অশ্রুকুমারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। পার্থিব ঐশ্বর্য্যের প্রতি অবহেলা যে দেখাইতে পারে সে মানুষ নয়, দেবতা!

অশ্রুকুমার মাতার নিকটে যাইয়া কথাটা উত্থাপিত করিলে, তিনি প্রথমে বলিয়াছিলেন যে না ঐ সম্পত্তি গ্রহণ করা হইবে না, পরের সম্পত্তি গ্রহণ করিলে, মানুষ আপন পপিরশ্রম দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের মহাসুখে বঞ্চিত থাকে; আর অনর্জ্জিত অর্থ হস্তে পাইয়া বিলাসী হইয়া পড়ে। কিন্তু তিনি পরে চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, অশ্রুকুমার যে ভাবে শিক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে প্রচুর অর্থ পাইলেও সে কখনও বিলাসী বা অলস হইবে না; বরং ঐ অর্থ লাভ করিয়া, তদ্দ্বারা অনেক দরিদ্রের অভাব মোচন করিতে পারিবে, এবং অন্যান্য অনেক সদনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবে। অতএব সম্পত্তি গ্রহণ করিবার জন্য তিনি অশ্রুকুমারকে অনুমতি প্রদান করিলেন।

অশ্রুকুমার বহির্ব্বাটীতে আসিয়া, তারক বাবুকে জানাইল, "মা অনুমতি দিয়েছেন; চলুন, আমি সম্পত্তি গ্রহণ করব।"

তখন তারক বাবু সকলকে আপন গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া, বড় রাস্তা হইতে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সদর বাটীতে

প্রবেশ করিলেন; এবং যে সকল কর্ম্মচারী বা ভৃত্য তৎকালে সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া, নব প্রভুর সহিত তাহাদের পরিচয় করিয়া দিলেন। ম্যানেজার বাবু তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে একখানি মোটর গাড়ী ভাড়া লইয়া, ম্যানেজার বাবুকে শীঘ্র ডাকিয়া আনিবার জন্য তিনি একজন কর্ম্মচারীকে আদেশ করিলেন। পরে ত্রিতলে উঠিয়া একে একে গুদামগুলি দেখাইয়া, তাহার চাবিগুলি অশ্রুকুমারের হাতে সমর্পণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষে যে বাক্সে চক্রবর্ত্তী মহাশয় শেষ উইল ও কতকগুলি চাবি রাখিয়াছিলেন, তাহা আনাইয়া, অশ্রুকুমারের হাতে দিয়া কহিলেন, "এই বাক্সে তোমার জ্যেঠা মশায়ের উইল দেখতে পাবে। ঐ উইল অনুযায়ী তুমি কায করবে। আর, ওতে কতকগুলি চাবি দেখবে, ঐ চাবি দিয়ে ঘর, সেফ, আলমারি, বাক্স, সিন্দুক প্রভৃতি খুলে সে সবের মধ্যে রক্ষিত মূল্যবান তৈজস ও অলঙ্কার দেখতে পাবে। প্রত্যেক ঘর বা আলমারী প্রভৃতিতে রক্ষিত জিনিষের এক একটি তালিকা ঐ ঘর বা আলমারীতে পাবে। অবসর মত তালিকার সঙ্গে জিনিষগুলি মিলিয়ে নেবে।"

গুদামঘরগুলি খুলিয়া তারক বাবু যে সকল দ্রব্য দেখাইলেন, তাহা দেখিয়া এবং তাহার মহামূল্য অনুমান করিয়া, ডেপুটী বাবু ও রামতনু বাবু অবাক হইয়া গেলেন। কিন্তু অশ্রুকুমারের মনে কোন প্রকার বিস্ময়ের ভাব উদিত হয় নাই। কেবল একটা দায়িত্বপূর্ণ ধর্ম্মভাবে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। এই অতুল সম্পত্তি যে তাহারই উপভোগ্য, সে কথা সে একবারও মনে করে নাই। সে মনে করিল, যে সম্পত্তি রক্ষা করিবার গুরুভার তাহার জ্যেঠা মহাশয় তাহার উপর অর্পণ করিয়াছেন, সে উহা রক্ষা করিয়া জগতের কল্যাণের জন্য উহার সদ্ব্যবহার করিবে।

সেই দিন প্রভাতে তাহার যে ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল, সৌদামিনী তাহার কোন তথ্যই অবগত ছিল না; কেহই তাহাকে সেই সংবাদ প্রদান করে নাই। সে দ্বিতলে থাকিয়া আপন শয্যাগৃহের সংস্কার করিতেছিল বলিয়া মাতাপুত্রের কথাবার্ত্তা শুনিতে পায় নাই। বেলা নয়টার পর সে নিম্নে আসিয়া, অশ্রুকুমারের মাতার আহার প্রস্তুত জন্য রন্ধনস্থানে যাইয়া দেখিল যে মাতা স্নানের পর পূজায় বসিয়াছেন। সৌদামিনীকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া তিনি তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, এখনও প্রভাকর দাদা বাজার থেকে ফেরেনি কেন?"

মাতা কহিলেন, "আজ প্রভাকর বাজারে যায় নি; চিন্তামণি একাই গিয়েছে।"

সৌদামিনী কহিল, "তবে প্রভাকর দাদা কোথায় গেছে? সে ত বাড়ীতে নেই। দেখলাম বারবাড়ীতে কেউ নেই।"

মাতা কহিলেন, "সকলেই অশ্রুর সঙ্গে ঐ সমুখের বাড়ীতে গেছে।"

সৌদামিনী উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? ওখানে ত সেই রাজা রাণীরা আছেন।"

মাতা কহিলেন, "রাজা রাণী ঐ বাড়ী ভাড়া নিয়েছিলেন। এখন তাঁরা চলে গেছেন। ঐ বাড়ী—তুমি শুনে আশ্চর্য্য হবে—এখন অশ্রুর বাড়ী হয়েছে। অশ্রুর জ্যেঠামশায় তাঁর সমস্ত টাকাকড়ি আর ঐ বাড়ী অশ্রুকে দিয়ে গেছেন। সকালে একজন এটর্ণি বাবু এসেছিলেন, তাঁর নাম তারকনাথ ভট্টাচার্য্য; তিনি অশ্রুর সন্ধানে রঙ্গণ ঘাটে গিয়েছিলেন। আমার ভাশুর বাড়ী ঘর ও টাকা কড়ি তাঁরই জিম্মায় রেখে গিয়েছিলেন। ঐ সব বুঝিয়ে দেবার জন্য তিনি অশ্রুকে নিয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গে তোমার দাদামশায়, প্রভাকর ও রামতনু বাবু গেছেন।"

সৌদামিনী বিস্মিত হইয়া কহিল, "ঐ বাড়ী যে এখনও আমাদের জ্যেঠা মশায়ের বাড়ী আছে, তা ত একবারও আমার মনে হয় নি মা। আর ঐ জ্যেঠামশায়ের উত্তরাধিকারী যে আমরাই হব, তাও ত তুমি একবারও আমাকে বলনি। কত সম্পত্তি হবে?"

মাতা কহিলেন, "আমি শুনলাম, তিনি যে সম্পত্তি রেখে গেছেন, তার দাম দু' কোটি টাকার চেয়ে অনেক বেশী।"

সৌদামিনী তাহার পদ্ম-সদৃশ চক্ষু বিস্তারিত করিয়া কহিল, "দু' কোটী টাকার চেয়ে বেশী? বাবা! এত টাকা নিয়ে আমরা কি করব মা? এত টাকায় আমাদের দরকার কি?"

মাতা কহিলেন, "আমাদের এই গরীব দেশে টাকার অনেক দরকার আছে মা। ঐ টাকার আয় থেকে তোমরা অনেক লোকের উপকার করতে পারবে। আমাদের দেশের অনেক গ্রামের পথঘাট ভাল নয়; অনেক গ্রামে ভাল খাবার জল নেই; অনেক গ্রামে চিকিৎসকের অভাবে রোগীর চিকিৎসা হয় না; অনেক গ্রামে গোচারণ মাঠের অভাবে গরুরা চরে খেতে পায় না। অশ্রু ঐ টাকা খরচ করে গ্রামে গ্রামে ভাল পথ ঘাট করে দেবে; পুকুর কাটিয়ে গ্রামের লোককে তৃষ্ণার জল দেবে; ডাক্তারখানা খুলে রোগীকে ঔষধ দেবে; গরুর স্বাস্থ্যের উন্নতি করে শিশুর পথ্যের ব্যবস্থা করবে। যাঁর পবিত্র রক্ত অশ্রুর শিরায় বইচে, তিনি দান ছাড়া আর কিছু জানতেন না। তাঁর ছেলে অশ্রুও দান করবে। তাই তার জ্যেঠামশায়ের সম্পত্তি আমি তাকে নিতে বলেছি। অশ্রু ছেলেবেলা থেকে অনেক দুঃখ সহ্য করেছে, তবু টাকা নিয়ে আমি তাকে ভোগবিলাসে গা ভাসাতে দেব না। আমি মা কায়মনোবাক্যে কামনা করি যে দেশের সমস্ত দুঃখ আপন স্কন্ধে বহন করে সে যেন চির-দুঃখীই থেকে যায়। আমার অশ্রু পরোপকারে যেন তার সর্ব্বস্ব ব্যয় করতে পারে; আমার অশ্রু পরোপকারে যেন তার জীবন উৎসর্গ করতে পারে! বাছা! তুমিও দীনবন্ধু বাবুর মহৎকুলে জন্মেছ। আমি যখন মরে যাব, তখন তুমি তার ধর্ম্মপত্নী থেকে, তাকে এই মতিই দিও; মা, দেশসেবা ব্রতে তুমি তার সহায় হয়ো। তোমার জন্মভূমি মূর্ত্তিমতী হয়ে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবেন; তোমার মাথার সিন্দূর আরও উজ্জ্বল করে দেবেন।"

সৌদামিনী শ্বশ্রূর বাক্যের কোনও উত্তর দিল না; কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে, অশ্রুকুমারের দানযজ্ঞে চিরকাল সে তাহার অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়া থাকিবে। অর্দ্ধভুক্ত দরিদ্রগণ আহার পাইবে, কি আনন্দ! শিশু দুগ্ধ পাইবে, দুগ্ধ পাইয়া শিশু মুখে হাসিবে, কি আনন্দ! সৌদামিনী আপনার চারিদিকে স্বচ্ছলতার প্রফুল্ল জগৎ দেখিবে—সে কি আনন্দ!

সৌদামিনীকে কিয়ৎকাল চিন্তা করিবার অবসর দিয়া মাতা পুনরায় কহিলেন, "আরও শোন বাছা! অশ্রুর জ্যেঠা মশায়ের কাছে তুমিও অনেক টাকা পেয়েছ। আমি অশ্রুর মুখে শুনলাম যে তোমাকে দু'লক্ষ টাকা দেবার জন্যে তিনি উইলে লিখে গিয়েছেন।"

ইহার পর মাতা আর কোন কথা কহিলেন না; পূজায় মনোনিবেশ করিলেন। সৌদামিনী শ্বশ্রূর জন্য রন্ধন করিতে লাগিল।

বেলা দশটার পর অশ্রুকুমার, ডেপুটী বাবু প্রভৃতি অন্দরের দিকের দরজা দিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। ডেপুটী বাবু আহারাদি করিয়া আদালতে গেলেন। বলা বাহুল্য সেদিন তিনি আদালতের কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই; এই অভাবনীয় ব্যাপারে তাঁহার মনে আনন্দ ব্যতীত আর কিছুরই স্থান ছিল না। সওয়াল জবাব, জেরা, ফরিয়াদি, আসামী সমস্তই উদ্দাম আনন্দ-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল।

আহারাদির পর অশ্রুকুমার সৌদামিনীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

শত কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও সৌদামিনীর একটা চক্ষু অশ্রুকুমারের পাছু পাছু ফিরিত; সে অশ্রুকুমারের কক্ষপ্রবেশ নিম্নতল হইতে লক্ষ্য করিল। সে জানিত যে তাহার সহিত বাক্যালাপের আবশ্যক হইলেই অশ্রুকুমার তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া থাকে। অতএব সে ত্বরিত পদে তাহার নিকট সমাগতা হইল; এবং জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে খুঁজছ কেন?"

অশ্রুকুমার কহিল, "তোমাকে ত সমস্ত দিনই খুঁজি; যখন তোমার কাছ থেকে দূরে থাকি তখনও খুঁজি।"

সৌদামিনী আবার আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "বল না, তুমি কেন খোঁজ?"

অশ্রুকুমার সৌদামিনীকে বক্ষে চাপিয়া কহিল, "তোমাকে ভালবাসি বলে। কিন্তু আজ এখন তোমায়

খুঁজছি তোমার সঙ্গে একত্র কায করব বলে। আজ থেকে আমাদের কাযের জীবন আরম্ভ হল। এই কাযের জীবনে তুমি আমার সহায় হবে, আমি তোমার সহায় হব।"

সৌদামিনী কাযের সন্ধান পাইয়া উৎসাহান্বিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বল কি কায করতে হবে?"

অশ্রুকুমার বলিল, "ঐ বাড়ীতে যেতে হবে। ওখানে যে সকল ঝিকে রাখতে বলে এসেছি, তাদের কায দেখিয়ে দেবে এস।"

সৌদামিনী মনে মনে একটা কর্ত্তৃত্বের গৌরব অনুভব করিয়া, প্রফুল্লমুখে অশ্রুকুমারকে কহিল, "তুমি এত টাকা পেয়েছ, এত ঝি চাকর রেখেছ, তবু দেখ, আমাকে না পেলে তোমার কায চলে না। আমি না গেলে যখন তোমার কায হবে না, তখন কাযেই আমাকে যেতে হবে। চল, যাই।"

অশ্রুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার খাওয়া হয়েছে?"

সৌদামিনী কহিল, "হয়েছে।"

অশ্রুকুমার আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ, পাণ খাওনি ত?"

সৌদামিনী কহিল, "তুমি আমার বর, তুমি পাণ খাও না, আমি খাব কেন?"

অশ্রুকুমার কহিল, "এখনও আমার পাণ খাওয়া অভ্যাস হয় নি। কিন্তু তুমি ত বরাবর খেতে।"

সৌদামিনী কহিল, "আগে যে আমি আমার ছিলাম, এখন যে আমি তোমার হয়েছি। এখন তুমি যা কর না আমি তা করব কেন? তুমি আমার স্বামী, তোমার যা ভাল লাগে না, আমার তা ভাল লাগবে কেন? জান না, আমি যে তোমর দাসী হয়েছি।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অন্দরবাটীর বড় দরজায়, একজন দ্বারবান, অশ্রুকুমারের আদেশানুযায়ী বসিয়া ছিল। সে সেই বৃহৎ দ্বার উদ্ঘাটিত করিল। সৌদামিনী অশ্রুকুমারের সহিত, দুরু দুরু হৃদয়ে সেই বৃহৎ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

দ্বারবানেরা এবং অন্য সমস্ত দাসদাসীরা সেই অল্পকাল মধ্যেই তাহাদের নূতন প্রভুর সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিল। ডেপুটীবাবুর নাতিনীকে তাহারা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জীবদ্দশাতেই অনেক বার লক্ষ্য করিয়াছিল। এক্ষণে তিনি যে তাহাদের মাতৃস্থানীয়া প্রভুপত্নী হইয়াছেন, তাহাও তাহারা অবগত হইতে পারিয়াছিল। অতএব দ্বারবান ভূমিতে ললাটস্পর্শ করিয়া, অশ্রুকুমার ও সৌদামিনী উভয়কেই প্রণাম করিল।

অশ্রুকুমার দ্বারবানকে আশীর্ব্বাদ করিল। কিন্তু সৌদামিনী কোন কথাই কহিতে পারিল না। গৃহস্বামিনী হইয়া, গৃহস্বামিনীর সম্মান এই সে প্রথম লাভ করিল। এই নূতন গৌরবে গৌরবান্বিতা হইয়া সে মনোমধ্যে একটা মাতৃভাব অনুভব করিল। এই নূতন ভাবের প্রফুল্লতায় তাহার অধরোষ্ঠ সুহাসে স্ফুরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু ভাবোদ্বেগে সে কথা কহিতে পারিল না।

অশ্রুকুমার সৌদামিনীকে লইয়া, বাটীর প্রত্যেক অংশে ঘুরিয়া বেড়াইল। নবনিযুক্ত দাসীগণ সৌদামিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া, এবং তাহাকে মাতৃসম্বোধন করিয়া, তাহার নিকট কার্য্যের উপদেশ গ্রহণ করিল। অল্পকালমধ্যে সৌদামিনী গৃহকর্ত্রীর কর্ত্তব্যভার আপন মস্তকে তুলিয়া লইল। অল্পকাল মধ্যে গৃহকার্য্যে সে যেন বিজ্ঞ হইয়া উঠিল।

অবশেষে অশ্রুকুমার তাহাকে ত্রিতলের এক কে লইয়া গেল। তাহা বৃহৎ কক্ষ। সেখানে উৎকৃ কক্ষসজ্জা ব্যতীত, ভিত্তিগাত্রে কয়েকটি লৌহ নির্ম্মি বৃহদাকার আলমারি সন্নিবেশিত ছিল। অশ্রুকুমা প্রাতঃকালে তারকবাবুর নিকট হইতে যে চাবি বাক্স প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা ঐ কক্ষেই রাখিয়া গিয় ছিল। এক্ষণে আপন পকেট হইতে চাবি বাহির করি সে উহা খুলিয়া ফেলিল এবং সৌদামিনীকে কহি "এই বাক্স নাও। এর মধ্যে এই লোহার আলমা গুলির চাবি আছে। এই আলমারি গুলিতে যে রত্ন লঙ্কার আছে, সকলই তোমার। তুমি চাবি নিয়ে এ

একে ওগুলি খুলে দেখ। আলমারি গুলির মধ্যে এক একটি ফর্দ্দ পাবে; ঐ ফর্দ্দের সঙ্গে অলঙ্কারগুলি মিলিয়ে দেখবে। ফর্দ্দের সঙ্গে অলঙ্কারগুলি মিললে, বাইরে আমাকে খবর পাঠাবে।"

সৌদামিনী কক্ষস্থিত একটি আসনে উপবেশন করিয়া, চাবির বাক্সটি আপন ক্রোড়ে রক্ষা করিল। অশ্রুকুমার তাহাকে তদবস্থায় রাখিয়া বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জলখাবার।

অশ্রুকুমার প্রস্থান করিলে সৌদামিনী কিয়ৎকাল নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া, একটা বৃহৎ গবাক্ষ খুলিয়া, কক্ষে আরও আলোক প্রবেশের সুবিধা করিয়া দিল। পরে চাবি বাছিয়া লইয়া, একে একে লোহার আলমারিগুলি খুলিয়া উহার মধ্য হইতে নানা আকারের মখমল বা প্লশ্‌মণ্ডিত পেটক সকল প্রাপ্ত হইল। কোন পেটাকে বহুমূল্য রত্নবিজড়িত কর্ণাভরণ রক্ষিত ছিল; কোনটাতে নীল মখমল শয্যায় সুগোল স্ফীতোদর মুক্তারাশিতে অপূর্ব্ব মালা শোভা পাইতেছিল; কোনও হীরকখচিত অলঙ্কার মধ্যাহ্নালোকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিতেছিল; কোন অলঙ্কারের মধ্যমণি প্রভাতগগনে শুক্রতারার ন্যায় হাসিতেছিল; কোন রত্নময় বলয় বিদ্যুদ্দীপ্তির ন্যায় ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করিতেছিল; কোনও অঙ্গুরীয়-মধ্যস্থিত মহামণি চঞ্চল-মুকুরপ্রতিফলিত সূর্য্যরশ্মির ন্যায় কিরণ বিকীর্ণ করিতেছিল; কোনও রত্নময় কণ্ঠভূষা জ্বালাময় দীপ্তি নিক্ষেপ করিতেছিল। অলঙ্কারের পর অলঙ্কার—রত্নপ্রভাময়, সুগঠিত, নয়নাভিরাম, [illegible]নাশূন্য—একে একে বাহির করিয়া, সৌদামিনী তালিকার সহিত মিলাইয়া দেখিতেছিল। কখন কোন কণ্ঠমালা আপন গলায় দুলাইয়া আপন মনে হাসিতেছিল। একবার হীরক ও পদ্মরাগরচিত একটা অতি মনোহর জ্যোতির্ম্ময় মুকুট পাইয়া, সৌদামিনী তাহা আপন মস্তকে ধারণ করিল; এবং কক্ষগাত্র-সংলগ্ন বৃহৎ মুকুরে আপন মুকুটভূষিত মস্তকের প্রতিবিম্ব দেখিল;—স্বচ্ছ সরোবরজলে যেন প্রভাতপদ্ম ফুটিয়া উঠিল।

বেলা দুইটার পূর্ব্বে, সৌদামিনী আলমারিগুলি গুছাইয়া চাবিবন্ধ করিল; এবং অশ্রুকুমারের উপদেশমত বহির্ব্বাটীতে তাহাকে সংবাদ পাঠাইল। আর কি কায করিবে, তাহা চিন্তা করিতে করিতে সে দ্বিতলে, এবং পরে নিম্নতলে নামিয়া আসিল।

সেখানে বারান্দায় এক প্রবীণা স্ত্রীলোককে দেখিয়া, সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? তোমার নাম কি? এ বাড়ীতে তুমি কি কর?"

সে বলিল, "আমার নাম ভোলার মা; আমি চার পাচ বছর আগে এই বাড়ীতে রাঁধুনী ছিলাম। আজ আবার দারোয়ান গিয়ে আমাকে বাড়ী থেকে ডেকে এনেছে। ম্যানেজার বাবু আজ থেকে আমাকে কাযে লাগিয়েছেন।"

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি কি রান্না রাঁধতে পার?"

ভোলার মা কহিল, "আমি সকল রান্নাই রাঁধতে পারি। কিন্তু মেঠাই তৈরীর জন্যেই আমাকে বেশী মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে। নিরামিষ ভাত তরকারি, আর মাছ মাংস রাঁধবার জন্যে আরও দু' জন রাঁধুনীকে রাখা হয়েছে।"

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি কি মিষ্টান্ন তৈরী করবে?"

ভোলার মা কহিল, "আপনি মা অনুমতি করবেন, তাই করব। বার বাড়ী থেকে বাজার সরকার মশায় ক্ষীর আর ছানা তৈরী করবার জন্যে দুধ পাঠিয়ে দিয়েছেন; তা ছাড়া চিনি, ময়দা, বেশম, ঘি আর অন্যান্য সামগ্রী সবই এসেছে।"

সৌদামিনী কহিল, "চল, আমিও তোমার সঙ্গে মিষ্টান্ন পাক করব। আজ রামতনু ঠাকুরদাদাকে আর দাদামশায়কে আমি এইখানে নিমন্ত্রণ করে, জলখাবার

পাওয়াব। আমার দাদামশায়ের ঐ বাড়ী থেকে প্রভাকরদাদাকে ডেকে আনবার জন্যে একজন ঝিকে পাঠিয়ে দাও; রামতনুঠাকুরদাদাকে খবর দেবার জন্যে, আর দাদামশায় আফিস থেকে ফিরলে, তাঁকে এখানে আনবার জন্যে, আমি তাকে বলে রাখব। দেখ ভোলার মা, কাপড় ছেড়ে গঙ্গাজল মাথায় দিয়ে, প্রথমেই মার জন্যে কিছু সন্দেশ তৈরী করতে হবে। বাজারের সন্দেশ তিনি খান না; তাই একটু দুধ আর গুড় ছাড়া রাত্রে তাঁর আর কিছুই খাওয়া হয় না। চল, রান্নাঘরে যাই। কিন্তু রান্নাঘরে গিয়ে কায আরম্ভ করবার আগে, আর একটা কায করতে হবে। কে কে পুরান লোক এই বাড়ীতে ছিল, আর কোন কোন নূতন লোক আজ ভর্ত্তি হয়েছে, তা জানতে চাই। আর জলখাবার তৈরীর জন্যে কি কি জিনিষ এসেছে, সরকারের কাছ থেকে তার একটি ফর্দ্দ চাই। ঐ ফর্দ্দ দেখে আমি জিনিষগুলি মিলিয়ে নেব।”

পাচিকা বুঝিল, তাহার নূতন মনিব বয়সে বালিকা হইলেও দক্ষ ও কর্ম্মঠ; তাহাকে কোনও কাযে প্রতারণা করা সহজ হইবে না। বাজার সরকার ও অন্যান্য দাসদাসীগণও অল্পকালমধ্যে সে কথা বুঝিল। কিন্তু এই বালিকা কোথা হইতে হঠাৎ গৃহধর্ম্মের জ্ঞান লাভ করিল?—কবি যথার্থই বলিয়াছেন, সামান্য ঘেসেড়াকে হারুণ-অল-রশীদের রাজসিংহাসনে বসাইয়া দাও, তাহারও মাথায় রাজবুদ্ধি আসিবে!

বহির্ব্বাটীতে, অশ্রুকুমারের অল্পকাল কায করিয়া, ম্যানেজারবাবু, খাতাঞ্চি বাবু এবং চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অন্যান্য পুরাতন কর্ম্মচারিগণও বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহারা যথার্থই একজন প্রভু পাইয়াছেন; বুঝিয়াছিলেন যে অশ্রুকুমার রূঢ় না হইয়াও প্রভুত্ব করিতে পারিবে। তাহার মিষ্ট মুখের একটি আদেশও অবহেলা করা চলিবে না; তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতলে তুচ্ছ একটি ত্রুটিও গোপন করা চলিবে না। অশ্রুকুমারের কার্য্য দেখিয়া বুড়া খাতাঞ্চি, নায়েব খাতাঞ্চিকে গোপনে বলিয়াছিলেন, “ওহে! ছেলেমানুষ হলে কি হয়? আসল জাত গোখরো; সাবধান হয়ে কায করো।”

বহির্ব্বাটীর কায সারিয়া, বেলা চারিটার সময় অশ্রুকুমার অন্দর বাটীতে আসিয়া দেখিল, সৌদামিনী পাচিকা ও পরিচারিকাগণে পরিবৃতা হইয়া একটি রন্ধনশালায় জলখাবার প্রস্তুত কার্য্যে নিযুক্ত আছে। পাকশালা ইন্ধনালোকে নহে, সৌদামিনীর রূপশিখায় যেন আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। অশ্রুকুমারের প্রীতিপূর্ণ চক্ষু দুইটা, তাহার শ্রমরক্ত মুখোশোভা, যেন একপাত্র সুধার ন্যায় আকণ্ঠ পান করিয়া প্রমত্ত হইয়া উঠিল।

রন্ধনগৃহের দ্বারে অশ্রুকুমারকে উপস্থিত দেখিয়া সৌদামিনী সত্বর হাত ধুইয়া, মাথায় কাপড় দিয়া, তাহার নিকটে আসিয়া দাড়াইল।

মুগ্ধনেত্রে কিশোরীর প্রেমোজ্জ্বল মুখশ্রী দেখিয়া অশ্রুকুমার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি নিজে জলখাবার তৈরী করছ, সদু? তুমি এসব তৈরী করতে পার?”

সৌদামিনী একবার অশ্রুকুমারের দিকে চাহিয়া, আবার লজ্জাপীড়িত চক্ষু আনত করিয়া কহিল, “আমি এসকল জলখাবার তৈরী করতে জানিনে; তাই এই ভোলার মার কাছে শিখছিলাম। জলখাবার তৈরী করবার জন্যে, ম্যানেজার বাবু ভোলার মাকে রেখেছেন। ও চার পাঁচ বছর আগে এই বাড়ীতেই কায করত।” অশ্রুকুমার কহিল, “তখন আমার জ্যেঠাই মা বেঁচে ছিলেন। আমি ম্যানেজার বাবুর কাছে সব পরিচয় নিয়েছি। তখন সকালের ভাত ডাল রান্নার তার সময় ছিল না; আর তোমাদের বাড়ীতে খাবার তৈরী ছিল। তাই আমি বল্লাম যে তখন কিছু রাঁধতে হবে না; কিন্তু বিকালে জলখাবার তৈরি হবে। বাজার সরকার তখন জলখাবার তৈরীর জিনিষের একটা ফর্দ্দ তৈরী করে এনে আমাকে দেখালে। আমি দেখলাম, যে ঐ সকল জিনিষে, আমাদের বাড়ীর সকলের জলখাবার ত হবেই, তা ছাড়া, আরও দু চারজনের জলখাবার হতে পারে। তাই তারক বাবুকে আর

ম্যানেজার বাবুকে নিমন্ত্রণ করেছি ; তাঁরা সাড়ে পাঁচটার সময় খাবেন।”

সৌদামিনী কহিল, “আমিও ঠিক সেই সময়ে, দাদামশায়কে আর রামতনু ঠাকুরদাদাকে আসতে বলেছি।

অশ্রুকুমার কহিল, “বেশ করেছ। দেখ, আজ বিকালে এখানে জলখাবার খাওয়া হল বটে, কিন্তু রাত্রে তোমাদের বাড়ীতেই খাব। কাল সকালে, মাকে আর দাদামশায়কে নিয়ে এসে, তোমাতে আমাতে এই বাড়ীতে নূতন সংসার পাতব। নূতন সংসার তুমি চালাতে পারবে ত ?”

সৌদামিনী কহিল, “পারব।”

বাটীতে প্রত্যাগতা হইয়া সৌদামিনী তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া, এবং বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া শ্বশ্রূকে স্বহস্তে প্রস্তুত সন্দেশ খাইতে দিল। পুত্রবধূর প্রস্তুত মিষ্টান্ন তাঁহার কত মিষ্ট লাগিয়াছিল,—কত তৃপ্তিতে, কত আনন্দে তিনি তাহার স্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব না ; তাহা বধূযুক্তা পুত্রের জননীগণ অনুভব করিয়া লইবেন।—কিন্তু, কিন্তু—হায় হতভাগ্য দেশ ! আধুনিক জননীগণ যে মিষ্টস্বাদ কখনও পাইয়াছেন কি ?

অশ্রুকুমার তারক বাবুর নিকট হইতে তাহার জ্যেঠামহাশয়ের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়া আসিয়াছিল। মাতা আহার করিতে বসিলেন, সে তাঁহ নিকটে বসিয়া বুঝাইয়া দিল যে তাহার জ্যেঠা মহা মনে মনে তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন ; এবং তাঁহা অর্থ পাইয়া মাষ্টারমহাশয় রঙ্গণঘাটে তাহাকে দশবৎ ধরিয়া শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। জ্যেঠামহাশয়ের নি থাকায় মাষ্টার মহাশয় কখনই সে কথা তাহাদিগ বলেন নাই। বলা বাহুল্য, কথাটা শুনিয়া অশ্রুকুমারে মাতার মনে পরলোকগত শ্বশুর্য্যের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা উদয় হইল।

সুতরাং অশ্রুকুমার যখন প্রস্তাব করিল, “কা তোমাকে জ্যেঠামশায়ের বাড়ীতে যেতে হবে। কা থেকে আমরা সকলেই ঐ বাড়ীতে থাকব, আর খাব। তখন মাতা সহজেই সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

ডেপুটী বাবুর সহিত আহার করিতে বসিয়া অশ্রুকুমা কহিল, “দেখুন কাল থেকে আমরা সকলেই ঐ বাড়ী থাকব।”

ডেপুটীবাবু বলিলেন, “আমি বুড়ো দাদামশা তোমরা আমাকে যেখানে রাখবে আমি সেই খানে থাকব। আর, আজ বিকালে যে রকম জলযোগের যোগা করেছিলে, রোজ সেই রকম জলযোগ করতে পে কোথাও নড়ব না।”—বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গালী কোন জাতি ?

এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়—বাঙ্গালী কোন্ জাতি ? কোথা হইতে ইহার উদ্ভব ? কোন্ কোন্ জাতির মিশ্রণে এ জাতির উৎপত্তি ? এ কথা শুনিয়া অনেকেই বলিবেন, “কেন, আমরা ত পবিত্র আর্য্যবংশ-সম্ভূত। আমরা আর্য্যসন্তান, আমাদের দেহে পবিত্র আর্য্যরক্ত সেই অনাদিকাল থেকে প্রবাহিত হচ্চে।”

এ কথা, এ উক্তি সত্য কি না, তাহা ইতিহাসে আলোকে, এবং জাতিতত্ত্বের মাপকাঠিতে দেখা যাক্।

একটা কথা আগেই বলা দরকার যে, জা হিসাবে অবিমিশ্র জাতি পৃথিবীতে প্রায়ই নাই। পৃথিবীর প্রায় সব জাতিই বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। এ নিয়ম যেমন বাঙ্গালীর পক্ষে খাটে, তেম

ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মান প্রভৃতি স্বাধীন জাতির পক্ষেও খাটে। কেবল লঙ্কাদ্বীপের বেদ্দিয়া জাতি ছাড়া অমিশ্র বা অসঙ্কর জাতি পৃথিবীতে একটীও নাই।

এই বাঙ্গালা দেশের যে কোন ব্রাহ্মণ বা কায়স্থকে তাঁহার বংশ বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি তাঁহার ইতিহাসকে আদিশূরের রাজত্বের সময়ে টানিয়া লইয়া যাইবেন। তাঁহারা বলেন—বাঙ্গালায় এমন একসময় আসিয়াছিল যখন সারা বাঙ্গালাদেশে ব্রাহ্মণের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার সিংহাসনে তখন রাজাধিরাজ আদিশূর আসীন। বাঙ্গালার এ দুরবস্থা দেখিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বিদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আমদানী করিয়া ব্রাহ্মণহীন বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণের প্রসারের সহায়তা করিলেন। তাহারই ফলে সেই সুদূর কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ-ব্রাহ্মণের আগমন হয়, এবং তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পঞ্চ কায়স্থ আসেন। সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, বৎস ও সাবর্ণ এই পঞ্চ ঋষির বংশোদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দেন। আদিশূর রাজা সাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন, তাঁহাদের দ্বারা নানা যজ্ঞ করাইলেন, আর ৫৬টী গ্রাম তাঁহাদের বসবাসের জন্য দিলেন। সেই কথা প্রচলিত ছড়াতে আছে :—

"পাঁচগোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই
এ ছাড়া ব্রাহ্মণ নাই।"

তাঁহাদের সঙ্গে ঘোষ-বোস-প্রমুখ যে সব কায়স্থ আসেন, তাঁহাদের মধ্যেও শীঘ্রই আবার একটা আভিজাত্যের বেড়া সৃষ্টি হইল। ঘোষ-বসুরা রাজার অধীনতা স্বীকার করিল, তাহারা "কুলীন" আখ্যা পাইল, কিন্তু দত্ত ততটা মাথা হেঁট করতে রাজী না হইয়া বলিলেন—

"দত্ত কারও ভৃত্য নয়।"

সেইজন্য তাঁহাকে কৌলিন্য হইতে বঞ্চিত করা হইল; দত্ত পচা মৌলিকের শ্রেণীতে নামিলেন। তার পর বল্লালসেন যে কৌলিন্য প্রথার কৃত্রিম বন্ধন সৃষ্টি করিলেন, বাঙ্গালাদেশ এখন তাহা সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া আছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের আনয়ন-কথাটা কতটা সত্য? ইহার মীমাংসা করিতে আমাদের দেশের ঐতিহাসিকরা দুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন। একদল আছেন, যাঁহারা কুলজীকেই প্রমাণ ও ইতিহাসের মূলভিত্তি বলিয়া স্বীকার করেন, আর সেই কুলজীর উপর নির্ভর করিয়া ইতিহাসকে গড়িতে চেষ্টা করেন। এ দলের নেতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্তনগেন্দ্রনাথ বসু। অপর দল কিন্তু কুলজীকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী নন,—কারণ কুলজীর সব সিদ্ধান্ত ইতিহাসের খাঁটী সত্যের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না।

এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শশধর রায় তাঁহার "মানব সমাজে" আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "প্রবাদ আছে বঙ্গের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ কায়স্থ জাতির পূর্ব্বপুরুষ নাকি কান্যকুব্জ দেশ হইতে আসিয়াছিলেন। এ কথা স্বীকার না করিলেও, অনেক সময় অনেক ব্রাহ্মণাদি পশ্চিম-দেশ হইতে আসিয়াছিলেন এবং এখনও আসিতেছেন, ইহা স্বীকার করা যায়। দেশ তখন জনশূন্য মরুভূমি ছিল না। এখানেও ব্রাহ্মণাদি ছিলেন। বহু ব্রাহ্মণ শূদ্রাদির সমাজে আসিয়া ঐ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কতদিন স্ব-বংশানুক্রম স্থির রাখিতে পারিয়াছিলেন? তাঁহারা বংশানুক্রমে এতদ্দেশীয় নারীগণের পাণিগ্রহণ করতঃ অপত্য উৎপাদন করিলে ক্রমে তাঁহাদিগের বংশধারা মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্বতন বাঙ্গালী রক্তে নূতন রক্তের মিশ্রণ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতির দেহ, বিশেষতঃ মস্তক পরীক্ষা করিলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। কান্যকুব্জ দেশীয় কতিপয় কায়স্থ এবং এতদ্দেশীয় কতিপয় ব্রাহ্মণ-কায়স্থের মস্তক পরিমাপ করিয়া যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাতে মোটের উপর বলা যায় যে, কান্যকুব্জীয়গণের মাথা লম্বা, আর বঙ্গীয়গণের মাথা চওড়া। এই কথাই একটু বিস্তৃতভাবে বলিলে এই-রূপে বলিতে হয়, মাথার প্রস্থ ও দৈর্ঘ্যের অনুপাত এতদ্দেশীয়গণের অধিক, আর কান্যকুব্জীয়গণের অপেক্ষা

অল্প। মাথার খুলির পিছনদিকে যে একটি ঢিপি আছে, তথা হইতে ভ্রূযুগলের মধ্যস্থান পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য ধরিলাম; আর এক কর্ণের উপর হইতে অন্য কর্ণের উপর পর্য্যন্ত প্রস্থ ধরিলাম। এখন অনুপাত জানিতে হইলে, প্রস্থকে দৈর্ঘ্য দিয়া ভাগ করিতে হয়, এবং ভাগফলকে একশত দিয়া গুণ করিতে হয় যথা :—

$$\frac{\text{প্রস্থ} \times ১০০}{\text{দৈর্ঘ্য}} = \text{অনুপাত}$$

"এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া দেখিয়াছি, কান্যকুব্জীয়গণের গড় অনুপাত ৭২, ৭৩; এবং বঙ্গীয়গণের অনুপাত ৭৮ হইতে ৮০; এবং কোন কোন স্থলে তাহারও কিছু অধিক। এ বৈষম্য বংশগত অর্থাৎ জাতিগত, সম্ভবতঃ জলবায়ু নিবন্ধন নহে। তবেই কান্যকুব্জীয়গণ হইতে বঙ্গীয়গণ কত পৃথক! তাহা এইরূপই হইবার আশা করা যায়।" (১)

তার পর শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ চন্দ মহাশয় এ বিষয়ে আলোচনা করেন, তাঁহার মত আমাদের প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :—"রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের কুলশাস্ত্র বিশ্বাস করিবার আর একটী বাধা যে, ইহাতে ধরিয়া লইতে হয় যে ৩০ হইতে ৩৫ পুরুষ পূর্ব্বে অর্থাৎ ৮ হইতে ১০ শতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ছিল না বলিলেই হয়। রাঢ়ীগণের কুলশাস্ত্রে লেখে যে, যে সময়ে কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসেন, তখন বাঙ্গালায় ৭০০ ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। কিন্তু আজ কাল সেই ৭০০ ঘরের কোন বংশধর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ পাঁচজন আগন্তুক ব্রাহ্মণগণের বংশধরেরাই সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে।"

এই সব যুক্তির সাহায্যে আমরা বিচার করিতে পারি যে, আদিশূরের পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নের মূলে কোনও ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, অথবা ইহা কোনও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্রাহ্মণের উর্ব্বর মস্তিষ্কে জন্মলাভ করিয়াছিল। একাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলা দেশে আদিশূর নমে যে রাজা ছিলেন, ইতিহাস তাহা স্বীকার করে। (২) কিন্তু তাঁহার সময় হইতেই যে বাঙ্গালার উর্ব্বরা ভূমিতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-সমাজ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে তাহার প্রমাণের যথেষ্ট অভাব। কারণ সে সময়ে বাংলায় যে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় নাই তার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। আদিশূরের পূর্ব্বে পালবংশ বাঙ্গালার সিংহাসনে রাজত্ব করিতেন। ৯ম শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশে তাঁহাদের প্রতাপ খুব প্রবল ছিল। পালবংশীয় রাজারা যদিও বৌদ্ধ ছিলেন, তথাপি তাঁহারা এতটা উদার ছিলেন যে, তাঁহাদের মন্ত্রিবংশ গোঁড়া ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই মন্ত্রিবংশের ইতিহাস দিনাজপুরে বাদল-নামক স্থানে একটি স্তম্ভে লিপিবদ্ধ আছে। তাহাতে স্পষ্ট লেখা আছে যে, তাঁহারা শাণ্ডিল্য বংশ হইতে উদ্ভূত। (৩) সুতরাং আমরা ঐতিহাসিক প্রমাণ পাইতেছি যে, আদিশূরের পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে "শাণ্ডিল্য-বংশীয়" ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং তাঁহারা পদমর্য্যাদায় ও গৌরবে হীন ছিলেন না। এটা আমরা মানিতে পারি না যে, আদিশূর রাজা হইবার পূর্ব্বেই এই সমৃদ্ধ বংশটি একেবারে লোপ পাইয়াছিল, এবং কান্যকুব্জ হইতে "শণ্ডিল্য" ব্রাহ্মণ আনাইবার প্রয়োজন হয়েছিল। যখন ৯ম শতাব্দীতে বাঙ্গালায় শাণ্ডিল্য বংশ বিদ্যমান ছিল, তখন বিদেশ হইতে পুনরায় এই বংশ আমদানী করবার কি প্রয়োজন ছিল? এ ছাড়া, সে সময় দেশে যে কায়স্থ ছিল তাহারও প্রমাণ আছে। রাজা ধর্ম্মাদিত্যের যে শিলালিপি ফরিদপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহাতে আমরা অনেক কায়স্থ রাজকর্ম্মচারীর নাম পাই। উড়িষ্যার এক রাজার লিপিতেও আমরা ঘোষ-উপাধিধারী কায়স্থের পরিচয় পাই। অতএব কেহ চীৎকার করিয়া বলিতে পারেন না যে, আদিশূর রাজার পূর্ব্বে বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ কায়স্থের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল।

আরও একটা কথা। যাঁহারা কুলজী সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে আদিশূরের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ

১। মানবসমাজ.—শ্রীশশধর রায়, ৪৪—৪৬ পৃঃ।

২। গৌড়রাজমালা—শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ; বাংলার ইতিহাস—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। গৌড়লেখমালা—শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

সমাজের ৩০।৩৫ পুরুষ অতিবাহিত হইয়াছে। কিন্তু কায়স্থ সমাজে তাঁহারই জায়গায় মোটে ২২।২৫ পুরুষ কাটিয়াছে। যদি আদিশূর রাজাই পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনান, আর পঞ্চকায়স্থ তাঁহাদেরই সঙ্গে আসেন, তবে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজে দশ পুরুষ তফাৎ কেন? যদি সেই সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণদের ৩০।৩৫ পুরুষ হয়, তবে কায়স্থেরও—যাঁহারা একসঙ্গে একই সময়ে আসিছিলেন—তাঁহাদেরও সেই পর্য্যায় হইবে না কেন? যদি এখন হইতে পর্য্যায় হিসাব করি, তবে বলিতে হয় বর্ত্তমান কায়স্থ সমাজের পূর্ব্বপুরুষেরা ব্রাহ্মণদের দশ পুরুষ বা ৩০০।৪০০ বৎসর পরে এদেশে আসিয়াছিলেন। তাই যদি হয়, তবে কি করিয়া বলা যাইতে পারে যে, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ একসঙ্গে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন?

আমাদের প্রথম প্রশ্ন ছিল বাঙ্গালী কোন্ জাতি? আর্য্য না অনার্য্য? ইহার উত্তর যখন জনশ্রুতি বা কুলজী ঠিক ভাবে দিতে পারিল না, তখন আমাদের অন্য দিকে খুঁজিতে হইবে। ভারতের জাতিতত্ত্বের বিষয়ে রিজলী সাহেবের মতবাদ অনেকে গ্রাহ্য করেন। তাঁহার মতে বাঙ্গালী "মঙ্গোলীয়-দ্রাবিড়ীয়"। তিনি বলেন—

"The Mongolo-Dravidian or Bengali type occupies the delta of the Ganges and its tributaries from the confines of Bihar to Bay of Bengal. It is one of the most distinctive types in India. The broad head of the Bengali of which the mean index varies from 79 in the Brahmin to 83 in the Rajbanse Magh, effctually differentiates the type from the Indo-Aryn or Aryo-Draivdian, * * * In western Bengal the Dravidian element is prominent, in Dacca and Mymensingh the type has undergone a change which scientific methods enable us to assign to the effect of intercourse with a Mongolian race." (৪)

রিজলী সাহেব বলিলেন—বাঙ্গালী ত আর্য্য নয়, একেবারে অনার্য্য দ্রাবিড়ীয়। আবার তার উপর পূর্ব্ববাঙ্গালায় মঙ্গোলীয় মিশ্র আছে। একথা শুনিয়া অনেক ব্রাহ্মণ রিজলী সাহেবের স্বর্গকামনা করিবেন সন্দেহ নাই। আর যাঁহারা এখনও আর্য্য বলিয়া গর্ব্ব করেন, তাঁহারাও ক্রোধে অন্ধ হইবেন।

এইবার সমস্যাটার আলোচনা ইতিহাসের দিক দিয়া করা যাক। সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালাদেশের সম্বন্ধে খুব কমই আলোচনা পাওয়া যায়। যাহা সামান্য কিছু পাওয়া যায়, তাহার মধ্যেই শাস্ত্রকারদের বাঙ্গালা মগধের উপর কেমন একটা বিদ্বেষভাব স্বতঃই পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। মনুসংহিতাতে বাঙ্গালা দেশকে "ম্লেচ্ছদেশ" বলা (৫) হইয়াছে। ঐতরেয় আরণ্যকে দেখি যে, বঙ্গ, মগধ ও চেরদেশ বৈদিকমার্গকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছে। এই বিদ্বেষভাবকে সুদৃঢ় করিবার জন্যই বোধ হয় শাস্ত্রকারেরা নিয়ম করিয়াছেন—

"অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥

এই যে তীব্র বিদ্বেষভাব, এই যে ঘৃণার ভাব, ইহার মূল কারণ কি? ইহার প্রধান কারণ এই যে, তখন বাঙ্গালাদেশে আর্য্যদের বসবাস ছিল না। তাহার পরিবর্ত্তে দ্রাবিড়ীয় অনার্য্যজাতি তখন এখানে বাস করিত। তবে তাহারা জাতিতে অনার্য্য হইলেও সভ্যতায় আর্য্যদের অপেক্ষা কোনও অংশে হীন ছিল না। তাহাদের উন্নত সভ্যতায় আর্য্যদের হিংসাবৃত্তিটাই জ্বলিয়া উঠিত, তাই তাঁহারা বারবার এদেশে আসা বারণ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে তাঁহাদের নিষেধবাক্য সত্ত্বেও আর্য্যেরা বঙ্গে আসিয়া বসবাস করিতেছে, তখন তাঁহারা বিধান বদলাইতে বাধ্য হইলেন। হরিবংশ ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন—"এমন এক সময় আসিবে যখন আর্য্যেরা ক্ষুধা পীড়িত হইয়া কৌশিকী নদী অতিক্রম করিয়া অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশে আশ্রয় লইবে।"

৪। Risley's Peoples of India.

৫। মনুসংহিতা ২য়, অধ্যায় ৩।

এই রকমে আর্য্যেরা আসিয়া অনার্য্য বাঙ্গালাদেশে ছড়াইয়া পড়িল। আর্য্যেরা আসিয়া দেখিলেন যে আর্য্যামির প্রথম স্তর চতুর্ব্বর্ণের অস্তিত্ব বাংলা মুল্লুকে নাই, তাই তাঁহারা বাঙ্গালাদেশকে নূতন ভাবে গড়িতে চেষ্টা করিলেন—যদিও তাঁহারা আসিয়া দ্রাবিড়ীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছিলেন, আর তাহাদের সঙ্গে বিবাহাদিরও প্রচলন হয়েছিল। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা আর্য্য সভ্যতার সব শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলি হারান নাই, সেগুলা সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে এদেশে চারিবর্ণের সৃষ্টি হইল। হরিবংশ ও বায়ুপুরাণ হইতে একথা আমরা জানিতে পারি। বায়ুপুরাণের মতে পুরুবংশে বলি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পাঁচপুত্র ছিল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র। তাঁহাদের নাম হইতেই বাঙ্গালার এই পাঁচটি রাজ্যের নাম হইয়াছিল। চতুর্ব্বর্ণের প্রচলন ইঁহারাই প্রথম এদেশে করেন।

তবেই দেখা যায় যে বাঙ্গালাদেশে যে সব ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহারা অনার্য্য রমণী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, পূর্ণভাবে বংশের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাই বলিতে হয় যে, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ খাঁটি ব্রাহ্মণ নন। একথা শুনিয়া হয়ত অনেক গোঁড়া হিন্দু ভয়ানক রাগ করিবেন। আমি কিন্তু তাঁদের বলি, যদি তাই না হয়, তবে পশ্চিমের ব্রাহ্মণ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের হাতে অন্নগ্রহণ করেন না কেন? যদি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আর পশ্চিমী ব্রাহ্মণ একই আর্য্যজাতির বংশধর হন, তবে অপর প্রদেশীয় ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে একটু অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন কেন? ইহার কি কোনও গূঢ় কারণ নাই?

তা ছাড়া লোকতত্ত্বের (Ethnology) দিক্ হইতে দেখিলেও আমাদের এ উক্তির সত্যতা বুঝিতে পারা যাইবে। লোকতত্ত্ববিৎরা লোকের মাথার আকৃতি দেখিয়া স্থির করিতে পারেন, লোকটি কোন্-জাতীয়। সেই হিসাবে বাঙ্গালী ও কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণদের তুলনা করিলে দেখা যাইবে দু'জনের মধ্যে কত প্রভেদ। দু'জনে ত এক জাতীয় নহেই, বরং একেবারেই বিভিন্নজাতীয়। সেই জন্য এক পণ্ডিত বলিয়াছেন—

> **"The wide difference in the head form of the Kanyakubjia Brahman and those of Bengal cannot be explained."**

আমাদের বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমানে যাহারা বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত, যাঁহাদের লইয়া বাঙ্গালী জাতি গঠিত হইয়াছে, তাঁহারা পূর্ণমাত্রায় আর্য্যবংশধর নন, অনার্য্য রক্ত অনেক পরিমাণে তাঁহাদের দেহের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়াছে। মূলতঃ তাঁহারা যে অনার্য্য ছিলেন একথা বর্ত্তমানে সব ঐতিহাসিক মানেন। তবে তাঁহাদের সঙ্গে আর্য্য রক্ত যে মিশ্রিত হইয়াছিল, এবং আর্য্য সভ্যতা যে তাঁহাদের উপর বেশীরকম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সে বিষয়েও কাহারও মতদ্বৈধ নাই। আর্য্যসভ্যতা বাঙ্গালার অনার্য্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিলেও একেবারে অনার্য্যসভ্যতাকে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে নাই। অনার্য্যসভ্যতার একটা মস্ত গুণ ছিল যে, অপরের মধ্য হইতে ভালটি সহজেই নিজস্ব করিয়া লইতে পারিত। তাই আর্য্যসভ্যতার মধ্যে যাহা সত্য, যাহা সুন্দর তাহা বাছিয়া লইয়া আত্মসাৎ করিয়াছে।

বাঙ্গালীর মধ্যে অনার্য্য রক্ত কতটা মিশ্রিত হইয়াছে তাহার যথার্থ পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা অনেকটা অসম্ভব মনে হয়। তবে এখনও বাঙ্গালীর মধ্যে যে সব অনার্য্য রীতিনীতি বর্ত্তমান আছে তাহা হইতে তাহার অনুপাত কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। প্রথমেই দেখুন—বাঙ্গালী এই নামটা কোথা হইতে আসিল? শুনিলে অনেকে হয়ত আশ্চর্য্য হইবেন যে, আমাদের এই জাতিত্বব্যঞ্জক শব্দটি পর্য্যন্ত অনার্য্যদের নিকট হইতে আমরা ধার করিয়া লইয়াছি। "বং" নামে এক অনার্য্য জাতির নাম হইতেই আমাদের জাতীয় নাম "বাঙ্গালী" উৎপন্ন হইয়াছে। এই বং জাতি এখনও ময়মনসিংহে বাস করে। যেমন অহং জাতি আসামকে নিজের নাম দিয়াছে, তেমনি বং জাতি বাংলাকে নিজের নাম দিয়া ধন্য হইয়াছে।

একবার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমাদের অনেক আচার ব্যবহার অনার্য্য প্রতিবেশীদের নিকট

হইতে লওয়া; কিন্তু কেহ বিশদভাবে আলোচনা করেন নাই কি রকমে কবে সেই সব আচার ব্যবহার রীতি নীতি আমাদের সমাজে প্রবেশ লাভ করিল।' সেই কথাই অনেকদিন আগে তিনি "প্রবাসী"তে লিখিয়াছিলেন—"যে সকল অনার্য্য প্রতিবেশী জাতির প্রভাব আমরা অতিক্রম করিতে পারি নাই তাহাদের পূজা, ব্রত, এবং আচার ব্যবহারের কথা আমাদিগকে বিশেষ করিয়া জানিতে হইবে। হিন্দুর প্রাচীন পুরাণে এবং স্মৃতিতে যে সকল অনুষ্ঠানের কথা নাই, অথবা যে সকল আচার নিয়মের কথা নাই, সেগুলি কোথা হইতে আমরা পাইলাম তাহা সযত্নে অনুসন্ধান না করিলে বাংলার জাতিসঙ্ঘের যথার্থ ইতিহাস পাওয়া যাইবে না। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মত কয়েকটি পবিত্র ও মধুর পারিবারিক অনুষ্ঠান যদি আমরা কোন অনার্য্য জাতির নিকট হইতে পাইয়া থাকি, তাহা স্বীকার করিতে কোন লজ্জার কারণ নাই। (৬)

আমরা সকলেই বাঙ্গালী রমণীকে ভ্রাতার মঙ্গলকামনায় যমের দুয়ারে কাঁটা দিতে দেখিয়াছি, তাঁহাদের নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃস্নেহ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি ও ভাবিয়াছি যে জগতের ইতিহাসে এমন পবিত্র এমন মধুর চিত্র বিরল। কিন্তু আমরা জানিতাম না যে, বাঙ্গালী রমণী এ পবিত্র ব্রত প্রতিবেশিনী অনার্য্য রমণীর নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী রমণীর কাছে যাহা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া নামে পরিচিত, তাহাকেই তাঁদের অনার্য্য ভগিনীরা "ভাই জীউতা" বলিতেন। কি রকমে এই ভাই জীউতা কালে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় পরিণত হইল তাহার ইতিহাস এখনও অন্ধকারে ঢাকা।

এ ছাড়া আরও অনেক অনার্য্য প্রথা আছে যাহা আমরা একেবারে নিজস্ব করিয়া লইয়াছি। আমাদের বিবাহপদ্ধতির কথাই ধরুন। বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে এখন যে বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে আর্য্যসভ্যতার প্রভাব যে একেবারে নাই তা নয়। যেমন সম্প্রদান, একটি পূর্ণমাত্রায় আর্য্য বৈদিক প্রথা। কিন্তু এই বৈদিক প্রথার সঙ্গে যে প্রথাগুলি সঙ্গোপনে আত্মরক্ষা করিতেছে তাহাদের চিনিতে দেরী হয় না। যেমন স্ত্রী-আচার। এ সম্বন্ধে সেদিন শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা আমরা উদ্ধৃত করিলাম—"আমাদের দেশে বিবাহের সময়ে শাস্ত্রসম্মত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোক-সম্মত কতকগুলি ক্রিয়া-কলাপ চলিতে থাকে, যাহা স্ত্রী-আচার নামে পরিচিত। মনে হয় আমাদের কতক স্ত্রী-আচার যেন বেদাচারের অপেক্ষাও প্রাচীন।" (৭) সেজন্য আমিও বলিয়াছি এ প্রথাটি অনার্য্য। অনেকে বলিতে পারেন, এবিষয়ে প্রমাণ কৈ? যাঁহারা হাতাহাতি প্রমাণ চান, তাঁহাদের বলি সাঁওতালদের রীতিনীতি ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করুন। একটু যত্ন করিলেই দেখিবেন যে, আমাদের লৌকিক স্ত্রী-আচারটি কেমন ভাবে সাঁওতালদের বিবাহ প্রথা হইতে লওয়া হইয়াছে। সাঁওতালী বিবাহ আর বাঙ্গালী বিবাহে এতটা সাদৃশ্য দেখিয়াই অনেকেই আশ্চর্য্য হইয়া যাইবেন। বিবাহের সময় সাঁওতাল বর একটি উচ্চস্থানের উপর দাঁড়ায় (যেমন আমাদের ছাদনাতলায়), আর কন্যাকে আত্মীয়েরা একটি কাষ্ঠের উপর বসাইয়া তুলিয়া ধরে। তখন সিন্দুর দান প্রথায় বিবাহের শেষ হয়, অর্থাৎ বর সিন্দুর লইয়া কন্যার কপালে দেয়। (৮)

বাঙ্গালীর ঘরে কি আমরা এদৃশ্যের পুনরভিনয় দেখি না? কেবল আমাদের মধ্যে এ সিন্দুর দান প্রথার বদলে মাল্যদান প্রথা প্রচলিত আছে না?

আবার এই সিন্দুর ব্যবহারের প্রথাটাই ধরুন। আমাদের রমণীদের মধ্যে সীমন্তে সিন্দুর ধারণ সধবার চিহ্ন বলিয়া গণ্য। কিন্তু কোথা হইতে এ প্রথা আমরা পাইলাম? এ প্রশ্ন কি কেহ সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন? এক দল ঐতিহাসিক বলেন যে, এটি আর্য্য প্রথা, সাঁওতাল প্রভৃতি অনার্য্যেরা আর্য্যদের নিকট হইতে ধার করিয়া লইয়াছে। রিজলী সাহেব প্রথম একটু ইতস্ততঃ করিয়া, একেবারে বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন,

---

৬। প্রবাসী।

৭। মেদিনীপুর সাহিত্যসম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ

৮। Santal Parganas দ্রষ্টব্য।

আসলে এটি অনার্য্য প্রথা। (৯) আমরাও এ মতের পরিপোষক। আমাদের বিশ্বাস যে সিন্দুর ব্যবহার প্রথা এবং বঙ্গরমণীর সধবার অন্যতম চিহ্ন "নোয়া" আমাদের নিজস্ব নয়। এ দুইটিই প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতার অঙ্গ। সেই প্রাগৈতিহাসিক কালে (Stone age or Copper age) এমন একটা সময় আসিয়াছিল যখন লোহা সোণার ন্যায় মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হইত। সেই সময় রমণীরা সাদরে লোহার অলঙ্কার পরিধান করিতেন। তাই এখনও অনেক অসভ্য জাতিদের মধ্যে লোহার অলঙ্কারের আদর দেখা যায়। কালক্রমে সেই লৌহবলয় ও সিন্দুর, পবিত্রতা ও সধবার চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হইল, এবং রমণীসমাজ বর্ত্তমান লৌহযুগে আসিয়া দাঁড়াইলেও সেই পুরাতন অলঙ্কার প্রাচীন সভ্যতার শেষ চিহ্নকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। কাজেই এই বিংশ শতাব্দীতেও বঙ্গরমণীর সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতার চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, বাঙ্গালী রমণী এ দুটি চিহ্ন অনার্য্য ভগিনীর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ বঙ্গরমণীর পূর্ব্ব ইতিহাস অনার্য্য ভগিনীর ইতিহাসের সঙ্গে মিশ্রিত।

আর এক উপায়ে আমরা বাঙ্গালী জাতির উপর অনার্য্য প্রভাবের ন্যায্য পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে পারি। সে উপায়টী এই—আমাদের আচার, ব্যবহার, ব্রত অনুষ্ঠানের প্রত্যেক অংশটী ইতিহাসের ও সত্যের মাপ কাঠিতে ওজন করিয়া দেখা। বাঙ্গালীর বার-ব্রত পূজাদি কেবল যে, আর্য্যদের নিকট হইতে ধার করা তাহা নয়, অনার্য্য—যাহারা আর্য্যদের আসিবার পূর্ব্বে ভারতের ভাগ্যবিধাতা ছিল, তাহাদের মধ্যে যাহা সত্য ও সুন্দর তাহা নির্ব্বিবাদে আমরা আমরা আত্মসাৎ করিয়াছি।

বাংলার ব্রতগুলিতে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "আমাদের ভাষাও সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে।" কিন্তু দুঃখের বিষয় এই মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য কোনও বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলেন—"দৃষ্টান্ত স্বরূপ মেয়েলী ব্রতের উল্লেখ করা যাইতে পারে, যে সকল ব্রতে জাতিনির্বিশেষে মেয়েরাই পুরোহিতের কাজ করেন। বেদের প্রভাব, স্মৃতির প্রভাব, পুরাণের প্রভাব, ব্রাহ্মণের প্রবল প্রভাব স্বত্ত্বেও মেয়েলী ব্রতের অস্তিত্ব কি প্রমাণ করে? মেয়েলী ব্রত প্রমাণ করে, এই অনুষ্ঠান গুলি খুবই সুপ্রাচীন—হয়ত বৈদিক এবং পৌরাণিক ক্রিয়াকলাপ অপেক্ষাও প্রাচীন,—এবং যে সমাজে এই সকল ব্রত আদৌ অভ্যুদিত হইয়াছিল, সেই সমাজে হয়ত মেয়ের প্রাধান্য বা মাতৃতন্ত্র শাসন (Matriarchy) প্রচলিত ছিল।" (১০)

অধ্যাপক চন্দের মত কতটা গ্রাহ্য জানি না, তবে মেয়েলি ব্রতগুলি যে যথাবিধি আলোচিত হওয়া উচিত, এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না।

সেই আলোচনা যে সুরু হইয়াছে তাহার প্রমাণ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থ "বাংলার ব্রত।" এই পুস্তকে যে ব্রতকথার প্রথম বৈজ্ঞানিক আলোচনা হইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করেন। বাঙ্গালার পণ্ডিত সমাজ তাঁহার প্রতি সেজন্য কৃতজ্ঞ।

এখন প্রশ্ন এই যে—আমাদের পূজা বা ব্রতের সকলই কি বৈদিক বা পৌরাণিক? প্রথম ধরুন—জন্তুপূজা, এটা কোথা হইতে আমাদের পূজার মণ্ডপে স্থান পাইল? কোন্ ঋষির বিধানে আমরা জন্তুতেও দেবত্ব আরোপ করিলাম? একটু মনোযোগ করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে, দেবতার আসন হইতে আমরা কাহাকেও বাদ দিই নাই; সিংহ সর্প হইতে পেচক পর্য্যন্ত সকলেই সগৌরবে আমাদের কাছে দেবতার পূজা পাইয়াছে। এ জন্তুপূজা আমরা অনার্য্য প্রতিবেশীদের নিকট শিখিয়াছি। এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন, "নৃতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় বর্ব্বর জাতির অনেকেরই মধ্যে এক একটি বিশেষ জন্তু পবিত্র বলিয়া পূজিত হয়। অনেক সময় তাহারা আপনাদিগকে সেই জন্তুর বংশধর বলিয়া গণ্য করে। সেই জন্তুর নামেই তাহারা বিখ্যাত হইয়া

৯। Risley—Peoples of India দ্রষ্টব্য।

১০। মানসী ও মর্ম্মবাণী ৯ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৬০ পৃঃ।

থাকে। ভারতবর্ষে এইরূপে নাগবংশের পরিচয় পাওয়া যায়।" (১১)

এই পর্য্যন্ত নাগবংশ, যাহারা সর্পকে দেবতার ন্যায় পূজা করিত, তাহারা প্রথমে আর্য্যদের সুদৃঢ় ভাবে আকর্ষণ করিতে পারে নাই, ফলে আর্য্যদের সঙ্গে নাগবংশের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সংঘর্ষের প্রতিধ্বনি আমরা মহাভারতে পাই। শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ তাই বলিয়াছেন—"হয়ত জনমেজয়ের সর্পসত্রের কথার মধ্যে একটা প্রচণ্ড প্রাচীন যুদ্ধ-ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। পুরুষানুক্রমিক শত্রুতার প্রতিহিংসা সাধনের জন্য সর্প-উপাসক অনার্য্য নাগজাতিকে একেবারে ধ্বংস করিবার জন্য জনমেজয় নিদারুণ উদ্যোগ করিয়াছিলেন এই পুরাণ-কথায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।" (১২)

বোধ হয় যখন আর্য্যেরা দেখিলেন যে, এত নিদারুণ উদ্যোগ করিয়াও নাগবংশকে ধ্বংস করতে পারিলেন না, তখন পূর্ব্বকার বিরোধভাব দূর হইয়া সখ্যভাবের দেখা দিল। তাহার ফলে আর্য্যেরা নাগবংশের রীতি-নীতি পূজা-পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে নিজস্ব করিতে লাগিলেন। সেই জন্য আজ আমাদের মধ্যে মনসা দেবীর পূজার প্রচলন দেখিতে পাইতেছি। এ ছাড়া নাগপঞ্চমী ব্রত ত আছেই। এটী যে আনার্য্য সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অনার্য্যদের যে নাগপূজা প্রচলিত ছিল, যে পদ্ধতিটা নাগবংশেরই একচেটিয়া ছিল, সেইটাই রূপান্তরিত হইয়া—"মনসাপূজা" নামে আমাদের সমাজে প্রবেশ করিয়াছে।

এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় "ঠাকুর-পূজার ইতিহাসে" বলিয়াছেন :—"এখন হয়ত অনেকেই জানেন যে, যে সকল পৌরাণিক দেবতা হিন্দুসমাজে এখন অধিক পূজিত, তাঁহারা কেহই বৈদিক যুগের প্রাকৃত দেবতা নহেন। তাঁহারা দলে দলে আর্য্যেতর জাতির সমাজ হইতে আসিয়া আর্য্যসমাজ অধিকার করিয়াছেন; এবং অনেক স্থলে দেবতাদিগকে অনেক কষ্টে টানিয়া বুনিয়া বেদের নৈসর্গিক দেবতাদিগের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কোন্ কোন্ দেবতা কি সুবিধায় আর্য্যসমাজে স্থানলাভ করিয়াছেন, তাহার অনেক বিবরণ "শিবপূজা," "বিষ্ণুমাহাত্ম্য", "গণেশের জন্ম," "তান্ত্রিক-দেবতা" প্রভৃতি প্রবন্ধে পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেক পত্রিকায় লিখিয়াছি। পূর্ব্বকালের "মাতৃকা" নামধারিণী প্রেতিনীর দল এবং "গণ" সংজ্ঞায় পরিচিত ভূতের দল যে, হিন্দুসমাজে কতখানি স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র দেবদেবীদিগের নামের দীর্ঘ তালিকা মনোযোগ করিয়া পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়।" (১৩)

আমাদের শিবঠাকুরটি আসলে যে অনার্য্য দেবতা তাহা তাঁহার আচার-ব্যবহারেই অনেকটা প্রকাশ পায়। সেই জন্য তাঁহার মূর্ত্তিটি বীভৎস। তিনি ভাঙ্ ও ধুতুরায় উন্মত্ত। আর তাঁর অনুচর ভৃত্য হইতেছে প্রেতাদি। শিবঠাকুর অনার্য্য দেবতা ছিলেন, কি করিয়া তিনি আর্য্য দলে প্রবেশ করিলেন তাহার মোটামুটি ইতিহাসটি এই :—"এই সময়ে অনার্য্য দেবতা শিবের সঙ্গে আর্য্য উপাসকদের একটা বিরোধ চলিতেছিল। সেই বিরোধে কখনো আর্য্যেরা, কখনো অনার্য্যেরা জয়ী হইতেছিল। কৃষ্ণের অনুবর্ত্তী অর্জ্জুন কিরাতদের দেবতা শিবের কাছে একদিন হার মানিয়াছিলেন। শিবভক্ত বাণ অসুরের কন্যা উষাকে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ হরণ করিয়াছিলেন, এই সংগ্রামে কৃষ্ণ জয়ী হইয়াছিলেন। বৈদিক যজ্ঞে অনার্য্য শিবকে দেবতা বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। সেই উপলক্ষ্যে শিবের অনার্য্য অনুচরগণ যজ্ঞ নষ্ট করিয়াছিল। অবশেষে শিবকে বৈদিক রুদ্রের সহিত মিলাইয়া একদিন তাঁহাকে আপন করিয়া লইয়া আর্য্য অনার্য্যের এই ধর্ম্মবিরোধ মিটাইতে হইয়াছিল।" (১৪)

আর একটি অনার্য্য ব্রত, যাহা আমাদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে, সেটি কুক্কুটী ব্রত। এটি যে মূলতঃ অনার্য্য ব্রত তাহা নামেতেই প্রকাশ। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র-

---

১১। ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১২। ঐ ঐ

১৩। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, "ঠাকুর পূজার ইতিহাস," প্রবাসী ১৩২৯, ৪৪৭ পৃঃ।

১৪। ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা।

নাথ ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—“কুক্কুটি ব্রতটি নামে অহিন্দু এবং বাস্তবিকই ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য জাতির, কুক্কুটি হলেন তাঁদের দেবী, এবং যেমন নানা অহিন্দু দেবীকে, তেমনি কুক্কুটি দেবীকেও এককালে লোকে পূজা দিতে আরম্ভ করেছিল।” (১৫)

লক্ষ্মীপূজাটিও যে অনার্য্য তাহা বোধ হয় অনেকে মানিতে চাহিবেন না। কিন্তু এই পূজার সঙ্গে অনার্য্য পূজাপদ্ধতি অনেকটা সুন্দর ভাবে মিল খাইয়াছে। এসম্বন্ধে অবনীবাবু বলিয়াছেন, “মোটামুটি হিসাবে দেখা যায়, এই কোজাগর পূর্ণিমার ব্রতটির মধ্যে অনেকখানি অনার্য্য অংশ রয়েছে। শুয়োরের দাঁত—যার উপরে ফলমূল মিষ্টান্ন রচনা পাতিল; কুবেরের মাথা বেটা সব উপরে রয়েছে দেখি; কিম্বা সবার পিছনে থেকে উঁকি দিচ্ছে একটি ঘোমটা দেওয়া মেয়ের মতো ডাগ—হলুদ সিঁদুর মাখানো; আর পেঁচা ও ধানছড়া—এক লক্ষ্মীর বাহন আর এক লক্ষ্মীর শস্যমূর্ত্তি; এ কয়টিই অহিন্দু ও অনার্য্য বা অন্ত্যব্রতদের।” (১৬)

এই সব আলোচনা করিয়া আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই-যে, “ভারতবর্ষের বাইরে থেকে যাঁরা এলেন এবং এদেশের মধ্যে যাঁরা ছিলেন সেই আর্য্য এবং না-আর্য্য বা অন্ত্যব্রতদের মধ্যে সব দিক দিয়ে এমন কি বিয়েতে এবং ভোজেতেও আদান প্রদান চলেছিল। পুরাণের দেবদেবীর উৎপত্তির ইতিহাস এই আদান প্রদানের ইতিহাস, ধর্ম্মানুষ্ঠানের দিক দিয়ে—শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির ইসিহাসও তাই; কেবল এই মেয়েলী ব্রতগুলির মধ্য দিয়ে আমরা সেই সব দিনের মধ্যে গিয়ে পড়ি যেখানে আমাদের পূর্ব্বতন পুরুষ অন্ত্যব্রতরা তাঁদের ঘরের মধ্যে রয়েছেন দেখি।”

অন্য দিক হইতে আলোচনা করিলেও আমরা অনার্য্যদের প্রভাব দেখিতে পাই। সংস্কৃতে যেখানে “উদূখল” পাই, সেই অর্থে বাংলায় আমরা পাই ঢেঁকি। এটা বড় আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয় যে সারা ভারতবর্ষে সব জায়গায় ধান বা অপর শস্য ভাঙ্গিবার জন্যে উদূখল ব্যবহার হয়, কেবল এই এক বাংলা দেশ ছাড়া। বাংলা বোধ হয় তার নিজস্ব হারায় নাই, তাই তার যাহা কিছু নিজস্ব ছিল সব ধরিয়া রাখিয়াছে। তাই বাংলা ভারতের সবদেশকে অবহেলা অবজ্ঞা করিয়া ঢেঁকি ব্যবহার করিয়াছে। সেইজন্যই আমরা এখনও “কুলো”কেও ছাড়ি নাই, যদিও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের কুলোর বাতাস দিয়া বিদায় করিয়াছি। ধুচুনীও বাংলার নিজস্ব, তাই বাংলার বাহিরে ইহাকে আমরা দেখতে পাই না।

সেই রকম যখন আর্য্যেরা নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য দুর্গ নিম্মাণ করিতেন, আমরাও “গড়” তৈরী করিয়া নিজেদের সুরক্ষিত করিতাম। যুদ্ধ করাটা খুব স্বাভাবিক হইলেও, আমরা ‘লড়াই’ করাটা কোলদের নিকট হইতে শিখিয়াছি। বাংলার নদীতে নৌকা দেখা যায় বটে, কিন্তু তার পাশে “ডোঙ্গা”ও চলে। এটি আমরা মুণ্ডারিদের কাছে লইয়াছি। আমাদের প্রিয় ফল দুটি, কদলী আর নারিকেলও ধার করা—মুণ্ডারিতে এগুলি কাদ্‌লা ও নরিয়র বলিয়া পরিচিত।

সংস্কৃত কবিতায় ময়ূরের অনেক প্রশংসাবাদ দেখিতে পাই বটে, কিন্তু আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে এ শব্দটিও ধার করা। মুণ্ডারিতে এটিকে মার বলে। বাংলার মেয়েরা “পুসি”কে ভালবাসে, আর পুসিকে ষষ্ঠী বুড়ীর বাহন বলিয়া কল্পনা করে; কিন্তু এটিও কোলদের নিকট হইতে লওয়া।

এছাড়া ঘোড়া আমরা তেলেগু ভাষা হইতে পাইয়াছি। তেলেগুতে ঘোড়াকে গুররাম বলে।

আরও যে সব অনার্য্য শব্দ বাঙ্গালাভাষাতে প্রবেশ করিয়াছে তাহার একটা তালিকা নীচে দিলাম :—

১। বাংলায় কুণ্ড—তামিলে কুণ্ড—যেমন সীতাকুণ্ড।

২। বাংলায় ঝিঙ্গা—মুণ্ডাতেও ঝিঙ্গা।

৩। বাংলার কুকুর, অথর্ব্ববেদের কুর্ককুর—বোধ হয় দ্রাবিড়ীয় কুর হইতে উৎপন্ন।

১৫। বাংলার ব্রত—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৬। ঐ ” ।

৪। বাংলার ফল বোধ হয় দ্রাবিড়ীয় পলম হইতে জাত। (১৭)

৫। মুণ্ডাদের বটি, বাংলায় রূপান্তরিত হয় নাই। (১৮)

৬। তেলেগুর পিলে, বাংলার ছেলেপিলেতে স্থান পাইয়াছে।

৭। বাংলার কাণা (অন্ধ), তামিল কাণ (চক্ষু) হইতে উৎপন্ন।

৮। তামিল আকালি (ক্ষুধা) হইতে বাংলা আকাল (দুর্ভিক্ষ)। (১৯)

৯। ওরাঁও কোকা কোকি হইতে বাংলা খোকা ও খুকী।

১০। বাংলা কুটা, বোধ হয় মলয়ালম কুড়ী হইতে উৎপন্ন। (২০)

এইরূপ বহু দ্রাবিড়ী শব্দ বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে অবাধে প্রবেশলাভ করিয়াছে। সেই সব দ্রাবিড়ী শব্দ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে আমরা বুঝিতে পারিব বাঙ্গালার উপর দ্রাবিড়ী ভাষার প্রভাব কতটা ব্যাপক।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু।

১৭। Caldwell's Comparative Grammar of the Dravdian Languages.

১৮। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার—বাংলাভাষার দ্রাবিড়ী উপাদান। সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ১৩২০।

১৯। সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা।

২০। G. R. Grierson's Linguistic Survey of India, Vol IV.

ময়মনসিংহে আনন্দমঠ

যাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ বিবাহিত জীবন যাপন করে, তাহারা গৃহস্থ বা গৃহবাসী। অজ্ঞাতবাসী ও বনবাসীরা পঞ্চপাণ্ডব ও শ্রীরামচন্দ্রাদি ব্যতীত বেশীর ভাগ সন্ন্যাসী; জটিল সন্ন্যাসীদের মধ্যে ইদানীং পুরাতন পাপী ছাড়া, সাধুও আছেন তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে যখন ভিক্ষা একান্ত দুর্লভ ছিল, তখন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের হাটে মাঠে ঘাটে দৌরাত্ম্যের অন্ত ছিল না। দেশ তখন সম্পূর্ণ অরাজক। ওয়ারেণ হেষ্টিংস ইহাদের দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহার নিযুক্ত বড় বড় কাপ্তানেরা অশ্ব ও গজে চড়িয়া চারিদিক হইতে দস্যুদলন করিতে ধাবমান হইল। সুজলা সুফলা জন্মভূমির গৃহস্থ লোক পুনরায় আশার উল্লাসে "হাতী পর হাওদা, ঘোড়াপর জিন, জলদি আও সাহেব হেষ্টিন" বলিয়া ত্রাণকর্ত্তা ইংরেজ গবর্ণর সাহেবকে সসম্ভ্রমে আহ্বান করিতে লাগিল। তথাকথিত সন্ন্যাসীরা গিরি ও বন উপাধি সার্থক করিয়া ভয়ে দলে দলে গহন কাননে কিংবা পর্ব্বতকন্দরে প্রবেশ করিল, এবং আত্মগোপনার্থ আরও বেশী করিয়া গাত্রে ভস্ম লেপন করিতে লাগিল। ভীরু প্রকৃতি গৃহস্থ প্রজা খণ্ড সাধুবেশীদের বিপক্ষতাচরণ করিতে সাহস করে নাই; সুতরাং সন্ন্যাসী দলন গবর্ণর সাহেবের সহজসাধ্য হয় নাই। কাপ্তান টমসন ও কাপ্তান এডোয়ার্ডস অতর্কিত আক্রমণে নিহত হইয়াছিলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের পত্রাবলীতে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের বিবরণ (Creig's Memoirs) বঙ্কিমবাবু তাঁহার আনন্দমঠের তৃতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার রাজনৈতিক সন্ন্যাসীদের "সং"-ন্যাসের ভিতর "উপ"ন্যাসের মালমশলা থাকিতে পারে, কিন্তু বাস্তব ঘটনার মধ্যে রাজনীতি বা ধর্ম্মনীতির বিন্দু বা বিসর্গ ছিল কিনা সন্দেহ। ডাকাতেরা করিত কালীপূজা, আর সন্ন্যাসীরা খাড়া করিয়াছিল বনের ভিতর চড়ক গাছ ও শিবের

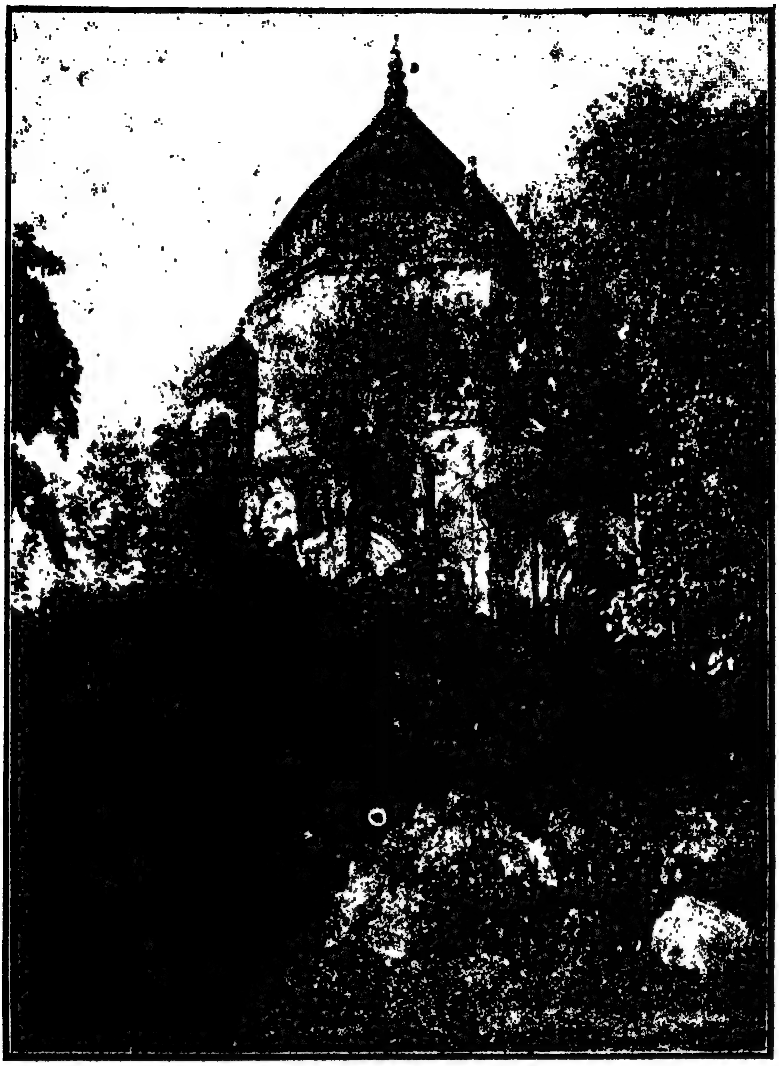

ময়মনসিংহ—মধুপুর গ্রামে সন্ন্যাসী-মঠ বা শিব বাড়ী মন্দির

পূজা। বিবেকের বলিদানে একটা পূজা অর্চ্চনা চাই। গঞ্জিকা-সেবনের নাম গাঁজন। ইহারা শত্রুকে শিবের নামে উৎসর্গ করিয়া শূলে চড়াইত। অথবা তাহাকে উচ্চ বৃক্ষের মগডালে চড়াইয়া উদ্বন্ধন্ পূর্ব্বক আনন্দে নৃত্য করিত। ইহারই নাম চড়ক গাছ এই আনন্দময় সন্ন্যাসীদের সন্তানেরা পরবর্ত্তী কালে আরও আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া লয়। তাহারা চড়ক গাছের গার্হস্থ্য সংস্করণ প্রকাশ পূর্ব্বক পূর্ব্বে বড়সী বিদ্ধ ধর্ম্মান্ধ পুণ্যকামীর আর্ত্তনাদ ঢক্কা নিনাদে নিমগ্ন করিয়া তাণ্ডব নৃত্যে উন্মত্ত হইত। "বাজে চড়ক ড্যাড্যাং ড্যাড্যাং, নাচরে শালারা, নাচতে জানিস্ না!" ইতি পুরাতন পঞ্জিকা।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত জামালপুরের ভূতপূর্ব্ব নাম সন্ন্যাসীগঞ্জ। প্রায় ১৪০ বৎসর পূর্ব্বে ঐস্থানে সন্ন্যাসীদের এক প্রধান আড্ডা ছিল। চেরাগ আলি নামক এক মুসলমান ফকীর ইহাদের সর্দ্দার ছিল এবং ইহারা দিনাজপুর জেলা হইতে বিতাড়িত হইয়া যমুনা অতিক্রম

করে। কিছুকাল পূর্ব্বে সন্ন্যাসীগঞ্জে সন্ন্যাসীদের মঠস্তূপ বিদ্যমান ছিল। ইংরেজ সৈনিক হেনরী লজ চেরাগ আলী ও তৎসহচর শাহ মাজনুর কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারেন নাই। সহচরদের মধ্যে লুণ্ঠনের অংশ লইয়া কলহসূত্রে বহু দলের সৃষ্টি হয়, এবং বহু সন্ন্যাসী মধুপুরের অন্ধতমোময় অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। সন্ন্যাসী দলনের জন্যই ১৭৮৭ সনে মোমেনসিংহ জেলা স্থাপিত হয়। শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৩১৯ সনের “সৌরভ” পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ময়মনসিংহে সন্ন্যাসীদের কীর্ত্তি-কথা কিছু লিখিয়াছেন। পরগণা “রণভয়াল” ও তৎসংলগ্ন ঢাকার ভয়াল বা ‘ভাওয়াল’ পরগণা অতি বিস্তৃত ভয়াল অরণ্যাবৃত শৈলভূমি। এই জনমানবশূন্য অরণ্যানীর নাম মধুপুরের গড়। এই জঙ্গল হইতে এখনও পর্য্যাপ্ত পরিমাণ মধু ও মোম সংগৃহীত হইয়া থাকে। মধুর প্রলোভনে অসংখ্য বানর ও হনুমান মধুবনে বিচরণ করে। রেল খুলিবার পূর্ব্বে মুক্তাগাছার জমিদার মহাশয়গণ “গজারি” বৃক্ষে পিলখানা রচনা করিয়া অহরহ ব্যাঘ্র শিকার করিতেন। এখনও বন্দুক ঘাড়ে করিয়া সাহেবেরা ভল্লুকা থানার জঙ্গলে ভল্লুকের সন্ধানে বহির্গত হন।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও মধুপুর জঙ্গলের সন্ন্যাসী-বিভীষিকা হৃৎকম্প উপস্থিত করিত। বিভূতি গিরি ও রূপ গিরি নামক সন্ন্যাসীদ্বয়ের নাম কে না শুনিয়াছেন? বাড়ীর কর্ত্তারা ঢাকা হইতে স্থলপথে নসিরাবাদ (ময়মনসিংহ সহর) যাত্রাকালে গৃহিণীদের কাছে শ্রীচরণের খড়ম রাখিয়া আসিতেন। ভয়াল অরণ্যাবৃত সন্ন্যাসীময় দুর্গম পথ, কি হয় বলা যায় না। তখন ফটোগ্রাফের আমল হয় নাই, মৃত পতির পাদুকাই সতীর বক্ষের নিধি। কিন্তু এখন পথিকের সেই অপমৃত্যুর ভয় নাই। রেলের গর্জ্জনে ব্যাঘ্রেরা পলায়ন করিয়াছে, এবং সন্ন্যাসী “সন্তানেরা” হিংসা বর্জ্জন করিয়াছে। মধুপুরের অনেক জঙ্গল ধানবাড়ী, সরিষাবাড়ী, বেগুনবাড়ী, প্রভৃতি কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ইহার নানা স্থানে সুবৃহৎ ইষ্টকস্তূপ, বিশাল দীর্ঘিকা দৃষ্টিগোচর হইতেছে। মালদহের জঙ্গলের ন্যায় ‘সাগরদীঘি’, বিষ্ণুপুরের বীর হাম্বির স্থাপিত জনপদের ন্যায় গুপ্ত বৃন্দাবন, মধুপুরের অরণ্যেও আবিষ্কৃত হইয়াছে। যাত্রীরা তীর্থসলিলে এখন নির্ভয়ে স্নান করিয়া যাইতেছে। এইগুলি সকলই সন্ন্যাসীর বংশধরদের অধিকৃত। বলা বাহুল্য সন্তানেরা কালের প্রভাবে সকলেই সাধুভাবাপন্ন।

আমরা এখন যে মঠের কথা বিশেষভাবে লিখিতেছি, সেই মন্দিরের নাম শিব-বাড়ী. ময়মনসিংহ হইতে ৩১ মাইল দূরে মধুপুর গ্রামে অবস্থিত। সন্ন্যাসীরা এই মন্দির দখল করিয়া বক্তেশ্বর শিব স্থাপন করে। বর্ত্তমানে ভগবান গিরি সন্ন্যাসী ইঁহার পূজক। পুথরিয়া পরগণার জমিদারীভুক্ত দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে দৈনিক বহু অতিথি সেবা হইয়া থাকে। বহু পূর্ব্বে প্রায় একশত সাধুসন্ন্যাসী দৈনিক প্রসাদ পাইতেন। সন্ন্যাসীর শিবের অনতিদূরে বংশ নদীর অপরতীরে প্রাচীন মদনগোপাল বিগ্রহ-মন্দিরও উল্লেখযোগ্য। সন্নাসীদের শিব বাড়ীর মঠ ৩৪ হাত উচ্চ, স্থাপত্যশিল্প অনুপম।এই দেবায়তনের প্রকৃত ইতিহাস পুথরিয়া জমিদারীর কীটদষ্ট দপ্তরে এখনও পাওয়া যাইতে পারে। অনেকে ইহাকে সন্ন্যাসী মঠ বলিয়া থাকে।

পূর্ব্ববঙ্গের বনবাসী সন্ন্যাসীদস্যুরা নীতিজ্ঞানহীন ইতরজাতীয় ছিল, সন্দেহ নাই। তাহাদের গৃহস্থ বংশধরগণ এখনও পূর্ব্বপুরুষদের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর জেলার নমঃশূদ্র ও চণ্ডালেরা প্রতিবৎসর মধুমাসে রঞ্জিত গৈরিক বসন পরিধান করিয়া সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করে। গলায় রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ ও স্ত্রী তৈল আমিষ বর্জ্জন বিধি। সিন্দূরলিপ্ত কাষ্ঠখণ্ডে শিবমূর্ত্তি বস্ত্রাবৃত করিয়া সন্ন্যাসীরা বাড়ী বাড়ী ঢাকের বাদ্যে নৃত্য করিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে। শিবের নাম পাট ঠাকুর। ভিক্ষার চাউলে সকলের দিনান্তে একবেলা আহার হয়। ঢাকের তালে নৃত্য করিয়া ভিক্ষা করিবার নাম খাটনা খাটা। গ্রামের ইতর লোক সকলেই নিজ কার্য্য ফেলিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া ঐরূপ বেগার খাটিতে বাধ্য। সর্ব্বশেষ দিন চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক, ও ঢাকের ড্যাডাং ড্যাডাং। এই

দিন সন্ন্যাসীদের নৃশংস আচরণ ও তাণ্ডব নৃত্য।* কোম্পানি বাহাদুর আইন করিয়া নৃশংসতা বন্ধ করিয়াছেন। এই দিন সন্ন্যাসীরা বনবাসী হনুমান ও বানরের সজ্জা করিয়া ঘরের চালে ও উঠানে লম্ফঝম্প করিয়া, কপি-সৈন্যের অভিনয় করে ও রাবণের আম্রবন ধ্বংস করে। এই বনবাসী বানরেরা সকলেই সন্ন্যাসী। পাঠক বোধ হয় অবগত আছেন বানরদের মধ্যে একমাত্র গৃহস্থ পালের গোদা—সমস্ত বানরী তাহার। অন্য বানরদের চলিত নাম সন্ন্যাসী। মধুপুরের অরণ্যে বনবাসী দস্যুদের বানরের মিতালিতে কালযাপন করিতে হইত।

শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়।

---

* বিশ্বকোষকার অনুমান করেন, তিব্বতীয় লামাদের চোঙ উৎসবই বাঙ্গালায় চড়ক নামে বিদিত। ইহা হিন্দু শাস্ত্রে নাই, বৌদ্ধ কাণ্ড। ১৩২১ সালের ভাদ্রের "ভারতী"তে শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়াছেন তাহা নয়, চড়ক চক্র শব্দের অপভ্রংশ, কারণ ছট্টা চক্রবৎ ঘুরাইতে হয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণের দোল এবং নীলমাধব শিবের পূজায় এই May Pole-এর চারিদিকে নৃত্যগীত বাদ্যাদির উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা যেন হইল, কিন্তু পাছে চড়াইয়া রক্তরঞ্জিত নৃশংস ঘুরপাক খাওয়ান এবং বাজে চড়ক ড্যাড্যাং ড্যাড্যাং ইতি গঞ্জনা বাক্য, পতিত সন্ন্যাসীদের চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত নিজস্ব সৃষ্টি, অত্র সংশয়ং নাস্তি।—লেখক।

"মেবার পতন"-এর সমস্যা ও মীমাংসা

দ্বিজেন্দ্রলালের "মেবার পতন" একখানি সমস্যামূলক দৃশ্য-কাব্য। মেবারের পতনের সঙ্গে ভারতের পতন,—সমস্ত রাজপুত জাতির পতন; এই অবনতির কারণ কি? এবং পুনরুত্থানেরই বা উপায় কি? এই দুই সমস্যামূলক চিন্তার ক্রমবিকাশের ফল—মেবারপতন নাটক। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ভাবিয়া চিন্তিয়া এই দুই প্রশ্নের যে মীমাংসা পাইয়াছেন, তাহা নিজের সাধ্যমত নাট্যশিল্প ও কবি-প্রতিভার সাহায্যে লোক-সমক্ষে প্রচারিত করিতে বিন্দুমাত্র ক্রটি করেন নাই; বলিতে গেলে, সমস্যাগুলি যেরূপ জটিল, সে অনুপাতে উপযুক্ত কলা কৌশলেরও লেখকের অভাব হয় নাই—এ কথা যিনিই বইখানি পড়িয়াছেন কিংবা অভিনয় দেখিয়াছেন তিনিই অবশ্য স্বীকার করিবেন। কিন্তু সে কথা যাক্। যে পরিমাণে সত্যের আলোক প্রদান করে সেই পরিমাণেই কাব্যের সার্থকতা; শিল্পকলা এই সত্য-নিরূপণে সাহায্য করে মাত্র। আর্টের কথা রাখিয়া, এই নাটক খানিতে সমস্যার মীমাংসা কতদূর সফল হইয়াছে তাহাই আমরা আলোচনা করিব।

সমস্যা।

নাটকের আরম্ভ হইতেই কবি দূরদর্শী, চিন্তাশীল রাণা সমরসিংহের কথায় বার্ত্তায় দেখাইয়াছেন যে মেবারের পতন অবশ্যম্ভাবী—ভাগ্য-বিধাতা যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহা যেন ঘটিবেই ঘটিবে—তাহা প্রতিরোধ করিতে গেলেও কোন্ অজ্ঞাত আতঙ্কের ভূত আসিয়া ঘাড়ে চাপিবে; তাই, শেষযুদ্ধে "আমি কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। সে যেন একটা কি!—যেন সে এ জগতের কিছু নয়; যেন একটা উল্কাবৃষ্টি—একটা অভিশাপের বন্যা! আমি নিমেষের জন্য চোখ বুজলাম। আমার শরীরের উপর দিয়ে একটা ঘূর্ণী উড়ে গেল। আর কিন্তু বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। পরে সুপ্তোত্থিতের মত চোখ খুলে দেখ্‌লাম, সে যুদ্ধক্ষেত্রে আমি একা, আর কেউ নেই! চারিদিকে রাশি রাশি শব! উঃ—সে কি দৃশ্য! সে কি দৃশ্য!" (৫ম অং, ১ম দৃঃ)

এই ভাবপ্রবণতা রাণাকে কি জয়ে কি পরাজয়ে ঘিরিয়া আছে—

কৃষ্ণদাস। কি সাহসে রাণার পিতা স্বর্গীয় প্রতাপ সিংহ মোগলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন?

রাণা। রাণা প্রতাপসিংহ? তিনি মানুষ ছিলেন না।

শঙ্কর। তিনিও রাজপুত ছিলেন।

রাণা। না শঙ্কর! তিনি এ জাতির কেহ ছিলেন না। তিনি এ জাতির মধ্যে এসেছিলেন—একটা দৈবশক্তির মত, একটা আকাশের বজ্রসম্পাত, একটা পৃথিবীর ভূমিকম্প, একটা সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস। কোথা থেকে এসেছিলেন কোথায় চলে গেলেন, কেউ জানে না। সকলেই রাণা প্রতাপসিংহ হ'তে পারে না, শঙ্কর! (১ম অং, ৩য় দৃঃ)

এই নিশ্চেষ্টতা, এই নৈরাশ্য, এই ভাবপ্রবণতা কিরূপে নির্ভীক, বাহুবলদৃপ্ত রাজপুতের চিত্তে আধিপত্য বিস্তার করিল? কি যেন একটা ধারণা রাজপুত নায়ক রাণা সমরসিংহের প্রাণে এমনি বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, তিনি একজন অদৃষ্টবাদী দার্শনিক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন! রাজমহিষীকে তিনি একস্থানে বলিতেছেন—

রাণা। * * * * এই সৈন্য নিয়ে মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে বসা ভ্রম; আমার তোমায় বিবাহ করা ভ্রম; আমার রাজ্য, আমার জীবন—সব ভ্রম। (৪র্থ অং, ১ম দৃঃ)

তিনি যেন দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছেন যে এ জাতির আর রক্ষা নাই। তবে যখন মরিতেই হইবে, বীরের মতন মরাই ভাল। তাই একলক্ষ মোগলসৈন্যের সহিত, মাত্র পাঁচ সহস্র রাজপুত যুদ্ধ করিয়া মেবার হারাইল;—

রাণা। কর্ব্বে বৈ কি! যুদ্ধ কর্ব্বে না! কয়জন রাজপুত সৈন্য আছে গোবিন্দসিংহ? পাঁচ সহস্র হবে? তাই যথেষ্ট। মর্ব্বার জন্য এর অধিক সৈন্যের প্রয়োজন হয় না। মহাবৎ খাঁর সৈন্য প্রায় একলক্ষ হবে না? হোক্ না! কি যায় আসে!

(৪র্থ অং, ৪র্থ দৃঃ)

কিন্তু যতদিন না রাজপুত রাজপুতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে—যতদিন না মহাবৎ খাঁ ও রাজা গজসিংহ প্রতিহিংসা ও চাটুকারের প্রতিমূর্ত্তির মত মেবার আক্রমণে সহায়তা করিয়াছে, ততদিন মেবারীদিগের প্রাণে এই রাজপুতবিরুদ্ধ নিরাশা নিরুদ্যম নিশ্চেষ্টতা পূর্ণ আকার ধারণ করে নাই। প্রথম আক্রমণ করিল নির্ব্বোধ হেদায়ৎ খাঁ; দ্বিতীয় আক্রমণ করিল সাহাজাদা পরভেজ; কিন্তু এই দুই আক্রমণেই চারণীরা সঙ্গীতে জাতীয়তার উন্মেষ করিয়া দিল—যে সঙ্গীতে উৎসাহিত হইয়া মেবারের মৃতপ্রায় শৌর্য্যবীর্য্য আর একবার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। প্রথম আক্রমণে রাণা মোগল দূতকে বলিলেন, "মোগল দূত! তোমাদের সেনাপতিকে বল যে আমরা সন্ধি কর্ত্তে প্রস্তুত।" এমন সময় চারণী সত্যবতী বেগে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "কখন না! সন্তানগণ! তোমরা যুদ্ধের জন্য সাজ! রাণা যদি তোমাদের যুদ্ধে নিয়ে যেতে অস্বীকার হন, আমি তোমাদের সেনাপতি হবো।" এই বীররমণীর ওজস্বিনী বক্তৃতায় রাণা প্রতাপের চিরসহচর বৃদ্ধ গোবিন্দসিংহ ও সামন্তগণ একেবারে মত্ত হইয়া উঠিলেন; এমন কি রাণাও বলিতে বাধ্য হইলেন, "গোবিন্দসিংহ! আমি যুদ্ধে যাচ্ছি, মোগল দূত, আমরা যুদ্ধ কর্ব্বো। আমার অশ্ব প্রস্তুত কর্ত্তে বল।"

কোথায় সন্ধি করিবে, না মেবার জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া সগর্ব্বে ফিরিয়া আসিল।

দ্বিতীয় আক্রমণে আবার সেই নৈরাশ্য; সেই নিরুদ্যম। রাণা বলিতেছেন, "………মেবার যুদ্ধে আমরা অর্দ্ধেক রাজপুতসেনা হারিয়েছি। মোগলসম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ যে কর্ব্বো সে সৈন্য কৈ?

সত্যবতী। মাটি ফুঁড়ে উঠ্‌বে মহারাণা।

রাণা। কে? চারণী?

সত্য। হাঁ রাণা। আমি চারণী। শুনলাম মোগল আবার মেবার আক্রমণ কর্ত্তে এসেছে। দেখলাম এখনও মেবার নিশ্চিন্ত, উদাসীন। ভাবলাম রাণার বুঝি এখনও ঘুম ভাঙ্গে নাই। তাই আমি রাণার ঘুম ভাঙ্গাতে এলাম।"

পূর্ব্বের মত এবারও ছদ্মবেশিনী চারণী সত্যবতী মূর্ত্তিমতী দেশভক্তির মত আসিয়া মেবারবাসীর মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করিয়া দিলেন। এবারও মেবার সন্ধি করিতে করিতে রহিয়া গেল। কিন্তু আর নয়। এতদিন ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই বাধে নাই। রাণার পিতৃব্যপুত্র যবন মহাবৎ খাঁ ও মারবাড়ের অধিপতি মহারাজ গজসিংহ তৃতীয়বারে যখন একলক্ষ সৈন্য লইয়া মেবারের দিকে হিংস্র পশুর ন্যায় প্রধাবিত হইলেন, তখন চারণীর কণ্ঠে আর গান জোগাইল না; রাণাকে কেহ উৎসাহ দিল না।

রাণা। কে? মহাবৎ খাঁ যুদ্ধে এসেছেন?

সত্যবতী। হাঁ রাণা। মহাবৎ খাঁ। তাঁর সঙ্গে লক্ষাধিক সৈন্য। (৪র্থ অঃ, ৩য় দৃঃ)

শুধু একটা হাঁ। আর সে ওজস্বিতা নাই—মুখে সে দীপ্তি নাই—শুধু একটা নিরুৎসাহের স্বাদহীন, গন্ধহীন হাঁ; কিন্তু রাণা প্রতাপের সহচর বৃদ্ধ গোবিন্দ সিংহের তেজ তখনও বিলুপ্ত হয় নাই—তবে এ তেজে ও পূর্ব্বের তেজে অনেক প্রভেদ; পূর্ব্বে—বিশুদ্ধ, অনাবিল ক্ষাত্র তেজ; আর এখন বিদ্বেষ কলুষের কালিমা-যুক্ত ক্রোধের অগ্নি,—তাই তিনি বলিতেছেন "আমরা ইহার প্রতিশোধ নেবো।" কিন্তু অন্তরে তিনিও জানিতেন এবার আর নিস্তার নাই—এবার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেই হইবে।

এই দুরন্ত ভ্রাতৃবিদ্বেষের বিষময় ফল কেবল যে রাজপরিবার ও সেনা সামন্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নয়—পরন্তু সমস্ত রাজপুতজাতির মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কবি তাহা চরিত্রের ভিতর দিয়া বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

অজয়। গ্রামবাসিগণ, দাঁড়িয়ে রয়েছ কি! ঐ গ্রামবাসিদের বাঁচাও।

গ্রামবাসী। আমরা কি কর্ব্বো মহাশয়!

অজয়। তোমরা শুধু দাঁড়িয়ে এ অত্যাচার দেখ্‌বে?

৪র্থ গ্রামবাসী। নইলে কি দাঁড়িয়ে মর্ব্বো?—চল পালাই। এদিকে আস্‌ছে।

কল্যাণী। পালিয়ে বাঁচবে ভেবেছ? তা হবে না। কেউ বাদ যাবে না। তোমাদের পালা আস্‌ছে—তোমাদেরও ঘর পুড়বে।

১ম গ্রামবাসী। সে যখন পুড়বে তখন দেখা যাবে। পরমায়ু থাক্‌তে মরি কেন? চল, ঐ এসে পড়লো। পালা পালা।

অজয় ও কল্যাণী ভিন্ন সকলের পলায়ন।

(৪র্থ অঃ, ৪র্থ দৃঃ)

প্রবল ঝটিকা যেমন দুই চারিটি সুবিশাল বৃক্ষ ছাড়া আর সকল গুলিই ভূমিসাৎ করিয়া ফেলে, তেমনি এই তুমুল অন্তর্ব্বিরোধ মেবারের দুই চারিটী বীরকেশরী ছাড়া আর সকলেই কাপুরুষে পরিণত করিয়াছিল; এই জন্যই মেবারের পতন অনিবার্য্য। যে কয়েক সহস্র বীর অবশিষ্ট ছিল, তাহারা রাজপুতের মত যুদ্ধ করিল বটে, কিন্তু যে বিষ জাতির শিরায় শিরায় মিশিয়া গিয়াছে, তাহার ক্রিয়া কেবল শৌর্য্য বীর্য্য দ্বারা নষ্ট করা যায় না; তাহার ক্রিয়া নষ্ট করিতে হইলে রাজপুতের দেহ, মন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলেরই শোধন প্রয়োজন; দূষিত রক্ত শুদ্ধ না করিয়া ঔষধ দিলে যেমন একটা সাময়িক উপশমমাত্র হয়, রোগ যেমন তেমনি রহিয়া যায়,—ঠিক্ সেইরূপ ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ভাব থাকিতে মেবারের জয় একটা সাময়িক উন্নতি মাত্র; তাহাতে কোনই লাভ নাই। এই কথা ভাবিয়াই রাণা সমরসিংহ এত নিরুদ্যম, এত নিশ্চেষ্ট, এত ভাবপ্রবণ হইয়াছিলেন।

রাণী। তবে এই অপমান নীরব হয়ে' সহ্য কর্ব্বে?

রাণা। কর্ব্বো বৈ কি? তবে নীরব হ'য়ে সহ্য কর্ত্তে হবে না। একটা আর্ত্তনাদ কর্ব্বো। দেখ, আহার প্রস্তুত কিনা? কোন ভয় নাই। সব যাবে। যে জাতির মধ্যে এত ক্ষুদ্রতা, সে জাতিকে স্বয়ং ঈশ্বর রক্ষা কর্ত্তে পারেন না, মানুষ তুচ্ছার। যাও।

(৪র্থ অঃ, ১ম দৃঃ)

চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে এই ভাব আরও সুস্পষ্ট—

সত্যবতী। তবে কি রাণা যুদ্ধ কর্ব্বেন না?

রাণা। যুদ্ধ কর্ব্বো না? যুদ্ধ কর্ব্বো বৈ কি! এবার

সত্য সত্য যুদ্ধ হবে। এতদিন ত এসব ছেলেখেলা হচ্ছিল। এবার একটা মহা আনন্দ, মহা বিপ্লব। এবার ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই। সমস্ত ভারতবর্ষ তাই দাঁড়িয়ে দেখবে।

সত্যবতী। মহাবৎ খাঁর সঙ্গে শুন্‌লাম যোধপুরের মহারাজ গজসিংহ এসেছেন?

রাণা। ও! বটে! তিনি তাহ'লে আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন? আমি তাই ভাব্‌ছিলাম যে মহারাজ আমাদের প্রতি কি এত বিমুখ হবেন যে নিমন্ত্রণটা গ্রাহ্য কর্ব্বেন না?

* * * *

সত্য। রাজপুত হ'য়ে রাজপুতের বিরুদ্ধে এসেছেন!

রাণা। তা না হ'লে যজ্ঞনাশ সম্পূর্ণ হবে কেন? মহাদেবের সঙ্গে নন্দী ভৃঙ্গী না এলে চলে না। শাস্ত্রের কথা মিথ্যা হয় না। (চক্ষু মুদিলেন)

সত্যবতী। হা হতভাগ্য মেবার!

রাণা। সত্যবতী! বিধাতা যখন ভারতবর্ষ তৈরি করেছিলেন, তখন তার ললাটে এই কথা লিখে দিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ কর্ব্বে তার নিজের সন্তান। মনে কর তক্ষশীল। মনে কর জয়চাঁদ। মনে কর মানসিংহ, আর শক্তসিংহ। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখ এই মহাবৎ খাঁ, আর গজসিংহ। ঠিক মিলেছে কি না? একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে কি না? বিধাতার লিখন ব্যর্থ হয় না। যাও।

সত্যবতী। আমি সৈন্য সাজাই।

(সত্যবতীর প্রস্থান)

রাণা। যখন একটা জাতি যায়—সে নিজের দোষেই যায়, সে এই রকম করেই যায়। যখন জাতি নির্জ্জীব হ'য়ে পড়ে, তখন ব্যাধি প্রবল হ'য়ে উঠে, আর এই রকম বিভীষণ তার ঘরে ঘরে জন্মায়।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, সমরসিংহের তীব্র শ্লেষপূর্ণ ভাবপ্রবণতার কারণ তাঁহার কাপুরুষতা নয়,—তাঁহার দূরদর্শিতা।

বাস্তবিক এই অধঃপতনের কারণ যে শুধু রাণা সমরসিংহ বুঝিয়াছিলেন, তাহা নহে, মানসীর মত চিন্তাশীল মহিলারও তাহা বুঝিতে বাকী ছিল না।

মানসী। মা! মেবারের পতন কি আজ আরম্ভ হল? না, মা; তার পতন আজ হয় নি। তার পতন বহুদিন পূর্ব্ব হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে। এ পতন সেই পরম্পরার একটি গ্রন্থি মাত্র।

সত্যবতী। সে পতন কবে থেকে আরম্ভ হ'য়েছে, মা? যে দিন থেকে সে নিজের চোখ বেঁধে আচারের হাত ধ'রে চলেছে। যে দিন থেকে সে ভাবতে ভুলে গিয়েছে। মা! যতদিন স্রোত বয়, জল শুদ্ধ থাকে। কিন্তু সে স্রোত যখন বন্ধ হয়, তখনই তাতে কীট জন্মে। তাই এই জাতিতে আজ এই নীচ, স্বার্থ, ক্ষুদ্রতা, ভ্রাতৃদ্রোহিতা, বিজাতিবিদ্বেষ জন্মেছে। সেই উদার-অতি উদার হিন্দুধর্ম্ম—আজ প্রাণহীন একখানি আচারের কঙ্কাল। যার ধর্ম্ম গেল, মা, তা'র পতন হবে না? জাতি যে পাপে ভ'রে গেল, তা দেখবার কেউ অবসর পায় না। মেবার গেল ব'লে এখন ক্রন্দন কর্‌লে কি হবে মা!

(৫ম অঃ, ৭ম দৃঃ)

এই হইল দ্বিজেন্দ্রলালের নিজের অভিমত। মেবারের তথা ভারতের অধঃপতনের কারণ স্পষ্টভাবে মানসীর মুখে তিনি বলিয়াছেন। মহাবৎ খাঁর মত বুদ্ধিমান্ সেনাপতিরও ইহা বুঝিতে বাকী ছিল না। মহাবৎ মোগলের দাসানুদাস চাটুকার গজসিংহকে বলিতেছেন—

"আর মহারাজ! আপনি মেবারের গ্রামগুলি এক ধার থেকে পুড়োতে আরম্ভ করুন। যদি কেউ বাধা দেয়—কোন বাছবিচার না ক'রে হত্যা কর্ব্বেন। আপনি সবচেয়ে সে বিষয়ে দক্ষ তা জানি। কেবল দেখবেন, নারীজাতির প্রতি কোন অত্যাচার না হয়—সাবধান।

গজসিংহ। উত্তম মহাবৎ খাঁ! আমি মেবারে রাজপুত রাখব না।

মহাবৎ। তা জানি মহারাজ। রাজপুতের প্রতি মুসলমানের বিদ্বেষ তত আন্তরিক হবে না জানি—তার নিজের বিদ্বেষ যত আন্তরিক হবে। আমি ভারতবর্ষের

পুরাতন ইতিহাস পাঠ ক'রে এটা ঠিক বুঝেচি যে, স্বজাতির উপর পীড়ন ক'রে হিন্দুর যত আনন্দ, এত আনন্দ আর কিছুতে নয়। মহারাজ, রাজপুত জাতির উচ্ছেদ আপনার দ্বারা যত হবে, আর কেউ কর্ত্তে পার্ব্বে না জানি। তাই এ কাজ আপনাকে দিয়েছি। যান, এই আদেশ পালন করুন, মহারাজ—যান।

গজসিংহ। উত্তম মহাবৎ খাঁ! [প্রস্থান]

মহাবৎ। হিন্দু! রাজপুত! মেবার! সাবধান! এ জাতির সঙ্গে জাতির সংঘর্ষ নয়—এ সংঘাত ধর্ম্মে ধর্ম্মে। দেখি কে জেতে [প্রস্থান] (৪র্থ অঃ, ৩য় দৃঃ)

মহাবৎ খুব বিজ্ঞের মত বক্তৃতা দিয়া গেলেন বটে, কিন্তু নিজেও একটি কম নন্। "স্বজাতির উপর পীড়ন ক'রে হিন্দুর যত আনন্দ, এত আনন্দ আর কিছুতে নয়"—ইহার দৃষ্টান্ত তিনি নিজে। প্রথম দুইবার মেবার স্বদেশ বলিয়া তিনি অভিমানে সৈনাপত্য করিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু তৃতীয় বারে একটি তুচ্ছ সাংসারিক কারণে মেবারের উচ্ছেদ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি বিধর্ম্মী বলিয়া শ্বশুর গোবিন্দসিংহ কন্যা কল্যাণীকে তাঁহার গৃহে পাঠাইতে স্বীকৃত নহেন—এই মাত্র মহাবতের আক্রোশের কারণ। তাই তিনি বলিতেছেন, "এ সংঘাত ধর্ম্মে ধর্ম্মে।" অন্ততঃ তাঁহার পক্ষে বটে।

গজসিংহ। খাঁ সাহেব! এবার আপনি মেবারযুদ্ধে অস্ত্রধারণ করুন। জানি—মেবার আপনার জন্মভূমি।

মহাবৎ। [অর্দ্ধ স্বগত] যদি মেবার আমার জন্মভূমি না হত!

গজসিংহ তর্ক যুক্তি দ্বারা আরও প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু মহাবৎকে রাজি করিতে পারিলেন না। তখন মহাবতের পিতা সগর সিংহ প্রবেশ করিলেন।

সগর। জান মহাবৎ যে, কল্যাণীর পিতা কল্যাণীকে নির্ব্বাসিত করেছেন?

মহাবৎ। নির্ব্বাসিত করেছেন? কি অপরাধে?

সগর। এই অপরাধে যে, কল্যাণী এখনও তোমায়—এক বিধর্ম্মীকে—পূজা করে।

এই কথা শুনিয়া মহাবৎ ধর্ম্মবিদ্বেষে একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন—মেবার স্বদেশ বলিয়া যে একটু সঙ্কোচ তাঁহার ছিল, তাহা একেবারে মুছিয়া গেল তিনি মেবার আক্রমণে শতগুণ উৎসাহে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সগরসিংহ চলিয়া গেলে মহাবৎ সেই কক্ষে উত্তেজিত ভাবে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন, "এত বিদ্বেষ, এত আক্রোশ! আশ্চর্য্য নয় যে, এই জাতি বারবার মুসলমানের পদদলিত হয়েছে। আশ্চর্য্য নয় যে, এই ঘৃণা মুসলমান সুদসমেত ফিরিয়ে দিচ্চে। এই এঁদের উদার—অত্যুদার—হিন্দুধর্ম্ম এত গর্ব্ব! এত অহঙ্কার! এতদূর স্পর্দ্ধা! এই অহঙ্কার যদি চূর্ণ কর্ত্তে পারি—মহারাজ! আমি মেবার-যুদ্ধে যাব। সম্রাট্‌কে বলুন গে যান্।

গজসিংহ সবিস্ময়ে চাহিলেন।

মহাবৎ। "মহারাজ! আশ্চর্য্য হচ্ছেন? কেন যাব জানেন?

গজ। কারণ আপনি সম্রাটের রাজভক্ত প্রজা।

মহাবৎ। সে জন্য নয়, মহারাজ। আমি যাব হিন্দুত্ব ধ্বংস কর্ত্তে। আপনাদের সমস্ত জাতিকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর্ব্বো। তার উচ্ছেদ কর্ব্বো। যান, সম্রাট্‌কে বলুন গে যান।"

আগুন জ্বলিল; যেমন এক ক্ষুদ্র কুটীরে অগ্নিসংযোগ হইলেও একটা সমগ্র নগর ভস্মসাৎ হইতে পারে, তেমনি এই তুচ্ছ ব্যক্তিগত মতদ্বৈধ একটা জাতির ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। ভগবানের ইচ্ছা হইলে তিলকে তিনি তালে পরিণত করিতে পারেন; মানুষ দেখিয়া শুনিয়া, বুঝিয়া সুঝিয়া সেখানে কিছুই করিতে পারে না। ইহাই ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তার পরিচয়।

মীমাংসা।

অবনতির কারণ কি?—এ প্রশ্নের উত্তর আমরা মানসীর মুখে পাইয়াছি; সেগুলি যথাক্রমে—

(১) "নিজের চোখ বেঁধে আচারের হাত ধ'রে চলা।"

(২) "ভাবতে ভুলে যাওয়া।"

(৩) ইহার ফলে "নীচ স্বার্থ, ক্ষুদ্রতা, ভ্রাতৃদ্রোহিতা, বিজাতি-বিদ্বেষ।"

(৪) উদারতার অভাব; তজ্জনিত হিন্দুধর্ম্ম-বিরুদ্ধতা।

(৫) ধর্ম্মের অভাবে পাপের প্রশ্রয়।

এই সকল দোষের প্রতীকার না হইলে—আবার মানুষ না হইলে—উন্নতির আশা করা বৃথা। সে প্রতীকার কিরূপে হইতে পারে তাহাও মানসী নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মানসী। ……এ জাতি আবার মানুষ হবে।

সত্যবতী। সে কবে?

মানসী। যে দিন তারা এই অথর্ব্ব আচারের ক্রীতদাস না হ'য়ে নিজে আবার ভাবতে শিখ্‌বে; যে দিন তাদের অন্তরে আবার ভাবের স্রোত ববে; যে দিন তারা যা উচিত, যা কর্ত্তব্য বিবেচনা কর্ব্বে, নিশ্চয় তাই ক'রে যাবে; কারো প্রশংসার অপেক্ষা রাখ্‌বে না—কারো ভ্রুকুটীর দিকে ভ্রুক্ষেপ কর্ব্বে না। যে দিন তারা যুগজীর্ণ পুঁথি ফেলে দিয়ে নবধর্ম্মকে বরণ কর্ব্বে।

সত্যবতী। কি সে ধর্ম্ম, মানসী?

মানসী। সে ধর্ম্ম ভালবাসা। আপনাকে ছেড়ে ক্রমে ভাইকে, জাতিকে, মনুষ্যকে, মনুষ্যত্বকে ভালবাস্‌তে শিখতে হবে। তারপরে আর তাদের নিজের কিছুই কর্ত্তে হবে না; ঈশ্বরের কোন অজ্ঞেয় নিয়মে তাদের ভবিষ্যৎ আপনিই গ'ড়ে আস্‌বে। জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে। যে পথ বঙ্গের শ্রীচৈতন্যদেব দেখিয়ে গেছেন, সেই পথে চল মা। নইলে নীচ, কুটিল, স্বার্থসেবী হ'য়ে রাণা প্রতাপসিংহের স্মৃতি মাথায় রেখে, অতীত গৌরবের নির্ব্বাণ প্রদীপ কোলে ক'রে চিরজীবন হাহাকার কর্লেও কিছু হবে না।

(৫ম অঃ, ৭ম দৃঃ)

মানসীর এই ওজস্বিনী বক্তৃতায় কবি সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। সবগুলিই যদি তাঁহার নিজের কথা হইত তাহা হইলে কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু এক শ্রীচৈতন্যের নজির (precedent) দেখাইতে গিয়া তাঁহার সমস্ত মীমাংসা, সমস্ত যুক্তিতর্ক একটা জটিল, পরস্পরবিরুদ্ধ (self contradictory), অসঙ্গত (inconsistent) ভাবের সমষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিরূপে, তাহা পাঠক একবার নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখুন।

শ্রীচৈতন্যদেবের পথ—প্রেমের পথ। তাঁহার ধর্ম্ম ভালবাসা। কিন্তু সমস্ত বঙ্গদেশও যখন যবন অধিকারে, সে অধীনতা তাঁহার ক্ষণকালের জন্যও বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি নিজে স্বরাট্ ছিলেন—বাহিরের অধীনতা তাঁহার কি করিবে? সুতরাং তাঁহার পথে চলিলে, নিজের দেশ মোগলের কি পাঠানের কি নিজের অধিকারে রহিল—তাহাতে কিছুই আসে যায় না। সুতরাং রাজপুতজাতিকে এই পথে চলিতে বলিলে বলা হয় "হে রাজপুত, তুমি মোগলের কি পাঠানের অধীনে তাহার জন্য চিন্তা করিও না, অন্তরে শ্রীচৈতন্যের মত স্বাধীন থাকিও, তাহা হইলেই চলিবে।"

আর যদি শ্রীচৈতন্যের পথই মেবারের উন্নতির পথ হয়, তবে কবিকে একথা স্বীকার করিতে হয় যে, তাঁহার সময়ের বঙ্গদেশই ভারতের আদর্শ। এই যদি কথা হয়, তবে স্বাধীনতার বা পরাধীনতার কথা উঠিতেই পারে না, শৌর্য্য বীর্য্যের প্রয়োজন হয় না; ক্ষত্রিয় তেজের প্রয়োজন হয় না; শ্রীচৈতন্যদেব যে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার জন্য এ সকল বৃথা। অথচ রাজপুতজাতি অন্যজাতির অধীনতাই প্রকৃত অধীনতা বলিয়া জানে। শ্রীচৈতন্যদেবের পথে চলিলে রাণাপ্রতাপের আদর্শ—সমস্ত রাজপুতজাতির স্বাধীনতার আদর্শ ভূমিসাৎ হইয়া যায়। কবি স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও তাঁহার স্বীকার করা হয় যে, সমস্ত রাজপুতজাতি স্বাধীনতার একটা মিথ্যা আদর্শ লইয়া এতকাল দাঁড়াইয়া ছিল। সে হিসাবে রাণাপ্রতাপ কেন—সমর সিংহের পূর্ব্বপুরুষ কেহই স্বাধীন ছিলেন না। কিন্তু একথা কে স্বীকার করিবে? স্বাধীনতার এ আধ্যাত্মিক আদর্শ কোন্ রাজপুত গ্রহণ করিবে?

বুঝিলাম কবি স্বাধীনতার একটা নূতন আদর্শ রাজপুতজাতির সম্মুখে ধরিয়া দিলেন—যে আদর্শে

চলিলে, ভিন্নজাতির অধীনে থাকিলেও স্বাধীন বলা যাইতে পারে। কিন্তু "যুগজীর্ণ পুঁথি ফেলে দিয়ে" সে আদর্শে কি করিয়া চলা যাইবে? শ্রীচৈতন্যদেব বিশ্বপ্রেম দান করিয়াছিলেন, কিন্তু "যুগজীর্ণ পুঁথি" ফেলিয়া দিয়া নহে; পক্ষান্তরে তিনি শাস্ত্রসদাচার পালন করিয়াছিলেন—শাস্ত্রের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করেন নাই। ভক্তবীর যবন হরিদাসের সঙ্গে তিনি এক পংক্তিতে আহার করেন নাই—কি জন্য? কেবল সেই চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন যুগজীর্ণ পুঁথির অনুরোধে; কেবল "অথর্ব্ব" আচারে বিশ্বাসপরায়ণ ছিলেন বলিয়া;—কিন্তু সে আচার লোকাচার নহে,—শাস্ত্রাচার;—অথর্ব্ব নহে—শক্তিশালী। ইহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের বিশ্বপ্রেম খর্ব্ব হয় নাই—যবন হরিদাসের জন্য তাঁহার ভালবাসা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। অন্য এক সময়ে তাঁহার জনৈক সন্ন্যাসী ভক্ত শাস্ত্রবিধির বিরুদ্ধে অশীতিপরা এক রমণীর নিকট হইতে ভিক্ষা লইয়াছিলেন; সন্ন্যাসীর নারীসংস্রবে আসিতে শাস্ত্রে নিষেধ—কেবল এই কারণে তিনি সেই ভক্তকে পরিত্যাগ করেন। এও কেবল সেই "যুগজীর্ণ পুঁথি"র অনুরোধে, কেবল শাস্ত্রাচারের অনুসরণে—"যুগজীর্ণ পুঁথির" বিধি নিষেধ ভাল কি মন্দ, ন্যায্য কি অন্যায্য—সে বিষয়ে "ভাবতে শিখেন" নাই বলিয়া। কিন্তু ইহাতেও শ্রীচৈতন্যের বিশ্বপ্রেম বিন্দুমাত্র খর্ব্ব হয় নাই। "যুগজীর্ণ পুঁথি" ফেলে দিয়ে—শাস্ত্রাচারের ক্রীতদাস না হ'য়ে শ্রীচৈতন্যদেবকে অনুসরণ করাও যা, আর রামকে ছাড়িয়া রামায়ণগান করাও তাই। অথচ কবির মানস-রাজ্যের মানসী তথাকথিত বিশ্বপ্রেমের প্রচারিকা নির্ব্বিবাদে জলদগম্ভীরভাবে উপদেশ দিয়া গেলেন যে যুগজীর্ণ পুঁথি ছাড়িতে হইবে, শাস্ত্রাচার ছাড়িতে হইবে, অথচ শ্রীচৈতন্যদেবকেও অনুসরণ করিতে হইবে; অর্থাৎ জলেও নামিবে না অথচ সাঁতরাইয়া নদীপার হইবে। এরকম বিশ্বপ্রেম যদি থাকে, আর এ রকম চৈতন্য যদি সম্ভব হয়, তবে সে বিশ্বপ্রেম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিশ্বপ্রেম নহে, এবং সে শ্রীচৈতন্য বঙ্গদেশে আবির্ভূত মহাপ্রভু নন।

এই নব্যতন্ত্রের বিশ্বপ্রেমের আভাস দিতে গিয়া কবিবর যে কেবল শ্রীচৈতন্যদেবের অমর্য্যাদা করিয়াছেন, তাহা নহে, পরন্তু শাস্ত্রসদাচারের নিগূঢ়ার্থ সম্বন্ধেও ঘোর প্রমাদে পতিত হইয়াছেন।

শ্রীঅনন্তলাল সান্যাল।

চিরন্তন ব্যথা

এ বিশ্বের জীবনের প্রত্যেক পলকে,
অপূর্ণ-সঙ্গীত যত আঁধারে আলোকে
চির নিশিদিন ধরি' শ্রান্তিহীন জাগে,—
অনন্ত রোদন নিয়ে কি ভিক্ষা সে মাগে?
পার্থিবেরে দূরে ঠেলে বিক্ষুব্ধ হিয়ায়
অপার্থিব অনুভূতি কি লভিতে চায়?
যুগ যুগান্তর ধরি' সে ব্যাকুল চাওয়া
অন্তরের পাত্র ভরি অমৃতেরে পাওয়া।

জীবনের সব পূজা, অপূর্ণ সাধনা,
সুখ দুঃখ আশা তৃষা, অতৃপ্ত কামনা
একমাত্র চেয়ে থাকে অসীমের পানে
হৃদয় ভরিতে চায় পরিপূর্ণ দানে।
সীমার বাঁধন বাধা সব তুচ্ছ করি'
নিতে চায় চিরন্তন আনন্দেরে বরি'।
সফল-চাওয়ার শেষে ধন্য করি মানে,
বিশ্বের চরম পাওয়া শুধু এইখানে।

শ্রীঅমিয়া দেবী।

পুষির ডায়েরি

(গল্প)

২৭শে শ্রাবণ— আমি পুষি বিড়াল, আমার আবার ডায়েরি লিখিতে সাধ হইয়াছে। এ সুখ-দুঃখ-সমাকুল সংসার-মঞ্চে তোমাদের কখন হাসি কখন অশ্রু, কখন হর্ষ কখন বিষাদ, কখন আশা কখন নৈরাশ্য অভিনয় দেখিয়া, জন্মান্ধের রবিকরোজ্জ্বল ধরিত্রীর মনোহর শোভা দর্শনের মত, চির-বধিরের সুমিষ্ট সঙ্গীত শ্রবণের মত, বামনের চন্দ্র ধরিবার প্রয়াসের মত আমারও কত কি লিখিতে সাধ হয়। জানি—তোমরা মহৎ, আমি ক্ষুদ্র ; তোমরা বলিষ্ঠ আমি দুর্ব্বল, তোমরা পণ্ডিত আমি মূর্খ। তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ মানব-রূপে পশু—আর আমি সত্য সত্যই পশু। তবুও তোমাদের কথা তোমাদের কাছে বলিতে বসিয়াছি।

ক্ষেন্তি ঝির ঝাঁটা খাইয়া, গৃহিণীর বকুনী হজম করিয়া, দাদাবাবুর চোখ রাঙাণী দেখিয়া, নেবুর (দাদাবাবুর ৩ বছরে মেয়ে) নানা উৎপাত সহিয়া, আমার স্নেহময়ী করুণাময়ী বৌদির আদর সোহাগ পাইয়া আমার পশুত্ব অনেকটা লোপ পাইয়াছে। তাই খাতার বুকে দুটি মনের কথা লিখিতেছি। ইহাতে তোমরা আমার দোষ ধরিও না, অপরাধ গ্রহণ করিও না।

আজ ২৭শে শ্রাবণ। এ দিনটি যে আমার কত স্মরণীয় তাহা তোমরা জান না। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এক মেঘাচ্ছন্ন স্নিগ্ধ সন্ধ্যায়, সঙ্কোচে অবনতা বিবাহ-বেশা একটি ত্রয়োদশবর্ষীয়া কিশোরীর সহিত প্রথম আমার পরিচয় হইয়াছিল। কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতা ঐ পাশের বাড়ীটা কয়েকদিনের জন্য ভাড়া লইয়া মেয়ের বিবাহ দিতে আসিয়াছিলেন। তখন আমার বয়স অল্প, স'বে যৌবন সীমায় পদর্পণ করিয়াছি। শাদা-কালো রোমাবলীতে সর্ব্ব শরীর আচ্ছাদিত, চক্ষের উল্লাস-ভরা দৃষ্টি, লেজের বিচিত্র বাহার দেখিয়া সকলেই কাছে ডাকিয়া আদর করিত, গায়ে হাত বুলাইয়া দিত। এই গৌরবে অধীর হইয়া আমি কাহাকেও ভয় করিতাম না। সুতরাং বিবাহ বাড়ীতে দধি রাব্‌ড়ীর লোভে প্রবেশ করিতে আমার একটুও শঙ্কা হয় নাই। কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে ভাঁড়ারে ঢুকিবার পূর্ব্বেই কাহার সুন্দর মুখচ্ছবি দেখিয়া, অমিয়বর্ষী কণ্ঠস্বর শুনিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমার অন্তরখানি আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমি চিনিপাতা দধির কথা ভুলিয়া গেলাম, সুগন্ধযুক্ত রাব্‌ড়ী আমার মনের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল, বৃহৎ রোহিত-মৎস্যের কথা আমার স্মরণপথ হইতে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইল!

আমি মুগ্ধ পুলকিত হৃদয়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। তখন সন্ধ্যা হয় হয়, খণ্ড মেঘের আড়ালে সূর্য্য অস্ত যাই যাই করিতে করিতে কিশোরীর কোমল বদনে নিজের শেষরশ্মিটুকু মাখাইয়া দিলেন। বর্ষণোন্মুখ মেঘের টুকরাগুলি তাহার হরিণ-আঁখিতে সজল কাজল-লতার প্রতিচ্ছায়া দেখিয়াই যেন আনন্দে গুরু গুরু ডাকিতে লাগিল। তাহার বিজলীবর্ণের শাড়ীখানা লইয়া উতলা বাতাস খেলা করিতেছিল। কোন্ সুখস্বপ্নের আবেশে বিহ্বলা কুমারী অনুচ্চকণ্ঠে ডাকিল, “দিদি দেখেছিস্ ভাই কেমন সুন্দর একটা কাব্‌লী-বিড়াল এসেচে”—বলিয়া খপ্ করিয়া আমায় কোলে তুলিয়া লইল।

“কেবল কাব্‌লী বিড়াল নয়, একটুবাদে তোর মানুষ বিড়ালই আস্‌ছে উষা, সেও কাবলী বিড়ালের মতই সুন্দর!”—বলিয়া হাসিতে হাসিতে দিদি ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া কিশোরী আমার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। আমি দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহার চন্দন-চর্চ্চিত বদন-মণ্ডল চাহিয়া দেখিলাম। তাহার বঙ্কিম গ্রীবাবেষ্টিত

বকুল ফুলের মালাটিতে মাথা রাখিয়া মনে মনে বলিলাম, "ওগো আমার নয়ন-শোভন হৃদয়-রঞ্জন কিশোরী, তোমার সবই সুন্দর, সবই মনোরম। তুমি বড় মিষ্টি, বড় মধুর। আজ এক নিমেষের দৃষ্টিপাতেই আমি তোমায় ভালবাসিলাম। তোমাকে ভালবাসিয়া আমার পশুজন্ম সার্থক করিব। তোমার পাতের মাছের কাঁটা খাইয়া, দুধের বাটী চাটিয়া আমি ধন্য হইব।"

ফুলশয্যার মধুময় নিশীথে নূতন বর, ঘুমে ঢুলু ঢুলু নববধূর সদ্যোবিকশিত পদ্মের মত মুখ চুম্বন করিয়া, আমার কথার প্রতিধ্বনির মত বলিয়াছিলেন, "উষা, উষু, উষী—তুমি আমার অন্ধকার জীবনের উজ্জ্বল শুকতারা। তোমায় আমি খুব বালবাসিব; পিপাসার জলের মত ভালবাসিব, আপনার প্রাণের মত ভালবাসিব।" সেদিনের সেই কথাগুলি আজ আমার মনোবীণায় বারবার ধ্বনিয়া উঠিতেছে।

আজ বৌদি রান্না চড়াইয়া বোধ হয় অতীতের সুখ সৌভাগ্যের স্মৃতির ধ্যান করিতেছিলেন। সেই দিন, সেই তারিখ, সেই স্নিগ্ধশ্যাম বরষা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। সেদিনকার বর বধূ এখনও রহিয়াছে। কেবল পাঁচটি বৎসর কাল চক্রে গড়াইয়া—নূতনকে পুরাতন করিয়া দিয়াছে, সুন্দরকে অসুন্দর করিয়াছে,—কিন্তু সকলের নিকটে নহে, স্থান বিশেষে।

আহারাদির পর দাদাবাবু শয়ন ঘরে আফিসের পোষাক পরিতেছিলেন, বৌদি স্বামীর নিকটে সরিয়া গিয়া পানের ডিবাটি টেবিলের উপর রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার পায়ে প্রণাম করিলেন। দাদাবাবু বৃহৎ দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া "টাই" বাঁধিতেছিলেন, নীরস কণ্ঠে বলিলেন "এ আবার কি?"

"আজ আমাদের বিয়ের তারিখ, তাই তোমার পায়ের ধূলো মাথায় নিলাম, তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর।" বলিয়া বৌদি মুচকি মুচকি হাসিতেছিলেন। কিন্তু সেই আনন্দ-উদ্ভাসিত মুখের দিকে দাদাবাবু একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না। পোষাক পরিধান করিয়া, রূপা-বাঁধা ছড়ি-গাছা হাতে লইয়া, "এখন আমার রস করবার সময় নেই, আফিসের বেলা হ'য়ে গেচে।" বলিতে বলিতে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। বৌদি স্তব্ধ নির্ব্বাক হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার আয়ত বিশাল চক্ষে অশ্রুর ধারা বহিল। আকাশে রৌদ্রের পার্শ্বে ঘননীল মেঘরেখা পুঞ্জীভূত হইয়া আসিতেছিল।

মনে ভাবিয়াছিলাম রাত্রে দাদাবাবু নিশ্চয়ই বৌদির সমস্ত চিত্তদাহ আপনার স্নেহের প্রলেপে জুড়াইয়া দিবেন। কিন্তু প্রীতির সম্ভাষণ দূরে থাকুক, দীর্ঘ রজনীর নিভৃত নীরবতার মধ্যে তাঁহাকে স্ত্রীর সহিত সামান্য একটা মুখের কথা বলিতেও শুনিলাম না। হায় রে পুরুষের ভালবাসা! এ যেন আকাশর গায়ে রামধনু, দেখিতে দেখিতেই মিলাইয়া যায়; এ যেন তৃণগুচ্ছে নিপতিত শিশির-কণা, রবিকর-স্পর্শে বিলীন হয়। ইহারই এত গর্ব্ব, এত গৌরব!

২৮শে শ্রাবণ—আজ শেষ রাত্রি হইতে ঝুপ ঝুপ ঝুপ; পোড়া বৃষ্টির যেন আর বিরাম বিশ্রাম নাই,—ঝরিয়া পড়িলেই হইল। আর নিলর্জ্জ মেঘগুলারই বা রকম সকম কি! কখন গগনপটে উজ্জ্বল পাণ্ডুর শোভা বিকীর্ণ করা—আবার পরক্ষণেই ছায়ায় আবৃত করিয়া রৌদ্রের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা; এত রঙ্গ কেন বাপ? ছাদে গিয়া একটু ঘুমাইবারও উপায় নাই। বৃষ্টি যেন আমার দু' চক্ষের বিষ। পোড়ামুখী ক্ষেন্তি ঝি বাদলা দেখিয়া আজ কাযে আসে নাই। ভোর হইতে বৌদি ভিজিয়া ভিজিয়া বাসন মাজিতেছেন, কাপড় কাচিতেছেন, জল তুলিতেছেন। ভেজা ঘুঁটে দিয়া উনুন ধরাইতে তাঁহার চোখের জল দেখিয়া আমার মনটা মোটেই ভাল নাই। দাদাবাবুর আদরের চাকর বেটা কুটাটি ভাঙ্গিয়া দু'খানা করিবে না। বাজারটা ফেলিয়া দিয়া আপনার ঘরে বসিয়া দিব্য আরামে ভুড়ুক ভুড়ুক! হতভাগা আমাকে অপবাদ দেয় "পুষি মাছ চুরি করিয়া খাইয়াছে। পুষি দুধের কড়ায় মুখ দিয়াছে।" ও বেটা যেন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির! যমেও চোখে দেখে না।

বেলা ১০ টার সময় বৌদি কুচা চিংড়ি ভাজা দিয়া

দুটি ভাত মাখিয়া দিয়াছিলেন, খাইতে খাইতে উপর হইতে সিংহগর্জ্জন শুনিলাম, "আমি এখনই বাড়ী ছেড়ে যাচ্ছি মা, এখানে আমার আর পোষাবে না।" গৃহিণী (বৌদির শাশুড়ী) পূজার আসনে বসিয়া ছিলেন, ছেলের চীৎকারে ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "ছোট লোকের মেয়ে ঘরে এনে জ্বলে পুড়ে মলাম ! গা ছেড়ে দিয়ে থাকে, ওদিকে মেয়ে যেন বাছার কি ক্ষতি কর্‌লে।" বৌদিদি কম্পিত হৃদয়ে দাদা বাবুর বসিবার ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। আমি ভাত ছাড়িয়া তাঁহার সঙ্গ লইলাম। দাদাবাবুর ঘরের সম্মুখে গিয়া দেখিলাম, নেবু পিতার এসেন্সের শিশি পমেটমের শিশির মধ্যে ঢালিয়া তাহাতে এক দোয়াত লাল কালী মিশাইয়া নিজের সর্ব্ব শরীর দিব্য সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়া অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া আছে।

রাগের সময় স্ত্রীকে কাছে পাইয়া দাদাবাবুর ক্রোধ-বহ্নি আরও প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি শূন্য শিশিগুলি বৌদির দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা শিশি বৌদি পায়ের উপর পড়িয়া শত খণ্ডে বিভক্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে বাঁ পা খানা কাটিয়া রক্তের ধারা ছুটিল। মার পায়ের রক্তস্রোত দেখিয়া নেবু দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দাদাবাবু কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে করিতে তীব্রস্বরে বলিলেন, "কায়ের মধ্যে দুই খাই আর শুই, এই নিয়েই তুমি অস্থির। মেয়েটাকেও চোখে চোখে রাখতে পার না ? এমনি করে আমার ক্ষতি কর। এখনই আমি বাড়ী ছেড়ে যাচ্ছি।" স্ত্রীর উত্তর শুনিবার পূর্ব্বেই দাদাবাবু জুতার খট্ খট্ শব্দ করিয়া বেগের সহিত প্রস্থান করিলেন। বৌদি দেয়াল ধরিয়া তেমনি অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পর বাল্‌তির জলে ক্ষতস্থান ধুইয়া, নেবুকে কোলে লইয়া বৌদি রান্নাঘরে ফিরিয়া আসিতেই গৃহিণী সেদিকে বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, "তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে ? বাছা আমার না খেয়েই বেরিয়ে গেছে; এইবার জগন্নাথের 'আট্‌কে' বেড়ে নিয়ে মনের সুখে গিল্‌তে বসো।" বাড়ীতে সাধারণ ডাল চচ্চরী উপেক্ষা করিয়া পুত্র যে তাঁহার অন্যত্র খুব ভাল দ্রব্যই আহার করিবে একথা গৃহিণী বিলক্ষণরূপেই জানিতেন। এবং বধূর অপরাধের পরিমাণ যে তাঁহার না জানা ছিল এমনও নয়; তথাপি এই উপলক্ষে মর্ম্মপীড়িতাকে আরও দুটি কথা শুনাইবার সুযোগ তিনি সহজে ত্যাগ করিতে করিতে পারিলেন না। ফলে গৃহিণীর অবিরাম রসনায় সমস্ত দ্বিপ্রহর বাক্যবাণ বর্ষিতে লাগিল।

নেবুকে ভাত খাওয়াইয়া, হাঁড়ি তাকে উঠাইয়া বৌদি খুকুকে দুধ খাওয়াইতে বসিলেন। এবেলা তাঁহার শুষ্কমুখে এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত উঠিল না। কে দেখিবে ? দেখিবারই বা কে আছে ? যার সোহাগে স্ত্রীলোক সোহাগিনী, যার আদরে আদরিণী, এক্ষেত্রে তিনিই যে বিমুখ। মেয়েরা কথায় কথায় একটা উদাহরণ দেন, আমারও সেই কথাটা মনে পড়িতেছে—

এক চন্দ্র জগতের অন্ধকার হরে,
লক্ষ লক্ষ তারা বল কি করিতে পারে।

২২শে ভাদ্র—কাল রাত্রে একটুও ঘুম হয় নাই। কারণ ভাঁড়ার ঘরে নেংটি ইন্দুরের পিছনে পিছনেই রাতটা কাটিয়া গিয়াছে। ভোরের সময় বাছাধনের ভবের লীলা সাঙ্গ করিয়া দিয়াছি। আমি পুষি,—হাঁড়িকুড়ীর মধ্যে লুকাইলেও আমার নিকটে ও জাতের উদ্ধার নাই।

দুপুর বেলা নেবুর পাতে দুধ ভাত খাইয়া উনুনের পাশে শয়ন করিয়া খুব ঘুমাইয়াছিলাম। "আ মলো ! এখানে আবার আরাম করে শোয়া হয়েচে ! দূর হ মুখপুড়ী।"

ক্ষেন্তির এহেন প্রিয়-সম্বোধনে আপ্যায়িত হইয়া আমার গভীর নিদ্রা অন্তর্হিত হইল। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, বেলা একেবারেই পড়িয়া আসিয়াছে। ছাদের আলিসার উপর ম্লান রৌদ্র ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। রাস্তার নেড়া আমগাছের ডালে ডালে কাকদের মেলা বসিয়া গিয়াছে। বৌদির কাপড় কাচা পাণ সাজা শেষ হইয়াছে। তিনি কুটনা কুটিতে বসিয়াছেন। নেবু খুকুর দোলায় নাড়া দিতেছে। গৃহিণী পাশের বাড়ীতে

বেড়াইতে গিয়াছেন। ক্ষেন্তি কলতলায় বাসন সম্মুখে লইয়া নিজের দুঃখের গাথা বৌদিকে শোনাইতেছিল। হঠাৎ দাদাবাবুকে আসিতে দেখিয়া তাহার অবিরাম রসনা ক্ষণকালের জন্য নীরব হইল।

আজ অসময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামীকে ফিরিতে দেখিয়া বৌদির কালো ডাগর চক্ষে আনন্দের উচ্ছ্বাস বহিল। রাত ১০টার পূর্ব্বে কোনদিনও দাদাবাবু ঘরে ফেরেন না। মাঠের বিশুদ্ধ বায়ু রাত ১০টা পর্য্যন্ত সেবা না করিলে তাঁহার নাকি ক্ষুধা ও নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। অবশ্য পূর্ব্বে এরোগে তিনি আক্রান্ত ছিলেন না। নেবুর জন্মের পর ইহার সূচনা হইয়াছে।

বৌদি কুটনা কোটা অসম্পূর্ণ রাখিয়াই স্বামীর নিকটে উপনীত হইয়া সহাস্য মুখে বলিলেন, "আজ সকাল সকালই ফিরে এলে যে, মাঠে যাবে না ?"

"না, আজ থিয়েটারে যাব। পাঁচটা থেকে থিয়েটার সুরু হবে; খুব তাড়াতাড়ি কিছু খাবার, আর এক কাপ্ চা আমায় তৈরি করে দাও।"

"আচ্ছা, চা খাবার তৈরি করে আনচি। তুমি আমাকে নিয়ে চল না কেন? কতদিন থিয়েটার দেখি নি।" বলিয়া বৌদি স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। দাদাবাবু ধমকাইয়া উঠিলেন, "ওসব কথা এখন শোনবার আমার অবসর নেই; শীগ্‌গির খাবার তৈরি করে আন; নইলে দোকানে গিয়ে কিনে খেয়ে যাব।"

কোন কথা না বলিয়া বৌদি ষ্টোভে স্বামীর জন্য চায়ের জল চড়াইয়া, ময়দা মাখিতে বসিলেন।

রান্না খাওয়া মিটাইয়া বৌদি যখন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, তখন রাত্রি ১১টা বাজিয়া গিয়াছে। নেবুর ঘুমন্ত মুখখানি চুম্বন করিয়া, খুকুকে দুধ খাওয়াইয়া, বৌদি উদাস দৃষ্টিতে স্বামীর শূন্য শয্যার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার পা চাটিয়া আমার ভালবাসা প্রকাশ করিতেছিলাম। কিন্তু আজ বৌদি মিষ্টি মধুর হাসিয়া আমাকে কোলে তুলিয়া লইলেন না, গায়ে হাত বুলাইলেন না। অভিমানে আমার দুইচক্ষু জলে ভরিয়া গেল। আমি মনের দুঃখে পাপোষের উপর শুইয়া পড়িলাম।

কিয়ৎকাল পরে চাহিয়া দেখি, বৌদি দাদাবাবুর মাথার বালিসটা বুকের মধ্যে জড়াইয়া বারবার আঘ্রাণ করিতেছেন। সেটাকে আলিঙ্গন দিয়া সাদর চুম্বন করিয়া কিছুতেই যেন তাঁহার তৃপ্তি হইতেছিল না। হিংসায় আমার বুকের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল। শ্যামের বাঁশীর প্রীতি দেখিয়া, রাধা মনের দুঃখে বলিয়াছিলেন, "কেন না হইনু বাঁশী।" আমিও মনে মনে বলিলাম, "কেন না হইনু বালিস।"

অনেকক্ষণ পর বৌদি বালিসটা বিছানায় রাখিয়া, কাঠের বাক্স হইতে স্বামীর চিঠির তাড়া কয়েকটা বাহির করিয়া আনিলেন। মেঝেয় বাতির সম্মুখে বসিয়া কত স্নেহে কত যত্নে চিঠিগুলি পড়িতে লাগিলেন। এ চিঠিগুলি তাঁহাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম উচ্ছ্বাস। ইহার কথায় কথায় ভালবাসার সুবিমল হিল্লোল, রেখায় রেখায় প্রেমের অফুরন্ত কাকলী; চিরমধুর চিরসুন্দর প্রিয় সম্বোধন—"উষা হৃদয়ের রত্ন আমার, জীবন মরণে জন্মে জন্মে আমি তোমারই, একান্ত তোমারই।" স্মৃতির সাগর আলোড়িত করিয়া অতীতের স্নেহ মমতার ঢেউ বৌদির সুকোমল অন্তরে আঘাত করিতে লাগিল। আঁখি-কোণে বরষার ধারা ছুটিল।

রাত ৪টার পর রুদ্ধদ্বারে দাদা বাবুর ধাক্কার শব্দে জাগিয়া দেখি, বৌদি মেঝেয় পড়িয়া আছেন। বুকের উপর সেই চিঠিগুলি। স্বামীর সাড়া পাইয়া, চিঠির তাড়া কয়েকটা বিছানার নীচে লুকাইয়া দ্বার মুক্ত করিতেই দাদাবাবু বলিলেন, "এতক্ষণে ঘুম ভাঙ্গলো? ঘণ্টাখানেক দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে ব্যথা ধরে গেচে। মানুষ যে এমন বেআক্কেল হয় তা জান্‌তাম না।"

১লা আশ্বিন—পূজার আর বেশী দেরী নাই। শরতের সোণার আলোকে পৃথিবী সমুজ্জ্বল। শেফালীর স্নিগ্ধ সুবাস, মেঘশূন্য নির্ম্মল গগনের নব নব দৃশ্যপট, বিরহীর মলিন আননে হাস্যচ্ছটা ফুটাইয়া তুলিতেছে। দোকানে দোকানে জিনিস কিনিবার ভিড় লাগিয়া

গিয়াছে। মেসের যুবকগণ উল্লসিত হৃদয়ে গান ধরিয়াছে—

"দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি
তাই, চমকিত মন, চকিত শ্রবণ, তৃষিত
আকুল আঁখি।"

সকলেই প্রিয়জনের সাথে নিবিড় মিলনের আশায় আশাতুর, কিন্তু বৌদি আমার মলিনা, দীনা—কারণ দাদাবাবু কাল পশ্চিমে বেড়াইতে যাইবেন। সমস্তই ঠিক হইয়া গিয়াছে।

আজ দাদাবাবু সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ী ফিরিয়াছেন। আর একটি মাত্র রজনী দুইজনে একত্রে থাকিবেন—ইহাকে সার্থক করিয়া মধুময় করিয়া একটি তরুণ হৃদয়ের গোপন আবাসে সুখের স্মৃতি সঞ্চিত করিয়া দিতে কাহারও কি অসাধ হয়? অনেক দিনের পর বৌদি শুভ্র ললাটের উপর কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ বিন্যস্ত করিয়া চুল বাঁধিয়া, সাদা সেমিজের উপর খয়ের রংঙের শাড়ীখানা পরিয়া শয়ন ঘরে প্রবেশ করিলেন। দাদাবাবু টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া একখানা বই পড়িতেছিলেন। একটু থামিয়া একবার ইতস্ততঃ করিয়া বৌদি স্বামীর পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। উজ্জ্বল বাতির নিকটে দাঁড়াইয়া তৃষিত নয়নে তিনি যখন স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন তখন যে তাঁহাকে কত সুন্দর দেখাইতেছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ হয় না। তাম্বুলরাগে অধরোষ্ঠ রঞ্জিত, ঈষৎ বেদনাযুক্ত। হাস্যমুখী তরুণীর আলতাপরা পা-দুটির তলে মাথা লুটাইয়া মুগ্ধ পুলকিত স্বরে আমার বলিতে সাধ হইতেছিল, "আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই—তুমি তাই গো!" কিন্তু বলিব কি করিয়া? আমি যে পুষি। যাহার বলিবার শক্তি আছে, দেখিবার চক্ষু আছে, শুনিবার কর্ণ আছে, অনুভব করিবার অন্তঃকরণ আছে তিনি কিন্তু নির্ব্বাক, নিশ্চল, দৃষ্টিহীন অন্ধের মত বসিয়া বসিয়া পুস্তকের পাতা উল্টাইতে লাগিলেন।

ক্রমে রজনীর গভীরতা বাড়িতে লাগিল। রাস্তার কোলাহল, ফেরিওয়ালার নীরস চীৎকার, গাড়ীর ঘড়ঘড় ধ্বনি, মোটরের ফোঁস ফোঁস শব্দ সবই নীরব হইয়া আসিল। ব্রাকেটের উপর ঘড়িটা কেবল টিক্ টিক্ করিয়া যেন বলিতেছিল, "ওগো, সময়ের মূল্য-জ্ঞানহীন মানব, সময় যে চলিয়া যাইতেছে; ইহাকে আর ফিরাইতে পারিবে না।" রাস্তার দিকের বারান্দায় খড়খড় মড়মড় শব্দের সহিত কি যেন পলাইয়া গেল, বোধ হয় ইন্দুর। কিন্তু সেদিকে আমার মন আকৃষ্ট হইল না। দাদাবাবুর উদাসীনতা দেখিয়া রাগে দুঃখে আত্মহারা হইয়া আমি বসিয়া রহিলাম।

অনেকক্ষণ পর দাদাবাবু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন। ডিবা হইতে দুইটি পাণের খিলি মুখে দিয়া, স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঢের রাত হয়ে গেছে, এখন ঘুমুতে হবে। কাল রাতে বোধ হয় শোবার জায়গা পাব না। আলোটা ছোট করে, মাথার দিকের জানালাটা খুলে দিয়ে তুমি শুয়ে থাক।"

বৌদি নিরুত্তরে স্বামীর আদেশ পালন করিয়া, মেয়ে দুটির মাঝখানে শয়ন করিলেন।

৩রা আশ্বিন—দাদাবাবু কাল দেরাদুন রওনা হইয়া গিয়াছেন। যাইবার সময়টিতেও বৌদির সঙ্গে দুটো মিষ্টি কথা বলিয়া যান নাই। বেচারী আজ সমস্ত দিনটাই শুক্‌নো মুখে কাযকর্ম্ম করিতেছে। আমি লক্ষ্য করিতেছি, ক্ষণে ক্ষণে বৌদির চোখের পাতা দুটি জলে ভিজিয়া যাইতেছে। মনটা আমার প্রসন্ন নাই; নেবু কাণ ধরিয়া টানিতে আসিয়াছিল, একটা আঁচড় দিয়াছি। নাতনীর গোল গোল নরম হাতে আঁচড় চিহ্ন দেখিয়া গৃহিণী ত রাগে আগুন। ক্ষেন্তির উপর হুকুম হইল—"পোড়ারমুখী বেড়ালকে থলেয় পুরে ফেলে দিয়ে আয়।"

একগাল হাসি হাসিয়া ক্ষেন্তি আমায় ধরিতে আসিয়াছিল, তাহার আঙ্গুলে এমনি কামড় দিয়াছি যে রক্ত বাহির হইয়াছে। তাতেও মুখপুড়ীর আক্কেল হয় নাই। "ঠেঙ্গিয়ে ওর হাড় গুঁড়ো করবো" বলিয়া হতভাগী আমায় লাঠি নিয়া তাড়া করিয়াছিল। বৌদি আমায় কোলে লইয়া ক্ষেন্তিকে বলিলেন, "পুসিকে এত কষ্ট দিচ্ছিস

কেন ক্ষেন্তি? ও তো ব্যথা না পেলে কাউকে কিছু বলে না। দস্যি মেয়েটা ওকে বড্ড জ্বালায়, আহা ওরও তো রক্ত মাংসের শরীর। নির্দ্দোষী জীবকে কষ্ট দিলে ভগবান নারাজ হন।"

ক্ষেন্তি সম্প্রতি বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা লইয়াছে। লোক দেখানো জপের মালাও সংগ্রহ করিয়াছে। বৌদির মুখের ভগবান নারাজ হন শুনিয়া অগত্যা তাহাকে রণে ভঙ্গ দিতে হইল।

৮ই আশ্বিন—সকাল বেলা দাদাবাবুর পৌছানসংবাদ আসিয়াছে। বৌদির নিকটে নহে, গৃহিণীর নিকটে একখানা পোষ্ট কার্ডে। বৌদি সেখানা নিজের ঘরে আনিয়া হাজারবার পড়িতেছেন। কখনো মাথায় ছোঁয়াইতেছেন, কখনো বা সেখানা বুকে চাপিয়া ধরিতেছেন। একখানা ছোট কাগজে লেখা কয়েকটি লাইনের এত আদর ভাল লাগে না বাপু হ্যাঁ! একালের মেয়েদের সবতাতেই বাড়াবাড়ি।

দুপুর বেলা খুকুটার বড় জ্বর হইয়াছে। সে আমার দিকে চাহিয়া হাসে নাই। মার সঙ্গে মুখ নাড়িয়া একবারও কথা বলিতে চেষ্টা করে নাই। শুধু কান্নার উপরেই আছে।

১৪ই আশ্বিন—খুকুর খুব অসুখ। ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন, নিউমোনিয়া, জীবনের আশা নাই। একথা শুনিয়া প্রাণ যে আমার কেমন করিতেছে গো! খুকু আমার কাজল পরা উজল চোখে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া আর কি হাসিবে না? আকুল আগ্রহে হাত বাড়াইয়া আর কি আমায় ধরিতে চেষ্টা করিবে না? লাল কাগজের ফুল দেখিয়া আর কি সে খেলা করিবে না? বৌদির এই সতের বছর বয়স, খুকুকে হারাইয়া বাকী জীবন সে কেমন করিয়া কাটাইবে? ভগবান, তুমি ওকে রক্ষা কর।

২০শে আশ্বিন—একটি শুভ্র সুন্দর কুসুমকলিকা মায়ের কোল শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আর সে ফিরিয়া আসিবে না। মাস বর্ষ বসন্ত শরৎ বহুবার ফিরিয়া আসিলেও, সে আর ফিরিয়া আসিবে না। খুকুকে হারাইয়া বৌদি উন্মাদের মত হইয়াছেন। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অবিরল অশ্রুজলে ভাসিতেছেন। কে সান্ত্বনা দিবে, সান্ত্বনা দিবার কে আছে? স্বামী প্রবাসগত। শাশুড়ী হৃদয়হীনা। বধূর অনাদর অযত্নেই যে এ ঘটনা ঘটিয়াছে, একথাটাই তিনি সহস্রবার বলিয়া সন্তান-হারার মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া দিতেছিলেন। হায়, কে শান্তি দিবে? কে সান্ত্বনা দিবে?

কয়েকদিন দাদাবাবুর কোনই চিঠি আসে না। উৎকণ্ঠিতা পত্নী সকাল সন্ধ্যায় তুলসীমঞ্চ চোখের জলে ভিজাইয়া প্রার্থনা করিতেছেন, "হে ঠাকুর, হে হরি, আমার যা করিবার করিয়াছ, এখন তাঁহাকে আমার কাছে ফিরাইয়া আন। আমি যে আর পারি না।"

২৬শে আশ্বিন—অনেককালের পর দাদাবাবু স্ত্রীর নিকট চিঠি লিখিয়াছেন। স্বামীর হস্তাক্ষর দেখিয়া বৌদির অন্ধকারে হৃদয়ে আশার ক্ষীণ প্রদীপটি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। শুষ্ক শীর্ণ প্রাণের মধ্যে শান্তির উৎস ছুটিতেছে। নিভৃতে বসিয়া বৌদি চিঠি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন—

"পরম কল্যাণীয়াসু—

মার চিঠিতে সমস্তই জানিয়াছি। তোমার অযত্নে, অবহেলায় যে খুকী চলিয়া গিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি তোমাকে বেশী কিছু বলিতে চাহি না। আশা করি তোমার এ ভুল তুমি নিজেই বুঝিতেছ। নেবুকে অযত্ন করিও না। আমি কয়েকদিন পর রওনা হইব। ভাল আছি। ইতি

আশীর্ব্বাদক
শ্রীরমেশচন্দ্র দাস।"

চিঠিখানা হাতে করিয়া বৌদি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। এতদিনের পর এত কষ্টের পর স্বামীর এই চিঠি তাঁর ভাঙ্গা বুকে দাবানলের সৃষ্টি করিল। এ সেই স্বামী, তিন বছর পূর্ব্বে যাহার অসীম অব্যয় প্রেমোচ্ছ্বাস বর্ষার স্রোতের মত প্রবাহিত হইয়া, একটি ক্ষুদ্র সংসারজ্ঞানহীনা সরলা কিশোরীর সুকুমার চিত্তে মহা-

প্লাবনের' সূচনা করিয়াছিল। ফুটোনোন্মুখ কলিকা যাহার সোহাগস্পর্শে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, হায় সে আজ কোথায়? নূতনত্বের মোহ কাটিয়াছে, রূপের নেশা ছুটিয়া গিয়াছে, তাই কি সেই চিরসুহৃৎ চিরপ্রিয়, তাহার বড় আদরের বাঞ্ছিতাকে পদদলিতা ধূলিলুণ্ঠিতা করিয়া সরিয়া গিয়াছে? কিন্তু অনাদৃতা নারী আজ কি করিবে? তাহার প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি প্রাণের পূজা কেমন করিয়া ফিরাইয়া লইবে? তাহার হৃদয় নদী যে উন্মাদ তরঙ্গে সাগরের অভিমুখে ছুটিয়া গিয়াছে! আর তো ফিরিবার উপায় নাই! শুকাইয়া সাহারায় পরিণত হইলেও ফিরিবার উপায় নাই।

২রা কার্ত্তিক—প্রচুর পরিমাণে স্বাস্থ্য লাভ করিয়া, বেলা ১০টা ৩০ মিনিটের গাড়ীতে দাদাবাবু ফিরিয়া আসিয়াছেন। সঙ্গে আসিয়াছে, একটি পাহাড়ী মেয়ে। তার নাম 'ডালিয়া'—বয়স বছর কুড়ি। শ্রাবণের নদীর মত রূপরাশিতে যুবতীর সর্ব্বশরীর হিল্লোলিত। সরল চঞ্চলতা ভরা চক্ষু, ঠোটের উপর মধুর হাসি, নববর্ষার মেঘের মত স্নিগ্ধ শ্যাম বর্ণ, গুচ্ছে গুচ্ছে কেশকলাপ, সুকোমল বলিষ্ঠ বাহুবল্লরী, নিখুঁত নিটোল যৌবনশ্রী, সমস্তই মনোমুগ্ধকর। দেরাতুনে গিয়া দাদাবাবু যাঁহাদের সহিত আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, এ মেয়েটি তাঁহাদের বাড়ীরই পরিচারিকা। বালীগঞ্জে তাঁহাদের কন্যা জামাতার নিকটে, ডালিয়ার স্বামী চাকুরী করিতেছে। ছয় মাস সে দেশে যায় নাই। স্বামী স্ত্রীতে সাক্ষাৎ নাই; তাই বিরহিণী স্ত্রী এ সুযোগে স্বামীর নিকটে ছুটিয়া আসিয়াছে।

বাঙ্গালী পরিবারে বাল্যকাল হইতে থাকিয়া ডালিয়া সুন্দর বাঙ্গলা বলিতে পারে। আচার ব্যবহারও তাহার সাধারণ পাহাড়ী হইতে অনেকটা উন্নত। মেয়েটিকে আমার বড়ই ভাল লাগিতেছে। সে এখানে আসিয়া প্রথমেই আমাকে কোলে লইয়াছিল। বৌদির জটাবদ্ধ চুলগুলি তৈল দ্বারা আঁচড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার সহিত বৌদির বেশ আলাপ পরিচয় হইয়া গিয়াছে। নেবুর সঙ্গে ভাব হইয়াছে সকলের চেয়ে বেশী।

দাদা বাবু কিন্তু একবারও বৌদির ঘরমুখো হইলেন না। এত দিনের পর দেখা, তবু এমন কেন গা? বোধ হয় রাত্রে দুজনার হৃদয়দ্বার দুজনে খুলিয়া দিবেন।

৩রা কার্ত্তিক—রাত্রে দাদা বাবু নীচের বৈঠকখানায় শুইয়া ছিলেন, কারণ কিছু বুঝিলাম না। সকাল বেলা বৌদি বিছানা তুলিতেছিলেন, দাদাবাবু ধীরে ধীরে কাছে গিয়া বলিলেন, "কাল নীচেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পর্শু রাত জেগে এসেচি, তাই ঘুমটা গভীর হয়েছিল। ভোর বেলা জেগে দেখি নীচের ঘরে শুয়ে আছি।"

কি বলিবার জন্য মুখ তুলিয়াই বৌদি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন। কতদিনের কত পুঞ্জীভূত বেদনার উৎস, স্বামীকে নিকটে পাইয়া উছলিয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পর চক্ষু মুছিয়া বৌদি পুনরায় স্বামীর দিকে চাহিয়া কি যেন বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। অশ্রু-বাষ্পে বারংবার তাঁহার ওষ্ঠযুগল কাঁপিতে লাগিল। দাদাবাবু সে অব্যক্ত কথা বুঝিলেন কি না জানি না,—পশু হইলেও আমি তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। সে নীরব ভাষা যেন বলিতেছিল, "ওগো আমার প্রিয়তম, তোমার নিকটেই আমার শোকের সান্ত্বনা আছে, দাহের প্রলেপ আছে, দুঃখের সুখ আছে, নিরাশার আশা আছে। ঐ বক্ষের নিকটে টানিয়া লইয়া ব্যথিতার ব্যথার ভার লাঘব করিয়া দাওগো, আমি জুড়াইয়া যাই, শীতল হই। হে প্রাণের দেবতা আমার, তুমি আজ আমাকে উপেক্ষা করিও না, তোমার বাহু বেষ্টনে বাঁধিয়া আমার যাতনারাশি মুছাইয়া দাও।"

দ্বারের নিকট হইতে ক্ষেন্তি ডাকিল, "ধোপা এসেছে বৌদি, দাদাবাবুর ময়লা কাপড় দিয়ে যাও।" দাদাবাবু উঠিয়া বাহিরে আসিতেই ডালিয়া বলিল, "কাউকে দিয়ে আমায় বালীগঞ্জে পাঠিয়ে দেন বাবু, আমি এই বেলাই সেখানে যেতে চাই।"

"আজ তোর যাওয়া হবে না ডালি, আজ আমার সময় হবে না। কাল সকাল বেলা আমিই তোকে নিয়ে রেখে আসবো।"—বলিয়া তৃষ্ণাতুর নয়নে ডালিয়ার দিকে চাহিতে চাহিতে দাদাবাবু প্রস্থান করিলেন। দেখিয়া আমার

গা জ্বলিয়া গেল। ডালিয়া ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "কাল যেতে পারলাম না, আজও হল না। কতদিন তাকে দেখি নি।" বৌদি ডালিয়াকে কাছে ডাকিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, "একদিন দেরী হল বলে দুঃখ করিস নে ডালি, আজকের দিনটা আমাদের কাছেই থাক্, কালই ত চলে যাবি।"

ডালিয়া ম্লান হাসিয়া উত্তর দিল, "কতদিন তার সাথে দেখা নাই বৌদি, আমার পরাণ যে কেমন করে! আমি আপন দেশ্ আপনার জন্ ছেড়ে তাকে দেখ্তেই ছুটে এসেছি এখনো কি দেরী করা যায়?" এই মেয়েটির মলিন মুখ দেখিয়া সরল কথা শুনিয়া পাহাড়ী মেয়েদের সম্বন্ধে কবির কথা মনে পড়িল "প্রেম সে মাতাল বড়, অটল তবু।"

রাত্রে দাদা বাবুকে বৌদির ঘরে শয়ন করিতে দেখিয়া, আমি নিশ্চিন্ত মনে পাশের ছোট ঘর খানিতে ডালিয়ার বিছানায় আশ্রয় লইয়াছিলাম। বৌদির পায়ের গোড়া পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র শয়ন করিবার অপবাদ এ পর্য্যন্ত কেহই আমাকে দিতে পারে নাই—আমার পরম শত্রু ক্ষেন্তিও নহে। কিন্তু আজ ভিন্ন কাল ডালিকে আর পাইব না, সেই জন্য আজ তাহার নিকটেই শুইয়াছিলাম। কারণ মেয়েটিকে আমি ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি।

কি একটা শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন বোধ হয় রাত একটার বেশী হইবে না। বাহিরে ঘন ঘোর অন্ধকার, সেই অন্ধকারে মুক্ত গবাক্ষের নিকটে একটি চোরকে দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম—"মিউ—মেও—ম্যায়ো।"

আমার আর্ত্তনাদে ডালিয়া বিছানার উপর বসিয়া বিস্ফারিত চক্ষে বাহিরের দিকে চাহিতে লাগিল। তাহার নাসাপথ দিয়া সজোরে নিশ্বাস বহিতেছিল। হঠাৎ তাহার নয়ন কোণে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। দৃঢ় কণ্ঠে সে বলিল, "আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কোন বাবু? যান ঘরে যান, বৌদি একলা আছেন।"

চোরের মতই আস্তে আস্তে দাদাবাবু উত্তর করিলেন, "আমি তোর কাছেই এসেছি ডালি, তুই দোর খুলে দে।"

ডালি গর্জ্জিয়া উঠিল, "আমি তোমার সাথে এসেছি বলেই তুমি আমায় এম্নি ভাব বাবু? তোমরা ভদ্রলোক, আমরা ছোটজাত হ'লেও অধর্ম্মের কায আমরা করি না। আমি এখনই বৌদিকে ডাক্‌ছি।"

"তাকে ডাকিস না ডালি তোর দুটি পায়ে পড়ি। তোকে না পেলে প্রাণ আমার বাঁচবে না ডালু, দয়া করে দোরটা খুলে আমার দুটো কথা শোন্।"

দাদাবাবুর পশ্চাতে একটি মানুষের পতন শব্দ হইল। রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিয়া ডালি ছুটিয়া গিয়া সকরুণ কণ্ঠে ডাকিল, "বৌদি ও বৌদি, এমন হলে কেন?" মৃদু জ্যোস্নালোকে বিষাদময়ী তরুণীর অর্দ্ধমূর্চ্ছাতুর মুখের দিকে চাহিয়া আমি নিজকে সম্বরণ করিতে পারিলাম না। দাদাবাবুর দিকে চাহিয়া দেখিলাম তিনি ঘরের মধ্যে চলিয়া গিয়াছেন। ভাবিলাম, অমন মানুষের মুখে আগুন; মনুষ্যত্বে শত ধিক্—আমাদের পশুজন্মই ভাল! আমি আমার আমার ভাষায় ভগবানকে ডাকিয়া বলিলাম, "হে সর্ব্বশক্তিমান্! তোমার চরণপ্রান্তে অধম স্ত্রীজাতির জন্য কি একটুও স্থান নাই? তুমি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করিতে পার, তোমার অসীম ক্ষমতা, তবে কেন প্রভু লাঞ্ছিতা নারী জাতিকে সংসার হইতে চিরলুপ্ত করিয়া দাও না?"

পরদিন প্রাতে উঠিয়া ডালিকে আর দেখিতে পাই নাই। পরে শুনিলাম, সেই রাত্রেই সে বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছে; পথের লোককে পথ জিজ্ঞাসা করিয়া বালিগঞ্জে তাঁহার স্বামীর নিকট পৌঁছিয়াছে।

শ্রীগিরিবালা দেবী।

মাতৃপূজা

নামটী তাহার স্যামুয়েল ঘোষ—খৃষ্টান সে বড়ই গোঁড়া,
চেহারা নয় মন্দ নেহাৎ, কেবল ছিল একটু খোঁড়া।
পাদরী সাহেব বাস্‌তো ভালো, তাঁর কুঠিতেই তাহার বাসা,
কেউ ছিলনা তিন ভুবনে, যীশুই তাহার ভরসা আশা।
মাইনে করা বক্তা ছিল, মিঠার উপর স্বরটী চড়া,
কার্য্য তাহার আঁধার থেকে আলোয় আনার চেষ্টা করা।
চটালে সে চট্‌তোনাক, ধৈর্য্য ছিল তাহার কত!
জন্মাবধি ক্রুশের ব্যাথা আস্‌ছে সয়ে যীশুর মত।
বক্তৃতা তার শুনতো বা কে? ছড়িয়ে দিত পথের ধূলি,
আমরা ছিলাম শত্রু তাহার বিদ্যালয়ের ছাত্রগুলি।

কিন্তু আবার ফুলের লাগি যেতাম সবাই তাহার বাড়ী;
নিত্য দিত ফুলের তোড়া, ভাল সে যে বাসতো ভারি।
সেদিনে অর ঘরে দেখি, ক্রুসে যীশুর মূর্ত্তিখানি,
কাঁচ দিয়ে সব বাঁধাই করা 'জন' 'ম্যাথুয়ে'র সত্যবাণী।
কিন্তু ঘরের একটী ধারে—এ কার চিত্র? বিধবাটি,
হস্তে হরিনামের ঝোলা, কণ্ঠে মালা—হিন্দু খাঁটি!
সেদিন থেকে বিদ্রূপেতে বক্তৃতা তার দিতাম ঢেকে,
বক্তা যপেন রাত্রে মালা, জানিয়ে দিতাম লোককে ডেকে,
পেটের দায়ে দিনের বেলা খৃষ্টানীতে থাকেন বটে,
রাতের বেলা কৃষ্ণনামে ধর্ম্ম কর্ম্ম করাই ঘটে।

পাদরী সাহেব শুন্‌লো ক্রমে। ঘোষের ঘরে গিয়েই, তথা
দেখতে পেলে হিন্দু ছবি, যপের মালা, সত্য কথা।
বল্লে ডাকি, "হায় স্যামুয়েল, দায়াবলের * সঙ্গে প্রীতি?
খৃষ্টানের এই ঘরের মাঝে হিদেন হোমের ঘৃণ্য স্মৃতি?"
সবিনয়ে কয় স্যামুয়েল, "জননী মোর স্বর্গগতা,
পবিত্র তাঁর পুণ্যছবি হেথায় ছাড়া রাখবো কোথা?"
বিষম রোষে পাদরী বলে, "কাল্‌কে ছবি ফেলবে দূরে।
নইলে জেনো, বিধর্ম্মীদের নাইক ঠাঁই এ প্রেমের পুরে।"

স্যামুয়েল কয়, "দানব তুমি, যীশুর প্রেমের কি ধার ধারো?
ধর্ম্ম মাঝে গর্ব্ব এনে প্রেমকে কেন খর্ব্ব করো!
ছিলাম পিতৃ মাতৃ হারা, পালিত তাই তোমার কাছে,
তাহার লাগি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা আছেই আছে।
কিন্তু তোমার এই গোঁড়ামি সহ্য আমি করবোনাক,
মর্ম্মহারা ধর্ম্ম লয়ে খোসায় তুঁষে তুষ্ট থাক!
মাতা আমার ধর্ম্ম জেনো, মাতা আমার স্বর্গসমা,
সাহেব, তোমার ক্ষুদ্রতাকে পরম পিতা করুন ক্ষমা।"

তাহার পরে স্যামুয়েল ঘোস পাপ পুরীতে রইল না সে;
ক্ষুদ্র কুটীর করলে ভাড়া হিন্দুপাড়ার একটী পাশে।
মন্দির এবং মসজিদেতে ঢুকতো না সে,—করতো নতি,
বলতো, "যীশু বিশ্বরূপে কর দয়া আমার প্রতি।"
ঘরের মাঝে যীশুর ছবি যীশুর বাণী তেমনি আছে;—
আছে মায়ের চিত্রখানি গৌরবে তার মাথার কাছে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

---

* অর্থাৎ "ডেভিল" (ফরাসী ভাষায় Diable)—বাঙ্গালা বাইবেলে "দায়াবল" লেখা হয়।

হারাণী

(গল্প)

হিরণহাটের গোকুল মণ্ডল সামান্য খোড়ো ঘরে বাস করিয়া দু'বেলা শাক অন্ন খাইয়া বড়ছেলেটীকে যখন পাশের গ্রামের স্কুলে ইংরাজি পড়াইতে আরম্ভ করিল, তখন গ্রামের মাতব্বরেরা যে খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এমন নয়। জাতি-ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া ইংরাজি পড়িতে গেলে যতরকম দোষ জন্মিবার সম্ভাবনা সেগুলি দেখাইয়াও যখন এই "চাষার পো"কে ক্ষান্ত করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে বৃদ্ধবয়সে বেটার ভীমরতি ধরিয়াছে।

ছয় বৎসর পূর্ব্বে ওলাওঠার কৃপায় গোকুল মণ্ডলের স্ত্রী যখন হরিগোপাল এবং পাঁচুগোপাল দুটী পুত্রকে স্বামীর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া অজানা কোন এক দেশের উদ্দেশে প্রস্থান করিল, তখন অনেকেই তাহাকে মাত্র একচল্লিশ বৎসর বয়সে আবার নুতন "সংসার" করিবার উপদেশ দিয়াছিল। কিন্তু কি জানি কেন সে তাদের কথার মর্ম্মার্থ ভালরূপে গ্রহণ না করিয়া, ১৩ বৎসরের হরিগোপালের সঙ্গে পাশের গ্রামের দীনুমণ্ডলের প্রথম-পক্ষের অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা হারাণীর বিবাহ দিয়া ফেলিল। পুত্র হরিগোপাল এই বিবাহের তত্ত্ব সম্যক্ বুঝিতে না পারিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল। কিন্তু দুই এক দিন পরেই তার সে ভাব কাটিয়া গেল, ঠিক পূর্ব্বের মতই বহি সেলেট লইয়া স্কুলে যাইতে লাগিল। দীনু মণ্ডল প্রথম পক্ষের এই মাতৃহারা মেয়েটীকে আবর্জ্জনার ঝুড়ির মত যেদিন ফেলিয়া দিয়া গেল, সেদিন সে এই নিষ্কৃতির জন্য ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে করিতে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। তবে বিবাহের পরই মেয়ে "পর" হইয়া যায় এই মহাজন-বাক্যটী ভুলিল না।

হারাণী প্রথমতঃ বিবাহের নাম শুনিয়া আহ্লাদে নাচিয়া উঠিয়াছিল; শ্বশুরবাড়ীর সম্বন্ধে নানা রকম জল্পনা কল্পনাও আরম্ভ করিয়াছিল; সে বিশেষ ভাবে আনন্দিত হইয়াছিল বিমাতার কঠোর তত্ত্বাবধান হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায়। কিন্তু এখানে আসিয়াও যখন সেই সমান ওজনের গোবরের ঝুড়ি তাহাকে বহিতে হইল, তখন তার শিশুহৃদয়ের সমস্ত সুখকল্পনা কোথায় উড়িয়া গেল। ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, গোয়াল সাফ করা তাকে বাপের ঘরে যেমন করিতে হইত, এখানেও তেমনি করিতে হইল; অধিকন্তু শ্বশুরকে রান্নার উদ্যোগ করিয়া দিতে তার প্রাণান্ত হইত। বাপের ঘরে তবু খেলার সাথী মিলিত, এখানে আসিয়া খেলিবার সময় ছিল না। যদি বা একটু আধটু অবসর মিলিত তাহাও সাথীর অভাবে বৃথা হইত। সাথীর মধ্যে ১০ বৎসরের দেবর পাঁচুগোপাল; সে বিষম রাগী, মারা ধরা ভিন্ন তার কথাই ছিল না। সুতরাং তার ভয়ে হারাণী অস্থির থাকিত। যদি কখনও বরের সঙ্গে দুই একটী কথা বলিবার চেষ্টা করিত, বালকবর অমনি চোক রাঙ্গাইয়া বলিত, "এই! আমার সঙ্গে এখন কথা বলতে নেই।" হারাণীর ক্ষুদ্র মুখখানি মলিন হইয়া যাইত। বাপের বাড়ীতে গ্রামের পাচজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলিত; কিন্তু এখানে সে যে বউ; তাকে মাথায় ঘোমটা দিয়া থাকিতে হইবে, কারও সঙ্গে কথাবলা তার নিষেধ। সময় সময় এই সমস্ত অভাবনীয় ব্যাপার ভাবিতে ভাবিতে সে এতই উন্মনা হইয়া পড়িত যে দুই একবার ডাকিয়া তাহার সাড়াই পাওয়া যাইত না।

গোকুল মণ্ডল ক্রমে ছোট ছেলে পাঁচুগোপালকেও স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আসিল। কিন্তু অল্পদিন পরেই পাঁচুগোপাল, বেলা দশটায় মুড়ির বদলে পান্তা খাইয়া, মাঠে মাঠে ঘোড়ায় চাপিয়া বেড়ানর বদলে স্কুলের পাকা ঘরে আবদ্ধ থাকা কিছুতেই ভাল বোধ করিল না; তাই বাপের শাসন অগ্রাহ্য করিয়া সে স্কুল যাওয়া ত্যাগ করিল।

বাপও চাষবাস দেখিবার একজন লোক দরকার ভাবিয়া আর বেশী তাড়না করিল না। পাঁচুগোপাল এমনিভাবে "মুনীষদের" উপরওয়ালা হইয়া নিরাপদে সময় কাটাইতে আরম্ভ করিল। হরিগোপাল নিয়ম মত সকালবেলায় পড়ামুখস্থ করিয়া, বেলা দশটায় পান্তা খাইয়া বই বগলে স্কুলে যাইতে এবং বছরের পর বছর এক এক ক্লাসে উঠিতে লাগিল। এইরূপে ছয় বৎসর কাটিল।

২

সেবার গ্রামের সকলের যুগপৎ বিস্ময় ও ঈর্ষা জন্মাইয়া হরিগোপাল যখন দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া প্রোমোশন পাইল, তখন স্কুলের হেডমাষ্টার গোকুল মণ্ডলকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, এক বৎসর হরিগোপালকে বোর্ডিংএ রাখিতে হইবে, বাড়ী হইতে যাওয়া আসা করিলে পড়ার তত সুবিধা হয় না; ভাল রূপ পড়াশুনা করিলে তার বৃত্তি পাইবার আশা করা যাইতে পারে।—গোকুল মণ্ডল কিছুক্ষণ 'আম্তা আম্তা' করিয়া অবশেষে স্বীকৃত হইল। সমস্তদিন পরে সন্ধ্যার সময় যখন দেবু চাটুয্যের বাড়ী গিয়া হেডমাষ্টারের কথা বলিল এবং তৎসঙ্গে হরিগোপালের বোর্ডিংএ পাঠাইবার ব্যবস্থার স্থিরতাও জানাইল, তখন দেবুচাটুয্যের চক্ষুস্থির হইয়া গেল। স্কুল বোর্ডিংএ গেলে জাতিবিচার ত থাকেই না, অধিকন্তু ছেলে এমন "বাবু" হইয়া যায় যে বাপ্‌কে বাড়ীর চাকর বলিয়া ফেলে, এটা যখন খুব ভাল করিয়া তাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন গোকুল মণ্ডল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল, 'কি করব, হেডমাষ্টার কিছুতেই ছাড়লে না। আর নাকি হরিগোপালের জলপানি পাবার 'আশঙ্কা' আছে, তাই তার কথা এড়াতে পারলাম না।" অর্দ্ধেক রাত্রিতে বাড়ী আসিয়া সে শুইয়া পড়িল, কিন্তু সমস্ত রাত্রি মনে মনে ঐ কথাটার আলোচনা করিতে করিতে তার ভাল ঘুম হইল না।

এই ঘটনার ২।৩ দিন পরেই একদিন সকালে হরিগোপাল মায়ের আমলের ছোট টিনের বাক্সটিতে বইগুলি গুছাইয়া পুরিয়া, বাক্সের মধ্যে ক্ষারে কাচা কাপড় কয়খানির স্থানাভাব দেখিল। সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কাপড় কয়খানির ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভাবিতেছিল, এমন সময় হারাণী আসিয়া তার পিছনে দাঁড়াইল। এখন তাহার ১৩।১৪ বৎসর বয়স হইয়াছে। হরিগোপাল চুড়ির শব্দে তার আসা বুঝিতে পারিয়া, কাপড় কয়খানি তার দিকে বাড়াইয়া দিয়া কহিল, "বেশ করে ভাঁজ ক'রে দে ত; বাক্সের উপরেই বেঁধে নিই।"

হারাণী যেমন মুখ নত করিয়া সেই কাপড় লইতে গেল, অমনি তার চোখ হইতে একফোঁটা জল হরিগোপালের হাতে পড়িল। হরিগোপাল একটু চম্‌কিয়া উঠিয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল যে জল ফোঁটাটি সঙ্গীবিহীন নয়, তার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আরও অনেকগুলি নামিয়া আসিতেছে। অন্যদিন হইলে সে এ ব্যাপার হাসিয়া উড়াইয়া দিত; কিন্তু আজ তার নিজের মনটাও অন্যরকম ছিল। বোর্ডিংএ যাওয়ার এই নূতন উদ্যমের মধ্যেও যেন বুকের ভিতরটা মাঝে মাঝে টন টন্ করিয়া উঠিতেছিল।

এতদিন হারাণীর সম্বন্ধে হরিগোপাল কোন কথাই মনে স্থান দিত না। সমস্ত দিনটা অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর হারাণী যখন সন্ধ্যার একটু পরেই মেঝের উপর আঁচল বিছাইয়া ঘুমাইয়া পড়িত, তখন কতদিন হরিগোপাল কার্য্যোপলক্ষে আলো হাতে তার পাশ দিয়া যাইবার সময় তার সেই ক্লান্ত মুখখানি দেখিতে পাইত; কতদিন হয়ত, পাঁচুগোপালের বিনা কারণে প্রহারের পর রোরুদ্যমানা হারাণীর মুখখানি দেখিতে পাইত; কতদিন হয়ত স্কুল যাইবার সময় রান্নাঘরে খাইতে গিয়া, রান্নার সমস্তই বাকী দেখিয়া রাগে ফিরিয়া আসিবার সময় ভয়গ্রস্তা হারাণীর মুখখানি দেখিতে পাইত। কৈ, কখনও এমন ভাব ত তার মনে জাগে নাই! আজ তার মনে হইতে লাগিল, কেহ না বলিয়া দিলেও, এই হতভাগিনী বালিকা সমস্ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া কেবল তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

সে দাঁড়াইয়া হারাণীর চোখ দুটী মুছাইয়া দিল, কিন্তু

অশ্রুধারা যেন দ্বিগুণ বেগে বহিতে লাগিল। হরিগোপাল নিম্নস্বরে কহিল, "কেঁদ না হারাণী, আমি ত ফি শনিবারেই বাড়ী আস্‌ব।" হারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "তুমি যেওনা, গেলে আমি এখানে থাক্‌তে পারব না।"

যাহা হউক, বাক্স বিছানা বাড়ীর "মুনীষ" শিবু-কাকার মাথায় তুলিয়া দিয়া বিষণ্ণ মুখে হরিগোপাল বোর্ডিংএ চলিয়া গেল। প্রতি শনিবারেই বাড়ী আসিতে লাগিল; বৃহস্পতি ও শুক্র এই দুইটী দিন বড় উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়া কাটিত। শনিবার সন্ধ্যার আগে গ্রামের ধারেই বামনী পুকুরের ঘাটে কলসী কাখে হারাণীকে দূর হইতে দেখিয়া তার সমস্ত শরীরটা যেন পুলকে নাচিয়া উঠিত, এবং সেই সঙ্গে সেই ঘোমটা ঢাকা মুখখানির আনন্দের আতিশয্যও সে বেশ অনুভব করিতে পারিত।

সমস্ত দিনটা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়াও শনি রবিবার রাত্রিতে হারাণীর চোখে যখন ঘুমের লেশমাত্র দেখা যাইত না, তখন হরিগোপাল ভাবিত, কেমন করিয়া এই দুঃখিনী বালিকা এমন নিদ্রাজয়িনী হইয়া উঠিল? সন্ধ্যা হইতে না হইতে যে-হারাণী মেঝেয় আঁচল বিছাইয়া এমন ঘুম ঘুমাইত যে পাচুগোপালের তীব্র কঠিন কণ্ঠস্বরেও নিতান্ত পাঁচমিনিট গত না হইলে চেতনা পাইত না, সে কেমন করিয়া এমন হইল? যদি কখনও হরিগোপাল তাকে ঘুমাইবার জন্য বলিত, সে একটু সলজ্জ হাসিয়া বলিত, "মরুকগে, দুটো রাতই ত, কিছু কষ্ট হবে না। কতক্ষণই বা ঘুমোব আর? আর যে রাত নেই, এখন ঘুমুলে ভোরে জাগতে পারব না, বাবা বকবেন।" এমনি ভাবে সন্ধ্যা হইতে "রাত নাই রাত নাই" সুরু করিয়া সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিত। রবিবারে সে যখন নিপুণ হস্তে বাড়ীর অন্যান্য কায সারিয়া, তার বাপের দেওয়া বড় ঘড়াটিকে কক্ষে লইয়া স্নানে বাহির হইত, তখন পাড়ার মেয়েরা তার এই এত-সকাল কায সারার জন্য অবাক হইয়া যাইত। দুপুর বেলা যখন শ্বশুর দেবরের সঙ্গে স্বামীকে খাইতে দিয়া রান্নাঘরের মধ্যে হইতে চাহিয়া থাকিত, তখন তার অতৃপ্ত বাসনা-মাখা চোখ দুটীর তৃপ্তি কিছুতেই হইত না। রাত্রিতে খাওয়ার পর কোন দিন হয়ত হরিগোপাল বিছানায় বসিয়া কপট মনোযোগ সহকারে পড়িতে আরম্ভ করিত। হারাণী বিছানার একপাশে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিত; যেই হরিগোপাল বইখানি রাখিয়া বিছানায় শুইত, হারাণী পাশ ফিরিয়া হাসিয়া ফেলিত। সোমবারে সকাল বেলা যখন এই দুঃখিনী বালিকার সমস্ত উৎসাহটুকু নষ্ট করিয়া দিয়া হরিগোপাল চলিয়া যাইত, সেদিন তার কাযে কুড়েমির জন্য হয়ত পাঁচুগোপালের প্রহার পর্য্যন্ত খাইতে হইত।

দুঃখের বিষয় হরিগোপালের জলপানি পাইবার "আশঙ্কা" থাকা সত্ত্বেও সে জলপানি পাইল না। এই জলপানি না পাওয়ার আর কারণ যাহাই থাকুক, পাঁচুগোপাল স্থির করিল যে এত "বরটান" থাকিলে কেউ জলপানি পাইতে পারে না।

পাস করিয়া হরিগোপাল ধরিয়া বসিল, সে বাঁকীপুরে গিয়া ডাক্তারী পড়িবে। ব্যয়ের হিসাব শুনিয়া গোকুল মণ্ডল প্রথমটা পশ্চাৎপদ হইয়াছিল। অবশেষে ভবিষ্যতের আশা কুহকে ভুলিয়া, সে ব্যয়ভার সে স্বীকার করিল। শুভদিনে হরিগোপাল বাক্স বিছানা বাঁধিয়া, সজলনেত্রে হারাণীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, বাপকে প্রণাম করিয়া, বাঁকীপুর চলিয়া গেল।

৩

৺পূজার মাত্র ১২ দিন বন্ধে, ৬৵০ রেল ভাড়া দিয়া হরিগোপালের বাড়ী আসার প্রস্তাব গোকুল মণ্ডলের কিছুতেই ভাল বোধ হইল না; হরিগোপাল রাহা খরচের টাকার জন্য বারম্বার তাগিদ দিলেও টাকা পাঠাইবার কোন ব্যবস্থাই সে করিল না। চতুর্থী পূজার দিন হরিগোপাল কিন্তু মনিঅর্ডার যোগে ১০৲ পাইল এবং অবিলম্বে বাড়ী রওনা হইয়া পড়িল।

মহাষ্টমীর দিন তিনক্রোশ রাস্তা, জল কাদা ভাঙ্গিয়া, একহাতে 'মেটেরি মেডিকা' অপর হাতে জুতা লইয়া হরিগোপাল যাই বাড়ীর কাছে পৌছিল, অমনি বাড়ীর

মধ্য হইতে শুনিতে পাইল, পাঁচুগোপাল খুব রাগান্বিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"না পিসিমা, তুমি ওকে ছেড়ে দাও, আজ আমি এই ঝাঁটার ঘায়েই টাকা বা'র করব।"

হরিগোপাল একলাফে দরজায় উঠিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। হারাণী উঠানে পড়িয়া কাঁদিতেছে, অদূরে ঝাঁটা হাতে পাঁচুগোপাল এবং ও পাড়ার পিসিমা। দেখিয়াই সে রাগে কাঁপিয়া উঠিল। সে যেন কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বড় ঘরের দুয়ারে হুঁকার শব্দে বাপের দিকে নজর পড়ায় কথাটা চাপিয়া ফেলিল। উঠানে পতিতা হারাণীর হাত ধরিয়া উঠাইয়া তাহাকে ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরপদে বাহিরে আসিয়া বাপকে প্রণাম করিল।

ছেলেকে এরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখিয়া গোকুল মণ্ডল এমন আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল যে, তার মুখ হইতে আশীর্ব্বাদটুকুও বাহির হইল না। ইত্যবসরে পাঁচুগোপাল "যে আসবে সেই আসুক, টাকা আমি চাইই চাই" ইত্যাদি বলিতে বলিতে, একবার পিছন দিকে নেত্রপাত করিয়া, বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

এতক্ষণে গোকুল মণ্ডলের আড়ষ্ট ভাবটা যেন কাটিয়া আসিল। "শরীরটা বেশ ভাল আছে ত রে হরি? আমি ত বাড়ী আস্তে নিষেধ করেছিলাম—"

হরিগোপাল সে কথা কাণে না তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি বাবা?"

গোকুল বামহাতটা একবার মাথায় বুলাইয়া, ডান হাতের হুঁকায় আর একটা দম দিয়া কহিল, "তা—ওর দোষও ত কম নয়। এক আধটা নয়, দশ দশটা টাকা! আভাগীর বেটী টাকা নিয়ে করলে কি?"

হরিগোপাল তীব্র কণ্ঠে কহিল, "সে যাই হোক্, আপনি নিজে হাতে ওকে সাজা দিলেন না কেন? পেঁচোকে দিয়ে অমন ভাবে ঝাঁটাপেটা করানোটা কি আপনার উচিত?"

গোকুল মণ্ডল আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল, "হাঁ, তা ত বটে। কিন্তু আমি শ্বশুর হয়ে কেমন করে ওর গায়ে হাত তুলি বল্ দেখি? টাকাগুলো নিয়ে করলে কি!"

হরিগোপাল আরও উচ্চ কণ্ঠে কি যেন বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ হারাণী ঘর হইতে বাহির হইয়া, হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল।

রাত্রি ১১টার সময় হরিগোপাল বিছানার উপর হারাণীর এলান তপ্ত দেহটা বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "হারু! কেন এমন কায করলে?"

হারাণী সোহাগে গলিয়া কহিল, "নইলে তুমি যে বাড়ী আস্তে পেতে না! পূজোর দিন তোমাকে না দেখে আমি কি করে থাক্‌তাম? বাবা তোমায় আসতে বারণ করেছেন শুনে আমি যখন মজুমদারদের ছোট ঠাকুরঝির কাছে কাঁদাকাটা করছিলাম, তখন সে বল্লে যে তার ভাইকে ১০৵০ দিলে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবে, তা হলে তোমার বাড়ী আসা হবে।"

হরিগোপাল কোন কথা না বলিয়া, হারাণীকে বুকে বাঁধিয়া তপ্ত অশ্রুজলে তাহার কপোলখানি প্লাবিত করিয়া দিল।

পরদিন প্রাতে হারাণী অথবা হরিগোপাল, কাহাকেও বাড়ীতে দেখা গেল না। নানাস্থানে অনুসন্ধান চলিল; অবশেষে জানা গেল, ষ্টেশনের এক বাবুর নিকট হাতের আংটি বিক্রয় করিয়া, স্ত্রীকে লইয়া, হরিগোপাল দানাপুর চলিয়া গিয়াছে।

তিন মাস পরে গোকুল মণ্ডলের নামে দশ টাকার এক মণিঅর্ডার ও একখানি পোষ্ট কার্ড আসিল। তাহা পাঠে জানা গেল, হরিগোপাল রেলে চাকরি পাইয়া, সম্প্রতি জামুই ষ্টেশনের ছোটবাবু স্বরূপ বদলি হইয়া আসিয়াছে। বেতন ২৫৲, উপরিও কিছু আছে। বৈদ্যনাথ ধাম খুব নিকটে, পিতা যদি তীর্থদর্শনের মানস করেন, লিখিলে রাহা খরচ পাঠাইয়া দিবে। শ্রীচরণে "উভয়ের" প্রণাম জানাইয়া, "ও-বাটীর কুশল সংবাদ" প্রার্থনা করিয়াছে।

শ্রীনবনীধর মিত্র।

শোকের জ্বালা

ফুলের শোকে শাখীর হিয়ায় যে সুর বেজে উঠ্‌ছে ব্যথায়—
সেই রাগিণী মর্ম্মরিয়া উদাস-বায়ে ছোটে;
কানন-কোলে হাজার পাতায় দীর্ঘশ্বাসের লহর জাগায়,
নদীর দোলায় সেই বেদনার কাঁদন এসে লোটে।
হৃদয়-বাগান শূন্য করে' সাধের কুসুম পড়্‌ল ঝরে,
দমকা বাতাস এক নিমেষে সব সুষমা হরে,—
অন্তহারা ব্যথার ভরে অন্তর যে গুম্‌রে মরে—
স্মৃতির তটে সকল কাঁদন্‌ আছ্‌ড়ে এসে পড়ে।
যে কালো দাগ বাদল-রাতে রয়গো আঁকা গগন-পাতে
কাল এসে তা দেয় যে মুছে, পরায় আলোর মালা;
সেই রেখাটী শোকের সনে নিবিড় হয়ে গাঁথ্‌ল মনে
এই জীবনে থাক্‌ না যে তা, কাল শুধু দেয় জ্বালা।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

নূতন হাওয়া

(উভয় ভূমিকায় শ্রীকালীপ্রসন্ন পাইন)

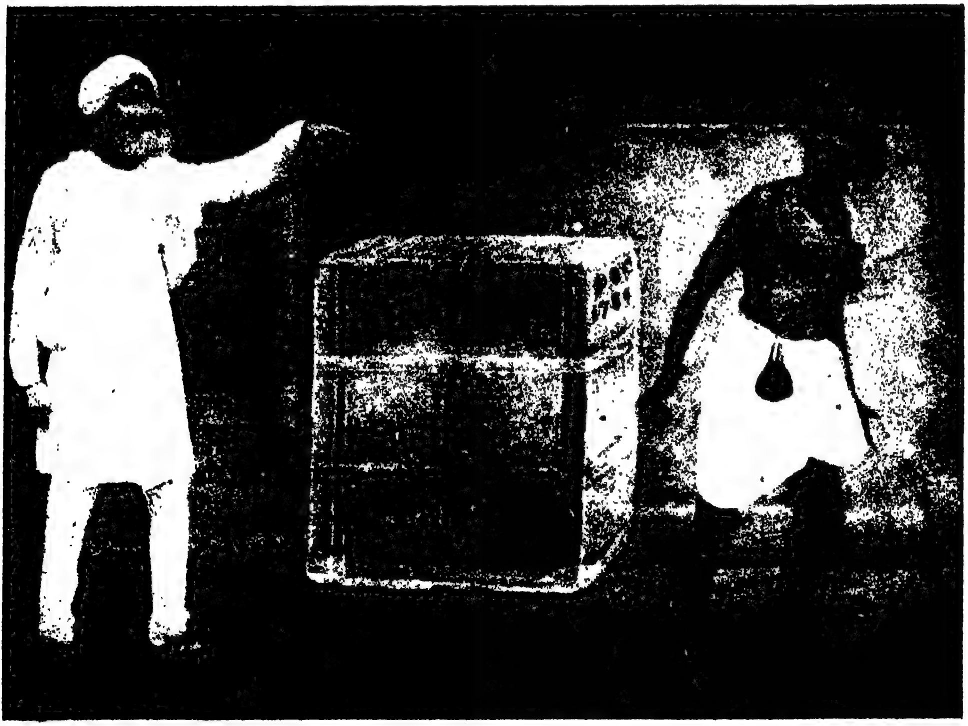

১। খোট্টা জমাদার ও উড়িয়া মুটিয়া

জমাদার। এ ভাইয়া, আও আও, গাঁঠ উঠাও।

মুটিয়া। বিলাতী কাপড় গাঁঠ অছি, সে মু উঠাইবনি

২। খুড়া মহাশয় ও ভ্রাতুষ্পুত্র

খুড়া। মুখ দিয়ে ভক ভক করে সিগারেটের গন্ধ বেরুচ্ছে- এই বয়সে সিগারেট খেতে শিখ্‌লি পাজি শূয়ার!

ভাইপো। আজ্ঞে, বিলাতী সিগারেট ত খাইনি, আসল গান্ধি মার্কা।

৩। জমিদার ও চাঁদা আদায়কারী

চাদা আদায়কারী। স্বরাজ ফণ্ডে ১০০০৲ চাঁদা দিয়েছেন, আর সাহেবের গার্ডেন পার্টিতে মোটে ৫০৲!

জমিদার। হ্যাঁ বাপু, এই ঢের হয়েছে; দেবতা বুঝে ত নৈবিদ্যি!

৪। উকীল ও অসহযোগী মাড়োয়ারী বাবু

পুলিস কোর্টের উকীল। বাবু-সাব, হামকো এন্‌গেজ করুন, হাম আপকো ডিফেণ্ড করেগা, তিন তুড়িতে আপনার মোকর্দ্দমা উড়ায় দেগা।

মাড়োয়ারী বাবু। (পরিষ্কার বাঙ্গলায়) আমাকে ডিফেন্স করবেন না মশাই; আমরা গান্ধী মহারাজের শিষ্য আমাদের জেলই ভাল।

খদ্দর

আজি এই শুভদিনে শুচি করি অন্তর
হে ভারত লহ লহ "খদ্দর" মন্তর।
ঘরে বোনা খদ্দর, চরকার সূত্রের
চিহ্ন এ ভারতের সাম্য ও মৈত্রের!

খদ্দর লাজহারী-নারায়ণ নগ্নের,
খদ্দর পার-তরী কড়িহীন মগ্নের।
নিঃস্ব ও অলসের রোজগার খদ্দর,
এই বীজ-মন্তর, হে ইতর ভদ্দর!

খদ্দর জাতি মান, ধর্ম্ম ও কল্যাণ,
সাম্যের এ নিশান অক্ষত অম্লান।
এ যে মহা মহিমার গৌরব সম্মান,
এ যে বড় আপনার, অমৃতের সন্তান।

যুগে যুগে নব বাণী এই ভূমে বিশ্বের
উঠেছে রে কণ্ঠেতে এক এক নিঃস্বের!
কভু দয়া, কভু প্রেম, কভু মৃদু ভর্ৎসন
আজ সেই দেশে পুনঃ খদ্দর-দর্শন।

খদ্দর এস আজি দেশবাসী-নিষ্ঠায়,
জাগ চির ভারতের ইতিহাস পৃষ্ঠায়,
উর ক্রিয়া উৎসবে ধনী আর দুঃখীর,
এস চির ভরসায় আজি মহালক্ষ্মীর।

থাক সবে কর্ম্মেতে মুর্ত্তির মঙ্গল,
অশরণে দাও শুভ সান্ত্বনা সম্বল,
আলোকিয়া পৃথিবী ও উজলিয়া অন্তর
এস নব ওঙ্কার খদ্দর-মন্তর।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

নৈরাশ্য

মালা গেঁথে আর কি হবে বল না?
মালিকা বিলাস হয়েছে শেষ।
কি হবে আমার ফুলের দোলনা,
নিয়ে এস সখি যোগিনী বেশ।
ছিঁড়ে ফেলে দাও লীলা-শতদল,
দ্রাক্ষার বনে জ্বালাও অনল
মল্লীকুঞ্জে হান গো কুঠার
রেখনাক তার সুষমা-লেশ।

পিঞ্জর-দ্বার দাও খুলে দাও,
উড়ে যাক মোর শারিকা শুক,
প্রিয় বঁধু যদি হলো অকরুণ,
কুসুম শয়নে কি আছে সুখ?
খুলে নাও ওগো হেম আভরণ,
ধুয়ে দাও মোর রাঙানো চরণ,
মুছে দাও সখি নয়নাঞ্জন
মুড়াইয়া দাও মাথার কেশ।

শ্রীকালিদাস রায়

পূজারিণী

দীন দেউলের হে দেব-দয়িত,
আমি হব চির-সেবিকা তব,
তব বেদিকার ধূলি মলা আমি
মাথার চিকুরে মুছিয়া লব।
দীনের ছদ্মে রয়েছ গোপনে,
সে কথা আমি যে জেনেছি স্বপনে,
সারা নিশি ভাঙা দেউল সোপানে
আঁচল বিছায়ে শুইয়া র'ব।

নাহি ও দেউলে ভাস্কর কলা
জলে না শীর্ষে কনক চূড়া
অশথের মূল বেড়িয়া বেড়িয়া
তোরণ স্তম্ভ করেছে গুঁড়া।
আসিনিক আমি দেউলে পূজিতে,
এসেছি দেবতা তোমারে খুঁজিতে,
করিব প্রাণের অর্ঘ্যরাজিতে
জীর্ণ দেউলে পুনর্নব।

শ্রীকালিদাস

ভারতীয়-জীবনে ইস্‌লামের শিক্ষা

আজ ভারতে হিন্দু ও মোস্‌লেম এই দুই বৃহৎ জাতির মিশ্রণের প্রশ্ন চিন্তাশীল রাজনৈতিকের চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। অথচ ইস্‌লামের সভ্যতা ও শিক্ষার ইতিহাস দেশীয় ভাষায় এত বিরল যে, অন্য সম্প্রদায়ের কথা দূরে থাকুক, মোসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিকেই সে ইতিহাসের সহিত পরিচিত দেখা যায়। সুতরাং মোসলেম জাতির অতীত গৌরবোজ্জ্বল যুগে জগতের জ্ঞান ও সভ্যতার ভাণ্ডারে তাহাদের অক্ষয় দান ও প্রাচীন কীর্ত্তি কাহিনী সকল অন্য সম্প্রদায়ের আলোচনার বিষয় হইলে, ভারতের জাতীয় জীবন গঠনে এতদুভয় জাতির যে বিশেষত্ব এবং পরস্পরের নিকট যাহা নিতান্তই গ্রহণীয় তাহার নির্দ্ধারণের সহায়তা করিবে। এক জাতি অন্য জাতির উৎকৃষ্ট বস্তু সকল গ্রহণ দ্বারা নিজেদের ভিতরের ক্ষুদ্রতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া, একে অন্যের সম্বন্ধে পরিচয়-হীনতা হেতু সঞ্চিত কুসংস্কার বর্জ্জন করিলে কেবল ভারতে কেন, জগতে এক উচ্চতর মিলনের ভূমি নির্ম্মিত হইবে। আজ যাহাকে ইস্‌লাম-প্রমুখতা (Pan-Islamism) বলিয়া রাজনীতিবিদ্‌গণ বিভীষিকার সৃষ্টি করিতেছেন, তাহার ভীষণতাও দূরীভূত হইবে। ডাঃ খোদাবক্স সাহেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইস্‌লামীয় ইতিহাসের বক্তৃতার ভূমিকায় এই আশা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

"Itwill help forward the cause, so dear to us all;—mutual understanding, and mutual toleration, the first necessay step to that higher unity, which is at once the dream of the poet, the fervent prayer of the philosopher, the hope [illegible] the rising generation, and the true destiny of India."

ইহা যে কেবল কবি-কল্পনা (dream of the poet) নয়, এবং ভারতে উচ্চ মিলনের স্থান গঠিত হইবার পক্ষে হিন্দু মোস্‌লেমের মধ্যে প্রীতি বন্ধন এবং মিলনসূত্র গ্রথিত করা যে সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন, তাহা ভারতের সৌভাগ্যগুণে অজ্ঞানী গুণী সকল শ্রেণীর লোক এক সুরে ঘোষণা করিতেছেন। ইহা কেবলমাত্র একটা রাজনীতিক কায গুছাইবার বুদ্ধি প্রসূত নয়, কিন্তু ইহার ভিতরে মঙ্গলময় গূঢ় সত্য নিহিত রহিয়াছে। যে মোস্‌লেম জাতি সহস্র বৎসরাধিককাল এদেশের সঙ্গে সংসৃষ্ট রহিয়াছেন, যে মোসলেমগণ ভারতীয় মোসলেম বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা এদেশের হিন্দু ও অন্যান্য জাতির সহিত যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়াছেন তাহার উৎকর্ষসাধন ভিন্ন কেবল ভারতের কেন, জগতের কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে না। আরব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দান সাম্যবাদ। আরব জাতির ভিতর হইতে সর্ব্বপ্রথম বিরাট্ প্রজাতন্ত্র-শাসন-প্রণালী উদ্ভূত হয়। পৃথিবীর সর্ব্বশেষ বৃহৎ সাম্রাজ্য মধ্যে মোসলেমদিগের দ্বারা স্থাপিত সুবিস্তৃত ও সুবিন্যস্ত রাজ্যই শ্রেষ্ঠ রাজ্য এবং এত বড় রাজ্যের পতনের ও দুর্ব্বলতার কারণ সমূহ জগতের ইতিহাসে অতি স্পষ্টরূপে অঙ্কিত রহিয়াছে। যে অভাব ভারতের চিরদুর্ব্বলতার কারণ, যে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা ভারতীয় রাজনীতিকগণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই, সে সাম্যবাদের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠায় মোসলেম জাতি সফলতা লাভ করিয়া তাঁহাদের অপরাজিত তরবারি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে অব্যাহত ভাবে সঞ্চালিত করিয়া গিয়াছেন। মোসলেমগণের প্রতিষ্ঠিত শাসনপদ্ধতি তাঁহাদের নিজস্ব সম্পত্তি। ইহা তাঁহাদের স্বীয় বুদ্ধি কৌশলে উদ্ভাবিত যন্ত্র—কাহারও নিকট হইতে ধার করা সম্পদ নহে, ইহাই সে সভ্যতার বিশেষ গৌরব। যে যে কারণে গ্রীসের পতন ঘটিল, যে কারণগুলি রোমান রাজ্যের ধ্বংসের

মূলে বর্ত্তমান ছিল, সেইরূপ কারণ ইসলামের রাজগৌরব ও রাজ্য সমূলে নাশের মূলেও যে কার্য্য করিয়াছে এবং সে নিমিত্ত ইস্লাম আজ এত হীনবল, ইহাও ভারতে হিন্দু মোসলেমের জাতীয়তা গঠনে উভয়জাতির স্মরণ রাখা আবশ্যক। জাতির জীবনে ও চরিত্রে বিলাসিতা প্রভাব-বিস্তার করিলে সে জাতি হীনবীর্য্য ও হৃতবল হইয়া অবনত ও পতিত হইবে, এ নিয়মের ব্যতিক্রম মোসলমান জাতির মধ্যেও হয় নাই। জাতীয় নীতির প্রতি দৃষ্টিহীন রাজনীতি, অস্থায়ী রাজ্যের ভিত্তিভূমি মাত্র নির্ম্মাণ করে। যে ধর্ম্মনিষ্ঠা ইস্লামের মানসিক ও নৈতিক শক্তির মূলে থাকিয়া তাহার ক্ষাত্র-বীর্য্যকে এমন অপরাজেয় করিয়া তুলিয়াছিল, বিলাসিতার আবিলতায় যখন তাহা পঙ্কিল হইয়া উঠিল, কি ডামস্কাসে, কি বোগদাদে, কি দিল্লীতে, কি কর্ডোভায়, তখনই ইস্লামের উজ্জল নক্ষত্র গগন হইতে বিচ্যুত হইল। হালাম তাঁহার Middle Ages গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"In the friutful valleys of Damascus and Bassora, the Arabs of the desert forgot their abstemious habits."

মোসলমান ইতিহাসের অপর শিক্ষা—কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতার বিষময় ফল। প্রত্যেক জাতি আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে স্ব স্ব উন্নতিসাধন করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে প্রকৃতি তাহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিলে জাতির মৃত্যু ও অবনতিও নিশ্চয় ও অনিবার্য্য। সাহিত্যিক, দার্শনিক ও রাজনীতিবিৎ এ বিষয়ে একমত। প্রত্যেক জাতির সাহিত্য তাহার দেশের ও পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির প্রভাব দ্বারা বহুল পরিমাণে গঠিত। প্রত্যেক জাতির রাজনৈতিক জীবনেও প্রকৃতিগত প্রভাব প্রবলভাবে কার্য্য করে। কিন্তু রাজনীতিবিদ্‌গণ এখনও সে বাহিরের প্রভাবের শ্রেণীবিভাগ করিতে পারেন নাই। যাহা কোন জাতির পতনের মূল, তাহা হইতেও সে জাতি কিয়ৎকালের জন্য শক্তিলাভ করিতে পারে—ক্রুসেড যুদ্ধের উন্মাদনায় তাহার প্রমাণ। কিন্তু পরিণামে তাহা জাতীয় শান্তির কারণ না হইয়া শক্তিহীনতা ও পতনের কারণ হয়। সৈয়দ আমির আলি তাঁহার History of the Saracens গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"Although each community must work out its regeneration according to its individual genius, yet none can afford to wrap itself in the mantle of a dead Past without the fatal certainty of extinction."

ভারতের ইতিহাসে যেমন, ইস্লাম জাতির ইতিহাসে তেমনি, প্রাচীনতার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবার অনুরাগের ফল—জাতীয় জীবনের দুর্গতি।

ইসলামের সভ্যতা ও জ্ঞানের আলোচনায় এ কয়েকটী ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সে জাতির প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইলে আমাদের মোস্লেম চরিত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

এসিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমে যে দেশে সভ্যতার বীজ অঙ্কুরিত হয়, যে আরবভূমি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের জন্মস্থান, সে দেশের সহিত ভারতের সম্বন্ধ যে-জগতের বর্ত্তমান সভ্যদেশ সমূহ অপেক্ষা নিকটতর ও ঘনিষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ নাই। যে আরব জাতি এদেশে স্বাধিকার স্থাপনের পূর্ব্ব হইতে ভারতের উৎপন্ন বাণিজ্য-সম্ভার পাশ্চাত্য দেশে লইয়া যাইত, যে জাতি ভারতের জ্ঞানের এক্‌াংশ ইউরোপ খণ্ডে প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, ইউরোপের সভ্যজাতিসঙ্ঘ সে দেশের প্রতি কটাক্ষপাত ও শ্রদ্ধাহীনতা প্রকাশ করিলেও ভারতবর্ষ সে দেশকে সমাদর ও শ্রদ্ধাদান না করিয়া পারে না। পশ্চিমের সভ্যতাভিমানী জাতিগণ প্রাচ্যদেশ সমূহের বহু শিক্ষণীয় বিষয়কে ঘৃণ্য ও হেয় মনে করিলেও, এসিয়া খণ্ডের প্রাচীনত্ব ও নীতি ধর্ম্মের মাহাত্ম্য একদিন সভ্যজগৎকে স্বীকার করিতেই হইবে। ইউরোপের ক্ষুদ্রমনা লেখকগণ মোস্লেম ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বা প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি [illegible] না পারিয়া, ঈশ্বরের বিধানে প্রত্যেক ধর্ম্মের উদ্ভব

ও বিস্তৃতির যে বিশেষ হেতু আছে তাহা ভুলিয়া গিয়া, প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদকে false prophet (কৃত্রিম মহাপুরুষ) প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছেন। এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের স্থায় মোসলমান-ভারতের ইতিহাস-লেখকও এরূপ শব্দ ব্যবহার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। যে ডাঃ ওয়েলের গ্রন্থের অনুবাদ খোদাবক্স সাহেব করিয়াছেন, সেই ডাক্তার ওয়েলের প্রকাশিত মত সকল ইসলামের প্রেরিত পুরুষের চরিত্রের উপরে বিষম আঘাত করিয়াছে। সেই অনূদিত গ্রন্থের একস্থানে লিখিত আছে—

"Even before his flight to Medina Mahammad had fallen from the path of truth and rectitude." যদিও ডাঃ খোদাবক্স সাহেব ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"I must not, however, omit to mention that I do not at all agree with some of Dr. Weil's observations regarding the Prophet." তবুও এমন পুস্তকের ভিতরের ভাব, ছাত্র ও পাঠকের মনে ইসলামের সম্বন্ধে একবার যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিবে, তাহার অপনয়ন করা সুকঠিন হইবে।

যাহা হউক, প্রেরিত পুরুষের চরিত্রের অতুল গৌরব প্রাচ্যভাগের বহু মনস্বী উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। যে ধর্ম্মের জয়পতাকা এটলাণ্টিক হইতে ভারত সাগর পর্য্যন্ত উড্ডীন হইয়াছিল, সে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তককে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা বিদ্বেষ ও অজ্ঞতামূলক। ভারতবাসীর উদার ধর্ম্মভাবাপন্ন হৃদয়ে সে ভাব স্থান পাইতে পারে না।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ রায়।

সেকালের পল্লীচিত্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মাঘ মাস, বসন্তকাল, আজ যেন প্রকৃতি দেবী আকাশে চুল এলো করিয়া দিয়া, মাথায় হাতে পায়ে শরীরে নানারকমের বনফুল জড়াইয়া, বাতাস ও সূর্য্য কিরণের ভিতর দিয়া গাছ পালা তরুলতা পশুপক্ষী নরনারী প্রভৃতি সকলকে নবীন শক্তি, নবীন জীবন দিতেছেন। সেই নবীন শক্তি ও নবীন জীবন পাইয়া দিক সকল যেন নাচিয়া উঠিতেছে। বৃক্ষ সকল পুষ্পবনে, সরোবর পদ্মে পূর্ণ। মালতী, মল্লিকা, পদ্ম, করবী, কেতকী, কুন্দ, বকুল, চম্পক, অশোক, শিরীষ, কি[illegible] প্রভৃতি মনোহর বৃক্ষে ফুল ফুটিয়াছে। তৃণময় স্থানে বিবিধ পুষ্প পতিত হওয়াতে যেন চিত্রিত কম্বলে আস্তীর্ণ রহিয়াছে। বায়ু বিবিধ রসাস্বাদনে পুলকিত হইয়া যেন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে, বন হইতে বনান্তরে প্রবাহিত হইতেছে,—ভ্রমরগণ গুণ গুণ স্বরে তাহার অনুসরণ করিতেছে। এই সময়ে শ্রীপঞ্চমী; বাড়ী বাড়ী ছেলেদের মধ্যে ভারি আনন্দ। কাল ৺সরস্বতী পূজা, আজ আমের বোল, যবের শিষ, দ্রোণফুল প্রভৃতি নানাবিধ শ্বেতপুষ্প আহরণ করিতে হইবে। বিকালে ছেলেরা দলে দলে মাঠের দিকে চলিয়াছে। তখন অপরাহ্ণ, রক্তাভ সূর্য্যের কিরণ পুষ্করিণী-জলে পড়িয়াছে, যেন প্রতি ঢেউ কত হীরা মাণিক লইয়া খেলা করিতেছে; গ্রামের মেয়েরা কলসী কক্ষে লইয়া জল আনিতে আসিয়াছে, বাতাস তাদের সঙ্গে রঙ্গ করিবার জন্ত ছুটিয়াছে; পাড়ের তালগাছগুলা

একস্বরে সর সর বলিয়া বাতাসকে যেন নিবারণ করিতেছে। ছেলেরা আঁকাবাঁকা পথ দিয়া মাঠের দিকে চলিয়াছে। পথের দুই দিকে নীরব ছায়া শুইয়া আছে, গাছের পাতা তাহাকে বীজন করিতেছে। আকাশে পূরবী গীতি ছড়িয়া পড়িয়াছে। বাতাস আমের বোলের গন্ধের নেশায় ভরপুর হইয়া তাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে। পাশের বাগানে কোকিলগণ আমের বোলের মধুপানে উন্মত্ত হইয়া উল্লসিত হৃদয়ে মধুর রবে গগনতলে অমৃত ঢালিয়া দিতেছে। পাপিয়ার সুমধুর স্বরে দিক্‌সকল তরঙ্গিত; পথে শিরীষ, বকুল ফুল ফুটিয়াছে। দুই ধারে কোথাও বন, কোথাও বাড়ী, কোথাও বেড়া দেওয়া বাগান। বনফুলের গন্ধ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাড়ীর মেয়েরা ঘরের কায সারিয়া কেহ কেহ প্রাঙ্গণে দাড়াইয়া আনমনে অনন্তের আরতির ঘটা দেখিতেছে। বেড়া দেওয়া বাগানে বাঁশ, তেঁতুল, আমগাছ, কোথাও বা অশোক গাছ প্রবালের ন্যায় রাঙ্গা ফুল ধরিয়া, লোকের মনোরঞ্জন করিতেছে। এই রূপে কত কি দেখিতে দেখিতে ছেলেরা মাঠে গিয়া পড়িত। মাঠে তখন গোধূলির ধূসর আলো পড়িয়াছে। যব মটর প্রভৃতির ক্ষেতের শ্যাম শোভায় ঐ আলো পড়িয়া বড়ই সুন্দর হইয়াছে। এইরূপে তাহারা ক্ষেত হইতে যবের শিষ ও নানাস্থান হইতে নানাবিধ ফুল ও আম্রমুকুল সংগ্রহ করিয়া, মটর ক্ষেত হইতে প্রচুর মটরগাছ তুলিয়া, গোষ্ঠে প্রত্যাবর্ত্তনশীল ধেনুগণের সহিত শ্রান্তপদে তাহারাও বাড়ী ফিরিয়া আসিত। তখন রজনী নামিয়া আসিতেছে দেখিয়া পাখীরাও নানাবিধ শব্দে নিজ নিজ বাসায় ফিরিতেছে। পূজার দিনে বৈকালে ঐ মটর গাছে আগুন দিয়া অগ্নিপক্ক শুঁটির মধ্যস্থ মটর বালকেরা সকলে মিলিয়া বড়ই আনন্দের সহিত খাইত। ইহাকে "হড়া পোড়া" বলে। সময়ে সময়ে মাত্রা এত বেশী হইত যে উহার আগুনে ঘরেও আগুন লাগিত। গ্রামের উত্তরভাগে কয়েকঘর সিংহদের বসতি, একবার হড়পোড়ায় আগুনে তাঁহাদের ঘর পুড়িয়া যায়; সেই জন্য আজিও "হড়া পোড়া সিংহ" বলিয়া তাঁহাদের খ্যাতি আছে। সরস্বতী পূজার দিন প্রাতে দোয়াত ধুইবার ধুম পড়িয়া যাইত। কাঠের ছোট গাড়ীর ভিতর দোয়াত বসাইয়া বালকেরা দলে দলে "গলার গজমতি মুক্তার হার, দাও মা সরস্বতী বিদ্যার ভার" ইত্যাদি গাইতে গাইতে দোয়াত ধুইয়া বাড়ী ফিরিত। সেদিন তাহারা ভাত খাইত না।

ফাল্গুন মাসে দোল, তখন গ্রামে খুব ধুম। সিংহ মহাশয়দের দোল, পূর্ণিমাতে হইত। ঘোষ মহাশয়দের দোল সপ্তমীতে হইত; এক গোয়ালা বাড়ী রামনবমীর দোল হইত। সিংহ মহাশয়দের দোলমঞ্চ ছিল সম্মুখে বিস্তৃত ফাঁকা জায়গা। সেখানে দোলের হাট বসিত; নানাপ্রকার খেলনা, আবির, মিষ্টান্ন মুড়ি মুড়কী ফুট কলাই, বীরখণ্ডী, কদমা, বড় বাতাসা, চিড়া, সন্দেশ, বস্ত্র, ডোম কামার ছুতার ও কুমারের দ্রব্যজাত চারিদিক হইতে আসিয়া সেখানে বিক্রীত হইত। তথায় বিস্তর লোকের সমাগম হইত; গ্রামের বালকেরা দলে দলে তথায় গিয়া নানাবিধ দ্রব্যাদি কিনিত ও আবির কুঙ্কুম লইয়া খেলা করিত। দোলের আগের দিন সন্ধ্যায় পুকুরধারে "মেড়া পোড়ান" হইত; সেই সময়ে তথায় নানাপ্রকার বাজীও পুড়িত। ঘোষ মহাশয়দের পৃথক দোলমঞ্চ ছিল। যে দালানে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণা পূজা হইত, সেই দালানেই শ্রীকৃষ্ণের দোল হইত। সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে হাট বসিত; সেখানেও যথাসম্ভব লোক-সমাগম হইত ও দ্রব্যাদি কেনাবেচা হইত। পুরনারীদের মধ্যে ভারী আনন্দ চারিদিকে আবিরের ছড়াছড়ি; কাপড়, মস্তক, মুং আবিরময়—দেখিতে বড় শোভা হইত। ফাগখেলা—চোখে ফাগ দিয়া ও ফাগ বা রং গোলা পিচকারী দেওয়া হইত। যাঁহারা বয়সে বড়, তাঁহারা কনিষ্ঠা বা কনিষ্ঠকে উৎসবের পরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ডাকাইয়া সুগন্ধি চন্দনাদি দান করিয়া স্নেহ যত্ন ও আদর সহকারে কাছে বসাইয়া জলযোগ করাইতেন।

চড়ক পূজাতেও গ্রামে খুব ধুম হইত। সিং মহাশয়েরাই চড়ক পূজা করিতেন। তাঁহাদে

শিবমন্দিরের সম্মুখেই চড়কের সমস্ত কায হইত। হাত ও পিঠফোঁড়া, চরকীতে ঘোরান, ঝাঁপ ও আগুন খাওয়া, দাত বসা ইত্যাদি হইত।

বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া

গ্রামে বিবাহ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপোলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রায় সমস্ত ভদ্রলোকেরই নিমন্ত্রণ হইত। তখনকার লোকসংখ্যা এত বেশী ছিল যে, বিশেষ অবস্থাপন্ন না হইলে কেহই গ্রামস্থ ভদ্রলোককে কোন ক্রিয়া উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিতে পারিতেন না। যেদিন শ্রাদ্ধ সেইদিনই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ভোজন হইত। সেদিন লুচি চিনির ব্যাপার—যাহার যেমন সঙ্গতি সে তেমনি ভাবে লোকজন খাওয়াইত। নিয়ম ভঙ্গের দিন অন্নের ব্যাপার। পাড়াগাঁয়ে অন্নের ব্যাপারে পাচক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করা হইত না। বাড়ীর মধ্যে অভাব হইলে গ্রামের মধ্যে রন্ধননিপুণা প্রৌঢ়ারাই এই রন্ধনকার্য্য করিতেন। তাহাতে তাঁহারা আপনাদের গৌরব মনে করিতেন এবং কাহাকেও না ডাকিলে তিনি তজ্জন্য বিশেষ ক্ষুণ্ণা হইতেন। রন্ধন ভাল হইয়াছে শুনিলেই তাঁহারা তাঁহাদের পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিতেন। কেহ কেহ কোন বিশেষ ব্যঞ্জন বা পায়স রন্ধনে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তখনকার পাড়াগেঁয়ে মেয়েরা নিজের হস্তে রাঁধিয়া স্বামী পুত্রকে খাওয়ানো জীবনের পুণ্যময় কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। এবং সেই কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিতে পারিলে তাঁহাদের জীবন সার্থক হইল বলিয়া বিবেচনা করিতেন। শুনিয়াছি কোন বিখ্যাত জমীদার পত্নী গরিবের মেয়ে ছিলেন। তিনি স্বহস্তে রাঁধিয়া স্বামী পুত্র, পরে চাকর লোকজনকে খাওয়াইয়া, তবে নদীতে স্নান করিতে যাইতেন। স্নান করিয়া আসিয়া তাঁহার আহার করিতে বেলা ৪টা বাজিত। তাঁহার স্বামী এ সকল কিছুই জানিতেন না; একদিন ঘটনাক্রমে উহা দেখিতে পান ও দেখিবা মাত্র স্ত্রীকে বলেন, ও বিশেষরূপে নিষেধ করেন। তাঁহার স্ত্রী তাহার উত্তরে বলেন—"আমি গরীবের মেয়ে, ভাগ্যক্রমে তোমার হাতে পড়েছি; আমি কখনও তোমার কাছে কিছু চাই নি; চাবও না। তোমাদিকে ও অন্যান্য সকলকে খাইয়ে তবে আমি খাই, এতে আমার যে কি সুখ, কি আনন্দ তা তোমাকে বোঝাতে পারব না; আমাকে সে সুখ হতে বঞ্চিত কোর না এই আমার একমাত্র ভিক্ষা।"

বৃহৎ ব্যাপারে লম্বা নালার মত উনান কাটা ও পাতা হইত, তাহাতে হাঁড়ি বসাইয়া রান্না হইত। প্রথমে ঝোড়াতে ভাত ঢালিয়া, পরে পাতার উপর কাপড় পাতিয়া উহা ঢালা হইত। অন্নব্যাপারে পর্য্যাপ্ত মাছ, পায়স, ভাল মুণ্ডী, জিলাপী, বোঁদে ও দধি হইলেই উচ্চ অঙ্গের খাওয়ান হইত। গ্রামে যুবা, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের মধ্যে অনেকে খুব ভাল "খাইয়ে" ছিলেন। তাঁহাদের নাম সকলেই জানিতেন, পরিবেষণের সময় পরিবেষক বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে মাছের মুড়া পায়সাদি দিতেন। এক তিজেল সন্দেশ, এক মালসা পায়স, এক মালসা ভাজা কলাই কি মুগের ডাল, এক থাল মাছ ভাজা, কাহাকে কাহাকেও দেওয়া হইত এবং তাহা পাতে পড়িয়া থাকিত না। আমি তখন ১৫।১৬ বৎসর বয়স্ক হইলেও, সেই তালিকার মধ্যে আমার নামটাও ছিল। মাছের মুড়া, তিজেল করিয়া পায়স, মুঠা মুঠা মুণ্ডী আমার পাতে পড়িত দেখিয়াই আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম। গ্রামে ও বাড়ীতে আমি একজন ভাল খাইয়ে বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলাম। কলিকাতার বাসায়, এমন কি আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ও কুটুম্ব মহলেও সকলে আমাকে ভাল খাইয়ে বলিয়া জানিতেন। ৩৬।৩৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমার সে নাম ও খ্যাতি সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ ছিল। শুদ্ধ আমি বলিয়া নয়, সকল বালক ও যুবা, বেশ খাইতে পারিত ও হজম করিত। দক্ষিণপাড়ার কুলীন মিত্রদের বাড়ীর একটি পূজনীয় বৃদ্ধ যখন বাড়ী আসিতেন, তখনই তিনি স্বহস্তে রাঁধিয়া ছেলেদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া কাছে বসিয়া খাওয়াইতেন, তাহাতে তিনি বড়ই তৃপ্তি ও আনন্দ বোধ করিতেন। তিনি নানাপ্রকার নিরামিষ

ব্যঞ্জন এত ভাল রাঁধিতেন যে, এখনও তাহা ভুলিতে পারি নাই।

বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে গ্রামস্থ সমস্ত লোক পরস্পর পরস্পরকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। মাছ ও তরিতরকারী কিনিতে হইত না। যার তার পুকুর হইতে প্রয়োজনীয় মাছ, যার তার বাগান হইতে প্রয়োজনীয় তরি তরকারী সংগ্রহ হইত। তাঁহারা কেবল মাছ ও তরিতরকারী দিয়া ক্ষান্ত ও নিশ্চিন্ত হইতেন না। সকলে নিজে নিজে উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও পরিবেষণাদি করিতেন। গৃহস্থের কোন ভাবনা থাকিত না।

বিবাহে পণপ্রথা ছিল না। কুলমর্য্যাদা হিসাবে ক্ষমতানুরূপ যে যাহা পারিত দিত। বস্ত্রালঙ্কার সম্বন্ধে সেইরূপ ছিল। তখন ভদ্র পরিবারে রূপার গহনাও প্রচলিত ছিল। কোমরে সোণা পরিতে নাই, কাযেই রূপার গহনা চলিত।

নিম্নশ্রেণীর লোক

গ্রামের কৈবর্ত্তেরা চাকরী, সন্দেশ বা মুদিখানার দোকান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। তাহাদের কিছু কিছু কৃষিকার্য্যও ছিল, তাহাতে সম্বৎসরের ভাতের ভাবনা থাকিত না। কৈবর্ত্তের মেয়েরা কেহ কেহ ভদ্র কায়স্থগণের বাড়ী দাসীবৃত্তি করিত। গোয়ালা, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার প্রভৃতি অপরাপর শ্রেণীর লোকেরা নিজ নিজ ব্যবসাতেই ব্যাপৃত থাকিত। কাহারও কাহারও কিছু কিছু চাষের জমিও ছিল। ইহারা অর্থবান হইলেই জমি জমা করিত। কায়স্থ ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগকে আদৌ ঘৃণা করিতেন না। ঘৃণা করা দূরে থাকুক, বালকদের নিকট হইতে তাহারা খুড়া, জেঠা, দাদা, দিদি সম্বোধন ও তদনুরূপ শিষ্ট ব্যবহার পাইত। তাহারা প্রাচীন ও প্রাচীনাদের নিকট ঘরের লোক বলিয়া বিবেচিত হইত এবং অবাধে অন্তঃপুরে গিয়া যথাযোগ্য সম্বোধন করিয়া, তাঁহাদের আদেশ শুনিয়া আসিত ও তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিত। প্রতি বৎসর পূজার সময়ে উহারা ও উহাদের ছেলে মেয়েরা নূতন কাপড় ও মিষ্টান্ন পাইত। ইহা ছাড়া, ঘরে যখন যাহা হইত, প্রাচীন ও প্রাচীনারা তখন তাহাদিগকে না দিয়া আপনারা খাইতেন না। তখন ইতর ও ভদ্র শ্রেণীর পরস্পর সম্বন্ধ বড়ই মধুর সুন্দর ও স্নেহ মমতা পূর্ণ ছিল। বহির্গ্রামের ইতর শ্রেণীর লোকেরা ও চাষাভুষারা ভদ্রলোকদিগকে যথেষ্ট সম্মানের চক্ষে দেখিত।

প্রজা ও জমিদার

এই গ্রামের পার্শ্বেই চাষাদের বাস ছিল। তাহাদের বাসভূমির অনতিদূরেই তাহাদের চাষের জমি। তখন তাহাদের আর্থিক অবস্থা তত স্বচ্ছল না হইলেও, বঙ্কিমবাবু যেরূপ লিখিয়াছেন, জমিদারদের নিকট তাহাদের সেরূপ অত্যাচার সহ্য করিতে হইত না। অবাধ্য হইলে জমিদারেরা তাহাদিগকে শাসন করিতেন বটে, কিন্তু অপর কেহ তাহাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিত না। মহাজনেরা জমিদারের ভয়ে তাহাদিগকে পীড়ন করিতে সাহস করিত না। নিজের প্রাপ্য টাকা বা ধান্য আদায় করিবার জন্য মহাজনদিগকে জমিদারের শরণাপন্ন হইতে হইত। জমিদার তাঁহার প্রজাকে বজায় রাখিয়া মহাজনের টাকা বা ধান্য আদায় করাইয়া দিতেন। মহাজনকে আদালতে যাইতে হইত না; প্রজাও বাঁচিয়া যাইত। তখন প্রজারা অজন্মা হইলে জমিদারকে যথাসাধ্য খাজনা দিত, একেবারে খাজানা বন্ধ করিত না। জমিদারকেও কথায় কথায় আদালতে যাইতে হইত না। দুর্ভিক্ষ হইলে জমিদারেরা নিজের সঞ্চিত ধান্য বা টাকা দিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না; আবশ্যক হইলে অপরের নিকট টাকা ও ধান্য কর্জ্জ করিয়াও প্রজাদিগকে রক্ষা করিতেন। এজন্য দুর্ভিক্ষ বা অজন্মার কথা তখন রাজপুরুষদের কর্ণগোচর হইত না। তখন প্রজারাও জমিদারকে বাপ মার মত দেখিত; জমিদারও তদনুযায়ী ব্যবহার করিতেন। দুই একটি বড় জমিদারের শাসন দোষে যদি কখনও কোথাও কোন অত্যাচার ঘটিয়া থাকে ত সে স্বতন্ত্র কথা। ছোট বড় সমস্ত জমিদারদের

সহিত প্রজাদের সম্বন্ধ তখন ঘনিষ্ঠ ও মমতাপূর্ণ ছিল।

এখন ঐ সকলের কিছুই নাই। ঐ সকল এখন অলীক স্বপ্নবৎ সকলের মনে প্রতীয়মান হয়। পরে উহা ক্রমে ক্রমে বিস্মৃতির অতল সলিলে একেবারে ডুবিয়া যাইবে।

অধিবাসিগণ প্রায় অনেকেই একণে মরিয়া গিয়াছে; তাঁহাদের বংশের চিহ্নমাত্রও নাই। কতকগুলি পলাইয়া কোন প্রকারে জীবন রক্ষা করিতেছে, অবশিষ্ট যৎসামান্য যাহারা অতি কষ্টে গ্রামে বাস করিতেছে, তাহারাও ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পাইতেছে। চারিদিকে জঙ্গলাকীর্ণ বাস্তুভিটার ও বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ। পুষ্করিণী সকল মজিয়া গিয়াছে। যাহাও বা আছে তাহাতে জল নাই বলিলেও চলে; যাহাতে আছে তাহাও শৈবালে ও পানায় পূর্ণ। পথ ঘাট বন জঙ্গলে ছাইয়া গিয়াছে। বন্য হিংস্র জন্তু, ছোট বাঘ, নেকড়ে বাঘ, শূকর সময়ে সময়ে বিচরণ করে— তাহাদিগের সংখ্যা অনেক হইয়াছে। লোকজনের সাড়াশব্দ নাই, চারিদিকে অন্ধকার, যেন শ্মশানের সাঁ সাঁ শব্দ অহোরাত্র বহিয়া যাইতেছে।

আজ আমাদের সেই হাস্যময়ী আনন্দদায়িনী জন্মভূমি পরিত্যক্তা, শীর্ণা, জীর্ণা ও চৌর-পরিহিতা। তাঁহার আর সে রাজলক্ষ্মীর বেশ নাই, সে সম্পদ নাই, সে ঐশ্বর্য্য নাই। আজ তিনি রুক্ষকেশা, শ্মশানভূমিতে হিংস্র শ্বাপদ ভয়কম্পিতা, ধূল্যবলুণ্ঠিতা ও রোরুদ্যমানা! আজ তিনি ভিখারিণী! কেন এমন হইল? কে আমাদের সমাজ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিল? কে আমাদের ধর্ম্মবন্ধন ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল? কে আমাদের আনন্দের কলসে বিষ মিশাইয়া দিল? কে আমাদের পুরাতন সুদৃঢ় নীড় ভাঙ্গিয়া দিল? ইহার উত্তর কে দিবে? শুদ্ধ ম্যালেরিয়াকে দোষী করিলে চলিবে না। অনেক অন্তর্নিহিত নিগূঢ় তত্ত্ব ও কারণ আছে; তাহা দেখিবার, ভাবিবার ও সম্যকরূপে পর্য্যালোচনা করিবার বিষয়। এই সুবিশাল বঙ্গভূমিতে এমন কি কেহ নাই, যিনি উহার প্রতিবিধানকল্পে ও পুনরুদ্ধার ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন? নহিলে আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চ্চা, স্বদেশহিতৈষণা, যশ ও সম্পদ সমস্তই মিথ্যা ও বৃথা। নহিলে আমাদের এই সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি অচিরেই একেবারে বিলুপ্ত হইবে।

মা আমরা আর্ত্ত, ত্রস্ত, বিপন্ন ও অসহায়; মা, ওঠ মা, একবার ওঠ, এই শ্মশান ভূমি হইতে উঠিয়া আমাদিগকে অভয় দান কর; আমাদিগকে বল দাও, তেজ দাও, ধৈর্য্য দাও; আমরা অকৃতী—আমাদের যে মা আর কোন উপায় নাই!

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

গৌতমাশ্রম

বিহার প্রদেশের অনেক স্থানের সহিত ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক স্মৃতি জড়িত আছে। গৌতমাশ্রম বা রেভেলগঞ্জ অতি প্রাচীন স্থান। ইহার সহিত রামায়ণের কোন কোন ঘটনার সম্পর্ক আছে। এই স্থান সম্বন্ধে কেহ কিছু লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না, সেই জন্য এই স্থানের বিবরণ সাধারণের অবগতির জন্য লিখিলাম।

সারণ জেলার ছাপরা নগর হইতে এই গৌতমাশ্রম ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। বেঙ্গল নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের রেভেলগঞ্জ ষ্টেশন হইতে ইহা প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী। বর্ত্তমানে ইহা একটী গণ্ডগ্রাম মাত্র, কিন্তু অতীতের পুণ্য-কাহিনী এখনও ইহাকে নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীদিগের নিকট একটী পবিত্র তীর্থস্বরূপ করিয়া রাখিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও

রাখিবে। যখন ইহার সমৃদ্ধি ছিল, গৌরব ছিল, তখন ইহারই নীচে গঙ্গাদেবী তাঁহার সখী সরযূর সহিত মিলিতা হইয়া, ন্যায়ের মীমাংসা শুনিতেন। এখন আর ইহার সে গৌরব নাই, সে ঐশ্বর্য্য নাই, আছে কেবল অতীতের স্মৃতি। তাই বুঝি গঙ্গাদেবী ইহার দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া, এস্থান হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে তাঁহার সখীর সহিত মিলিতা হইয়াছেন। প্রাচীনকালে এই স্থানেই মহাত্মা গৌতম ঋষির আশ্রম ছিল। পুরাণে গৌতম নামে কয়েকজন ঋষির নাম পাওয়া যায়। এই স্থানে যাঁহার আশ্রম ছিল, তিনি, রামায়ণ-বর্ণিত গৌতম মুনি। যে ষড়দর্শন আর্য্যপ্রতিভার ও জ্ঞানের চরম নিদর্শন, যাহা হিন্দুজাতির বড়ই গৌরবের জিনিষ এবং যাহার খ্যাতি পৃথিবীব্যাপ্ত, সেই ষড়দর্শনের এক দর্শন ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম ঋষির এই স্থানেই আশ্রম ছিল। এই স্থানেই তিনি শিষ্যবর্গ বেষ্টিত হইয়া ন্যায়ের আলোচনা করিতেন। দুইটী পুণ্যতোয়া নদীর এই মিলনস্থানে মহাত্মা গৌতমের তপোবন যজ্ঞধূমে সুরভিত থাকিত এবং ঋষিগণের সামগানে মুখরিত হইত। হায়, আজ ইহার সেই ঐশ্বর্য্য কোথায়! এখন কেবল ধ্বংসের চিত্র বক্ষে ধারণ করিয়া ইহা সরযূতীরে দাঁড়াইয়া হাহাকার করিতেছে এবং পার্থিব জগতের নশ্বরতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্রবাদ, ত্রেতাযুগাবতার রামচন্দ্র বনগমনকালে এই স্থানেই গঙ্গা পার হইয়া, তপোবনে পাষাণী অহল্যাকে পদস্পর্শে উদ্ধার করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে, তিনি বক্সারের নিকট গঙ্গাপার হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ছাপরাবাসিদিগের অর্থে ও জেলার কালেক্টর সাহেবের চেষ্টায় এই স্থানে একটী ন্যায়ের পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। সরযূতীরে মন্দিরও স্থাপিত হইয়াছে। একটী মন্দিরে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর বিগ্রহ, অন্য মন্দিরে গৌতমমুনি, অহল্যা, গৌতমপুত্র, হনুমানের বিগ্রহ এবং আর একটী মন্দিরে অন্যান্য দেববিগ্রহ আছেন।

বর্ষাকালে এই স্থানের দৃশ্য বড়ই মনোরম। কলনাদিনী সরযূ (Gogra) কল কল শব্দে মন্দিরের পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিতা হন। অন্যসময়ে মন্দিরের নিকট নদীতে জল না থাকিলেও, অল্পদূরেই সরযূর প্রধান প্রবাহে সর্ব্বদাই জল থাকে। সাধারণ লোকে এই স্থানকে 'গোদনার ঘাট' বলে। রামনবমী এবং কার্ত্তিকী পূর্ণিমার সময় এখানে মেলা হয়। রাজা দশরথ অন্ধমুনির পুত্রকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য এই স্থানে সহস্র গোদান করিয়াছিলেন। সেইজন্য গোদানের ঘাট হইতে ইহার নাম গোদনার ঘাট হইয়াছে। ঐ দুই সময় নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের অধিবাসিবৃন্দ সরযূতে স্নান করিয়া এবং বিগ্রহদর্শন করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিবার জন্য সমবেত হয়। এখানে হাতোয়ার মহারাজ, বেতিয়ার মহারাজ এবং অন্যান্য জমিদারদিগের বড় বড় অট্টালিকা আছে, সরযূতে স্নান করিবার জন্য রাজপরিবারবর্গ এই সকল অট্টালিকাতে আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। এই স্থানের সহিত ঐতিহাসিক স্মৃতিও জড়িত আছে। ইহার অবস্থানটী বড়ই সুন্দর। দুই ধারেই সরযূ। মোগল বাদশাহদিগের সময় এই স্থানে একটী দুর্গ ছিল এবং এখনও এই দুর্গের ও অন্যান্য অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ ইহার অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই দুর্গ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না; এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে ইহা মাঝি নামক স্থানের দুর্গাধিপতির অধীনে ছিল।

শ্রীহরিপদ ঘোষ।

প্রাণের সাড়া

(গল্প)

রাত্রি তখন আটটা। ধীরেশ কলিকাতায় তার শয়ন ঘরের বড় আয়নাখানার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পমেটম্, চিরুণী আর ব্রুশ এই তিনটা জিনিসের সাহায্যে তার চুলের প্রকটা পাশ বেশ মানান্-সই করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময় একটী বছর পনেরো বয়সের ফুটফুটে মেয়ে তার পিছনে আসিয়া চুপ্‌টি করিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটীর নাম সুধা—ধীরেশের স্ত্রী। মুখখানি কি একটা করুণ উদাস ভাবে যেন বাসি ফুলটির মত দেখাইতেছিল। সে কিছুক্ষণ তেমনি দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, "বেরুচ্ছ?"

পিছন দিকে না তাকাইয়াই ধীরেশ উত্তর দিল, "হ্যাঁ, কেন?" সুধা বলিল, "না, তাই জিজ্ঞেস্ করচি।" তারপর একটু থামিয়া বলিল, "সকাল সকাল ফিরবে ত, না, রাত্তির হবে?"

"রাত্তির হবে।"—তারপর সে ফিরিয়া স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "হ্যাঁ, বল্‌তে ভুল হয়ে গেছে সুধা। আমি তো আজ রাত্তিরে খাব না! তুমি বৌদিকে বলে দিও।"

সুধা গম্ভীর হইয়া বলিল, "বাঃ, সে কথা আমি এখন কি করে' বল্‌বো?"

ধীরেশ ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "কি করে' বল্‌বে তার মানে? এই সোজা কাযটা আর তুমি আমার জন্যে কর্‌তে পার না?"

"না। দিদি যে খাবার-দাবার সব তৈরী করে' ফেলেচেন, এখন ওকথা বল্‌তে গেলে তিনিই বা কি মনে কর্‌বেন?"

"ওঃ! আচ্ছা, তবে বলে' কায নেই।"—বলিয়া ধীরেশ তার জরীপাড় চাদরখানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া গায়ের উপর ফেলিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই, সুধা তার একটা হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "কোথাও নেমন্তন্ন আছে বুঝি?"

ধীরেশ তার মুখের পানে চাহিয়া, একটু থামিয়া বলিল, "হ্যাঁ। আর কিছু বল্‌বার আছে? না থাকে, ছেড়ে দাও; দেরী হয়ে যাচ্ছে!"

"গেলেই বা! একটা দিন যদি আমি না-ই যেতে দিই!"

"যেতে দেবেনা? বল কি? তারা এতক্ষণ হয়ত আমার জন্যে অপেক্ষা কর্‌চে। ছাড়—ছাড়—"

সুধা হঠাৎ তার দুইটা হাতে স্বামীর হাতখানা আরও জোরে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার পায়ে পড়ি, সত্যিই আজ আমি তোমায় যেতে দোব না।"

ধীরেশের কাছে এই কথাটা যেন নিতান্তই অনাসৃষ্টি বলিয়া মনে হইল। সে সেই বালিকার মিনতি ভরা মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, "বাঃ বাঃ! এ তো ভারী মজার কথা বল্‌লে গা! তোমায় না কতদিন বলেচি,—বৌয়ের কথায় ঘরের কোণে বসে' থাক্‌বার পাত্র এ শর্ম্মা নয়, হ্যাঁ!—হাত ছাড়। সোহাগ তখন সে ফিরে এলে যত পার কোরো।"

স্বামীর কথা শেষ হইতে না হইতেই সুধা তার হাত ছাড়িয়া দিয়া চুপ্ করিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে যে নিদারুণ নীরব অভিমানে তার মুখখানি এক ঝাপ্‌সা মেঘে ছাইয়া উঠিল, ধীরেশ একবার মুহূর্ত্তের জন্যও তাহা লক্ষ্য করিল না। ঘরের কোণ হইতে রূপা-বাঁধান' ছড়িটা তুলিয়া নিয়া সে ঘর ছাড়িয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

বাহিরের আকাশে সেদিন ফুটন্ত জ্যোৎস্নার রূপালি ঢেউ খেলিয়া যাইতেছিল। তাহারই আলোকে সুধার ঘরের খাট-বিছানা পর্য্যন্ত প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। গভীর রাত্রি। সুধা একা সেই শুভ্র বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া মাথার কাছে রক্ষিত দেরাজের উপরকার ঘড়িটার টিক্‌টিক্ শব্দগুলা গণিতেছিল, আর ভাবিতেছিল—সে অনেক কথা। দু'বছর আগে যখন তার বিবাহ হয়, সেই ফুলশয্যার রাত্রিটী হইতে এই দীর্ঘ ব্যবধানের পর আজিকার এই

রাত্রি, এই দুইটা রাত্রির মধ্যে তার জীবনের উপর দিয়া দিনগুলা কেমন করিয়া কাটিয়াছে, তারই একটা মোটামুটি হিসাবের খসড়া সে আজ নিজের মনে ক'রিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল। হঠাৎ একবার মাথার কাছের বাতিটা জ্বালিয়া তুলিয়া ধরিয়া দেখিল, ঘড়িতে তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে।—মোটে বারোটা? সুধা বাতি নিবাইয়া, আবার সেই বিছানার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

বাহির হইতে তাহার বড় যা' কপাটে ঘা দিয়া ডাকিলেন, "ছোটবৌ!" সে তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠিয়া বসিল কিন্তু কোন উত্তর দিল না। বড়বৌ আর একটা ডাক্ দিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

সুধা আবার বিছানায় মুখখানি গুঁজিয়া আপনার মনে বলিতে লাগিল, "বৌয়ের কথায় ঘরের কোণে বসে' থাকা অন্যায়,—পাপ! কিন্তু তাই কি আমি বলেছিলুম? কেন তা বল্‌বো? বড্ড ভুল ক'রেই শুধু একটীবার বলেছিলুম, আর যেতে দোব না। পোড়ারমুখী আমি, তাই বলেছিলুম।"—নিজের উপর রাগে বিরক্তিতে তাহার বুকের ভিতর জ্বলিয়া উঠিতেছিল। নির্জ্জীবের মত সে সেইখানেই পড়িয়া রহিল। ঘুমের মোহ বোধ করি একবারও তার চোখের পাতায় আবেশ স্পর্শ বুলাইয়া দিতে সাহস করিল না। ঘড়িতে একটা বাজিল, তারপর দুইটা, তারপর তিনটা বাজিয়া গেল। দুশ্চিন্তার পেষণে পড়িয়া সুধার শরীর ও মন দুই যখন ক্লান্ত হইয়া একটা আবেশে ঢলিয়া পড়িয়াছে, এমন সময় দরজায় ঘা শুনিয়াই সে ধড়্‌মড়্ করিয়া উঠিয়া ছুটিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ধীরেশ ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, "এই যে, ঘুম ভেঙ্গেচে! আমি ভাবলুম, বুঝি দরজাটা লাথির চোটেই ভেঙে ফেল্‌তে হবে।"

সুধা আস্তে আস্তে আসিয়া আলো জ্বালিতেই ধীরেশ বলিয়া উঠিল, "আবার এত রাত্রে আলোর বহর কেন চাই? অন্ধকারে অন্ধকারেই কোন রকমে মাথা গুঁজে একটু শুতে দাও, ব্যস্, আর কিচ্ছু চাইনে।"

এবার সুধা স্বামীর পানে চাহিয়া দেখিল। তার মাথার উস্কখুস্ক ঝাঁকড়া চুলগুলা কপালের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, চোখের তারাদুটা কেমন এক রকম অস্বাভাবিক ভাবে এ'দিক ওদিক নড়িতেছে। দেওয়ালের গায়ে ছড়িটা রাখিতে গিয়া সে একবারে ধপ্ করিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। তারপর আবার উঠিয়া আসিয়া হঠাৎ সুধাকে দুই বাহুর মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া তার মুখচুম্বন করিয়া বলিয়া উঠিল, "কি বাবা! আলোটা নিবিয়ে দাও!"

সুধা ব্যস্তভাবে সে আলিঙ্গন এড়াইয়া আসিয়া বলিল, "আজও তুমি ঐসব খেয়ে এসেচ?" ধীরেশ পালঙ্কের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "কি! কি সব খেয়ে এসেচি শুনি? ইস্! তুমি যে একেবারে পাদ্রী সাহেব হয়ে গেছ দেখছি!"

সুধা প্রস্তরমূর্ত্তির মত একপাশে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঘন-ঘন দুই তিনটা নিশ্বাস টানিয়া বলিয়া উঠিল, "রোজ-রোজ তুমি এইরকম করবে? দু'বছর আমাদের বিয়ে হ'য়েচে, তার ভিতর এই সব কাণ্ডই আমি বেশী দেখ্‌চি। কিন্তু এইবার আমি সব কথা সকলকে বলে' দোব!"

ধীরেশ ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "কি করবে? বলে' দেবে?—ওঃ! এ বাড়ীর কারু কিছু আমি তোয়াক্কা রাখি কি না! কেন মিছে ঘাঁটাচ্চ' বাবা! ভালয় ভালয় মুখটী বুজে শুয়ে পড়, তবে জান্‌ব—লক্ষ্মী ছেলে!"

সুধার বুকের ভিতর তখন যেন কি একটা আকুল হা-হা শব্দ সাগর তরঙ্গের মত ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতেছিল। তারই উন্মাদনায় সে নীরব থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "বাড়ীর কারু তোয়াক্কা না রাখ, এবার আমি বাবাকে লিখে এখান থেকে চলে' যাব!'

এই কথায় ধীরেশ হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বটে! ভয় দেখাচ্চ' আমায়, না? একরত্তা ছুঁড়ি, কোথায় পায়ের তলায় পড়ে' থাক্‌বে, না, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চোখ রাঙাতে চাও? বাবাকে বলে' বাপের বাড়ী চলে' যাবে? যাও না! আমি তো বেঁচে যাই! আজই, এখ্‌খুনি, যাও—যাও।" বলিয়াই সহসা সে সুধার সেই কোমল মণিবন্ধ বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া হিড়্‌হিড়্ করিয়া তাকে একেবারে দরজার কাছে টানিয়া নিয়া গেল। ভয়ে সুধার সর্ব্বশরীর তখন থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল;

অথচ তার মাতাল স্বামীর সেই উন্মত্ত মুখের পানে তাকাইয়া একটা মিনতির বাণীও তার মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না। ধীরেশ তখন হঠাৎ তাহাকে সেই রুদ্ধ দরজার দিকেই ধাক্কা মারিয়া ঠেলিয়া দিল, মাথাটা তার সশব্দে কপাটে ঠুঁকিয়া গেল। 'মাগো'—বলিয়া সুধা মাথায় হাত দিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

২

দিন-পনেরো কাটিয়া গিয়াছে। সুধার পিতা শ্যামলবাবুও কলিকাত'-বাসী—তিনি আসিয়া মেয়েকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়াছেন। যাইবার পূর্ব্বে ধীরেশের সঙ্গে একবারও তার সাক্ষাৎ হয় নাই। সেই রাত্রিকার ঘটনার পর হইতে স্বামী স্ত্রীর ভিতর দেখা শুনা প্রায় ছিলই না, এমন কি, রাত্রিতেও না। ধীরেশ তার নৈশ আমোদ প্রমোদের পর গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া নীচের বৈঠকখানাতেই পড়িয়া রাত্রি ভোর করিত। দু'তিনদিন অপেক্ষায়-অপেক্ষায় থাকিয়া সুধা যখন নিরাশ হইল, তখন সেও আর সাধ্যমত ও-সব কথা মনেও আনিত না। কিন্তু আবার, ঐ মনে না আনার সাধ্য যে তার কতটুকু তাহাও সে প্রতিরাত্রেই অনুভব করিত। প্রতিরাত্রেই সে যখন একলা আসিয়া তার শূন্য শয্যাখানি অধিকার করিত, তখন কোথা হইতে হাজার হাজার এলোমেলো কথা স্রোতের মত আসিয়া তার মনখানি ভাসাইয়া দিত। কেবলই সে ভাবিত, কেন তার প্রতি এই অবিচার! বিবাহের পর এই দুইবৎসরের ভিতর কোন্ দিন কোন্ অপরাধই বা সে করিয়াছে, যাহার জন্য এই নিত্য নূতন শাস্তি! তারপর—সেদিনের সেই আঘাত চিহ্ন এখনও তার কপালের উপর সুস্পষ্ট বর্ত্তমান! এ শাস্তি দিয়াও কি তার মনের সাধ পূর্ণ হইল না?—অবাধ চোখের জলে সুধা তার বিছানা-বালিশ সিক্ত করিয়া আপনা আপনি বলিয়া উঠিত,—"আমি যদি কোন দোষের দোষী হতুম, তা হলে সেধে গিয়ে তার পায়ে ধর্‌তুম!—কিন্তু দোষ ত' সে নিজেই করেচে! তবে কেন—না, কখ্‌খনো তা আমি কর্‌বো না, কখ্‌খনো কর্‌বো না—!" এইরূপে প্রতি রাত্রে সে আপনা-আপনি তর্ক করিতে করিতে শেষে ঘুমাইয়া পড়িত।

ধীরেশের বড়দাদা যে এই সব ব্যাপারগুলা মোটেই লক্ষ্য করিতেন না, এমন নহে; কিন্তু তাহার প্রতিকারের কোনও চেষ্টা তিনি করিতেন না। কিন্তু, ব্যাপার এবার একটু বেশীদূর পর্য্যন্তই গড়াইল। তাঁহার স্ত্রী একদিন বলিলেন, "বলি হাঁগা, তুমি কি এ সবের একটা বিহিত করবে না? নিজের গুণধর ভাইটাকে যদি শাসনে করতে না পার, তবে অমন পরের মেয়েকে ঘরে এনে জবাই করার দরকার কি শুনি?"

নরেশ তাঁহার কাগজপত্র হইতে মুখ তুলিয়া, একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, "হুঁ, দরকার তো মোটেই ছিল না। কিন্তু, কি কর্‌ব? এ যে হিন্দু ঘরের বে, ফেরৎ চলে না!"

স্ত্রী ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "ফেরৎ চল্লে, তারই ব্যবস্থা কর্‌তে নাকি?'

"অবশ্য। তাই আবার জিজ্ঞেসা কর্‌চ?"

"আচ্ছা আচ্ছা, ঢের হয়েচে। এখন যা রয়-সয়, তাই কিছু ভেবে চিন্তে ঠিক কর দিকি! তুমি ভাসুর, তোমার তো দেখ্‌তে হয় না! কিন্তু, এরকম স্ত্রীহত্যা আমি যে আর দেখ্‌তে পারিনে!"

নরেশ একবার তাঁর গম্ভীর দৃষ্টি স্ত্রীর মুখের উপর স্থির-নিবদ্ধ রাখিয়া, পরে আবার তাহা নামাইয়া বলিলেন, "তাহ'লে আমি বউমার বাবাকে লিখে দিই, তিনি এখন তাকে নিয়ে যান্! নইলে, ও ছোঁড়াকে আমি এখন কি বল্‌ব বল? ব'লে কিছু ফল হবে মনে কর?"

ইহারই দিন দুই বাদে সুধা বাপের বাড়ী গিয়াছে। ধীরেশ এ বিষয়ে বাড়ীর কাহারও কাছে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করে নাই। বরং একটা পর্ব্বতরূপী অন্তরায় তাহার পথের মাঝখান হইতে সরিয়া যাইতে সে একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া নিজেকে পূর্ণভাবে স্রোতের মুখে ভাসাইয়া দিয়াছে। ক্রমশঃ, রাত্রিতে বাড়ী আসাও বন্ধ হইয়া গেল। বৈঠকখানায় বন্ধুবান্ধবের ঘন ঘন পদধূলি পড়িতে লাগিল। শোবার ঘরের কাঁচের আল-

আরিতে বড় যত্নে সুধা যে সব রং বেরং-এর পুতুল ও খেলনা সাজাইয়া রাখিয়াছিল, সে গুলি স্থানান্তরিত করা হইল, এবং তাহার স্থানে সারি-সারি ছোট বড় লম্বা-বেঁটে, সাদা-কালো বোতলের অধিষ্ঠান হইল। ধীরেশ যেন তার অন্তর-বাহিরে একটা স্বাধীনতা ও স্ফূর্ত্তির আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল।

৩

বাপের বাড়ীতে সুধার দিনগুলা নিতান্ত মন্দ কাটিতেছিল না। ছোট-ছোট ভাইবোনগুলিকে লইয়া সে সারাদিন একরকম হাসিয়া খেলিয়া কাটাইত। কিন্তু পাড়া প্রতিবেশিনীদের ভিতর যে দুই-চারিজন তার সমবয়সী ছিল, তাদের সহিত সে বড় একটা মিশিত না। কেন না, তাহাদের নিকট গিয়া বসিলেই তাহারা সর্ব্বপ্রথমে স্বামীর কথাটাই পাড়ে—কার স্বামী কাহাকে বেশী ভালবাসে, কার স্বামী কাহাকে হাল ফ্যাসানের কি কি গহনা দিয়াছে—তাহাদিগের গল্পগুজব ও আলোচনার ধারাটা প্রধানতঃ এই দিক দিয়াই বহে। তাই সে আসরে সুধার একান্ত চুপটি করিয়া বসিয়া থাকা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। প্রথম-প্রথম দু'একদিন সে এই বৈঠকে যোগ দিয়া তার 'সখী' 'বেলফুল' 'গঙ্গাজল'দের এই সব স্বামী সমালোচনা নীরবে শুনিয়া যাইত, আর মাঝে-মাঝে তাদের কোন রঙ্গরসের কথায় মুচ্‌কি হাসির যোগান্ দিত মাত্র। কিন্তু যতক্ষণ সে এইখানে বসিয়া থাকিত, ততক্ষণ যেন একটা আবদ্ধ বায়ুতে তার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিত; যুবতী জীবনের এই সব হাসি তামাসাগুলা যেন তার বুকের ভিতর সীসার মত ভারী হইয়া বসিত।

কিন্তু সেদিন তাকে সবচেয়ে বেশী মুস্কিলে ফেলিয়াছিল, তাদের পাশের বাড়ীর কনক বলিয়া সেই মেয়েটী। কনকের পিতা সেখানে নূতন ভাড়াটে আসিয়াছেন; তাঁহারা বড় লোক। কনকের বয়স প্রায় সুধার সমানই; সবে একবৎসর হইল তাহার বিবাহ হইয়াছে। স্বামীর গৃহ হইতে বাপের বাড়ী ফিরিয়া সেদিন হঠাৎ সুধার মত একটি সঙ্গিনীর সাক্ষাৎ লাভে সে রীতিমত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। নূতন আলাপ, তাহার উপর দুইজনেই তরুণী, দুইজনেই বিবাহিতা,—কনক সেদিন হাসিতে হাসিতে সুধার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার যে রূপ ভাই, তাতে তোমার স্বামী যে তোমার কাছ ছাড়া করেচেন, তাতেই আমি আশ্চর্য্য হচ্চি!"

সুধা তার মুখের উপর অনেক কষ্টে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, "কেন? তাহলে তোমাকেই বা তোমার স্বামী—"

বাধা দিয়া কনক বলিয়া উঠিল, "দূর! আমি আর তুমি! নামে আমি কনক হলেও, কাযে যে তার এক ফোঁটা নই, তা তো দেখ্‌চ! এই কালো রঙ, এই প্যাঁচার মত মুখ চোখ—"

সুধা তার বিস্ফারিত দুটী চোখ এই নব-পরিচিতার মুখের উপর রাখিয়া বলিয়া উঠিল, "তাহলে তোমার স্বামী তোমায় পছন্দ করেন না?"

উত্তরে কনক খিল্‌খিল্ করিয়া এক মধুর হাসির লহর তুলিয়া বলিল, "পছন্দ আর না করেই বা কি উপায় বল ভাই? বিয়ে যখন হয়েচে, সাধ করে' যখন সাত পাকের বাঁধন গলায় পরেচে, তখন সোণাই হোক্, আর লোহাই হোক্, তা কি আর ঠেল্‌তে পারে?"

এই সহজ সরল উত্তরটা কিন্তু সুধা বড়ই গভীর ভাবে লইল। কনকের কথাবার্ত্তায় অবশ্য এটা তার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, স্বামীর সোহাগে এই মেয়েটী পরিপূর্ণ সুখী; কিন্তু কেন যে সুখী, তাহা বুঝিতে পারিল না। তাহারই ঐ ফাঁকা যুক্তিটুকু সে কোন মতেই স্বীকার করিতে পারিল না। বিয়ের বাঁধন গলায় পরিলেই সকল স্বামী যে কর্ত্তব্যজ্ঞানে তার স্ত্রীকে ভালবাসিতে বাধ্য হয়, এ কথার প্রতিবাদ করিতে গিয়া, সে চুপ করিয়া রহিল।

কনক বলিল, "আচ্ছা, সত্যি ভাই, এ কি রকম রীতি বল তো? বাপ মায়ের কোলে-পিঠে আদর-যত্নে এত বড়টী হলুম, আর এখন হঠাৎ কে একজন পরের বাড়ীতে গিয়ে যেন একেবারে আলাদা মানুষটী হ'য়ে গেছি! বাপের বাড়ী আস্‌বার সময় কত আমোদ হয় বটে, কিন্তু, এসে অবধি খালি কি মনে হয় বল দিকি?"

সুধা অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, "কি মনে হয়?"

কনক মুচ্‌কি হাসিয়া তার গালটী টিপিয়া দিয়া বলিল, "আহা, জান না যেন, কি হয়! আচ্ছা, সত্যি বল তো, সারাটা দিন একখানা চিঠির জন্যে কি রকম হা-পিত্যেশ হয়ে বসে থাক্‌তে হয়?"

"হ্যাঁ।"

কিন্তু কনক তার এই গাম্ভীর্য্যে ব্যথিত হইয়া বলিল, "না ভাই, তুমি সব কথা খুলে বল্‌চ না। আমি তো তোমার কাছে কিছু লুকোচ্চি নে, তবে তুমি কেন লুকোবে ভাই?"

"কেন, কি লুকোচ্চি?"

"লুকোচ্চ না?—আচ্ছা বল, তোমার স্বামী তোমার কতখানি ভালবাসে?"

সুধা উদাস ভাবে বলিল, "যেমন সকলের স্বামী বাসে, তেমনিই বাসে। আমার কি নতুন?"

কনক একটু নীরব থাকিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, "তুমি ভাই বিরক্ত হচ্চ?"

সুধা কাতরভাবে তার একখানি হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "না ভাই না, মোটেই না।" বলিয়া খানিক স্তব্ধ থাকিয়া পরে মুখ তুলিয়া বলিল, "তুমি ভাই কিছু মনে করোনা। আর একদিন তোমায় আমি সব কথা বল্‌বো—"

বাড়ী আসিয়া সে একটা ঘরের মেঝের প্রায় ঘণ্টাখানেক উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল। তার বুকের জমাট বেদনা তরল হইয়া একটা অশ্রুবিন্দুও বাহিরে আসিল না। মনে মনে বারম্বার সে শুধু এই কথাটাই বলিতে লাগিল,—ঐ কনক আর এই আমি! ওর মুখে কত হাসি, আর আমার মুখে তার একবিন্দু ফোটে না কেন?

তারপর আর একমাস অতিবাহিত হইয়াছে। কনক তার শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু তার সরল সহৃদয়তার গুণে সে মাত্র কয়দিনের মেলামেশায় সুধার এই তরুণ-জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনারাশির সবটুকু পরিচয় লইয়া গিয়াছে। শ্বশুরবাড়ী হইতে মাঝে মাঝে সে তাহাকে চিঠি লিখিত। তাহার প্রতিছত্রে কনক তার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে যে প্রগাঢ় সমবেদনা সুধার কাছে পাঠাইয়া দিত, তাহাতে সুধাও যেন তার দুঃখের এই নিবিড় ব্যথার মাঝখানে সামান্য একটুখানি সুখের রশ্মি অনুভব করিয়া তৃপ্ত হইত। কনকের এই সখিত্ব সে তাই প্রাণ দিয়া আলিঙ্গন করিয়া লইয়াছিল।

দিন যখন এমনি করিয়া কাটিতেছিল, তখন একদিন হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত সংবাদে সুধা যেন অকূল সমুদ্রের মাঝখানে গিয়া পড়িল। শ্যামলবাবু সেদিন একটু সকাল সকাল আফিস হইতে ফিরিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া অবধি সুধা প্রায়ই এই সময়টীতে তাঁহার জলখাবার লইয়া তাঁহার কাছে গিয়া বসে। আজ কিন্তু সে তার পিতার নিকট আসিয়া দেখিল, তিনি তখনও আফিসের চোগা-চাপ্‌কান না খুলিয়াই খাটের উপর স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া আছেন। তাঁহার কপালের দুইপাশ দিয়া ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছে। সুধা বিস্মিত হইয়া বলিল, "ওমা, তুমি এখনো কাপড় ছাড়নি বাবা? অনেকক্ষণ ত এসেচ?" বলিয়া সে ঘরের কোণ হইতে একখানা হাতপাখা লইয়া বাতাস দিতে দিতে পুনরায় প্রশ্ন করিল, "হ্যাঁ বাবা, কিছু অসুখ করেচে নাকি?"

এতক্ষণে আচ্ছন্নতার পর শ্যামলবাবু হঠাৎ খুব জোরে একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "নাঃ, এই যাই—" বলিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া, একবার দুইচোখ সুধার মুখের পানে তুলিলেন। সুধা বলিল, "কি বাবা!"

পিতা বলিলেন, "শোন্ সুধা! তোর সঙ্গেই আমার একটু কথা আছে। আমি এখন কোথা থেকে ফির্‌চি জানিস্? লালবাজার থেকে। মা! এইমাত্র ধীরেশকে আমি পুলিশের হাজত থেকে জামিনে খালাস করে' দিয়ে আস্‌চি!"

বলিতে বলিতে তাঁর গলার স্বর একেবারে ভাঙ্গিয়া আসিল। সুধা পাথরে গড়া প্রতিমাটীর মত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পিতার মুখের উপর নিমেষহীন দুটী চোখ স্থির নিবদ্ধ। শিথিল মুষ্টি হইতে পাখাখানা মাটিতে খসিয়া পড়িতেই সে তাড়াতাড়ি তাহা তুলিয়া নিয়া আরও জোরে বাতাস করিতে লাগিল।

শ্যামলবাবু বলিলেন, "কাল রাত্রে তাকে পুলিশে ধরেচে। একটা মাগীর কাছ থেকে নগদে আর গয়নায় প্রায় ছ'হাজার টাকা ঠকিয়ে নিয়ে সে এতদিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল।"

সেই সময় সুধার মাতা সেখানে আসিয়া পড়াতে সুধা তাড়াতাড়ি পাখাখানা নামাইয়া রাখিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

তখন পশ্চিমে কনকদের বাড়ীর ওপাশে একটা বড় নারিকেল গাছের মাথায় চড়িয়া আরক্ত সূর্য্যটা উকি ঝুকি মারিতেছিলেন। তারই সিন্দুরছটা গায়ে মাখিয়া সুধা একা ছাদের ধারে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার মুখের উপর চাঞ্চল্যের কোন লক্ষণ নাই, তবে যেন তাহা আষাঢ়ের মেঘের মত গম্ভীর। কিন্তু সে মেঘে বর্ষণ ছিল না। স্বামীর এই আকস্মিক বিপদের সংবাদে তার বুকের মাঝে যে ঝড় বহিয়া যাইতেছিল, তাহাতে লজ্জা, ঘৃণা, ক্রোধ এবং ভয়, এই চারিটা অনুভূতি বুঝি সমান ভাবেই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এতদূর যে ঘটিতে পারে, তাহা সে কখনও স্বপ্নেও ভাবে নাই। এতটা নীচতা! শেষে কিনা একটা বেশ্যার পয়সা ঠকাইয়া—

আপনার মনে নানা দিক্ দিয়া সে যখন এই কথাটাকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল, সেই সময় তাহার মাতা আসিয়া তাহার হাতখানি ধরিয়া ফেলিতেই সে চমকিয়া উঠিল। মা তাঁহার জলে-ভেজা দুটি চোখ মেয়ের মুখের উপর রাখিয়া কম্পিতস্বরে বলিলেন, "কি আর করবি বল্ মা! অদৃষ্টে য' আছে তাতো হয়েচেই—"

সুধা ইহার কোন উত্তরই দিল না। মা পুনরায় বলিলেন, "কিন্তু তোর ভাসুরেরই বা কি আক্কেল বল্ মা? ছেলেটা না হয় একটা ভুলই করেছে। তাই বলে কাল রাত্তির থেকে যে সে হাজতে আছে, তাও কি একবার খোঁজ নিতে নেই?"

সুধা ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "খোঁজ নিয়ে আর কি কর্বেন বল?"

"ওমা, কি করবে কি সুধা? শুনলুম, খবর পেয়ে তোর ভাসুর নাকি বলেচেন, ও জেলে যাক্ ওর জন্যে আমি কিছু কর্তে পারবো না। এই কি ভাইয়ের মত কথা?"

কিয়ৎক্ষণ নতমুখে থাকিয়া, পরে মুখ তুলিয়া সুধা দৃঢ়স্বরে বলিল, "হ্যাঁ মা, সেই ঠিক ভায়ের মত কথা! ভদ্রঘরের ছেলে হয়ে বংশের নাম ডুবিয়ে যে এ কাষ করতে পেরেচে, তার এতবড় অপরাধ ত কখনো অম্নি অম্নি যাওয়া উচিত নয় মা!"

মেয়ের এই স্থির অকম্পিত দৃঢ় বাক্যে মা বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেলেন। তিনি বোধ করি ভাবিয়াছিলেন, সুধা একা ছাদে বসিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া এতক্ষণ কি কাণ্ডই না করিতেছে। তাই তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই তিনি তাড়াতাড়ি এখানে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি নিজেই স্তম্ভিত হইয়া দেখিলেন, মেয়ের চোখে একফোঁটা জল নাই, মুখে এতটুকু চাঞ্চল্য নাই, বুকে এতটুকু করুণাও বুঝি নাই!

৫

ধীরেশের বিপক্ষে মাম্লা চলিতে লাগিল। মাম্লা অত্যন্ত স্পষ্ট। একে একে সাক্ষীরা যাহা বলিতে লাগিল, তাহাতে তাহার অপরাধ ক্রমশঃই প্রমাণিত হইয়া আসিল। ধীরেশ তাহার পক্ষে যে একজন ছোটখাট উকীলকে নিযুক্ত করিয়াছিল, ব্যাপার দেখিয়া তিনি একটা মিটমাটের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ধীরেশকে বলিলেন, "দেখ হে, কাযটি যা' করেচ, তাতে মাম্লা চল্লে তো তোমার শ্রীঘর বাস অনিবার্য্য। তার চেয়ে কোন রকমে হাজার দেড়েক টাকা ওদের ফেলে দাও। তাতেই ওরা মিটিয়ে নিতে রাজী হয়েচে।"

ধীরেশ বলিল, "আজ্ঞে, আমার কাছে তো একটী পয়সাও নেই!"

উকীলবাবু বলিলেন, "তোমার কাছে না থাকে, বাড়ীতে কিম্বা তোমার শ্বশুরমশায়ের কাছে যোগাড় করে' নাও। নইলে কি শেষে জেল খাট্বে?"

ধীরেশ গম্ভীর ভাবে বলিল, "আজ্ঞে, সে আমি কাউকে কিছু বল্তে পারবো না।"

উকীলবাবু আরও গোটা কয়েক ধমক্ দিলেন; কিন্তু তাহাতে আসামীর দুইটা চোখ ভারী হইয়া আসিতে তিনি চুপ করিয়া গেলেন। সত্যসত্যই লোকটার জন্য তাঁহার মায়া হইতেছিল।

উকীলবাবুর অনুরোধে ও মধ্যস্থতায় প্রতিপক্ষ শেষে এক হাজার টাকায় পর্য্যন্ত মামলা তুলিয়া লইতে রাজী হইল। তিনি তখন একবার স্বয়ং শ্যামলবাবুর নিকট কথাটা পাড়িলেন। কিন্তু শ্যামলবাবু সামান্য গৃহস্থ। পূর্ব্ব হইতেই এখানে সেখানে তাঁহার দেনা নিতান্ত কম ছিল না। সুতরাং এখন একসঙ্গে এই হাজারটাকা ফেলিয়া দিবার শক্তি তাঁহার কেমন করিয়া থাকিবে? তিনি মহা বিপদে পড়িলেন। বাড়ীতে আসিয়া গৃহিণীর সহিত অনেকক্ষণ পরামর্শ করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত কিছুই মীমাংসা করিতে পারিলেন না। গৃহিণী শুধু মেয়ের দুরদৃষ্ট ভাবিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়া দিলেন।

এই মিট্‌মাটের কথা সুধার কাণেও উঠিল। স্বামীর এই ঘৃণ্য অপরাধের বিরুদ্ধে প্রথমে সে যতই নিজেকে কঠোর করিয়া তুলুক, শেষে কিন্তু তার সে কঠোরতা শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। মিট্‌মাটের এই হাজার টাকার কথা শুনিয়া সে কেবলই চিন্তা করিতে লাগিল কি করিয়া ঐ টাকাটা যোগাড় করা যায়! পূর্ণ একটা রাত সে ঘুমাইতে পারিল না। থাকিয়া থাকিয়া তার রুদ্ধ অভিমান কেবলি গর্জ্জিয়া উঠিতে লাগিল,—যদিই সে এ বিপদ হইতে উদ্ধার পায়, তাহা হইলেই কি তার মন ফিরিবে? তাহার পানে সে কি আবার স্ত্রী বলিয়া ফিরিয়া চাহিবে? তাই যদি না চায়, তবে কিসের জন্য তারই বা এত চিন্তা, এত উদ্বেগ?

কিন্তু, শেষ পর্য্যন্ত এ যুক্তি টিকিল না। মনে-মনে সে একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়া মাকে গিয়া বলিল, "মা, আমি একবার আজই সেখানে যাব। আমি গেলে, ও টাকা যোগাড় হতে বড় বেশী কষ্ট হবে না। এখন যাই মা, আবার ও-বেলাই আমি ফিরে আসব।"

মা সানন্দে সম্মতি দিলেন। সুধা পাল্কী ডাকাইয়া শ্বশুরবাড়ী গেল।

৫

স্বামী স্ত্রীতে যখন সাক্ষাৎ হইল, তখন বেলা প্রায় পাঁচটা। ধীরেশ তখনও তার বিছানার উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে উপরের কড়িকাঠগুলার পানে তাকাইয়া ছিল। সুধা ঘরে ঢুকিয়া দ্বারে অর্গল আঁটিয়া দিল। অকস্মাৎ যেন চোখের সাম্‌নে কাহার প্রেতাত্মাকে দেখিয়া ধীরেশ ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। সুধা কিন্তু সহজ ভাবে তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বিকেল বেলা শুয়ে ছিলে যে?"

ধীরেশ উত্তরে কি বলিল, তাহার একবিন্দুও বোঝা গেল না। কিন্তু তাহার পরে উপর্য্যুপরি গোটাকয়েক ঢোক গিলিয়া নিয়া সে বলিল, "তুমি কখন এলে?"

সুধা উত্তর দিল, "অনেকক্ষণ এসেচি।" ধীরেশ একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "নিজে-নিজেই?"

সুধা গম্ভীরস্বরে বলিল, "হ্যাঁ, নিজে নিজেই বৈ আর কি! আবার এই সন্ধ্যের সময়ই ফিরতে হবে।"

ধীরেশ স্তব্ধ হইয়া খোলা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া বলিল, "ওঃ! তা হ'লে আজ একবার আমার উপর প্রতিশোধ নিতে এসেচ বল?"

সুধা একবার তার চোখ দুটী স্বামীর মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া, পরে নামাইয়া নিয়া বলিল, "না। প্রতিশোধ নিতে নয়। আমি তোমার স্ত্রী। স্ত্রীর কর্ত্তব্য যেটুকু, তাই আমি করতে এসেচি।"

ধীরেশ ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "স্ত্রীর কর্ত্তব্য?"

"হ্যাঁ, বল্‌চি। বাবার মুখ থেকে আমি সব কথা শুনেচি। তোমার যে এখন টাকার বিশেষ দরকার, সেই কথা শুনেই আমার এখানে আসা।" বলিয়া একটু নীরব থাকিয়া, সুধা তার আঁচলে বাঁধা কি কতকগুলা জিনিস খুলিয়া বলিল, "এই দেখ, এই সব গয়না আমার। এর কতক আমি পরে' গিয়েছিলুম, বাকী দিদির কাছে তোলা ছিল। আমি এসে তাঁর কাছ থেকে সব চেয়ে নিয়েচি। আমার বিশ্বাস, এই গয়নাগুলো বিক্রী করলে হাজার টাকার কম হবে না।"

ধীরেশ জড়মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু তার অন্তরের ভিতর দিয়া যেন একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ তাহাকে ঘন ঘন কাঁপাইয়া তুলিতেছিল। সুধা এক একখানি করিয়া গহনাগুলি তাহার সামনে রাখিয়া বলিল, "শুনলুম, পরশু তোমার মামলার দিন। তারই ভিতর এগুলো বেচে টাকাটা তাদের ফেলে দিও।"

ধীরেশের দুই চোখ যেন কি-একটা অস্পষ্ট জালে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। তাহারই ভিতর দিয়া সে নির্নিমেষে সুধার মুখ পানে তাকাইয়া শুধু ডাকিল, "সুধা!"

একান্ত নির্লিপ্তভাবে সুধা উত্তর দিল, "কি বল!"

"তা হলে তুমি আমায় বাঁচাতে এসেচ?"

সুধা তেমনিভাবে বলিল, "আমি আর তোমায় কেমন করে বাঁচাব? আমার কি সাধ্য! তবে, যতক্ষণ আমার গায়ের এগুলো আছে, ততক্ষণ তোমার জেলে যাওয়া তো হতে পারে না। তাই, এইগুলো তোমায় দিতে এসেচি। আর কিছু না।"

তারপর দুইজনেই খানিকক্ষণ একান্ত স্তব্ধভাবে ঘরের ভিতর বসিয়া রহিল। কেহ কাহারও সহিত সহজে আর কোন কথাই কহিতে পারিল না, অথবা কেহ কাহাকেও একটা সম্বোধনও করিল না। এইরূপে আবিষ্ট ভাবে খানিকক্ষণ কাটাইয়া সুধা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তা হ'লে আমি চললুম। মামলা মিটিয়ে ফেলতে দেরী কোরো না।"—বলিয়া সে মাথা নত করিয়া ধীরেশের পদতলে প্রণাম করিয়া, আর একবারও ফিরিয়া না চাহিয়া, বরাবর ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

৬

কনক আবার বাপের বাড়ী আসিয়াছে। সেদিন বিকালবেলা সে সুধার ঘরে বসিয়া তাহার সহিত গল্প করিতেছিল। আজ ধীরেশের মামলার শেষ দিন। মামলার কথা আগাগোড়া সব শুনিয়া কনক বলিল, "এই ত' ঠিক তোমারই মত কাষ করেচ ভাই! স্বামীর চেয়ে বড় মেয়েমানুষের আর কি আছে বল?"

সুধা খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক থাকিয়া বলিল "কিন্তু, মিছে আশ্বাস দিচ্চ ভাই! স্বামীর বিপদটুকু কেটে গেল, এই যা! নইলে তাঁকে ফিরে পাবার ভরসা আমার একবিন্দুও নেই।"

ঐ সব বিষয়ে দুইজনে আরও কত-কি কথা হইতেছিল, এমন সময় বাহির হইতে শ্যামল বাবু ডাকিলেন, "সুধা!" ডাক শুনিয়াই সুধা একবার চমকিয়া উঠিল; পিতার কণ্ঠস্বর যেন অস্বাভাবিক রকম গাঢ় এবং ভারী। সে একটু থতমত খাইয়া যখন বাহিরে আসিল, সেই সময় তাহার মাতা হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিলেন, "ওগো, তবে তুমি কি করলে গো? বাছাকে তুমি কাদের হাতে রেখে দিয়ে এলে গো?"

শ্যামল বাবু চোখের জল মুছিতে মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "না, সব বিফল হল। তার তিনমাস জেল হয়ে গেছে। এই নাও মা! তোমার সব গয়না সে ফিরিয়ে দিয়েচে।" বলিয়া তিনি একটা ছোট পুঁটুলী মেয়ের হাতে দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কি একটা অনির্ব্বচনীয় শক্তিতে সুধা কিন্তু তখন পাষাণের মত অচল। অতি ধীরে সে ঘরের ভিতর আসিয়া গহনার পুঁটুলীটি খুলিতেই একটুকরা কাগজ তাহার নজরে পড়িল। তুলিয়া লইয়া দেখিল,—ধীরেশের হস্তাক্ষরে তাহাতে কয়েকছত্র লেখা রহিয়াছে। সুধার তখন নিশ্বাস প্রায় রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সেই অবস্থায় সে লেখাটী পড়িয়া ফেলিল।—

"সুধা!

আমি জেলেই চল্লুম। তোমার গয়নাগুলতে আমি বাঁচতে পারতুম, কিন্তু, বুঝলুম, সে বাঁচায় কোনো লাভ নেই। যাতে এবার ফিরে এসে আমি তোমার স্বামী হবার যোগ্য হতে পারি, তারই জন্যে আমি এই শাস্তি; মাথায় তুলে নিলুম। তোমার গয়না আমি চাই না। যা পেলে আমি ধন্য হতে পারবো, ফিরে এলে তাই তুমি আমায় দিও। ইতি—

ধীরেশ।"

সুধার দেহের প্রতি পরমাণুটী পর্য্যন্ত যেন পাষাণে রিণত হইতেছিল। চোখের জল মুছিতে মুছিতে কনক লিল, "তাই তো ভাই, এ কোত্থেকে কি হ'য়ে গেল! কন্ যে তিনি এরকম কর্‌লেন—"

সুধা হঠাৎ সুপ্তোত্থিতার মত কথা কহিল। কনকের খের পানে চাহিয়া বলিল, "না ভাই না, আমার মনে হয়, ঠিক কাযই করেচে। আজ যে সে তার অপরাধের স্তিটুকু মাথায় পেতে নিতে পেরেচে, তাতে যেন আমার মনে একটা গৌরব আসচে। সই! এই তিন মাসে তার আমার যত কষ্টই হোক্, কিন্তু তার পর যখন সে ফিরে আস্‌বে, তখন—তখন্ আমাদের দুজনের মাঝ আর কোন আড়ালই থাক্‌বে না দিদি!"

বলিতে বলিতে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু তার দুই গণ্ড বাহিয়া পড়িতে লাগিল।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল।

জৈন যুগের মথুরা

নীতিশাস্ত্রকারেরা উপদেশ দিয়া থাকেন—"সত্যং য়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" কিন্তু তিহাসিকগণের পক্ষে এ নীতি-পথে চলিলে সত্যের পলাপ করা হয়। কবি ও ঔপন্যাসিকেরা এই নীতিবশে লিতে পারেন, কিন্তু ঐতিহাসিককে যাহা সত্য ঘটিয়াছে হা অপ্রিয় হইলেও বলিতে হইবে। আমরা এবার সকল কথা বলিতে যাইতেছি, সেগুলি হয়ত প্রচলিত শ্বাসের বিরোধী, এবং হিন্দুশাস্ত্রানুগত না হইতেও রে। ভরসা করি পাঠকগণ সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার ন্য আমাদিগের সেই অপ্রিয় সত্যকথাগুলিকে দোষা- বলিয়া মনে করিবেন না।

আমরা পূর্ব্বগত দুই সংখ্যায় "বৈদিক ও পৌরাণিক গ মথুরা" প্রবন্ধে বেদ, রামায়ণ ও পুরাণাদি ইতে যে সমস্ত বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছি, সেগুলি ধুনিক কঠোরব্রত প্রতীচ্য প্রত্নতাত্ত্বিকগণের নিকট প্সরা নূপুর-নিক্কণ-নিন্দিত" সুমধুর সংস্কৃত ভাষায় চিত, কবিকল্পনা-প্রসূত, সুনীতিমালা পূর্ণ, অলীক খ্যান বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। তাঁহারা আজি স্ত ঐ সকল-কাব্য মধ্যে কোন রূপ সত্য ইতিহাস ছে কি না তাহা নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিতে সমর্থ নাই। ভাগবত, মৎস্য, বিষ্ণু, বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড ও ভবিষ্যপুরাণে গুপ্ত রাজগণের ও কোন কোন প্রাচীন রাজবংশের ছিন্নভিন্ন ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি ভিন্‌সেণ্ট্ স্মিথ্ প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা শিলা লেখ, তাম্রশাসন, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি পাথুরে প্রমাণ ভিন্ন সে সমস্ত পৌরাণিক ইতিবৃত্তগুলিকে তাঁহাদের বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস গ্রন্থ মধ্যে স্থান দিতে অসম্মত।

আমরা এ পরিচ্ছেদে যে সকল বৃত্তান্ত বিবৃত করিব, তাহার কিয়দংশ স্বয়ং ভগবতী বসুন্ধরা বিস্মৃতির তিমিরাবৃত যবনিকা অপসারিত করিয়া, এবং নিজ কালবিজয়ী বক্ষ উদ্‌ঘাটিত করিয়া অক্লান্তকর্ম্মা ঐতিহাসিকগণকে রত্নরাজি রূপে উপহার দিয়াছেন। এবং কিয়দংশ বা পৃথিবীর পূর্ব্বপ্রান্তবাসী সৌগত চৈনিক পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে সংগৃহীত। ভারতীয় ব্রাহ্মণ রচিত গ্রন্থমালা মধ্যে সে সকল অভ্রান্ত সত্যের স্থান নাই। তবে পালি ভাষায় রচিত তিব্বৎ, ব্রহ্ম, বা সিংহল দেশের বৌদ্ধ গ্রন্থমধ্যে তাহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভগবদ্গীতায় লিখিত আছে—"যদা যদা তু ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥" প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু সমাজে ধর্ম্মের বিরূপ গ্লানি হইয়াছিল, আমরা এখানে

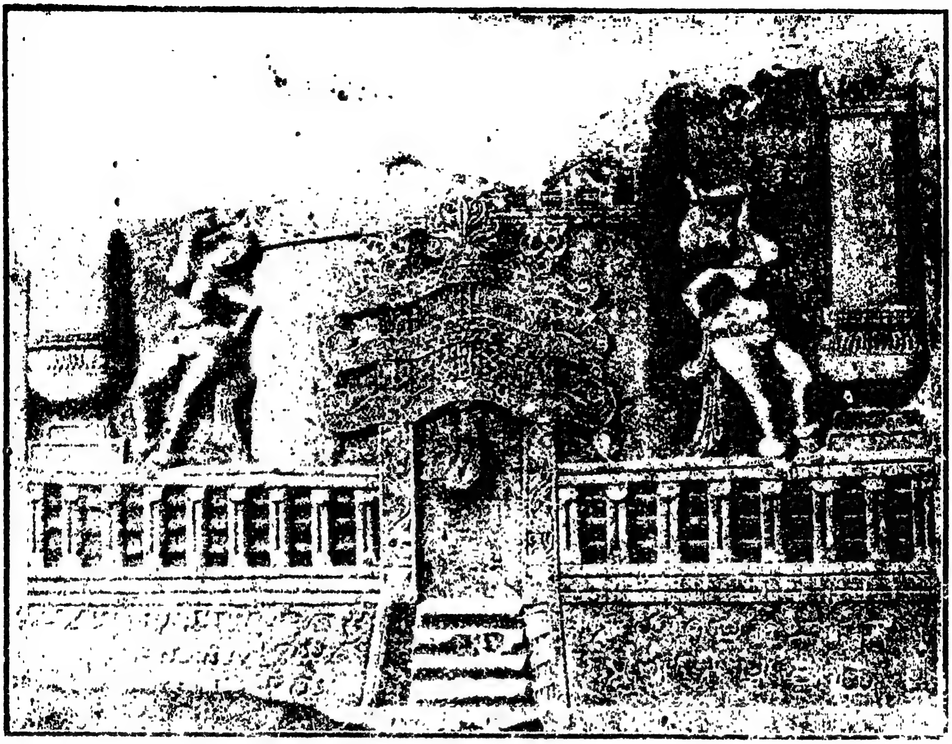

১। পাষাণ-ফলকে অঙ্কিত জৈন স্তূপ

পুরাণাদি হইতে তাহার কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, নতুবা জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তির কারণটা বিশদ ভাবে বুঝা যাইবে না।

বৈদিক্ যুগের ভারতীয় আর্য্য পিতামহগণ সূর্য্য, অগ্নি, মরুৎ, বরুণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সৃষ্ট পদার্থগুলিতে দেবত্ব আরোপ করিয়া, হুতাশনে হবি আহুতি দিয়া ও নানাবিধ জীব বলি দিয়া স্রষ্টার উপাসনা করিয়া আসিতেছিলেন।

পরবর্ত্তী কালে ব্রাহ্মণ্য ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রবলতর হইলে পুরাণাদিতে সেই সকল বেদোক্ত প্রাকৃতিক দেবতার স্থলে রাম, কৃষ্ণ, ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি দেবতার নামে বীরোপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল। তাঁহারা দেবতাগণের প্রীতির জন্য এবং আপনাদিগের স্বার্থলাভোদ্দেশে নানাবিধ আড়ম্বরপূর্ণ যজ্ঞাদি করিতেন। ঐ সকল যজ্ঞে অবাধে অধিকতর জীবহিংসা চলিতে লাগিল— খেচর, ভূচর, জলচর, কোন প্রাণীই বাদ পড়ে নাই। অশ্বমেধ, গোমেধ ত দূরের কথা, নরমেধ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। একাদশ যুগে এই নরমেধ যজ্ঞে কত বিভিন্ন জাতীয় মানবের প্রাণ বধ করা হইত তাহা যজুর্ব্বেদের ৩০ অধ্যায়ে ৫ম সূত্রে "ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ে রাজন্যং" প্রভৃতি বচনে দেখিতে পাইবেন। শক্তি-পীঠে নরবলি ত ছিলই। আবার তৈত্তিরীয় সংহিতায় পাইবেন—দেবরাজ ইন্দ্রকে শূকর, বরুণ রাজাকে কৃষ্ণসার হরিণ, যম রাজাকে ঋষ্যমৃগ, ঋষভ দেবকে গবয় বা নীলগাই, বনের রাজা শার্দ্দূলকে গৌর মৃগ, পুরুষের রাজাকে মর্কট, শকুন (পক্ষী) রাজকে বতক (হংস), নীলাঙ্গ সর্পরাজকে ক্রিমি, ওষধিরাজ সোমকে কুলঙ্গ, সমুদ্রের রাজাকে শিশুমার, এবং পর্ব্বতরাজ হিমালয়কে হস্তী বলি দিয়া প্রসন্ন করিতে হয়। কলিযুগে এগুলি নিষিদ্ধ হইলেও, আজি পর্য্যন্ত ভারতের নানা শক্তিপীঠ, সকাম সাধনার স্থলে, যে সকল প্রাণী উৎসর্গ করা হইতে পারে তাহার একটী

তালিকা আমরা কালিকাপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। যথাঃ—"পক্ষী, কচ্ছপ, কুম্ভীর, মৎস্য, নব প্রকার মৃগ, মহিষ, গোধিকা, গো, ছাগ, নকুল, শূকর, গণ্ডার, কৃষ্ণসার, সরভ, সিংহ, ব্যাঘ্র, মনুষ্য ও স্বীয়-শরীরের রক্ত, এই সমুদয় বস্তু চণ্ডিকা ভৈরবাদির বলি। বলিদ্বারা মুক্তি সাধন হয় এবং স্বর্গ সাধন হয়।" তৎসঙ্গে সুরাপান ও ব্যভিচার পর্য্যন্ত যে সাধনার অঙ্গরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহা না বলিলেও চলে। ইহা ত গেল, জীবিতগণের কথা। মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্দেশে "পল পৈতৃকং" মাংস দিয়া শ্রাদ্ধ করাও বাদ পড়ে নাই।

আজিকার দিনে গোহত্যা ঘৃণাকর, অকথ্য ও অশ্রাব্য হইলেও, ভারতের সেই প্রাচীন স্বাধীনতার দিনে ইহা সাধারণ জনগণ মধ্যে এতই প্রচলিত ছিল যে, তখনকার সম্ভ্রান্ত গৃহস্থরা, এমন কি মুনিঋষিরা পর্য্যন্ত, কোন মাননীয় অতিথি গৃহে সমাগত হইলে গোমাংস দিয়া তাঁহার আতিথ্যসৎকার করিতেন; সেই জন্য অতিথির অপর একটী নাম "গোঘ্ন"। পাঠকগণের মধ্যে হয়ত অনেকেই উত্তররামচরিতে এইরূপ আতিথ্য সৎকারের বিবরণ পড়িয়া থাকিবেন। ইহা ত গেল সামাজিক ব্যাপার। এবার আমরা উপাসনা ও সামাজিক ব্যাপার ছাড়িয়া দিয়া, বৈষ্ণবগণের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবগণের ভোজনোৎসবের একখানা চিত্র হরিবংশ (১৪৭ অধ্যায়) হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পাঠকগণ তাহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে কত বিভিন্ন প্রকার জীবহিংসা করিয়া দ্বাপরযুগের শেষে ভোজন ব্যাপার সম্পন্ন হইত।

"অনন্তর নৃত্য ক্রীড়া শেষ হইলে ভগবান নারায়ণ জলকেলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সলিল হইতে সমুত্থিত হইলেন। এবং মুনিবর নারদকে উৎকৃষ্ট অনুলেপন প্রদান করিয়া পরে স্বয়ং সর্ব্বাঙ্গ অনুলিপ্ত করিলেন। যাদবগণও উপেন্দ্রকে সমুত্থিত দেখিয়া, জলকেলি পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর বেশবিন্যাস সমাপন হইলে কৃষ্ণের আদেশানুসারে সকলে ভোজন স্থানে সমবেত হইলেন। শুদ্ধাচার পাচকগণ অম্লচুক্র, অর্থাৎ অম্লশাক অপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রদত্ত দাড়িমরস দ্বারা সুপক্ক মাংস, শূল্য মাংস (শিক্ কাবাব) ও নানাবিধ পশুমাংস পরিবেশন করিতে লাগিল। কেহ কেহ ঘৃতসিক্ত শূল্যপক্ক অম্ল বেতস, চুক্র এবং লবণমিশ্র, স্থূল বাল-মহিষমাংস সকল পাচক-

২। সিংহলাঞ্ছন মহাবীর বৰ্দ্ধমান

৪। দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের মহাবীর মূর্ত্তি

দিগের আদেশক্রমে পরিবেশন করিতে লাগিল। কেহ কেহ অতিস্থূল মৃগমাংস খণ্ড সকল সুসিদ্ধ ও চুক্র ও আম্রদ্বারা পরিপক করিয়া তাহাই পরিবেশন আরম্ভ করিল। কেহ কেহ ঘৃতসিক্ত এবং সামুদ্র চূর্ণ (কর্কচ লবণ) ও চূর্ণ মরিচযুক্ত সুপক বিবিধ পশুর পার্শ্বমাংস-খণ্ড সকল পরিবেশন করিতে লাগিল। মূলক, দাড়িম, মাতুলঙ্গ (টাবা লেবু) এবং পর্ণাস, হিঙ্গু, আর্দ্রক ও শাক সকল অবলম্বন করিয়া যাদবগণ পরমাহ্লাদে উৎকৃষ্ট পানপাত্রে পানীয় সকল পান করিতে লাগিলেন। পান সময়ে চতুর্দ্দিকে প্রিয়তমাগণ পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। পরে সকলে একত্র হইয়া কটুরস যুক্ত শলাকায় আবিদ্ধ, ঘৃত, অম্ল, সৌবর্চ্চল (সাচ লবণ) যুক্ত ও তৈলসিক্ত পক্ষিমাংস সকল অবলম্বন পূর্ব্বক মৈরেয়, মাধ্বীক, সুরা ও আসবাদি নানাবিধ মদ্যপান করিতে লাগিলেন। তথায় শ্বেতবর্ণ, লোহিত বর্ণ, সুগন্ধ মহিষী দুগ্ধ সিদ্ধ ঘৃতপূর্ণ, লবণযুক্ত নানাপ্রকার খাদ্য সকল আহৃত হইল। উদ্ধব ও ভোজ প্রভৃতি যাঁহারা মদ্য-মাংস-বিরত, তাঁহারা স্বতন্ত্র একস্থানে উপবেশন করিয়া শাক, সূপ, পিষ্টক, দধি ও দুগ্ধযুক্ত খাদ্য এবং আম্র প্রভৃতি ফল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে উৎকৃষ্ট কপর্দ্দক নির্ম্মিত পানপাত্রে নানাবিধ সুগন্ধ কাঞ্জিক এবং শর্করা যুক্ত বিশুদ্ধ সুস্বাদু উদক পান করিতে আরম্ভ করিলেন।"

বৃন্দাবনে মা যশোদা শৈশবে যাঁহার মুখে ক্ষীর, সর ও নবনীত তুলিয়া দিতেন, তাঁহার এই রূপ আসুরিক ভোজন প্রথা দেখিয়া, আজিকালিকার গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় চমত শিহরিয়া উঠিবেন। কিন্তু ভারতে যেদিন স্বাধীনতা ছিল, সে সময়ের বীরপুরুষেরা যে এইরূপেই আহারাদি সম্পন্ন করিতেন তাহাতে নিন্দা বা অগৌরবের কোন কারণ নাই। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বদেশেই এই ভাবে জীবহিংসা করিয়া বীরপুরুষগণের ভোজন সম্পাদিত হইত, এবং আজিও হইয়া থাকে।

খৃষ্ট জন্মের প্রায় পাঁচ ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয়

আর্য্যেরা দেবারাধনা বা সামাজিক উৎসবে অসংখ্য প্রাণী হিংসা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মের এইরূপ গ্লানি (দেখিয়া পূর্ব্বোদ্ধৃত "যদা যদা তু" গীতা বাক্য স্মরণ করুন) দুইজন মহাপ্রাণ ক্ষত্রিয় সন্তান করুণ রসে বিগলিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ-দিগের আচরিত জীবহিংসা-মূলক নৃশংস ক্রিয়া কলাপ-গুলিকে রোধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের একজনের নাম 'মহাবীর' 'বর্দ্ধমান', অপরের নাম কর্ম্মবীর 'সিদ্ধার্থ'। ইঁহারা দুইজনে "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" বলিয়া যে ধর্ম্মমত প্রচার করেন, তাহার একটী জৈন ধর্ম্ম ও অপরটী বৌদ্ধ ধর্ম্ম। তবে জৈন ধর্ম্ম ভারতেই আবদ্ধ ছিল বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের বাহিরে গিয়া

এই জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সহিত মথুরার প্রাচীন ইতিহাস অচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত আছে। কোন নদীর চরে জলস্রোতে আনীত কর্দ্দম স্তর যেমন পূর্ব্ব বালুকা স্তরকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে, মথুরাতেও কালবশে প্রবল হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব সেইরূপ জৈন ও একেবারেই লোপ করিয়া দিয়াছিল। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এখানে যে সকল কারুকার্য্য-খচিত সমুন্নত জৈন ও বৌদ্ধ স্তূপ এবং মন্দিরাদি ছিল, ১০১৮ খৃষ্টাব্দে মামুদগজনী তাহা ভাঙ্গিয়া ও দগ্ধ করিয়া বিকৃতাকার করিয়া দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে মথুরার মুসলমান ও হিন্দু অধিবাসীরা তৎসংলগ্ন ইষ্টক ও প্রস্তরাদি লইয়া অবাধে আপনাদের ভবন-নির্ম্মাণের উপাদান করিয়াছেন। আজিও মথুরার নানাস্থানে বহু সংখ্যক উচ্চ মৃত্তিকা স্তূপ বা টিলা দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলির উপর এখন হিন্দু দেবতার মন্দিরাদি স্থাপিত হইয়াছে। কোথাও ভূগর্ভ হইতে কোনরূপ সেকালের প্রস্তর-নির্ম্মিত ভগ্ন খণ্ড সকল আবিষ্কৃত হইলে, সাধারণ লোকে ও চৌবে ঠাকুরেরা সেগুলিকে কংসরাজার বা যদুবংশীয়দিগের কীর্ত্তি বলিয়া অনভিজ্ঞ যাত্রীদের নিকট পরিচয় দিয়া থাকেন। স্তূপ সংলগ্ন রেলিংয়ের স্তম্ভে সেকালে বিচিত্রাকারে নারী মূর্ত্তি সকল উৎকীর্ণ হইত। এখন সেগুলি রাধা, ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি ব্রজাঙ্গনাগণের আখ্যা লাভ করিয়াছে—কোথাও বা সিন্দুর চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া হিন্দু দেব-দেবী রূপে পূজিত হইতেছে। এইরূপে কালের কঠোর ও অপরিহার্য্য বিধানে জৈন ও বৌদ্ধ কীর্ত্তিমালা বহুদিন যাবৎ বিস্মৃতির তিমির গহ্বরে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। আমাদিগের ব্রাহ্মণগণ রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ঘুণাক্ষরেও মথুরায় জৈন ও বৌদ্ধগণের অস্তিত্বের কোনই উল্লেখ পাওয়া যায় না। কেবল

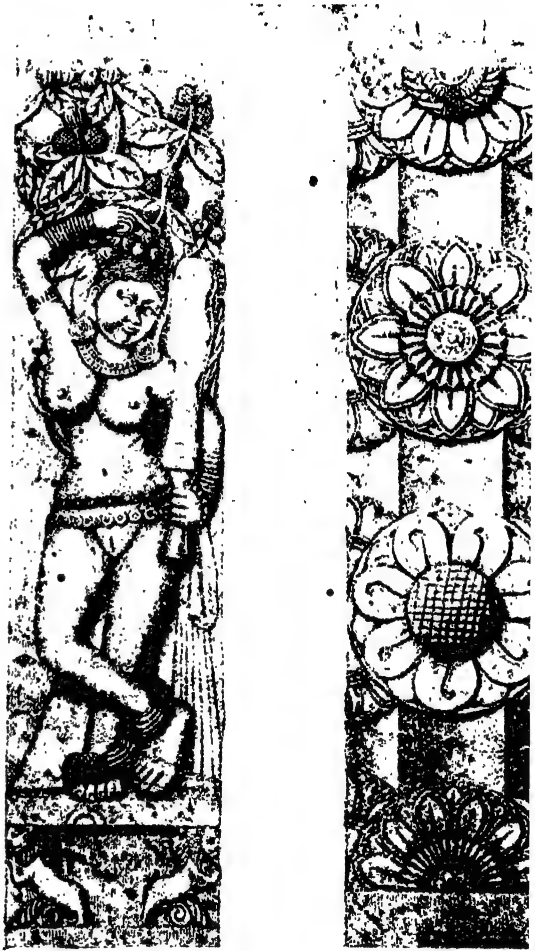

৪। রেলিং স্তম্ভের উভয় দিক
একদিকে দিব্যাঙ্গনা, অপর দিকে কমলদল।

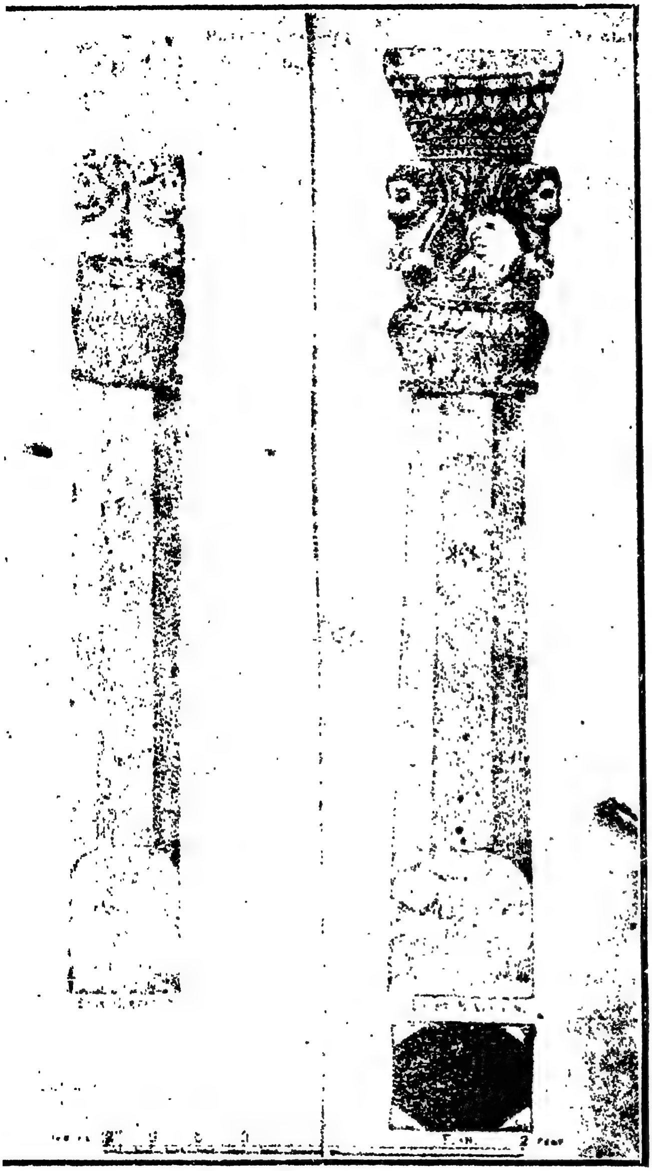

৫। সিংহশীর্ষ মন্দির-স্তম্ভ

পুরাণের একটী মাত্র শ্লোকে মথুরার এক ঘাটের [illegible]

ব্রিটিশ রাজ ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মথুরা মণ্ডলকে নিজ ীনে আনেন; ইহার পর হইতে জেম্‌স প্রিন্সেপ সাহেব মথুরা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে দুইচারিটী লাল প্রস্তর নির্ম্মিত কারুকার্য্য-খচিত ধ্বংসাবশেষ কলিকাতার যাদুঘরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেগুলি এখনও তথাকার দক্ষিণ দিকের গৃহে রক্ষিত আছে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে আর্কিয়লজিকাল্ সার্ভে ডিপার্টমেণ্টের ডিরেক্টর্ জেনারেল্ আলেক্‌জাণ্ডার্ কানিংহাম্ সাহেব, মথুরায় প্রাপ্ত একটী ভগ্ন স্তম্ভ গাত্রে, দক্ষিণ হস্তে শাখা ধরিয়া শাল তরুমূলে দণ্ডায়মানা নারীমূর্ত্তি দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সেটী বুদ্ধদেবের জননী মায়াদেবীর মূর্ত্তি। এবং এই মথুরায় একদা যে বৌদ্ধদিগের প্রভাব ছিল তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজকেরা তাহার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী।

আমরা প্রথমে একে একে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়া, পরে কোথায় কিরূপে তাহাদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে সে পরিচয় দিব।

জৈনধর্ম্ম।

খৃষ্ট জন্মের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে, প্রাচীন পাটলিপুত্র নগরের প্রায় চৌদ্দ ক্রোশ উত্তরে, কুণ্ডলপুরী বা বৈশালি নগরে ক্ষত্রিয়কুলে মহাবীর বর্দ্ধমানের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম সিদ্ধার্থ, মাতা ত্রিশলা।* তিনি ত্রিশ বৎসর

---

* এই বর্দ্ধমানের জন্ম সম্বন্ধে একটি অলৌকিক আখ্যান আছে। বৈষ্ণব গ্রন্থে দেবকীর গর্ভ হইতে মহামায়া বলরামকে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই জন্ত বলরামের একটি নাম সংকর্ষণ। জৈনশাস্ত্রে হরিণমেষা নামে

৬। শ্বেতাম্বরীয় জৈন পুরোহিত

বয়ঃক্রম কালে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়া, অবশিষ্ট জীবন 'অহিংসা পরমো ধর্ম্ম' প্রচারে অতিবাহিত করেন। জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্রের মতে বিক্রম সম্বতের ৪১০ বৎসর পূর্ব্বে পাবাপুরী বা বিহারে মহাবীরের নির্ব্বাণলাভ হয়। "জৈন সূত্রাঙ্গ" নামক পুঁথিতে ইঁহার আখ্যান আছে। ইঁহার উপাধি জিন্ অর্থাৎ যিনি ষড়রিপু জয় করিয়াছেন। এই জিনের ধর্ম্ম হইতেই জৈনধর্ম্ম নাম হইয়াছে। জৈনগণের মধ্যে ২৪ জন তীর্থঙ্কর আছেন। তাঁহাদের সকলকেই বীতরাগ (বিকার বিহীন), অরহন্ত বা অর্হৎ (দেব পূজ্য), সর্ব্বজ্ঞ, পরমেষ্ঠী (উচ্চপদারূঢ়), এবং শাস্তা (উপদেষ্টা) নামে অভিহিত করা হয়। ঐ ২৪ জন তীর্থঙ্করের নাম :—

(১) আদিনাথ বা ঋষভদেব, ইঁহার ধ্বজা, লাঞ্ছন বা চিহ্ন বৃষ, ( ) অজিত নাথ - ধ্বজা হস্তী (৩) শম্ভুনাথ—ধ্বজা অশ্ব, (৪) অভিনন্দন—ধ্বজা বানর, (৫) সুমতিনাথ—ধ্বজা চক্রবাক্ (৬) পদ্মনাথ - ধ্বজা পদ্ম, (৭) সুপার্শ্বনাথ—ধ্বজা স্বস্তিক, (৮) চন্দ্রপ্রভ—ধ্বজা চন্দ্রকলা, (৯) পুষ্পদন্ত—ধ্বজা কুম্ভীর, (১০) শীতলনাথ—ধ্বজা কল্পবৃক্ষ, (১১) অংশুনাথ—ধ্বজা গণ্ডার, (১২) বাসুপূজ্য—ধ্বজা মহিষ, (১৩) বিমলনাথ - ধ্বজা শূকর, (১৪) অনন্তনাথ—ধ্বজা শজারু, (১৫) ধর্ম্মনাথ—ধ্বজা বজ্র, (১৬) শান্তনাথ-ধ্বজা হরিণ (১৭) কুন্থনাথ—ধ্বজা ছাগ, (১৮) অরনাথ-ধ্বজা মৎস্য, (১৯) মল্লীনাথ—ধ্বজা কলস, (২০ সুব্রতনাথ—ধ্বজা কচ্ছপ, (২১) নমিনাথ—ধ্ব সদন্ত পদ্ম, (২২) নেমিনাথ—ধ্বজা শঙ্খ, (২৩) পা নাথ—ধ্বজা সর্প, (২৪) বর্দ্ধমান্ বা মহাবীর স্বামী ধ্বজা সিংহ।

এই সকল তীর্থঙ্করগণের মধ্যে কেবল মহ বীরকেই ঐতিহাসিক লোক বলিয়া জানা গিয়াছে বৌদ্ধগ্রন্থে মহাবীরের নাম নিগ্রন্থনাথ পুত্র'। জৈনে প্রধানতঃ দুই সম্প্রদায়ে বা পন্থ বিভক্ত - দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর পন্থ। সকল তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি দেখি প্রায় একরূপ। উভয় সম্প্রদায়েরই ঠাকুরগুলি ক্রো দেশে হস্ত রাখিয়া পদ্মাসন-মুদ্রায় উপবিষ্ট। হৃদে উপর শ্রীফল অর্থাৎ নারিকেল রক্ষিত, এবং শিরোপ

দেব সেনাপতি ইন্দ্রাদেশে, ব্রাহ্মণী দেবানন্দার গর্ভ হইতে বর্দ্ধমানকে আকর্ষণ করিয়া ক্ষত্রিয়াণী রাজমহিষী ত্রিশলা গর্ভে স্থাপন করেন। এই হরিণমেষার অপর নাম নৈগমেষা, আকার মানব দেহের উপর ছাগ মেষ অথবা হরিণ মুণ্ড। মথুরায় কঙ্কালী টিলায় হরিণমেষা আকার সহ বর্দ্ধমানের জন্ম চিত্র পাওয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন পক্ষযুক্ত মানব যুগল মূর্ত্তি ও মহিষাসুরের ন্যায় ঘোটকের স্কন্ধ কটিদেশ পর্য্যন্ত বিনির্গত কিন্নর মূর্ত্তি এবং বীণাহস্তে নৃত্য গীতে রত কয়েকটি গন্ধর্ব্ব মূর্ত্তির এই জৈন টিলায় পাওয়া গিয়াছে। এ সকল গুলিই প্রায় ভগ্নদেহ।

ার মুকুট বা শিখা সমন্বিত। কোন মূর্ত্তির আসনের ক্ষিত বৃষ, হস্তী প্রভৃতি বাহন বা ধ্বজা দ্বারাই দের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। দিগম্বর পন্থের য় তীর্থঙ্করগুলির মূর্ত্তি বসনভূষণহীন, নগ্ন। সে দেবমূর্ত্তির নয়নে কাঁচের বা মণির চক্ষু বসান

ইঁহাদের প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথ বা ঋষভদেব বসন ত্যাগ করিয়া দিগম্বর সম্প্রদায়ের মত প্রবর্ত্তন ন। ইঁহার বহুবৎসর পরে ভদ্রবাহু নামে একজন মুনি দুর্ভিক্ষে দুরবস্থায় পড়িয়া, দক্ষিণ দেশে যাইয়া ম্বর মত প্রচলন করেন। শ্বেতাম্বরীদিগের সাধুরা ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং দেবমূর্ত্তি গুলিকেও ভূষণে ভূষিত রাখেন। প্রতিমার নয়নে মণি বা নির্ম্মিত চক্ষু বসান থাকে।

এই পদ্মাসন মুদ্রা ছাড়া জৈন তীর্থঙ্করগণের আর প্রকার দণ্ডায়মান মূর্ত্তি আছে, তাহার দুই পার্শ্বে বিলম্বিত, কাহারও এক হস্তে ভিক্ষা পাত্র। এ ুলির নাম 'কায়োৎসর্গ মুদ্রা।' ইহা সংখ্যায় স্বল্প। দ.ম্বরী সাধুরা নগ্ন থাকেন বলিয়া কেহ কেহ দিগকে উন্মাদ আখ্যা দিয়া থাকেন। কৃজন্দর্ যখন ভারত জয় করিতে আইসেন, দণ্ডীনামে একজন দিগম্বর সন্ন্যাসীর সহিত র সাক্ষাৎ হইয়াছিল। গ্রীকেরা দিগম্বরী সন্ন্যাসি-Gymnosophist বা Naked philosophers দিয়াছিলেন।

জন ধর্ম্মের মূল সিদ্ধান্ত আত্মার অমরত্ব। অহিংসা, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও পরিগ্রহত্যাগ, এই পঞ্চব্রত ধ। নিজ কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ ও পরিণামে প্রকৃত ত, বা জরা মরণ-রহিত মোক্ষপদ-প্রাপ্তি। জৈনেরা প্রয়, সংযমী ও অহিংসাপরায়ণ। ইঁহারা ব্রাহ্মণদিগের াতিভেদ মানেন, দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, অষ্টমী, একা-তুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে উপবাস ালন করিয়া থাকেন। পুরোহিত দ্বারা ধর্ম্ম কর্ম্মের ন করিয়া থাকেন। বিবাহ প্রভৃতি সংস্কারে টা হিন্দু মতেরই অনুসরণ করিয়া চলেন। মৃত্যুর পর শবদাহ ও অশৌচ পালন করেন; কিন্তু পূর্ব্বপুরুষগণকে পিণ্ডদান করেন না। চতুর্দ্দশ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পর দিবস কুটুম্ব-ভোজন করাইলেই হইল। ইঁহাদের পুরোহিতগণের উপবীত নাই। কেবল উত্তরীয়খানা দক্ষিণ বাহুর নিম্ন দিয়া বাম স্কন্ধের উপর নিক্ষিপ্ত থাকে। প্রাণী-বিনাশ ভয়ে ইঁহাদের পুরোহিতেরা ব্যজনী বা রজোহরণ (সূত্র নির্ম্মিত সম্মার্জ্জনী) হস্তে বিচরণ করেন। কোন স্থানে উপবেশন করিতে হইলে তাঁহারা অগ্রে ক্ষুদ্র জীবগণকে তদ্দ্বারা অপসারিত করিয়া উপবেশন করেন। প্রাণিবিনাশ ভয়ে জৈনেরা সন্ধ্যার পর আহার পর্য্যন্ত করেন না। ইঁহারা এতদূর অহিংসাপরায়ণ যে মৎস্য মাংস গ্রহণ করা দূরে থাকুক, মশক, মৎকুন, বা পিপীলিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্রতম জীবকেও বিনাশ করা পাপ মনে করেন। শাস্ত্রপাঠ কালে কথক ঠাকুর নাসিকা ও মুখ পর্য্যন্ত বস্ত্র দিয়া আবৃত করিয়া রাখেন, পাছে মুখে কোন ক্ষুদ্র কীট প্রবেশ করে। জৈন পৌরাণিক গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ নবম নারায়ণ রূপে অভিহিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার সহিত ইঁহাদিগের দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর নেমিনাথের জ্ঞাতি-সম্পর্ক ছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। সে আখ্যানটী এই রূপ :—

যদুবংশে অন্ধকবৃষ্টি নামে একজন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তাঁহার দশ পুত্র. সর্ব্ব জ্যেষ্ঠের নাম সমুদ্রবিজয় ও সর্ব্ব কনিষ্ঠের নাম বসুদেব। সমুদ্রবিজয়ের ঔরসে শিবা দেবীর গর্ভে নেমিনাথের. এবং বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। ইঁহারা সকলেই মথুরায় বাস করিতেন। কোন কোন মতে নেমিনাথের শৌরীপুর (শূরসেন পুরী) বা মথুরায় জন্ম। অপরের মতে দ্বারকায় জন্ম। মহাপ্রতাপান্বিত মগধরাজ জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক স্বীয় জামাতা কংসের বধ-সংবাদ শুনিয়া মথুরাপুরী আক্রমণ করেন। যাদবেরা জরাসন্ধের তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া সৌরাষ্ট্র দেশের সমীপবর্ত্তী দ্বারিকায় যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। নেমিনাথ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া তথায় রাজা

হইলেন। নেমিনাথের যৌবন কালে শ্রীকৃষ্ণ, জুনাগড়ের রাজা উগ্রসেনের পরমা সুন্দরী তনয়া 'রাজীমতীর' সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। নেমিনাথ বররূপে পরিণয় দিনে জুনাগড়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, একস্থানে ছাগ, মেষ প্রভৃতি অনেকগুলি পশু বাঁধা রহিয়াছে। সারথিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে বরযাত্রীদিগের ভোজন পরিতৃপ্তি জন্য এই সকল পশু সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি এতগুলি নিরীহ পশুর বধাশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিলেন। পরিণয়ানন্দের পরিবর্ত্তে তাঁহার মনে অকস্মাৎ এক বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়িল। নেমিনাথ ভাবিতে লাগিলেন, "আমারই বিবাহোৎসব জন্য, এতগুলি নিরপরাধ জীব প্রাণ হারাইবে! বধকালে ইহাদের ভীষণ মৃত্যুযন্ত্রণার চীৎকার ভগবানের চরণতলে পৌঁছিলে আমি কি সুখী হইব? আমি এরূপ স্বার্থপর অনিত্য সুখ চাহি না। আমি অদ্য হইতে এমন পথ অবলম্বন করিব, যাহাতে সকল জীবের দুঃখনাশ হইয়া পরিণামে বিমল সুখ লাভ হইতে পারে।" সেই রাত্রেই তিনি বিবাহ-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া রথ হইতে নামিয়া জুনাগড়ের অন্তর্গত রামগিরি বা গিরনার পর্ব্বতের উপর চলিয়া গেলেন। তথায় জৈনদীক্ষা গ্রহণ করিয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই ঘটনার পর হইতে নেমিনাথকে জৈনেরা তীর্থঙ্কররূপে পূজা করিতে লাগিল। 'নেমিদূত' বা 'নেমিচরিত' নামে একখানি সংস্কৃত পুস্তক আছে। তাহার বিশেষত্ব এই যে কালিদাস কৃত মেঘদূতের প্রত্যেক শ্লোকের শেষ চরণ গ্রহণ করিয়া, সমস্যা পূরণাকারে জৈন কবি বিক্রম এই কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। ইঁহাদের 'পাণ্ডব চরিত্র' নামক পুস্তকেও নেমিনাথের আখ্যান আছে। ইঁহাদের অনেকগুলি মূল গ্রন্থ প্রাকৃত মাগধী বা তৎকাল প্রচলিত হিন্দী ভাষায় রচিত। কিন্তু সেগুলির টীকার ভাষা সংস্কৃত। ইঁহারা পুনর্জ্জন্ম মানেন। কেহ প্রণাম করিলে 'ধর্ম্মলাভ' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে 'পিঞ্জরাপোল' নামে যে পশুশালাগুলি আছে, তাহা প্রধানতঃ জৈনগণের উদ্‌যোগেই সংস্থাপিত। বর্ষার চারিমাস হিন্দু সন্ন্যাসীরা লোকালয়ে থাকিয়া কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে বিহারে (ভ্রমণে) বাহির হইতেন। জৈন তীর্থঙ্করেরাও বুঝি সেই প্রথা অনুকরণ করিয়া হিন্দুদিগের রাসপর্ব্ব দিনে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে দেশ পর্য্যটনে বাহির হইতেন। এই ঘটনার স্মৃতি রক্ষার জন্য আজিও কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর উভয় সম্প্রদায়ের জৈনেরা, আপন আপন তীর্থঙ্করগুলির মূর্ত্তি লইয়া মহাসমারোহে শোভাযাত্রা করিয়া থাকেন। এত স্বর্ণ-রজত মণি-মাণিক্য-মণ্ডিত দ্রব্য সম্ভার লইয়া অপর কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় শোভাযাত্রা করেন কিনা সন্দেহ।

রৈবতক (গির্ণার), অর্ব্বুদাচল (আবু), শত্রুঞ্জয় (সুরাট), পার্শ্বনাথশিখর, রাজগৃহ ও খণ্ডগিরি প্রভৃতি নানাস্থানের পর্ব্বতশিখরে ইঁহাদের মঠ সংস্থাপিত আছে। তন্মধ্যে আবুপর্ব্বতশিরে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত শিল্পকলা বিভূষিত যে জৈন মন্দির আছে তাহার তুলনা বোধ হয় অন্য কোন দেবমন্দিরে পাওয়া যায় না।

'পাণ্ডবচরিত' নামক ইঁহাদের পুস্তকে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী ও নারদাদি বৈষ্ণব পুরাণোক্ত ব্যক্তিগণের আখ্যান কিছু কিছু ভিন্নাকারে পাওয়া যায়। তাঁহারা অনেকেই মুনি নামে অভিহিত; ও শেষে জৈন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন বলিয়া লিখিত আছে। শৈব শাক্ত প্রভৃতি অপরাপর সম্প্রদায়ের মঠের সহিত সংস্রব নাই। জৈনেরা জাতিভেদ ও হিন্দু প্রথার কিয়দংশ পালন করেন বলিয়া ভারতে আজিও তাঁহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধদিগের স্বাতন্ত্র্য লুপ্তপ্রায় হইয়া হিন্দু সম্প্রদায়ে মিশিয়া গিয়াছে। জৈন শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চপাণ্ডব প্রভৃতি হিন্দু পুরাণোক্ত মহাপুরুষগণের সহিত সংস্রব থাকিলেও, হিন্দুরা "হস্তিনা তাড্যমানোঽপি ন গচ্ছেজ্জৈন মন্দিরম্" বলিয়া জৈনদিগের উপর বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে ছাড়েন নাই।

জৈনেরাও বৌদ্ধদিগের ন্যায় স্তূপমধ্যে 'শরীর-ধাতু'

চিতাদগ্ধ অস্থিরক্ষা করিয়া স্তূপ-মস্তকে তীর্থঙ্করগণের চরণচিহ্ন স্থাপন করিতেন। স্তূপ শিখরে উঠিবার সোপান এবং চতুর্দ্দিকে কোথাও এক তালা কোথাও দোতালা পরিক্রম পথও থাকিত। মথুরার কয়েক স্থানে এইরূপ জৈনস্তূপ ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে!

মহাবীর ও বুদ্ধদেব প্রায় একই সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অমরকোষে লিখিত "সর্ব্বজ্ঞ, সুগত, বুদ্ধ, তথাগত, ভদ্র, জিন" প্রভৃতি উপাধিগুলি উভয় সম্প্রদায়ে প্রচলিত। বুদ্ধদেবের উপবিষ্ট মূর্ত্তির সহিত তীর্থঙ্করগণের পদ্মাসন-মুদ্রা মূর্ত্তির অনেকেটা সাদৃশ্য আছে। উভয় সম্প্রদায়ে চৈত্য, স্তূপ, মঠ প্রভৃতি ছিল। এই কারণে বাহিরের লোকেরা, এমন কি কোন কোন সাহেব পর্য্যন্ত প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া গোলযোগ ঘটাইয়াছেন।

চিত্র-পরিচয়।

ইহা একখানি 'আযাগপট' (Tablet of Homage)। পাষাণ ফলকে চিত্র খোদিত করিয়া স্তূপ বা মন্দিরাদির গাত্রে আযাগপটে আঁটিয়া দেওয়া হইত। জৈন ও বৌদ্ধেরা এ আযাগপটের পূজা করিতেন। ইহার কোন কোনটাতে স্থাপয়িতার নাম এবং পরিচয় লেখা থাকিত। ১ম চিত্রখানি একটি জৈনস্তূপের দৃশ্য। চারিটি ধাপ উঠিয়া সুন্দর কার্য্য-শোভিত তোরণের ভিতর দিয়া রেলিং-ঘেরা পরিক্রম পথ দেখা যাইতেছে। তোরণের সর্ব্বনিম্ন কড়িকাঠে একগাচ্ছা মোটা মালা ঝুলিতেছে। তোরণের উভয় পার্শ্বে দুইটি বিবসনা দিব্যাঙ্গনা নৃত্য ভঙ্গিমায় রেলিংএর উপর দাঁড়াইয়া আছে। কর্ণ-কণ্ঠ কটি কর পদে অলঙ্কার শোভা পাইতেছে। কটি-ন্যস্ত করে যেন একখানা বসনাঞ্চল অযত্নে ঝুলিতেছে। তাহার পার্শ্বে দুইটা বিচিত্র পাদপীঠের উপর সুগঠিত স্তম্ভ রহিয়াছে। ইহার উপর দিকটা ভাঙ্গিয়া গেলেও তথায় যে আর একটা পরিক্রম পথ ছিল, তাহা বুঝা যাইতেছে। নিচে চারিছত্র কুশানগণের সময়ের পূর্ব্বকালীন অক্ষরে খোদিত যে শিলালিপি আছে তাহা হইতে জানা যায় যে—নমো অর্হতানাম্—ফগুযশা নটের ভার্য্যা শিবযশা, অর্হৎগণের পূজার জন্য এই আযোগপট করিয়া দিয়াছেন।

২য় চিত্র—মধ্যস্থানে ধ্যানমুদ্রায় উপবিষ্ট মূর্ত্তিটি যে শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্দ্ধমানের, তাহা পাদপীঠে অঙ্কিত সিংহলাঞ্ছন হইতে বুঝা যায়। ইঁহার তিনদিক বেষ্টন করিয়া ২৩ জন পূর্ব্বতীর্থঙ্কর। বর্দ্ধমানের শিরে জটাভার, তাহার পর কিরণছটা, তদুপরি খিলানের মত যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা প্রসারিত শাখবৃক্ষের আভাস। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর অক্ষরে কেবল অস্পষ্ট 'প্রতিমা' শব্দ লেখা আছে। এখানি ১৮৯০ সালে পাওয়া যায়।

৩য় চিত্র—এটি একটি শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের বিপুলকায় তীর্থঙ্কর বিগ্রহ। ইহার উভয় বাহুর কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শিরে কুঞ্চিত কেশদাম ও শিখা গ্রন্থি। মথুরার কঙ্কালী টিলা হইতে আরও কয়েকটি বিশালকায় তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি ১৮৮৯ খৃঃ পাওয়া গিয়াছে। এটির আসনে সংবৎ ১০৩৮ (খৃঃ ৯৮০) খোদিত আছে, সুতরাং মামুদ গিজনি ১০১৮ খৃষ্টাব্দে মথুরা লুণ্ঠনের কয়েক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে এটি স্থাপিত হইয়াছিল।

৪র্থ চিত্র। এটি একটি দিব্যাঙ্গনা বা নর্ত্তকীর মূর্ত্তি। কোন স্তূপের রেলিংএর খোদিত স্তম্ভ। রমণী যেন চামর হস্তে বৃক্ষকাণ্ডে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার। ইহার পাদপীঠে দুটি সিংহ। এইরূপ বিবসনা নারীমূর্ত্তি কেবল জৈন স্তূপেই খোদিত হইত। বৌদ্ধস্তূপের মূর্ত্তিগুলি বসন-মণ্ডিত।

জৈন স্তূপের স্তম্ভে কয়েকটি দিগম্বরা রমণীর পাদপীঠে স্থূলোদর কিম্ভূত কিমাকার শূকরের-মত এক একটা মার (সয়তান) মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। কেন তাহা বলিতে পারি না। এই সব স্তম্ভের পশ্চাদ্ভাগে বিচিত্র প্রস্ফুট কমলমালা। স্তম্ভগাত্রে এড়োভাবে আঁটা পাথর গুলিকে সূচি বলে, তাহাতে বেশ সুন্দর সুন্দর পুষ্প বা বিচিত্র আকারের জীব খোদিত থাকে।

৫ম চিত্র। এ দুইটি অষ্টপল বিশিষ্ট মন্দির বা বারান্দার থাম। দুইটারই মাথায় সিংহ খোদিত। শিল্পকলাবিদ্‌গণ বলেন যে পক্ষযুক্ত সিংহ আঁকা মাতলাগুলি পারস্য দেশের অনুকরণ।

৬ষ্ঠ চিত্র। পাঠ রত শ্বেতাম্বরীয় জৈন পুরোহিত। কীটাদি অপসারণ জন্য 'রজোহরণ' দক্ষিণ পার্শ্বে স্থাপিত।

মথুরার নানাস্থান হইতে জৈন যুগের ভগ্ন খণ্ড সকল পাওয়া যাইতেছে। তবে কঙ্কালী টিলা হইতে অধিক সংখ্যক জৈন ধ্বংসাবশেষ মিলিয়াছে। পরে আবশ্যক মত আরও পরিচয় দিব।

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত।

"প্রতাপসিংহ"-এর গান। *

[নীচের স্বরলিপিবদ্ধ গানখানি পৃথগ্‌ভাবে গত মাসের "মানসী
ও মর্ম্মবাণী"তে দেওয়া আছে। গানটি অভিনয় কালে
প্রায়ই গীত হয় না। যদি কখনও হয়, তখন কিন্তু
বিভিন্ন নাট্যশালায় দুই রকম সুরে গাওয়া হয়।
বলা বাহুল্য যে, গত মাসে অপর সুরের
লিপি প্রকাশ করা হইয়াছ]

চতুর্থ গীত

[রচনা—স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

রেখা।

কেদার-হাম্বির———মধ্যমান।

[স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

আস্থায়ী

			১				২			
সা	সন্া	সা ‖{	নর্সা	সমা	গমা	পক্ষা।	I পক্ষা	-পা	গমা	ধনধা ।
ও	গো ০	জা	নি ০ স্	ত ০	তো ০	রা ০	ব ০	ল্	কে ০	পা ০ ০

৩			‖	০			
। নর্সনা	ধনা	ধপক্ষাপা	পধনর্সা ।	(-া	সা	সন্া	সা) } ।
সে ০ ০	কো ০	পা ০ ০ ০	সে ০ ০ ০	০	'ও	গো ০	জা'

---

* "প্রতাপসিংহ"এর গানের স্বরলিপি ধারাবাহিকরূপে "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে, এবং নাটকান্তর্গত গানগুলি অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গীত হয়, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হইবে।

—লেখিকা।

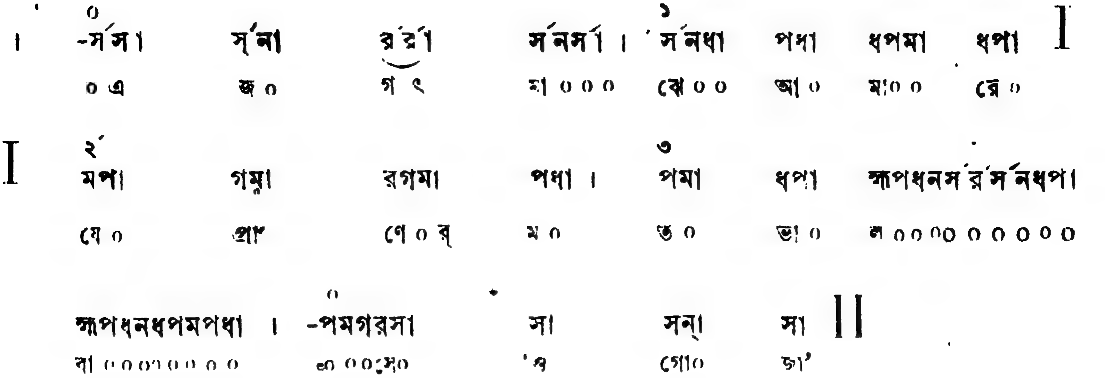
। -র্সর্স। র্সর্না র্রর্রা র্সনর্সা । র্সনধা পধা ধপমা ধপা I
০ এ জ ০ গ ৎ মা ০ ০ ০ ঝে ০ ০ আ ০ মা০ ০ রে ০
I মপা গমা রগমা পধা । পমা ধপা ক্ষাপধনর্সর্রর্সনধপা
যে ০ প্রা ণে ০ র্ ম ০ ভ ০ ভা ০ ল ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
ক্ষাপধনধপমপধা । -পমগরসা সা সন্া সা II
বা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ সে০ গ গো০ জা

অন্তরা

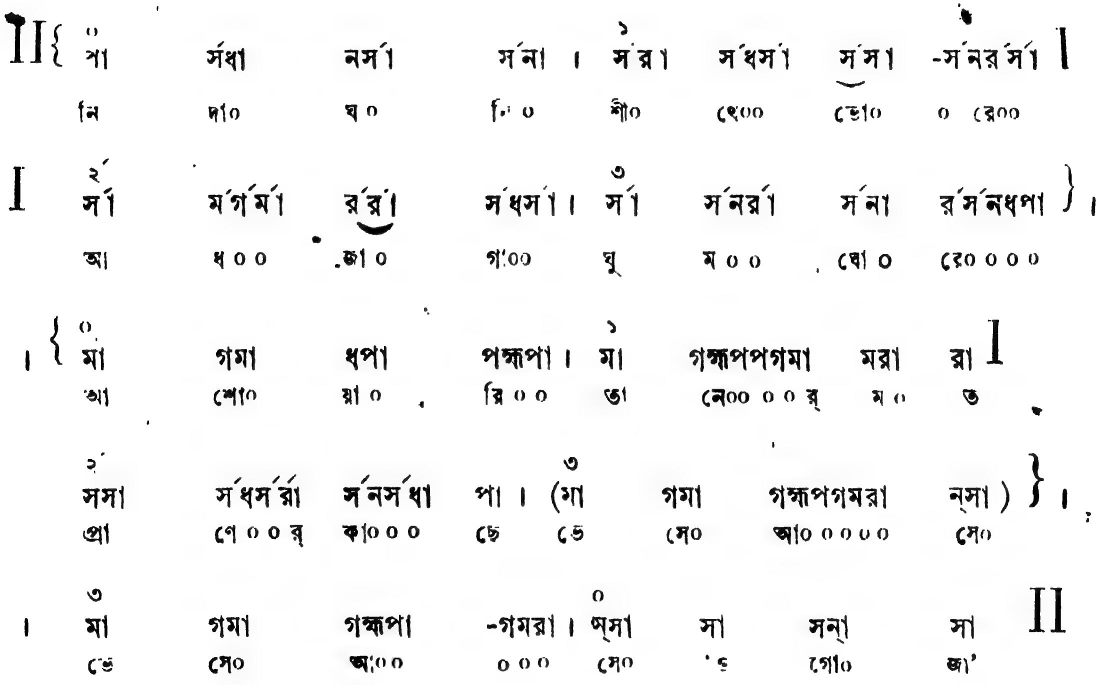
II{ পা র্সধা নর্সা র্সনা । র্সর্রা র্সধর্সা র্সর্সা -র্সনর্রর্সা I
নি দা০ ঘ ০ নি ০ শী০ থে০০ ভো০ ০ রে০০
I র্সা র্মর্গর্মা র্রর্রা র্সধর্সা । র্সা র্সনর্রা র্সনা র্রর্সনধপা } ।
আ ধ ০ ০ জা ০ গা০০ ঘু ম ০ ০ ঘো ০ রে০ ০ ০ ০
। { মা গমা ধপা পক্ষাপা । মা গক্ষাপপগমা মরা রা I
আ শো০ য়া ০ রি ০ ০ তা নে০০ ০ ০ র্ ম ০ ভ
সসা র্সধর্সর্রা র্সনর্সধা পা । (গা গমা গক্ষাপগমরা ন্সা) } ।
প্রা ণে ০ ০ র্ কা০ ০ ০ ছে ভে সে০ আ০ ০ ০ ০ ০ সে০
। মা গমা গক্ষাপা -গমরা । ন্সা সা সন্া সা II
ভে সে০ আ০ ০ ০ ০ ০ সে০ ঙ গো০ জা

সঞ্চারী

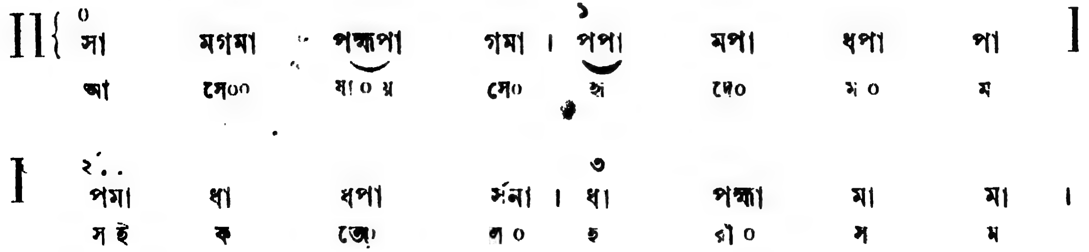
II{ সা মগমা পক্ষাপা গমা । পপা মপা ধপা পা I
আ সে০০ মা ০ য় সে০ স দে০ ম ০ ম
I পমা ধা ধপা র্সনা । ধা পক্ষা মা মা ।
স ই ক জো ল ০ চ রী ০ স ম

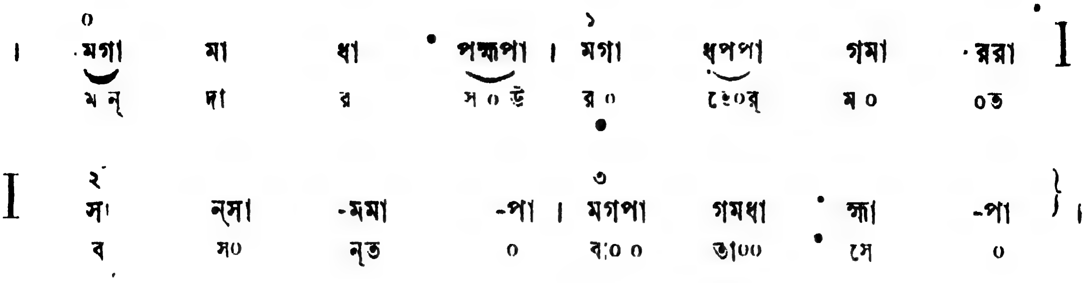
০ ১
। মগা মা ধা পক্ষাপা । মগা ধপপা গমা রৃরা I
মন্‌ দা র স০উ্‌ র০ হে০র্‌ ম০ ০ত
২´ ৩
I সা নসা -মমা -পা । মগপা গমধা ক্ষা -পা } ।
ব স০ নৃত ০ বা০০ তা০০ সে ০

আভোগ

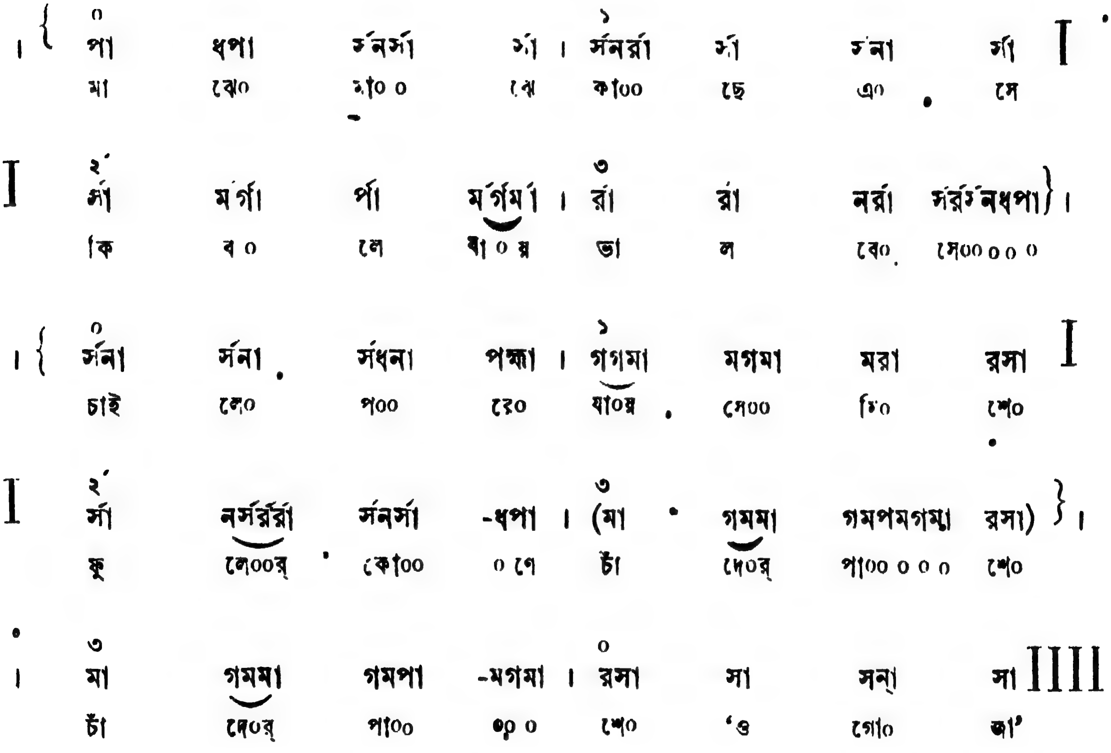
০ ১
। { পা ধপা র্সনর্সা র্সা । র্সনর্রা র্সা র্সনা র্সা I
মা ঝো০ মা০০ ঝে কা০০ ছে এ০ সে
২´ ৩
I র্সা মর্গা র্পা মর্গর্মা । র্রা র্রা নর্রা র্সর্রার্সনধপা } ।
কি ব০ লে যা০য় ভা ল বে০ সে০০০০০
০ ১
। { র্সনা র্সনা র্সধনা পক্ষা । গগমা মগমা মরা রসা I
চাই লে০ প০০ হে০ যা০য় সে০০ দি০ শে০
২´ ৩
I র্সা নর্সর্রর্রা র্সনর্সা -ধপা । (মা গমমা গমপমগমা রসা) } ।
ফু লে০০র্‌ কো০০ ০গে চাঁ দে০র্‌ পা০০০০০ শে০
৩ ০
। মা গমমা গমপা -মগমা । রসা সা সন্‌া সা IIII
চাঁ দে০র্‌ পা০০ ০০০ শে০ 'ও গো০ জা'

দ্রষ্টব্য। অবিকল এই সুরে কিন্তু 'যৎ' তালে, গানখানি আবার কখন কখন গীত হইয়া থাকে। সে অবস্থায় নিম্নলিখিত 'যৎ' তালের :—

০ ১ ২´
II তা আ তি ইন্ । ধি ইন্ ধি ইন্ I ধা আ ধি ইন্ ।

৩ ০ ১
। ধা ধা ধি ইন্ । তা আ তি ইন্ । ধি ইন্ ধি ইন্ II

ঠেকায় সহিত গানটি চলে।———লেখিকা।

প্রেত-তত্ত্ব

ডাঃ শ্রীযুক্ত হীরালাল হালদার প্রণীত Psychical Research and Man's Survival of bodily Death" পুস্তক পাঠে কয়েকটা প্রশ্ন মনে স্বতঃই উদিত হয়, তাহার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

১। প্রেত-তত্ত্ব সাধারণতঃ মনুষ্যজাতি সম্পর্কীয়। ইতর প্রাণীদের সম্বন্ধে প্রেততত্ত্বের আলোচনা কেহই বিশেষ করেন না। যাহা হউক, মনুষ্য-জীব শারীরিক ও মানসিক এই দুইটি ধর্ম্মের অধীন। এই উভয় ধর্ম্ম পরস্পর নিকট-সম্পর্কিত। কেহ কেহ এই মানসিক ধর্ম্মকেই দুই অংশে গণনা করেন, যথা জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মা শারীরিক ধর্ম্মাদির অধীন; পরমাত্মা কল্পনার বিষয়, ইহা বিকারহীন। পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে মাতৃগর্ভে মনুষ্য-ভ্রূণের অবস্থানকালে তাহার মানসিক শক্তি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। জন্মের পরে শারীরিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বৃত্তির'ও বলাধান হইতে থাকে। মনের অস্তিত্ব দেহেন্দ্রিয়াদির অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। মনের ক্রিয়া ততক্ষণ সম্ভব, যতক্ষণ দেহের ক্রিয়া বিদ্যমান থাকে। শরীর রোগে ক্ষীণ বা বিকারগ্রস্ত হইলে মানসিক শক্তিও তদনুরূপ হয়। অনেক সময় পূর্ব্বের অভ্যস্ত বিষয়গুলিও পর্য্যালোচনা বা স্মরণ করিবার শক্তি হ্রাস পায়। বাহির হইতে শরীরের উপর বা মনের উপর (শোকদুঃখ-মূলক) আঘাতে শরীর ক্ষুণ্ণ হইয়া যুগপৎ মনকেও ক্ষুণ্ণ করে। সুতরাং শরীরের বিলোপ হইতে মন বা জীবাত্মার বিলোপ সাধিত হয়। তাহাতে মনুষ্যের মৃত্যুর পর জীবাত্মার পৃথক্ অস্তিত্বের ধারণা নিরর্থক হয়।

২। Telepathy দ্বারা একের মনোভাব দূরদেশ হইতে অপরে জানিতে পারে। এই Telepathyর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্তস্থান Wireless Telegraphy। কৃত্রিম উপায়ে স্তম্ভের উপরিভাগ হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবাহিত করিয়া দূরস্থিত অপর স্তম্ভে উহা গৃহীত হয়। ঐরূপ মানব দেহও ভগবৎ-সৃষ্ট স্বাভাবিক বৈদ্যুতিক স্তম্ভ; উহার উপরিভাগ মস্তকদেশ হইতে একাগ্র চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়া দূরস্থ আত্মীয় বিশেষের মস্তিষ্কে সংবাদ প্রেরণ করে। পার্থক্য এই যে, মনুষ্য-দেহ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণবল যন্ত্র; উহার বৈদ্যুতিক শক্তি তত প্রবল নহে; এ কারণ সকল সময়ে ইহার সংবাদ ধরা যায় না। প্রবাসস্থ মুমূর্ষু আত্মীয়জনের একাগ্র চিন্তাস্রোত কখন কখন অপর আত্মীয়ের মস্তিষ্কে সংবাদ প্রেরণ করে। এই ঘটনায় লোকে মুমূর্ষু বা মৃত আত্মীয়ের মুক্তজীবাত্মার অপূর্ব্ব লীলা মনে কল্পনা করিয়া থাকে। সুতরাং এরূপ ঘটনাতেও (Telepathyর) কারণ বিদ্যমান্ থাকায় আত্মার পৃথক্ অস্তিত্বের প্রমাণ হয় না।

৩। পরজন্মবাদ স্বীকার করিলে মৃত্যুর পর কতদিন পর্য্যন্ত প্রেত জীবাত্মার পুনর্জ্জন্ম হয় না তাহার কোন মীমাংসা সম্ভব নহে। কেহ কেহ Planchet বা অন্য কোন উপায় দ্বারা বহুশতাব্দী পূর্ব্বে মৃত লোকের আত্মা আনিবার প্রয়াস পান। আবার খৃষ্টিয়ানদিগের মতে পরজন্মবাদ স্বীকার না করিলে, যাহারা ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিবে তাহাদের আত্মা কোথা হইতে আসে তাহারই বা মীমাংসা কোথায়? একমাত্র উত্তর এই যে আত্মা পৃথক ভাবে আসে না। দৈহিক নিয়মে জীবদেহের জন্মের সঙ্গে দেহের ক্রিয়ার সূক্ষ্মতম ফলই মানসিক শক্তি বা জীবাত্মা। ইহা দেহ-সম্পর্কিত মাত্র। দেহী পিতামাতা, সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুণে প্রাকৃতিক নিয়মে ক্ষুদ্র বা মহদাশয় হইয়া থাকে। জলবায়ু অবস্থান প্রভৃতি স্থূল ও উপরিউক্ত সূক্ষ্ম প্রভাবের ফলে জীবসাধারণের দৈহিক ও মানসিক ক্রমোন্নতিবাদ সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। ইহাই Darwinএর Evolution Theory। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র-সঙ্গত Cycle of Births—একটি বিশিষ্ট আত্মা তমোভাব হইতে ক্রমশঃ বৃক্ষ, কীট, পতঙ্গ, পশু প্রভৃতি অসংখ্য জন্মের পরে সত্ত্বভাবাপন্ন উত্তম

জন্ম ধারণ করিয়া পুনরায় নির্গুণ ব্রহ্মে লীন হওয়ার যে বিশিষ্ট বহুজন্মবাদ আছে, তাহার মূলে দেহান্তে জীবাত্মার পৃথক অস্তিত্বের কল্পনা করা হইয়া থাকে। কেবল পৃথক অস্তিত্বের নহে, পরজন্ম গ্রহণের উন্মুখতা ও উহার পূর্ব্বে 'প্রেত'-ভাব প্রভৃতি—রজোগুণযুক্ত মুক্ত জীবাত্মার কল্পনা করা হয়। আবার 'প্রেত-ভাব' কতকাল থাকিবে, প্রেত-ক্রিয়ার সহিত ইহার কতদূর সম্বন্ধ, দেশভেদে প্রেতভাবের অসামঞ্জস্য ও সর্ব্বোপরি **Planchet** দ্বারা আত্মা-আনয়নকারীদের অপূর্ব্ব প্রয়াসের ব্যাপারের মধ্যে কোন সারবত্তা পাওয়া যায় না। বিজ্ঞান মতে দেহ ও জীবাত্মার অস্তিত্ব পরস্পর-যুক্ত ইহাই দৃঢ় প্রতীতি হয়।

৪। খৃষ্টিয়ান্ মতে নশ্বর দেহের যাবতীয় বৃত্তিকেও (জীবাত্মাকেও) নশ্বর বলা হইয়াছে। ১ করিন্থিয়ান্, ১৫।৫১-৫,—এই জীবনে অথবা মৃত্যুর পরেই কোনও শ্রেণীর মানবকে অমরতা প্রদত্ত হয় না, কিন্তু খৃষ্টের দ্বিতীয় আগনন কালে উহা ধার্ম্মিকগণকে প্রদত্ত হইবে; উপদেশ ৯।৫-৬,—এই সময়ে (মৃত্যুর পরে) তাহারা ভালবাসিতে, ঘৃণা অথবা হিংসা করিতে পারে না; ইয়োব ১৪।২০-১—পৃথিবীতে যাহা ঘটিতেছে সে বিষয়ে তাহাদের কোন জ্ঞান থাকেনা; গীত ১৪৬।৩-৪—তাহারা কোন প্রকার চিন্তাশক্তিই চালনা করিতে পারে না; যোহন ৫।২৮-৯,—পুনরুত্থান দিবসে সাধু অসাধু উভয় মৃতগণই নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া নিজ নিজ প্রাপ্য পুরস্কার গ্রহণ করিবে।

ডাঃ হালদারের উক্ত গ্রন্থে পরিশেষে যে যে অদ্ভুত ঘটনার কথা বলা হইয়াছে, যাহার ব্যাখ্যা **Telpathy** দ্বারা চলে না এবং যাহার উপর **Man's Survival of Bodily Death** (পরলোক) এই বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে,—তাহার মীমাংসা একমাত্র পরলোকে অচল বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের কোন কারণ মিলে না, কারণ মানবের সীমাবদ্ধ জ্ঞান এখানে বিমুখ হয় এইরূপ **mystic** কারণ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞান সম্মত কোন হেতু খুঁজিতে গেলে পরলোক-বাদ প্রমাণ করা বড়ই দুরূহ হইবে। যাহা হউক **mystic** কোন কারণে বিশ্বাস করিতে হইলে বাইবেলে লিখিত কারণ একবার বিবেচনা করিলে মন্দ হয় না। "মানুষের ভীতি ও কল্পনা, মানব পরিবারের স্নেহ ও বেদনার উপরে প্রভাব বিস্তার করা ব্যতীত আর এমন কোন্ ফলপ্রদ পন্থা থাকিতে পারে যাহার সাহায্যে প্রেতবাদ তাহার কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে? প্রতি গৃহ কোন প্রিয়তম-জন-হারা হইয়াছে। শয়তান ও তাহার পতিত অনুচরবর্গ মৃতব্যক্তির বিশেষ স্বভাব জানিয়া থাকে। তাহারা আকৃতি ও প্রকৃতি মূর্ত্তিমান করিতে এবং একই কণ্ঠস্বরে কথা বলিতে পারে। মৃতব্যক্তির জীবনের প্রতি ঘটনা জানিয়া তাহারা মৃত ও তাহাদের জীবিত বন্ধুগণের মধ্যে যে সকল গূঢ় রহস্য রহিয়াছে তাহা বলিতে পারে। এই সকল উপায়ে তাহারা এরূপ সাক্ষ্য উপস্থিত করে, যাহা অনায়াসেই স্বাভাবিক প্রকৃতি আকৃষ্ট করিয়া থাকে। এই প্রকারে শয়তান প্রেরিত পুরুষ শমূয়েলকে মূর্ত্তিমান করিয়া ইস্রায়েলরাজা শৌলকে প্রতারিত করিয়াছিল—১ শমূয়েল ২৮।৬-১৪।" (যুগলক্ষণ, মে-জুন, ১৯২১)।

বাইবেল মতে যেমন ঈশ্বরের মঙ্গলকারী দূতগণ রহিয়াছে, তেমনি অমঙ্গলকারী শয়তানের অনুচরগণও রহিয়াছে। ইহারা মানব হইতে বিভিন্ন, **ethereal** (বায়ব) সত্ত্বাবিশিষ্ট ও অপূর্ব্ব শক্তিসম্পন্ন। বাইবেল মতে, প্রচলিত "প্রেত-তত্ত্বের" একটা মীমাংসা পাওয়া যায়। অনুসন্ধিৎসু নিরপেক্ষ সুধিগণের উপর এ বিষয়ের পর্য্যালোচনার ভার নির্ভর করে।

শ্রীলোকেন্দ্রনাথ গুহ।

মনের মানুষ

(উপন্যাস)

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

আরোগ্যের পথে।

সেদিন বৈকালে কুঞ্জলালের জ্বরোত্তাপ অনেকটা কম হইয়া আসিল; মাথায় আর আইস ব্যাগ চাপানোর দরকার হইল না। একটা দীর্ঘ ঘুমের পর কুঞ্জ চক্ষু খুলিয়া দেখিল, ঘরে মিটি মিটি করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে; কিরণ বিছানার পাশে বসিয়া আছে। কুঞ্জ ক্ষীণস্বরে বলিল, "কিরণ, তুই বসে আছিস?"

কিরণ কুঞ্জলালের ললাটে হস্ত রাখিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া বলিল, "এখন কেমন আছ?"

"ভাল আছি।"

"ক্ষিধে পেয়েছে?"

"কৈ, বুঝতে পারছিনে। ক'টা বেজেছে?"

"এই কতক্ষণ সন্ধ্যে জ্বালা হয়েছে। একটু বার্লি খাও।"—বলিয়া কিরণ তক্তপোষ হইতে নামিয়া গিয়া, কুলুঙ্গি হইতে একটি পাথরবাটি ও একটি চামচ লইয়া আসিল। কুঞ্জ বলিল, "থাক্ না, খাব এখন একটু পরে।"

কিরণ বলিল, "না না, তোমায় খেতে হবে। ডাক্তার সাহেব বলেছেন, ঘুম ভাঙ্গলেই তোমায় বার্লি খাইয়ে দিতে। খাও, হাঁ কর।"—বলিয়া বাটি হইতে এক চামচ বার্লি তুলিল।

কুঞ্জ আর আপত্তি করিল না। একে একে ৫।৬ চামচ বার্লি, তাহার পর ২।৩ চামচ জলও পান করিলে, কিরণ নিজ অঞ্চল দিয়া তাহার মুখ মুছাইয়া দিয়া বাটি চামচ যথাস্থানে রাখিতে গেল।

এক মিনিট নীরব থাকিয়া কুঞ্জ ডাকিল—"কিরণ!"

কিরণ তক্তপোষের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কেন?"

"তুই কোথাও যাচ্চিস?"

"না; মাসিমা আমায় তোমার কাছেই ত থাকৃতে বলে গেছেন! তোমায় একলা ফেলে কি আমি যেতে পারি?"

"তবে বোস্ এইখানে"—বলিয়া কুঞ্জ শয্যাপার্শ্ব দেখাইয়া দিল। কিরণ সেখানে বসিলে কুঞ্জলাল তাহার একখানি হাত নিজ হাতের মধ্যে লইয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নীরব রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে চক্ষু খুলিয়া বলিল, "আচ্ছা কিরণ, তুই কোনদিন বৈঠকখানা ঘরে আমার যে বাঁধানো ছবিখানা আছে, সেখানা ধূলো টুলো ঝেড়ে পরিষ্কার করেছিলি?"

কিরণ একটু বিস্মিতভাবে উত্তর করিল, "না, কেন? ভেঙ্গে গেছে নাকি? আমি ত হাতও দিই নি।"

"না ভাঙ্গে নি।"—বলিয়া কুঞ্জ আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। কিয়ৎক্ষণ আধো ঘুম আধো জাগা ভাবে পড়িয়া থাকিবার পর, ঘরের মধ্যে জুতার শব্দ পাইয়া কুঞ্জ আবার চক্ষু খুলিয়া দেখিল ডাক্তার সরকার সাহেব। তাঁহাকে দেখিয়াই কুঞ্জ সবিস্ময়ে বলিল, "আপনি?" সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল। ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "শোও শোও। কেন, আমি এসেছি তুমি কি জান না?"

কুঞ্জ শয়ন করিয়া একটু ভাবিয়া বলিল, "হ্যাঁ, ঠিক।"

ডাক্তার সাহেব শয্যার পাশে চেয়ারের উপর বসিলেন। রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, বগলে থার্ম্মমিটার দিলেন। কিরণ ও তাহার মাসিমা অদূরে সেই কক্ষমধ্যে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহাদের দিকে চাহিয়া

বলিলেন, "জ্বর আছে, তবে খুব অল্প। এখানকার সে ডাক্তার দুটিকে ডেকে পাঠানো হয়েছে কি?"

মাসিমা বলিলেন, "হ্যাঁ, তাদের ডাকতে লোক গেছে। কিন্তু বাবা, তুমি ত চলে যাচ্ছ, আবার যদি অবস্থা খারাপ হয়? আর একটা দিন থেকে গেলে হত না?"

সরকার সাহেব বলিলেন, "বল্লাম যে, আমার বড় মেয়েটির বিবাহের সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেছে। সময় সংক্ষেপ—এখনও অনেক আয়োজন করতে বাকী আছে, নইলে আর একটা দিন না হয় আমি থেকে যেতাম। তার কিছু দরকার হবে না, কোনও ভয় নেই আপনাদের—এ জ্বরটুকু মাঝে মাঝে বাড়বে, মাঝে মাঝে কমবে, এই রকম করে ক্রমে আরাম হয়ে যাবে। এখানকার সেই ডাক্তার দুটিকে আমি সব কথা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। তাঁরা সকালে বিকালে এসে দেখবেন, আবশ্যক মত ব্যবস্থা করবেন। আর কোনও ভয় করবেন না আপনারা।"

কিয়ৎক্ষণ পরে রমেশ ডাক্তার ও কেদার ডাক্তার আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সরকার সাহেব তাঁহাদের যথোপযুক্ত উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন। তাহার পর ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, "সময় হয়ে এল। পাল্কী বেহারা এসেছে কি?"

"আমি দেখে আসি"—বলিয়া কিরণ ঘর হইতে চলিয়া গেল।

মাসিমা বলিলেন, "বাবা, তুমি আমাদের যে উপকার করলে, এ জীবনে তা ভোলবার নয়। তুমি না এলে, বাছাকে আমার ফিরিয়ে পেতাম না!"—বলিয়া তিনি চক্ষে অঞ্চল দিলেন। কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিতে লাগিলেন—"ভগবান তোমায় দীর্ঘজীবী করুন, ছেলে মেয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে তুমি সুখে স্বচ্ছন্দে থাক বাবা। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার ফীজ বাবদ কি দিতে হবে? মূর্খ মেয়েমানুষ, কিছুই ত জানিনে।"

ডাক্তার সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "ফীজ দিতে হবে কেন? কিছু দিতে হবে না। কুঞ্জ যে আমার ছাত্র। ছাত্র আর ছেলে কি ভিন্ন? আপনি নিশ্চিন্ত হোন।"

গৃহিণীর পীড়াপীড়িতে ডাক্তার সাহেব অবশেষে রেল ভাড়াটা মাত্র গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

গৃহিণী বলিলেন, "আপনার ভারি কষ্ট হল বাবা। একে আমরা গরীব গৃহস্থ, তায় পাড়াগাঁয়ে থাকি, আপনার খাবার শোবার কষ্ট যতদূর হবার তা হল। কি করবো বাবা, নিতান্ত প্রাণের দায়েই, আপনাকে আনিয়ে এই কষ্টটা দিলাম, আপনি কিছু মনে করবেন না। ভগবান আপনার ভাল করুন।"

ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "কেন? কষ্ট আর কি হয়েছে আমার? দু'দিনই না হয় সাহেব হয়েছি—আমাদেরও পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, ছেলেবেলা পাড়াগাঁয়েই মানুষ হয়েছিলাম।"

"এ রকম কষ্ট করা ত আপনাদের অভ্যাস নেই। আপনার বাড়ীর যা বন্দোবস্ত, কিরণের মুখে আমি সবই ত শুনেছি। সে একটা রাজবাড়ী বল্লেই হয়!"

ডাক্তার সাহেব ইহার সবিনয় প্রতিবাদ করিলেন।

কিরণ আসিয়া সংবাদ দিল পাল্কী বেহারা আসিয়াছে। ডাক্তার সাহেব উঠিলেন। কিরণ গলবস্ত্র হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। "কিরণ, তুমি বড় ভাল মেয়ে।"—বলিয়া আশীর্ব্বাদ হিসাবে ডাক্তার সাহেব তাহার মাথায় হস্তস্পর্শ করিলেন। তাহার পর শয্যার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কুঞ্জ, জেগে আছ?"

কুঞ্জ চক্ষু খুলিয়া বলিল, "আপনি চল্লেন?"

"হ্যাঁ। আর কোনও ভয় নেই, তুমি শীগ্‌গির আরাম হবে। আর লাইক্‌-এ-ফুল, ও সব মোদক টোদক কখ্‌খনো খেও না, বুঝলে? এখন আসি তবে—গুড্‌-বাই!"—বলিয়া ডাক্তার সাহেব সস্নেহে কুঞ্জলালের বক্ষে দুই তিন বার মৃদু করাঘাত করিলেন। তাহার পর গৃহিণীকে নমস্কার জানাইয়া, কিরণের পিঠ চাপড়াইয়া, ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ডাক্তার সাহেবের অনুমানই যথার্থ হইল, কুঞ্জ দিন

দিন আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল। কিরণ সর্ব্বদা তাহার কাছে থাকে ; তাহার পথ্য দেয়, তাহার সঙ্গে গল্প করে। "হবু-বর" বলিয়া মাসিমার সাক্ষাতে কুঞ্জলালের কাছে আসিতে বসিতে বা তাহার সহিত কথা কহিতে কিরণের এত দিন যে একটা সঙ্কোচ বা লজ্জা ছিল, এই পীড়ার হিড়িকে তাহা কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। তাহার মাসিমা গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন, সুতরাং রোগীর সেবা শুশ্রূষার ভার তিনি কিরণের উপরেই দিয়াছেন—এবং তাহা যে কেবল নিজের সময়াভাব বশতঃ, তাহাও নহে। কিরণ সারাদিন নিঃসঙ্কোচে কুঞ্জলালের নিকটেই যাপন করিয়া থাকে।

একদিন কিরণ কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, ইন্দু দিদির বিয়েতে ডাক্তার সাহেব তোমায় নেমন্তন্ন করবেন না ?"

ইন্দুর বিবাহের সংবাদ যাত্রাকালে ডাক্তার সাহেবের মুখেই কুঞ্জ সেদিন শুনিয়াছিল। ডাক্তার সাহেবের কথায় সে ইহাও বুঝিয়াছিল যে, জেঠাইমার সহিত পূর্ব্বেই তাঁহার এ প্রসঙ্গ হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার সাহেব খাইতে বসিলে, জেঠাইমা খুব সম্ভব তাঁহাকে তাঁহার ছেলে মেয়েদের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ; বাঙ্গালী গৃহিণীদের প্রথানুসারে মেয়ের বিবাহ সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করিয়া থাকিবেন, তাহাতেই ডাক্তার সাহেব বলিয়াছেন। খবরটা শুনিয়া কুঞ্জলালের চিত্ত যে একেবারে নির্ব্বিকার আছে তাহাও বলা যায় না। এ কয়দিন মাঝে মাঝে সে ভাবিয়াছে কে সেই বর, সেই হতভাগা সিংহ সাহেবটাই নাকি ? আজ তাই কিরণের মুখে এ কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার সঙ্গে বিয়ে হবে তা কিছু ডাক্তার সাহেব বলেছেন ?"

কিরণ বলিল, "ঢাকার কোন্ এক জমিদারের সঙ্গে। বিয়ের মাসখানেক পরেই বর কনে নাকি বিলেত চলে যাবে। হ্যাঁগা বিলেত কদ্দূর ? কোন ইষ্টিশনে গিয়ে নামতে হয় ?"

কুঞ্জ একটু হাসিয়া বলিল, "তুই বিলেত যাবি না কি ?"

কিরণ ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "হুঃ, আমাকে কেই বা নিয়ে যাচ্চে ! সাহেবদের যেখানে দেশ সেই ত বিলেত ? সে বোধ হয় অনেক দূর—কাশীটাশী ছাড়িয়ে, নয় ?"

কুঞ্জ বালিকার এই মূঢ়তায় আমোদ পাইল, কিন্তু মনে একটু ব্যথাও বাজিল। যে লেখাপড়া জানে না সে জন্মিয়াও মাতৃগর্ভে আছে, সে জাগিয়াও নিদ্রিত, সে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ—এই ভাবিয়া তাহার দুঃখ হইল। এ কয়দিনের সেবাযত্নে কিরণকে তাহার আরও মিষ্টি লাগিয়াছে—তাহাকেই নিজ জীবন-সঙ্গিনী করিবে ইহা সে মনে মনে স্থির করিয়াছে। তাই সে বলিয়া ফেলিল, "কিরণ, তুই ইংরেজি পড়বি ?"

কলিকাতায় গিয়া ডাক্তার সাহেবের মেয়েদের সহিত মিশিয়া অবধি, কিরণের মনেও একটি গোপন ব্যথা সঞ্চিত হইতেছিল। তাহাদের জুতা মোজা বা বেশ ভূষার পারিপাট্যই যে কিরণের ঈর্ষা আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা নহে ; তাহাদের কথাবার্ত্তা, চাল চলন—তাহাদের বিদ্যাবত্তা দেখিয়া সে বুঝিয়াছিল, কেবল মাত্র রান্না বান্নায়, সেবা যত্নে, গৃহকর্ম্মে নিপুণতা লাভ করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল না। সে মেয়েদের তুলনায় নিজের হীনতা উপলব্ধি করিয়া কিরণ একটু ক্ষুণ্ণমনা ছিল, তাই উৎসাহের সহিত সম্মতি জানাইয়া বলিল, "পড়্‌বো। তুমি আমায় পড়াবে ?"

কুঞ্জ বলিল, "পড়াব। আমি বলি কি, এখন ত আমার খুব অবসর, চব্বিশ ঘণ্টাই ছুটি, এই সময় আরম্ভ করে' দিলেই বেশ হত। কিন্তু একখানি ফাষ্টবুক কোথায় পাই ?"

কিরণ বলিল, "ফাষ্টবুক ? ইংরেজি ক-খ'র বই ত ? সে আমার যোগাড় আছে।"

"কোথা পাবি ?"

"ও বাড়ীর পাঁচি, ধীরেনের ছোট বোন, তার কাছে আছে, চেয়ে নেবো এখন।"

"সে ফাষ্টবুক পড়েছে না কি ?"

কিরণ খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, "আ কপাল সে ফাষ্টবুক পড়বে কি ? দ্বিতীয় ভাগই মোটে তার সার

হল না। আমার কাছে রোজ পড়া বলে নিতে আসতো কি না। তোমার অসুখ হয়ে অবধি আর তাকে আমি পড়াতে পারিনি, তাই আজকাল আর আসে না। তার দাদার ফাষ্টবুক ছিল, সেখানি সে যত্ন করে নিজের দপ্তরের মধ্যে বেঁধে রেখেছে। বলে, বড় হয়ে আমি 'ইঞ্জিরি' পড়বো। ইংরেজি ত মুখ দিয়ে বেরোয় না, বলে ইঞ্জিরি। আরও তার যা সব উচ্চারণ, যদি শোন, ত হাসতে হাসতে দম আটকে যায়।"

"কি রকম?"

"সব এখন মনে পড়ছে না। 'উন্মাদ' তার মুখ দিয়ে কিছুতেই বেরুবে না, বলে 'উল্‌মাদ'। 'হ্রদ' বল্‌তে পারে না, বলে হর্‌হদ্‌। সেদিন তাকে ম-ফলা পড়াচ্ছিলাম, বুঝেছ, —বল্লাম এই দ্যাখ্‌—প, রয়ে আকার, উঁয়ায় ময়ে হ্রস্ব-উ, খ, 'পরাঙ্মুখ'—সে বল্লে, 'পোড়ারমুখ্‌'। যত তাকে বানান করাই আর পড়াই পরাঙ্মুখ—কিছুতেই তার মুখ দিয়ে বেরুল না; কেবলই বলে পোড়ারমুখ্‌। শুনে রাগ করব কি হেসেই অস্থির!"—বলিয়া কিরণ আবার খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল।

ফার্ষ্টবুক সংগৃহীত হইল। কুঞ্জলালের পাঠনার গুণে, ছাত্রীর অদম্য অধ্যবসায়ে, কিরণের ইংরাজি বিদ্যা দ্রুতগতি অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে কুঞ্জলাল আরোগ্যলাভ করিলেও তাহার অবসরের কিছুমাত্র অভাব লক্ষিত হইল না। ফলে, এই উপলক্ষ্যে দিবসের অনেকখানি সময় উভয়ের একত্র কাটিতে লাগিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বাবাজী-সংবাদ।

পথ্য পাইবার কয়েক দিন পরে, একদিন প্রাতে উঠিয়া কুঞ্জলাল ভাবিল, যাই সেই রাস্কেল হাম্বাগ বাবাজীটাকে আচ্ছা করিয়া দু'কথা শুনাইয়া দিয়া আসি। তাই সে চা পানান্তে, লাঠি হাতে লইয়া ঠুক ঠুক করিয়া গ্রামপ্রান্তে নিগমানন্দ স্বামীর আশ্রমাভিমুখে চলিল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, দুই একটি টাকা দিয়া সে প্রণাম করিত, তাই সঙ্গে দুইটি টাকাও লইয়াছিল। কিন্তু পথে যাইতে যাইতে মনে করিল—হ্যাঃ টাকা দিয়ে প্রণাম করবে না কচু! জোচ্চোর বেটা!—তথায় পৌছিয়া দেখিল, বাবাজী আশ্রমের বারান্দায় বসিয়া একটি থেলো হুঁকা হাতে লইয়া ভুড়ুক ভুড়ুক করিয়া তামাক খাইতেছেন। আজ কুঞ্জ পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম না করিয়া, হাত তুলিয়া নমস্কার মাত্র করিয়া, নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিল।

নিগমানন্দ তাহার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "কি গো! সেই মোদকের আর সেই অঞ্জনের কি রকম ফল হল? অদৃশ্য হয়েছিলে? কিন্তু একি, তোমার চেহারা এমন খারাপ হয়ে গেল কেন বাবা?"

কুঞ্জ বলিল, "আর চেহারা! যে মোদক খাইয়ে দিয়েছিলেন বাবাজী, তিন দিনের জন্যে কেন, পৃথিবী থেকে একদম অদৃশ্য হবার যোগাড় হয়েছিল।"

কুঞ্জলালের পীড়ার সংবাদ বাবাজী লোকমুখে পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। কিন্তু অজ্ঞতার ভাণ করিয়া বলিলেন, "কি রকম? অসুখ বিসুখ কিছু হয়েছিল না কি?"

কুঞ্জ শ্লেষপূর্ণ স্বরে উত্তর করিল, "বিলক্ষণ হয়েছিল। সেই মোদক খেয়ে তিন দিন তিন রাত্রি অচেতন হয়ে পড়ে ছিলাম। তার সঙ্গে জ্বর! এখানকার ডাক্তারেরা কিছুই করতে পারলেন না। শেষে প্রাণের দায়ে, টেলিগ্রাম করে' কলকাতা থেকে ডাক্তার আনাতে হয়েছিল। তিনি এসে চিকিৎসা করেন, তবে জ্ঞান হয়, প্রাণ বাঁচে।"—বলিয়া কুঞ্জলাল উদ্ধতভাবে বাবাজীর পানে চাহিয়া রহিল।

বাবাজী কুঞ্জলালের এই নূতন ভাব লক্ষ্য করিলেন। নিজ ভুঁড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে করুণ স্বরে বলিলেন, "তাই ত! কি রকম হল বুঝতে পারলাম না যে! নিশ্চয়ই তাহলে কোনও ত্রুটি হয়েছিল। সে মন্ত্রটি একশো আটবার জপ করেছিলে কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"দেহটি বেশ শুদ্ধ ছিল ত?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায় বসে জপ করেছিলে?"

"বিছানার উপর।"

"যে বিছানায় রোজ রাত্রে শোও?"

"হ্যাঁ। জপ শেষ করেই শোবার কথা আপনি বলে' দিয়েছিলেন ত!"

বাবাজী কয়েক মুহূর্ত্ত কটমট করিয়া কুঞ্জলালের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "কত দিনের এড়া, অপবিত্র বিছানার উপর বসে' তুমি মহাবিদ্যার বীজমন্ত্র জপ করেছ! কি আক্কেল তোমার? কেন, একখানা কম্বল টম্বল তোমার কি ছিল না? না হয় মেঝের উপর পদ্মাসনে বসেই জপ করতে! সব পণ্ড করলে? ছি ছি ছি।"

বাবাজীর কথায় ও ভাবভঙ্গিতে কুঞ্জলাল একটু যেন দমিয়া হইয়া গেল। বলিল, "বিছানায় বসে' জপ করতে হবে না এ কথা ত আপনি আমায় বলে দেন নি!"

বাবাজী একটু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "সে কথাও আবার হিঁদুর ছেলেকে বলে দিতে হবে? জান না? তোমার বাপ পিতামো, মা-মাসী বিছানার উপর গদিয়ান হয়ে বসে' পূজো আহ্নিক করছেন এ কবে দেখেছ? ইংরেজি পড়ে কি একেবারে গোল্লায় গেছ? নাহক্ আমায় কষ্ট দিলে! আমার যেমন গ্রহ, ঐ মোদক আর অঞ্জন তৈরি করতে আমার কি কম মেহনৎটা হয়েছে। আমারও পণ্ডশ্রম হল, তুমিও নিষ্ফল হলে।"—বলিয়া তিনি হতাশভাবে তামাক খাইতে লাগিলেন।

বাবাজীকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিয়া যাইবে ভাবিয়াই কুঞ্জ আসিয়াছিল, এখন দেখিল, সেটা উল্টা হইয়া যায়। কিন্তু উপায় কি? ইনি যাহা বলিতেছেন তাহারও ত কাটান্ নাই। পূর্ব্বের ঔদ্ধত্যপূর্ণ স্বর কয়েক পর্দ্দা নামাইয়া বলিল, "শুধু নিষ্ফল হলে ততটা ক্ষতি ছিল না; রোগে ভুগতে হল যে! সেই কলাপাতাটা ঘরের মেঝেয় পড়ে ছিল—"

বাবাজী বাধা দিয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, "মোদক খেয়ে কলাপাতাটা বুঝি ছুড়ে মেঝের উপর ফেলে দিয়েছিলে? ছত্রিশ জাতের পায়ের ধূলোর উপর! পূজো শেষ হলে ফুল বিল্বপত্রগুলো হিন্দুরা ঘরের মেঝেতেই বুঝি ফেলে দিয়া থাকে? ভাল!"—বলিয়া আবার গুড়ুকে মন দিলেন।

"পড়ে ছিল, ডাক্তার সাহেব সেটা শুঁকে, তাতে আফিমের আরক, গাঁজার আরক এই রকম সব জিনিষের গন্ধ পেয়েছেন। আমায় খুব বক্‌তে লাগলেন। বল্লেন এই সব জিনিষ খেয়েই আমার তেমন শক্ত ব্যারামটি হয়েছে।"

বাবাজী বলিলেন, "ডাক্তার সাহেব ত সবজান্তা! তিনি লোকটা কে?"

কুঞ্জ বলিল, "সেই যাঁর মেয়ের কথা আপনাকে বলেছিলাম। সেই মেয়ের জন্যেই তো—"

বাবাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে মেয়েটির কোন খবর টবর তার বাপের কাছে শুনলে না কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ঢাকা জেলার একটি পাত্রের সঙ্গে তার বিবাহ স্থির হয়েছে একথা তিনি বলে গিয়েছিলেন। এতদিনে বোধ হয় তার বিবাহ হয়েও গেছে।"

বাবাজী কয়েক মুহূর্ত্ত গর্ব্বিত দৃষ্টিতে কুঞ্জলালের পানে চাহিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "এই খবরটি জানবার জন্যেই ত তুমি অদৃশ্য হতে চেয়েছিলে বাপু? জানতে পেরেছ ত! তবু শাস্ত্রকে অবিশ্বাস করবে? কলকাতায় এত মেয়ের বাপ ডাক্তার থাকতে, ঐ মেয়ের বাপটিকেই এই ধাবধাড়া গোবিন্দপুরে আকর্ষণ করে আনলে কে, এ প্রশ্ন কি তোমার মনে কোনও দিন উদয় হয়েছে?"—বলিয়া তিনি গর্ব্বভরে কুঞ্জলালের পানে চাহিলেন।

কুঞ্জ থতমত খাইয়া অপরাধীটির মত বলিল, "আজ্ঞে না, তা ত হয় নি।"

তাহার এই ভাব-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া, বাবাজী খুসী হইয়া মনে মনে বলিলেন, "এস বাবা, পথে এস।" প্রকাশ্যে একটু নরম সুরে বলিলেন, "তোমায় দোষ দেওয়া মিথ্যে, এ সব কেবল ম্লেচ্ছবিদ্যার দোষ!"

এতক্ষণে কুঞ্জলাল মনে মনে বাবাজীর নিকট সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করিল; এবং তাঁহার ন্যায় মহাত্মাকে অন্যা

সন্দেহ করার জন্য লজ্জিতভাবে মাথাটি হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

কয়েক মিনিট স্তব্ধতার পর বাবাজী বলিলেন, "দেখ, একেবারে নিষ্ফলও ত হওনি। যা জানতে চেয়েছিলে, দেবী তা তোমায় জানিয়ে দিয়েছেন। তবে তোমার ঐ অনাচারের অপরাধ তিনি নিয়েছেন সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে,—তাই ঐ রোগটি দিয়ে তোমায় আচ্ছা করে' চাব্‌কে দিলেন। এখন শিক্ষা হল ত? ও সব গোয়ার্ত্তুমি ছেড়ে—দেখ, বোঝ,—হিন্দুশাস্ত্রটি কি জিনিষ! সাহেবরা সায়েন্স সায়েন্স বলে' যতই লম্ফঝম্ফ করুন, আমাদের মুনিঋষিদের পায়ের গোড়ালির কাছেও পৌছতে ওঁদের এখনও ৫০০০ বচ্ছর লাগবে। নিজের কর্ম্মদোষে ব্যারামে ভুগলে। কি ব্যারাম হয়েছিল?"

কুঞ্জ তাহার পীড়ার প্রথম কয়েক দিনের শ্রুত বিবরণ বাবাজীকে জানাইয়া শেষে বলিল, "অজ্ঞান অবস্থায় ঐ তিন দিন খুব আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখেই কেটেছিল কিন্তু।"

বাবাজীর প্রশ্নে, স্বপ্নবৃত্তান্ত, যতটা তার স্মরণ ছিল, সমস্তই বলিল।

বাবাজী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, "সেই সবই হল, কিন্তু কাযে কিছুই হল না। ঐ অনাচারগুলি যদি না করতে, তাহলে স্বপ্নে যা যা দেখেছ, সমস্তই যথার্থ ঘটে যেত। বাড়ী এসে, টাকার গাদার উপর তুমি বস্‌তে। নিজের দোষেই সব মাটি করলে—হায় হায়।"

কুঞ্জলাল অকপটে অনুতপ্ত স্বরে স্বীকার করিল যে নিজের দোষেই সমস্ত সে মাটি করিয়াছে। মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বাবাজী এতক্ষণে তাহার পূর্ব্ব ঔদ্ধত্য মার্জ্জনা করিলেন। তাহার বাহুতে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "সত্যি না হয়ে স্বপ্ন হয়ে গেল সে জন্যে আর দুঃখ করে' কি হবে? সবই যে স্বপ্ন—এ জগৎটা, এ জীবনটাও যে স্বপ্ন বাবা!"

কুঞ্জ বলিল, "তা ঠিক।"

আরও কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর, কুঞ্জ বিদায় লইবার জন্য উঠিল। পূর্ব্বক্রটি সংশোধন অভিপ্রায়ে পকেট হইতে টাকা দুটিই বাহির করিয়া বাবাজীর পায়ের কাছে রাখিয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

বাবাজী আশীর্ব্বাদ করিয়া, স্নেহসিক্তস্বরে বলিলেন, "আজ রাগের মাথায় দু'চারটে কড়া কথা তোমায় বলেছি, সে জন্যে তুমি কিছু মনে কোর না বাবা। এস মধ্যে মধ্যে, বুঝলে?"

কুঞ্জ বলিল, "আজ্ঞে, আসবো বৈকি। আর কড়া কথার সম্বন্ধে যা বল্লেন, সে আমি কিছু মনে করিনি। গুরুর কাছে কাণমলা খাবন ত শিখ্‌ব কি করে? আচ্ছা, আসি তবে, প্রণাম।"

টাকা দুইটি ট্যাঁকে গুঁজিয়া, গমনশীল কুঞ্জলালের পশ্চাতে চাহিয়া বাবাজী আপন মনে অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "বাবু যখন এলেন, ন্যাজ একেবারে খাড়া, আকাশের দিকে উঁচু হয়ে আছে। যাচ্চেন—কেঁউ কেঁউ কেঁউ—সে ন্যাজ কোথায় ঢুকে গেছে তার পাত্তাই নেই! কেমন, যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হয়েছে ত?"—বলিয়া ক্ষণকাল দাঁত খিচাইয়া থাকার পর, হুঁকা টানিয়া দেখিলেন আগুন নিবিয়া গিয়াছে। কলিকা ঢালিয়া সাজিবার জন্য গম্ভীর স্বরে চেলা-ভৃত্যকে ডাকিলেন—"দেবীপ্রসাদ!"

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থ-সমালোচনা

কান্তকবি রজনীকান্ত।—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রণীত। কলিকাতা, ৩০নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট হইতে বেঙ্গল বুক কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। হৃষীকেশ-সিরিজ গ্রন্থাবলীর চতুর্থ গ্রন্থ। ডবলক্রাউন ১৬ পেজি, ৪০৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ৪৲

বাঙ্গালীর সাধের কবি, বাঙ্গালার গীতকুঞ্জের পাপিয়া কান্ত-কবির জীবনচরিত বাহির হইয়াছে : নলিনী বাবু ইতিপূর্ব্বে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের পুণ্যচরিত বিবৃত করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। সমালোচ্য গ্রন্থেও তাঁহার পূর্ব্ব যশ সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কবির বিচিত্র জীবনের মধুময়, গীতময়, হাস্যময় ও অশ্রুময় কাহিনী অতি হৃদয়গ্রাহী এবং মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় রচনা করিয়া গ্রন্থকার বঙ্গবাণীর কমঅঙ্গে একখানি নূতন মণিভূষণ পরাইয়া দিয়াছেন।

কবি রজনীকান্ত ছিলেন প্রকৃতির দুলাল, পল্লীতড়াগের শতদল পদ্ম। তেমনি সহজ সৌন্দর্য্য, তেমনি উদার বিকাশ, তেমনি মধুরসে ভরপুর। তাঁহাকে চিনিলেই জানা হইত, জানিলেই চেনা হইত। তাঁহাকে বুঝিতে কেহ কখনও ভুল করিয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। এমন সহজ, সরল স্বচ্ছ আনন্দময় স্বভাবকবির সর্ব্বজনমনোহারী জীবন-কথা নলিনী বাবু দ্বাদশ বর্ষব্যাপী সাধনায় মণিমালার ন্যায় গাঁথিয়া স্বজাতিকে উপহার দিয়াছেন। বাঙ্গালী এ দানের জন্য কৃতজ্ঞ।

মৃত্যুর আহ্বান পৌঁছিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কান্তকবি কেবলি হাসিয়াছেন, কেবলি গাহিয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠ ছিল যেন গীতগঙ্গার "গোমুখী"। মনে হয়, সোণার বংলার পল্লীকুঞ্জের কোন কোকিল, কোন শ্যামা, কোন দোয়েল, বা কোন পাপিয়াও তত গাহে নাই, যত গাহিয়াছিলেন তিনি। আনন্দ ছিল তাঁর স্বভাব, সঙ্গীতে ছিল তার অভিব্যক্তি। এই আনন্দজলধি মন্থনোত্থিত বিষ পান করিয়াই তিনি অবশেষে নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন। অজস্র "আলাপে", "বিলাপে" ও "প্রলাপে" তাঁহার কণ্ঠ দীর্ণ হইয়া যায়, এবং উহা হইতেই কালব্যাধির (ক্যান্‌সার) সূচনা হয়। তিনি বিশেষ ভাবে গানেরই কবি ছিলেন, এবং অমন সুগায়ক ছিলেন বলিয়াই অমন সুকবি হইতে পারিয়াছিলেন। গান করিতে করিতে তিনি আত্মহারা হইয়া যাইতেন এবং ভাবতরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেন। সুতরাং একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, কণ্ঠেই তাঁহার প্রতিভার উদয়, কণ্ঠেই তাহার মধ্যাহ্ন প্রতিষ্ঠা এবং কণ্ঠেই তাঁহার অস্তাবসান। গ্রন্থকারের নিপুণ লেখনী এ সমস্তই অতি বিশদভাবে ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে।

কান্তকবির কবিত্ব ফুটিয়াছিল সাধন সঙ্গীত, স্বদেশ সঙ্গীত এবং হাসির গান—এই "ত্রিধারায়"। কিন্তু সাধন সঙ্গীতেই তাঁর প্রতিভা পূর্ণ স্ফূর্ত্তি লাভ করিত। শব্দ-সম্পদে, ছন্দ-মাধুর্য্যে, ভাবগাম্ভীর্য্যে ও সর্ব্বত্র রুচির পবিত্রতায় রজনীকান্ত কবি-শিরোমণি ছিলেন। তাঁহার সাধন-সঙ্গীতগুলিতে তিনি যে প্রেম, যে ভক্তি এবং যে ব্যাকুলতা ঢালিয়া দিয়াছিলেন তাহা যে কবিত্বমাত্র ছিল না, একান্তই সত্য-বস্তু ছিল —বর্ষাধিকব্যাপী মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যে তাহা তিনি বর্ণে বর্ণে সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। এমন বিশ্বাসী ভক্ত-কবি শুধু বাংলায় কেন, পৃথিবীতেও সুদুর্লভ।

কবির—"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নেরে
ভাই।
দীন দুখিনী মা যে মোদের, তার বেশী আর সাধ্য নাই।"

আজ বাংলার ঘরে ঘরে জপমন্ত্র হইয়া গিয়াছে। দেবপূজার অঞ্জলি চন্দনচর্চ্চিত রক্তজবার মতই এই গীতাঞ্জলি কবি-হৃদয়ের গৈরিক রঙ্গে অনুরঞ্জিত। চিরসুহৃৎ মহাপ্রাণ কুমার শরৎকুমারকে মৃত্যু-শয্যায় শায়িত কবি তাঁহার "অমৃত" উৎসর্গ করিতে যাইয়া শেষ দুই ছত্রে লিখিয়াছেন—

* * * *

ধর দীন উপহার, এই মোর শেষ ;
কুমার। করুণানিধে, দেখো রল দেশ।

হায় অভাগা দেশ। কি রত্নই তুমি অকালে হারাইয়াছ। কবি তাঁহার হাসির গানগুলিতে অনেক সময়ে হৃদয় বেদনা চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছেন। আবার অনেক গান তিনি "অতি অকারণ পুলকে" গাহিয়া গাহিয়া অনাবিল আনন্দ বিতরণ করিয়াছেন। প্রতিভাশালী গ্রন্থকার অসাধারণ দক্ষতার সহিত এই সমস্ত বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া কবি হৃদয়ের একখানি পরম রমণীয় চিত্র পাঠকের চক্ষে প্রতিফলিত করিয়া তুলিয়াছেন।

কবির রোজনামচা এই গ্রন্থরত্নহারের মধ্যমণি। ইহা বঙ্গভাষার এক অমূল্য সম্পদ—"সাতরাজার ধন এক মাণিক।" পৃথিবীর আর কোন কবি মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যে এমন অপূর্ব্ব দৈন-

স্মিন লিপি রাখিয়া গিয়াছেন কি না জানি না। বাঙ্গালী হইয়া যে ইহা উপভোগ না করিবে সে দুর্ভাগ্য।

কবির বাগ্‌যন্ত্র যখন চিরদিনের মত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, যখন তিনি পলে পলে তিল তিল করিয়া মরিতেছিলেন, তখনও বাণীর সেবায় তাঁহার কি আকুল আগ্রহ! তখনও—"আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ, গর্ব্ব করিতে চুর" প্রভৃতি অমূল্য সঙ্গীত রচনায় তাঁহার কি আশ্চর্য্য অভিনিবেশ। তখনও আর একবার অমৃত কণ্ঠে ঝঙ্কার তুলিতে তাঁহার কি আর্ত্তি! পরম ভাগবত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র কবির নিজ কণ্ঠে তাঁহার স্বরচিত সাধনসঙ্গীত শুনিবার অপূর্ব আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করিলে, বাক্যহারা কবি পাষাণদ্রাবী ভাষায় লিখিয়াছিলেন—"দয়াল আর একদিন কণ্ঠ দে, দেবতাকে দেবতার নাম শোনাই, একদিন কণ্ঠ দে দয়াল। খালি ওঁকেই শোনাব, তারপর কণ্ঠ বন্ধ করে দিস্।" এমন অসংখ্য রোমাঞ্চকর করুণ কাহিনীতে গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ করিয়া নলিনীরঞ্জন বঙ্গবাণীর পূজার জন্য এক মোহন নৈবেদ্য রচনা করিয়াছেন।

মাইকেল মধুসূদনের ন্যায় কান্তকবিও হাসপাতালেই জীবলীলা সম্বরণ করেন। কিন্তু সেই "অকাল কোকিল মরুতলতরু অনীর দেশের বাসি"কে মৃত্যুকালে উপেক্ষা করিয়া বাঙ্গালা যে মহাপাপ করিয়াছিল রজনীকান্ত রোগশয্যায় স্বজাতিকে সে পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিবার অবসর দিয়া মরিয়া ধন্য হইয়াছেন। কবির মহাযাত্রার পথে, সেই অতি বড় দুর্দ্দিনে যে সকল মহাপ্রাণ তাঁহাকে আপ্রাণ চেষ্টায় সেবা করিয়া এবং মুক্ত হস্তে সাহায্য করিয়া বাঙ্গালীর মুখ রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের অবদানের কথা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থকার অতি উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন।

এই বৃহৎ গ্রন্থের যথাযোগ্য সমালোচনা অনায়াসসাধ্য নহে। আমিও সে চেষ্টা করি নাই। তবে উহা পড়িতে পড়িতে আমি যে আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি, তাহারই কিয়দংশ ভাষায় ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র। আমি নিশ্চয় বিশ্বাস করি যে, কান্তকবির গানের মতই তাঁহার এই জীবনকথা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আশা ও আনন্দের বাণী বহন করিবে।

গ্রন্থের ছাপা, কাগজ, ছবি এবং বাঁধাই মনোজ্ঞ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

সাহিত্য-সমাচার

হিন্দুমেয়েদের শিক্ষা

আমার প্রতিষ্ঠিত "দুর্গাবতী বালিকা শিক্ষাশ্রম" লইয়া সাধারণে যে আলোচনা করিয়া থাকেন, তাহার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া, সাধারণের সাহায্য না চাহিয়াই যে কায আরম্ভ করিয়াছি, তাহাতে লোকের সহানুভূতিটুকুই পাইতে আশা করি। কিন্তু তাহাও সকলে দেখান না। রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া (২৩শে শ্রাবণ তারিখে শান্তিনিকেতন হইতে তিনি লেখেন, "তোমার শিক্ষাপ্রণালীটি আমার মনের মত। এই সৎকর্ম্মে তোমার সফলতালাভ কর, এই আমার কামনা") কায চালাইতেছি, আশা করি সফল হইব।

সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দু মেয়েদের দেখিয়া মনে হয় তাহারা যথার্থ শিক্ষা কিছু পায় না। পাড়ায় পাড়ায় মিশনারীদের, বা ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের অথবা অন্য কোনও নারী শিক্ষা-সমিতির যে সব স্কুল আছে, তাহাতে ছেলেদের স্কুলের শিক্ষা-প্রণালী অনুসারে পড়ান হইয়া থাকে। সেই সাহিত্যপাঠ, বিজ্ঞান রিডার, ব্যাকরণ, ভূগোল, ইতিহাস, ইংরাজী রিডার প্রভৃতি। মেয়েরা স্কুল হইতে পড়া লইয়া আসিয়া সন্ধ্যাবেলা বসিয়া ক্রমাগত মুখস্ত করে। ১৩।১৪ বছরেই তাহাদের বিবাহ হইয়া যায়, তাহারাও বইগুলা ফেলিয়া দিয়া মুখস্ত করা বিদ্যা ভুলিয়া যাইবার সুযোগ পাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। তার পর পরিণত বয়সে চাকরের কাছ হইতে বাজার খরচ একটাকার হিসাব লইতে বা নিজে হাতে ইংরাজীতে

একটা নাম ঠিকানা বানান করিয়া লিখিতে মাথায় বজ্রাঘাত হয়। অথচ তাহারা হয়ত বড় বড় গুণ ভাগ কষিতে জানে, তিন চার বুক ইংরাজী রিডার পড়িয়া "My net is wet", "His bag is of red colour" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ করিতে বেশ পারিবে। হাতের লেখাও হয়ত ভাল। কিন্তু হইলে কি হয়, বাবু বীরেশ্বর বসু, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, ইংরাজীতে লিখিবার জন্য কি বানান তা পরকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

সময়, অর্থ, উৎসাহ ও শরীর নষ্ট করিয়া ইহারা যেটুকু লেখাপড়া শেখে, পরে সেটা তাদের কিছুই কাযে লাগে না। এমন কি বাংলায় একটা চিঠিও তাহারা গুছাইয়া লিখিতে পারে না।

এই সব দেখিয়া, আমি সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে তাহাদের এমন শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছি, যাহাতে তাহাদের পরে যথার্থ কাযে লাগে। আমার প্রণালীতে আমি সফল হইয়াছি। আমার মেয়েরা হিসাব করিতে পারে, যে কোনও বাংলা নাম ইংরাজীতে লিখিতে পারে, চিঠি পত্র লেখা তাদের বেশ গোছান হয়। পৃথিবীর কথা, আকাশের কথা, ধান চালের কথা, দেশ বিদেশের কথা প্রভৃতি নানা সাধারণ বিষয়ে তাহাদের জ্ঞান হইয়াছে। এ সবের সঙ্গে সঙ্গে সেলাই, ক্লে মডেলিং, চরকার সূতাকাটা, আলপনা ও শ্রীগড়া—সবই শেখান হয়। সেতার ও এস্রাজ শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি। অসংখ্য শিক্ষার্থিনীদের মধ্যেই আমি মাত্র ২৫টি মেয়ে লইতে পারিয়াছি, কারণ সবই আমাকে একলা চালাইতে হয়।

"মানসী"র গ্রাহক অনুগ্রাহক, সকলকেই আমি সাদরে আমার সামান্য আশ্রমে আহ্বান করেতেছি। আমার শিক্ষাপ্রণালী আমি আনন্দের সহিত ব্যাখ্যা করিব।

শ্রীঅশ্রুমালা বসু।
দুর্গাবতী শিক্ষাশ্রম
৪৪ মলঙ্গা লেন, বহুবাজার
কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত 'রহস্য-লহরী' গ্রন্থমালার ৬১নং "ঘরের ঢেঁকি" ও ৬২নং "রোজা না ভূত" নামক গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য প্রত্যেকখানির ।৹

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "পঞ্চপাত্র" কবিতা গ্রন্থ যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

হৃষীকেশ সিরিজের ৫ম গ্রন্থ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত "চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ," বাহির হইয়াছে; মূল্য ১৲

কলিকাতা
১৪এ রামতনু বসুর লেন, "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সন্ধ্যায় শিবার্চ্চনা

চিত্রকর—শ্রীজিতেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

১৪শ বর্ষ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩২৯

১ম খণ্ড
৬ষ্ঠ সংখ্যা

ভারতীয় পরিব্রাজক

(ফরাসী হইতে)

দশম ও একাদশ শতাব্দীতে যখন মুসলমানেরা ভারত-বিজয়ের চেষ্টা করিতেছিল, ঠিক সেই সময় অনেক বৌদ্ধ পরিব্রাজক ধর্ম্মপ্রচার করিতে ভারতের বাহিরে যাইতেছিলেন। তাঁহারা ভারতের নানা দেশ হইতে কখনও চীন, কখনও বা তিব্বতে যাত্রা করিতেছিলেন। সেই সব ভারতীয় পরিব্রাজকদের কাহিনী চীনা ও তিব্বতী গ্রন্থে লেখা আছে।

৯৭১ সালে যিনি চীনের রাজসভাতে হাজির হন, সেই বৌদ্ধ ভিক্ষুর নাম মঞ্জুশ্রী। তিনি নাকি পশ্চিম ভারতের কোন এক রাজার ছেলে। সেই দেশের রীতি এ রকম ছিল যে রাজার মৃত্যু হইলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনের অধিকারী হইবেন, আর অন্য পুত্রেরা সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইবে। সেই জন্য তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও দেশ ছাড়িয়া চীনা ভিক্ষুদের সঙ্গে চীনদেশে গিয়া উপস্থিত হন। অল্পদিনে চীনদেশে তাঁহার খুব প্রতিপত্তি হয়। সকলে বলিত যে তাঁহার মত ধর্ম্মশীল ভিক্ষু আর নাই। ইহার ফল খারাপ হইল। তিনি কয়েকজনের চক্ষুশূল হইলেন। ইহারা তাঁহার অপকারের চেষ্টা করিতে লাগিল। দুঃখের বিষয় অপর ভারতীয় ভিক্ষুদের মত তিনি চীনাভাষা শিক্ষা করেন নাই। তাই চীনা ভিক্ষুরা একদিন রাজার কাছে গিয়া বলিল যে, মঞ্জুশ্রী স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে চান। ইহাতে রাজার কিছু আপত্তি ছিল না; তিনি অনুমতি দিলেন। মঞ্জুশ্রী যখন শুনিলেন যে রাজা তাঁহাকে ভারতে ফিরিতে আদেশ করিয়াছেন, তিনি ত অবাক্। তিনি খুব ক্রুদ্ধ হইলেন। প্রথমে আপত্তি করিলেন, শেষে আরও কিছু মাস চীনদেশে থাকিয়া, স্বদেশে ফিরিবার জন্য সমুদ্র পথে যাত্রা করিলেন। কিন্তু অবশেষে তিনি কোথায় যাইলেন, তাহা কেহ জানে না।

৯৮০ খৃঃ অব্দে দুইজন ভারতীয় ভিক্ষু চীনদেশে যান। একজনের নাম সম্ভবতঃ দানপাল, তাঁহার আদি নিবাস "উত্থান" (বা কাশ্মীরের নিকট)। আর এক জনের বাড়ী কাশ্মীরেই। তাঁহারা দুজনেই ত্রিপিটক শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। চীনদেশে যাইবার দুই বৎসর পরে চীনের সম্রাট্ তাঁহাদের উপর সংস্কৃত বই চীনা ভাষায় অনুবাদ করিবার ভার দেন। এ জন্য তিনি একটী কমিটী গঠন করেন। সেই কমিটীতে ইঁহারা দুইজন ও ধর্ম্মদেব নামে আর একজন ভারতীয় ভিক্ষু নিযুক্ত হন। তাঁহারা প্রত্যেকে এক একটী বই চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। ইহা ছাড়া আরও কয়েকজন সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত চীনা ভিক্ষু, সেই অনুবাদ ঠিক হইয়াছে কি না দেখিবার জন্য নিযুক্ত হন। আরও একজন পণ্ডিত ছিলেন—লিখন-ভঙ্গী দেখিবার জন্য। এই রকমে ভারতীয় ভিক্ষুরা চীন দেশে গিয়া সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করিতেন। এ সব কাযে তাঁহারা রাজার সাহায্য যথেষ্ট পাইতেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, যদিও সেই সকল অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ লোপ পাইয়াছে, তবু এখনও সেই চীনা অনুবাদগুলি ঠিক আছে। যদি ভারতবাসীরা সেই সব সংস্কৃত গ্রন্থ উদ্ধার করিতে চান, তবে পুনরায় চীনা ভাষা হইতে অনুবাদ করিতে হইবে।

৯৯৫ খৃঃ অব্দে মধ্যভারত হইতে আর একজন ভিক্ষু চীনদেশে যান। তাঁহার নাম বোধ হয় কালশান্তি। চীনের সম্রাটের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া তিনি সম্রাটকে কতকগুলি উপহার দেন। তাহার মধ্যে বুদ্ধের অস্থি ছিল, আর কতকগুলি পুঁথি ছিল। সেই পুঁথিগুলি তালপাতায় লেখা ছিল।

ইহার দুই বৎসর পরে (৯৯৭ অব্দে) রাহুল নামে এক শ্রমণ চীনের দরবারে হাজির হন। তিনি ভারতের পশ্চিম অংশ হইতে গিয়াছিলেন। তিনিও কতকগুলি সংস্কৃত পুঁথি লইয়া গিয়াছিলেন। সেইগুলিও তাল পাতায় লেখা ছিল।

১০০৪ খৃঃ অব্দে অপর এক শ্রমণ চীনদেশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নাম—শীলভদ্র। তিনি উত্তর ভারত হইতে চীনের দরবারে গিয়াছিলেন। চীনের সম্রাট সেই সময় বৌদ্ধ ছিলেন, তাই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তিনিও কয়েকখানি সংস্কৃত পুঁথি স্বদেশ হইতে লইয়া গিয়া সম্রাট্‌কে উপহার দেন।

পরের বৎসর কাশ্মীর হইতে এক শ্রমণ চীনে যান। যাইবার সময় বুদ্ধগয়া হইতে তিনি বোধিদ্রুমের একটী শাখা সংগ্রহ করেন ও সেইটী চীনদেশে লইয়া গিয়া সম্রাটকে উপহার দেন। ইহাতে সম্রাট নিশ্চয়ই তাঁহার উপর খুব প্রীত হইয়াছিলেন, কেন না বৌদ্ধদের নিকট বোধিদ্রুমের শাখা অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহা ছাড়া কয়েকখানি সংস্কৃত বহি লইতেও তিনি ভুলেন নাই।

এই সব শ্রমণদের মধ্যে কাশ্মীরের শ্রমণেরাই অধিক সংখ্যায় চীনদেশে যাইত বলিয়া মনে হয়, কারণ কাশ্মীর ও গান্ধার দিয়া সে দেশে যাইবার সুবিধা অনেক ছিল। তবে বাংলা বা মগধ হইতে যে ভিক্ষুরা যাইত না, তাহা নহে। বাংলার ও মগধের ভিক্ষুদেরও উল্লেখ আছে।

১০১৬ খৃঃ অব্দে বাংলা দেশ হইতে একজন শ্রমণ চীনদেশে গমন করেন। সেই শ্রমণের চীনা নাম—P'ou tsi—তিনি পূর্ব্বভারতের বরেন্দ্র রাজ্য হইতে আসিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ আছে। চীনা ভাষায় বরেন্দ্রের নাম হইয়াছে Fo-lin-nai। তাঁহার সঙ্গেও অনেক সংস্কৃত পুঁথি ছিল।

এই রকমে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বিদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিতে দলে দলে যাইতেন। এখানে মোটামুটী ভারতীয় শ্রমণদের কথা বলা হইল—যাঁহারা ১০ম ও ১১শ শতাব্দীতে চীনে সদ্ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের পথ সামান্য ছিল না, পথে কষ্ট ও বিপদ দুইই ছিল। কিন্তু সে সকল গ্রাহ্য না করিয়াও তাঁহারা কেবল ধর্ম্ম প্রচারের জন্য নানা স্থানে যাইতেন। *

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু।

---

* এই প্রবন্ধে উল্লিখিত শ্রমণদের বৃত্তান্ত M. Chavannes রচিত Les Inscriptions Chinoises De Bodh Gaya প্রবন্ধের পরিশিষ্ট অবলম্বনে লিখিত। মূল প্রবন্ধটী Revue de L'histoire des Religions পত্রিকাতে ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল।

হিন্দুসমাজে নারীর স্থান

স্ত্রী ও পুরুষ জাতি সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে আদিকাল হইতে উভয় জাতির উপযোগিতা ও কার্য্যকারিতা পর্য্যালোচনা করা উচিত। ইতিহাস-পূর্ব্ব যুগের অবস্থা, অনুমানে স্থির করা ভিন্ন উপায় নাই। আদিকালে মানবজাতির অসভ্যাবস্থা ছিল, স্ত্রী পুরুষ নগ্নদেহে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিত, তখন স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ গঠিত হয় নাই, বিবাহ বিধি প্রচলিত হয় নাই। সমাজের সৃষ্টি হয় নাই, তদনুযায়ী কোন নিয়ম পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

কালক্রমে মানবহৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ হয় এবং তৎসহযোগে মানবজাতির মধ্যে সভ্যতা প্রবেশ আরম্ভ হইল। এই সভ্যতা সৃষ্টির সূত্রপাত সর্ব্বাগ্রে কে করিয়াছিল? নারী না পুরুষ? প্রথমেই পুরুষের প্রতিভা স্ফূর্ত্ত হইয়া সভ্যতার সোপানাবলি নির্ম্মিত করিয়াছিল একথা সর্ব্বদেশে সর্ব্ববাদী সম্মত। স্বভাবতঃ নারী জাতি পুরুষ অপেক্ষা চঞ্চল ও দুর্ব্বল-প্রকৃতি, কোমল ও ভাবপ্রবণ—ইহা সাধারণ দৃষ্টিতে বেশ বুঝা যায়। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণও নারীর আকৃতি প্রকৃতি বিশ্লেষণে উহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পুরুষ ও স্ত্রী লইয়া মানব জাতি হইয়াছে—উহার মধ্যে পুরুষ আশ্রয়, স্ত্রী আশ্রিতা, পুরুষ কঠিন, নারী কোমল, অতএব দেখা যাইতেছে মানব জাতির দুইটা বিভাগ একজাতীয় এক প্রকৃতি সম্পন্ন নহে, বরং ভিন্ন জাতি, ভিন্ন প্রকৃতি।

একটু প্রণিধান করিলে অবশ্যই প্রতীত হইবে যে এ সংসারে নারী জাতির উপযোগিতা ও কার্য্যকারিতা পুরুষের সহিত এক নহে। উভয় জাতির উন্নতি ও পরিণতি বিভিন্ন—বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দুইটি জাতি সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং উভয় জাতির শিক্ষা দীক্ষা যে একই প্রকারের হইবে ইহা সঙ্গত নহে। যুবকের শিক্ষা ও যুবতীর শিক্ষা বিভিন্ন হওয়া উচিত।

এই সংসারে যখন মানবের মনস্বিতা, প্রতিভা প্রস্ফুটিত হইয়া সভ্যসমাজ সংগঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখন স্ত্রী পুরুষের উপযোগিতা, কার্য্যকারিতা, ইত্যাদি অবশ্যই বিবেচিত হইয়াছিল। এ কথা কেবল ভারতবর্ষের হিন্দু জাতি সম্বন্ধে বলিতেছি না, এই পৃথিবীর যে জাতিই বলুন, তাহারা যে সময় সভ্য হইয়াছিল, সেই সময়েই স্ত্রী পুরুষের উপযোগিতা ও কার্য্যকারিতা নির্ণয় এবং তাহা সুনিয়মে পরিচালিত হওয়ার বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিল। সকল দেশেই পুরুষ জাতি অগ্রে ক্ষমতাশালী হইয়াছিল, সেই হেতু সকল দেশে পুরুষই সমাজ-পরিচালনের বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিল। ইহাতে অবশ্যই বুঝা যাইতেছে, কোন দেশেই পুরুষের অগ্রে স্ত্রী জাতির প্রতিভা স্ফূর্ত্তি হয় নাই, সমাজ গঠনের বিধি ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ বা কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করে নাই, অথবা করিতে পারে নাই। উহা হইতে আরও অনুমান করা যাইতে পারে, স্ত্রীজাতি পুরুষ জাতি অপেক্ষা হীনবুদ্ধি, ক্ষমতায়ও ন্যূন, তাই আদিম কাল হইতে একাল পর্য্যন্ত কোনদিন কোন দেশে কোন সমাজে নারী কর্ত্রী হইতে পারে নাই, চিরদিন সে অনুবর্ত্তিনী, অনুগতা, আশ্রিতা হইয়া আসিয়াছে। এরূপ অবস্থায় যদি কোন দার্শনিক কবি পুরুষকে কায়া, স্ত্রীকে ছায়া বলিয়া থাকেন, তাহাতে স্ত্রীজাতির অভিমানের কোনও কারণ দেখা যায় না।

যে কালে সমাজ গঠিত হয় নাই, বিবাহ বন্ধন প্রচলিত হয় নাই, সে কালে স্ত্রী পুরুষ স্বেচ্ছাচারী ছিল। লক্ষ লক্ষ নরনারী নগ্ন দেহে অরণ্যের বৃক্ষতলে গিরিগহ্বরে বাস করিত। উহাদের মধ্যে স্বভাবত যৌন নির্ব্বাচন ও আসঙ্গলিপ্সা প্রবল ছিল, যাহাতে স্ত্রী পুরুষ একত্র হইত, সৃষ্টির কার্য্য চলিত, কিন্তু কোন নিয়ম, বিধিব্যবস্থা ছিল না। যতদিন মনের মিল থাকিত, একত্র বাস

করিত; কোন কারণে অমিল হইলে পরস্পর তফাৎ হইত। এরূপ ভাব অদ্যাপি বহু সমাজে বিদ্যমান আছে।

এইরূপ আদিম অসভ্যাবস্থায়—যে সময়ে সমাজের অস্তিত্ব নাই, কোন বিধি ব্যবস্থার প্রচলন নাই, স্বামী স্ত্রী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় নাই, সে সময়ে—সতীত্ব, পাতিব্রত্য, পবিত্রতা, শুচিতা এ সকল কথার কোন সার্থকতা ছিল না। বিবাহের দ্বারা স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে সতীত্ব, পাতিব্রত্য, পবিত্রতা, শুচিতা কথার প্রয়োজনও দৃষ্টি হইয়াছে। স্বামীর জন্যই স্ত্রীর সতীত্বের মর্য্যাদা ও মাহাত্ম্য। পতির নিকট পত্নীর একাগ্রতা, একনিষ্ঠতাকেই পাতিব্রত্য বলে। স্বামীর সদ্ভাবে, অভাবে স্ত্রীর আমরণ সতীত্বধর্ম্ম পালনই পবিত্রতা। স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ যেখানে নাই, ঐ সকল সাধু বচনের সার্থকতাও সেখানে নাই। অতএব নারীর সতীত্ব, পাতিব্রত্য ও পবিত্রতার বিষয় পুরুষ যখন ভাবে, তখন স্বামিত্ব-প্রতীতি লইয়াই ভাবিয়া থাকে। নিজস্ব জ্ঞানের দিক দিয়াই ভাবে। অসভ্যাবস্থায় নারী হয়ত বহুচারিণী ছিল, তদবস্থায় তাহাকে অসতী বলা যায় না। যেখানে স্বামিত্ব নাই, সেখানে সতীত্বও নাই। (কুমারী সম্বন্ধে সততা কথাই প্রযুজ্য)। সমাজ-সঙ্গত পবিত্রপরিণয়ে নারী যখন পুরুষের নিজস্ব ও পুরুষ যখন নারীর নিজস্ব হয়, তখনই নিজস্ব জ্ঞানে উভয়েই উভয়ের সততা বা অসততার বিচার করিতে পারে। তাহাতে সঙ্কীর্ণতা অনুদারতা প্রকাশ পায় না, তাহাতে নারীজাতিকে হেয় জ্ঞান করা হয় না; অথবা পুরুষে তাহাকে ক্রীতদাসী মনে করে না।

মানব সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে পরস্পর আশ্রয় আশ্রিতার ভাব চলিয়া আসিতেছে। সমাজ বন্ধন, জাতীয় উন্নতি সাধন, পরিচালনের ব্যবস্থা, সমাজ শাসন প্রভৃতি সাধারণ গুরুতর কার্য্যে কোনও দেশের নারীজাতি কোনদিন হস্তক্ষেপ করে নাই। ঐ অধিকার পুরুষের প্রতিই অর্পিত ছিল; নারী জাতি যেন ইচ্ছা করিয়াই ঐ অধিকার ত্যাগ করিয়াছিল। পুরুষের চরিত্রের দুর্দ্দমনীয় দৃঢ়তা, কঠোরতা, ক্ষমতা, বলবিক্রম দেখিয়া স্বভাব-দুর্ব্বল নারীজাতি মুগ্ধ হইয়াছিল। পুরুষকারের নিকট নারীর মস্তক আপনা আপনিই অবনত হইয়াছিল। তাহারা বলিতে বাধ্য হইয়াছিল, সংসারের সর্ব্বপ্রকার বল বিক্রমের কার্য্য, দেশ হিতকর কার্য্য, আন্তর্জাতিক সন্ধি বিগ্রহের কার্য্য পুরুষেরাই সম্পন্ন করুক, সংসারের অন্য প্রকারের কার্য্য অর্থাৎ পুরুষের প্রীতিসাধন, সন্তান পালন, গুরুজনের সেবা, পীড়িতের সুশ্রূষা, দেব ধর্ম্ম রক্ষা প্রভৃতি যাবতীয় গার্হস্থ্য কার্য্য আমরা করিব। পরস্পরের মধ্যে এরূপ একটা স্বেচ্ছাকৃত নিষ্পত্তি না হইলে সংসারে সর্ব্বদেশে এরূপ সুশৃঙ্খলতা ও সাম্যভাব দেখা যাইত না। অধুনা কুশিক্ষা, দুর্নীতি স্বেচ্ছাচারিতা মানব সমাজে প্রবেশ করায় নানা কুতর্ক, অসন্তোষ, অশান্তি উত্থাপিত হইতেছে; পুরুষ স্ত্রী কেহই পুরাতন নিয়মে বাধ্য থাকিতে ইচ্ছুক নহে একটা নূতন কিছু করিতে সমুৎসুক।

বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে মিলিয়া যখন এক হইল, তখন একজন প্রভু একজন দাসী, একজন উত্তম একজন অধম, এরূপ ভেদবুদ্ধি কেন থাকিবে? অভিন্নহৃদয় দম্পতীর মধ্যে স্বার্থ পরার্থ ভেদ, উচ্চনীচতার কথা কেন উঠিবে? স্ত্রী-শিক্ষায়, স্ত্রীর উন্নতিতে যদি স্বামীভক্তি বৃদ্ধি পায়, একনিষ্ঠতা দৃঢ় হয়, স্বামিনির্ভরতা প্রগাঢ় হয়, তাহাতে পুরুষের স্বার্থপরতা অনুদারতা কিসে প্রকাশ পাইল? তবে কি যে শিক্ষায় নারীজাতি পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিযোগিতা করিতে পারে, যে শিক্ষায় স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, কলহপ্রিয়তা, তার্কিকতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যাহাতে বাঙ্গালীর দরিদ্র সংসারে কলহ কিচকিচি আসিয়া লক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান করেন সেইরূপ শিক্ষা বহুপরিমাণে প্রবর্ত্তিত করিলে বঙ্গীয় পুরুষের সুযশ, সুনাম, উদারতা স্ত্রীমহলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে? কায নাই এমন সুনামে, পৈতৃক ধন চিরাচরিত ধর্ম্ম বজায় থাক।

পুরুষের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া, স্ত্রীলোকের

স্বাধীন শিক্ষা, দীক্ষা, উন্নতিতে কি প্রয়োজন সাধিত হইবে বুঝা সুকঠিন। বিলাতে বহু চিরকুমারী আছেন। তাঁহারা স্বাধীনভাবে শিক্ষিতা, পুরুষ অপেক্ষা বিদুষী, গুণবতী হইয়া সমাজের কি বিশিষ্ট উপকার করিয়াছেন? বরং তাঁহারা মেয়ে হইয়া ক্রমে পুরুষের আকৃতি প্রকৃতি ধারণ করেন। সমাজও তাঁহাদিগকে ততদূর সম্মানের চক্ষে দেখে না। নেপোলিয়নের মাতা, নেলসনের ঠাকুর মাতার, সেক্ষপিয়র মিল্টনের মাতার সমাজে যে সম্মান, একজন বিদুষী কুমারীর সে সম্মানের শতাংশও নাই। পুরুষের সহিত সম্বন্ধ-বিচ্যুত হইয়া ঐ সকল বিদুষী কুমারী যদি অধিকতর অনাবিল আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন উত্তম, কিন্তু এই দরিদ্র হিন্দু সমাজে যেন ঐ প্রথা প্রবর্ত্তিত না হয়।

বিগত ১৩২৭ সালের আশ্বিন সংখ্যা “মানসী ও মর্ম্মবাণী”তে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সমাদ্দার মহাশয় স্ত্রীচরিত্র গঠনের একটি অভিনব পাশ্চাত্য প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন। আমেরিকার একটি প্রবীণ দার্শনিক পণ্ডিতের মত ইংরাজীতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—কন্যাদিগকে পাপ সংস্পর্শ, পাপের স্থান হইতে দূরে না রাখিয়া তাহাদিগকে উহার সম্মুখীন হইতে ও মিশিতে দেওয়া উচিত; কন্যাগণ পাপাচরণের কুফল দেখিয়া বুঝিবে যে পাপ পথে যাওয়া অতীব গর্হিত, ঐরূপ দেখিয়া শুনিয়া তাহাদের চরিত্র যেরূপ সুদৃঢ় ও বিশুদ্ধ হইবে, দূরে অন্তরালে থাকিলে সেরূপ হইবে না।

এই দার্শনিক উপদেশপ্রণালী শুনিলেই আমাদের মনে বিভীষিকার উদয় হয়। কন্যার দৃঢ় চরিত্র গঠন উদ্দেশে পাপের পাঠশালায় তাহাকে পাঠাইতে হইবে! যদি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারে, যদি তাহার পদস্খলন হয়, কি সর্ব্বনাশ? সে যে একেবারে অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য হইল। তাহার মুখ দর্শনেও কাহারও প্রবৃত্তি থাকিবে না। এমন বিপদসঙ্কুল নিদারুণ অগ্নিপরীক্ষায় কোন্ হিন্দু পিতা মাতা কন্যাকে পাঠাইবেন? বায়ুগ্রস্ত ভিন্ন কোনও প্রকৃতিস্থ পাশ্চাত্য পিতা মাতাও কন্যাকে সে পাঠাগারে পাঠাইবেন না। ভাবিয়া দেখুন স্ত্রী কন্যাকে ঐরূপ পাপের প্রলোভনে ফেলিয়া পরীক্ষা করিলে, যদি তাহারা উত্তীর্ণ হয়—তাহাতে তাহাদের নারীত্বের মর্যাদা বা মূল্য অধিক হইবে কি? মহামূল্য হীরক অত্যন্ত কঠিন প্রস্তর খণ্ড, উহার কাঠিন্য পরীক্ষার জন্য হাতুড়ির আঘাত হইল—তাহাতে না ভাঙ্গিলে, তাহার মূল্য বাড়ে কি? কিছুই বাড়ে না; যে মূল্য তাহাই থাকে। কিন্তু ভাঙ্গিয়া গেলে, তাহার মূল্য কপর্দ্দকও থাকে না। স্ত্রীলোকের সতীত্ব তদ্রূপ—সেই মূল্য-পরীক্ষায় না টিকিলে অস্পৃশ্য, টিকিলে মূল্যের বৃদ্ধি নাই। এরূপ ক্ষেত্রে পাপের স্থানে প্রলোভনের মধ্যে স্ত্রী কন্যাকে পাঠাইতে কোনও বুদ্ধিমান লোকে অনুমোদন করিবে না। সার্ভেণ্টস সাহেব বায়ুগ্রস্ত ডন কুইক্‌সোটের ভ্রমণবৃত্তান্তে বর্ণনা করিয়াছেন এক যুবক, বিশ্বাসী প্রিয় বন্ধু দ্বারা তাহার স্ত্রীর সতীত্বের দৃঢ়তা পরীক্ষা করিতে যাইয়া কি ভীষণভাবে ঠকিয়াছিল। নূতন সাহেবী মত দেখিলেই নব্য বাঙ্গালী তাহার পক্ষপাতী হন, ঐরূপ প্রবৃত্তিকে রোগ বিশেষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আবার ১৩২৮ সালের আষাঢ় মাসের “ভারতবর্ষে” দেখিলাম “নারীর কথা” শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী লিখিতেছেন, “নারীত্বের মহিমা এমনি ঠুন্‌কো জিনিস যে, বাল্যে পিতার অধীনে, যৌবনে স্বামীর অধীনে, বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীনে নারীর থাকতে হবে, কদাচ স্বাতন্ত্র্য দেওয়া উচিত নহে।···কি ঘৃণার্হ কথা! এ থেকে যা প্রকাশ পায়, তা লিখে বা বলে নিজেকে কলঙ্কিত করতে ইচ্ছা হয় না। এত ভঙ্গপ্রবণ, এমন ঠুন্‌কো ধর্ম্ম নাই থাক্‌লো? যার নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা নাই বা প্রবৃত্তি নাই, তাকে ধর্ম্ম বলা চলে না, আর যা ইচ্ছা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।”

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী প্রবন্ধটী আগাগোড়া প্রবল রাগ ভরে লিখিয়াছেন; ধীর ভাবে পক্ষাপক্ষ দেখিয়া সত্যানুসন্ধান করেন নাই, বিচার করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই, মক্ষিকা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কেবল ক্ষতস্থান খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন। প্রথমেই তিনি সাধক

রামপ্রসাদের গানের দুই চরণ তুলিয়াছেন—

"রমণীর মুখে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী।
ইচ্ছা সুখে পান করে, বিষের জ্বালায় ছটফটী।"

আবার—"তুলসী দাস পড়ুন, কবির পড়ুন, যাঁরা যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েছেন, লোকে বলে জনগণের উদ্ধারের জন্য, সেই সব মহাপুরুষ নামে অভিহিত মহাত্মারা তাঁদের জননী, ভগিনীর উদ্দেশে বলে গেছেন—

"দিনকো মোহিনী, রাতকো বাঘিনী
পলকে পলকে লহু চোষে।
দুনিয়া সব্ বাউরা হোকে
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে॥"

তারপর—সাধক রামকৃষ্ণ পরমহংস কথায় কথায় "কামিনী কাঞ্চন" পরিত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন, নব্য শিষ্য বিবেকানন্দের উপদেশেও ঐ কথার অভাব নাই, আবার পঞ্জিকাকারগণ তিথি বিশেষে মৎস্য, মাংস ভক্ষণ নিষেধের সঙ্গে স্ত্রী নিষেধও লিখিয়াছেন। নারী জাতিকে এত হীন, ঘৃণার চক্ষে দেখিলে, ধর্ম্ম সাধনের প্রধান অন্তরায় জ্ঞান করিলে, তিথি বিশেষের সহিত নিষেধ বিধির সম্বন্ধ যুক্ত করিলে বাস্তবিকই পুরুষের প্রতি নারী হৃদয়ে রাগ, অভিমান, বিতৃষ্ণা, ঘৃণা উদিত হইতে পারে, পুরুষ জাতিকে ঘোর পাষণ্ড, অকাল কুষ্মাণ্ড, অপদার্থ বলিতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু একটু স্থির ভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক। রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, তুলসীদাস, কবীর প্রভৃতি পরম সাধু সাধক ছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্ত্রীজাতিকে ধর্ম্মসাধন কার্য্যের প্রধান অন্তরায় জ্ঞান করিয়াছেন। অকারণ বিদ্বেষে স্ত্রীজাতির উপর অতবড় একটা দোষারোপ করা সাধুচরিত্রে সম্ভব নহে, তবে কি বিশেষ কারণে এরূপ কলঙ্কারোপ হইল? আমার এইরূপ অনুমান হয়, ঐ সকল সাধক যেরূপ নিয়মে ঈশ্বরের আরাধনা, তাঁহার ধ্যান ধারণার প্রয়াসী, তাহাতে একেবারে সংসারকে ভুলিতে হইবে, মায়া মোহ ত্যাগ করিতে হইবে, একনিষ্ঠভাবে ভগবানকে চিন্তা করিতে হইবে—সুতরাং কঠোর সংযম, একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা নিতান্ত আবশ্যক। সেইরূপ সাধনা করিতে যাইয়া সাধকগণ দেখেন স্ত্রীর মুখ, মায়া, মমতা কিছুতেই ভোলা বা ত্যাগ করা যায় না, চক্ষু বুজিলে ভগবানের রূপ মনে না আসিয়া স্ত্রীর মুখ মনে পড়ে, চিরকুমার হইলেও অব্যাহতি নাই, চক্ষু বুজিলে পূর্ব্বদৃষ্ট কোন সুন্দরী যুবতীর মুখ হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে। সিন্ধুবাদ বণিকের স্কন্ধস্থিত বৃদ্ধের ন্যায় সহস্র চেষ্টাতেও ঐ আপদ ছাড়ান যায় না—সুতরাং সংযম হয় না, ভগবানের ধ্যান ধারণা হয় না। তাই প্রিয় শিষ্য সেবকদিগকে ঐ রূপ ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় স্ত্রীজাতির সংস্রব ত্যাগ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। শিষ্যের মনে যাহাতে স্ত্রীজাতির উপর বিজাতীয় ঘৃণার উদয় হয়, তাহাদিগকে বিষ বোধ হয়, সেইরূপে উপদেশ দান করা হইয়াছে। বিদ্বেষ বুদ্ধিতে স্ত্রীজাতির অবমাননা করার উদ্দেশ্যে সাধকদিগের মুখ হইতে ওরূপ অশ্লীল কথা বাহির হয় নাই। উদ্দেশ্য বুঝিবার ভ্রমে রাগান্ধ হইয়া লোকমান্য সাধকদিগের মাতা, ভগিনী, কন্যারা পিশাচী, স্বৈরিণী এরূপ অকথ্য ভাষার ব্যবহার সুরুচিসঙ্গত নহে, অত্যন্ত আপত্তিজনক।

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলিতেছেন, নারীত্বের মহিমা এমনি ঠুনকো জিনিষ যে উহার জন্য বাল্যে যৌবনে বার্দ্ধক্যে সকল কালেই নারীকে পুরুষাশ্রয়ে থাকিতে হইবে, কদাচ স্বাতন্ত্র্য পাইবে না।—হিন্দুর চক্ষে নারীত্ব বা সতীত্ব ঠুনকো জিনিষ নহে, মহামূল্যবান জিনিষ। হিন্দুর চক্ষে উহার মহিমা, উহার পবিত্রতা এতদূর বিশুদ্ধ যে, অন্যের বক্র দৃষ্টিতে, নিশ্বাসে উহা বিকৃত মলিন হয়। সেই জন্য সতীত্ব সম্বন্ধে হিন্দু পুরুষ অতি সাবধানী। শ্লোক-কর্ত্তার রুচি অনুসারে, তাঁহার ভূয়োদর্শনে যাহা শ্রেয় মনে হইয়াছে, তাহাই শ্লোকে রচিয়াছেন, তাহাতে অভিমানের কারণ নাই। হিন্দুরমণীর স্বাতন্ত্র্য নাই সেই অভিমানে "নারীত্ব ধর্ম্ম রক্ষণীয় নহে" "এমন ঠুনকো ধর্ম্ম নাই থাকলো" ইত্যাদি অবজ্ঞাসূচক ভাষা হিন্দুমহিলার মুখে!

বহু পুরাতন সভ্য হিন্দু পুরুষ, সহবাসিনী চিরসঙ্গিনী রমণীর সতীত্ব ধর্ম্মকে প্রাণাদপি ভালবাসে, স্বর্গাদপি

গরীয়সী মনে করে, সেই জন্যই চিতোরে লোমহর্ষণ বিশ্ব বিশ্রুত জহর ব্রতের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বৈধব্যের ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান, তদভাবে সহমরণ প্রথা ঐ হেতুই হিন্দু সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। নিয়মের উপর নিয়ম, বিধির উপর ব্যবস্থা, শোকের উপর শ্লোক রচিত হইয়াছিল। সতীত্বধর্ম্মের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য মহানরক ভোগের ভয় দেখান হইয়াছিল। এত শাস্ত্র শাসনের বাঁধনে, সহমরণের ব্যবস্থায় এই বুঝা যায় পুরাকালের হিন্দুশাস্ত্র কর্ত্তারা স্ত্রীজাতির সতীত্বধর্ম্মকে হিন্দুসমাজের কল্যাণ কামনায় যেরূপ হিতকর ও অবশ্য পালনীয় জ্ঞান করিতেন, স্ত্রী জাতির চরিত্রের দৃঢ়তায় বিশ্বস্ততায় তদ্রূপ সন্দিহান ছিলেন। এক্ষণে যদি পাশ্চত্য শিক্ষাদীক্ষার গুণে নারীগণ চরিত্রের দৃঢ়তা, বিশ্বস্ততা, আত্মনির্ভরতা, আত্মরক্ষার ক্ষমতা তাঁহাদের জন্মিয়াছে দেখাইতে পারেন, তবে পুরুষের নিকট অবশ্যই নিজ প্রাপ্য স্বাতন্ত্র্য স্বাধীনতা আদায় করিয়া লইবেন। কিন্তু সামান্য স্বাধীনতার লোভে যদি হিন্দুর মহারত্ন অঞ্চলচ্যুত হয়, তবে বড়ই মনস্তাপের বিষয় হইবে। সে স্বাধীনতা-লাভ সোণা ফেলে আঁচলে গেরো হইয়া দাঁড়াইবে।

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যেমন তাঁহার প্রবন্ধে বারংবার নারী জাতিকে মাতৃ ভগিনী স্ত্রী কন্যার জাতি বলিয়া অভিমান করিয়াছেন, তেমনি তাঁহার ভাবা উচিত ছিল, তিনি যে পুরুষ জাতিকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন তাহারাও পিতৃ ভ্রাতৃ স্বামী পুত্রের জাতি। তাহা মনে করিলে ওরূপ প্রগল্‌ভভাবে অত গালি পাড়িতে অবশ্যই কুণ্ঠা বোধ করিতেন। হিন্দুপুরুষ নারীর সতীত্ব ধর্ম্মকে সুরক্ষিত করিতে যেরূপ প্রয়াস পাইয়াছেন, অন্য কোন জাতি সেরূপ প্রয়াস পান নাই। যে সমাজে সতীত্বের অত বড়াই নাই, অত মূল্য নাই, অত আদর নাই, সেখানে স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারিতায় সেরূপ বাধা নাই। ঐ সকল সমাজের স্ত্রী পুরুষের মন বাল্যকাল হইতে ঐ ভাবে গঠিত হইয়াছে। সমাজিক নিয়মও ঐরূপ আচার ব্যবহার অনুমোদন করিয়া থাকে; বহুকাল হইতে ঐরূপ প্রথা প্রচলিত আছে।

আমাদের হিন্দু সমাজে ঐ বিদেশীয় প্রথার বিপরীত ভাবই বহু পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে—এখন হঠাৎ তাহার পরিবর্ত্তন সহজ নহে। সেই অভিনব পরিবর্ত্তন সমাজের কল্যাণদায়ক হইবে কি না, তাহা বিবেচনা করা উচিত। যাহা সাহেবী, যাহা পাশ্চাত্য, তাহাই মঙ্গলদায়ক, বিশুদ্ধ, অবশ্যপ্রতিপাল্য—এরূপ সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য নহে। ইহাই স্লেভ মেণ্টালিটি। পুরাকালের যে সকল সাধু পণ্ডিত মহর্ষি কর্ত্তৃক সামাজিক শাস্ত্রবিধি রচিত হইয়াছে, তাঁহারাও কোন অংশে অবজ্ঞেয় নহেন। তাঁহারা স্ত্রী পুরুষের চরিত্রের বিচার বিশ্লেষণ না করিয়াই যে একটা নারী দমনকারী-শাস্ত্ররূপ অস্ত্র দ্বারা উহাদিগকে আবহমানকাল নির্য্যাতন করিতেছেন এরূপ বোধ হয় না। নারীজাতি মাতৃজাতি—ভক্তি, স্নেহ, ভালবাসার জাতি, তাহাও তাঁহারা জানিতেন। নারীদের পূজা করিলে দেবতা সন্তুষ্ট হন, কন্যাগণও পুত্রের ন্যায় যত্নে পালনীয়া, তদ্রূপ যত্নে শিক্ষণীয়া—ইহাও মহামুনি মনুর বচন। আবার তাঁহারাই বলিয়াছেন. স্ত্রীজাতি বাল্যে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে পিতা, স্বামী পুত্রের আশ্রয়ে বাস করিবে অর্থাৎ পুরুষ স্ত্রীর মধ্যে আশ্রয় আশ্রিতার ভাব বরাবর বজায় থাকিবে। উভয় জাতির আকৃতি প্রকৃতি ভাবগতি বুঝিয়া স্বাভাবিক ব্যবস্থাই করিয়াছেন। ঐরূপ ব্যবস্থা শিক্ষা দীক্ষার ফলে সমাজে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি আদর্শ নারী জন্মিয়াছিলেন, আদ্যাপি হিন্দু মহিলা স্বামীপদ পূজা করিতেছেন, স্বামী পুত্রের মঙ্গল কামনায় কত ব্রত উপবাস করিতেছেন;—এক্ষণে পাশ্চাত্য শিক্ষার মাদকতায় নারীদিগের ঐরূপ পরার্থপর আচরণকে যদি "দাসীত্ব" বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে নাচার।

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী "নারীর কথা" লিখিতে লিখিতে পুরুষের নিন্দাবাদ লিখিয়াছেন—"আবার লক্ষ্য করে দেখলে বুঝা যাবে কিরকম নীচ কদর্য্য অর্থসূচক নাম আছে নারীদের।" কামিনী, রমণী, মোহিনী প্রভৃতি কদর্য্য অর্থসূচক নাম পুরুষেরা কেন রাখিল বোধ হয় এই অভিযোগ। অতএব যখন হিন্দু পুরুষেরা এবম্বিধ নীচমনা,

তখন "ভগবান এই নিষ্ঠুর হতভাগ্য দেশ থেকে নারীত্ব বিলুপ্ত করে দাও।" এরূপ চুলচেরা তর্ক ধরিয়া ঝগড়া বাধাইতে, কাঁদিয়া মাটী ভিজাইতে, বাঙ্গালী মেয়েই পারে।

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী সুদীর্ঘ সমাসযুক্ত বাক্যে বঙ্গনারীর যেরূপ দুর্দ্দশা বর্ণনা করিয়াছেন, বাস্তবিক বর্ত্তমানে তাহাদের অবস্থা কি ততদুর শোচনীয়? "ব্যথা-ভয়-আনন্দ-শোক-দুঃখ-সুখ-বিজড়িত রক্তমাংসময় দেহ-বিশিষ্ট ভগবানের দৃষ্টি (মানুষের নয়) এই হতভাগিনী নারীদের।" অন্যস্থানে—"আমার মাঝে মাঝে ভয় হয় মনে হয় হয়ত বা এই অধম হতভাগিনীরা ভগবানের সৃষ্টি নয়, এদের মানুষই গড়েছে; তাদের দুষ্প্রবৃত্তি, পৈশাচিক লিপ্‌সা, নিষ্ঠুর পীড়নের উপকরণ স্বরূপ করে।" এইরূপ কটূক্তিতে প্রবন্ধটি পরিপূর্ণ। প্রবন্ধাকারে পুরুষ জাতিকে অতদূর অসাধু ধিক্কারজনক ভাষায় গালি পাড়িতে আমার এই বৃদ্ধ বয়সে আর দ্বিতীয় দেখি নাই বা শুনি নাই। সেকালে নারী জাতির অবস্থা যাহাই থাকুক, একালে ইংরাজের আমলে পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে তাঁহাদের উন্নতি যে চরমে উঠিয়াছে, তাহার নমুনা এই প্রবন্ধেই প্রকাশ পাইতেছে! দেখা যাইতেছে শিক্ষার ফল যথেষ্ট হইয়াছে!

শ্রীচণ্ডিচরণ চট্টোপাধ্যায়।

পুলিসের গল্প

শিবসাগর ও জোড়হাট।

আমি "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে জনৈক বন্ধুর কথা যাহা লিখিয়াছিলাম, বন্ধু তাহা পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন যে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াই তাঁহার "শ্রাদ্ধ"টা করা আমার পক্ষে উচিত ছিল। কিন্তু সে জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে থাকিতে সেই অপ্রীতিকর ঘটনাটা যদি আমার উপরেই প্রথমে পতিত হয়? সুতরাং শ্রাদ্ধকার্য্যটা সারিয়া রাখাই সঙ্গত বোধ করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে বাল্যকালে পঠিত একটা গল্প মনে পড়িল। এক ফকীর এক ধনী কৃপণের কাছে গিয়া ভিক্ষা চাহিল। ধনী বলিলেন, তিনি কিছুই দিবেন না। ফকীর জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা আমি যদি এখনই তোমার দ্বারদেশে দেহত্যাগ করি তাহা হইলে তুমি কি কর?" ধনী বলিলেন, "তাহা হইলে আমি তোমার দেহে আতর মাখাইয়া রেশমী বস্ত্র পরাইয়া মূল্যবান কাষ্ঠ প্রস্তুত কাফুনে (অর্থাৎ শবাধারে) রাখিয়া কবর দেওয়াই।" ফকীর বলিল, "ভাই, আমি মরিয়া গেলে যত খরচ করিবে, তাহার সামান্য কিয়দংশ খরচ করিয়া আমাকে কিছু খাইতে দিয়া আমার প্রাণটা বাঁচাও না কেন?"

ফকীরের এই প্রশ্নটা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। বঙ্গদেশে মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করার জন্য কত কাণ্ড হইয়া থাকে। তাঁহারা সকলেই জীবিত থাকিতে সেই শ্রদ্ধার কিছু অংশ তাঁহাদিগকে দিলে ক্ষতি কি? যাহা হউক, এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ কয়েকটী মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধেই দুই চারি কথা বলিব।

আমি শিবসাগরে সাত আট দিন মাত্র ছিলাম। সে স্থান হইতে জোড়হাটে বদলি হইয়া সেখানে প্রায় ছয় মাস থাকি। এই ছয় মাসের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তদন্ত করিয়াছিলাম বলিয়া আমার মনে পড়িতেছে না। একজন ভদ্রলোকের একটা হাতী চুরী হইয়াছিল। আমিই তদন্ত করিয়া চোর ধরিয়াছিলাম। চোরেরা হাতীটা জঙ্গলে ধরিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ করিবার

অভিপ্রায়ে হাতীটার সর্ব্ব শরীর অতি নিষ্ঠুর ভাবে অস্ত্রাঘাত করিয়া ক্ষত বিক্ষত করিয়াছিল। আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমার সময়ে ঘটিয়াছিল। একজন সব্‌ইন্‌স্পেক্টের একটা চোর ধরিয়া রাত্রিকালে মফঃসলে এক গৃহস্থের বাড়ীর এক ঘরে শয়ন করিয়া ছিলেন। চোর অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া একখানা কাঠ দিয়া নিদ্রিত সব্‌-ইন্‌স্পেক্টরের মাথা ফাটাইয়া দিয়া হত্যা করে।

শিবসাগর শেষ আহোম রাজাদিগের রাজধানী ছিল। তাঁহাদের রাজধানীর নাম ছিল রঙ্গপুর। তাহা শিবসাগর হইতে কিছু দূরে অবস্থিত ছিল। এখনও নগাঁও ডিব্রুগড় প্রভৃতি স্থানের লোকে শিবসাগরকে রঙ্গপুর বলিয়া থাকে। আহোম রাজাদিগের অনেক কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ এখনও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের কীর্ত্তির মধ্যে কয়েকটা পুষ্করিণী বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এইগুলি ছোট হ্রদ স্বরূপ। শিবসাগরের পুষ্করিণীর জলখাতই শুনিয়াছি আয়তনে ৮০০ বিঘা। জয়সাগর ও গৌরীসাগর শুনিয়াছি শিবসাগর পুষ্করিণী অপেক্ষাও বড়; কিন্তু আমি এই দুইটী দেখি নাই। এই সকল পুষ্করিণী বেষ্টন করিয়া গোলাকার এক একটী খাত খনন করা হইয়াছে। এই সকল খাতকে 'যমুনা' বলে।

যমুনাগুলি থাকাতে নাকি পুষ্করিণীর জলের উপরিভাগ যমুনার জলের উপরিভাগ হইতে উচ্চে থাকে। এই কথাটা বিজ্ঞানসম্মত কি না, অথবা সত্য কি না তাহা জানিতে পারি নাই। যমুনা ও শিবসাগরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কাছারী, পুলিস লাইন, সাহেবদের বাসগৃহ এবং বড় একটা শিব মন্দির অবস্থিত। জোড়হাটেও শিবসাগর অপেক্ষা ছোট একটা পুষ্করিণী আছে এবং তাহারও চতুর্দ্দিকে একটা যমুনার বেষ্টন আছে। পুষ্করিণীর জলের উপরিভাগ পার্শ্ববর্ত্তী নগরের স্থলভাগ হইতে উচ্চ, এজন্য আমি যখন জোড়হাটে ছিলাম তখন পুষ্করিণীতে নল বসাইয়া অতি সহজ উপায়ে নগরবাসীদিগকে জল যোগাইবার কথা চলিতেছিল। তাহার কয়েক বৎসর পরে শিবসাগরকে মহকুমা এবং জোড়হাটকে সদররূপে পরিণত করা হইয়াছে।

শিবসাগরে কয়েক দিন আমি তথাকার সিবিল-সার্জ্জন ৺অতুলচন্দ্র রায় মহাশয়ের অতিথিরূপে কাটাইয়াছিলাম। পূর্ব্বে তিনি যখন তেজপুরের সিবিল সার্জ্জন ছিলেন, তখনই তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। তিনি সুপুরুষ, সুচিকিৎসক, অতিশয় সত্যবাদী, কর্ত্তব্য পরায়ণ, পরোপকারী, সদালাপী, আমোদপ্রিয় লোক ছিলেন। সর্ব্বদা অধ্যয়ন করিতেন বলিয়া চিকিৎসা ভিন্ন অন্য বিষয়েও তাঁহার প্রভূত জ্ঞান ছিল। তাঁহাকে কেহ কখনও ক্রুদ্ধ হইতে দেখে নাই। তিনি কখনও ম্লানমুখ হইতেন না। তাঁহার প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া বোধ হইত যেন তিনি কখন কোনরূপ শোক পান নাই। মাতা পত্নী ও সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য তিনি সর্ব্বদা সমান ভাবে পালন করিতেন। কিন্তু ভগবান্ ইহজীবনে তাঁহাকে সুখী করেন নাই। তাঁহার সন্তান একটী ভিন্ন সকলেই অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। মৃতাবশিষ্ট একটী মাত্র কন্যাও বিবাহের অল্পদিন পরে অল্প বয়সে বিধবা হইল। তাহাকে তিনি পুনর্ব্বার বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই বিবাহে একটী পুত্র হইয়াছিল সেও দুই এক বৎসর বয়সেই প্রাণত্যাগ করিল। তাহার পর তিনি অন্ধ হইলেন। অস্ত্র-চিকিৎসা করিয়া পুনরায় যখন তিনি দৃষ্টিলাভ করিলেন তখন মনে হইল বুঝি তাঁহার শেষ জীবনে আর কোন কষ্ট পাইবেন না। কিন্তু এক বৎসর হইল একদিন তাঁহার বাড়ীর কাছে একখানা গাড়ী চাপা পড়ায় তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার জীবন পর্য্যালোচনা করিলে কবি শিবনাথ শাস্ত্রীর একটা পংক্তি মনে হয়—

"কারে কি যে কর, জানহে ঈশ্বর, দেখে শুনে কবি হত-বুদ্ধি প্রায়।"

আর একজন পুণ্যবান ও প্রাতঃস্মরণীয় লোকের সহিত আমার শিবসাগরেই আলাপ ও বন্ধুতা হইয়াছিল। তাঁহার নাম অক্ষয়কুমার ঘোষ। তিনি গবর্ণমেণ্ট প্লীডার ছিলেন। উপর আসামের তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল ছিলেন। প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিতেন এবং তাহা প্রায় সমস্তই পরোপকারে ব্যয় করিতেন। যাহারা দান বা ভিক্ষা চাহিতে লজ্জাবোধ করে, তাহারা ধার বলিয়া টাকা চাহিত,

অক্ষয়বাবুও একখানা হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া লইয়া তাহাদিকে টাকা দিতেন। এই সকল টাকা তাহারা কখনই শোধ করিত না এবং অক্ষয় বাবু কখনই তাহাদের নামে নালিশ করিতেন না। এইরূপ অপ্রত্যার্পিত টাকার পরিমাণ প্রায় বিশ হাজার ছিল। এই সমস্ত টাকার তামাদী হ্যাণ্ডনোট অক্ষয় বাবু একদিন অতুল বাবুকে দেখাইয়াছিলেন। আমি অতুল বাবুর মুখে একথা শুনিয়াছি। আইনের জ্ঞান ভিন্ন অক্ষয় বাবু চিকিৎসা বিদ্যাও জানিতেন এবং প্রত্যহ ঔষধ বিতরণ করিতেন। সূপকারের কার্য্যেও তিনি বিশেষ পটু ছিলেন এবং বন্ধুবান্ধবকে স্বহস্তে পাক করিয়া খাওয়াইতেন। তিন চারি বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

আমার সময়ে শিব সাগরের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট টনেয়ার সাহেব। তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই, কিন্তু তাঁহার গুণগ্রামের কথা এবং উৎকেন্দ্রতার কথা আমি অনেক শুনিয়াছি। তাঁহার শরীরে এত বল ছিল যে, তিন ইঞ্চ পরিধির লৌহদণ্ড দুই হাত দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন; এক জন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে একখানা চেয়ারে বসাইয়া চেয়ারের পায়ার নিম্নতম স্থান ধরিয়া তুলিতে পারিতেন। লক্ষ্যভেদ করিবার ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ ছিল। দূরে একটা লক্ষ্য দেখিয়া সেই দিকে পৃষ্ঠ দিয়া গুলি করিতেন, গুলি ব্যর্থ হইত না। তাঁহার পানাহারের কথা মহাভারতোক্ত বৃকোদরের ভোজন ব্যাপার স্মরণ করাইয়া দিত। কেবল স্ত্রীলোকের জবানবন্দী করিবার সময়ে তাহাকে তাঁহার পশ্চাদ্দিকে দাঁড় করাইয়া তাহার উক্তি লিখিয়া লইতেন—তাহার দিকে। তাকাইতেন না। বহু দরিদ্রকে অর্থ সাহায্য করিতেন কয়েক বৎসর হইল অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

আমি যখন জোড়হাটে ছিলাম, তখন এলেন সাহেব সেখানকার সব ডিবিজনাল অফিসর ছিলেন। তাঁহাকেই গোয়ালন্দে কয়েক বৎসর পরে কে গুলি করিয়াছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞান কতদূর উন্নত হইয়াছে তাহা তাঁহার চিকিৎসাকালে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু যে তাঁহাকে গুলি করিয়াছিল সে ধরা পড়িল না। একজন উচ্চ পদস্থ পুলিস কর্ম্মচারী ঘটনার প্রায় এক বৎসর পরে আমাকে বলিলেন যে, তিনি জানেন কে এলেন সাহেবকে গুলি করিয়াছে। আমি বলিলাম, "তবে তাহাকে ধরেন না কেন? যে আততায়ীকে ধরিয়া দিবে সে গবর্ণমেণ্ট হইতে দশ হাজার টাকা পুরস্কার পাইবে ইহা ত আপনি অবগতই আছেন।"

তিনি বলিলেন, "তাহাতে বাধা আছে।" কি যে বাধা তাহাও আমাকে বলিলেন।

আমি বলিলাম, "আপনি যাহা জানেন তাহা আমাকে বলুন। আমি তাহা হইলে আপনার নাম গোপন করিয়া মকদ্দমাটা তুলিয়া দিব।"

তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। কথাটা পরিহাস না বাস্তবিক বুঝিতে পারিলাম না। তখন এলেন সাহেব শিলংএ ছিলেন। শিলংএর ডেপুটী কমিশনর হাউএল সাহেবের সহিত আমার পত্রব্যবহার চলিত। আমি যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা তাঁহাকে লিখিলাম এবং এলেন সাহেবকেও সে কথা জানাইতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু আমার পত্রের সেই অংশের কোন উত্তর পাইলাম না।

আমি জোড়হাটে থাকিতে চীফ কমিশনর কটন সাহেব সেখানে পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। অতি ক্ষুদ্র বিষয়েও তাঁহার কিরূপ অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল, তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সময়ে তাহার একটা দৃষ্টান্তও দেখিলাম। ভূমিকম্প হওয়ার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি ডিব্রুগড়ে এবং নগাঁয়ে ছোট ছোট যে কয়েকটা ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম, তদ্বিষয়ে ইংলিশম্যান সংবাদপত্রে ক্ষুদ্র একখানা পত্র লিখিয়াছিলাম। জোড়হাটে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র আমার নামটা শুনিয়াই কটন সাহেব সেই পত্রের কথা বলিলেন। ইহার পর তাঁহার লিখিত ভূমিকম্পের রিপোর্টেও তিনি সেই পত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

আমার সময়ে জোড়হাটের একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনর ছিলেন খাঁ বাহাদুর মৌলবী মহীবুদ্দীন সাহেব।

তাঁহার বাড়ী নগাঁয়ে। সেখানেই তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। তিনি তখন উকীল ছিলেন। তিনি বেশ মিশুক, আমোদপ্রিয় ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তাঁহার ইংরেজী লেখা ইংরেজেরাও প্রশংসা করিতেন। তিনি আসামের জজ হইয়াছিলেন। এখন বোধ হয় তদপেক্ষাও উচ্চপদে আছেন।

কিন্তু জোড়হাটের, এমন কি তাৎকালিক আসামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কথা এখনও বলা হয় নাই—যদিও তাঁহার কথাই সর্ব্বপ্রথমে বলা উচিত ছিল। তিনি ৺জগন্নাথ বরুয়া। আসামীরা তাঁহাকে বি-এ জগন্নাথ বলিত। তিনি বিলাতে গিয়াছিলেন। তিনি বড় মিষ্টভাষী ও সদালাপী ছিলেন। তিনি উত্তম বাঙ্গলা ও সংস্কৃত জানিতেন এবং বিজ্ঞান, সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি গবর্ণমেণ্টের কোন কায করিতেন না, কিন্তু স্বাধীন থাকিয়া দেশের সর্ব্বপ্রকার হিতকর কার্য্যে যোগদান করিতেন। তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার বরুয়াও সকল বিষয়ে তাঁহার সহিত যোগ দিতেন। আসামের অনেকে নিজের আভিজাত্যের ভান করিবার জন্য মেকী বরুয়া সাজিয়া থাকেন। কিন্তু জগন্নাথ বাবুরা প্রকৃত বরুয়া! বরুয়া শব্দের অর্থ সম্ভ্রান্ত। আসামীরা ঠিক "বরুয়া" উচ্চারণ করেন। যাঁহারা শুদ্ধরূপে লেখেন তাহারা "বরুআ"ই লেখেন। বাঙ্গালীরা বলেন "বড়ূআ" কিন্তু লেখেন "বড়ূয়া"। আসামীরা ড়কে র রূপে উচ্চারণ করেন। আসামী ভাষায় ড় নাই। বাঙ্গালীরা য়া কে কখন কখন "ইআ" রূপে শুদ্ধ উচ্চারণ করেন যথা—অনসূয়া, ভূঁয়া, কিন্তু কখন কখনও "আ" রূপে অশুদ্ধ উচ্চারণ করেন যেমন কাকাতুয়া, বড়ূয়া। এই শব্দগুলিকে কাকাতুআ, বড়ূআ লিখিতে দোষ কি?

ব্রহ্মপুত্রের একটা বড় দ্বীপের নাম মাজুলী। এখানে বিখ্যাত আউনি আটার গোস্বামী থাকেন। এই স্থানটা আসামীদের মহাতীর্থ। আমি যখন সেখানে গিয়াছিলাম, তখন ৺দত্তদেব গোস্বামী জীবিত ছিলেন। তিনি একজন প্রকৃত সাধুপুরুষ ছিলেন। আসামীদের বিশ্বাস যে তিনি যাহাকে যাহা বলিবেন তাহা ফলিবেই ফলিবে। তাঁহার কাছে গেলে বোধ হইল যেন একটা পবিত্রতার গণ্ডীর মধ্যে উপনীত হইলাম। আসামীরা তাঁহাকে এতই ভক্তি করিতেন যে, তাঁহারা তাঁহার সমক্ষে কোনরূপ আসনে না বসিয়া মাটীতে বসিতেন। পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোক গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেও তাঁহাকে বসিবার আসন দেওয়া হইত না। গোস্বামী ইহা অবগত হইয়া সেই বর্ব্বরোচিত প্রথা বন্ধ করিয়াছিলেন। আমি আসন পাইয়াছিলাম। গোস্বামী অতি সমাদরে আমার সহিত আলাপ করিলেন। আমি একদিন তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি যখন পঁহুছিলাম তখন দেখিলাম ভাগবতের একটা শ্লোক লইয়া বিচার হইতেছে। শ্লোকটীর অর্থ এই যে, কৃষ্ণ গো ও মহিষ চরাইতেছিলেন। গোস্বামী মহাশয় বলিলেন যে কৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর ছিলেন, সুতরাং তিনি গরু চরাইতে পারেন, কিন্তু তিনি যে মহিষও চরাইয়াছিলেন এটা অশ্রদ্ধেয় কথা, নিশ্চয়ই মহিষ শব্দের অন্য কোন গূঢ় অর্থ আছে। এই জটিল সমস্যাটার সমাধান সভাস্থ কেহই করিতে না পারায় সকলেই বিমর্ষ হইলেন। আমি তখন তাঁহাদিগকে একটা গল্প বলিলাম। শুক্লাম্বর ধরং দেবং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্। প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥ একজন পণ্ডিত বলিলেন যে শ্লোকটা বিষ্ণুর ধ্যান নহে—উহা বিড়ালের ধ্যান। যে হেতু শুক্লা অর্থাৎ গৌরী অম্বা যাঁহার তিনি শুক্লাম্ব অর্থাৎ গণেশ। শুক্লাম্বং রাতি বহতি ইতি শুক্লাম্বরঃ অর্থাৎ মূষিকঃ। শুক্লাম্বরস্য ধরঃ অর্থাৎ মূষিক যে ধরে সে শুক্লাম্বরধরঃ অর্থাৎ বিড়ালঃ। দেবং শব্দের অর্থ দীপ্তি বিশিষ্ট, যে হেতু দিব্ দীপ্তৌ। শশিবর্ণ শব্দের অর্থ সাদা। বিড়ালের চারি পাকেই এখানে চতুর্ভুজ বলা হইয়াছে। এবং মূষিক ধরিয়া বিড়াল যে প্রসন্নমুখ হইবে তাহা সকলেই বুঝিতে পারে। আমি এই গল্পটা শেষ করিয়া বলিলাম, এই ব্যাখ্যা-কারকের মত কোন পণ্ডিত যদি সভায় থাকেন, তাহা হইলেই মহিষ শব্দের গূঢ়ার্থ উদ্ধার করা সম্ভব। নতুবা তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। সভার সকলেই উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন; কিন্তু অশীতি পুর

গোস্বামী একটু স্মিতমুখ মাত্র হইলেন। একবার কটন সাহেব গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া বাঙ্গালীর মত তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিলেন। আসামে তাঁহার যত শিষ্য, তত শিষ্য অন্য কোন গোস্বামীরই নাই। শুনিয়াছি তিনি প্রত্যহ শিষ্যদিগের নিকট হইতে ন্যূনাধিক এক সহস্র মুদ্রা প্রণামী পান। সেই আশ্রমে চারি পাঁচ শত ব্রহ্মচারী থাকেন। আশ্রম মধ্যে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকেরা কেবল পূর্ব্বাহ্ন ৭টা বা ৮টা হইতে অপরাহ্ণ ৪টা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে গোস্বামীকে প্রণাম করিবার জন্য আশ্রমে যাইতে পারেন। স্ত্রীজাতীয় অন্য জীবকেও আশ্রমে যাইতে দেওয়া হয় না।

আমি জোড়হাটের মফঃসলে যখন ছিলাম, তখন একদিন সূর্য্য গ্রহণ হইয়াছিল। তখন বেলা দুই তিনটা। প্রায় সর্ব্বগ্রাস গ্রহণ হইল এবং হঠাৎ অন্ধকার হইয়া গেল। পালিত পশুগণ আবাসস্থানের দিকে দৌড়াইতে লাগিল। পক্ষিগণ কলরব করিতে করিতে নীড় আশ্রয় করিল। যে সকল নাগা, মিরি, মিকির প্রভৃতি পার্ব্বত্য লোক রবর, কচু এবং অন্যান্য বস্তু বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল, তাহারা দলে দলে ভীতিবিহ্বল হইয়া থানায় আসিতে লাগিল। তাহাদের উৎকণ্ঠা দেখিয়া বড় আমোদ বোধ হইয়াছিল।

আমি জোড়হাট হইতে ডিব্রুগড়ে বদলির আদেশ পাইয়া সেখানে গেলাম। আট বৎসর পূর্ব্বেও আমি ডিব্রুগড়ে ছিলাম। প্রথমে আমি সেই প্রথম বারের কথাই বলিব। আমি এই গল্পগুলি প্রথম হইতে না লিখিয়া মধ্য হইতে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। মহাকাব্য এইরূপেই লিখিত হয় বলিয়া আরিষ্টটল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই নির্দ্দেশ অনুসারে সৃষ্টি হইতে আরম্ভ না করিয়া মিল্‌টন মনুষ্যের আদেশ লঙ্ঘন হইতে তাঁহার **Paradise Lost** আরম্ভ করিয়াছেন এবং হোমর অখিলুর ক্রোধ (**Achilles' wrath**) হইতে ইলিয়াদ আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের দেশের গল্প স্বাভাবিক ক্রমেই লিখিত হইয়াছে। কিন্তু অরিস্তটলের নির্দ্দেশিত প্রণালী যে অধিকতর চিত্তাকর্ষক তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি সেই জন্যই মহাকাব্য না হইলেও, এই গল্পগুলি লিখিতে সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছি!

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ

গ্যালিলিও একটি নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, যাহা তাৎকালীন মানবের বদ্ধমূল বিশ্বাস ও সংস্কারের বিরোধী; সুতরাং লোক সব ক্ষেপিয়া উঠিল—দেশের রাজা উক্ত আবিষ্কারককে কেবল বাতুল কিংবা নাস্তিক বলিয়াই ছাড়িয়া দিলেন না—তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া, তাঁহার গবেষণার সমুচিত শাস্তিবিধান করিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক তাদৃশ ক্ষিপ্ত জনসমূহের অপেক্ষা যে কম উৎক্ষিপ্ত হইয়াছেন তাহা নহে, তবে সৌভাগ্যের বিষয় এদেশে তেমন রাজা না থাকায় রবীন্দ্রনাথের কাব্য রচনারূপ গুরুতর অপরাধের বিচার রাজদ্বারে হয় নাই; হইলে এই উত্তেজিত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ জনসমূহ রবীন্দ্রনাথকে ফাঁসি না দেওয়াইয়া কিছুতেই ছাড়িতেন না। কাযেই রাজদ্বারে যখন এই অপরাধের কোনও প্রতিকারের উপায় নাই, তখন এ দেশের কাব্য সমালোচকগণ মিলিয়া এই অপরাধের শাস্তিপ্রদানভার আপনাদের মধ্যেই গ্রহণ করিলেন। ফলে, রবীন্দ্রনাথকে নিন্দা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ উপহাস কুৎসা কটুকাটব্য গালিগালাজ করিতে দেশে অপরিমিত মূলধনে একটি স্বদেশী যৌথ কারবার স্থাপিত হইয়াছে। এ ব্যবসাটির এখন খুব চলতি অবস্থা,

কারণ বিনা মূলধনে শূন্য বখরায় পূরা মুনাফার লোভে অংশীদারের কখন অভাব হয় না।

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ দুইটি। প্রথমতঃ তাঁহার কাব্যের অর্থ অস্পষ্ট এবং দুর্ব্বোধ্য; কারণ, তাঁহার ভাব সমস্ত বিদেশীয়। সুতরাং রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রাণহীন, নিস্তেজ, বস্তুতন্ত্রহীন প্রভৃতি কত কি।

দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার ছন্দ দুষ্পাঠ্য। এমন কি অনেক কবিতা ছন্দ বৈগুণ্যে নাকি অপাঠ্য। এ প্রবন্ধে প্রথম অভিযোগ সম্বন্ধে কোনো কথাই আমি বলিব না; জীব-বিশেষে মুক্তা কি পদার্থ তাহা না জানিয়া, কোনো সুখাদ্য-বিশেষ ভাবিয়া তাহাতে যে দংষ্ট্রা আরোপ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা মুক্তার আদর কিছুই কমে নাই। মুক্তা উক্ত বীরের দশনমুক্ত হইয়া, আজ পর্য্যন্ত অম্লান অক্ষত উজ্জ্বল হইয়াই আছে এবং থাকিবেও। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সমালোচনা নাম দিয়া অনেক সুযোগ্য ব্যক্তি অনেক কসরৎ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য-রত্নাকর হইতে মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় একটি বা দুইটি প্রবন্ধের জাল ফেলিয়া যিনি নিঃশেষে সমস্ত রত্ন আহরণ করিবার দুশ্চেষ্টা করেন—তাঁহার উক্ত কার্য্য কেবল বাতুলতা নহে, নিছক ধৃষ্টতা! বড়কে জবরদস্তি ছোট করিবার চেষ্টাটিই আমাদের জাতীয় জীবনের একমাত্র বিশেষত্ব।

এখনও রবীন্দ্রনাথের নিত্য নব নবউন্মেষশালিনী প্রতিভা, নব নব অপূর্ব্ব সৃষ্টিতে নিযুক্ত। কাযেই এই বিপুল কাব্যজগতে ধ্যানসমাহিত হইয়া তাহার সমস্ত শিল্পনৈপুণ্য কারুকার্য্য ও সৌন্দর্য্যকে নখদর্পণে দেখিয়া, যিনি নিখিলবিশ্বকে দেখাইবেন, সেই অলৌকিক রসিকের সন্ধানও আজ পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে পাওয়া যায় নাই। সেই জন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পৃথিবীর এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কবি বিশ্বের বরেণ্য রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে আমি কোনও মতামত প্রকাশ করিব না। আর এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও তাহা নহে।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দের কথাই আমার বক্তব্য। রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে আবহমানকাল হইতে মাত্র কয়েকটি পুরাতন ছন্দই চলিয়া আসিতেছিল। রবীন্দ্রনাথের শেষাগ্রজ হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এবং বিহারীলাল প্রভৃতি কবিগণ বহুলভাবে সেই সকল ছন্দই গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। পয়ার, লঘুত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী, চৌপদী ও একাবলী এই কয়েকটিই তাহার মধ্যে প্রধান। মধুসূদন বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দদান করিলেন—তাহাও তাৎকালীন কবিগণ গ্রহণ করিতে ছাড়িলেন না। ভারতচন্দ্র কয়েকটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী কবিগণ সেগুলির বড় আদর করেন নাই। রবীন্দ্রাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ কয়েকটি নূতন ছন্দ বাংলা সাহিত্যকে দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ পরে প্রচলিত সমস্ত ছন্দগুলিকে ছাঁটিয়া কাটিয়া বাড়াইয়া কমাইয়া এক অপরূপ মাধুর্য্যদান তো করিয়াছেনই, পরন্তু অসংখ্য নূতন ছন্দ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এখনও তাঁহার বিশ্বকর্ম্মা প্রতিভা এই সৃষ্টি-কার্য্য বন্ধ করে নাই।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ "সন্ধ্যাসঙ্গীত"। এই কাব্য হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে আরম্ভ হইতেই কবি প্রচলিত ছন্দের প্রতি তত অনুরাগী ছিলেন না। প্রচলিত ছন্দগুলি যদি তাঁহার প্রাণে ঠিক সুরটি বাজাইতে পারিত, তবে তিনি সেগুলিকে পরিত্যাগ করিতেন না। শিশুর অপটু অস্থির হস্ত কোন জিনিষ ধরিতে চাহিলে একেবারেই যেমন ধরিতে পারে না এদিক ওদিক সরিয়া নড়িয়া যায়—তেমনি কিশোর কবির মন আপনার ভাবগুলিকে ছন্দের আধারে ধরাইতে গিয়া কেবলি নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইয়াছে। অথচ হাতের কাছের চলিত ছন্দগুলি তাহার পছন্দ হইল না। কাযেই অন্ধকার অনির্দ্দেশ্যে কেবলই হাতড়াইয়াছেন। কাহাকে যেন খুঁজিতেছেন—নিজের মনোমত ছন্দের জন্য এমনি একটা আকুলতা তাঁহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাই "সন্ধ্যাসঙ্গীত", "প্রভাতসঙ্গীত" এবং "ছবি ও গান" কাব্যত্রয়ে তিনি বিধিবদ্ধ ছন্দ প্রণালীকে বড় মানিয়া চলেন নাই। কিশোর কবি তখন কাঙাল, পয়সা ছিল না তাই তাঁহার ভাব নদীর ঘাটটি শান

বাঁধাইয়া দিতে পারেন নাই, এখান ওখান হইতে দুই চারি ঝুড়ি মাটি কাটিয়া আনিয়া কোনও মতে একটা তট খাড়া করিয়া দিয়াছিলেন; দর্জ্জিদোকানের ছাঁচতলা হইতে রং-বেরঙের টুকরো ন্যাকড়া আনিয়া তাঁহার ভাব শিশুকে বাউলের মত একটা আলখেল্লা পরাইয়াই মনকে কোনো রকমে প্রবোধ দিয়াছিলেন। পরে তিনি হঠাৎ একদিন গুপ্ত ধনের অধিকারী হইয়া পড়িলেন; অমনি নানাবর্ণের বহুমূল্য পাথর আনিয়া নদীর সেই ঘাটটি বাঁধাইয়া দিলেন—সে শিশুকে রাজাধিরাজের সাজ পরাইয়া জগতে ছাড়িয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথের ছন্দস্রোত সেইদিন হইতে গঙ্গার মত পবিত্র করিতে করিতে, সম্রাটের মত দিগ্বিজয় করিতে করিতে অপরাজিত অদম্য বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

সম্প্রতি "অসম মাত্রিক" ছন্দে রবীন্দ্রনাথ ছন্দের যে রাসনৃত্য দেখাইয়াছেন, তাহার জন্ম আজ হয় নাই; সে বহুদিনের পুরাতন। "সন্ধ্যাসঙ্গীতে"র প্রথম কবিতা "উপহার" তাহার বাল্য মূর্ত্তি। এমন কি "সন্ধ্যাসঙ্গীতে"র কোন কবিতাতেই প্রচলিত ছন্দরীতির কোনো বিধানই মানিয়া চলা হয় নাই। "গান আরম্ভ", "তারকার আত্মহত্যা" প্রভৃতি কবিতা, অসম মাত্রিক ছন্দের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বোধ হয়, স্বর্গীয় কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার নাটকে এক একটি বাক্য বা এক একটি ভাবকে এক নিশ্বাসে বলিবার সৌকর্য্য হেতু এই অসম মাত্রিক ছন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন। গিরিশচন্দ্রের অসমমাত্রা ছন্দ বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী।

প্রভাত সঙ্গীতের আরম্ভও অসমছন্দে। কিন্তু তাহাতে সঙ্গীতের একটা অস্ফুট কলরব শোনা যাইতে লাগিল। ভাবের সঙ্গে ছন্দের যেন দূর হইতে চোখাচোখি হইল। ভাব আপন মনে গুঞ্জরিয়া উঠিল। ক্রমশ আমরা দেখিতে পাইব যে, এই গুঞ্জরণই ছন্দের বাহুবন্ধনে আসিয়া ঢলিয়া পড়িয়া "ছন্দের মাঝে হারা" হইয়া গেল।

পথহারা রবিকর
আলয় না পেয়ে পড়েছে আসিয়া
আমার প্রাণের পর!

* * *

জাগিয়া উঠেছে প্রাণ
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি!
হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়
বাহিরিতে চায় দেখিতে না পায়
কোথায় কারার দ্বার!

কিশোর কবি 'কারার দ্বার' দেখিতে পাইতেছেন না, কিন্তু বাহির হইবার জন্যও আকুল আবেগ! এমন সময় একদিন অকস্মাৎ—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি—

ছন্দকোষের চাবি হঠাৎ কুড়াইয়া পাওয়া গেল। পরিচিত ছন্দগুলির জীর্ণ সংস্কার সাধিত হইল, তাহাদের পরিবারে অনেক নূতন নূতন অতিথি আসিয়া জুটিল।

"অনন্ত জীবন", "অনন্ত মরণ", "মহাস্বপ্ন" প্রভৃতি কবিতায় পয়ার এবং লঘু ও দীর্ঘ ত্রিপদীর চরণ সংযুক্ত করিয়া ছন্দদশভুজার প্রথম কাঠামো তৈরি হইল।

এই "প্রভাত সঙ্গীত" কাব্যেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম চতুর্দ্দশপদী পয়ার পাওয়া যায়। চতুর্দ্দশ অক্ষরের অমিত্রাক্ষর ছন্দও "প্রভাত সঙ্গীতে" প্রথম।

"ছবি ও গান" কাব্যের প্রথম কবিতাতেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম মাত্রিক ছন্দ পাওয়া যায়।

"ভানু সিংহের পদাবলী"তে বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের এবং জয়দেবের সংস্কৃত গীতিকবিতার ব্যবহৃত ছন্দপ্রণালীরই অনুসরণ করা হইয়াছে। সুতরাং সেগুলি এ প্রবন্ধের বক্তব্য নহে। বাংলা ছন্দে নূতন যে স্রোত রবীন্দ্রনাথ বহাইয়া দিয়াছেন সেইগুলিরই কেবল এ প্রবন্ধে একটা শ্রেণী ও সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া আমি ক্ষান্ত হইব, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আরও দুই একটা কথা বলা আবশ্যক। এগুলি এই অপূর্ব্ব ঐন্দ্রজালি-

কের সৃষ্টিকৌশল বুঝিতে হয়ত কতকটা সহায়তা করিতে পারে।

'ছবি ও গানে' প্রথম মাত্রিক ছন্দ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি এই গ্রন্থের "আচ্ছন্ন" কবিতা হইতেই শেষ পর্য্যন্ত গৃহীতছন্দের সমতা রক্ষা করিয়া কবিতা রচনাও পরিদৃষ্ট হয়। এতৎপূর্ব্বে কবির ছন্দসংযম কোথাও দেখা যায় নাই।

সনেট রচনা।

"কড়ি ও কোমলে"ই সর্ব্বপ্রথম "সনেট" পরিদৃষ্ট হয়।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বঙ্গ-সাহিত্য প্রথম **সনেট** রচনা করেন। সনেটকে তিনি **চতুর্দ্দশপদী কবিতা** বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। সনেটের চৌদ্দ ছত্রে সাধারণতঃ চতুর্দ্দশপদী পয়ারই ব্যবহৃত হইত, এবং এখনও হয়; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, সনেটের ছন্দেও বৈচিত্র্য দান করিতে বিরত হন নাই। যথা:—

১। সাধারণ সনেট—

চতুর্দ্দশাক্ষরী পয়ারের সনেট। উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন।

২। দশিকা-সনেট—

সন্ধ্যা যায়, সন্ধ্যা ফিরে যায় শিথিল কবরী পড়ে খুলে
যেতে যেতে কনক আঁচল বেধে যায় বকুল কাননে।
—সন্ধ্যার বিদায়, কড়ি ও কোমল।

৩। ষোড়শী-সনেট—

এ শুধু অলস মায়া, এ শুধু মেঘের খেলা,
এ শুধু মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জ্জন।
—গান রচনা, কড়ি ও কোমল।

৪। অষ্টাদশী-সনেট—

কোথা রাত্রি কোথা দিন কোথা ফুটে চন্দ্র সূর্য্য তারা
কেবা আসে' কেবা যায়', কোথা ব'সে জীবনের মেলা।
—চিরদিন, কড়ি ও কোমল।

অক্ষরের যাদু আবিষ্কার।

১৮৮৭ সালের বৈশাখে রচিত, "ভুল ভাঙা" কবিতায়, শিল্পী যুক্তাক্ষরকে প্রথম দুই অক্ষর রূপেই ব্যবহার করিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই সময়েই তাঁহার সঙ্গীতকলাকুশল-কর্ণে এ যাবৎ প্রচলিত যুক্তাক্ষরকে একাক্ষর গণনা অসহ্য কটু লাগিতেছিল। ললিত গীতিকবিতায় যুক্তাক্ষর একাক্ষর রূপে ব্যবহৃত হইলে যে নিতান্ত বেসুরা ঠেকে, তাহা আমরা এখন রবীন্দ্রনাথের কৃপায় কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। অথচ বাংলা ভাষা হইতে যুক্তাক্ষর বাদ দিলে, তাহার পনের-আনা সৌন্দর্য্যই নষ্ট হইয়া যায়। কবি বিষম সমস্যায় পড়িলেন। এই বৈশাখ মাসেই রচিত "ভুলে" কবিতায়, তিনি সযত্নে যুক্তাক্ষর বর্জ্জন করিয়া,

"মনে পড়ে সেই হৃদয় উছাস"

লিখিয়া, অর্থাৎ যুক্তাক্ষরকে বোধগম্য রূপে সরল করিয়া লইয়া, দেখিলেন যে, ঈদৃশ উপায়ে শব্দের বিকৃতি ঘটাইতে থাকিলে, অদূর কালের মধ্যে বাংলা কবিতার ভাষা এমন জটিল এবং অস্বাভাবিক হইয়া পড়িবে যে তাহা সাধারণের বোধগম্য ত' হইবেই না, বরং পদ্যের ভাষা গদ্যের ভাষা হইতে ক্রমশ দূরে যাইতে যাইতে, কিছু দিনের মধ্যে পদ্যের এবং গদ্যের ভাষা দুইটি বিভিন্ন হইয়া পড়িবে। অথচ যুক্তাক্ষর ছন্দের সহজ নৃত্যলীলাকে পদে পদে আহত করিয়া বেসুরা বেতালা করিয়া দিতেছে।

কবিই আবিষ্কার করিলেন, যুক্তাক্ষরের মধ্যে সহজাত একটা বেগ ও একটা ছন্দ আছে। ইহাকে কাযে লাগাইতেই হইবে। তাহাই হইল। যুক্তাক্ষরের এই নায়েগ্রা জলপ্রপাত সত্য সত্যই পরিশেষে ছন্দের এই অমরাবতী গড়িয়া তুলিল।

তিনি স্বাধিকারপ্রমত্ত যুক্তাক্ষরকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য দিয়া, সে যে অন্য বর্ণের সহিত যুক্ত, তাহা যেমনি তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন, অমনি, যে এতদিন কেবল সুরের বিদ্রোহাচরণই করিয়া আসিয়াছে, সেই আবার তখনই তাহার মালাকর হইয়া ফুল জোগান্ দিতে আরম্ভ করিল।

পরবর্ত্তী বৎসর (১৮৮৮।২৭শে জ্যৈষ্ঠ) "নিষ্ফল উপহার" (মানসী) কবিতায়, কবিগুরু সাধারণ পয়ারেও; উক্ত যুক্তাক্ষরকে দুইটি বর্ণরূপে একবার পরখ করিয়া দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তেমন শ্রুতিসুখকর হয় নাই বলিয়া তিনি এ সংকল্পও অমনি পরিত্যাগ করিলেন।

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল
ঊর্দ্ধে পাষাণতট শ্যাম শিলাতল—

সুরে যেন ফাঁক পড়িয়া যাইতে লাগিল।

"মানসী"র 'কবির প্রতি নিবেদন' কবিতায় "দশিকা" ছন্দেও কবি যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষর রূপে চালান যায় কি না, পরীক্ষা করিলেন ; –

"শ্রান্তি লুকাতে চাও ত্রাসে,
কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে আসে।
শুনে যা'রা যায় চলে দু'চারিটা কথা বলে
তারা কি তোমায় ভালবাসে ?

কিন্তু যুক্তাক্ষরের বীণ্ ইহাতেও তেমন বাজিল না, তাই এ সংকল্পও কবি পরিত্যাগ করিলেন।

"মানসী"র "নিষ্ফল কামনা" কবিতা **অমিত্র অসমছন্দে** রচিত।

তবেই দেখা যাইতেছে যে ছন্দ রচনার জন্য যে ব্যাকুলতা তাহা "মানসী"র যুগ পর্য্যন্তই। তাহার পরে এই গুণী অশ্রান্ত ভাবে ছন্দের পর ছন্দ রচনা করিয়া আসিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দের নিগূঢ় প্রাণ-স্পন্দনটুকু, তাহার তাল মান,তাহার সুর এবং তাহার রূপ, যেমন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তেমন বাংলা ভাষায় আর কোনো কবিই ইতিপূর্ব্বে আর কখনও করেন নাই।

এই বার এই নূতন ছন্দ গুলির শ্রেণী ও রচনা কৌশল দেখাইতে চেষ্টা করি।

(১) পয়ার–

প্রচলিত পয়ার ছিল তাহার চৌদ্দটি অক্ষর, চরণে চরণে মিল, নিতান্ত একটানা, একঘেয়ে, বৈচিত্র্যবিহীন, সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী গৃহস্থ ভদ্রলোকের মত। রবীন্দ্রনাথ তাহাকে সম্রাটের সিংহাসনে বসাইলেন : সে নূতন নূতন সম্ভার আনিয়া আপনার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ও দৃঢ় করিয়া ফেলিল।

১। সাধারণ-পয়ার—

হেথা নাই ক্ষুদ্রকথা, তুচ্ছ কানাকানি,
ধ্বনিত হতেছে চির দিবসের বাণী।
—সিন্ধুতীরে, কড়ি ও কোমল।

২। ভঙ্গ-পয়ার—

চারিদিকে কেহ নাই একা ভাঙা বাড়ী
সন্ধ্যেবেলা ছাদে বসি ডাকিতেছে কাক,
নিবিড় আঁধার মুখ বাড়ায়ে রয়েছে
যেথা আছে ভাঙা ভাঙা প্রাচীরের ফাঁক।
—পোড়ো বাড়ী, ছবি ও গান।

৩। জোড়-পয়ার

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই;
এই সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।
—প্রাণ, কড়ি ও কোমল।

৫। রাস-পয়ার

ওই তনুখানি তব আমি ভালবাসি
এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী।
শিশিরেতে টল মল ঢল ঢল ফুল
টুটে পড়ে থরে থরে যৌবন বিকাশি।
চারিদিকে গুঞ্জরিছে জগৎ আকুল
সারানিশি সারাদিন ভ্রমর পিপাসী।
ভালবেসে বায়ু এসে দুলাইছে দুল
মুখে পড়ে মোহভরে পূর্ণিমার হাসি।
—তনু, কড়ি ও কোমল।

৬। তরঙ্গপয়ার

সুখশ্রমে আমি সখি শ্রান্ত অতিশয়,
পড়েছে শিথিল হয়ে শিরার বন্ধন

অসহ্য কোমল ঠেকে কুসুম শয়ন
কুসুম রেণুর সাথে হয়ে যাই লয়।
—ভ্রান্তি, কড়ি ও কোমল।

৬। ব্যুত্ত পয়ার

নিশীথে রয়েছি জেগে ; দেখি অনিমিখে
লক্ষ হৃদয়ের সাধ শূন্যে উড়ে যায়।
কত দিক হতে তারা ধায় কত দিকে।
কত না অদৃশ্য কায়া ছায়া আলিঙ্গন
বিশ্বময় কারে চাহে করে হায় হায়।
কত স্মৃতি খুঁজিতেছে শ্মশান শয়ন
অন্ধকারে হের শত তৃষিত নয়ন
ছায়াময় পাখী হয়ে কার পানে ধায়!
—মানব হৃদয়ের বাসনা, কড়ি ও কোমল।

৭। খণ্ড-পয়ার

(ক) জীবনে আছিল লঘু প্রথম বয়সে
চলেছিনু আপনার বলে
সুদীর্ঘ জীবন যাত্রা নবীন প্রভাতে
আরম্ভিনু খেলিবার ছলে!
—জীবন মধ্যাহ্ন, মানসী।

(খ) হয় কি না হয় দেখা, ফিরি কি না ফিরি
দূরে গেলে এই মনে হয়
দুজনার মাঝখানে অন্ধকারে ঘিরি
জেগে থাকে সতত সংশয়।
—বিরহীর পত্র, কড়ি ও কোমল।

৮। লঘুপয়ার

(ক) বিজ্ঞান লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে।
—জগদীশচন্দ্র বসু, কল্পনা।

(খ) একদা তুলসীদাস জাহ্নবীর তীরে
নির্জ্জন শ্মশানে
সন্ধ্যায় আপন মনে একা একা ফিরে
মাতি নিজ গানে।
—স্বামীলাভ, কথা।

৯। মিশ্র-পয়ার

(ক) শত শত প্রেম পাশে টানিয়া হৃদয়
একি খেলা তোর ?
ক্ষুদ্র এ কোমল প্রাণ ইহারে বাঁধিতে
কেন এত জোর ?
ঘুরে ফিরে পলে পলে
ভালবাসা নিস্ ছলে
ভাল না বাসিতে চাস
হায় মনোচোর!
—প্রকৃতির প্রতি, মানসী।

(খ) জন্মেছি নিশীথে আমি তারকার আলোকে
রয়েছি বসিয়া
চারিদিকে নিশীথিনী মাঝে মাঝে হুহু করি
উঠিছে শ্বসিয়া!
—নিশীথজগৎ, ছবি ও গান।

(গ) কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ। প্রথম সন্ধ্যায়
ম্লান চাঁদ দেখা দিল গগনের কোণে
ক্ষুদ্র নৌকা থরে থরে চলিয়াছে পাল ভরে
কালস্রোতে যথা ভেসে যায়
অলস ভাবনা খানি আধজাগা মনে।
—মরণ স্বপ্ন, মানসী।

১০। অন্তরষ্টিকা-পয়ার

(ক) কেন তবে কেড়ে নিলে লাজ আবরণ ?
হৃদয়ের দ্বার হেনে বাহিরে আনিলে টেনে
শেষে কি পথের মাঝে করিতে বর্জ্জন ?
—ব্যক্তপ্রেম, মানসী।

১১। মাত্রিক-পয়ার

দিনের আলো নিবে এল সূয্যি ডোবে ডোবে
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে
—কড়ি ও কোমল।

(২) সপ্তিকা—

সপ্তাক্ষরী ছন্দকে সপ্তিকা বলিতেছি। ইহাকে কেহ কেহ সপ্তাক্ষর-যতি পয়ারও বলিতে পারেন; কিন্তু

তাহা না বলাই সঙ্গত। কারণ, এই সপ্তিকা হইতে বীণকার নানা ললিত রাগিণী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি হেথা করিছে কোলাকুলি।
—নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, প্রভাত সঙ্গীত।

২। মাল্য সপ্তিকা

ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী
বিরহ তপোবনে আনমনে উদাসী।
—বিরহানন্দ, মানসী।

[ইহাও চতুর্দ্দশাক্ষরী, কিন্তু যতি-বৈচিত্র্যে এবং মিল-মাল্যে, একটি নূতন ছন্দ।]

৩। খণ্ড-সপ্তিকা

"বেলা যে পড়ে' এল জল্‌কে চল্"
পুরাণো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে
কোথা সে ছায়া সখি, কোথা সে জল!
—বধূ, মানসী।

৪। বৃত্ত-সপ্তিকা

(ক) এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘন ঘোর বরষায়।
এমন মেঘ স্বরে বাদল ঝর ঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়।
—বর্ষার দিনে, মানসী।

(খ) গগন ঢাকা ঘন মেঘে
পবন বহে খর বেগে
অশনি ঝন' ঝন' ধ্বনিছে ঘন ঘন
নদীতে ঢেউ উঠে জেগে!
পবন বহে খর বেগে!
—নদী পথে, সোণার তরী।

(গ) যদি বারণ কর' তবে
গাহিব না,
যদি সরম লাগে মুখে
চাহিব না।
যদি বিরলে মালা গাঁথা
সহসা পায় বাধা
তোমার ফুল বনে
যাইব না।
যদি বারণ কর' তবে
গাহিব না।
—সংকোচ, কল্পনা।

এই ছন্দটির সহিত যে উদ্ধৃত (ক) ছন্দের বিলক্ষণ পার্থক্য আছে, ঠিক পড়িতে পারিলেই ধরা যাইবে। (ক)-য়ে 'বরষায়' 'তমসায়'-চারিটি অক্ষর থাকিলেও উচ্চারণ তিনটি বর্ণের, কিন্তু (গ)-য়ে 'গাহিব না' 'চাহিব না' প্রভৃতি শব্দগুলি, গুনতিতে চারি অক্ষর হইলেও উচ্চারণে পাঁচটি—এই প্রভেদ।

৫। মিশ্র-সপ্তিকা

(ক) তবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধিহে
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া
পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে?
—গুপ্ত প্রেম, মানসী।

(খ) খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখী ছিল বনে।
একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে
কি ছিল বিধাতার মনে।
—দুই পাখী, সোনার তরী।

(গ) রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়
রাজার মেয়ে যেত তথা,
দু'জনে দেখা হত পথের মাঝে
কে জানে কবেকার কথা!
রাজার মেয়ে দূরে সরে' যেত
চুলের ফুল তার পড়ে' যেত
রাজার ছেলে এসে তুলি দিত
ফুলের সাথে বন লতা,

রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,
রাজার মেয়ে যেত তথা।
—রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে, সোনার তরী।

(৩) ষড়িকা।—

পূর্ব্বোক্ত "সমান-সপ্তিকা" ছন্দে যেমন দেখা গেল যে চৌদ্দ অক্ষরে সম্পূর্ণ চরণ, এবং চরণে চরণে মিল সবই পয়ারের লক্ষণ, কেবল সপ্তিকায় সপ্তমাক্ষরে আর পয়ারে অষ্টমাক্ষরে যতি, তেমনি "ষড়িকা"তেও ঠিক পয়ারের সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইবে, কেবল ইহার যতি ষষ্ঠ অক্ষরে।

১। সম-ষড়িকা

জানি জানি কোন্ আদি কাল হ'তে
পাঠালে আমারে জীবনের স্রোতে
সহসা হে প্রিয় কত গৃহে পথে
রেখে গেছ' প্রাণে কত হরষণ!
—২২, গীতাঞ্জলি।

২। ষণ্ণবিকা

(ক) জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে
আকুল পুলকে উলসিছ ফুলকাননে
দ্যুলোকে ভুলোকে বিলসিছ চল চরণে
তুমি চঞ্চল গামিনী। —চিত্রা।

(খ) ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা!
গুরু গর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা কলরবে বিহরে;
নিখিল চিত্ত হরষা
ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা!
—বর্ষা-মঙ্গল, কল্পনা।

৩। দীর্ঘ-ষড়ষ্টিকা

(ক) তখন ছিল যে গভীর রাত্রি বেলা
নিদ্রা ছিল না চোখের কোণে
আষাঢ় আঁধারে আকাশে মেঘের মেলা
কোথাও বাতাস ছিল না বনে।
—সার্থক নৈরাশ্য, খেয়া।

(খ) সে আসি কহিল "প্রিয়ে মুখ তুলি চাও
দূষিয়া তাহারে রুষিয়া কহিনু "যাও"
সখি ওলো সখি, সত্য করিয়া বলি,
তবু সে গেল না চলি।
—স্পর্দ্ধা, কল্পনা।

দুইটিই একজাতীয় তবে প্রথম উদাহরণটিতে "নিদ্রা" ও "কোথাও" দুইটি শব্দ সুরের ফাঁক পূরণে ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র।

৪। মিশ্র-ষড়িকা

(ক) অমল কমল সহজে জলের কোলে
আনন্দে রহে ফুটিয়া
ফিরিতে না হয় আলয় কোথায় বলে
ধুলায় ধুলায় লুটিয়া।
—১২, নৈবেদ্য।

(খ) যদিও সন্ধ্যা নামিছে মন্দ মন্থরে
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া
মহাআশঙ্কা জপিছে মৌন অন্তরে
দিক্ দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা
তবু বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা।
—দুঃসময়, কল্পনা।

(গ) ওগো প্রিয়তম, আমি তোমারে যে ভাল বেসেছি
মোরে দয়া করে কোরো মার্জ্জনা কোরো মার্জ্জনা
ভীরু পাখীর মতন তব পিঞ্জরে এসেছি
ওগো তাই বলে দ্বার কোরোনা রুদ্ধ কোরোনা।

মোর যাহা কিছু ছিল কিছুই পারি নি রাখিতে
মোর উতলা হৃদয় তিলেক পারি নি ঢাকিতে
সখা তুমি রাখ ঢাক তুমি কর মোরে করুণা
ওগো আপনার গুণে অবলারে কোরো মার্জ্জনা
কোরো মার্জ্জনা।
—মার্জ্জনা, কল্পনা।

(ঘ) দেবি,
অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে
অনেক অর্ঘ্য আনি,
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া নয়নজলে
ব্যর্থ সাধনখানি।
—সাধনা, চিত্রা।

৫। ষড়-সপ্তিকা

সখি প্রতি দিন হায় এসে ফিরে যায় কে!
তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে!
যদি শুধায় কে দিল, কোন ফুলকাননে
তোর শপথ, আমার নামটি বলিস্ নে!
সখি প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে!
—সকরুণা, কল্পনা।

৬। ষড়ষ্টিকা

যৌবন রাশি টুটিতে লুটিতে চায়
বসনে শাসনে বাঁধিয়া রেখেছ তায়
তবু শতবার শতধা হইয়া ফুটে
চলিতে ফিরিতে ঝলকি চলকি উঠে।
—তোমরা ও আমরা, মানসী।

(৪) পঞ্চদশী—

পনের অক্ষরের ছন্দ।

জীবনে যা' চিরদিন রয়ে গেছে আভাসে
প্রভাতের আলোকে যা' ফোটে নাই প্রকাশে!
—১৪৯, গীতাঞ্জলি।

(৫) ষোড়শী—

ষোল অক্ষরের ছন্দ।

স্তব্ধ বাদুড়ের মত জড়ায়ে অযুত শাখা
দলে দলে অন্ধকার ঘুমায় মুদিয়া পাখা!
—নিশীথ চেতনা, ছবি ও গান।

২। বৃত্ত-ষোড়শী

কোথারে তরুর ছায়া বনের শ্যামল স্নেহ!
তটতরু কোলে কোলে সারাদিন কল রোলে
স্রোতস্বিনী যায় চলে সুদূরে সাধের গেহ;
কোথারে তরুর ছায়া বনের শ্যামল স্নেহ!
—বনের ছায়া, কড়ি ও কোমল।

৩। পীড়িতা-ষোড়শী

লতার লাবণ্য যেন কচি কিশলয়ে ঘেরা
সুকুমার প্রাণ তার মাধুরীতে ঢেকেছে,
কোমল মুকুলগুলি চারি দিকে আকুলিত
তারি মাঝে প্রাণ যেন লুকিয়ে কে রেখেছে!
—আচ্ছন্ন, ছবি ও গান।

[হেমচন্দ্রের রচনায় পীড়িতা-ষোড়শী বহুল পরিমাণে আছে।]

৪। ত্রিবেণী-ষোড়ষী

(ক) যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এসো ওগো এস মোর
হৃদয় নীরে।
তল তল ছল ছল কাঁদিবে গভীর জল
অই দু'টি সুকোমল চরণ ঘিরে!
আজি বর্ষা গাঢ়তম নিবিড় কুন্তল সম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে!
ওই যে শবদ চিনি নূপুর রিনিকি ঝিনি
কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে?
যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এস ওগো এস মোর
হৃদয় নীরে!
—হৃদয় যমুনা, সোনার তরী।

(খ) দক্ষিণে বেঁধেছি নীড়　　চুকেছে লোকের ভীড়
বকুনীর বিড় বিড়　　গেছে থেমে থুমে
আপনারে করে' জড়'　　কোণে বসে আঁছি দড়
আর সাধ নাই বড়　　আকাশ কুসুমে !

—পত্র, মানসী।

৫। মাত্রিক ষোড়শী

জলে বাসা বেঁধেছিলাম ডাঙায় বড় কিচিমিচি
সবাই গলা জাহির করে চেঁচায় কেবল মিছি মিছি !

— পত্র, কড়ি ও কোমল।

(৬) অষ্টাদশী—

আঠার অক্ষরের ছন্দ।

পূর্ণ করি মহাকাল পূর্ণ করি অনন্ত গগন
নিদ্রামগ্ন মহাদেব দেখিছেন মহান্ স্বপন।

—মহাস্বপ্নে, প্রভাত সঙ্গীত।

২। যুক্তা-অষ্টাদশী

ঈশানের পুঞ্জ মেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধাবন্ধহারা
গ্রামান্তের বেণু কুঞ্জে নীলাঞ্জন ছায়া সঞ্চারিয়া
হানি দীর্ঘ ধারা।

— বর্ষ-শেষে, কল্পনা !

৩। দীর্ঘ-অষ্টাদশী

মোরে কর সভা কবি ধ্যান মৌন তোমার সভায়
হে শর্ব্বরী, হে অবগুণ্ঠিতা !
তোমার আকাশ জুড়ি যুগে যুগে জপিছে যাহারা
বিরচিব তাহাদের গীতা।

—রাত্রি, কল্পনা।

৪। মিশ্র-অষ্টাদশী

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরি রূপসি,
হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশী !
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপ খানি,
দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে
স্মিত হাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসরশয্যাতে
স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে !
উষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা।

—উর্ব্বশী, চিত্রা।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অশ্রুকুমার

(উপন্যাস)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গৃহ-প্রবেশ।

আজ তাহারা সকলে নূতন বাড়ীতে যাইবে সেই আনন্দে সৌদামিনী অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিল।

দেখিয়া, অশ্রুকুমার কহিল, "দেখ, আজ আমরা সকলে গাড়ী চড়ে বড় রাস্তা থেকে সমুখের ফটক দিয়ে ঐ বাড়ীতে যাব।"

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ? অন্দর বাড়ীর দরজা দিয়ে যাব না কেন ?"

অশ্রুকুমার কহিল, "তারক বাবু আর ম্যানেজার বাবুর ইচ্ছা যে একটু মাঙ্গলিক ক্রিয়া করে' আমরা একটু ধুমধামের সঙ্গে গৃহপ্রবেশ করি। এজন্য আমার বারণ না শুনে ম্যানেজার বাবু রাত জেগে উদ্যোগ করেছেন। আর বলেছেন যে আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে সকালে

সাতটার সময় চারখানা গাড়ী পাঠাবেন। তার আগে তুমি মুখ হাত ধুয়ে গহনা কাপড় পরে নাও।"

সৌদামিনী কহিল, "আমাকে ছেড়ে দাও ; আমি তোমার কাপড় জামা এনে দিয়ে, তবে মুখহাত ধুতে যাব।" এই বলিয়া অঞ্চলে গুঞ্জিকাগুচ্ছের মৃদু গুঞ্জন তুলিয়া সৌদামিনী ছুটিল ; এবং অবিলম্বে একটি পেটক খুলিয়া অশ্রুকুমারের পরিধান জন্য তাহার দাদামহাশয়ের দেওয়া উৎকৃষ্ট গাত্রাবরণ, বসন ও পিরাণ বাহির করিয়া তাহা অশ্রুকুমারের নিকট আনিয়া দিল। পরে বাক্স খুলিয়া, অশ্রুকুমারের বিবাহোপহার ঘড়ি চেন ও অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া দিল। অশ্রুকুমারের সজ্জার উদ্যোগ করিয়া সে ত্বরিতপদে বৃদ্ধা ঝিয়ের নিকট গেল ; এবং তাহাকে বুঝাইয়া বলিল, "ঝি ! ও ঝি ! আমি আজ এখনই শ্বশুরবাড়ী যাব। তুই আমার সমস্ত গহনা আর বারাণসী কাপড় জামা বার করে দে।"

গহনা পরিবার জন্য সৌদামিনীর এমন আগ্রহ বৃদ্ধা ঝি আর কখনও লক্ষ্য করে নাই। সে জিজ্ঞাসা করিল, "গহনা এখনই বার করব কি ? ক'টার সময় শুভদিন ?"

বৃদ্ধা সন্তুষ্টা হইয়া সৌদামিনীকে বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইয়া দিল। দক্ষালয়ে যাইবার পূর্ব্বে স্বর্গের রত্নাধ্যক্ষ দক্ষনন্দিনীকে সাজাইয়া বুঝি এতটা তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই ; বিধাতা বুঝি বসুমতীকে নগনদী বৃক্ষবল্লরীতে সজ্জিতা করিয়া, এত প্রীতি প্রাপ্ত হন নাই ; ভক্ত বুঝি কখনও পূজার প্রতিমা খানি অশেষ আভরণে ভূষিত করিয়া এত আনন্দিত হয় নাই।

যথাসময়ে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটী হইতে তিনখানি বৃহৎ ও সুদৃশ্য শকট বৃহৎ ও সুদৃশ্য অশ্বে যোজিত হইয়া ডেপুটী বাবুর বাটীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। বেলা প্রায় আটটার সময় সকলে উহাতে আরোহণ করিয়া, সম্মুখের গেট দিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

ম্যানেজার বাবুর ব্যবস্থায় পল্লব পুষ্প পরিশোভিত ও নানাবর্ণের কেতনমালায় সজ্জিত নহবৎখানায় নহবৎ বাজিয়া উঠিল। অশ্রুকুমার দেখিল যে ফটকের স্তম্ভ দুইটি পত্রপুষ্পের বিন্যাসে অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত হইয়াছে ; ঐ সজ্জিত স্তম্ভের ক্রোড়ে দুইটি সুদৃশ্য নবীন পত্রান্বিত ক্ষুদ্র কদলীবৃক্ষ রোপিত হইয়াছে, এবং দুইটি কুসুমপল্লব শোভিত রজতনির্ম্মিত মঙ্গলঘট স্থাপিত হইয়াছে ; গেট হইতে বাগানের ভিতর দিয়া, বহির্ব্বাটীর গাড়ীবারান্দা পর্য্যন্ত যে সুদৃশ্য পথ সুদৃশ্য পুষ্পকাননের মধ্য দিয়া গিয়াছিল, তাহার দুই পার্শ্বে বিচিত্র বংশদণ্ড সকল শ্রেণীবদ্ধভাবে প্রোথিত ছিল। এই সকল বংশ স্তম্ভের চূড়ায় এক একটি বৃহৎ ধ্বজা প্রভাত বায়ুর স্পর্শে ধীরে ধীরে উড়িতেছিল ; আর একটি দণ্ডের স্কন্ধ পর্য্যন্ত নানাবর্ণের ও আকারের ক্ষুদ্র পতাকায় দ্বারা রচিত এক একটি মালা ঝুলিতেছিল ; মনে হইতেছিল, যেন কোন অজানিত দেবলোক হইতে অদ্ভুত আকার দেবতাসকল আসিয়া পরস্পরের স্কন্ধে স্কন্ধে হাত দিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া, বৃহৎ বিচিত্র অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিত ও বৃহৎ দর্পণাদি ও চিত্রালঙ্কৃত কক্ষ দেখিয়া সৌদামিনীর বৃদ্ধা ঝি মনে করিল যে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মত, সে সশরীরে স্বর্গলোকে আসিয়াছে ! মানুষের বাড়ী কি কখনও এমন হয় ? যাহাকে সে একদিন দরিদ্র পল্লীবাসী বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহারই কি এই ঐশ্বর্য্য ! সে আপনার নয়নকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। সৌদামিনীর নিকটে যাইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা দিদিমণি, আমরা এ কার বাড়ীতে এলাম ? এমন বাড়ী ত আমি কখনও দেখি নি। এখানে যে আমি দিশাহারা হয়ে যাচ্ছি।"

সৌদামিনী হাসিমুখে কহিল, "এ আগে আমার জেঠা শ্বশুরের বাড়ী ছিল, এখন এ বাড়ী আমাদের হয়েছে। এখানে কিছুদিন থাকলেই কোথায় কোন ঘর আছে, তা তুই চিনে নিতে পারবি। এখন চল্, আমার সঙ্গে রান্না ঘরে চল্ ; আজ কি কি রাঁধতে হবে এখনই তার ব্যবস্থা করতে হবে।"

এই বলিয়া, সৌদামিনী নিম্নতলের বারান্দায় আসিয়া

দাঁড়াইল। সেখানে পরিচারিকা ও পাচকগণ আসিয়া তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল; কেহ পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রণাম করিল, কেহ সসম্ভ্রমে আশীর্ব্বাদ করিল। তাহারা তাহার অলঙ্কার-মণ্ডিত অবয়ব দেখিয়া মনে করিল যেন দেবী পদ্মালয়া আপন আসনান্বেষণে বাহির হইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে আসিয়াছেন। ভোলার মা, মা মা সম্বোধন করিয়া, রন্ধন সম্বন্ধে আদেশ প্রার্থনা করিল; এবং বিস্মিত নেত্রে মাতা অন্নপূর্ণার ন্যায় তাহার অপূর্ব্ব দেহশোভা অবলোকন করিল।

কাহাকে তরকারি, কাহাকে মাছ কুটিতে বলিয়া, কাহাকেও ভাণ্ডার ঘর হইতে তৈল, ঘৃত লবণ মসলা ইত্যাদি বাহির করিবার ভার দিয়া, কাহাকেও মসলা পেষণে নিযুক্ত করিয়া, কাহাকেও রান্না চড়াইতে বলিয়া এবং এইরূপে ত্রিশজন লোকের আহারের উপযুক্ত অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া, সৌদামিনী তাহার বৃদ্ধা ঝিকে নিকটে ডাকিল।

বৃদ্ধা এতক্ষণ ভূতগ্রস্তার ন্যায় নিষ্পলক নেত্রে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; মনে করিতেছিল, বুঝি সে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে কোনও পরীরাজ্যে আসিয়াছে। সৌদামিনীর আহ্বানে সে তাহার নিকটে আসিয়া বুঝিল যে সে জাগ্রতই আছে।

সৌদামিনী কহিল, "দেখ্ ঝি, তোর এক কায করতে হবে। আমি কাপড় ছেড়ে মার জন্যে নিজে রাঁধব। তুই এই চাবি নে।"

বৃদ্ধা যন্ত্রচালিত কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় চাবি গ্রহণ করিয়া কহিল, "চাবি নিয়ে কি করব?"

সৌদামিনী কহিল, "এটা আমাদের ঐ বাড়ীর চাবি। তুই ঐ চাবি নিয়ে যা, আর শীঘ্র আমার জন্যে একখানা কাচা কাপড় এনে দে। আমি এ কাপড় ছেড়ে, কাচা কাপড় পরে মার জন্যে রান্না চড়াব।"

বৃদ্ধা বিষণ্ণ মুখে বলিল, "আমাদের বাড়ী কোথায়, কতদুর? গাড়ী চড়ে কোন রাস্তা দিয়ে এসেছি তা ত কিছুই আমার মনে নেই। আমি রাস্তা চিনতে পারব কেন?"

সৌদামিনী বুঝিল যে বৃদ্ধা এখনও বুঝিতে পারে নাই যে কোথায় আসিয়াছে। সে বৃদ্ধার হাত ধরিয়া অন্দরের বড় দরজার নিকট লইয়া গেল। দ্বারবান সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিল। বৃদ্ধাকে সৌদামিনী কহিল, "বাইরে গিয়ে দেখ, রাস্তা চিনতে পারিস কি না।"

বিহ্বলভাবে রাস্তায় বাহির হইয়া বৃদ্ধা কহিল, "ও মা! ঐ যে আমাদের বাড়ী, আর এ যে সেই একাদশী চক্রবর্ত্তীর বাড়ী। আমরা কোথা থেকে কেমন করে এখানে এলাম?"

সৌদামিনী কহিল, "সে কথা পরে আমি তোকে বুঝিয়ে বলব। কিন্তু তুই আজ থেকে আর কখনও আমার জেঠশ্বশুরকে একাদশী চক্রবর্ত্তী বলিস না। এখন তুই শীঘ্র কাচা কাপড় এনে দে, আমি মার জন্যে রান্না চড়িয়ে দিই; বেলা হয়েছে।"

বৃদ্ধা সৌদামিনীর কাপড় আনিয়া দিল।

সৌদামিনী কতকগুলি অলঙ্কার খুলিয়া, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, পৃথক চুল্লীতে শ্বশ্রূর জন্য রান্না চড়াইয়া দিল; এবং অন্যান্য রন্ধনশালার দ্বারে যাইয়া, ব্রাহ্মণীদিগের রন্ধন কতদূর অগ্রসর হইতেছে, তাহার পরিদর্শন করিতে লাগিল।

একবার ডেপুটী বাবু অন্দর বাটীতে আসিয়া সৌদামিনীকে রন্ধনশালায় দেখিলেন। সৌদামিনীর এমন মোহিনী মূর্ত্তি তিনি আর কখনও দেখেন নাই। তুমি পাঠক! তুমি কি কখনও রন্ধনশালার দ্বারে দাঁড়াইয়া রন্ধনরতা বঙ্গকিশোরীর অপূর্ব্ব মুখশ্রী অবলোকন করিয়াছ? স্বেদবিজড়িত কৃষ্ণ অলকতলে ইন্ধনাগ্নিতাপে তরুণ কপোলের অরুণরাগ, গোলাপদলনিন্দিত ইষদ্ভিন্ন অধরৌষ্ঠের নির্ব্বাক সৌন্দর্য্য, আর কম্বুনিন্দিত কমনীয় কোমল কণ্ঠের মুক্তাসদৃশ ঘর্ম্মবিন্দুর মোহনমালা দেখিয়া তুমি কি কখনও তোমার নশ্বর নয়ন সার্থক করিয়াছ? কিন্নরীর হাতের বেণুর ন্যায় রন্ধনদণ্ড হস্তে লইয়া তাহাকে কি কখন পাকপাত্র মধ্যে নৃত্যশীলা অপ্সরার চরণাশ্রিত রত্ননূপুরের গুঞ্জনতুল্য শব্দ তুলিতে দেখিয়াছ? যদি না

দেখিয়া থাক, এস, আসিয়া চাহিয়া দেখ, রন্ধনশালার ধূমের মধ্যে সুন্দরী সৌদামিনীর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধূপধূনা সেবিতা দেবী প্রতিমার ন্যায় কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে!

রন্ধনরতা নাতিনীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া ডেপুটী বাবু মুগ্ধনেত্রে কহিলেন, "আজ তোমাকে দেখে আমার মনে যে আনন্দ হচ্ছে, তেমন আনন্দ আমি জীবনে আর কখনও পাই নি। আজ দিদিমণি তুমি আর দিদিমণি নও; তুমি জগৎজননী হয়েছে; তোমার ছেলেমেদের খাদ্য তৈরি করবার জন্যে নিজে হাতাবেড়ী ধরেছ!"

সৌদামিনী কহিল, "আমি ত সকল রান্না রাঁধছি না; কেবল দু একটা নিরামিষ তরকারী রাঁধছি।"

ডেপুটী বাবু আবার মুগ্ধনেত্রে নাতিনীর দিকে দৃষ্টি পাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও ঘরে কি রান্না হচ্ছে?"

সৌদামিনী কহিল, "ওটা মাছ রাঁধবার ঘর। ওখানে মাছের ঝোল, মাছের অম্বল, মাছের ঝাল এই সব রান্না হচ্ছে। এস, তোমাকে সব ঘরগুলো দেখিয়ে দিই।"

এই বলিয়া, সৌদামিনী অগ্রসর হইল; ডেপুটী বাবু তাহার অনুসরণ করিলেন।

সৌদামিনী ডেপুটী বাবুকে এক একটা ঘর দেখাইয়া কহিল, "এইটে মাছ কোটবার ও রাখবার ঘর। এই চৌবাচ্ছা তিনটা দেখ, ওতে জীবন্ত মাছ রাখা হয়; আর এই ছোট চৌবাচ্ছাতে মাছ ধোয়া হয়। এইটে তরকারি কোটবার ঘর; লোহার তারের জানালা দিয়ে এই যে সেল্‌ফ তৈয়ারী করা আছে, ওতে কাঁচা তরকারি রাখা হয়। এইটা জলখাবার তৈরী করবার ঘর; জলখাবার তৈয়ারী করে এই সব কাচের আলমারীতে রাখা হয়। এইটা নিরামিষ রান্নাঘর; এখানে আলো চালের ভাত, কাঁচা দাল, আর নিরামিষ তরকারী রান্না হয়; আর এই ঘরের এদিকটায় লুচি ভাজা হয়। এই পাশের ঘরটায় সিদ্ধ চালের ভাত, ভাজা দাল আর মাছ রান্না হয়। তার পর, ঐ যে ঘরটা দেখছ, ওখানে মাংস রান্না হয়। এই লম্বা বারান্দায় এই দেখ, বারখানা শিল; এক এক শিলে কেবল এক এক রকম মসলা বাঁটা হয়, একখানাতে ধনে, একখানাতে হলুদ, একখানাতে রাধুনি, একখানাতে সরষে—এই রকম। আর ঐদিকের বারান্দায় চল, তোমাকে ভাঁড়ার ঘরগুলো দেখাব। এই দেখ, এই ভাঁড়ারে কত রকম রাঁধবার বাসন থাকে থাকে সাজান রয়েছে। আবার পাশের এই ভাঁড়ারে এসে দেখ; এখানে চাল, দাল, আটা ময়দা ও সকল রকমের মেওয়া ও মসলা থাকে। আবার এস, এই ভাঁড়ারটা দেখ, এখানে তেল ঘি গুড় চিনি আর নানা রকমের আচার থাকে। তার পরে, ঐ বড় ঘরটা এখন খালি আছে: শুনলাম, বাড়ীতে কাযকর্ম্ম হলে ঐ ঘরে ক্ষীর, দই, মিষ্টান্ন, পাতা, ভাঁড়, খুরী সরা গেলাস ইত্যাদি রাখা হয়। আর এ দিকে যে ছোট ঘরটা দেখছ, এখানে বরফজল সোডা লেমনেড এই সব থাকে; এটাকে এরা আবদার খানা বলে।"

পান ও আহার সম্বন্ধে একজন বিখ্যাত কৃপণের বিরাট ব্যবস্থা দেখিয়া ডেপুটী বাবু অবাক হইয়া গেলেন। তিনি নাতিনীকে কহিলেন, "তোমার এই সব ভাঁড়ার দেখে আমি কি মনে করেছি বল দেখি দিদিমণি?"

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

ডেপুটী বাবু বলিলেন, "আমি মনে করছি যে চাকরী ছেড়ে দিয়ে তোমার এই ভাড়ারের ভাঁড়ারী হয়ে থাকি, আর ঘি ময়দা মেওয়া খেয়ে আমার এই ভুঁড়িটা আরও মোটা করে নিই।"

সৌদামিনী কহিল, "সত্যি, দাদামশায়! তুমি পেন্সনের জন্যে কবে দরখাস্ত করবে?"

ডেপুটী বাবু বলিলেন, "অশ্রু আজ থেকে আমাকে আর আদালতে যেতে দেবে না। আপাততঃ আমি তিন মাসের ছুটীর জন্যে দরখাস্ত করব। তার পর পেন্সন নেব।"

সৌদামিনী তাহার দাদামশায়ের কথার প্রত্যুত্তর করিল না; আনতাননে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ডেপুটী বাবু বলিলেন, "এই বাড়ীতে আমার বাসের জন্যে অশ্রু কিরকম বন্দোবস্ত করেছে, তা বোধ হয় তুমি জান না? বারবাড়ীর সমুখদিকের এক সারি বড়

বড় ঘর সে আমার জন্য ছেড়ে দিয়েছে। ঘরগুলি খুব ভাল; দামী আসবাব দিয়ে সাজান আছে। বাড়ীর মধ্যে সেই ঘরগুলিই সব চেয়ে ভাল। শুনতে পেলাম, আগে কেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় পোষাকী তোলা কাপড়ের মত ঐ ঘরগুলি কেবল পালে পার্ব্বণে ব্যবহার করতেন। আমার ঘরগুলির পাশেই প্রভাকর দুটি ঘর পেয়েছে। তার পাশেই একটা ছোট সিঁড়ি আছে। এই সিঁড়ির নীচে চিন্তামণি গোপাল ও বামুন ঠাকুর তিনটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর পেয়েছে। তাদের ঘরের কাছে একটা বড় ঘরে, পাণ, তামাক, জল ও জলখাবারের বন্দোবস্ত আছে।”

সৌদামিনী কহিল, “দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর আমি তোমাদের ঘরগুলি দেখে আসব। এখন এই অন্দর মহলে মার ও আমার থাকবার জন্যে যে ঘর ঠিক হয়েছে, তা তুমি দেখবে চল।”

বাস্তবিক অশ্রুকুমার মাতা ও পত্নীর বাসের জন্য দ্বিতলে কয়েকটি সুসজ্জিত ও সুবিধাজনক কক্ষ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিল। সৌদামিনীর স্নানাগার যুক্ত বৃহৎ প্রসাধন কক্ষে বৃদ্ধা ঝি সৌদামিনীর বস্ত্রাদি আনাইয়া গুছাইয়া রাখিতেছিল। মাতার বস্ত্র-পরিবর্ত্তন কক্ষটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র; উহা শ্যামার মার জিম্মায় ছিল। সৌদামিনীর সহিত প্রীতিপূর্ণ লোচনে ডেপুটী বাবু এই সকল কক্ষ পরিদর্শন করিলেন।

নূতন সংসারে আহার ও অবস্থানের সমস্ত বন্দোবস্ত অশ্রুকুমার সেই প্রথম দিনেই ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার পর আরও দুই তিন দিন মধ্যে তারক বাবু ও ম্যানেজার বাবু অশ্রুকুমারকে সমস্ত কাগজপত্র ও হিসাব নিকাশ বুঝাইয়া দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কর্ম্ম।

নূতন সংসারে দশ বারদিন অতিবাহিত হইলে, এক দিন অশ্রুকুমারকে নিকটে ডাকিয়া তাহার মাতা বলিলেন, “তুমি এখনও তোমার জেঠামশায়ের শ্রাদ্ধকার্য্য কর নি। তুমি তাঁর বংশধর; তাঁর পরলোকের সদ্গতির জন্যে এ কায করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। পরশু অমাবস্যা আছে, ঐ দিন উপবাসী থেকে পুরুত ডেকে তুমি তাঁর শ্রাদ্ধ যথারীতি সম্পন্ন করবে; পরদিন কতকগুলি ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন করবে।”

অশ্রুকুমার মাতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বুঝিল যে তাহার জেঠামশায়ের পরিত্যক্ত অর্থের কিঞ্চিৎ প্রথমেই তাঁহারই স্বর্গ কামনায় ব্যয় করা উচিত; ইহাই তাহার প্রথম অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। অতএব সে কাছারী বাটীতে যাইয়া আপন আফিসকক্ষে বসিল এবং খাতাঞ্চিখানায় কত টাকা মজুত আছে, তাহা জানিবার জন্য খাতাঞ্চিকে এবং আয়োজন জন্য ম্যানেজার বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইল।

খাতাঞ্চি আসিলে জানা গেল, তহবিলে দুই লক্ষ টাকার উপর মজুদ আছে।

ম্যানেজার বাবু আসিয়া, অশ্রুকুমারকে অভিবাদন করিয়া নিকটবর্ত্তী আসনে উপবেশন করিলেন।

অশ্রুকুমার তাঁহাকে প্রতিনমস্কার করিয়া কহিল, “জেঠামশায়ের মৃত্যুকালে আমি তাঁর কাছে না থাকায়, এ পর্য্যন্ত তাঁর শ্রাদ্ধকার্য্য রীতিমত হয় নি। আমি স্থির করেছি, আগামী অমাবস্যার দিন তাঁর যথারীতি শ্রাদ্ধ করব। আপনি পুরোহিত মশায়কে ডেকে একটা ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়ে নেবেন; ব্রাহ্মণভোজন আর কাঙ্গালী বিদায়ের ব্যবস্থাও করতে হবে।”

ম্যানেজার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই শ্রাদ্ধে কি প্রকার ব্যয় করবার অভিপ্রায় করেছেন?”

অশ্রুকুমার কহিল, “আজ আমাদের তহবিলে যা মজুত আছে, আমার ইচ্ছা তা সমস্তই এই শ্রাদ্ধে ব্যয় করা হয়। আপনি দু লক্ষ টাকা ব্যয়ের একটা ফর্দ্দ প্রস্তুত করবেন।”

ম্যানেজার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভূরিভোজন আর কাঙ্গালী বিদায় ছাড়া, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে কি?”

অশ্রুকুমার কহিল, “দূরবর্ত্তী পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ করা চলবে না, কারণ তার সময় নেই। কিন্তু নিকটবর্ত্তী

পণ্ডিতদিকে আহ্বান না করলে, তাঁদের পাণ্ডিত্য গালাগালিতে পরিণত হবে ; এ জন্যে কিছু ব্যবস্থা রাখবেন।”

ম্যানেজার বাবু কহিলেন, “দ্রব্যাদির ও খরচের তালিকা তৈরী করে আজই আমি আপনার হাতে দেব।”

অশ্রুকুমার যথাসময়ে তালিকা পাইয়া, তাহা ডেপুটী বাবুকে দেখাইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিল। দুইদিন ধরিয়া দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইল, নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইল, এবং কাঙ্গালীদিগকে সংবাদ দেওয়া হইল। অমাবস্যার দিন মহা সমারোহে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শ্রাদ্ধকার্য্য হইয়া গেল ; অসংখ্য লোক আহারে পরিতৃপ্ত হইয়া, এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ বিদায়ে পরিতুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন চারিহাজার কাঙ্গালী বস্ত্র ও সিধা পাইল।

তাহার পর দিন সৌদামিনী সমুদয় কর্ম্মচারী ও দাসদাসীগণকে এবং তাহাদের প্রতিপাল্য পরিবার-বর্গকে আহারে আহ্বান করিল। অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া, সৌদামিনী আহার প্রস্তুতের বিপুল আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিল। বালিকা সৌদামিনী আজ সত্যই জননী-মূর্ত্তিতে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছে।

বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের পুত্র কন্যাগণকে লইয়া আহারে বসিলেন ; বেলা সাড়ে বারটার সময় তাঁহাদের আহার সমাপ্ত হইল। তাহার পর, কর্ম্মচারিগণের পত্নীগণ আহার করিলেন। তাহার পর দাস দাসীগণ আহারে বসিল। সৌদামিনী কোমর বাঁধিয়া তাহাদিগের খাদ্য পরিবেষণ করিতে লাগিল ; অশ্রুকুমারের মাতা সৌদামিনীর সহায়তা করিতে লাগিলেন।

সকলের আহার শেষ হইলে, বেলা দুটার সময় সৌদামিনী স্নাতা হইয়া শ্বশ্রূর সহিত আহার করিতে বসিল।

এই শ্রাদ্ধের সময় ডেপুটী বাবু ও অশ্রুকুমার দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া, রামতনু বাবু ও তাঁহার স্ত্রী সর্ব্বদা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে আসিতেন। আজ আহারের পর রামতনু বাবু ডেপুটী বাবুর একটি কক্ষে বিশ্রাম করিতেছিলেন। সেখানে চিন্তামণি কলিকার পর কলিকা আনিয়া তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতেছিল।

দিবাবসানকালে ডেপুটী বাবু তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “আজ আমার দিদিমণি কি কাযই করেছে! দেখে আমার চক্ষু সার্থক হয়েছে।”

রামতনু বাবু কহিলেন, “আমার গৃহিণীও অন্তঃপুরে থেকে বোধ হয় দিদিমণির কায দেখেছেন।”

ডেপুটী বাবু কহিলেন, “অবশ্যই দেখেছেন। এবং আপনি শুনে সুখী হবেন, তিনিও অনেক কায করেছেন।”

রামতনু বাবু কহিলেন, “যদিও এ বয়সে আর কিছু পরিবর্ত্তনের ভরসা নেই, তবু দিদিমণির কায দেখে একটু শিক্ষালাভ হলেও যথেষ্ট। ইদানিং আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের মনে বিশ্বাস জন্মেছে যে, কালীঘাটে যাওয়া আর গঙ্গার ময়লা জলে স্নান করা ছাড়া হিন্দুর আর কোনও ধর্ম্ম নেই। কায যে হিন্দুর প্রধান ধর্ম্ম তা তারা ভুলে গেছে। ষষ্ঠীর দিন লুচি খাওয়া, পূর্ণিমার দিন গঙ্গাস্নান করা, অমাবস্যার দিন কালীঘাটে গিয়ে ভিড় ঠেলে কালীমূর্ত্তি দেখা, কেউ হাই তুললে তুড়ি দেওয়া, কেউ হাঁচলে জীব সহস্র বলা—এই এখন হিন্দু-নারীর ধর্ম্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরে, এ যদি ধর্ম্ম হত, তা হলে যিনি ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য মানব মূর্ত্তি ধরে পৃথিবীতে এসেছিলেন, তিনি তাঁর প্রিয়তম শিষ্য অর্জ্জুনকে ডেকে সর্ব্বাগ্রে বলতেন হে সখে, জৃম্ভনকালে তুমি তিনটি তুড়ি দিও ; আর ষষ্ঠীর দিন লুচি খেও। বলতেন না—ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ ; বলতেন না, ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোহশ্নুতে।”

ডেপুটী বাবু কহিলেন, “আমার মনে হয়, ভগবান এই উপদেশটা আমাদের মত অলস নারীনিন্দক পুরুষদিকেই দিয়েছিলেন।”

রামতনু কহিলেন, “আরে না মশায়, অর্জ্জুনকে সমুখে রেখে ভগবান পৃথিবীর সমস্ত লোককে ঐ উপদেশ দিয়েছিলেন। একালে ঐ উপদেশটা আমাদের দেশের ভদ্র পরিবারের স্ত্রীলোকগণের প্রতিই প্রযোজ্য। কর্ম্ম

যে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, তাঁরা সে কথা একদম ভুলে গেছেন।"

চিন্তামণি তামাক সাজিয়া আনিল। রামতনু বাবু ঊর্দ্ধদিকে কুণ্ডলীকৃত ও সুগন্ধি ধূমরাশি মুখবিবর হইতে নিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন, "আপনাকে আজ একটা নূতন সংবাদ দেব।"

ডেপুটী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি?"

রামতনু বাবু কহিলেন, "আজকের খবরের কাগজ বোধ হয় আপনি পড়েন নি। আজ আলিপুরের সংবাদে জানলাম যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই জাল জমীদার তিন জনকে ছেড়ে দিয়েছেন; কিন্তু তাদের জাল ম্যানেজার যাদবচন্দ্র দাসকে দায়রায় সোপর্দ্দ করেছেন। এই যাদবচন্দ্র দাস যে এজাহার দিয়েছে, তাতে বেশ বুঝতে পারা যায়, দিদিমণিকে বিবাহ করবার জন্যে তারা যে চেষ্টা করেছে তার কারণ কি।"

ডেপুটী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন চেষ্টা করেছিল?"

রামতনু বাবু কহিলেন, "অর্থলাভ করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল।"

ডেপুটী বাবু কহিলেন, "তারা বুঝি জানতে পেরেছিল যে চক্রবর্ত্তী মশায় দিদিমণিকে দু'লক্ষ টাকা দিয়ে গেছেন?"

রামতনু বাবু কহিলেন, "না, তাদের চেষ্টাটা দুলক্ষ টাকার জন্যে নয়। তারা চক্রবর্ত্তী মশায়ের সমুদয় সম্পত্তিলাভের চেষ্টায় ছিল।"

ডেপুটী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করে?"

রামতনু বাবু কহিলেন, "ঐ খুনী আসামী যাদব দাস তার এজাহারের এক স্থানে বলেছে যে, সে অন্তরালে থেকে এটর্ণির সঙ্গে চক্রবর্ত্তী মশায়ের কথাবার্ত্তা শুনে জানতে পারলে যে সমুদয় সম্পত্তি সৌদামিনী পাবে; তখন এই সংবাদটা সে ঐ তিন শালাকে জানালে; শুনে তারা সৌদামিনীকে বিয়ে করে ঐ সম্পত্তি হস্তগত করবার জন্যে একটা চক্রান্ত করলে।"

ডেপুটী বাবু কহিলেন, "কেবলমাত্র দৈবের শুভ দৃষ্টিতে আমরা এই চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত হতে মুক্তিলাভ করেছি। তাদের ভ্রান্ত চক্রান্তের দ্বারা তাদের বিশেষ কিছু লাভ হত না বটে, কিন্তু দিদিমণির কি সর্ব্বনাশই হত!"

রামতনু বাবুর সহিত ডেপুটী বাবু যখন উপরিউক্ত কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন অশ্রুকুমার আপন নির্দ্দিষ্ট কক্ষ সকলের মধ্যে একটিতে বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিল। সহসা সেই কক্ষের মধ্যে এক আন্দোলিত অঞ্চলে গুঞ্জিকাগুচ্ছের মৃদু গুঞ্জন উত্থিত হইল। শুনিয়া অশ্রুকুমারের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল; সে পুস্তকে মন স্থির রাখিতে পারিল না। সে দ্বারে দিকে উৎফুল্ল নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল যে সৌদামিনী আসিয়াছে।

সৌদামিনী কহিল, "তুমি পড়ছ, পড়; আমি চলে যাই; তোমাকে এখন আর বিরক্ত করব না।"

অশ্রুকুমার কহিল, "তুমি আমাকে কখনই বিরক্ত করতে পারবে না, সদু। আর পড়া? আমি বই পড়তে খুব ভালবাসি বটে, কিন্তু পড়ার চেয়েও তুমি বড়। তুমি আগে, তার পর পড়া। তুমি এখন কেন এসেছ সদু?"

সৌদামিনী বলিল, "তুমিই বল না।"

অশ্রুকুমার বলিল, "তুমি আমাকে ভালবাস, অনেকক্ষণ না দেখে থাকতে পার না; তাই আমাকে দেখতে এসেছ।"

সৌদামিনী লজ্জারক্ত মুখে কহিল, "দূর তা কেন? আমার কায আছে তাই এসেছি।"

অশ্রুকুমার বলিল, "তবে আমার কাছে বস; বসে বল কি কায।"

সৌদামিনী কহিল, "জ্যেঠা মহাশয়ের শ্রাদ্ধের আগে তুমি একদিন বলেছিলে যে শ্রাদ্ধটা শেষ হয়ে গেলে তুমি আমার কাকার সন্ধান করবে।"

অশ্রুকুমার কহিল, "অন্য লোকের দ্বারা তোমার কাকার অনুসন্ধান নিয়েছি। কিন্তু এপর্য্যন্ত তাঁর কোন সন্ধানই পাই নি। আমি কতকগুলি কায আরম্ভ

করেছি, সেগুলি শেষ হয়ে গেলেই আমি নিজে কোটালিগ্রামে গিয়ে সন্ধান করবো।”

সৌদামিনী কহিল, “আর কি কায আরম্ভ করেছ ?”

অশ্রুকুমার কহিল, “আমাদের দেশে আমাদের যে সকল জমীদারী বিক্রি হয়ে গেছে, যদি সম্ভব হয়, তবে তা আবার কেনবার জন্যে কতকগুলি দালাল লাগিয়েছি। আর, আমাদের রঙ্গণঘাটের বাড়ী ভাল করে মেরামত করবার জন্য কতকগুলি মিস্ত্রি পাঠিয়েছি।”

সৌদামিনী কহিল, “তুমি কি সেই বাড়ীতে গিয়ে থাকবে ? দেখ, সেই বাড়ী আমার এমন মিষ্টি আর আপনার বলে মনে হয়েছিল যে, এখনও সেইখানে থাকতেই আমার ইচ্ছা করে !”

অশ্রুকুমার কহিল, “তা, তোমার যখন ইচ্ছে হবে, তুমি সেখানে মার কাছে গিয়ে থাকবে। মা বলেছেন যে বৈশাখ মাস থেকে তিনি সেইখানেই থাকবেন। কিন্তু সর্ব্বদা সেখানে থাকতে পারবেন না। থাকলে আমি এখানে আর আর যে সকল কায আরম্ভ করেছি তাহা ঠিক মত হবে না।”

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি আর কি কায আরম্ভ করেছ ?”

অশ্রুকুমার কহিল, “তোমার ঠাকুরদাদা মশায়ের যে সকল জমীদারী ছিল, তাও কেনবার জন্যে দালাল নিযুক্ত করেছি। আর কোটালিগ্রামে তোমাদের যে বাড়ী ছিল, তা কি অবস্থায় আছে, তা দেখবার জন্যে একজন লোক পাঠিয়েছি। আমিও সেখানে একবার যাব ; আর যে সকল জমীদারী কেনা হবে, সেই সব স্থানেও এক একবার যেতে হবে ; কোথায় কি কায করা দরকার তা নিজে চোখে দেখতে হবে।”

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি যখন এই সব কায নিয়ে থাকবে, তখন আমি কি করবো ?”

অশ্রুকুমার কহিল, “তুমিও কায করবে। কাযের জন্যেই ত আমরা সংসারে এসেছি, সদু। তুমি বাড়ীর ভিতর থেকে কায করবে, আমি বাইরে কায করবো !”

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের উত্থান ও পতন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মৌলিক বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন বিষয়ে গত সংখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি। প্রথমতঃ এই ধর্ম্ম ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নীরব ছিল। এই স্থলে মৌনকে সম্মতির লক্ষণ বলিয়া ধরা হয় নাই, পরন্তু বৌদ্ধগণ হিন্দুদের নিকট অনেকটা নাস্তিকই ছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে বুদ্ধদেবই (তাঁহার পরিনির্ব্বাণের অনেক শতাব্দী পরে) ভগবানের আসন দখল করিয়া লন। অসংখ্য বোধিসত্ত্বের সৃষ্টি হইয়া মহাযানতন্ত্রে পৌত্তলিকতা চরম সোপানে গিয়া উঠে। অন্তর ও বাহির ভারতে এই পৌত্তলিকতা ছড়াইয়া পড়ে। আরবগণ মধ্য এসিয়ায় অসংখ্য বৌদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলেন। আরবদিগের নিকট পুত্তলিকা বুঝাইতে বুধ্ শব্দ ব্যবহৃত হইত। যে বুদ্ধদেব মূর্ত্তির ভীষণ পরিপন্থী ছিলেন, কালচক্রে তাঁহার নামই পৌত্তলিকতার সূচক হইয়া পড়িল ! পৌত্তলিকতা হিন্দুধর্ম্মেও পূর্ব্বে ছিল না। বেশী পরিমাণে লোকপ্রীতি অর্জ্জন করিবার আশায় লোকের মন যোগাইতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম জনসাধারণ ও বিদেশীয়দিগের কুসংস্কার, ধর্ম্মের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করিলেন এবং কে কত

নীচে নামিতে পারে ইহারই যেন একটা রেস (race) হইয়া গেল। এই 'রেসে' এত যে বড় পৌত্তলিক ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম তাহাকে পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মের কাছে মাথা নোয়াইতে হইল! বড়ই বিসদৃশ ব্যাপার।

সিন্ধুদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই মত দর্শনের উচ্চশৃঙ্গ হইতে পতিত হইয়া নীচতম কুসংস্কার ও পৌত্তলিকার ধূলিতে লুটাইতেছিল।

মহম্মদ বিন কাশিম যখন সিন্ধুদেশ আক্রমণ করেন, তখন এই বৌদ্ধগণ নেরুন ও শিবিস্থানে যেরূপ আচরণ করেন তাহা বড়ই গর্হিত হইয়াছিল। বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের ফলে বীরের বীর্য্য, শূরের শৌর্য্য কর্পূরের মত উবিয়া গিয়াছিল। ভারতের অধঃপতনের ইহাই অন্যতম কারণ বলিয়া ঐতিহাসিক বৈদ্য (Vaidya) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শিবিস্থানে তাঁহারা বলেন—"আমরা পুরোহিতের দল। শান্তিই আমাদের ধর্ম্ম। আমাদের ধর্ম্মে যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ, প্রাণিহত্যা হইবার যো নাই।" বৈদ্যের মতে এই অহিংসা মন্ত্রই ভারতের কাল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি বলেন—মাংসাহারী জাতি প্রায়ই সাহসী ও উদ্যোগী হয়। এবং যদি কোনও জাতির পক্ষে মাংস অখাদ্য হয়, তবে তাহাতে সেই জাতির ক্ষতি হয়। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে মধ্যশ্রেণী একেবারে হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল (এবং আজ পর্য্যন্তও আছে)। এইরূপে দুদ্ধর্ষ আরবগণ এ হতভাগ্যদেশ আক্রমণ করিবার সময়ে অর্দ্ধেক কেন, অর্দ্ধেকের উপর দেশের লোক, মেষশাবকের মত নিরীহ ছিল, এবং নিরীহ মেষশাবকেরই মত বধের উপযুক্ত ছিল এবং হতও হইয়াছিল। আক্ষেপের বিষয় যে মরন-মারণ-শঙ্কী বৌদ্ধগণ আরবদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন! একমাত্র ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যে ধর্ম্মে কাপুরুষতা শিক্ষা দেয় সেই ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

কাশ্মীর দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের প্রচলন হয়। শিব, বিষ্ণু ও আদিত্যের উপাসনার জন্য মন্দির গড়িয়া উঠে। বৌদ্ধ মন্দিরও নির্ম্মিত হয়। সুবিখ্যাত ললিতাদিত্যের চাঙ্কুণ নামক একজন তুক্খর জাতীয় মন্ত্রী ছিলেন। ললিতাদিত্য মগধ বিজয় করিয়া যখন একটা বুদ্ধ মূর্ত্তি লইয়া আসেন, তখন তিনি সেই মূর্ত্তি চাহিয়া লইয়া নবনির্ম্মিত বিহারে স্থাপিত করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে তুরস্ক, তুক্খর ও ইরাণ দেশীয় অন্যান্য জাতির মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। নৃপতি অবন্তিবর্ম্মণ অনেকটা বৌদ্ধ ছিলেন এবং প্রাণিহত্যা নিবারণ করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মে মানুষকে কতটা নিস্তেজ ও নির্ব্বীর্য্য করিয়া তুলিয়াছিল তাহার একটা দৃষ্টান্ত বলভি দেশের পতন সম্পর্কে বৈদ্য দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"অবশ্য ইহার পতনের মুখ্য কারণ হইতেছে রঙ্কের বিশ্বাসঘাতকতা। কিন্তু আমরা ইহার অন্যতম কারণও নির্দ্দেশ করিতে পারি। তাহা হইতেছে—তদ্দেশের শাসক সম্প্রদায় ও জনসমূহের একান্ত নির্ব্বীর্য্যতা ও সমরবিমুখতা। এবং এই সমরবিমুখতা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত অহিংসামন্ত্রেরই বিষময় ফল। অহিংসা মন্ত্রের জন্য আজিও গুজরাট বিখ্যাত।"

উড়িষ্যাদেশে খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫০ হইতে খৃষ্টাব্দ ৬১৮ পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের একাধিপত্য ছিল। প্রথমে তদ্দেশবাসীই নৃপতি ছিলেন। পরে রক্তবাহুর বংশধর যবনগণ আসেন। মধ্যপ্রদেশের কৈলকিল যবনগণ তাঁহাদের জ্ঞাতি ছিলেন এবং উভয়েই বৌদ্ধ ছিলেন। হিন্দুধর্ম্ম প্রথম প্রথম অত শীঘ্র বিদেশীয়দিগকে স্বীয় গণ্ডীর ভিতরে আসিতে দেয় নাই; বৌদ্ধধর্ম্মের সে বালাই ছিল না, সেই জন্য বিদেশীয়েরা বেশীর ভাগ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না, কেন না উভয় ধর্ম্মই উচ্চ আদর্শ বিবর্জ্জিত ও নীচ কুসংস্কার সঙ্কুল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তবুও বৌদ্ধধর্ম্ম "মিশনরী" কায করিয়া দল পুরু করিত, সেই জন্য যবন, শক ও অন্যান্য বিদেশীয়গণ যত শীঘ্র বৌদ্ধ হইত, তত শীঘ্র হিন্দু হইত না। মৌলিক বৌদ্ধধর্ম্মে জাতি বিচার ছিল না। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর বৌদ্ধধর্ম্মে এই ব্যাপারটী বেশ আড্ডা গাড়িয়া

বসিয়াছিল। ৪৭৪ খৃষ্টাব্দে কেশরী রাজগণ যবনগণকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। কেশরীগণ শিব উপাসক হইলেও সর্ব্ববিশ্বের পালয়িতা বলিয়া বিষ্ণুরও সম্বর্দ্ধনা করিতেন। স্যর উইলিয়াম হণ্টর তাঁহার "উড়িষ্যা"নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "দেড় শত বৎসর ধরিয়া শৈব ও বৌদ্ধ উপাসনার মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগিয়া ছিল কে জয়ী হয়; অবশেষে শৈবোপাসনারই জয় হইল। তদানীন্তন কেশরীরাজ সর্ব্বসংহারক রুদ্রেরই উপাসক ছিলেন। বিখ্যাত শিবমন্দিরযুক্ত ভুবনেশ্বর তাঁহার রাজধানী ছিল। বর্ষের পর বর্ষ গুহানিবাসী বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ ক্রোশত্রয়-ব্যাপী ফলপুষ্প সমন্বিত কুঞ্জশ্রেণীর উপর দিয়া দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া বহুদূরে শিবমন্দিরের চূড়া নিরীক্ষণ করিত।"

কেশরী রাজগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে যেমন বাঙ্গালার নৃপতিগণ ব্রাহ্মণগণকে আনাইয়া নিজদেশে বাস করাইয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহারাও উত্তর ভারত হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া স্বীয় দেশে বসাইয়াছিলেন। অযোধ্যা হইতে দশ সহস্র ব্রাহ্মণ আসেন; তাঁহাদিগকে অনেক জমিজমা দেওয়া হয়। যাহারা সেই দেশেরই পুরাতন ব্রাহ্মণ ছিলেন, ও পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হন তাঁহাদিগকে লৌকিক ব্রাহ্মণ বলা হইত, নবাগত ব্রাহ্মণগণকে বৈদিক ব্রাহ্মণ বলা হইত; এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে আদান প্রদান অথবা কোন সামাজিক ব্যবহার চলিত না। কেশরী নৃপতিগণ ১১৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; তৎপরে বিদ্রোহ বিপ্লবে তাঁহাদের বংশের উচ্ছেদ হয়। বৈদ্য বলেন, "এই সময়ে এক ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত হয়; এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম বৈষ্ণবধর্ম্মের ছদ্মরূপ ধারণ করিয়া আবার শির উন্নত করে।" প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার Modern Buddhism নামক গ্রন্থে বলেন যে উড়িষ্যার বৈষ্ণবগণ বস্তুতঃ ছদ্মবৌদ্ধ এবং তাহাদের ধর্ম্মমত মহাযানতন্ত্রেরই পরবর্ত্তী ও বিকৃত রূপ বিশেষ।

কনৌজে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর কিয়ৎকাল পরে যশোবর্ম্মণ নামক এক রাজা রাজত্ব করেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের তুঙ্গাবস্থা। হর্ষের শেষ সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনর্জীবন দেখা গিয়াছিল। আবার বেদের পবিত্রতা ও প্রামাণ্য ঘোষিত হইল, আবার বৈদিক যাগ যজ্ঞের ফলশ্রুতি কীর্ত্তিত হইল। বৌদ্ধধর্ম্ম এই দুইটা মতের ভীষণ বিরোধী ছিল। হর্ষের সময়েই পূর্ব্বমীমাংসার পঠন পাঠন আবার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কবি বাণভট্টের খুল্লতাতগণ মীমাংসা শাস্ত্রের সমধিক অনুশীলন করিতেন; এবং বাজপেয়, অগ্নিষ্টোম ও বেদ-বিহিত অন্যান্য যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিতেন। পূর্ব্ব মীমাংসা শাস্ত্রের প্রচারক সুবিখ্যাত কুমারিল ভট্টের শিষ্য হইতেছেন কবি ভবভূতি ও প্রশিষ্য হইতেছেন বাক্‌পতিরাজ। হর্ষের মৃত্যুর পর পরবর্ত্তী বর্ম্মাগণের আমলে পূর্ব্ব মীমাংসার একাধিপত্য হয়, হিন্দু সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমি হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিতাড়িত হয়। স্বভাবতঃই যশোবর্ম্মণের অধীনে হিন্দু সাম্রাজ্যের রাজধানী কান্যকুব্জ গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের কেন্দ্র হইয়া মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্বীয় প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। সমগ্র ভারতে কনৌজিয়া ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর নেতা বলিয়া পরিগণিত হইতেন। পূর্ব্বগৌড় (অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র এবং থানেশ্বর) হইতে ব্রহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ বঙ্গে প্রেরিত হন, কিন্তু পরবর্ত্তী কিম্বদন্তী অনুসারে বঙ্গে হিন্দুরাজা আদিশূর পাঁচজন কনৌজি ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থকে নিমন্ত্রণ করিয়া বঙ্গে আনাইয়াছিলেন ও বসবাস করাইয়াছিলেন। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ও মীমাংসা শাস্ত্রের পুনরভ্যুদয় কেবল উত্তর ভারতেই সীমাবদ্ধ হইয়া ছিল না, অধিকন্তু দাক্ষিণাত্যেও বেদানুশীলন বেশ চলিয়াছিল। চালুক্য বংশের কাহিনী সম্পর্কে তাহার উল্লেখ করিব। বেদ ও পূর্ব্বমীমাংসার অনুশীলন ফলে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাণ হইল; কেবল মাত্র জন্মভূমি মগধে আরও কয়েক শতাব্দী টিকিয়াছিল।

কোশল নৃপতি হৈহয়গণ পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; কিন্তু খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ভারতের অন্যান্য স্থানের অধিবাসীর মত তাঁহারাও ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন করিলেন। যখন

হুয়েনসাঙ ভিনমল পরিদর্শন করেন, তখন সেখানকার রাজা বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। চীনা পরিব্রাজকের আগমনের সময় জেজাকভুক্তি ও মহেশ্বরপুরে ব্রাহ্মণ নৃপতিগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

নেপালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ হিন্দু। শিবোপাসক পশুপতিনাথের মন্দির ভারতবিশ্রুত। দুর্গা এবং গণপতিও খুব পূজা পাইয়া থাকেন। এমন কি তথায় বৌদ্ধেরাও দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এখানে যে মহাযানতন্ত্র চলিত আছে তাহাতে এত কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার ভেজাল আছে এবং তাহা হিন্দুধর্ম্মের এত ভাব ও মত আত্মসাৎ করিয়াছে যে নেপালের বৌদ্ধগণ চণ্ডিকাদেবীর উদ্দেশে মুরগী ছাগল ও মহিষ বলি দিতে দ্বিধামাত্র করে না। এমন কি তাহারা স্বীয় ধর্ম্মে দেবীর (শক্তি) আবিষ্কার করিয়াছে। তাঁহাদের সংখ্যা পাঁচ ও নাম তারা। পশুপতি ও বুদ্ধদেব জনসাধারণের ভক্তি ভাগবাটোয়ারা করিয়া লইয়াছেন। দুই ধর্ম্মেই নাগ, যক্ষ ও রাক্ষস আছে। নেপাল মহাপীঠ বলিয়াও বিখ্যাত। একটা কিম্বদন্তী আছে যে বিক্রমাদিত্য যখন নেপালে আসেন, তখন তাঁহার সঙ্গে ভৈরবগণও আসিয়াছিলেন। হুয়েন সাঙ বলেন—"এখানকার লোকেরা সত্য ও মিথ্যা উভয় ধর্ম্মেই আস্থাবান। দেবমন্দির ও বৌদ্ধ বিহার গা-ঠেকাঠেকি করিয়া আছে।" অংশুবর্ম্মণ পর্য্যন্ত রাজগণ বৌদ্ধ ও কখনও বৈষ্ণব ছিলেন। অংশুবর্ম্মণ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ পশুপতির উপাসক ছিলেন এবং লিপিতে তাঁহারা "পশুপতি ভট্টারক পদানুগৃহীত" বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নেপালে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসঙ্গে ভিনসেণ্ট স্মিথ লিখিয়াছেন, "খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যে ধর্ম্ম নেপালে প্রচলিত ছিল তাহা এক প্রকার - মহাযানতন্ত্রের বিকৃত তান্ত্রিক সংস্করণ; হিন্দুদের শৈবমতের সহিত এতটা সামঞ্জস্য ছিল যে, দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য বাহির করা অত্যন্ত দুরূহ ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম আপনা হইতেই ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতেছিল,—সম্প্রতি গুর্খা গভর্ণমেণ্ট তাহাকে সেই পথে আরও আগাইয়া দিয়াছেন। অতএব মনে হয় যে কয়েক পুরুষের মধ্যেই নেপালীয় বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাণ প্রাপ্তি ঘটিবে।"

আসামে মঙ্গোলীয় অসংখ্য জাতি আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের জাতীয় বিশ্বাস হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রমতকে বেশ পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। কামরূপ সেই জন্য মায়ার দেশ — ইন্দ্রজাল, ভোজবাজি, কুহকী কুহকিনীর এবং ডাইন ডাইনীর দেশ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অবশেষে হিন্দুধর্ম্মই জয়ী হয়।

বৌদ্ধধর্ম্ম যখন বিশিষ্ট তন্ত্রমতে পরিণত হয়, সেই অবস্থায় বঙ্গের পালরাজগণ তাহার পৃষ্ঠপোষক হন এবং 'মিশনরী'গণ এখান হইতে গিয়া তীব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করেন। সেনরাজগণ কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং বৌদ্ধরাজগণের ভীষণ বিরোধী ছিলেন।

মুসলমানগণ বঙ্গ ও বিহার আক্রমণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করেন। ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেন—"হিমালয়ের দক্ষিণ ভাগস্থিত উত্তরভারতের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ আশ্রয় ছিল। বিহারে কেবলমাত্র একজন মুসলমান আক্রমণকারীর অসির আঘাতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিনষ্ট হয়।"

অতঃপর বৌদ্ধভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের কি অবস্থা ঘটে তাহার পর্য্যালোচনা করিব।

কৃষ্ণস্বামী আয়াঙ্গার তাঁহার "প্রাচীন ভারত" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, প্রথম পহ্লবগণ, যাহাদের কীর্ত্তিকলাপ প্রাকৃত লিখিত লিপিসমূহ হইতে জানা যায়, তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাহার পরে যাঁহারা রাজত্ব করেন তাঁহারা বৈষ্ণব ছিলেন ও শেষে যাঁহারা রাজত্ব করেন তাঁহারা শৈব ছিলেন। পহ্লব আধিপত্যের প্রারম্ভ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মকে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিকট পরাভব মানিতে হয়।

বৈঙ্গের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে পহ্লবগণ বৈদিক ধর্ম্মের অনুগত ছিলেন। শিবস্কন্দ বর্ম্মণ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শিবস্কন্ধ বর্ম্মণের নাম হইতে

বুঝা যায় যে তিনি একজন গোঁড়া শিবভক্ত ছিলেন। কিন্তু উত্তরভারতের নৃপতিগণের মত তাঁহারাও পরধর্ম্ম-সহিষ্ণু ছিলেন। তাঁহাদের রাজধানী কাঞ্চীনগরে অসংখ্য শিবমন্দিরের সহিত বিষ্ণুমন্দিরও দেখা যায়। একজন রাজা অমরাবতীস্থ বৌদ্ধগণকে দান করিয়াছিলেন। কখনও কখনও জৈনধর্ম্মের সেবকগণ অনুগৃহীত হইতেন। কিন্তু পহ্লববংশ ও জনসাধারণের ধর্ম্ম ছিল শিবোপাসনা। দক্ষিণভারতে এখন পর্য্যন্ত কাঞ্চী শৈবধর্ম্মের পীঠস্থান হইয়া আছে। শৈব সন্ন্যাসী ও কবিগণের জন্মভূমি এই কাঞ্চীনগর। গুহামন্দির ও প্রস্তরখোদিত রথ সমূহ দেখিলে বিস্ময়ে আপ্লুত হইতে হয়। কাঞ্চীর রাজসিংহেশ্বর অথবা কৈলাসনাথ মন্দির সুবিখ্যাত। মামান্নপুরের শিবমন্দির উল্লেখযোগ্য।

আচার্য্য ভাণ্ডারকর বলেন যে প্রথম চালুক্যদের সময়েই বৌদ্ধধর্ম্ম অবনতির পথে দাঁড়াইয়াছিল, এবং রাজা ও জনসাধারণের তাহা আর ধর্ম্ম ছিল না। বাকাতক ও রাজগণের আমলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি হয়; অজন্তা গুহাই ইহার সমৃদ্ধির পরিচায়ক। চালুক্যরাজ প্রথম পুলকেশিন অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; এবং যে সকল পণ্ডিত যজ্ঞীয় কর্ম্মবিধি অধ্যয়ন করিতেন তাঁহাদিগকে নানাপ্রকারে উৎসাহিত করিতেন। উত্তর ও দক্ষিণ উভয় ভারতেই ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধবাদ খণ্ডন করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছিয়েন। কবি বাণ ভট্টের খুল্লতাতগণের মীমাংসা দর্শনের আলোচনার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। চালুক্যদের সময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু অহিংসা মন্ত্র রূপান্তরিত হইয়া জৈনধর্ম্মের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করে। সেই জন্য দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম জৈন ধর্ম্মেরই সহিত প্রকৃতপক্ষে যুঝিতেছিল। বৈদিক যজ্ঞের পুনরভ্যুদয়ের সহিত শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, সূর্য্য, দেবী, স্কন্দ প্রভৃতি পৌরাণিক দেবগণের পূজার্চ্চনা আরম্ভ হইল এবং তাঁহাদের উদ্দেশে মন্দির রচিত হইতে লাগিল। চালুক্য বংশের আর একটী শাখা ছিল তাহারা পূর্ব্ব-চালুক্য নামে অভিহিত হইত। তাহারাও শিবোপাসক ছিল এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আচার বিধি পালন করিত। ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেন, “বাদামীর চালুক্যদের শাসনকালে বৌদ্ধ ধর্ম্ম যদিও অনেকের সাহায্য প্রাপ্ত হইত, তথাপি তাহার পতন সুরু হইয়াছিল এবং ক্রমেই লুপ্ত হইতেছিল। তাহার নাম ধীরে ধীরে জৈনধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম কর্ত্তৃক অধিকৃত হইতেছিল। যজ্ঞীয় বিধির নানা গ্রন্থ সঙ্কলিত ও প্রণীত হইতেছিল। হিন্দু ধর্ম্মের পৌরাণিক দিকটা ক্রমেই লোকপ্রিয় হইয়া উঠিতেছিল, এবং সর্ব্বত্রই বিষ্ণু শিব ও অন্যান্য পৌরাণিক দেবদেবীর মন্দির গড়িয়া উঠিতে ছিল।”

রাষ্ট্রকূট নৃপতিগণ চালুক্য বংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন। তাঁহারাও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রসার বিস্তার কল্পে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন। ঐ বংশের নৃপতি প্রথম কৃষ্ণরাজ শৈবধর্ম্মান্দোলনের এক প্রকাণ্ড পাণ্ডা ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে এলুরার কৈলাসমন্দিরের গঠন আরম্ভ হয় বলিয়া তাহা স্মরণীয় হইয়া আছে।

এস্থলে স্মরণ করিতে হইবে যে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকে শৈবধর্ম্মের উত্থানকল্পে অনেক কায করিতে হইয়াছিল। সকলেই জানেন যে পূর্ব্বে সহস্র সহস্র বৌদ্ধ সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে জাতির বিচার ছিল না; সুতরাং ভিক্ষুর সংখ্যা বাড়িয়া বৌদ্ধধর্ম্মের পরিধি বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। সেই অনুকরণে শঙ্করাচার্য্যও সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের প্রবর্ত্তন করেন। সেই সঙ্ঘে প্রবেশ করিবার অধিকার সকল জাতিরই ছিল। এই প্রকারে তিনি হীনযান ও মহাযান উভয় সম্প্রদায়কেই প্রবল আঘাতে বিচূর্ণ করিয়া দেন। এই সন্ন্যাসীগণই হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিয়া তাহাকে লোকপ্রিয় করিয়া তুলিলেন। হ্যাভেল সাহেব বলেন, “শঙ্করাচার্য্যের প্রচার কার্য্য এতদূর সফল হইয়াছিল যে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পর বৌদ্ধধর্ম্ম সমগ্র দক্ষিণ দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া সিংহলে আশ্রয় লাভ করিতে বাধ্য হইয়া হইয়াছিল। ভগবদ্গীতানুমোদিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত শঙ্করের কোন বিরোধ ছিল না। সেই বৈষ্ণবধর্ম্মে ক্রমে উত্তর ভারতে মহাযান বৌদ্ধ

মতকে গ্রাস করিয়া আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল। অবশেষে মহাযান বৌদ্ধমত চীন ও জাপানে গিয়া বাঁচিল। মুসলমানগণ তৎপরে নিষ্ঠুরভাবে বৌদ্ধবিহার জ্বালাইয়া ধ্বংস করিয়া দিয়া সঙ্ঘের মূলচ্ছেদ করিলেন। শেষ অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া এইরূপে ঘটিল। বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ সম্পত্তি হইয়া একান্ত অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। এখন শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের সামাজিক দিকটাও লইলেন। বৌদ্ধ সঙ্ঘের আদর্শে সন্ন্যাসীর সঙ্ঘ গঠিত হইল, জাতিবিচার তিরোহিত হইল। কাযেই বৌদ্ধধর্ম্মের আন্তর বস্তু হিন্দুধর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বাহ্যতঃ বিলীন হইলেও রহিয়াই গেল। সেইজন্য তিনি বলেন—

"So that it is more in a material than a spiritual sense that Buddhism became extinct in India." অন্য এক স্থলে তিনি বলেন, "The decline of Buddhism and its final disapperance from India as a separate religious cult were the consequences of a gradual process of intellectual absorption rather than the result of any outside pressure. The whole logical position of Sakyamuni's philosophy was shifted and brought closely in line with that of Brahminical schools directly the Buddha himself was recognised as the absolute God—or as a personal God—and there is no doubt that this became the authorised teaching of the Sangha very soon after his death. The development of Mahayana teaching made the difference between Buddhism and Brahmanism no greater than that which separated one Brahmanical school from another, and though the Sangha as an organisation remained in India until it was finally broken up in the Mahommedan invasions, its intellectual supremacy was already superseded in the beginning of the Gupta era by the new schools of Kshatriya and Brahman philosophy."

পূর্ব্বেই ইহার মর্ম্ম দেওয়া হইয়াছে, অতএব এখানে আর অনুবাদ দিলাম না।

(ভাদ্র) ১৩২৮ সালের "ভারতী"তে "শাক্যসিংহের ধর্ম্মের পরিণতি" প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি যে মহাযানতন্ত্রের স্বাভাবিক ধর্ম্মমতের সহিত কাপিল সাংখ্যের অনেকটা ঐক্য আছে। সেইরূপ মহাযানতন্ত্রের ঐশ্বরিক ধর্ম্মমতের সহিত ব্রাহ্মণদের সেশ্বর সাংখ্যের ঐক্য আছে। বৌদ্ধদের আদি বুদ্ধই হইতেছেন হিন্দুদের পরমেশ্বর। শ্রীযুক্ত নরিমান প্রণীত Literary History of Sanskrit Buddhism নামক গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে Sir R. C. Temple, Indian Antiquaryতে (March .1921, p. 96) লিখিতেছেন—

"প্রকৃত কথা বলিতে হইলে 'এখন বুদ্ধ দেবতারও উচ্চে, সকল দেবতন্ত্রের উপরে, তাঁহার উচ্চতার পরিমাণ করা যায় না, তিনি অসংখ্য যুগ যুগ ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন, এবং তিনি অনন্তকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবেন।" তাহার পর বলিতেছেন, "এই যে ভাব তাহা কি পরবর্ত্তী যুগে হিন্দুগণ পরমেশ্বর সম্বন্ধে পোষণ করেন নাই?"

বাস্তবিক পক্ষে আমরা স্বয়ম্ভু আদিবুদ্ধ, পরিত্রাতা অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী ও বোধিসত্ত্বগণের কল্পনায় হিন্দু ভাবই লক্ষ্য করি। বৌদ্ধ যোগাচার সম্প্রদায়ের নাম কত হিন্দু হিন্দু ঠেকে! এই সম্প্রদায় হিন্দু সাংখ্যদর্শন মত, বৈশেষিক দর্শন মত, পাশুপত এবং অন্যান্য দার্শনিক ও ধর্ম্ম সম্প্রদায় ঘটিত নানা হিন্দুমতের ব্যাখ্যা করিয়াছে। মহাযানতন্ত্রের শেষ অবনতি দেখিতে পাই যখন ইহার ভিতরে হিন্দুর "শক্তি" (দেবী শক্তি) প্রবেশ করিয়াছে। তখন দেখি যে পরিত্রাণকারিণী "তারা" অবলোকি-

তেশ্বরের (স্ত্রী) শক্তি হইয়াছেন ও তাঁহার উদ্দেশে নানা স্তোত্র রচিত হইয়াছে। বিষ্ণু ও শিব-স্তোত্রের সহিত এই সব স্তোত্রের কোনই পার্থক্য নাই। তাহার পর দেখিতে পাই "ধারণী"। এইগুলি নাকি নানামতের চুম্বক সারসংগ্রহ, কিন্তু তাহা দুর্ব্বোধ্য "মন্ত্র" ভিন্ন আর কিছু নহে; তাহার পর দেখিতে পাই তন্ত্র —অর্থাৎ আচার, গ্রন্থ। বৌদ্ধ ধর্ম্মের কি অবনতিই না ঘটিয়াছিল! এই সমস্তই সাম্প্রদায়িক হিন্দুধর্ম্মের অনুকরণ। শ্রীযুক্ত নরিমান ঠিকই বলিয়াছেন যে ডাইনতন্ত্রের সহিত মহাযান তন্ত্রের মিলন করিবার উদ্দেশ্যে এই সব তন্ত্রের ব্যবহার হইয়াছিল; এবং এই প্রকারে দার্শনিক হিন্দুধর্ম্মের সহিত animism (জড় চৈতন্যবাদ) ও লিঙ্গপূজার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল।

অধ্যাপক গ্রুণওয়েডেল তাঁহার Buddhist Art in India নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, মহাযানতন্ত্রে হিন্দুদেবদেবী গৃহীত তো হইয়াইছিলেন, অধিকন্তু তাঁহারা বৌদ্ধ পুরাণোক্ত দেবতন্ত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইন্দ্র অথবা শক্র হইলেন সত্যমনু ও বজ্রপাণি। ব্রহ্মার গুণাবলী মঞ্জুশ্রীতে বর্ত্তিল। বিষ্ণু অথবা পদ্মনাভ হইলেন পদ্মপাণি। শিব হইলেন বিরূপাক্ষ। গণেশ হইলেন বিনায়ক ও দৈত্য বিনত। বাহুল্যেনালম্।

বিরূপাক্ষ

হ্যাভেল সাহেব তাঁহার "Ideals of Indian Art"এ বলিয়াছেন—"Buddhism as a distinct sect disappeared from the land of its birth only because in the general evolution of Hindu philosophy its doctrines merged into the main current of Aryan thought, as the river Jamuna is lost when it unites with the waters of the Ganges."

—যমুনা যেমন গঙ্গায় মিশিয়া স্বীয় অস্তিত্ব হারাইয়াছে, সেইরূপ হিন্দুদর্শনের ক্রম-বিবর্ত্তনে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশিষ্ট সম্প্রদায়হিসাবে অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়া আর্য্যচিন্তার প্রধান :ধারায় আপনাকে মিশাইয়া দিয়াছে।

"But the main cause was the general almost insensible assimilation of Buddhism to Hinduism, which attained to such a point that often it is really imposible to draw a line between the mythology of the Buddhists and those of the Hindus."

শ্রীকালীপদ মিত্র।

কাণপুরে দুইদিন

গত ১৩২৭ সালের জন্মাষ্টমীর ছুটি উপলক্ষ্যে কাণপুরে যাওয়া মনস্থ করিয়াছিলাম। কাণপুর সহরের নাম বহুকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। অতি বাল্যকালেও শশীবাবুর ভূগোল পরিচয়, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অন্যান্য অনেক স্থানের সহিত কাণপুরের সঙ্গেও পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল। এখনও মনে আছে সেই ৮।৯ বৎসর বয়সে রাত্রি জাগিয়া ভূগোলপরিচয় হইতে "বস্তি, মিহিন্দাবল, বস্তি, ঝান্সি—মৌ, ঝান্সি হনিরপুর রাট—হমিরপুর" মুখস্থ করিয়াছি। তখন স্বপ্নেও মনে করি নাই যে কখনও এই সকল স্থানের সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত হইতে হইবে। যাহা হউক, এই প্রদেশে অনেকদিন হইল আসিয়াছি বটে, তবে এ প্রদেশের সহর সকলের সঙ্গে পরিচিত হইবার সৌভাগ্য অল্পই ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আমার পরমশ্রদ্ধেয় প্রিয়বন্ধু রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কাণপুর গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের হেডমাষ্টার। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ-সুখলাভের এবং সঙ্গে সঙ্গে কাণপুর সহরটিও দেখিয়া লইবার ইচ্ছা যুগপৎ আমাকে কাণপুর যাত্রায় উদ্বুদ্ধ করিল।

যেদিন জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে ছুটি হইয়া গেল, সেইদিনই সন্ধ্যাকালে আমি হঠাৎ যাত্রার অভিলাষ ব্যক্ত করিলাম। ট্রেণের তখন প্রায় এক ঘণ্টা মাত্র দেরী। বাড়ীতে সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল! হঠাৎ 'তড়ি ঘড়ি' এ কিরূপ যাত্রা? আহারীয় বস্তু কিছুই প্রস্তুত নাই, কি খেয়ে যাওয়া হবে? আর গোছানও তো কিছু হয় নাই। আমি হাসিয়া বলিলাম, বৈকালের জলযোগ ভালমতই হইয়াছে; এখন দুধটা খেয়ে গেলেই চলিবে। গোছান ত পাঁচ মিনিটের কায! এই বলিয়া দু'খানি কাপড়, চাদর এবং ২।১টা জামা, একখানা 'কাণপুরি হলদে কম্বল' (যাকে বিলাতী কম্বল বলা হয়) জড়াইয়া গামছা দিয়া বাঁধিয়া লইয়া আমি প্রস্তুত হইলাম। ষ্টেসনে যাইবার জন্য গাড়ী কি একা পাওয়া গেল না, বেশী বিলম্ব করিলে গাড়ী ছাড়িয়া যাইবে এই আশঙ্কায় ভৃত্যের নিকট পোঁটলাটি দিয়া পদব্রজেই ষ্টেসনে রওনা হইলাম। আমি পথ চলিতে নটবহরের হাঙ্গামা কিছুই করি না, যত কম সরঞ্জাম লইয়া পারি, তাহাই করি; বাক্স পেটারার সঙ্গে কোনই সম্বন্ধ রাখিনা; সুতরাং আমার যাত্রার জন্য বিশেষ কোনও আয়োজনই করিতে হয় না। ষ্টেসনে পৌছিয়া একখানি টিকিট সংগ্রহ পূর্ব্বক গাড়ীর উদ্দেশ্যে চলিলাম। শ্রীযুক্ত অঘোর বাবুর কনিষ্ঠ ভগিনীপতি কালী বাবুও এই গাড়ীতেই কাণপুর যাইতেছেন, তাঁহাকে অনায়াসেই খুঁজিয়া বাহির করিলাম এবং তাঁহার সঙ্গে একত্র বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই যাওয়া যাইবে ভাবিয়া বিশেষ আনন্দ বোধ করিলাম। হঠাৎ একটা বিষাদের কারণও উপস্থিত হইল। পকেটে হাত দিতেই দেখিলাম, দিব্য চক্ষুটি (অর্থাৎ চসমা যোড়া) তাড়াতাড়িতে ফেলিয়া আসিয়াছি! যাঃ! একেবারে পাঠকার্য্য বন্ধ! আর এমন সময় নাই যে চস্‌মা আনাইয়া লই!

সুতরাং "যাহার প্রতীকারের উপায় নাই তাহা সহ্য করিতেই হইবে" এই সনাতন উপদেশ স্মরণ করিয়া সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করিলাম।

কালীবাবু ছেলেপিলেদের জন্য আনারস, পেয়ারা ইত্যাদি ফল এবং বাসার জন্য কতকগুলি লাউ কুমড়ার এবং পুঁই শাকের ডাঁটা লইয়া যাইতেছিলেন। বৈদ্যবাটী এবং কাবুল কান্দাহারের অপূর্ব্ব সম্মিলন তাঁহার ঝুড়ির মধ্যে ঘটিয়াছিল। যাহা হউক বি-এন-ডব্লিউ রেলের সনাতন নিয়ম অনুসারে নির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষা অর্দ্ধঘণ্টা কাল নিষ্প্রয়োজন বিলম্ব করিয়া গাড়ী ধীর মন্থর গতিতে ষ্টেসন প্লাটফরমের মায়া কাটাইয়া যাত্রার পথে অগ্রসর হইল। কিন্তু প্লাটফরমের সঙ্গে তাহার প্রেমটা এত ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিল যে, গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে গিয়া শকটিকা সুন্দরীর দশা, পুরাকালের শকুন্তলার মত হইয়া পড়িল বোধ হয়—"গচ্ছতি পুরঃ

শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।" তাহার ফলে এক মিনিটের মধ্যেই তিনি শকুন্তলাকেও পরাস্ত করিয়া দিলেন, কারণ শকুন্তলা পিছু তাকাইতে তাকাইতে ও মনটাকে কোন ক্রমে সামলাইয়া লইয়া চলিয়াই গিয়াছিলেন, রাজার নিকট আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। কিন্তু গাড়ী সুন্দরী তাহা পারিলেন না, তিনি আবার প্লাটফরম-সম্ভাষণে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং তাঁহার গর্ভস্থ আমাদিগকে এইটুকু যাত্রার 'ফাউ' স্বরূপ প্রদান করিলেন। শেষে প্লাটফরম ভায়া বোধ হয় "যেতেই যখন হবে, কেন আর বৃথা তবে, ফিরে ফিরে এসে সই বাড়াও যাতনা" ইত্যাদি বলিয়া সুন্দরীকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া পুনরায় পাঠাইয়া দিলেন। তখন সুন্দরী অভিমানে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া, মানভরে অঙ্গ দোলাইয়া সেস্থান ত্যাগ করিলেন।

আমরা ইহাদের এই মান অভিমানের অভিনয়টুকু বেশ একটু উপভোগ করিলাম এ কথা না বলিয়া পারি না। কালীবাবুর দেহখানি একটু স্থূল। তিনি এক খানি বেঞ্চে শয্যা রচনা করিয়া তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁর সঙ্গে বেশী কথাবার্ত্তা বলিয়া তাঁর নিদ্রাসুখের ব্যাঘাত করিয়া ব্রাহ্মণের ক্ষুণ্ণ মনের অভিশাপ লাভ করাটা ভাল মনে হইল না। সুতরাং আমি জানালার ধারে বসিয়া মুখ বাহির করিয়া দিয়া সেই অন্ধকার রজনীতে 'তারাদর্শক' সাজিলাম। রাত্রিতে রেলে ভ্রমণ করিতে সহজে নিদ্রার কোলে বিরাম লাভ করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। আমি এইরূপে জানালার ধারে বসিয়া নীরব নিস্তব্ধ অন্ধকারাবগুণ্ঠিতা প্রকৃতিবধূর শোভা দেখিতে বড় ভালবাসি।

চারিদিক নিস্তব্ধ। উপরে নীরব নীলাকাশে নক্ষত্ররাজি নীরবে মিটি মিটি অপাঙ্গ দৃষ্টিতে হাসির লহর খেলাইয়া দিতেছে। নিম্নে প্রকৃতিরাণী কৃষ্ণাস্তরণে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া অঘোরে নিদ্রা যাইতেছেন, কচিৎ কখনও দূরস্থিত গ্রামের কোন গৃহের আলোকরশ্মি সে অন্ধকার আবরণের মধ্যে তীরের ন্যায় প্রবিষ্ট হইতেছে। এই নীরবতার মধ্য দিয়া রেলগাড়ী আপনার ঘর্ঘরশব্দে আপনাকে চমকিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল, আমাদের অবস্থাও তো এই রেলগাড়ীরই মত। সেই অনন্তকাল হইতে আমার এই আত্মা, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড-প্রান্তরে ক্রমাগত ছুটিতেছে, আপনার কর্ম্মকোলাহলে আপনি বিভোর হইয়া, মধ্যে মধ্যে এক এক ষ্টেসনে একটু একটু বিশ্রাম করিয়া, আবার ছুটিতেছে। এ বিশ্বপ্রকৃতির মহাশূন্যের মধ্য দিয়া এই যে ছুটাছুটি, ইহার বিরাম কোথায়? আমার গাড়ী তো কাণপুরে পৌছিবে—তাহার লক্ষ্যস্থান প্রাপ্ত হইবে, তাহার ছুটাছুটির শেষ হইয়া যাইবে; কিন্তু এ আত্মার ছুটাছুটির শেষ কোথায়? কোথায় সেই কাণপুর, যেখানে পৌছিতে পারিলে আর ছুটিতে হইবে না, এঞ্জিন থামাইয়া আমাকে চিরতরে বিশ্রাম করিতে দিবে?

পথে এইরূপ চিন্তাতে আমি অভিভূত হইয়া নিদ্রার কথা ভুলিয়া যাই; অনেক সময় বসিয়া থাকিতে থাকিতেই রজনী প্রভাত হইয়া যায়, ঘুমাইবার কথা মনেই থাকে না।

বি-এন্-ডব্লিউ রেলের এঞ্জিনের যতটুকু শক্তিসামর্থ্যে কুলায়, গাড়ী সেইরূপ জোরেই যাইতেছিল। মধ্যে মধ্যে ষ্টেসনে অনেকক্ষণ দাঁড়াইতেছিল। গোন্ড্রা ষ্টেসনে কিছু বেশীক্ষণ অপেক্ষা করে। তারপর মানকাপুর ষ্টেসনে অধিকক্ষণ দাঁড়ায়। মানকাপুর ষ্টেসনে হইতে অযোধ্যা যাইবার লাইন সরযূ নদীর তীর পর্য্যন্ত গিয়াছে। তথা হইতে সরযূ, বর্ষাকালে ষ্টীমারে এবং অন্যসময় ভাসমান সেতুর সাহায্যে পার হইয়া, পুণ্যভূমি অযোধ্যাতে পৌছান যায়।

গাড়ী মানকাপুর ছাড়িয়া গেলে, আমিও নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ীর দোলা খাইতে খাইতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

অতি প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। আমি উঠিয়া বসিলাম। কোথায় আসিয়াছি দেখিবার জন্য মুখ বাহির করিয়াই দেখিলাম, দূরে লক্ষ্ণৌ সহরের গম্বুজ আদির চূড়া দেখা যাইতেছে। আমার সম্মুখের বেঞ্চে একটি

মুসলমান ভদ্রলোক বসিয়া আছেন, তিনি আমার নিদ্রিতাবস্থায় কোনও ষ্টেসন হইতে উঠিয়াছেন। আমি তাঁহার দিকে তাকাইতেই তিনি অতীব ভদ্রতা এবং স্বভাবসিদ্ধ আদবকায়দার সহিত আমাকে 'তস্‌লিম' করিয়া, আমার সুনিদ্রা পক্ষে কোন 'তকলিফ্‌' হইয়াছে কি না এবং তিনি এ কামরায় উঠিয়া আমার সুখ স্বচ্ছন্দতার কোন হানি করিয়াছেন কি না, তাহা পরিস্কার মিঠা উর্দ্দুতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার এরূপ বিনীত এবং ভদ্র ব্যবহারে আমি বড়ই মুগ্ধ ও আপ্যায়িত হইলাম। আমার যে নিদ্রার কোন বাধা হয় নাই, এবং তাঁহার ন্যায় সম্ভ্রান্তব্যক্তি যে আমার কামরাতে উঠিয়া তাঁহার সহিত আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য দান করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, ইহাই তাঁহাকে সবিনয়ে আমার ভ্রমসঙ্কুল উর্দ্দুতে নিবেদন করিলাম। তাঁহার মত উর্দ্দুতে এবং সেইরূপ কেতাদোরস্ত ভাবে কথা বলা আমার অসাধ্য। আমি কোথায় 'তস্‌রিফ্‌' লইয়া যাইতেছি এবং এই গরমে এত 'তকলিফ্‌' বরদাস্ত করিবার কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং আমার 'দৌলতখানা' বঙ্গদেশের কোন সৌভাগ্যবান্‌ নগরে,খাস্‌ কলিকাতাতে, কিংবা সেখান হইতে আরও দূরে তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে আমি আমার গন্তব্যস্থান এবং গমনপ্রয়োজন ব্যক্ত করিয়া আমার 'গরীবখানার'ও পরিচয় দিলাম। তাঁহাকে জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে তাঁহার 'গরীবখানা' লক্ষ্ণৌ সহরেই। তিনি কোন কাযকর্ম্ম করেন না, 'থোড়িসি জমিন্দারী' আছে তাহাতেই কোনরূপে দিন-গুজরান হয়; তাঁহার দুই পুত্র, একজন হায়দ্রাবাদ নিজাম রাজ্যে ৫০০৲ বেতনে কায করেন, অন্যজন বিলাতে ব্যারিষ্টার হইতে গিয়াছেন, শীঘ্রই ফিরিবেন। আজকালকার দেশের অবস্থার কথাও হইল—সবজিনিস দুর্ম্মূল্য, কি করিয়া ইজ্জৎ বাঁচাইয়া 'জান' বাঁচান যায় সেইটাই বিষম সমস্যা। 'সরিফ্‌' গণের 'জান' অপেক্ষাও যে 'ইজ্জৎ' বড় ইত্যাদি অনেক কথা তিনি বলিলেন। আমার সহিত সৌজন্য করিবার জন্যই হউক বা অন্য কারণেই হউক, বঙ্গদেশ এবং বাঙ্গালীগণের তিনি যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং লক্ষ্ণৌ প্রবাসী অনেক বাঙ্গালীর সঙ্গে তাঁহার যে বিশেষ হৃদ্যতা আছে তাহাও জানাইলেন। অবশেষে একবেলার জন্যও লক্ষ্ণৌয়ে নামিয়া তাঁহার গরীবখানা পবিত্র করিতে অনুরোধ করিলেন। আমিও সবিনয় ধন্যবাদ জানাইয়া সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলাম।

এইরূপ কথাবার্ত্তাতে লক্ষ্ণৌ ষ্টেসনে গাড়ী উপস্থিত হইল। ভদ্রলোক নানারূপ আপ্যায়ন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ষ্টেসনে তাঁহাকে লইবার জন্য তাঁহার যে ভৃত্যবর্গ আসিয়াছিল, তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ আদি দেখিয়া এই ভদ্রলোটিকে বিশেষ সমৃদ্ধব্যক্তি বলিয়াই বোধ হয়।

ইতিমধ্যে কালীবাবু উঠিয়া বসিয়াছিলেন। আমরা উভয়েই ষ্টেসনে অবতরণ কবিয়া মুখহাত ধুইয়া লইলাম।

গাড়ী হইতে লক্ষ্ণৌ সহরের অট্টালিকা-সম্পদ দেখিয়াই তৃপ্ত হইতে হইল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া এই বিলাস লীলা নিকেতন সহরের শোভা সমৃদ্ধি দর্শন আর এবার ভাগ্যে ঘটিল না। গাড়ী ক্রমে কাণপুরের দিকে অগ্রসর হইল। লক্ষ্ণৌ হইতে কাণপুর অধিক দুর নহে—দুই তিন ঘণ্টার পথ।

ক্রমে কাণপুরের সন্নিকট গঙ্গার পুলের উপর উঠিলাম। পুলটি বেশ। এখন ভরা গঙ্গা খরস্রোতা; তীব্র বেগে আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন; সাগরগামিনী গৈরিকধারিণী সুরধুনীর এ বেশ বড় সুন্দর লাগিল; কিন্তু গ্রীষ্মকালে শীর্ণকায়া বালুকাপঞ্জরা গঙ্গার বিশীর্ণা মূর্ত্তি হৃদয়ে বড়ই বেদনা দেয়।

যাহা হউক, ক্রমে কাণপুর ষ্টেসনে গাড়ী পৌছিল। এটা ছোট ষ্টেসন্‌, এখানে O. & R. এবং B. N. W. দুই লাইনেরই ষ্টেসন একত্র আছে। E. I. R. এর ষ্টেসনকে বড় ষ্টেসন বলে। ষ্টেসনের নিকটই ট্রামের রাস্তা। সবুজ রঙে চিত্রিত ছোট ছোট ট্রামের গাড়ীগুলি বৈদ্যুতিক বলে চালিত।

ষ্টেসনের ওভারব্রিজ পার হইয়া পান্থশালাতে উপনীত হইলাম; তাহার কাছেই এক্কা এবং ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডা। তথা হইতে একখানি এক্কা পাঁচ আনাতে ভাড়া করিয়া, কালী বাবু ও আমি কুমড়ো এবং পুঁই ডাঁটার ঝুড়ি সমেত তাহাতে আরোহণ করিলাম। ষ্টেসন হইতে সহরে যাইবার রাস্তাটি অতি সুন্দর,—যেমন প্রশস্ত, তেমনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; দুইধারে প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা শ্রেণীতে নানারূপ ব্যবসায়ীর বড় বড় দোকান। মোটর গাড়ীর আড্ডাই কয়েকটা; তারপর হোটেল, সাহেবদের দোকান, ইত্যাদি। বড় ডাকঘরও এই রাস্তারই উপরে।

এই সব দেখিতে দেখিতে ক্রমে কাছারির নিকট উপস্থিত হইলাম। তাহার পরই সিভিল লাইনস্, সেখানেই একটি ছোট বাংলোতে বন্ধুবর রায় সাহেব মহাশয়ের অবস্থিতি। তাঁহার বাসার সম্মুখেই ইংরাজদিগের প্রাচীন সমাধি ক্ষেত্র; এটা এখন আর ব্যবহৃত হয় না। সিপাহি বিদ্রোহের পূর্ব্বেকার মৃত সাহেব বিবিদের সমাধি সমূহই এখানে আছে। ছোট বড় নানারূপ কারুকার্য্য সমন্বিত বহু সমাধিসৌধ যুগ যুগ ধরিয়া নীরবে মৃতের প্রতি জীবিত পরিজনের স্নেহ-প্রেমের সাক্ষী হইয়া দণ্ডায়মান আছে। যাঁহারা এইসব সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া স্বীয় প্রাণপ্রিয় পরিজনগণের স্মৃতি-পূজা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দেহের উপরও বোধ হয় আবার সমাধি নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের এ প্রেমচিহ্ন এ ভক্তির অর্ঘ্য এখনও অটুট আছে, আরও কতকাল থাকিবে!

যাহা হউক, আমরা বন্ধুবরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতেই তিনি অতি সমাদরে ভ্রাতৃস্নেহে আমাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। কালীবাবু নিজের বোঝা লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর স্নান করিবার উদ্যোগ করা গেল। গঙ্গা, বন্ধুবরের বাসার পশ্চাৎ দিকে বলিলেই চলে। গঙ্গাতে স্নান করাই স্থির করিলাম এবং নিকটবর্ত্তী পুলিশ লাইনের ঘাটে কালীবাবু ও আমি স্নানের জন্য গেলাম। সেখানেও গঙ্গার সেই প্রবলা মূর্ত্তি। অতি তীব্র স্রোত তর তর করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। স্নান করিবার জন্য বিশেষরূপে সাবধানতার সহিত জলে নামিতে হইল—পাছে স্রোতের টানে পড়িয়া সুরধুনী মুনিকন্যার অঙ্কগত হইয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হয়।

আমরা স্নান সারিয়া উঠিলাম। ট্রামের লাইন গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত গিয়াছে। সেখানে কয়েকটা বাঁধান ঘাট আছে এবং ঘাটোয়াল পুরোহিতেরা ফুল, বিল্বদল, তিলক, চন্দন, আয়না, চিরুণী ইত্যাদি প্রসাধন দ্রব্য সকল লইয়া শিকারের আশায় বসিয়া আছেন। ঐ প্রশস্ত বারাণ্ডার একটী ফুটপাত রেলিং দিয়া ঘেরা, সেটা শুধু স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহারের জন্য। এ ব্যবস্থাটা আমার কাছে বড় ভাল বোধ হইল। স্নানার্থিনী রমণীগণ নানা সুরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া দলে দলে পূজোপকরণ হস্তে স্নানে চলিয়াছেন, অথবা স্নান করিয়া ছোট ঘটীতে গঙ্গাজল লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, সঙ্গে ছোট ছোট বালক বালিকারা অলকা তিলকা বিভূষিত মুখমণ্ডল হইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়াছে; দেখিয়া মনে বড় আনন্দ পাইলাম।

বাসাতে আসিয়া আহারান্তে বিশ্রাম করা গেল। বন্ধুবরের সহিত নানা বিষয়ক কথোপকথনে দ্বিপ্রহরটা বেশ সুখেই কাটিল। বৈকালে সহরটা একবার দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। কাণপুর বানিজ্যপ্রধান স্থান। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মধ্যে কাণপুর বাণিজ্যসম্পদে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উলেন মিল, কটন মিল ইত্যাদি তো অনেকই এখানে আছে, তাহাদের বিজ্ঞাপন অনেক কাগজেই দেখা যায়। কাকোমি,লালইম্লি ইত্যাদি কারখানাগুলি দেখিলে তাক লাগিয়া যায়। এইরূপ মিল এখানে অনেক আছে। গাড়ীতে এখানে আসিবার সময় গঙ্গার অপর পার হইতে কেবল চিমনীর মাথা সারি সারি দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সব কল ছাড়া বরফের কল আছে, বৈদ্যুতিক কারখানাও আছে। অন্যান্য বাণিজ্যসম্পদও যথেষ্ট। বাজারে গেলে একদিকে এক এক জিনিসের

আড়ং। যেখানে লোহার জিনিস সেখানে লোহাই রহিয়াছে; বাসনের দোকানও তাই, শ্রেণীবদ্ধভাবে অনেকগুলি রহিয়াছে। কাপড়, সতরঞ্চ, কারপেট, রেশমী বস্ত্রাদির দোকানও এইরূপ। চকের বাজারেও টুপির বাজার, জামার বাজার, ইত্যাদি নানা জিনিসের বাজার। ফলের বাজারে নানাজাতীয় ফলই সাজান রহিয়াছে। মসলাদির আড়তে ত বিরাট ব্যাপার; স্তূপাকারে লবঙ্গ, এলাচি ইত্যাদি হইতে জিরামরিচ ধনে প্রভৃতি রহিয়াছে।

তরিতরকারীর বাজার অন্যদিকে। মাছের এবং মাংসের বাজারও পৃথক স্থানে। মাছের বাজারে সর্ব্বদা ভাল মাছ পাওয়া যায় না।

জিনিসপত্রাদির মূল্য বড় আক্রা। আর কাণপুরে বাড়ীভাড়ার কথা শুনিলেই চক্ষুস্থির। বন্ধুবর যে বাড়ীতে আছেন সেটাতে চারিটী মাত্র কুঠারী, আর আশে পাশে ছোট ছোট দু তিনটা বারান্দা কুঠারি, সম্মুখে একটু খোলা যায়গা আছে। ভাড়া ৭৫৲ টাকা! বাণিজ্যপ্রধান স্থান বলিয়াই বাড়ীর ভাড়া এত বেশী। এলাহাবাদ কি কাশীতে ঐরূপ বাড়ী ২০।৩০ টাকায় অনায়াসে পাওয়া যায়।

রাস্তাগুলি অতি সুন্দর। বেশ প্রশস্ত, দু'ধারে বৃক্ষরাজি সমন্বিত, আর বেশ সুন্দর অট্টালিকাশোভিত। তবে বাজারের ভিতর দিককার গলিগুলি অপ্রশস্ত এবং নোংরা।

বাঙ্গালী এখানে অনেক আছেন, তবে তাঁহারা নাকি বাঙ্গালী পাড়াতেই থাকেন। আমি যেখানে ছিলাম সেখান হইতে অনেক দূর বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সুবিধা হয় নাই।

সুপ্রশস্ত মল রোড দিয়া অনেকখানি ঘুরিয়া সেদিনের মত বাসায় ফিরিলাম।

পরের দিন প্রাতঃকালে গবর্ণমেণ্ট স্কুলের নবনির্ম্মিত বাড়ী এবং বোর্ডিং বাড়ী দেখিলাম। উভয় বাড়ীই বেশ সুন্দরভাবে প্রস্তুত হইয়াছে। স্কুলের বাড়ীর হলটী এবং তাহার উপরে দেওয়ালে গ্যালারি আমার বড় ভাল লাগিল। বৈদ্যুতিক পাখা ও আলোর বন্দোবস্ত আছে। এই স্কুল-সংসৃষ্ট বিজ্ঞানশালা, হস্তশিল্প শিক্ষাগার এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত শিক্ষা গৃহাদিও দেখা গেল। স্কুলের সম্মুখে বিস্তৃত মাঠে বালকগণের ক্রীড়াভূমি।

এখানে আরও অনেকগুলি হাইস্কুল আছে—মুস্‌লিম, পৃথ্বিনাথ, কান্যকুব্জ, আর্য্য সমাজীয়, মাড়োয়ারী, ধর্ম্মসভা ইত্যাদি। মিশনারীদের ক্রাইষ্ট চার্চ্চ কলেজ বাড়ী বেশ সুন্দর। দয়ানন্দ এবং এংলো বেদিক কলেজও নূতন স্থাপিত হইয়াছে। সনাতন ধর্ম্মসভার পক্ষ হইতে একটি বৃহৎ কলেজ প্রধানতঃ বাণিজ্য শিক্ষার জন্য স্থাপিত হইবার কথা তখন হইতেছিল। ব্যবসায়সংক্রান্ত আরও অনেক স্কুল—যেমন মুচির কায শিক্ষা দিবার স্কুল, রঞ্জনশিল্প শিক্ষার স্কুল ইত্যাদিও আছে। শ্রীমতী এনি বেসান্ত প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষাপীঠের অধীন জাতীয় বিদ্যালয়ও এখানে একটি আছে। শুনিলাম তাহাতে শিক্ষকগণ বিশেষরূপ যত্নের সহিত শিক্ষা দিয়া থাকেন।

সিপাহি বিদ্রোহের সময়কার সেই কাণপুরের কূপ দেখার অনুমতিপত্র না পাওয়াতে তাহা দেখা হইল না। ভিক্টোরিয়া পার্ক এবং তাহার মধ্যে টাউন হল ও ক্লক টাওয়ার দেখিবার জিনিস। পার্কটি সুবিস্তৃত এবং নানাবিধ বৃক্ষলতা গুল্মাদিতে অতি সুদৃশ্য। এ স্থানটিতে বেড়াইতে অথবা বৃক্ষছায়ায় কাষ্ঠাসনে বসিয়া থাকিতে আমি বড় আনন্দ পাইতাম।

প্রাতঃকালে এই সব দেখিতে দেখিতে বেলা হইয়া গেল; একবার বাজারটা ঘুরিয়া বাসায় ফিরিলাম।

ব্যবসার জায়গায় যেরূপ হয়—এখানকার লোকজন সকলেই যেন বড় ব্যস্তসমস্ত, তাড়াতাড়ি চলাফেরা করিতেছে। সময়ের মূল্য তাহারা যেন খুব বোঝে এবং ইহার প্রত্যেক দণ্ড পলের সদ্ব্যবহার দ্বারা অর্থ উপার্জ্জনের পথ পরিষ্কার করে।

বৈকাল বেলায় আর কোথাও বেশীদূরে যাওয়া হইল না। কৃষিবিদ্যালয় এবং আদর্শ কৃষিক্ষেত্র অনেক দূরে বলিয়া আর দেখা ঘটে নাই। সাহেব মহলের বাড়ী

ঘরগুলি—যেমন সর্ব্বত্র হইয়া থাকে—তেমনই। তাঁহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যপ্রিয়ত্ব অসুন্দর স্থানকেও সুন্দর নয়নাভিরাম করিয়া রাখিতে পারে।

অব্যবসায়ী আমি, এ ব্যবসায়ের স্থানে কলের ধুম, পথের ধুলা এবং উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা ছাড়া আর কিছু দ্রষ্টব্য বড় পাইলাম না। মোটামুটি কাণপুরের একটা ধারণা এই দুই দিনে যাহা করিতে পারিয়াছিলাম তাহার একটু পরিচয়মাত্র দিলাম। রাত্রিতে বন্ধুবরের আতিথ্যে সৎকৃত হইয়া, বড় ষ্টেশনে গিয়া E. I. R. রেল ধরিয়া এলাহাবাদে যাইবার জন্য উঠিয়া পড়িলাম। কাণপুরের রেল ষ্টেশনটি বেশ বড়। ভাগ্যক্রমে আমার গাড়ীর মধ্যে আরও ৩।৪টী এলাহাবাদ-যাত্রী বাঙ্গালী পাইয়া বড় সুখী হইলাম। তাঁহাদের মধ্যে একজন অতি সুকণ্ঠ ছিলেন, তিনি কয়েকটী গান করিয়া আমাদের সকলের চিত্তরঞ্জন করিলেন। তার পর নানা কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে কখন যে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছি তাহা জানিতেও পারি নাই।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

অন্তিম-শয্যায়

("Strew on her roses, roses"...*M. Arnold.*)

শুধু ঢাল গোলাপ কেবল,
কাঁটাগুলি ভেঙ্গে দাও তার!
প্রাণারাম শান্তির শয়নে
ঘুমান মা-জননী আমার!
ললাটে রাখিয়া হাত শুধু
ভাবি আমি আজি অনুক্ষণ,
জীবনের অশ্রান্ত দোলার
কবে পাব বিরাম এমন?
হাসি মার আলো করেছিল
ধরার এ কান্নাভরা বুক,
কি মাধুরী ঝরিত হাসিতে,
সে হাসিতে কি অমল সুখ!
প্রাণ তাঁর শান্তি চেয়েছিল,
ধরা ভাল লাগে নাই আর,
—বুকের সে স্পন্দন টুকুও
থেমে গেছে—স্তব্ধতা অপার!
রূপ রস গন্ধ স্পর্শময়ী
ধরণীর বক্ষ মাঝখানে
সুন্দর সে সুবিমল প্রাণ
ডুবে ছিল আনন্দেরি গানে।
ধরার দুখের বোঝা হ'তে
চেয়েছিলে শান্তি অবিরাম,
শান্তি তাই এসেছে এখন
শীতলতা-চিরপ্রাণারাম।
সরল সে উদার প্রাণের
থেমে গেছে হাসি অশ্রুধার
পূর্ণানন্দ, মৃত্যু-পরপারে
লভিয়াছ জননী আমার!
স্বর্গমুখী ক্লান্ত আত্মাপাখী
ছেড়ে গেল সোনার পিঞ্জর,
মরণের বিপুল গভীরে
মা আমার! হয়েছ অমর।
জীবনটী ভরা শুধু ছিল
নিষ্কণ্টক আনন্দে অপার
তাই ঢাল গোলাপ কেবল,
কাঁটাগুলি ভেঙ্গে দিও তার।

শ্রীনির্ম্মলা বসু।

প্রবাসীর পত্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৩০শে জুলাই—

ছুটীটা একবারে সমস্ত নষ্ট না করিয়া লণ্ডনে বসিয়াই যাহাতে এতটা সময় কাযে লাগাইতে পারি, তাহার চেষ্টা করিলাম। লণ্ডন ত কেবল একটা সহর নয়—একটা দেশ; মহাদেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিজ-লণ্ডন-বাসী সহরের সকল স্থান চেনেই না। যাহারা "তীর্থযাত্রী" তাহারাও ইহার বিশেষ পরিচয় সহজে পায় না। নিবিড় অরণ্য অথবা অন্ধকার ভূমিগর্ভের তথ্যও বরং সহজে পাওয়া যায়, কিন্তু লণ্ডনের নয়। কাযেই আমি এত অল্পদিনে এ অদ্ভুত সহরের সমস্ত সন্ধান পাইব—ইহা সম্ভব নয়।

সকালে আজ "প্রিভি কাউন্‌সিল" আদালতের বিচার দেখিতে গেলাম। পথে Horse Guardsএ (হর্স গার্ডস) পাহারা বদলী দেখিলাম। মহাসমারোহে প্রথম পাহারা বদলী হয়। হর্স গার্ডদিগের অশ্ব, পরিচ্ছদ, বর্ম্ম, অস্ত্রশস্ত্র সবই সুন্দর; লাল সাদা চামর দেওয়া বড় বড় শিরস্ত্রাণের উপর সকলেরই দৃষ্টি পড়ে। প্রত্যহ এই "পাহারা বদলী"র অভিনয় বহু অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া অত্যন্ত ধূমধামে অনুষ্ঠিত হয়, এবং তাহা দেখিবার জন্য প্রত্যহই রাস্তায় ভিড়ও যথেষ্ট হয়।

আজ প্রিভিকাউন্‌সিল আদালতে লর্ড হ্যাল্‌ডেন, লর্ড কারসন, লর্ড বেড, ক্যানাডা উপনিবেশ হইতে আগত মামলার বিচার করিতেছিলেন। ভারতবর্ষের সব আপীল বিচার শেষ হইয়া গিয়াছিল। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার আপ্‌জন (Upjohn) বক্তৃতা করিতেছিলেন।

ল-কোর্টস্‌এ প্রধান বিচারপতি লর্ড জষ্টিস্ লরেন্স, জষ্টিস্ ব্রে, জষ্টিস্ শাঙ্কির নিকট অদ্ভুত এক মোকদ্দমা হইতেছিল। লণ্ডন কাউণ্টি কাউন্‌সিল (অর্থাৎ মিউনিসিপ্যালিটি) হইতে যে সকল ট্যাক্স মঞ্জুর হইয়াছে, Poplar নামে পাড়ার (Burrough) কমিটি তাহা প্রচার ও আদায় করিতে অস্বীকৃত, এই জন্য উহার মেম্বরদের কেন জেল হইবে না, এই বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য প্রধান আদালতের সাহায্য প্রয়োজন। শ্রমজীবিগণের মুখপাত্র ল্যান্‌স্‌বরী সতেজ বক্তৃতায় সাধারণের পক্ষের কথা বিশদভাবে বলিলেন। ব্যারিষ্টার না দিয়া তাঁহারা নিজেরা নিজের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। একজন মহিলা-মেম্বরও বক্তৃতা করিলেন। এই সকল মেম্বরকে উৎসাহিত করিবার জন্য সেই পপ্‌লার পাড়ার প্রায় ২০০০ করদাতা, বিজয়ী বীরের পতাকা-অনুসরণের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে আদালতের দরজা পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, পরে পুলিস তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। সরকারী পক্ষের তীব্র সমালোচনায় সতেজ বক্তৃতা ল্যান্সবরী পক্ষে কোন কাযে লাগিল না। রায় বাহির হইল যে, চৌদ্দ দিনের মধ্যে লণ্ডন কাউন্‌সিলের আদেশ মত কায না হইলে মেম্বর মহাশয়দিগকে জেলে যাইতে হইবে। ব্যাপার নূতন; কতদূর গড়ায় বলা যায় না। ভারতবর্ষেও এ সকল বিষয়ের সূচনা দেখা যাইতেছে। এই শ্রেণীর দৃষ্টান্তে এবং আইরিশ ও সাউথ আফ্রিকান বিদ্রোহের সাফল্যে ভারতবর্ষের কর্ম্মীদিগের দৃষ্টি ও চিন্তাস্রোত স্বভাবতঃই এই দিকে ধাবিত হইয়াছে।

Shearman, Darling, Seton, Rowlett প্রভৃতি জজদিগের আদালতে ঘুরিয়াও অনেক মোকদ্দমার বিচার দেখিলাম। আজ কাল সর্ব্বত্রই জজ-ব্যারিষ্টার, উকীলদিগের যোগ্যতার হ্রাস ও খর্ব্বতা পদে পদে দেখিতে পাওয়া যায়। যে "রোলাট"-আইনের জন্য ভারতবর্ষে এত অসন্তোষ ও অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে, সেই আগুন জ্বালিবার কর্ত্তা এই জজ রোলাট।

গত বৃহস্পতিবার ভারতবর্ষের প্রতিনিধি মহারাণা কচ ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়কে লণ্ডন-সহর বিশেষ

সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল। বিশেষ সমারোহের সহিত লণ্ডনের লর্ড মেয়র, অল্ডারম্যান ইত্যাদি গিল্ড হলে তাঁহাদিগকে Freedom of the city প্রদান করেন এবং তদুপলক্ষে ম্যানসন্ হাউসে এক বিরাট মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন হয়। দুই জনেই উভয়ক্ষেত্রে সুন্দর বক্তৃতা করিয়া ভারতবর্ষের কথা ইংরাজকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন। উভয় অনুষ্ঠানেই আমার নিমন্ত্রণ ছিল,—প্রবাসী অনেকের সহিত আবার সাক্ষাৎ হইল। বিশিষ্ট দুই জন ভারতবাসীর প্রতি এই বিশেষ সম্মান প্রদর্শন উপলক্ষে তাঁহাদের দেশবাসিগণকে নিমন্ত্রণ করা অতি শোভন হইয়াছিল। দায়ে পড়িয়া Sir Michael O' Dywerকে পর্য্যন্ত এই ব্যাপার গলাধঃকরণ করিতে হইয়াছিল। উভয় ক্ষেত্রেই ঐশ্বর্য্য আড়ম্বর প্রদর্শনের চূড়ান্ত হইয়াছিল। লর্ড মেয়রের সোনা রূপার আসবাবের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। গিল্ড্ হল হইতে ম্যানসন্ হাউসে সামান্য পথ যাইবার জন্য ও লর্ড মেয়রের আট ঘোড়ার গাড়ী, আশা সোঁটা ও জরি মখমলের পোষাক-পরা সহিস-দ্বারবানের বাহুল্য সহিত বিপুল শোভাযাত্রা হয়। পানাহারের ধূমধামের ত কথাই নাই।

শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর বক্তৃতাশক্তির খ্যাতি যথেষ্ট আছে, কিন্তু আজ তিনি একটা বড় কাঁচা কথা বলিয়া ফেলিলেন। ইংরাজ-সাম্রাজ্যকে জগন্নাথ দেবের পুণ্য মন্দিরের সহিত তুলনা করিয়া দাবী করিলেন যে, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের এখানে সম অধিকার, সম দায়িত্ব, অর্থাৎ ইংরাজ-সাম্রাজ্যছত্র-তলে ইংরাজ ব্রাহ্মণ শূদ্র ভারতবাসীর প্রতি সমব্যবহার করিতে বাধ্য। কথাটা অজ্ঞ অহিন্দুর কাণে হয়ত শুনাইল মন্দ নয়। কিন্তু হিন্দুর প্রাণে কথাটায় আঘাত দিবে। কোনও নশ্বর পার্থিব সাম্রাজ্যের সহিত পরম অভীষ্ট দেবতার পুণ্য মন্দিরের তুলনা হিন্দুর নিকট আনন্দপ্রদ নহে। আর ইচ্ছা করিলে চতুর ইংরাজ কথাটা ঘুরাইয়া লইতেও পারেন। সমগ্র ভারতবাসীকে শূদ্র-পর্য্যায়ভুক্ত না করিয়া বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যদি মুসলমানের সহিত গণ্য করা যায়, তাহা হইলে কথাটা দাঁড়ায় এই যে, সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবাসীর অধিকার নাই; কারণ ভারতবাসী হইলেও অহিন্দু মুসলমান জগন্নাথ-মন্দির-প্রবেশের অনধিকারী। ইংরাজ একেই ত জগন্নাথের রথচক্রকে নির্দ্দোষ-নিষ্পেষণ-যন্ত্র বলিয়া মনে করে। "Car of jaggarnaut" তাহার নিকট বিদ্রূপ ও বিভীষিকার বিষয়, ইহা এক শ্রেণীর ইংরাজী সাহিত্যের কলঙ্ক। অতএব এস্থলে এ ভাবে এ কথাটা তুলিয়া ভাল হয় নাই।

বৃহস্পতিবার রাত্রে সহযোগী জেনিস্ সাহেবের আমন্ত্রণে "পল মল রেষ্টোরাঁ" নামক সুন্দর ভোজনশালায় সান্ধ্য আহারের পর "Drury Lane Theatre"এ Abraham Lincoln নাটক অভিনয় দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। Abraham Lincoln ও General Grantএর ভূমিকা যাহারা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের অভিনয় অতি সুন্দর হইল। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট Abraham Lincoln দাসত্ব-প্রথার বিরুদ্ধে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হন, কিন্তু পরিশেষে আততায়ীর হস্তে প্রাণ দিতে বাধ্য হন;—দেশভক্ত বীরের এই করুণ কাহিনী নাটকের অবলম্বন। পূর্ব্বে নিগ্রো জাতির প্রতি যে অমানুষ নির্য্যাতন হইত, বর্ত্তমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে তাহা সম্ভব না হইলেও সর্ব্বত্রই কালা-গোরার প্রভেদ যথেষ্ট আছে। তাহা নিবারণের উপায় কর্ত্তারা বড় করিতেছেন না, কিংবা করিতে পারিতেছেন না। এ কথা প্রচ্ছন্ন ভাবে ও প্রকাশ্য ভাবেই চারিধারে ছড়াইয়া রহিয়াছে। কথাটা Peace Conferenceএ ভাল করিয়া উত্থাপন করিবার জন্য শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়কে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছি।

মনে পড়ে American Slave War শেষ হইবার পরেই কলিকাতায় Dane Carson সেই যুদ্ধের ছবি তখনকার প্রচলিত ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে কোরিন্থিয়ান থিয়েটরে দেখাইয়াছিল। তখন বায়স্কোপ সিনেমার সৃষ্টি হয় নাই। তাহার কিছু পরে জেনারেল গ্র্যাণ্টও কলিকাতায় গিয়াছিলেন। মদ্যপান-নিবারণী কোন সভায় তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন; বহুদিনের কথা কিন্তু অস্পষ্ট হইলেও মনে পড়ে। (কারণ বহুদিন হইতেই

এ শ্রেণীর অনুষ্ঠানের সহিত আমার যোগ আছে।) তাঁহার আহার-টেবিলে মদের গেলাস উল্টাইয়া রাখা হইত,—ইহার অর্থ এই যে সুরা সে ক্ষেত্রে আতিথ্যের অঙ্গ নহে।

জেনারেল গ্র্যাণ্টের ছোট খাট লাল চেহারা আমার মনে আঁকা ছিল—আজ তাঁহার ভূমিকায় অভিনেতা অবিকল সেই মূর্ত্তি অনুকরণ করিয়া, **make up** ও অভিনয়ের চূড়ান্ত দেখাইল। আমাদের রঙ্গমঞ্চে এ দিকে আদৌ দৃষ্টি নাই।

লর্ড লিটনের ভগিনী লেডি এমিলি লটিয়ান্স্ (**Hon'ble Lady Emilly Lutyens**) এর বাটীতে মিসেস্ বেশান্তের বক্তৃতার রাত্রে মণ্টেগু সাহেবের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার নির্দ্দেশ- মত গত বুধবার দিন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। সুরেশের অকাল-মৃত্যুতে যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশ করিলেন। ইউনিভার্সিটি কোর (**University Corps**), মদ্যপান নিবারণ, শিল্প, কৃষি ইত্যাদির উন্নতির সাহায্যের জন্য তাঁহাকে বিশেষ জেদ করিলাম। ভারতবর্ষে নব প্রবর্ত্তিত শাসনপ্রণালীর সম্যক্ প্রসার শীঘ্র প্রয়োজন একথাও যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। তিনিও সকল কথা মনোযোগের সহিত শুনিলেন এবং বিশেষ আগ্রহ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে স্বীকার করিলেন। অন্যান্য অনেক কথার পর বিদায় লইলাম। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের অর্থ অনটন-সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনার জন্য বৃহস্পতিবার মিষ্টার মণ্টেগুর নিকট এক ডেপুটেশন যাইবার কথা ছিল। কিন্তু তাঁহার অসুখের জন্য তাহা স্থগিত হইল। মদ খাইয়া আর মামলা করিয়া যদি বাঙ্গালী রাজকোষে অর্থ দিতে পারে, তবেই নবশাসন-তন্ত্র চালনা সম্ভব, ফলে ইহাই দাঁড়াইতেছে। কারণ, **Excise Revenue** এবং **Judicial stamep**ই গভর্ণমেণ্টের অর্থাগমের প্রধান উপায়। কথাটা বড়ই ভয়ানক! এ কথার মীমাংসা না হইলে দেশের মঙ্গল কোথায়?

মণ্টেগু সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া ইণ্ডিয়া আপিস হইতে বাহিরে আসিয়াই ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হইল। কাগজপত্রের প্রকাণ্ড ব্যাগটী হাতে করিয়া ধীরে ধীরে একাকী আসিতেছেন। দূর হইতে দেখিয়াই নমস্কার করিলেন—না চিনিয়াই প্রতিনমস্কার করিলাম। নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, লর্ড চেমস্‌ফোর্ড। ভারতে ও ইংলণ্ডে প্রভেদ কত! বিশেষ সৌজন্য প্রকাশ করিলেন। আসিয়া অবধি নিতান্ত ব্যস্ত থাকায় তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারি নাই বলিয়া ত্রুটি স্বীকার করিলাম। তাঁহার সহিত একদিন সাক্ষাৎ করিয়া কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন।

গত ২১শে জুলাই সম্রাটের বাকিংহাম প্যালেসে বাগানপার্টীর নিমন্ত্রণ ছিল। এবারকার হোটেলের রাজকীয় ভোজে কাহারও মন উঠে নাই; কারণ, রাজপরিবারবর্গের কেহ উপস্থিত ছিলেন না একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এই পার্টীর দিন রাজারাণী, রাজপুত্র, রাজকন্যা সকলেই উপস্থিত থাকিয়া অতিথিগণকে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিলেন। বিস্তর গণ্যমান্য লোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও নূতন আলাপ পরিচয় হইল। বিলাতী লাটদিগের অপেক্ষাও ভারতীয় নগণ্য অতিথির প্রতি সমাদর অধিক প্রদর্শিত হইল। গতবার উইণ্ডসর প্যালেস গার্ডেন পার্টিতে তাহা দেখিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্মমোহন অধ্যায় মনে পড়িয়াছিল। লেডি লিটনকে বলিলাম যে, কি সূত্রে জানিনা তাঁহার শীঘ্র ভারত গমন অবশ্যম্ভাবী এ কথা আমার বারম্বার মনে হইতেছে।

সেদিন রাত্রে কার্লটন হোটেলে **League of Nations Union** নামক সভা এক মহাভোজের অনুষ্ঠান করেন। আমার নিমন্ত্রণ ছিল। যুদ্ধব্যাপার বন্ধ হইয়া যাহাতে শান্তির পথে সকল জাতি অগ্রসর হয় ও বর্ণের বৈষম্যজনিত প্রভেদ লোপ পায়, এ সভার তাহাই প্রধান উদ্দেশ্য। বিশিষ্ট ভারতবাসিগণকে এ মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্য এই ভোজের আয়োজন। ভারতবাসীকে এ মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্য বিশেষ আয়াসের প্রয়োজন নাই। কিন্তু এত উদ্যোগ আয়োজনেও সাদা কালার প্রভেদ মিটিবে কি? তাহা না মিটিলে

এ সকল সভা সমিতি কিংবা ভোজের আদান প্রদানে বিশেষ কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে ব্যক্তিগত আলাপ-পরিচয়ের বৃদ্ধি ও প্রসার যেটুকু হয়, তাহাই লাভ।

৩১শে জুলাই, রবিবার—

কমিটীর কাজ বন্ধ—অথচ বাধ্য হইয়া লণ্ডনে আবদ্ধ থাকাতে যন্ত্রণার একশেষ হইয়াছে। সহরের বাহিরে যাইতে পারিলে বোধ হয় এতটা কষ্ট বোধ হইত না। সহরের ধুলা, আবর্জ্জনা, কলরব, জনতা আর ভাল লাগে না। কাযের খাতিরে ইহা সহিতে হয় সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু কায দুই একদিনের জন্যও বন্ধ থাকিলে সহর আমার পক্ষে অসহনীয়। এই কারণে ছুটীর সময় কলিকাতায় তিষ্ঠান যায় না। প্রাকৃতিক শোভার এখানে নিতান্ত অভাব নাই। সহরের মাঝে মাঝে সাজান বাগান আছে। টেম্স্ নদীর তীরেও বেড়াইবার সুন্দর জায়গা আছে। রবিবারেও ছুটীর দিনে কোন কোন চিত্রশালাও খোলা থাকে, সেখানেও কিছুক্ষণ বেশ আনন্দে কাটান যাইতে পারে। তথাপি সহরের গরম ও কোলাহল ভাল লাগে না। আর যাঁহাদের সহিত দেখাশুনা কথাবার্ত্তা হইলে তৃপ্তি ও আনন্দ হয়, তাঁহারাও ছুটী উপলক্ষে বাহিরে গিয়াছেন। এই ছুটীতে বেড়াইতে যাওয়ার বাতিকটা লণ্ডনে বড় কম নয়। গ্রীষ্মকালে যে পারিয়া উঠে, সেই সহর হইতে দুইদিনের জন্য হউক, দুইঘণ্টার জন্য হউক পলাইয়া যায়।

কাল অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান কোল্ড্ষ্ট্রীম সাহেব ও আজ বিখ্যাত ব্যারিষ্টার স্যার ফ্রেড্রিক পলকের গৃহে মধ্যাহ্ন ভোজের নিমন্ত্রণ ছিল। ভারতবর্ষসংক্রান্ত নানা কথা উভয়ের সহিত বিশেষ ভাবে হইল। নৈতিক শিক্ষা সম্মেলনের (Moral Education Congress) যে অধিবেশন সেপ্টেম্বর মাসে জেনিভাতে হইবে, তৎসম্বন্ধে পলক সাহেবের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হইল।

স্যার হেনরী কটনের পুত্র (যিনি কলিকাতায় ব্যারিষ্টার ছিলেন) কাল ক্লাবে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। কথাবার্ত্তায় ছুটীর দুইদিন একরকমে কাটিল।

আগামী কাল Bank Holiday, লণ্ডনে এক অদ্ভুত ব্যাপার। ছুটীর দিনটা রীতিমত ভাবে কাটাইবার জন্য সমস্ত সহর ব্যস্ত। কে কোথায় যাইবে, কে কি করিবে, কি খাইবে, কি পান করিবে, কত খরচ করিবে, কত ধার করিবে, ইহার গবেষণা লইয়া উন্মত্ত। অনেক দিন ধরিয়া যে পয়সা জমাইয়াছে, তাহা প্রাণ ভরিয়া অপব্যয় করিবে। বাসে, মোটরে, রেলে, ট্রামে, বাইসিক্লে, জাহাজে, ছোট ষ্টীমারে চাপিয়া অথবা পায়ে হাঁটিয়া কাতারে কাতারে, দলে দলে পুরুষ নারী সহর ছাড়িয়া নানা স্থানে চলিয়াছে। যুদ্ধের গোলমালে কয়লা কুলীর ধর্ম্মঘট ও অন্যান্য নানা কারণে ইহারা রীতিমত ছুটীর আমোদ করিতে বহুদিন পায় নাই। তাই যেন তাহার শোধ লইবে। যান বাহনে পা দেয় কাহার সাধ্য। রেলওয়ে ষ্টেশন সব লোকে লোকারণ্য! যে পারিতেছে, সেই পলাইতেছে। প্লেগ হাঙ্গামায় কিংবা শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণের আশায়ও এত বেগে এত দলে দলে লোক পালায় কি না সন্দেহ। ধন্য জাতি—যাহা করে তাহাতেই বাড়াবাড়ি।

কিছুক্ষণ এই বিপুল জনস্রোত দেখিয়া ফিরিবার পথে আজ প্রাণ ভরিয়া হাইড পার্ক বাগানে বেড়াইলাম। গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে ঘাস জলিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের সময় সৈনিক সমাবেশ উপলক্ষে শত শত তাঁবু পড়িয়া পার্কের অনেক স্থান শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেবল কমে নাই দলে দলে নানা মতাবলম্বী প্রবাসী বক্তাগণের উৎসাহ ও সাহস। যাহার মুখে, যাহার প্রাণে যাহা আসিতেছে, সে তাহাই বলিতেছে। পুলিশ কথাটিও কহে না।

১লা আগষ্ট, সোমবার

আজ ব্যাঙ্ক ছুটির দিন। কায কর্ম্ম সব বন্ধ। কেবলমাত্র পার্লামেণ্টের অধিবেশন এবং বাদানুবাদ বিশেষ কারণে আজ স্থগিত না থাকিয়া বরং অধিকতর তেজে চলিয়াছে। ডাকও একবার মাত্র বিলি হইয়া বন্ধ।

রেল, ট্রাম, বাস্, মোটর; জাহাজ, নৌকা, সাইকেল, ছুটীর আনন্দে অধীর (holiday makers) আরোহীপূর্ণ। সংবাদপত্রের মতে লণ্ডনের ৭০ লক্ষ লোকের মধ্যে অন্ততঃ ৪০ লক্ষ লোক আজ বাহিরে কোথাও না কোথাও যাইতেছে। আমাদের দেশের রথ দোল পূজা পার্ব্বণ উপলক্ষে "অপব্যয়ে" যাঁহারা নানা কথা কহেন, তাঁহাদের দেশে এ "ন দেবায় ন ধর্ম্মায়" অনর্থক অপব্যয়ের উপর দৃষ্টি দিবে কে। আমাদের তবু ধর্ম্মের দোহাই দিয়া সময় ও অর্থ ব্যয়—কখনও কখনও অপব্যয়ও হয়। শ্রাদ্ধে বা বিবাহে যে খরচ হয় তাহাও সেই কারণে; এবং নরনারায়ণের সেবাও হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নিছক আমোদ আহ্লাদের জন্যই খরচ; নিজের ও নিজগণের আমোদ—সময়ে সময়ে নীচশ্রেণীর জঘন্য আমোদ মাত্র ইহাদের সীমা। ধর্ম্মের সম্পর্ক অতি অল্প। মনে হয় যেন কেবলমাত্র ব্যয় করিবার জন্যই ব্যয় করা হয়।

ব্যাঙ্ক হলিডের ব্যাপারটা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য জনতার প্রধান কেন্দ্র ক্রিষ্টাল প্যালেসে আমরা কয়েকজন মিলিয়া যাইলাম। বাসে যাইতে পারিলে পথের দৃশ্য ভাল দেখিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু সমস্ত গাড়ীতেই অসম্ভব ভীড়। তিল রাখিবার স্থান নাই। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়াও বাস পাওয়া সম্ভব বোধ হইল না। সঙ্গীদের সঙ্গে অগত্যা টিউব রেলওয়ে পথেই যাওয়া গেল।

বেলা ২টা পর্য্যন্ত ক্রিষ্টাল প্যালাসে বেড়ান হইল। চারিদিক লোকে লোকারণ্য—তবে এখানে ভদ্র ও মধ্য শ্রেণীরই জনতা অধিক। কেহ খাবার সঙ্গে লইয়া গিয়া চড়ুই-ভাতি করিতেছে, কেহবা হোটেলে খাইতেছে। পানাহারের বিরাম নাই। কলের নাগর-দোলা ইত্যাদিরও আয়োজন যথেষ্ট; স্বতন্ত্র দর্শনী দিয়া "জাপানী গ্রাম ও বাগান", পাহাড়ী রেল, জলপ্রপাতে নৌবিহার প্রভৃতি দেখাও আছে। বাজী রাখিয়া Aunt Sallyর মাথায় লাঠিমারা, নারিকেল লক্ষ্য করিয়া বল ছোঁড়া ইত্যাদি খেলার ধূমই অত্যন্ত বেশী; যাহা হয় করিয়া লোক হৈ হৈ করিয়া বেড়াইতেছে। ইহাই আমোদ।

ক্রিষ্টাল প্যালেসে সঙ্গীতের বন্দোবস্ত সকল সময়েই উৎকৃষ্ট। আজও সমস্ত দিনই গীতবাদ্যের ধূমধাম চলিল।

যুদ্ধের সরঞ্জাম, গোলাগুলি, উড়ো জাহাজ, ডুবো জাহাজ, ট্যাঙ্ক ইত্যাদির বিরাট একটা প্রদর্শনীও এখানে সঙ্গে সঙ্গে বসিয়াছে। দেখিলে লোকের মনে যুদ্ধের ভীষণ অবস্থা সহজেই অনুমিত হয়। কি দারুণ বিপদের মধ্য দিয়া দেশ কয় বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল, এ সমস্ত যুদ্ধোপকরণ দেখিলে তাহা কতকটা ধারণা করা যায়। ভারতবর্ষে যাহারা কথায় কথায় আয়র্লাণ্ড কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকার উপমা দিয়া ইংরাজের সহিত প্রকাশ্য বিরোধের প্রস্তাব করে, যুদ্ধসরঞ্জামের এইরূপ প্রদর্শনী দেখিলে তাহাদের যথার্থ যুদ্ধব্যাপারের উপলব্ধি অনেকটা হইতে পারে। লাঠি, শড়কি, পিস্তল, বন্দুক গোপনে সংগ্রহ করিয়া কিছুকাল কোন নিভৃতপ্রদেশে অরাজকতার সৃষ্টি, আইন আদালতের অমর্য্যাদা ও আপনাদিগকে বিপন্ন করা যাইতে পারে বটে। কিন্তু যে সকল জাতির যুদ্ধসরঞ্জাম এই শ্রেণীর, তাহাদিগকে শীঘ্র ও দীর্ঘকালের জন্য পর্য্যুদস্ত করা যাইতে পারে কিনা—তাহা বিবেচ্য। ইংরাজ যে কারণেই হউক আয়র্ল্যাণ্ড অথবা দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত হয়ত সন্ধি স্থাপন করিতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্তর্বিদ্রোহ ইচ্ছা করিলে দমন করিয়া দেশশাসনের ক্ষমতা এখনও রাখে, এ প্রদর্শনী যেন স্পষ্টাক্ষরে তাহা বুঝাইয়া দিল।

ক্রিষ্টাল প্যালেসের মাঝের হলে গান বাজনা ও যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রাদির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা। পাশের বড় বড় ঘরে সেবারে যেরূপ নানাশ্রেণীর প্রদর্শনী দেখিয়া গিয়াছিলাম, তাহাই এখনও আছে দেখিলাম। যুদ্ধ-প্রদর্শনীর অন্তর্গত এক অপূর্ব্ব বিভাগ দেখিলাম; রমণীগণ যুদ্ধজয় সাহায্যে যে সকল ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা বিশদ ব্যাখানের সহিত শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সজ্জিত হইয়া রমণীর মর্য্যাদা বাড়াইয়াছে।

ক্রিষ্টাল প্যালেস হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন আর এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর জনতা দেখিতে যাইলাম হাম্পষ্টেট্ হিদে। সেখানে

নিম্ন শ্রেণীর লোকই বেশী। রাস্তায়, ফুটপাথে, ময়দানে লোকে লোকারণ্য। এত লোক যে, রাস্তা-ফুটপাথের জমি মোটেই দেখিতে পাওয়া যায় না। চারিদিকে অগণন লোকের মাথা। নানা প্রকারের পানীয় ও আহার্য্য অজস্র বিক্রয় হইতেছে। কাগজের ফুল, খেলনা, ছড়ি, ভেঁপু, টুপি, বাঁশীর ছড়াছড়ি। আমাদের দেশে রথ, দোল, চড়ক ও দুর্গাপূজার ভাসানের দিনের খেলনা বিক্রয় ও মেলার জনতার কথা মনে করিয়া দিতে লাগিল। নানা শ্রেণীর লোক সং সাজিয়া আমোদ করিতেছে। স্ত্রীলোকেরা দলে দলে হাসি ঠাট্টা তামাসা গান করিতে করিতে চলিয়াছে। ক্রিষ্ট্যাল প্যালেসের মত নাগর দোলা এবং নারিকেল লক্ষ্য করিয়া বল ছোঁড়া, আর **Annt Sally**র মাথাভাঙ্গার ধূনও আছে। জুয়া খেলাও নানা আকারে চলিয়াছে। দেশের আইন অনুসারে বেআইনী হইলেও, হাত দেখিয়া ভাগ্যগণনার দোকান অনেক বসিয়াছে। বেদেরা (Gipsy) দলে দলে তাহাদের ক্যারাভ্যান (Caravan) গাড়ী লইয়া ভিড় বাড়াইতেছে। চুরি ও পকেটমারদিগের সংখ্যা নাই। মাতলামী যথেষ্ট; মাঝে মাঝে মারামারি, হাতাহাতিও আছে। সন্ধ্যার পর শ্রাদ্ধ আরও গড়াইবে শুনিয়া, অধিক বিলম্ব না করিয়া ক্লাবে ফিরিলাম।

গতবারে লণ্ডন টাওয়ারে ব্যাঙ্ক হলিডের ভিড় দেখিতে গিয়াছিলাম। এবার অন্য দুই দিক দেখা হইল। লণ্ডন কেন, সকল গ্রাম ও সহরেই এই ব্যাঙ্ক হলিডেতে একবারে হৈ হৈ কাণ্ড হয়। যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধের পরও কিছু দিন লোকে প্রাণ খুলিয়া এত আমোদ, এত মাতামাতি করিতে পায় নাই। এবার তাহার খুব শোধ তুলিয়া লইল। আমাদের মত নিয়ানন্দ জাতিরও একদিন বারমাসে তের পার্ব্বণ ছিল—জাতির প্রাণ ছিল; এখন সব গিয়াছে। আমোদ কলুষিত পথ অবলম্বন করিয়াই সমস্ত বিপদ আনে। আমাদের রথ, দোল, পূজা পার্ব্বণের সময় ধর্ম্মের দোহাই দিয়াও প্রকৃত আমোদের যথেষ্ট অপব্যবহার হয়। কিন্তু যেখানে ধর্ম্মের সঙ্গে কোন সংস্রব নাই, সেখানে নিছক আমোদ উপলক্ষ্যে এরূপ ভীষণ জনতার মধ্যে সময়ে সময়ে ভীষণ ব্যাপারের অবতারণা হইবে, ইহার আশ্চর্য্য কি ?

আজিকার দিনটা মেঘলা মেঘলা করিয়া কাটিল। বেশ ঠাণ্ডা ছিল; কিন্তু ক্রিষ্ট্যাল প্যালেসে, কাঁচ আঁটা ছাদ ও দেওয়ালের মধ্যে হাজার হাজার লোকের ভিড়ে বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। বাহিরের হাওয়ায় আসিয়া বড়ই তৃপ্তি হইল। ঠাণ্ডা হাওয়া অন্যদিন এত মিষ্ট লাগে না।

বেলসাইজ পার্ক হইতে হ্যাম্পষ্টেড হিদে যাইবার পথে দক্ষিণে একটা প্রকাণ্ড বাগান। তাহা ছাড়াইয়া একটা বড় পুষ্করিণী আছে, তাহার পরই হ্যাম্পষ্টেড হিদের মাঠ আরম্ভ। এই পুষ্করিণীর সহিত ডিকেন্সের পিক উইক পেপার্সে উল্লিখিত পিকউইকের বরফের উপর স্কেট্ লীলার সংস্রব আছে, ইহাই প্রসিদ্ধি। এই হ্যামষ্টেড্ হিদ পণ্ডই Snodgrass প্রভৃতির সহিত স্কেট বিহারের স্থান, ইহা লোকের বিশ্বাস। সেদিন Lincolns Inn দেখিতে গিয়া Lincoln Inn Fieldsএর বাহিরে Old Curiosity Shop নামে সাহিত্যপ্রসিদ্ধ দোকান সম্বন্ধে পুনরালোচনা করিয়াছিলাম। গতবারে যখন এই বাড়ী দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন মনে হইয়াছিল, এবারও মনে হইল—যে বাড়ী এই প্রসিদ্ধি পাইয়াছে, সে বাড়ীতে old cnriosity shopএর সংকুলান হওয়া সম্ভব মনে হয় না। পুস্তকোল্লিখিত বর্ণনা পড়িয়া এ ধারণা বদ্ধমূল হয় এবং অনেকের বিশ্বাসও তাহাই। এ বৎসর **Pickwick country tour** বলিয়া টমাস কুক কোম্পানী চ্যারাব্যাঙ্ক গাড়ী সাহায্যে ভ্রমণের বন্দোবস্ত করিয়া অনেক টাকা রোজগার করিয়াছে। পিকউইক উল্লিখিত পথ, বাড়ী ও সরাই যতদূর সনাক্ত করিতে পারা গিয়াছে, তাহা দেখাইয়া বেড়ান এই ভ্রমণ ব্যাপারের উদ্দেশ্য। হ্যাম্পষ্টেড্ হিদ পণ্ড যাহা দেখিলাম, ইহা সেই সকল দ্রষ্টব্য স্থানের অন্যতম।

সংবাদ পাইলাম যে, আধুনিক যুগের তানসেন "সিনর ক্যারুসো"র আজ মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পীড়ার জন্য গলা একটু খারাপ হইয়া কোনও দিন তাঁহার গানের ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে কি না, এ কথা লইয়া বাজী খেলা বিস্তর হইত এবং জীবনবীমা যেমন হয়, তাঁহার

গলার স্বরও অনেক টাকায় বীমা করা হইত। আজ কোনও বীমাতেই তাঁহাকে ত ধরিয়া রাখিতে পারিল না। অতি সামান্য অবস্থা হইতে ক্যারুসোর শ্রীবৃদ্ধি। নিজের গুণপনায় জগজ্জয়ী হইয়া উন্নতির শিখরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আজ তাঁহার ইহলীলা সাঙ্গ হইল। বর্ত্তমান কালের গায়কদিগের মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠ পদ অধিকার করিয়াছিলেন। দেবলোকে সঙ্গীত কলা প্রদর্শনের জন্য তাঁহার নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল--সে নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা ত মরজগতের মানুষের নাই। তাই ক্যারুসো আজ স্বর্গে। কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি চিরদিন তাঁহার স্মৃতিকে জীবিত রাখিবে। মানুষের মত মানুষ এমনই করিয়াই মরিয়াও অমর হয়।

২রা আগষ্ট, মঙ্গলবার

লর্ড লিটনের সৌজন্যে পুনরায় আজ হাউস অব লর্ডস্-এর অধিবেশন দর্শনে যাইবার সুবিধা পাইলাম। আজ সেখানে অদ্ভুত বাদানুবাদের অবতারণা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। প্রতিপদে সাময়িক গবর্ণমেণ্টের প্রতি আক্রমণ ও গবর্ণমেণ্টকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের মজ্জাগত ইহার পরিচয় হাউস অব লর্ডসের মত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সভাতেও পাওয়া গেল। গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা এই যাহাতে পার্লামেণ্টের গ্রীষ্মাবকাশ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে নিতান্ত প্রয়োজনীয় আইন-কানুনের কায শেষ করিয়া একেবারে তিন চারি মাসের ছুটী হয়। আর তিন সপ্তাহ কায করিলে তিন মাস কায বন্ধ থাকিতে পারে। অপর পক্ষ বলেন যে, গবর্ণমেণ্টের ইহাতে নিশ্চয়ই কুমৎলব আছে। যাহাতে আয়র্লণ্ড গোলযোগ সংক্রান্ত কথা পার্লামেণ্টে উত্থিত না হইতে পারে তাহারই চেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট একটানে তিন চারিমাস অবকাশ লাভের চেষ্টা করিতেছেন। এবং সেই জন্যই যাহা হয় করিয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় আইনসংক্রান্ত কায শীঘ্র সারিয়া লইবার জন্য হাউস অব লর্ডস ও হাউস অব কমন্সকে সাধারণ ছুটী আরম্ভ হইবার সময়ের পরও আটকাইয়া রাখিয়া কষ্ট দিতেছেন। এই সামান্য কথা লইয়া তুমুল ব্যাপারের অবতারণা। এই সম্বন্ধীয় অকারণ বাদানুবাদ উপলক্ষ্য করিয়া গবর্ণমেণ্টের বল পরীক্ষারও অবকাশ উপস্থিত। ভূতপূর্ব্ব ভারত-সচিব লর্ড ক্রু প্রস্তাব করিলেন যে, গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত এই বন্দোবস্ত অগ্রাহ্য করিয়া ইহা স্থির হউক যে, হাউস অব্ কমন্স এখন আর প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় কোন কায উপলক্ষেই বসিবে না। এই উপলক্ষ্যে অজা যুদ্ধের বিরাট অভিনয় হইয়া গেল। যাঁহারা কস্মিন কালেও লর্ডস্ সভার দরজা মাড়ান না, তাঁহারাও ভোট দিবার জন্য আজ দল বাঁধিয়া আসিয়া উপস্থিত। গবর্ণমেণ্ট পক্ষে লর্ড কার্জ্জন ও লর্ড চ্যানসেলার বার্কেনহেড সতেজ বক্তৃতা করিলেন। অপর পক্ষে লর্ড ক্রু, লর্ড স্যালস্‌বরী, লর্ড নিউটন, লর্ড বক্‌মাষ্টারও বেশ জোরের সহিত উত্তর দিলেন। ভোটে গবর্ণমেণ্ট জয়ী হইল, ১০৪ ভোট গভর্ণমেণ্ট পক্ষে, ৭৯ ভোট অপর পক্ষে। একটা ছেলেখেলা লইয়া বিরাট বাদানুবাদ ও গবর্ণমেণ্টের বল পরীক্ষা হইয়া গেল। আজ হাউস্ অফ্ লর্ডসে এই অর্থশূন্য নিষ্প্রয়োজন বিরাট অভিনয় হইবে জানিয়া লর্ড লিটন বিশেষ করিয়া আজ সেখানে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এখন পার্লামেণ্টে সাধারণের প্রবেশ প্রায় একেবারে বন্ধ —অনেক কষ্টে অনেক সুপারিশ করিয়া পাস জোগাড় করিতে হয়। লর্ড লিটনের অনুগ্রহে আমাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। লর্ড কার্জ্জন ও হ্যালডেনের সহিত সভার পর বাহিরে দেখা হইল। লর্ড হ্যালডেন বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্ন-ভোজনে নিমন্ত্রণ করিলেন।

লর্ড লিভারহিউমের সহিতও আজ অনেক দিনের পর দেখা হইল। তাঁহার মত কায কর্ম্মে ব্যস্ত লোক বোধ হয় কমই আছেন। আজিকার হাঙ্গামায় ভোট দিবার জন্য তাঁহাকেও কায ফেলিয়া আসিতে হইয়াছে। আজ সভায় এত লর্ডগণের সমাগম হইয়াছিল যে, প্রায় এরূপ হয় না। ওডায়ার ও জেনেরাল ডায়ার সমস্যা সম্বন্ধে লর্ড ফিন্‌লের অসম্ভব প্রস্তাব আলোচনার দিন ব্যতীত হাউস অফ্ লর্ডসে এত অধিক সংখ্যক লর্ডগণের সমাবেশ ইদানীং প্রায় হয় নাই শুনিলাম। নূতন আইনের ফলে

লর্ড দিগের ক্ষমতার অনেক হ্রাস হইয়াছে—অধিকাংশ বংশগত লর্ডের বুদ্ধি, বিদ্যা, ব্যবহার ও চরিত্র আলোচনা করিলে সে ক্ষমতার হ্রাস কিছু অন্যায় হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। শীঘ্র আরও হ্রাস হইবার সম্ভাবনা।

৪ঠা আগষ্ট, বৃহস্পতিবার

চারিদিন অবকাশের পর কমিটীর কায গত কয়েক দিন হইতে আবার পূরাতেজে চলিতেছে। আজ এখনও এ সপ্তাহের ভারতের ডাক আসে নাই। দেশের বিস্তারিত সংবাদ না পাইয়া উদ্বিগ্ন আছি।

কলিকাতায়, বম্বেতে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য নগরে ও পল্লীতে উত্তেজনার যে ভাব দেখা যাইতেছে, তাহাতে বিশেষ চিন্তার কারণ মনে হয়। প্রজাপক্ষ ও রাজপক্ষ এ সময় বিশেষ ধৈর্য্য ও সৎসাহসের সহিত কায করিতে না পারিলে উভয় পক্ষেরই দারুণ অমঙ্গল এবং শত্রুপক্ষের সুবিধা। প্রজা ও রাজার মধ্যে স্থায়ী বিদ্বেষভাব স্থাপনে যাহাদের আনন্দ, তাহাদের ছলে ভুলিয়া দেশের ক্ষতি যাহারা না বুঝিতেছেন, ভগবান তাহাদিগকে সুমতি সুবুদ্ধি দিন। প্রিন্স অব ওয়েল্‌স ভারতবর্ষে গিয়া সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করিবেন, স্থির হইয়াছে। কিন্তু সে সদ্ভাব স্থাপনে অবশ্য দেশ শত্রুর নিরানন্দ ও অমঙ্গল। তাঁহার অভ্যর্থনায় ব্যাঘাত জন্মাইবার যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা ব্যর্থ হওয়া উচিত। কিন্তু ইংলণ্ডেই যে ভাবে কায চলিয়াছে, তাহাতে উভয়পক্ষের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের অন্তরায় যথেষ্ট। আয়র্লাণ্ডে যে যথেচ্ছ ব্যবহার চলিয়াছে এবং উপনিবেশ সমূহেও ভারত-বিদ্বেষের যে চিহ্ন দিন দিন বাড়িতেছে, তাহাতে ভারতবাসীর উদ্বিগ্ন হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। সে কারণ দুর করিতে এখানকার কর্ত্তারা অপারক অথবা অনিচ্ছুক। এ অবস্থায় ভারতবর্ষে বিদ্বেষভাবের বিস্তার আশ্চর্য্য নয়।

গতকল্য কমন্স মহাসভার অধিবেশনে যাইবার সুযোগ হইয়াছিল। আয়র্লাণ্ডের গোলমালের পর হইতে সাধারণ দর্শকের হাউস অব কমন্সে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। "বিশিষ্ট" অথবা "সম্মানিত" দর্শকগণ বিশেষ তদ্বির করিয়া তবে প্রবেশের অনুমতি পান। সেই তদ্বিরের ফলে কাল ও আজ আমার House of Commonsএর Distinguished Visitor's Galleryতে যাইবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। আজ বেলা ১২টার সময় Speakers' Libraryতে নূতন Speaker মিষ্টার Whetlyর সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইয়াছে। লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের ভূতপূর্ব্ব মিলিটারী সেক্রেটারী কর্ণেল ভারনে (Col: Vereney) এখন স্পীকার-মহাশয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী। তিনি আমার বিশেষ পরিচিত। লেজিস্‌লেটিভ এসেম্বলির সভাপতি হোয়াইট সাহেবও স্পীকারকে পরিচয়-পত্র পাঠাইয়াছেন, মণ্টেগু সাহেবও তদ্বির করিয়াছেন। এত করিয়া তবে কমন্স মহাসভার অধিবেশন দর্শনের অধিকার পাইয়াছি।

কিন্তু যে আয়র্লাণ্ডের দৌরাত্ম্যে এত বাঁধা ধরার প্রয়োজন, সেই আয়র্লাণ্ডের বিদ্রোহী দলের সহিত বিজয়ী শত্রুর সঙ্গে যে ভাবে সন্ধির প্রস্তাব চলে, সেই ভাবে ডি ভ্যালেরার সহিত লয়েড জর্জ্জের সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছে। দৌত্য কার্য্যও চলিয়াছে। "সন্ধি স্থাপনের" পূর্ব্বে এখন "লড়াই স্থগিত" অর্থাৎ Truce হইয়াছে। ভারতবাসিগণ যথেষ্ট বিদ্রোহ ভাব দেখাইতে পারে নাই, বিদ্রোহে তাহাদের কৃতিত্ব হয় নাই এই কারণে ভারতের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার হইবে না, এ ধারণা যদি সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যেও একবার বদ্ধমূল হয়, তাহা হইলে বিষম কুফল ফলিবে। মণ্টেগু, লিটন প্রভৃতি মহাপ্রাণ ও মনস্বী রাজপুরুষগণ এ বিষয় বুঝিয়া ভারতবর্ষের প্রতি ন্যায় ব্যবহারের চেষ্টা করিতেছেন, কাযেই তাঁহারা এখানে সাধারণের বিরাগ-ভাজন। অপর দিকে আমাদের দেশবাসীরা ভ্রমবশে তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সমর্থন করিতেছেন না।

ক্রমশঃ

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

স্বার্থত্যাগী

(গল্প)

"স্বার্থত্যাগী, মহৎ চরিত্র"—নবীন মুগ্ধভাবে গণকের কথার প্রতিধ্বনি করিল। গণক একটু থামিয়া, হাতটা আরও টানিয়া লইয়া অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিল—

"হাঁ, আপনি সাহসী ও বুদ্ধিমান। আপনার হৃদয় অতি মহৎ। অনেক সময় লোকে আপনার কথায় ভুল বোঝে, কিন্তু আপনি শীঘ্রই তাদের ভুল ভেঙ্গে দিতে পারেন। জীবনে আপনি যশস্বী হবেন নিশ্চয়ই। স্বার্থত্যাগীর সব লক্ষণ আপনাতে দেখছি। আত্মীয় স্বজনকে আপনি খুব ভালবাসেন। তাদের জন্যে আপনি কি না করতে পারেন!"

গণকের এই বাঁধা গৎ শুনিয়াও নবীন মুগ্ধ হইয়াছিল। এ যে সবই সত্য—মর্ম্মে মর্ম্মে সে বুঝিতেছিল যে ইহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। সর্ব্বাপেক্ষা তাহার আশ্চর্য্য মনে হইতেছিল যে এই লোকটা তাহাকে কখনও দেখে নাই, তার কথা কিছুই জানে না, কি করিয়া শুধু তাহার হাত ও মুখ দেখিয়া, তার মনকে একখানা খোলা বইয়ের মত পড়িয়া গেল!

যাই হোক, লোকটির উপর তাহার ভালই লাগিল। সে যে খুব ভাল লোক এ ধারণা তাহার পূর্ব্ব হইতেই ছিল, এত দিনে তাহা বদ্ধমূল হইল। ভাবিতেও ভাল লাগে যে, তাহার স্ত্রী রাণী এমন মহৎলোককে স্বামিরূপে পাইয়াছে, তার ছোট মেয়ে লীলা এমন স্নেহময় পিতা পাইয়াছে। মনে সে খুব আরাম অনুভব করিতেছিল। এমনই আরাম সে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ৫০০০৲ টাকা জীবনবীমা করিয়া একবার পাইয়াছিল।

গণকের পারিশ্রমিক দিয়া যখন সে বাড়ী ফিরিল, তখন তাহার শরীর মন খুবই হাল্‌কা। আশ্চর্য্য, সামান্য একটু আশার কথা মানুষের মনকে কি পরিবর্ত্তনই করিয়া দেয়! সে খুব ভাগ্যবান, তার জীবনে সে যশের অধিকারী হইবে—বেশ লাগিতেছিল। তাহার স্ত্রী ও কন্যা সুখে, স্বাচ্ছন্দ্যে সম্ভ্রমে থাকিবে।

নবীন নেহাৎ বোকা ছিল না—যে যাহা বলিত তাহাতেই ভুলিয়া যাইত না। কিন্তু সাধারণ লোকের যাহা হয়, তাহার সম্বন্ধে কেহ কোন ভাল কথা বলিলে, সে সহজেই বিশ্বাস করিয়া বসিত। তা' ছাড়া তার প্রকৃতি বাস্তবিকই নিরীহ ছিল।

বাড়ীখানি পৈতৃক। টাকাকড়ি যাহা ছিল সমস্ত খাটাইয়া রাধাবাজারে সে একখানি কাগজের দোকান খুলিয়াছিল। এই ব্যবসাই তাহার জীবনোপায়। নিজের ব্যবসায়, এবং বাড়ীর অনাবিল আনন্দ ছাড়া সে আর কিছুরই খোঁজ রাখিত না।

নিজে সে খুব হিসাবী হইলেও তার স্ত্রীর খরচ করা কেমন একটা রোগ ছিল। যত অদ্ভুত রকমের রঙ বেরঙের জামা কাপড়ে সে ঘর ভরাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহার আর এক প্রবল ঝোঁক ছিল—থিয়েটার দেখা। নবীনকে সেই জন্য রাশ টানিয়া রাখিতে হইত। মাসে অন্ততঃ একবারও থিয়েটার দেখা হয় নাই এখন কদাচিৎ ঘটিয়াছে। যদিও রাণী আজ কিছু বলে নাই, তথাপি নবীনের মনে আজ আনন্দের বান ডাকিয়াছিল—সে স্বয়ং গিয়া প্রস্তাব করিল—"আজ চলনা, থিয়েটার দেখে আসি।"

নবীনের মাত্র ৫০০০৲ টাকা জীবনবীমা ছিল। তাহার মাঝে মাঝে মনে হইত, যদি মরিয়া যাই, তাহা হইলে এই টাকাতে আমার পরিবারের কি হইবে? সে জন্য সম্প্রতি সে অন্য এক কোম্পানীতে আরও ৫০০০৲ টাকার জীবনবীমা করিবার জন্য দরখাস্ত দিয়াছিল। সেই কোম্পানীর নিযুক্ত ডাক্তার স্বাস্থ্য পরীক্ষার নিমিত্ত আজ নবীনকে ডাকিয়াছেন। বেলা তিনটার সময় ডাক্তারের নিকট যাইতে হইবে। ফিরিয়া আসিয়া সকালে সকালে খাইয়া লইয়া থিয়েটারে যাইবে—স্ত্রীকে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া গেল।

২০

বৃদ্ধ ডাক্তার ঘোষ যতক্ষণ তাহাকে নিঃশব্দে পরীক্ষা করিতেছিলেন, ততক্ষণ নবীন খুব ধীর ভাবেই শুইয়া ছিল—

কিন্তু পরীক্ষার শেষের দিকে ডাক্তারের ফ্যাকাশে মুখের দিকে চাহিয়া তার সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল।

পরীক্ষার পর কোন কথা না বলিয়া, ডাক্তার উত্তর দিকের জানালার সামনে যাইয়া দাঁড়াইলেন—মুখে গভীর দুশ্চিন্তার রেখা। হঠাৎ নবীন কেমন হইয়া গেল—যেন একটা হিংস্র জন্তু পশ্চাৎ হইতে তাহার উপর লাফাইয়া পড়িবে। নিজেকে শান্ত রাখা ক্রমশঃই তাহার অসাধ্য হইয়া পড়িল—আরসীতে নিজ সাদা মুখের ছায়া দেখিয়া সে নিজেই শিহরিয়া উঠিল।

ডাক্তার ঘোষ ধীরে ধীরে তাহার দিকে আসিলেন; তাঁহারও মুখ বিবর্ণ। তিনি বলিলেন, "তোমার অবস্থা কি বেশ সচ্ছল?"

নবীন মৃদু ভাবে মাথা নাড়িল।

"তোমার বিবাহ হয়েছে?"

"হাঁ, একটী মেয়েও আছে।"

তার পর, ডাক্তার তাহাকে সবই বলিলেন। তাহার পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে, বুকের অবস্থা খুবই জীর্ণ। বছর দুইয়ের মধ্যেই তাহাকে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতে হইবে'।

নবীন শুনিল—ইহার অর্থও বুঝিল। একটা গভীর অবসাদে তাহার সমস্ত দেহমন নিস্তেজ হইয়া পড়িল। 'কুয়াশার কালো পর্দ্দায় তাহার চোখ যেন বন্ধ হইয়া গেল।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকার পর, ডাক্তার তাহাকে কি একটা পান করিতে দিলেন। তখন একটু একটু করিয়া তাহার জড়তা কাটিয়া গেল, কথা ফুটিল।

"ডাক্তার বাবু, এ যে আমার সর্ব্বনাশ! আমার স্ত্রী কন্যার কি হবে? দোহাই ডাক্তার বাবু, আমি খুব সাবধানে থাকব—আপনি যে ওষুধ খেতে বলবেন খাব। কোন রকম অত্যাচার করব না। আমি এখন মরতে পারব না। আমাকে বাঁচান!"

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তোমাকে আমি ওষুধ দিতে পারি বটে—কিন্তু তার চেয়েও তোমার টাকার সদ্ব্যবহার করবার কি অন্য উপায় নেই? স্ত্রী কন্যার জন্যে টাকা সঞ্চয় কর।"

তার পর ডাক্তার তাহাকে অনেক উপদেশ দিলেন—সাবধানে থাকিতে, চিন্তার ভার কমাইতে—সে সব তাহার কাণে কিছুই যায় নাই—কেবল শেষ কথাটি তার বার বার মনে পড়িতেছিল:—

"এ সব ব্যারামে মনের বল খুব কাষ করে। স্বার্থত্যাগী হও। ভাল থাকব মনে করলে, আর সকলকে ভালবাসতে পারলে, আয়ু বাড়াতে পারা যায়।"

"স্বার্থত্যাগী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ"—গণকও এই কথা বলিয়াছে। তবে আর তাহার ভাবনা কি? এই কথাটা তাহাকে খুব সান্ত্বনা দিল। মনটা পরিষ্কার হইয়া গেল—এমন কি মুখে একটু মৃদু হাসির রেখাও ফুটিয়া উঠিল।

তাহাকে ত' মরিতেই হইবে। উত্তম। সে স্ত্রী কন্যার জন্য যুঝিতে যুঝিতে মরিবে। যেমন করিয়াই হউক মাসে ৫০৲ টাকার আয়ের ব্যবস্থা তাহাকে করিয়া যাইতে হইবে।

ছলে হোক, বলে হোক—এ অসাধ্য সাধনা তাহার করা চাই। মাথার ভিতর দিয়া চিন্তার ঝড় বহিয়া যাইতেছিল। এ কায তাহাকে করিতে হইবে—একাকী, কাহারও সাহায্য না লইয়া, কাহাকেও না জানাইয়া, রাণী যেন না জানিতেও পারে। তাহারা বেশ শান্তিতে আছে—এই আসন্ন বিপদের সংবাদ তাহাদের দিয়া এই পরিপূর্ণ আনন্দকে নিঃশেষ করিয়া দেওয়া? তাহা হইবে না। রাণী তাহাকে কত ভালবাসে—এখন তাহাকে জানাইলে কি তাহার ভালবাসা বাড়িবে? পরে দু'বছর পরে যখন তাহাদের ছাড়িয়া সে চিরদিনের মত চলিয়া যাইবে, ঘোর বিপদের মাঝে দুর্দ্দিনের কালো মেঘের কিনারায়, তাহার এই অক্লান্ত পরিশ্রম, এই নীরব সাধনার শুভ্র পরিচয় যখন ফুটিয়া উঠিবে, তখন তাহার মন প্রাণ কি ভক্তিতে, প্রেমে, কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিবে না?

যখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার সব অবসাদ কাটিয়া গিয়াছে। ডাক্তারকে নমস্কার করিয়া, সে বেশ স্ফূর্ত্তির সহিত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ডাক্তার

বিবর্ণ মুখে চাহিয়া রহিলেন। তখনও তাঁহার হাত কাঁপিতেছিল।

বাড়ী ফিরিবার মুখে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত ভাবনা নবীনের মনে জাগিতেছিল। কিন্তু সে সব চিন্তাকে সে শীঘ্রই ঝাড়িয়া ফেলিল। এই মনে করিল, তাহার স্বার্থত্যাগের ক্ষমতা কি অল্প? সে চোখের সামনেই তাহার ভবিষ্যতের মোহন ছবি দেখিতেছিল—সাফল্যের বিজয়-মুকুট তাহার শিরে—আর তাহাতে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা—স্বার্থত্যাগী।

সদর রাস্তার মোড়ে তাহার চিরপরিচিত চায়ের দোকানে কখন সে অন্যমনস্ক ভাবে উঠিয়া পড়িয়াছে খেয়াল ছিল না। এখানে প্রত্যহই সে চা পান করিত। চেয়ারে বসিয়া হঠাৎ তাহার মনে হইল—এক কাপ্ চার পয়সা। এই এক আনা ত বাঁচান যাক্। আরম্ভ এখানেই করা যাক। তাহাকে নিঃশব্দে উঠিয়া যাইতে দেখিয়া দোকানী বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

৩

নবীন বাড়ী ফিরিল। কিছুক্ষণ পরে রাণী তাহাকে মনে করাইয়া দিল যে সন্ধ্যায় তাহাদের থিয়েটারে যাইবার কথা—বেশী দেরী হইলে আর যায়গা পাওয়া যাইবে না। আর, এই নূতন পালার প্রথম অভিনয় না দেখিতে পাইলে জীবনটা ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

নবীনকে এখন কঠিন হইতে হইবে। নিজের চায়ের পয়সা বাঁচাইতে তাহার কষ্ট হয় নাই—কিন্তু রাণীর এত আগ্রহ উপেক্ষা করিয়া তাহাকে মনঃক্ষুণ্ণ করা—সে যে বড় কঠিন। সে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "না, না, রোজ রোজ থিয়েটারে যায় না!"—কথাটা বড় কর্কশ শোনাইল। স্তম্ভিত হইয়া রাণী কিছুক্ষণ একদৃষ্টে স্বামীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "তুমি নিজেই বলেছিলে!"

আরম্ভ যে ভাবে হইয়াছিল, সংকল্পরক্ষাও সেই-ভাবে চলিতে লাগিল। তামাক খাওয়াটা পর্য্যন্ত নবীন ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার চিরকালের সাথী রূপাবাঁধান হুঁকাটা অযত্নে একপাশে পড়িয়া আছে। খবরকাগজওয়ালা ভোরের আলোর সঙ্গেই আর এবাড়ীতে দেখা দেয় না। প্রতিমাসের শেষে নির্জ্জনে বসিয়া নবীন হিসাব দেখিত—এমাসে কত টাকা জমিল।

পাকাহিসাবী সে—সে জানিত যে শুধু খুচরো খরচ নয়, ভারি খরচও কমাইতে হইবে। প্রথমেই নজর পড়িল রাণীর জামাকাপড়—কেনা বাতিকের উপর। কত জামাকাপড় সে মাসে মাসেই না কেনে! কিন্তু এদিকে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে তাকে বুঝাইয়া রাজী করা চাই। তাই একদিন তাহাকে বুঝাইতে লাগিল যে কাগজের দর যেরকম বাড়িতেছে, তাহাতে তাহার কারবারে লোকসান হইতে পারে। কত মাসিকপত্রিকা আয়ব্যয়ের এমন সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে তাহাদের জীবন-মরণের সমস্যা উপস্থিত। নবীনের কারবার অল্পদিনের। কয়েকটি মাসিক পত্রিকাই তার প্রধান খরিদদার; পত্রিকাগুলি বন্ধ হইলেই তাহারও যথেষ্ট লোকসান। তাই তাহাকে এই আশুবিপদের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। অনুতাপের স্বরে সে বলিয়া উঠিল—"সেদিন তোমায় থিয়েটারে নিয়ে যাইনি বলে তোমার বড় দুঃখ হয়েছে—না?" অভিমানের পুঞ্জীকৃত মেঘে স্নেহের শীতল স্পর্শে অশ্রু হইয়া ঝরিয়া পড়িল। "ছিঃ লক্ষ্মীটি, আমি কি সাধ করে তোমাকে বারণ করেছিলুম। মাথার উপরে যে বিপদ!"

রাণীর অশ্রুমলিনমুখে ভয়ের ছায়া পড়িল। বেশী বলিবার প্রয়োজন হইল না। তখনই স্বামীস্ত্রীতে বসিয়া ব্যয়-সংক্ষেপের প্ল্যান আঁটা হইয়া গেল। তেল নুণ কাঠ কয়লা চাকর বামুন হইতে, রাণীর সব চেয়ে বড় সখ—কাপড়জামা কেনা, আর থিয়েটার দেখা—কিছুই বাদ গেল না। বিশেষতঃ শেষের এই দুটি খরচ এত কমানো হইল যে রাণীর বুকটি বেদনায় ভরিয়া উঠিল।

রাণীর এই যাতনা, নবীনের মনেও প্রতিঘাত আনিতেছিল বটে, কিন্তু সে তখন সুদখোর মহাজনের মত অপরিমিত লোভের সহিত, যতটুকু পারে আদায় করিতে উন্মত্ত ছিল। এ কি তার রাণী আর লীলার জন্যই নহে?

ক্রমে তাহার ধারণা হইল যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার

অভিপ্রায় সফল করিতে হইলে, তাহার সাধুতার আদর্শকে অনেকটা খাটো করিতে হইবে। বিশ পণ কাগজের রীমের উপর চব্বিশ পণ মার্কা দিয়া বেচিলে কে ধরে! সময়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ; সাধুতা কর্ত্তব্যনিষ্ঠা তাহাকে যে খুব বেশী সাহায্য করিতে পারিবে তাহা নহে। এই পৃথিবীতে এমন কত লোক এই অস্ত্রগুলি লইয়া যুঝিতে যুঝিতে তাহার বিনিময়ে পাইয়াছে—আধপেটা আহার! সেরূপ হইলে ত চলিবে না।

বাহিরের কোন আঘাত নবীনকে একটুও স্পর্শ করে নাই বটে, কিন্তু পারিবারিক জীবনে সে সবচেয়ে বেশী অশান্তি পাইতেছিল—কঠিনতর পরীক্ষা তাহার এইখানেই হইতেছিল।

নিজের ভাল বাড়ীটি ভাড়া দিয়া, দামী আসবাবপত্র যথাসম্ভব চড়াদরে বিক্রী করিয়া যেদিন তাহারা এই স্যাঁৎসেঁতে ছোটবাড়ীটায় উঠিয়া আসিল, সেদিন রাণীর মুখে যে বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা বাড়িয়াই চলিল—সে যেন ক্রমশঃই শুকাইয়া যাইতে লাগিল। ছোট মেয়ে লীলা—তাহার চাঞ্চল্য অন্তর্হিত হইয়াছিল, সেও যেন অকালবৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

৪

রাণী প্রথমবৎসর নীরবে সবই ঘাড় পাতিয়া সহিয়াছিল। অনভ্যস্ত হাত দুটীকে সকল কাযে নিপুণ করিয়া লইতে তাহার বেশী দেরী হয় নাই। কিন্তু তাহার প্রাণে সব চেয়ে বেশী বাজিত, তাহাদের একমাত্র সন্তান, তাহার বড় আদরের লীলার কোন অযত্ন। মেয়েটা ভাল খাবার খাইতে পায় না। যখন তার সঙ্গীরা হালফ্যাশানের কত রঙবেরঙের জামা কাপড় পরিয়া আসে, তাহাকে সেই পুরাতন, মলিন মোটা জামা পরিধান করিয়াই তাহাদের সমুখে বাহির হইতে হয়। ইস্কুলের মেয়েরা কত বিদ্রূপ করে, যখন সে সব রাণী তাহার মুখে শুনে, তখনই স্বামীর এই ব্যয়কুণ্ঠতার বিরুদ্ধে তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। নবীন প্রকৃত কথাটি এড়াইয়া যায়, বলে—"সময়টা বড় খারাপ যাচ্ছে কি না। আর নেই মোটেই। শীঘ্রই সামলে উঠবো—তখন আর কোন কষ্ট থাকবে না।"

রাণী মুখখানি মলিন করিয়া বসিয়া ছিল। নবীন তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিল। তাহার পর ধীরে ধীরে তার হাত দুটী নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। রাণীর হাতের সে কোমলতা আর নাই—ঝি চাকর না থাকাতে সব কাযই তাহাকে স্বহস্তে করিতে হয় তাই হাতে কড়া পড়িয়াছে। "লক্ষ্মীটি, আমি যা করছি সয়ে যাও।" নবীনের গলা কাঁপিতেছিল—"আমি কি জানিনা তোমাদের কি কষ্টই হচ্ছে—তোমাদের কষ্ট কি আমার বুকে বাজছে না? কি করব বল—বরাত!"

নবীনের মানসিক যাতনা ক্রমশঃই তীব্র হইয়া উঠিতেছিল। তাহার এক একবার ইচ্ছা হইতেছিল, সব প্রকাশ করি। ডাক্তারের বাড়ী হইতে আসিবার পর হইতে শান্তি সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও পায় নাই। একাকী সে এই যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত সে একাকীই লড়িবে—বৃথা রাণীর শান্তি নষ্ট করিয়া লাভ কি?

সমুখের আরসীতে তাহার মুখের ছায়া পড়িয়াছিল। চেহারা যে বদলাইয়া গেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহার চোখ নেকড়ে বাঘের মত জ্বলিতেছিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল—চেহারা খুব খারাপ হইলেও একেবারে মরণ পথের যাত্রীর মতও ত মনে হয় না। এ কয়মাস ধরিয়া সে কেবল অর্থের চিন্তাই করিয়াছে। উপার্জ্জন ও সঞ্চয় নিজের কথা ভাবিবার অবসর সে পায় নাই। আজ হঠাৎ নিজের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি পড়াতে, তাহার মনে সন্দেহের উদয় হইল—ডাক্তারের যদি ভুল হইয়া থাকে!

ভাবিতে সাহস হইল না—তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, সে বসিয়া পড়িল। চেয়ারের হাত ধরিয়া নিজেকে স্থির রাখিতে চেষ্টা করিল তাহার মস্তিষ্ক আশায় আশ্বাসে জ্বলিতেছিল। আশা! ইহার চিন্তাও অসহ্য। অথচ ইহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়াও অসম্ভব। এতদিন ত তাহার সন্দেহ হয় নাই যে ডাক্তারের ভুল হইতে পারে—সেই ডাক্তারের সুবিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা দেশ প্রসিদ্ধ। তাঁহার ভুল? কে জানে?

৫

পরদিন প্রভাতেই নবীন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিতে গেল—ঠিক যেমন ফাঁসীর হুকুমের বিরুদ্ধে খুনী আসামী, শেষ আদালতে আপীল করিতে গিয়াছে। সে এতটা উত্তেজিত হইয়াছিল যে, ডাক্তারের দরজায় সাইনবোর্ডে অন্য এক নাম লেখা সেটা তাহার চোখেও পড়িল না। সোজা ভিতরে গিয়া ডাক্তারের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার যখন ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখনই সে তাহার ভুল বুঝিতে পারিল—ইনি ত ডাক্তার ঘোষ নহেন। ডাক্তার ঘোষ, যিনি তাহার মৃত্যুর তারিখ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, স্থূল, কুব্জ, বৃদ্ধ;—আর এই ডাক্তারটির চেহারা বেশ বলিষ্ঠ—দেখিলেই সাহস হয়।

নবীনের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন যে ডাক্তার ঘোষ প্রায় বছর খানেক হইল চৌরঙ্গীতে বাড়ী কিনিয়া সেখানে উঠিয়া গিয়াছেন।

"এক বছর! তাহলে আমিই তাঁর শেষ হতভাগ্য রোগীদের একজন।"

নূতন ডাক্তারটির কি মনে হইল, তিনি নবীনকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

পরে বলিলেন, "বটে? আপনার কি হয়েছিল?"

কি জন্য ডাক্তার ঘোষের নিকট সে আসিয়াছিল, ডাক্তার কি বলিয়াছিলেন, সমস্তই নবীন বলিল।

নূতন ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। বলিলেন, "আমি আপনাকে একবার পরীক্ষা করব?"

পরীক্ষা হইল। নবীন লক্ষ্য করিল যে ডাক্তার ঘোষের মত ইহার হাত কাঁপে না—ইনি কেমন কৌশলের সঙ্গে ধীরে ধীরে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ডাক্তারের মুখ ক্রমেই গম্ভীর হইয়া উঠিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার মধ্যেই এমন একটা কিছু ছিল যাহা দেখিয়া নবীন ভরসা পাইতেছিল।

পরীক্ষা শেষে নবীনকে বসিতে বলিয়া, ডাক্তার ঘোষের মত, ইনিও কিছুক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন। নবীনের ধৈর্য্যের বাঁধ আর রহিল না—বলিল, "সত্যি কথা বলেই ফেলুন। আমার আর জানতে বাকি কিছু নেই। মনে কচ্ছেন ভয় পাচ্ছি?—তা মোটেই না। আমি এখন অনেকটা প্রস্তুত হয়েছি।" শেষের কথাগুলি সে বিজয়ীর মত গর্ব্বিত ভাবেই বলিল।

"বটে?"

"এক বছর যে কি করেই কাটিয়েছি, তা' আমিই জানি। কি খাটুনিই না খেটেছি! বন্ধু বান্ধব ছেড়ে গেছে, ঘরের শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য সে সব হারিয়েছি।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "অধীর হচ্ছেন কেন? আপনার ত কোন রোগই দেখতে পাচ্ছি না। আরও ২০।২৫ বছর আপনি নিশ্চয়ই বাঁচবেন।"

নবীন চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "কি, বলছেন কি?"

"আপনার স্বাস্থ্য ভালই। বুকে কোন দোষই নেই। বেশী দিন না বাঁচবার ত কোন কারণ নেই।"

"কিন্তু ডাক্তার ঘোষ—"

নূতন ডাক্তারের মুখ আঁধার হইল। বলিলেন, "তিনি মস্ত ভুলই করেছেন। যখন আপনি তাঁর কাছে আসেন, তখন তাঁর নিজেরই শরীর খারাপ ছিল। অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য হয়েছিল। আমার খুবই সন্দেহ হচ্ছে যে তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। বড় দুঃখের কথা, তাঁর ভুলে আপনাকে এ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে।"

নবীন একবার ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"ডাক্তার বাবু, আপনারও ভুল হয় নি ত!"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "না।"

নবীন তখন উন্মাদের মত রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। সামনেই একখানি গাড়ী যাইতেছিল, তাহাতে চড়িয়া সে বাড়ীর দিকে হাঁকাইতে হুকুম দিল। তাহার কেবল মনে হইতেছিল যে গাড়ী চলিতেছে না, এত ধীরে গেলে যে দেরী হইয়া যাইবে!

বাড়ীর নিকটেই একটি খেলনার দোকান হইতে লীলার জন্য এক রাশি খেলনা কিনিয়া লইল। গত বছর লীলার কত আবদার সে ঠেলিয়াছে—সে স্মৃতি এখন তার বুকে বিঁধিতে লাগিল। আজ এ সব না চাইতেও পাইয়া সে কি খুসীই হইবে—আর তাহার মায়ও মলিন মুখে হাসি ফুটিবে।

ঠাৎ তাহার মনে হইল যে রাণীর শরীর বোধ হয় খুবই রাপ হইয়াছে—তাহা না হইলে সে ক্রমশঃই শুকাইয়া াইতেছে কেন। এখন তাহার অনুতাপ হইতে লাগিল ব—সেও ত একবারও খোঁজ লয় নাই। এবার তাহার চকিৎসার চূড়ান্ত সে করিবে।

বাড়ী ফিরিতেই লীলা ছুটিয়া আসিল। তাহাকে খলনার কথা বলিবার পূর্ব্বেই সে ভীত চকিত ভাবে লিয়া উঠিল—"বাবা, মার কি হয়েছে? কেমন করে শুয়ে য়েছে।"

খেলনার রাশি গাড়ীতেই পড়িয়া রহিল—নবীন ছুটিয়া বাড়ীর ভিতরে গেল। রাণীর তখন খুব জ্বর, গা পুড়িয়া যাইতেছে—মাঝে মাঝে মুখ দিয়া এক এক ঝলক রক্ত উঠিতেছে। সে প্রলাপের ঘোরে এক একবার বলিয়া উঠিতেছে—"তোমার টাকা জমান হল? আমি চাই না—মেয়েটাকে যেন শুকিয়ে মেরো না।"

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, এ দ্রুত যক্ষ্মা—বহু দিনের অত্যাচার ও অবহেলায় এ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। জীবনের আশা অল্প।

নবীনের চোখের দীপ্তি নিষ্প্রভ হইয়া গেল—সে সংজ্ঞা হারাইয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। *

শ্রীভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

---

* একটি ইংরাজি গল্পের ছায়াবলম্বনে।

চিত্রকলা

আজকাল বাঙ্গালা মাসিকপত্র এবং পুস্তকাদিতে প্রকাশিত মৌলিক ছবির সংখ্যা অল্প নহে। স্বদেশী চিত্রশিল্পীদিগের অঙ্কিত বহু রঙের এবং এক রঙের যে সকল চিত্র প্রকাশিত হইতেছে, সেই সকলের কথাই বলিতেছি। সেগুলিকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। ভারতীয় চিত্রশিল্পের প্রথানুযায়ী অনেকগুলি ছবি শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এবং তাঁহার পন্থানুবর্ত্তী (school-এর) অন্যান্য শিল্পীর অঙ্কিত। অপরগুলি প্রতীচ্য প্রথানুযায়ী।

একমাত্র পুত্র চক্ষুহীন হইলেও সে পদ্মলোচন; কিন্তু আমরা যখন বহু পদ্মলোচনের সাক্ষাৎ লাভ করিতেছি, খন তাহাদের রূপগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করা অসঙ্গত হইবে না।

সে দিন সন্ধ্যায় আমার একজন পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধুর ভবনে এই সকল ছবি সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। বন্ধু ভাবগ্রাহী হৃদয়বান্ ব্যক্তি, তিনি ন্যায় বিচারের পক্ষপাতী, স্বদেশী বিদেশী আর্ট সম্পর্কে বহু তত্ত্বজ্ঞ এবং স্বয়ং দেশী বিলাতী জাপানী মূল চিত্রাদির অধিকারী। তাঁহার প্রশ্নের মূল্য আছে।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল ত, এই ছবিগুলির মর্ম্ম কি?" কতকগুলি বাঙ্গালা মাসিকপত্রে প্রকাশিত ছবি দেখাইয়া তিনি এই প্রশ্ন করিলেন। আরও বলিলেন, "বল ত এই গুলি দেখিয়া তোমার মনে কি প্রকারের ভাব (impression) মুদ্রিত হইতেছে! এগুলির শিল্পচাতুর্য্য (technique) সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য কি?"

প্রশ্ন কঠিন এবং প্রশ্নকর্ত্তা কঠিনতর। নিজেদের ঘরে বসিয়া অসীম সাহসে যে সমালোচনা করা যায়, তাহা ছাপার অক্ষরে দশের সমক্ষে উপস্থিত করিলে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা, এবং উহার সার্থকতা সম্বন্ধেও সন্দিহান বলিয়া, আমি তাঁহাকে যে উত্তর দিয়াছিলাম তাহার উল্লেখ করিব না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে এই সকল ছবি সম্বন্ধে আমার মনে যে দুই একটি বিষয়ের উদয় হইয়াছে তাহা আমি প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করি। আমার বক্তব্য সত্য এবং ন্যায়-সঙ্গত হইলে পাঠক সে বিষয়ে চিন্তা করিবেন; না হইলে, মনে রাখিবেন যে আমি কাহাকেও তর্কে আহ্বান করিতেছি না। কারণ ছবি ভাল কি মন্দ বিবেচনা করা বহু পরিমাণে অনুভূতির (perception-

এর) বিষয়। এই অনুভূতি ব্যক্তিগত (individualistic) এবং মানস-সংক্রান্ত (subjective)। আমি কোন যন্ত্রের সাহায্যে উহা অন্যের ভিতরে প্রবেশ করাইতে পারিব না।

ছবি জিনিসটা সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের ভাষা। যে কোন দেশের নিতান্ত নিরক্ষর লোকেও উহাতে কাব্য-দর্শন ইতিহাস ইত্যাদি পাঠ করিতে পারে। উহা দুই ব্যক্তিকে একত্র করিয়া সার্থকতা লাভ করে,—একজন শিল্পী এবং অপর জন দর্শক। অনেকে বলেন, কবি কাব্য রচনা করিয়া, ঔপন্যাসিক চরিত্র সৃষ্টি করিয়া, দার্শনিক চিন্তা করিয়া, ইঞ্জিনিয়ার কল কারখানা নির্ম্মাণ করিয়া খালাস। লোকে তাহা কি ভাবে গ্রহণ করিল তাহা দেখিবার প্রয়োজন তাঁহাদের নাই। কথাটা ঠিক নহে। এই সকল "সৃষ্ট" বিষয় সেই পরিমাণে সার্থক, যে পরিমাণে তাহারা অপরের মনোরঞ্জনে সমর্থ। সুতরাং দর্শককে বাদ দেওয়া চলে না। যদি চলিত, তবে পৃথিবী দশহাজার বৎসর পূর্ব্বে যেখানে ছিল, আজও সেইখানেই থাকিত।

দর্শককে বাদ দেওয়া চলে না বলিয়াই ছবির বিষয় (subject), ভাব (conception) এবং শিল্প চাতুর্য্য (technique) প্রভৃতি আলোচনার সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়। দুঃখের কথা এই যে, বর্ত্তমানে যে সকল ছবি প্রকাশিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশ গুলিতে এই সকলের নিতান্ত অভাব দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ, আমার মতে শিল্পীর মানসিক সম্বল (mental equipment), পরিশ্রম এবং শিল্প চাতুর্য্যের অভাব। পরন্তু এই সকল অভাব সঞ্জাত যথেচ্ছাচারও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। এ কথা সত্য যে টাকার বিনিময়ে ষোল আনা গণিয়া দিতে হয়। আট আনা দিয়া টাকার প্রত্যাশা করা চলে না। এবং গায়ের জোরে আট আনাকে টাকার সমান বলিয়া দাঁড় করানো যায় না। অধুনা প্রকাশিত অধিকাংশ ছবি আট আনা পরিমাণের হইয়াও টাকার প্রত্যাশা করে।

এই সকল ছবিতে ছবিত্বের লাঘব যাহা দেখিতে পাই, তাহার কয়েকটি প্রধান কারণ নিম্নে বলিতেছি।

চোখে যাহা দেখিতে পাই, কাগজে অথবা ক্যানভাসে তাহার অনুরূপ আকৃতি, ভঙ্গী ও ভাব প্রতিফলিত করিয়া রাখিতে পারিলে চিত্রাঙ্কন সফল হয়। আয়নায় প্রতিফলিত আকৃতি ছবি নহে। কিন্তু চোখে যাহা দেখি তাহা অবয়ব-বিশিষ্ট। অর্থাৎ তাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং গভীরতা আছে। তাহা এদিক, ওদিক, সেদিক করিয়া একটা স্থান জুড়িয়া থাকে। কিন্তু যে পদার্থে তাহার আকৃতি অঙ্কন হয় তাহা সমতল। সুতরাং প্রতিকৃতি বিষয়ের অনুরূপ করিয়া আঁকিতে হইলে ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ জটিল হইয়া পড়ে। অবয়ব বিশিষ্ট পদার্থকে সমতলক্ষেত্রে প্রতিফলিত করিবার জন্য তাহার সীমানা এবং প্রধান প্রধান নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলিকে প্রথমতঃ দাগিয়া লইতে হয়। ইহাতে দৃষ্টিশক্তি, পরিমাপ শক্তি এবং হস্ত চালনার উপর আত্মশক্তির প্রভাব বিশেষ আবশ্যক। এইরূপ দাগিয়া লইতে ভুল করিলে বা অবহেলা করিলে অথবা অপারক হইলে ছবি যে "অপ্রাকৃতিক" হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই দাগ দেওয়া ব্যাপারটা (draftsmanship) সামান্য অনুশীলন-সাপেক্ষ নহে। অথচ দুঃখের বিষয় এই যে অন্ততঃ শতকরা নব্বই জন শিল্পী এ বিষয়ে উদাসীন। ফল এই হয় যে, ছবির আকৃতি প্রকৃতি, ভাব ভঙ্গী শিবের মত না হইয়া জন্তু-বিশেষের মত হইয়া দাঁড়ায়। দর্শকের পক্ষে এবং শিল্পীর পক্ষেও বটে, ইহা আনন্দদায়ক না হইয়া বিরক্তিজনক হইয়া উঠে। প্রাকৃতিক এবং অস্থি-পেশী-বিজ্ঞানের অজ্ঞতা এই অনর্থের কারণ। একদল আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার শিল্পী আছেন, যাঁহারা এই অজ্ঞতা বশতঃ যে আট আনা রকমের ছবি আঁকেন, তাহাকে তাঁহারা "আর্ট" বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের অবোধ অনুরাগী-বৃন্দও তাঁহাদেরই মত চক্ষুহীন। আমার একটা গল্প মনে পড়িল। লণ্ডন সহরে মহিলাদিগের শিরোভূষণ হ্যাটের একটা নূতন দোকান খোলা হইয়াছে। দোকানে আরাম কেদারা, সোফা, কাউচের অভাব নাই। দেয়ালে বড় বড় আয়নায় ক্রয়ার্থিনী নিজ দেহের চারিদিক এক সঙ্গে দেখিতে পায়েন। তিন চার জন বিক্রয়কারিণী রমণী সুন্দর পরিচ্ছদে ভূষিতা হইয়া ক্রয়ার্থিনীর মনোরঞ্জনে ব্যস্ত। গোটা কয়েক কাঠির উপরে কতকগুলি লেস,

রেশমী কাপড়, জরির ফিতা ইত্যাদি সুসজ্জিত। একজন মহিলা আসিয়া এদিক ওদিক দেখিয়া বলিলেন, "হ্যাট কই?" বিক্রয়কারিণী তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া আশ্চর্যান্বিতা হইয়া উত্তর করিলেন, "হ্যাট! হ্যাট ত নয়, এ গুলি 'সৃষ্টি!' (Hats, Madam! No-these are creations!) পূর্ব্ববর্ণিত শিল্পী এবং তাঁহার শিল্পের অনুরাগী ভক্তবৃন্দ এই প্রকার "সৃষ্টির" দোহাই দিয়া অপরিপক্ক, অসম্পূর্ণ এবং অসুন্দরকে ষোল আনা বলিয়া চালাইতে চাহেন। একবার উক্ত দলের একজন শিল্পী আমাকে বলিয়াছিলেন, "দেখুন, আমাদের দেশের লোকের আর্ট বুঝিবার শক্তি এখনও হয় নাই। সাধে কি বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন, পাঠক! তুমি হয় ত বিশ্বাস করিলে না, তা কি করিব, যেরূপ দেখিয়াছি তাহাই বলিতেছি।" উত্তরে আমাকে বলিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল যে, আমাদের দেশের লোকের আর্ট বুঝিবার শক্তি ততদিন হইবে না, যতদিন তাঁহার মত শিল্পীর আট আনা পরিমাণ "সৃষ্টিকে" ষোল আনা বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে, এবং দেশের লোকে আর্ট না বুঝিলেও দুঃখ নাই, দুঃখ এই যে, শিল্পী যিনি, বুঝিবার এবং বুঝাইবার অধিকারী, তিনিও বঙ্কিম বাবুর ঐ টুকু আর্ট বুঝিতে পারেন নাই।

আসল কথা, শিল্প অপ্রাকৃতিক নহে। এই ভারতীয় চিত্র-শিল্পের সেবকগণের গুরুস্থানীয় অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রভৃতি চিত্রকরগণের বহুচিত্র দাগ (draftsmanship), ভাব (expression) ও ভঙ্গী (action) অসামান্য নিপুণতার সহিত প্রকৃতির অনুরূপ করিয়া প্রতিফলিত। তাঁহাদের সার্থকতা সেইখানে, যেখানে তাঁহারা ছবিকে অস্বাভাবিক (সুতরাং কুৎসিৎ ও বিরক্তিজনক) না করিয়া আত্মক্ষমতা এবং শিল্পে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা প্রাকৃতিক এবং অস্থি-পেশী বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিকে বলিদান না দিয়া সহায় করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে বিচিত্র decorative আর্ট যোগ করিয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা genius। কিন্তু তাঁহাদের বহু চেলার গুরুমারা বিদ্যার ফলে আমরা দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত, কঙ্কালসার, অসংবৃতদেহ পুরুষ এবং অহিফেন—নিমীলিত নয়না, ক্ষয়রোগগ্রস্তা, পাট-গুচ্ছ নিন্দিতকেশী, প্রেতিনীলাঞ্ছিত দীর্ঘহস্তা, মাতৃচিহ্ন বর্জ্জিতা, স্তন্যদাত্রী মাতৃকার দর্শন লাভ করিয়াছি। মুখে স্বতঃই বাহির হয়—রাম রাম!

আবার যে সকল শিল্পী প্রাচ্যপ্রথার সেবক, তাঁহারাও উপরিউক্ত শিল্পিগণ অপেক্ষা অল্প দোষী নহেন। দাগ, আলো-আঁধার এবং মধ্যবর্ণের (middle tone) বিষয়ে ইঁহাদের জ্ঞানাভাব এত গভীর যে, তাঁহাদের অঙ্কিত নারী মূর্ত্তির চক্ষুর দুইটি দিক দুই দিকে চাহিয়া থাকে, নাসিকা পার্শ্বশায়িনী, মুখ পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর ন্যায় বক্র, মস্তক স্কন্ধোপরি মেরুদণ্ড ও ম্যাষ্টয়েড পেশী বাদে অপর কোন উপায়ে সংরক্ষিত ইত্যাদি। অস্থি পেশীর জ্ঞান ইঁহাদের আদৌ নাই। পরন্তু এই সকল শিল্পী দৃষ্টিহীন।

দৃষ্টিহীন কথাটি শক্ত সন্দেহ নাই। কিন্তু কয়েকটি সাধারণ দৃষ্টান্ত লউন। আমাদের দেশের শিল্পীদের মধ্যে কয়জন আছেন যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, দুই চোখের শেষ ভাগ একই horizontal রেখায় অবস্থিত নহে? একটির শেষ ভাগ অপেক্ষা অপরটির শেষ ভাগ একটু নিম্নে অবস্থিত। এবং যেদিকে চোখের শেষ ভাগ একটু নিম্নে অবস্থিত, ঠোঁটের সেই দিকের শেষভাগ একটু উর্দ্ধে অবস্থিত। পরিণতবয়স্ক লোকের মুখে ইহার আভাস মাত্র উপলব্ধ হয়, কিন্তু বহু শিশুর মুখে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান। খোলা চোখে দেখিতে না পান, চোখ দুটিকে প্রায় নিমীলিত করিয়া দেখুন। তথাপি যদি বুঝিতে না পারেন, তবে ঐ প্রকার চক্ষু প্রায় নিমীলিত করিয়া শিশুর মুখের প্রতিবিম্ব একটি আরসীতে দেখুন।

যদি কেহ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া আপনার দিকে হাত বাড়াইয়া থাকে, তবে তাহার কব্জির অব্যবহিত পরে এবং কুনুইয়ের আগে হাতের যে অংশ তাহা আপনার খোলা চোখে যে রকম মোটা দেখাইবে, চক্ষুপ্রায় নিমীলিত করিয়া দেখুন তদপেক্ষা আরও বেশী মোটা দেখিবেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি যদি আমি নিখুঁৎ করিয়া আঁকিতে পারিতাম, তবে আপনি ঐ ছবিতে ইঞ্চি মাপিয়া দেখিতে পারিবেন যে, তাঁহার যে পা অন্য পায়ের উপর

বাঁকাইয়া আছে, উহার দৈর্ঘ সোজা পা অপেক্ষা অনেক বেশী এবং সোজা পা বাঁকা পা অপেক্ষা অনেক সরু।

তুলনায় আলোচনার পক্ষে সুবিধা হইবে বলিয়া আমি দুইটি উদাহরণ এক প্রকারের এবং তৃতীয়টি অন্য প্রকারের দিলাম। দুইটির বেলায় মনে করিতেছি বাস্তব অমন হইলে ছবি কি রকম হইবে, এবং তৃতীয়টির বেলায় মনে করিতেছি ছবি অমন হইলে বাস্তব কেমন।

আসল কথা, মন পূর্ব্ব হইতেই যাহা দেখিবে বলিয়া বসিয়া থাকে, চোখ ততটুকুই দেখিতে পায়। যাহা বিদ্যমান তাহা দেখে না। তাহা দেখিতে হইলে অনুশীলন আবশ্যক। অনুশীলন দ্বারা দৃষ্টিশক্তির ক্ষমতা এবং প্রসার বৃদ্ধি করিতে হয়। ইহা পরিশ্রম-সাপেক্ষ। বহু শিল্পী পরিশ্রমের ফল আজকাল যথেচ্ছাচার দ্বারা প্রকাশ করিতে চাহেন।

ছবির প্রাণই হইতেছে পরিমাণ (proportion)। যে উপায়ে পরিমাণ জ্ঞান লাভ হয়, শিল্পিগণ প্রথমতঃ সে উপায় উপেক্ষা করেন, এবং পরে দৃষ্টিশক্তির অভাবে তাহার আংশিক পূরণেও অসমর্থ হন।

বর্ণ (tone, রং নহে) বিন্যাস সম্পর্কেও যথেচ্ছাচার দৃষ্ট হয়। হইবারই কথা। কারণ একই। পরিমাণ জ্ঞানের অভাবে পার্স্পেক্টিভও ভুল হয়। সুতরাং হয়ত দেখা যায় পূর্ব্ব দিকের দেওয়ালে টাঙান ছবিখানি পশ্চিমমুখী না হইয়া দক্ষিণমুখী হইয়া আছে এবং উহার চারিদিকের পরিমাপ অসমান প্রতিভাত হইতেছে।

দর্শক হিসাবেই এই কয়েকটি কথা বলিয়াছি। অধুনা প্রকাশিত ছবি দেখিয়া আমি প্রীতিলাভ করিতে পারি নাই। সুতরাং অপ্রীতির কারণ অনুসন্ধান করিয়াছি। আমাদের দেশে অনেকের মুখে শোনা যায় "রাজা উজীর হইবার বাসনা নাই, দুবেলা দুমুঠা অন্নের সংস্থান হইলেই হইল।" ইহার মূলে হুকওয়ার্ম (hook worm) আছে কিনা জানি না, তবে শ্রমবিমুখতা যে বিলক্ষণ বিদ্যমান তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু শিল্পীর পক্ষে শ্রমবিমুখতা নিতান্ত মারাত্মক। ইহা দ্বারা যে তিনি কেবলমাত্র নিজের প্রতি অবিচার করেন তাহা নহে, তিনি দর্শকের রুচি ও শিক্ষারও হন্তারক হইয়া উঠেন। দুঃখ সেইখানে।

আমার বক্তব্য আমি যথাসম্ভব সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং অনেক বিষয়ে ইহাতে আভাস ইঙ্গিত আছে মাত্র। তর্কের হিসাবে কোন কথা বলি নাই। তত্তব আমি শিল্প এবং অন্যান্য বিষয়ের উন্নতির আশা রাখি। উপযুক্ত শিল্পী এবং ক্ষমতা ও হৃদয়বান সমালোচকের আবশ্যক। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুকে এই লেখাটি দেখাইয়াছিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "হু, সময়ে।"

"চিত্রামোদী।"

"প্রতাপসিংহ"-এর গান। *

পঞ্চম গীত

[রচনা—স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

মেহের্‌উন্নিসা।

বারোঁয়া———ভরৃতঙ্গ।

প্রেম যে মাখা বিষে, জানিতাম কি তায়।
তা হ'লে কি পান করি' মরি যাতনায়!
প্রেমের সুখ যে সখি পলকে ফুরায়;
প্রেমের যাতনা হৃদে চিরকাল রয়।
প্রেমের কুসুম সে ত পরশে শুকায়,
প্রেমের কণ্টক-জ্বালা ঘু'চিবার নয়॥

[স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

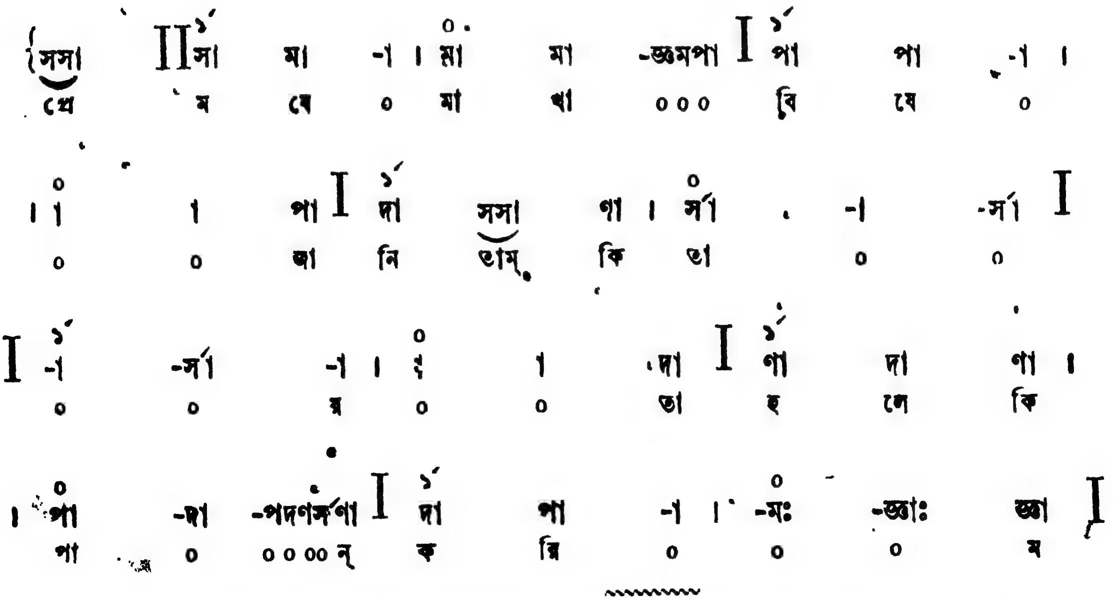
সসা II সা মা -া । মা মা -জ্ঞমপা I পা পা -া ।
প্রে ম যে ০ মা খা ০০০ বি ষে ০
। া া পা I দা সসা ণা । র্সা -া -র্সা I
০ ০ জা নি তাম্ কি তা ০ ০
I -া -র্সা -া । ঃ া দা I ণা দা ণা ।
০ ০ য় ০ ০ তা হ লে কি
। পা -দা -পদণর্সণা I দা পা -া । -মঃ -জ্ঞাঃ জ্ঞা I
পা ০ ০০০০ন্ ক রি ০ ০ ০ ম

---

* "প্রতাপসিংহ"এর গানের স্বরলিপি ধারাবাহিকরূপে "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে, এবং নাটকান্তর্গত গানগুলি অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গীত হয়, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হইবে।

—লেখিকা।

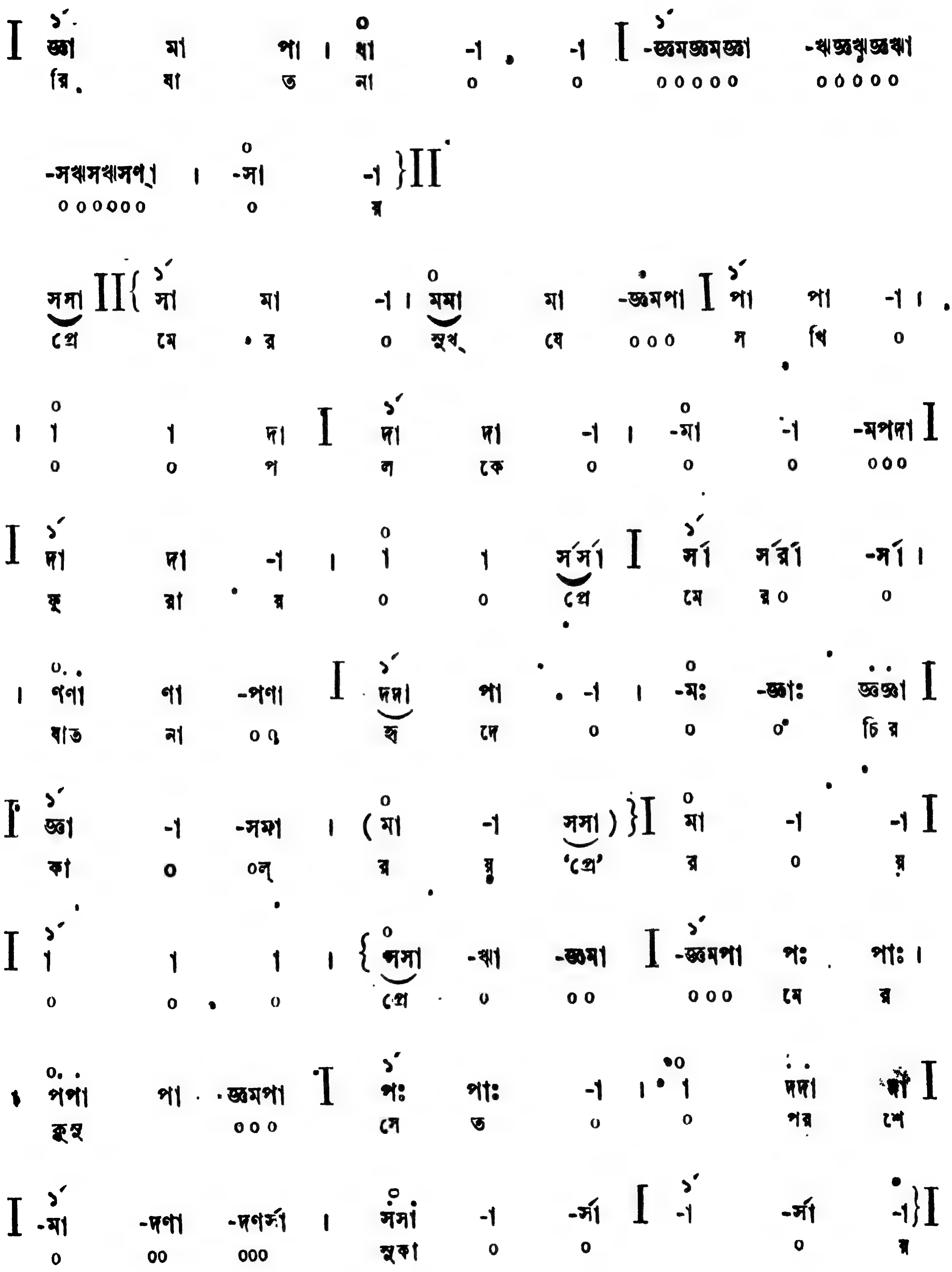
রি ষা ত না
প্রে মে র সুখ্ যে স খি
প ল কে
ফু রা য় প্রে মে র
যাত না হৃ দে চি র
কা ল্ র য় ‘প্রে’ র য়
প্রে মে র
কুসু মে সে ত পর শে
সুকা য়

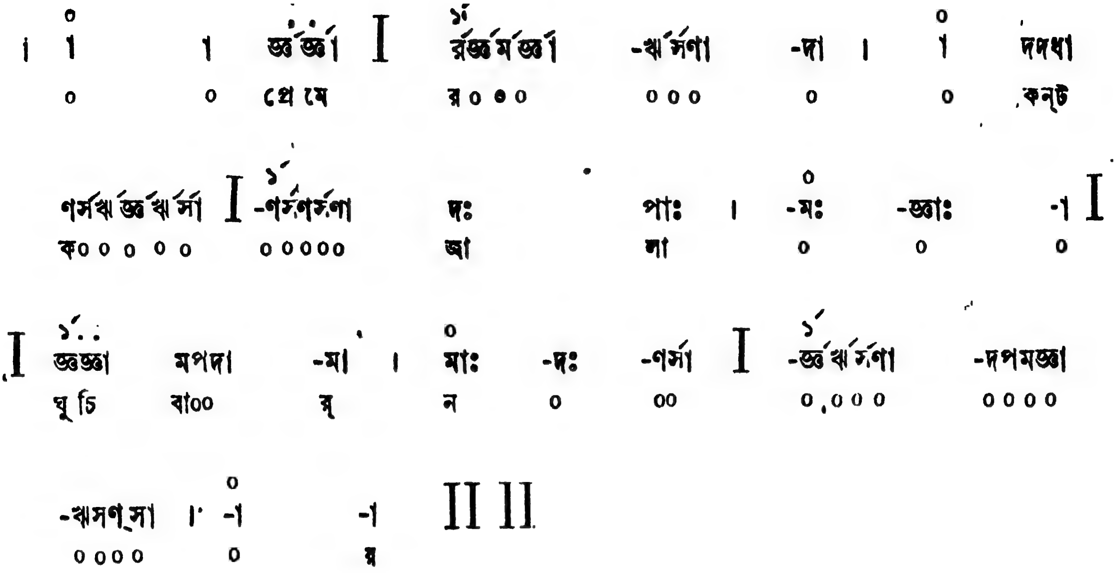
। া । জ্ঞর্জ্ঞা I র্জ্ঞর্মর্জ্ঞা -র্ঋর্সণা -দা । া দণধা
০ ০ প্রেমে র০০০ ০০০ ০ ০ কন্ট
ণর্সঋর্জ্ঞর্ঋর্সা I -ণর্সণর্সণা দঃ পাঃ । -মঃ -জ্ঞাঃ -া I
ক০০০০০ ০০০০০ আ লা ০ ০ ০
I জ্ঞজ্ঞা মপদা -মা । মাঃ -দঃ -ণর্সা I -র্জ্ঞর্ঋর্সণা -দপমজ্ঞা
ঘু চি বা০০ র্ ন ০ ০০ ০০০০ ০০০০
-ঋসণ্সা । -া -া II II
০০০০ ০ র

হেমচন্দ্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তৃতীয় খণ্ড

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শেষ জীবন

কবির দারিদ্র্য অপনোদনের চেষ্টা।

"বান্ধব" সম্পাদক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর "চিত্তবিকাশ" উপহার পাইয়া হেমচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন :—

'বান্ধব' কুটীর
৭ই ফাল্গুন ১৩০৫।

প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন মিদং—

আপনার 'চিত্ত বিকাশ' উপহার পাইয়া হর্ষ বিষাদে জর্জ্জরিত হইলাম। কবিকুলে হোমার আর মিল্টন অন্ধ হইয়াও পৃথিবীর অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন। আজি আপনি তাঁহাদিগেরই একজন হইয়া সে অলঙ্কারকে ত্রিগুণাত্মক করিলেন। জগদ্বিধাতা জগদীশ্বরের কোন কার্য্যই অন্ধ শক্তির উদ্দাম লীলা নহে। সকল কার্য্যেরই গূঢ় উদ্দেশ্য ও রহস্য আছে। আপনকার বহিশ্চক্ষুর অন্ধতাবিধানও নিরর্থক নহে। বোধ হয়, অন্তশ্চক্ষুর পূর্ণ দৃষ্টি ও প্রফুল্লতার সৃষ্টিই তাঁহার অভিপ্রেত হইবে। যাহা হউক আপনি সে বাহিরের চক্ষুর জন্য বিলাপ ও পরিতাপ করিবেন না। * * * 'চিত্ত বিকাশে'র প্রথম পৃষ্ঠায়,—"ধন নাই বন্ধু নাই, কোথায় আশ্রয় পাই" এই পংক্তিটীর অর্থ বুঝিতে না পারিয়া চিত্তে বড় গভীর দুঃখ বোধ করিলাম। বঙ্গাকাশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বঙ্গসাহিত্যের শিরোভূষণ হেমচন্দ্র একাই একটা রাজ্যের সম্পত্তি। হেমচন্দ্রের ধন নাই, বন্ধু নাই, এ কথাটা

বাঙ্গালি জাতির উপর বৃহৎ একটা গালির মত বুঝায় না কি? * * *

আপনার স্নেহানুগৃহীত
শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

সাধারণ চিকিৎসালয়ে "বাণী-বরপুত্র" মধুসূদনের দুঃখময় জীবনের শোচনীয় পরিসমাপ্তির পর বঙ্গবাসী হেমচন্দ্রের এ অনুযোগ নির্ব্বিকার চিত্তে সহ্য করিতে পারে নাই। চারিদিকে কবিবরের দারিদ্র্য অপনোদনের চেষ্টা হইতে লাগিল। 'বান্ধব' সম্পাদক রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ, 'হিতবাদী' সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত, 'অনুসন্ধান' সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রভৃতি অনেকেই কবিবরের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুপ্রসিদ্ধ রামশর্ম্মা (৺নবকৃষ্ণ ঘোষ) লিখিলেন:—

To Babu Hem Chandra Banerjee.
I keenly, deeply feel, O friend, for thee!
The light within thee gloweth as of yore.
The soul within thee floweth as before
In lucent stream of luscious melody.
Though dim the orbs through
which thy soul may see,
Sun-light and moon-light cheering
thee no more.
Thy only light that in thy bosom's core,
Yet thou singest mindless of all agony.
But where is the guerdon of thy minstrelsy
Thou who hast kindled
here the patriot flame
With noble burst of song beyond all meed!
Alas! 'tis cold neglect and penury!
Bengala's sons! remove this burning shame
Speed to the poet's rescue—swiftly speed.

ভাবার্থ—

গভীর ব্যথায় মম ব্যথিত অন্তর, সখে, তোমা তরে।
এখনো অম্লান তব অন্তরের জ্যোতিঃ, আছিল যেমতি
প্রাণের নির্ঝর তব অবারিত গতি, বহিছে তেমতি—
সুমধুর সঙ্গীতের স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী মহাবেগ ভরে।
দৃষ্টিহীন বটে এবে আঁখিদ্বয় তব—আত্মাবাতায়ন;
দিবালোক চন্দ্রালোক, আনন্দ তোমায় নাহি দিবে আর;
একমাত্র দীপ শুধু পরাণের মাঝে জ্বলিছে তোমার,
তথাপি গাহিছ তুমি তুচ্ছ করি ব্যথা, ধৈর্য্যপরায়ণ,
কিন্তু বল শ্রোত্রহারি সঙ্গীতের তব কোথা পুরস্কার?—
যে গানে জাগালে তুমি স্বদেশপ্রীতির পূত অগ্নিশিখা,—
যে উদাত্ত সঙ্গীতের সমুচিত পণ নাহি যায় লিখা,
অবহেলা দরিদ্রতা বিনিময় হায়, এই কি তাহার?
হে বঙ্গসন্তানগণ! ঘুচাও এ মহা কলঙ্ক-কজ্জ্বল,
সত্বর আসিয়া সবে মুছাও কবির নয়নের জল।

বাঙ্গলার প্রিয় কবি হেমচন্দ্রের সাহায্যার্থ অনেকেই অগ্রসর হইয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবকগণ নানাস্থানে সভা আহ্বান করিয়া হেমচন্দ্রের বিপদে সমবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী লাইব্রেরীর সাহিত্যানুরাগী সম্পাদক গোবিন্দচন্দ্র দত্ত মহাশয় এইরূপ একটি সভা আহ্বান করিতেছেন শুনিয়া, ঢাকা হইতে রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর প্রবীণ সাহিত্যিক 'অনুসন্ধান' সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন,

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

ঢাকা, ৬ই আষাঢ় ১৩০৬।

চির প্রীতিভাজনেষু,

ভাই * * * সেইদিন তোমার একখানি স্নেহপূর্ণ পত্র পাইয়া অনুগৃহীত হইয়াছি। সম্প্রতি জানিতে পাইলাম—সাবিত্রী লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ, বৌবাজার দত্ত পরিবারের অন্যতম সুসন্তান, বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্তের উদ্যোগে হেমচন্দ্রের সম্মানার্থ একটি সভা আহূত হইতে যাইতেছে। তুমি তোমার কাজে এই সভার অনুকূলতায় একটি

উদ্দীপক 'প্যারা' লিখিবে এবং আপনার সমস্ত বন্ধুবান্ধব লইয়া সভায় অনাহূত উপস্থিত হইবে। যদি বাঙ্গালাভাষাকে সত্য সত্যই মা বলিয়া জান, তাহা হইলে 'বৃত্রসংহার' রচয়িতা বঙ্গকবির এই বিপৎসময়ে উদাসীন রহিও না। আমি এখন বয়সে বৃদ্ধ, রোগে অকর্ম্মণ্য। কিন্তু ভগবান যদি আমায় শক্তিদান করিতেন, তাহা হইলে আমি আমার হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে সমস্ত বঙ্গভূমিকে এই সময়ে উদ্বোধিত করিতাম। হেমচন্দ্র অন্ধ হইয়া কাশীধামে অসহায় পড়িয়া রহিয়াছেন, আর আমরা কেহই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি না!—কেহই তাঁহার খবর লইতেছি না! ধিক আমাদের জাতীয় জীবনে! ধিক আমাদের সাহিত্যিক আস্ফালনে! আমি তোমাকেই লিখিলাম। যাহা যাহা করিতে হয়, তুমিই তাহা করিবে।

স্নেহানুগত
শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

সভাসমিতি করিয়া তাঁহার জন্ত অর্থ সংগ্রহ করা হয়—কবিবর হেমচন্দ্রের এরূপ ইচ্ছা ছিল না। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়কে লিখিত রায় সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিতের একখানি পত্রে এ সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের অভিপ্রায় প্রকটিত আছে। সমগ্র পত্রখানি এ স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়
১৮নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কলিকাতা
১৯শে আষাঢ় ১৩০৬

সুহৃদ্বরেষু

কবিবর হেমচন্দ্রের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপনি আপনার কাগজে ধারাবাহিকরূপে যে সহানুভূতি সূচক প্রবন্ধ প্যারা প্রভৃতি প্রকটিত করিতেছেন, তাহা বাস্তবিকই আপনার প্রগাঢ় সহৃদয়তার পরিচয়। পূর্ব্ববঙ্গের সেই প্রথিতনামা অকৃত্রিম সাহিত্যবান্ধব—বঙ্গের কার্লাইল—মনস্বী রায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর মহোদয়, হেমচন্দ্রের প্রতি সর্ব্বাগ্রে যে সমবেদনা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার স্বভাবসুলভ উদারতা ও মহানুভবতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু ভাই! সভাসমিতি আয়োজন করিয়া আপনারা দুর্ভাগ্য কবির দুঃখ মোচনে অগ্রসর হইয়াছেন! না তাহা করিবেন না, ইহাই আমার অনুরোধ। এ দেশ, সভাসমিতির দেশ নহে। এ দেশের মানুষ মানীর মান রাখিতে জানে না, ব্যথিতের ব্যথা সম্যক্ উপলব্ধি করিতেও পারে না। তাহা না হইলে, আমাদের মধুসূদন, খাইতে না পাইয়া, বিষম রোগগ্রস্ত হইয়া, দাতব্য হাঁসপাতালে দেহত্যাগ করিলেন—সে দৃশ্য তখন কেহ দেখিয়াও দেখিলেন না—আর আজ কি না তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইল। বিশেষ হেমবাবুর নিজের ইচ্ছা নয় যে, সভাসমিতি করিয়া, তাঁহাকে লইয়া মিছা একটা হৈ চৈ করা হয়। এ সম্বন্ধে তিনি আমাকে বহু পত্র লিখিয়াছেন। তবে তাঁহার একটা প্রার্থনা আছে বটে যে, দেশের কোন বিদ্যানুরাগী ধনাঢ্য ব্যক্তি রাজা, জমিদার, ভূস্বামী প্রভৃতি যদি তাঁহাকে মাসিক কিছু কিছু বৃত্তি দেন, তবে বর্ত্তমান এই প্রথম অবস্থায় তাঁহার বিশেষ উপকার হয়। ভাই! দেশে কি এমন ভাগ্যবান্ পরোপকারী মহাত্মা নাই, যিনি বঙ্গের এই প্রবীণ ও প্রধান কবির—বৃত্রসংহার রচয়িতার—এই মলিন দশায় সাহায্য করিয়া আপন অর্থের সার্থকতা সম্পাদন করেন? হায়! যিনি একদিন কল্পনা নেত্রে অমরাবতীর সেই অতুল ঐশ্বর্য্য ও সুখ-সম্পদের সেই উজ্জ্বল চিত্র সন্দর্শন পূর্ব্বক, অদ্ভুত প্রতিভাবলে আপন অমর কাব্যে অঙ্কিত করিয়া বাঙ্গালী পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিলেন, বিধির নির্ব্বন্ধে, আজ তিনি প্রায় অন্ধ ও নিঃসম্বল হইয়া দেশের দ্বারে অতিথি! ভাই! দেশ কি কবির মর্য্যাদা রক্ষা করিবে না? সভাসমিতি আহ্বান করিয়া কালক্ষেপ করা কেন? যাঁহার যেমন সাধ্য তিনি অবিলম্বে কবির নামে ৺কাশীধামে তাহাই পাঠাইয়া দিন। যদি আমাদের প্রকৃতই কিছু মনুষ্যত্ব থাকে, তবে তাহা দেখাইবার এই উপযুক্ত অবসর!

একটা আনন্দ সংবাদ দিই,—এইমাত্র রবিবাবুর এক পত্র পাইলাম যে, স্বাধীন ত্রিপুরার সেই মাননীয় মহারাজ, হেমচন্দ্রের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, হেমচন্দ্রকে তাঁহার জীবিত কাল পর্য্যন্ত ত্রিশ টাকা হারে মাসিক বৃত্তি ও নগদ দুইশত টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন। ভাই! এত চেষ্টা যত্ন ও পরিশ্রম বুঝি এইবার সার্থক হইল। আপনি বুঝিতে পারিতেছেন, কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই ইহার মূলাধার। তাঁহার এই প্রকৃত কবিজনোচিত ব্যবহার স্মরণ করিয়া, আমার চক্ষে জল আসিতেছে। সত্য বলিতে কি, হেমবাবুর এই উপকার আমি যেন আত্ম উপকারের ন্যায় অনুভব করিতেছি। ত্রিপুরার ন্যায় আর দুই এক স্থানে এমনি সাহায্য মিলিলেই আমাদের আরব্ধ কার্য্য শেষ হয়। রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়, যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে আমি পত্র লিখিয়াছি। সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা কি আমাদের আশা পূর্ণ করিবেন না?

প্রীতিপ্রার্থী
শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

কিন্তু হেমচন্দ্রের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বঙ্গবাসী তাঁহার প্রতি সম্মাননা ও সহানুভূতি প্রদর্শন, ব্যক্তি ভাবে না করিয়া জাতিগত ভাবে করাই অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে আহূত সভাসমিতি প্রভৃতির কার্য্যবিবরণ এ স্থলে প্রকাশিত করিবার স্থান নাই।

কবিবর রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় ত্রিপুরাধিপতি মাসিক ৩০৲, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়গণ মাসিক ৩০৲, বিজনীর রাণী অভয়েশ্বরী দেবী মাসিক ২০৲, মাননীয় কাশিমবাজারাধিপতি মাসিক ১৫৲, কোচবিহারাধিপতি মাসিক ৫০৲, সুকবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মাসিক ১০৲, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিক রায় বাহাদুর মাসিক ৫৲ অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কবিবরের কয়েকজন আত্মীয় বন্ধু যথা, স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র, স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত তারাপদ ঘোষ, উমাকালী মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী, যথোচিত মাসিক অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। দেশের প্রধান জমীদারগণ ও অন্যান্য সম্রান্ত ব্যক্তিগণ অনেকেই হেমচন্দ্রকে এককালীন অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে কয়েকখানি পত্র এস্থলে মুদ্রিত করিয়া, কবিবরের দারিদ্র্যহরণের জন্য সকলে কিরূপ ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাহার পরিচয় দিব।

(১)

ওঁ

৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন
যোড়াসাঁকো
কলিকাতা

বহুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

আমার পিতাঠাকুর আপনাকে তাঁহার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানাইতে বলিয়াছেন এবং প্রতিমাসে আপনার সাহায্যার্থে ২০৲ কুড়ি টাকা নিয়মিত পাঠাইবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন। প্রতিমাসের ২০শে তারিখে এখান হইতে টাকা প্রেরিত হইবে। গত মাসের টাকা অত্রসহ পাঠাই অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাসে মাসে ১০৲ টাকা করিয়া দিবেন সেও এই সঙ্গে পাইবেন।

আপনার পুত্র আপনার গ্রন্থাবলী হইতে সংকলন করিয়া যে বাল্যপাঠ্য গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন, আমার নিকট তাহার একখণ্ড প্রেরণ করিলে বিদ্যালয়ে তাহা প্রচার করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইব। কৃতকার্য্য হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

আমরা যে সামান্য দান পাঠাইলাম, আমার পিতৃদেবের আশীর্ব্বাদী স্বরূপ তাহা অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করিলে আনন্দ লাভ করিব। ইতি ৩রা শ্রাবণ ১৩০৬

অনুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২)

Tipperah
State

আগরতলা
২৪ শে আষাঢ়
১৩০৯ ত্রিপুরাব্দ

সবিনয়ে নিবেদনম্

শ্রীশ্রীযুত ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বাহাদুরের আদেশ মত জানাইতেছি বঙ্গসাহিত্যসেবী মাত্রেই আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। এ কৃতজ্ঞতার ঋণ সামান্য অর্থ দ্বারা পরিশোধ হয় না। তথাপি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশে মহারাজ আপনার হস্তে এক কালীন ২০০৲ দুই শত টাকা প্রেরণ করিতেছেন ও প্রতিমাসে নিয়মিত ত্রিশ টাকা করিয়া আপনার নিকট পাঠাইবার জন্য আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন। ভরসা করি আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক মহারাজের এই উপহার গ্রহণ করিয়া সুখী করিবেন।

২০০৲ টাকা মনিঅর্ডার যোগে পাঠান হইতেছে এবং প্রতি বাঙ্গালা মাসের প্রথম ভাগে আপনি একখানা বিল দেওয়ান শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র মহাশয় সংসার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক সদনে পাঠাইলে মাসিক বন্দানি ৩০৲ টাকা যথা সময় প্রেরিত হইবে। বর্ত্তমান মাসের ১লা হইতে সে বন্দানি ধার্য্য হইয়াছে।

বশংবদ
শ্রীমহিমচন্দ্র দেব বর্ম্মণঃ
(কর্ণেল) শ্রীশ্রীযুতের এডিকং

(৩)

পবিত্রাশয় শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়
পবিত্রাশয়েষু।

দৈবদোষে আপনি আজ অন্ধ, চিরজীবন দেশের সেবা করিয়া, বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও আজ আপনি দরিদ্র হইয়াছেন, আপনার বর্ত্তমান অবস্থায় দেশশুদ্ধ লোক দুঃখিত।

বিজনী রাজ সরকারের অবস্থা সমস্তই আপনি অবগত আছেন। নানা কারণে বিজনীর বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, কিন্তু আপনার বর্ত্তমান অবস্থায় সহানুভূতি প্রদর্শন জন্য আপনার জীবনকাল পর্য্যন্ত বিজনী রাজসরকার হইতে মাসিক ২০৲ কুড়ি টাকা করিয়া বর্ত্তমান মাসের ১লা তারিখ হইতে বৃত্তি নির্দ্ধারিত করা গেল।

আমার ইষ্টেটের কলিকাতার মোক্তার শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দত্ত আপনাকে এই কুড়ি টাকা করিয়া দিবেন। আপনার ন্যায় লোকের পক্ষে যদিও ইহা খুব সামান্য, তথাপি আপনার কষ্টের অবস্থায় আমার সহানুভূতি স্বরূপ এই ক্ষুদ্র সাহায্য গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন। ইতি

শ্রীমতী রাণী অভয়েশ্বরী দেবী।

অভয়াপুরী
তারিখ ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ বাং।

(৪)

শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ।
কাশীম্বাজার
শ্রীপুর রাজধানী।

নং ২

অশেষ মানাস্পদ
শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
মহাশয় মানাস্পদেষু—
মোঃ ৺ কাশীধাম

মহাত্মন্

আপনার বর্ত্তমান অবস্থায় শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর আন্তরিক দুঃখিত হইয়া আপনার কাশীবাসের ব্যয়ানুকূল্যে আগামী ভাদ্র মাস হইতে মাসিক ১৫৲ পনর টাকা হিসাবে সাহায্য প্রদান

করিবার মনস্থ করিয়াছেন এবং প্রথম মাসের সাহায্যের টাকা অবিলম্বে প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন। আজ্ঞানুসারে এতৎসহ মনিঅর্ডার যোগে আগামী ভাদ্র মাসের জন্য আপনার সাহায্যার্থে ১৫৲ পনর টাকা প্রেরিত হইল। অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহার প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন। ইতি

(স্বাঃ) শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
সেক্রেটারী

সন ১৩০৬ সাল
তারিখ ৩০শে শ্রাবণ।

দেশের প্রধান জমীদারগণ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ অনেকেই হেমচন্দ্রকে এক কালীন অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রামচরণ মিত্র মহাশয় হাইকোর্টের উকীলগণের নিকট হইতেও কবিবরের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিলেন শুনিয়া হেমচন্দ্র স্বয়ং তাঁহাকে উক্তবিধ প্রয়াস হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার একাংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"I fear therefore that it will not be proper to lay any further burden on my sympathising friends among the pleaders of the High Court. I would request you therefore to drop your project of collecting small subscriptions for me among your brother pleaders, as you intended. I do not know whether you have commenced the work and how far it has proceeded, but under the circumstances stated above, I think it would not be desirable to proceed with it any longer. Are you not also of the same opinion?"

কেবল এদেশে নহে, ইংলণ্ডেও কবিবরের দারিদ্র্য অপনোদনের চেষ্টা হইয়াছিল। অবসর প্রাপ্ত সিবিলিয়ান, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও লেখক স্যর উইলিয়ম উইলসন্ হান্টার সংবাদপত্রে কবিবরের দুরবস্থার কথা পাঠ করিয়া, ইংলণ্ডের 'ইণ্ডিয়া' সংবাদপত্রে একখানি চিঠি লিখিয়া, সম্পাদককে কবির সাহায্যার্থ একটি চাঁদার খাতা খুলিতে অনুরোধ করেন; এবং স্বয়ং ১০০৲ চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হন।

৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

তিনি হেমচন্দ্রের জন্য কেবল ইংলণ্ডে চাঁদা তুলিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন তাহাই নহে, তিনি ভারতের সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট কর্ত্তৃক কবিবরের জন্য পেন্সনের ব্যবস্থা করাইয়া লইবারও সংকল্প করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রকে লিখিত স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষের একখানি পত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

স্যর উইলিয়মের প্রস্তাবানুসারে 'ইণ্ডিয়া' সম্পাদক কবিবরের সাহায্যার্থ একটি চাঁদার খাতা খুলিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত রামচরণ মিত্র সি-আই-ই

কিন্তু "ভারত সঙ্গীতে"র কবির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবার মত, হাণ্টারের ন্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য ও সাহিত্য-সেবকের বন্ধু, ইংলণ্ডে অধিক ছিল না এবং হাণ্টারের এই সাধু চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশেষে স্যর উইলিয়ম উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া তৎসহযোগে কবিবরকে একশত টাকা পাঠাইয়া দেন :—

Oaken Holt
Near Oxford.
Novr. 20. 1899.

My dear Raja,

I heard sometime ago that Hem Chandra Bannerjee has lost his eye sight and is in straitened circumstances.' It eemed to me that the fact had only o be known in order that the admirers f the great Bengalee Poet should esteem t a privilege to assist him, and I asked he Editor of "India" to open a subscription vith my modest offering of a hundred upees. He writes to me, however, that here has been no response, so I venture o ask your advice as to how I should act.

have always regarded Hem Chandra annerjee as in a special sense a Bengali ational Poet, whose genius has inspired he younger generation and whose verse ill exercise a lasting influence on the evelopment of the Bengalee language. f you think fit, will you convey to him ne hundred rupees with my hearty espect for his talents and his work in ife? But if you think he would rather ot receive a pecuniary gift, kindly give im my friendly and sincere wishes for is good health and my hopes that he as still good work before him to do.

The enclosed cheque will realise omewhat, over Rs. 100—If you will indly cash it at a Calcutta Bank and end him the proceeds. I hope you are ell and with best wishes to you for the oming new year.

I am, Sincerely yours
(Sd.) W. W. Hunter.

স্যর উইলিয়ম হাণ্টারের ন্যায় প্রতিভাশালী বিদেশীয় লেখকের এই শ্রদ্ধার নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়া হেমচন্দ্র [illegible] হৃদয়ে তাঁহাকে যে উত্তর দিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত এফ্, এইচ্, স্ক্রাইন বিরচিত স্যর উইলিয়ম হাণ্টারের জীবন চরিত হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—

স্যর ডাব্লিউ, ডাব্লিউ হণ্টার

December, 20, 1899.

Dear Sir,

I cannot sufficiently express to you my gratitude for your generous gift to me, and for the kind and complimentary terms in which you speak of me in your letter to Raja Peary Mohan Mukerji. Most precious do I reckon both the gift and the letter, as coming from a gentleman of your great mental endowments, wide culture and literary fame and as marking

a generous appreciation of my humble efforts in the field of Bengali poetry. Loss of sight is in itself affliction enough. In my case, unfortunately, it is associated with want of nessesary means, and this in the evening of life, when means are most needed. As the poet says, "Sorrow's crown of sorrow is having known better days." Keen is my repentance now that I bad not foresight enough in my "better days." I must bear my misfortune with fortitude, and try to do any useful work that may still be in my power to do. As I can no longer write, I do all I can, ie, put my name on the part of the paper that is pointed out to me.

Yours Sinceerly

(Sd.) Hem Chandra Bannerjea.

গ্রন্থাবলীর আয়। হেমচন্দ্র কখনও গ্রন্থের আয় স্বয়ং গ্রহণ করেন নাই। কাব্যগ্রন্থ লিখিয়া এদে

শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় C. S. I.

কয়জন অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন? বিশেষতঃ হেমচন্দ্র কখনও অর্থের জন্য লেখেন নাই, গ্রন্থপ্রকাশদ্বারা অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজনও হয় নাই। সেকালে সকলেই সাহিত্য সেবা একটি মহৎ ব্রত বলিয়া মনে করিতেন। একবার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে হেমচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার সাহিত্য বন্ধুগণের মধ্যে কেবল বঙ্কিমচন্দ্রই (শেষ জীবনে) বহি হইতে মাসে ৫।৬ শত টাকা পাইতেন। ইহাও আজি কালিকার তুলনায় বোধ হয় অতি সামান্য। উদার চরিত্র হেমচন্দ্র পৃথিবীতে সকলকেই আপনার ন্যায় মনে করিতেন এবং সময়ে সময়ে প্রতারিত হইতেন। ৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ লিখিয়াছেন;—

“‘আর্য্য সাহিত্য সমিতি’ নামধারী কতিপয় হৃদয়হীন ব্যক্তি [হেমচন্দ্রের] গ্রন্থাবলীর প্রচারে অর্থ সংগ্রহ করে এবং কবিকে বঞ্চিত করিয়া ও আদালতে আপনাদিগকে দোষহীন বলিয়া নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়। ইতঃপূর্ব্বে কবি কখনও গ্রন্থের আয় স্বয়ং গ্রহণ করেন নাই। শেষে এই আয়ের উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল।”

স্যর ৺চন্দ্রমাধব ঘোষ

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় কবিবরের শেষ জীবনে তাঁহার গ্রন্থাবলীর নূতন সংস্করণ প্রকাশিত

করিয়া এবং "হিতবাদীর" গ্রাহকগণের নিকট তাহা বিক্রয় করিয়া কবিবরের কিঞ্চিৎ অর্থাগমের উপায় করিয়া দেন। এ সম্বন্ধে কাব্যবিশারদ মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্য—

"১৩০৬ সালে কবিবর হেমবাবু, তাঁহার গ্রন্থ-স্বত্ব ব্যক্তি-বিশেষকে পাঁচশত টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতেছেন এবং তাঁহার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, এই সংবাদ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যখন আমাকে জানাইলেন, তখন আমি হেমবাবুকে এ সম্বন্ধে পত্র লিখিয়া অন্যপ্রকার বন্দোবস্ত করিবার পরামর্শ প্রদান করি। ইহ ফলে ক্রমে আমার সহিত এই চুক্তি হয় যে, আমি সাধারণের নিকট হইতে অন্যূন দুই হাজার টাকা তাঁহাকে পুস্তক বিক্রয় করাইয়াই তুলিয়া দিব। অধিক তুলিতে পারি ভালই, নচেৎ দুই হাজার টাকার দায়ী আমি থাকিব। গ্রন্থস্বত্ব হেমবাবুরই থাকিবে, তবে আমি যখন যত ইচ্ছা গ্রন্থ ছাপিয়া বিক্রয় করিতে পারিব। এই অধিকার ভিন্ন আমার নিজের আর কোন অধিকার থাকিবে না। হেমবাবু নিজেও যত ইচ্ছা পুস্তক ছাপিতে বা অন্যকে ছাপিবার অধিকার দিতে পারিবেন, তবে দেড়বৎসরের মধ্যে তিনি স্কুলপাঠ্য কবিতাবলী ভিন্ন আর কিছু ছাপিবেন না, বা ছাপিবার অধিকার অন্যকে দিবেন না। ইত্যাদি মর্ম্মে স্বর্গীয় কবির সহিত আমার চুক্তি হয়। যে দুই সহস্র মুদ্রার দায়িত্ব আমি লইয়াছিলাম, পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের পূর্ব্বেই তাঁহাকে সেই প্রতিশ্রুত মুদ্রা প্রদান করি, ও শেষে ইহার কত অধিক দিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহা হেমবাবু ও তাঁহার বন্ধুবর্গ অবগত ছিলেন। * * * *

দরিদ্র অবস্থাতেও কবির হৃদয় উন্নত ছিল। 'ভিখারী' হইয়াও তিনি উপস্বত্ববিষয়ক হিসাব দেখিতে চাহেন নাই, একদিনও দেখেন নাই। এ বিষয়ে হিতবাদীতে লিখিত হইয়াছে—

'হিসাব পরীক্ষার জন্য জন্য আমরা হেমচন্দ্রকে বার বার বিরক্ত করিয়াছিলাম। প্রথম অনুরোধের পর তিনি দেখিতে অস্বীকার করিলে, আমি তাঁহাকে হিসাব পরীক্ষা করিবার জন্য লোক পাঠাইতে বলি, এবং তাঁহাকে শেষ টাকার ভগ্নাংশ পূর্ণ করিয়া আরও এক হাজার টাকা দিব বলি। তাহাতে তিনি ১৩০৭, ২৫ শে আষাঢ় আমাদিগকে একখানি পত্রে এইরূপ লিখিয়াছিলেন—

"আর আপনি একজন লোক পাঠাইয়া দিয়া হিসাব পত্র দেখিবার কথা বলিয়াছিলেন তাহার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। আপনার কথায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আপনি বলিয়া গিয়াছেন যে, এবছরে আমাকে আর এক হাজার টাকা দিতে পারিবেন, এই কথাই আমার যথেষ্ট। জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন ও আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন, সর্ব্বান্তঃকরণে আমি ইহাই প্রার্থনা করি।"

এই টাকাও আমি তাঁহাকে গিয়া দিয়া আসি। এবিষয়ে যদিও তিনি 'যাহা প্রাপ্য' তাহা পাইয়াছেন স্বীকার করেন, তথাপি আমার মনের তৃপ্তি হয় নাই। আমি ইহার বহু পরেও হিসাব পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে বিনয় সহকারে অনুরোধ করি। তাহাতে তিনি ১৩০৯ সালের ১২ই বৈশাখ আমাকে এইরূপ লিখিয়া পাঠান—

"এ হতভাগ্য দীনহীন অন্ধের আপনি বিস্তর উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্য চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছি ও থাকিব। অন্তর্য্যামী ভগবানই জানেন যে আপনার প্রতি আমার মনের ভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। তবে কেন যে আমার প্রতি আপনার চিত্তবৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু সেই জন্য মর্ম্মান্তিক দুঃখিত আছি। যদি কখনও আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে সকল কথা নিবেদন করিব এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিব। জগদীশ্বর সর্ব্বপ্রকারে আপনার মঙ্গল করুন ইহাই এ দীনহীন অন্ধের প্রার্থনা। এই প্রার্থনাকরা ভিন্ন আমার আর কিছু করিবার সাধ্য নাই।

আপনার অনুগত ও আশ্রিত
(স্বাঃ) শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

"ইহার পরে এ সম্বন্ধে আর পীড়াপীড়ি করা অসাধ্য বলিয়া আমি হিসাবের কথা মুখে আনি নাই।

"হেমচন্দ্র নিজগুণে প্রতিপত্রেই বিনয় প্রকাশ করিতেন। এ অধমের সহিত টেক্স্টবুক কমিটির কথা,

গবর্ণমেণ্টের বৃত্তির কথা ও অন্যান্য অনেক কথার আলোচনা করিতেন, আমার অকিঞ্চিৎকর পরামর্শ নিজগুণে গ্রহণ করিতেন। নিম্নলিখিত পত্রে এ বিষয়ের আভাস পাইবেন—

"একটিবার দয়া করিয়া এ দীনহীনের বাটীতে যদি পদার্পণ করেন, তাহা হইলে কৃতার্থ হই। আপনার সময়ের এক একবিন্দু যে কত মূল্যবান তাহা আমি জানি; কিন্তু কি করিব, ভগবান আমাকে একেবারে মৃতপ্রায় করিয়া রাখিয়াছেন। আপনি দয়া না করিলে আমার কিছুই করিবার সাধ্য নাই। করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি যে দয়া করিয়া ৫ মিনিটের জন্য একটীবার দেখা দিবেন। একটী বিষয়ে আপনার উপদেশ লওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে এবং আপনার সহিত সাক্ষাৎ না হইলে সে উপদেশ পাইতে পারিব না, সেই জন্যই এরূপ আগ্রহের সহিত আপনাকে একটু কষ্ট স্বীকার করিবার জন্য অনুনয় করিতেছি। আমি বড় হতভাগ্য! নিজ মাহাত্ম্যে এই কথা স্মরণ করিয়া আমার প্রতি দয়া করিবেন। আমি আপনার একান্ত অনুগত এবং দয়ার পাত্র। কোন অপরাধ করিয়া থাকি তাহা মার্জ্জনা করিবেন। অধিক আর কি লিখিব ইতি—

আপনার বশংবদ
(স্বাঃ) শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

"আর একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছেন—

"আমার শরীর ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, এই জন্যই ইহা লিখিয়া আপনাকে বিরক্ত করিলাম। কবে আসিতে পারিবেন, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়া জানাইলে যার পর নাই সুখী হইব। মরিবার পূর্ব্বে যতবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয়, ততই আমার পক্ষে সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয়। অধিক আর কি লিখিব।

আপনার অনুগত ও আশ্রিত
(স্বাঃ) শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

"এত স্নেহ, এত বিনয় এত সৌজন্য, আমি এ জন্মে ভুলিতে পারিব না। এরূপ বহুসংখ্যক পত্র আমার আমার নিকটে আছে—জনসমাজে সেগুলি প্রচার করা আমার অনভিপ্রেত। যাহা প্রকাশ করিলাম তাহাও আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।"

ক্রমশঃ

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

"আমার দেখা লোক"

১। দারোগা জিন্নৎ হোসেন।

আমি তখন (ইং ১৮৮৩ সাল) আরারিয়া মহকুমায় কায করি। কাছারিতে যে সকল গুরুতর মোকদ্দমার দরখাস্ত দাখিল হয়, প্রায়ই তাহাতে প্রার্থনা থাকে যে সাক্ষী তলব করিয়া কাছারিতেই বিচার করা হউক; অথবা যদিই প্রথমে একটা পুলিশ তদারকের আজ্ঞা হয়, তাহা হইলে যেন জিন্নৎ হোসেন দারোগার উপর ঐ তদারকের ভার দেওয়া হয়। ক্রমশঃ লক্ষ্য করিলাম যে, ধনে এবং লোকবলে যে পক্ষ দুর্ব্বল, সেই পক্ষ হইতেই ঐরূপ প্রার্থনা হইয়া থাকে। মোক্তার আমলা এবং অপর লোকের নিকটও শুনিলাম যে দারোগা জিন্নৎ হোসেনের ন্যায় খাঁটি লোক, পুলিস বিভাগে কেন, যে কোন সরকারী বিভাগে এবং যাঁহারা সাধুর বেশ ধারণ করেন সেরূপ দলের মধ্যেও বিরল।

জিন্নৎ হোসেনের নিজের একখানি গোরুর গাড়ী ছিল এবং একটি মুসলমান গাড়োয়ান ছিল। জিন্নৎ হোসেন সেই গোরুর গাড়ীর উপর ছাপ্পর দিয়া, তাহা

তেই নিজের বস্ত্রাদি, আহার্য্যদ্রব্য, এমন কি জ্বালানি কাষ্ঠ পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া মফঃস্বলে যাইতেন। মোকদ্দমার তদারকে গিয়া, সে গ্রামের কূপ হইতে নিজের দড়ি কলসী দ্বারা একটু জলমাত্র তিনি লইতেন, আর কিছুই লইতেন না। গাড়ীর ছাপ্পরে তেরপাল দেওয়া ছিল, অপর দুইখণ্ড তেরপালও সঙ্গে থাকিত। বৃষ্টির সময়েও বৃক্ষতলে গোরুর গাড়ীতে তিনি বাস করিতেন, কাহারও গৃহে যাইতেন না। তিনি মনে করিতেন মানুষের মন স্বতঃই অনিচ্ছুক, পরবশ হইতেই স্বভাবতঃ ভালবাসে, কোন পক্ষের আত্মীয় বা পভুক্ষক্ত লোকের বাড়ীতে থাকিলে, নিজের অজ্ঞাতসারেই সেইদিকে মন ফিরিতেই পারে। সিধা প্রভৃতি লইলে ত কথাই নাই। ক্ষুদ্রগ্রামের বাসিন্দারা, মনকে শেষ পর্য্যন্ত নিরপেক্ষ কেহই প্রায় রাখিতে সক্ষম হয় না - একটা না একটা দিকে মন অল্পবিস্তর ঝুঁকিয়া যায়—এমন কি দোষীর শাস্তি সম্বন্ধেও লোকে ভাবে—ও ব্যক্তি দোষী বটে ; কিন্তু উহার বিরুদ্ধে নালিস করাটা উচিত হয় নাই। ন্যায়পক্ষে দৃঢ়তাও লোকে দোষাবহ মনে করে।

জিন্নৎ হোসেনের রিপোর্টে কোন্ পক্ষের কথা কতদূর সত্য তাহার সমস্তই নির্ণয়ের চেষ্টা থাকিত। লোকটারও তীক্ষ্ণবুদ্ধি, পরিশ্রম করার শক্তি এবং নিরপেক্ষতা দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইতাম ; মনুষ্যত্বের উপর ভক্তি বৃদ্ধি হইত।

কিছুদিন পরে শুনিলাম, জিন্নৎহোসেন দারোগার বেতন ৬০৲ লইতে ৩০৲ হইয়াছে! পুলিস সাহেব তাঁহাকে অকর্ম্মণ্য স্থির করিয়া বেতন হ্রাস করিয়া দিয়াছেন, এবং সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে যদি কার্য্যে ক্ষিপ্রকারিতা দেখাইতে না পারেন, তাহা হইলে হেড কনেষ্টবলের পদে নামিতে হইবে। পুলিস বিভাগে উকিল বাবুদের ন্যায় লম্বা লম্বা রিপোর্ট লেখার কোন প্রয়োজন নাই, মোকদ্দমার নিষ্পত্তি (কেস্ ডিস্পোজ অফ্) করাই আবশ্যক। চুল চিরিয়া বিচার ব্যবস্থা পুলিসের জন্য নহে—শীঘ্র শীঘ্র যাহা হয় একটা হইয়া গেলেই সব চুকিয়া গেল এবং তাহাই পুলিসডিপার্টমেণ্ট এবং ফৌজদারী হাকিমদিগের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত বলিয়া রিটার্ণে সেইরূপ ঘর ফাঁদিয়া দেওয়া আছে। কোর্ট সাব্ইন্স্পেক্টরকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "জিন্নৎ হোসেন পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তি ; স্বধর্ম্মের সকল নিয়ম নিখুঁৎভাবে পালন করেন ; মন এমনই উদার হইয়াছে যে ব্যবহারে তিনি হিন্দু কি মুসলমান বুঝা যায় না। মুসলমানদিগের মধ্যে প্রায়ই স্বধর্ম্মীর উপর একটু বেশী টান থাকে ; কিন্তু জিন্নৎ হোসেনের কোন কার্য্যে কাহারও উপর কোন প্রকার আকর্ষণ, রাগ কি বিরাগ কেহ কখনও লক্ষ্য করিতে পায় না ; ধনী সম্ভ্রান্ত মাননীয় মুসলমান জমিদারের বিরুদ্ধেও গরীব হিন্দু প্রজা জিন্নৎ হোসেনের দ্বারা তদারক প্রার্থনা করে। যদি ভাল মুসলমানেও কোন বিশেষ ক্ষেত্রে হঠাৎ ধৈর্য্যচ্যুতি জন্য জমিদারী কাছারিতে প্রজাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার হুকুম দিয়া একটু মারপীট করিয়া ফেলিয়া থাকেন, এবং অল্পেই ছাড়িয়া দিয়াও থাকেন, তথাপি জিন্নৎ হোসেনের কাছে রেয়াত হয় না। 'মোকদ্দমা সামান্য মারপীটের, আবদ্ধ-রাখার নয় ; সুতরাং পুলিস গ্রাহ্য মোকদ্দমা নয়' এরূপভাবে রিপোর্ট দিয়া উভয় পক্ষই আপোষে মিটাইতে চাহিলেও তাহা দেন না। রিপোর্ট ঠিকই দেন, এবং আপোষে মিটাইবার জন্য উভয়কেই সঙ্গে সঙ্গে বলেন, 'এসকল মোকদ্দমা আপোষে মিটানর আইনও আছে, কাছারিতে দরখাস্ত দিয়া মিটাও। অণুমাত্র ধর্ম্মহানি করিয়া রিপোর্ট দেওয়া' আমার দ্বারা ঘটিবে না।"

এরূপ লোকের পদের অবনতি কেন হইল, জিজ্ঞাসায় কোর্ট বাবু বলিলেন, "কলিকাল! একালে ঐহিক উন্নতি কুপথেই হইতে দেখা যায়! সে উন্নতি স্থায়ী হয় না বটে ; কিন্তু ভাল লোকের ঐহিক সুবিধা মাঝারি লোকের অধীনে কেন হইবে? আমাদের মধ্যে অনেকেই কেহ খুনের সংবাদ দিলে বলি ; "অনেক সময় যে খুন করে সেই, খবর দেয়।" লোকটা তৎক্ষণাৎ দমিয়া পড়ে। তখন বলি পাল্কী ও বার জন মজবুত বেহারা আন্।" খুন হওয়ার সংবাদ যখন পাই, তখন হইতে চারি ঘণ্টা পরের পাওয়া বলিয়া লিখি। দ্রুত চালিত বা বাহিত যান

বাহনে পৌছিয়াও পৌছান খবরটা ঘণ্টা দুই পূর্ব্বের বলিয়া লেখা হয়। জিন্নৎ হোসেন এসব করে না, সমস্তই সে ঠিক ঠিক লেখে। গোরুর গাড়িতে যাইতেও তার দেরি হয়। সাহেবেরা ত মোকদ্দমার কথা ভাবেন না; কখন্ সংবাদপ্রাপ্তি, কতটা দূর, কখন্ পৌছান এবং কতক্ষণে শেষ রিপোর্ট—এই মাত্র দেখিয়া "কুইক" (ক্ষিপ্র) বা "স্লো" (দীর্ঘসূত্রী) বিচার করেন। আমাদের পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবস্থায় "কুইক" এবং "এনার্জেটিক" (উত্থানশীল) মনে করিতেই হইবে! জিন্নৎ হোসেনের সত্য কথায় তিনি একান্তই "স্লো" (ঢিমাচালের) সাব্যস্ত হইয়াছেন। শত ধমকেও তাঁহার চাল বিগড়ায় না, সত্য পথেই থাকেন! ঘুস লয়েন না; কাজেই তেজী ঘোড়া রাখিতে পারেন না। পুলিস কর্ম্মচারীর ঘোড়া রাখার নিয়ম আছে বলিয়া জিন্নতের একটা দলচরী টাটু আছে। সেইটা দেখিয়াই পুলিস সাহেব রাগিয়া আগুন। আর তার পরেই পদের অবনতি হইল।"

হউক! কিন্তু "সুদীর্ঘ" পরকাল আদর্শ দারোগা বলিয়া তাঁহার যশ ঘোষণা করিবে এবং শত সহস্রের আশীর্ব্বাদ তাঁহারই।

জিন্নৎ হোসেনের শেষ কি হইল জানিতে পারি নাই। তিনি দীর্ঘকালের ছুটী লইয়া তাঁর গুরুর নিকট গিয়াছিলেন শুনিয়াছিলাম। তাঁহার সেই ছুটী শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমাকে আরারিয়া হইতে জ্বরাক্রান্ত হইয়া ছুটী লইয়া সরিতে হয়।

২। দারোগা কাশীপ্রসাদ।

২। কাশীপ্রসাদ দারোগাকেও আরারিয়াতেই দেখিয়াছিলাম। সম্পুর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লোক।

কাশীপ্রসাদ সিকৃটি আউট পোষ্টের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নেপালের সীমাবর্ত্তী স্থলে আউট পোষ্টকে "নাকা" বলে। সিকৃটি নাকার কয়েক হাত উত্তরেই নেপালের সীমা, ঐ সীমানায় একটা লম্বা ড্রেনের ন্যায় সোজা খাত আছে। উহার উভয় পার্শ্বের মাটী উচ্চ এবং ভিতর দিকে ঢালু; পরিষ্কার ঘাস বসান। যেখানে যেখানে সীমানার লাইন বাঁকিয়াছে, সেই সেই স্থানে সাদা চূণকাম করা থাম (পিলার) খাত মধ্যেই প্রস্তুত করা আছে এবং তাহাতে উহার নম্বর বড় বড় কালো অক্ষরে লেখা আছে। প্রতিবর্ষে বৃটিশ সাবডিবিজানগুলি হইতে নেপাল সীমানা ঠিক আছে কি না, থামগুলি ঠিক আছে কি না রিপোর্ট পাঠাইতে হয়। সীমানার লাইন দোরস্ত রাখা ও থাম মেরামতের ভার পূর্ত্ত বিভাগের উপর ন্যস্ত। নেপাল দরবার এই খরচের অর্দ্ধেক বহন করেন কি না জানি না। খাতের মধ্যভাগ দিয়া থামের মধ্যভাগ দিয়া যে কল্পিত রেখা গিয়াছে, তাহাই উভয় রাজ্যের সীমা। ঐ সীমা পার হইলেই উভয় রাজ্যে পুলিশ অপরাধীর অনুসরণে নিরস্ত হয়; পররাজ্যে গ্রেপ্তার করিতে পারে না, নেপালের রেসিডেন্সি এবং ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট মধ্যে লেখাপড়া চলে। পরস্পরের রাজ্যে পলাতক বড় বড় অপরাধীদিগকে ধরিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা সন্ধির (একষ্ট্রাডিসান ট্রীটি) দ্বারা হইয়া গিয়াছে।

কাশীপ্রসাদের একটা উৎকৃষ্ট ঘোড়া ছিল। মূল্য আড়াইশত টাকার কম নয়। তাহার বেতন তখন ৫০৲ টাকা মাত্র। ক্ষিপ্রকর্ম্মা পুলিস অফিসার বলিয়া কাশীপ্রসাদের খ্যাতি ছিল।

একদিন রিপোর্ট আসিল যে কাশীপ্রসাদ দারোগার আউটপোষ্ট সংলগ্ন আবাস-গৃহে চুরি হইয়া গিয়াছে। নিকটবর্ত্তী পলাসী আউটপোষ্টের দারোগার নিকট এজেহার। বিস্তর গহনাপত্র চুরি। পরে পলাসী থানার দারোগা আসামী ও চোরাই মাল চালান্ দিলেন। মোকদ্দমায় সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ হইল যে নেপাল হইতে এক দল "কঞ্জড়" (ইহারা বেদিয়ার ন্যায় গৃহহীন জাতি "সির্কি" বা মাদুরের তাম্বুতে বাস করে) সীমানা পার হইয়া আসিয়াছিল; উহারাই দারোগার ঘরে চুরি করে। উহারা সরিয়া পড়ার পূর্ব্বেই কাশীপ্রসাদ উহাদের খানাতল্লাসী করিয়া মাল উদ্ধারান্তে পলাসীর দারোগার নিকট প্রথম এত্তেলা দেয়।

কঞ্জড়েরা বলিল তাহারা নির্দ্দোষ, নেপালের প্রথামত সেখানের ধনীরা যথেষ্ট স্বর্ণালঙ্কার ও তৈজসপত্র সহ মৃত-

দেহ দাহ করিতে আসেন, উহারা সেই সকল দ্রব্য লাভ করিয়া থাকে ; চুরি করে নাই।

দারোগা বলেন যে তাঁহার পত্নী বড়ই ধনশালী ব্যক্তির কন্যা ; তাঁহার শ্বশুরের বহুগোষ্ঠী ছিল ; এক্ষণে সকলেই মৃত। তাঁহার পত্নী তাঁহাদের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী ; সেই জন্যই ছয় গাছা সোণার হাঁসুলি, এগারটা বাঁট্‌লো (এক প্রকার পশ্চিমা হাঁড়ি) প্রভৃতি দ্রব্য তাঁহার বাসায় ছিল।

আসামীরা কোন সাক্ষ্য সাবুদ মানিল না। দারোগার তরফে তাঁহার চাকর, বামুণ ও একজন কনষ্টেবল কেহ কোনও দ্রব্য, কেহ কোনও দ্রব্য সনাক্ত করিল। কঞ্জড়দের অবশ্য সাজা হইয়া গেল ; কিন্তু কাছারিতে অনেকেই অনুমান করিলেন যে কঞ্জড়েরা নেপালে চুরি ডাকাতি করিয়া যে কয়েক সহস্র টাকার মাল লইয়া বৃটিশ অধিকারে পলাইয়া আসিয়াছিল, "চোরের উপর বাটপাড়ি" দ্বারা তাহা কাশীপ্রসাদ দারোগার হইয়া গেল! সন্দেহে খানাতল্লাসি দ্বারা উহাদের নিকট অনেক জিনিস পাওয়া যাওয়াতে দারোগা সেগুলি 'সন্দেহের মাল' বলিয়া সরকারী মালখানায় জমা দেওয়ার অপেক্ষা, নিজের স্ত্রীধন তৈয়ারি করিয়া লইতে দ্বিধা করিলেন না। এ অনুমানটা সত্য হইলে লোকটা "ক্ষিপ্রকর্ম্মা" সন্দেহ নাই! বেতন বৃদ্ধিও হইতেছিল। শেষে "সমূলোন্তু বিনশ্যতি" হইল কি না সে সংবাদ জানি না ; কিন্তু শাস্ত্রের কোন বাক্যই মিথ্যা নয় বলিয়া বিশ্বাস করি।*

৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়।

---

* পূজ্যপাদ লেখক মহোদয়ের অপ্রকাশিত গ্রন্থ "আমার দেখা লোক" হইতে এই প্রথম প্রবন্ধটী আমরা সাদরে প্রকাশ করিলাম। উক্ত গ্রন্থে এইরূপ বহুতর ছোট বড় স্বদেশী বিদেশী লোকের চরিত্র অতি নিপুণ ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। ক্রমে আরও কয়েকটি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। মাঃ মঃ সঃ

দারার দুরদৃষ্ট

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মোগলকুলতিলক বাদশাহ আকবরের জীবমানে জাহাঙ্গীর বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, কিন্তু পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যুদ্ধ হয় নাই, পুত্র আসিয়া পিতার ক্ষমা ভিক্ষা করায় বিসম্বাদের অবসান হইয়া যায়। জাহাঙ্গীর যখন দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন, রাজপুত্র খস্রু সে সময়ে রাজদ্রোহী হইয়াছিলেন, সেবারেও পুত্র ক্ষমা চাহিয়া সে অকল্যাণকর বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া দেয়। রাজপুত্র খুরম (অর্থাৎ বাদশাহ শাহজাহান) জাহাঙ্গীরের জীবিতাবস্থায় পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাবৎ খাঁর সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন—সে বিবাদ সেইরূপে মিটিয়া যায়। সেই রাজকুমার 'খুরম' পিতা জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পরে শ্বশুর আসব্ খাঁর সহায়তায় হিন্দুস্থানের রত্ন সিংহাসনে 'শাহজাহান' উপাধি ধারণ করিয়া যেদিন সমাসীন হইয়াছিলেন, সেদিনে হয়ত ভবিষ্যতে অমঙ্গলের আশঙ্কা তাঁহার হৃদয় মন হইতে বহুলক্ষ যোজন দূরে ছিল ; তাঁহার পিতার প্রতি দুর্ব্বিনীতাচরণ যে তদীয় পুত্র কর্ত্তৃক পুনরভিনীত হইতে পারে, সে ভয় হয়ত তাঁহার মনে দিনেকের জন্যও উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষদেবতাস্বরূপ পিতার দীর্ঘশ্বাস ব্যর্থ হয় নাই! একের মনোবেদনার দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুজল কাল পাইয়া অপরের পক্ষে কালস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় ;— শাহ্‌জাহানেরও তাহাই হইয়াছিল।

আয়ুঃসূর্য্য যে সময়ে অস্তাচলের অন্তরালে অন্তর্হিত হইবার জন্য উন্মুখ হইয়াছে, রুগ্ন বৃদ্ধ সম্রাটের স্বল্পা-

বশিষ্ট দিনগুলি যখন যথাসম্ভব আরামে কাটিয়া যাওয়াই সর্ব্বতোভাবে উচিত ছিল, পুত্র, পুত্রবধূ ও পৌত্র, দুহিতা, দৌহিত্র এবং অপরাপর আত্মীয় স্বজনগণের, সেবা এবং শুশ্রূষায় যেদিনে সম্রাট্ শাহজাহানের জীবন সন্ধ্যা শারদ-সন্ধ্যার বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত, হইয়া মৃত্যুর মহান্ধকারের মধ্যে সুখে বিলীন হইয়া যাইবে, সেদিনে যে এরূপভাবে পুত্রকৃত লাঞ্ছনার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য, তাঁহাকে দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করিয়া বীরবাঞ্ছিত যুদ্ধ-মৃত্যুর জন্য দাঁড়াইতে হইবে, ইহা তাঁহার উন্মাদ স্বপ্নেরও অতীত ছিল। কিন্তু দুরদৃষ্ট তাহাই ঘটাইল! একদিকে ঔরঙ্গজীব কর্ত্তৃক পরিচালিত বিজয়দর্পিত অংসখ্য গোলন্দাজসেনার হস্তনিক্ষিপ্ত অগ্নিময় লৌহপিণ্ডের অজস্র বর্ষণে দুর্গপ্রাচীর ভগ্নপ্রায় হইয়া পড়িতেছে, অপরদিকে একদা দুর্দ্ধর্ষ এবং অধুনা পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত বৃদ্ধ শাহজাহানের অনুজ্ঞায় তাঁহার শরীররক্ষী কতিপয় হাব্সী খোজা ও তাতার প্রহরীর দুর্গ রক্ষার্থ প্রাণপণ চেষ্টা! এই বলীয়ান্ ও দুর্ব্বলের অসম যুদ্ধ ব্যাপারের ফল একরূপ সুনিশ্চিত হইলেও, ঔরঙ্গজীব সপ্তাহকালের বহু চেষ্টাতেও দুর্গ অধিকার করিতে পারেন নাই। লোকপ্রিয় বৃদ্ধ সম্রাট্ শাহজাহানের স্নেহ পরিপালিত শরীররক্ষী ক্ষুদ্র সেনাদল নিজপ্রাণ তুচ্ছ করিয়া দুর্গ রক্ষার জন্য অদ্ভুত সমরকৌশল দেখাইয়াছিল। কেশরী বৃদ্ধ হইলেও কেশরী, আবাল্য যুদ্ধনিপুণ, অসংখ্য সমরবিজয়ী, রোগগ্রস্ত দুর্ব্বল সম্রাট্ শাহজাহানের পরিচালনায় তাঁহার শরীররক্ষিগণ যে অপূর্ব্ব রণকৌশল দেখাইয়াছিল, তাহা ঔরঙ্গজীবের ন্যায় সমরকুশল সেনাপতিকেও স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল। আগ্রার প্রাসাদদুর্গে পয়ঃপ্রণালী দ্বারা যমুনা হইতে জল আনা হইত, সেই জলে প্রাসাদস্থ সম্রাট্ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রতম অনুজীবী পর্য্যন্ত সকলেরই স্নান পান নির্ব্বাহ হইত। সপ্তাহকাল দুর্গ অবরোধের পরও যখন দুর্গবাসিগণ আত্মসমর্পণ করিল না, তখন ঔরঙ্গজীব কৌশলে রজনীযোগে দুর্গে জল লইয়া যাইবার পথ দখল করিয়া লইয়া উহা রুদ্ধ করিয়া দিল এবং সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত করিয়া সেই জলপথ দিবারাত্র রক্ষা করিতে লাগিল, যাহাতে সম্রাটের ক্ষুদ্র সেনাদল সেই পয়ঃপ্রবাহ পুনরায় তাহাদের আয়ত্তে আনিতে না পারে। নিদাঘের প্রাণান্তকর সূর্য্যতাপে জলবিন্দু বিরহিত প্রাসাদ দুর্গ মরুভূমির আকার ধারণ করিল; এবং বৃদ্ধ সম্রাট্ শাহজাহান এবং তাঁহার অন্তঃপুরচারিণী বেগমগণ হইতে আরম্ভ করিয়া, যতগুলি প্রাণী দুর্গে ছিল, তাহারা সকলেই নিদাঘ মধ্যাহ্নের অসহ্য তৃষ্ণায় একবিন্দু জলের জন্য ত্রাহি ত্রাহি রব করিতে লাগিল। কিন্তু হায়, জল কোথায়! একমাত্র জল আসিবার পথ ঔরঙ্গজীব রুদ্ধ করিয়া দুর্গের পতনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

বৃদ্ধ সম্রাটের শরীররক্ষী সেনাদল তাঁহার প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া তখনও অসীম সাহসে দুর্গরক্ষার্থ যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু গ্রীষ্মের দিনে জলাভাবে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া যুদ্ধে লিপ্ত থাকা মনুষ্যসাধ্যের অতীত। তাহারা সম্রাটের নিকট জল প্রার্থনা করিতে লাগিল। কিন্তু নিরুপায় বাদশাহ কোন পথই খুঁজিয়া পাইলেন না। সেনাদলকে জল দিয়া তৃপ্ত করা দূরের কথা, তিনি স্বয়ংই জলাভাবে, রুগ্ন শরীরে অশেষ যাতনা ভোগ করিতে লাগিলেন, এবং প্রাণসমা কন্যা ও বেগমগণকে পিপাসায় মৃতপ্রায় দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে কি শেল বিদ্ধ হইতেছিল, তাহা কেবল তিনিই জানিতেছিলেন; আজ সার্দ্ধদ্বিশত বৎসর পরে অনুমান দ্বারা তাহার উপলব্ধি অসম্ভব। অনন্যোপায় শাহজাহান তখন গত্যন্তর বিরহিত হইয়া পুত্র ঔরঙ্গজীবের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন এবং সেই দূত দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন—"যে হিন্দুজাতিকে ঔরঙ্গজীব কাফের বলিয়া অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, সেই হিন্দু তাহাদের মৃত পিতৃগণের জন্য তর্পণের জল মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া পরলোকের উদ্দেশে প্রেরণ করিয়া থাকে; আর পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের একান্ত পক্ষপাতী সেই ঔরঙ্গজীব তাহার জীবিত পিতার পানীয়জল বন্ধ করিয়া তাঁহার প্রাণ নাশের আয়োজন করিয়াছেন, ইহা কোন ধর্ম্মের অনুমোদিত?"

শাহজাহান সম্ভবতঃ মনে করিয়াছিলেন যে, নিদারুণ

তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় পিতার দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া পুত্রের মনে বিবেক এবং করুণার উদয় হইতে পারে, কিংবা তাহা না হইলেও, চিরদিনের ধর্ম্মধ্বজী নমাজী ঔরঙ্গজীব লোকরঞ্জনার্থ পিতার জলকষ্ট দূর করিয়া ধর্ম্মাচরণের ভানও করিবে। কিন্তু ইহা তাঁহার বিষম ভুল! হিমশৈল-কিরীটিনী ভারতভূমির একাতপত্র-প্রভুত্বের প্রতি যাহার লোলুপ দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে, অমূল্য মণিমাণিক্য-বিজড়িত স্বর্ণময় শিখিসিংহাসনে আরোহণ যাহার একান্ত মনের নিগূঢ় কামনা, সেই কামনা পরিপূরণার্থ বিজয়-দর্পিত বিপুল বাহিনী যাহার করায়ত্ত, ধর্ম্মের কাহিনী কি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে পারে? পিতার প্রেরিত দূত দ্বারা প্রত্যুত্তরে ঔরঙ্গজীব বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনার বর্ত্তমান দুরবস্থা আপনি স্বয়ং আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন। পরধর্ম্ম-পক্ষপাতী বিধর্ম্মী দারার পক্ষাবলম্বন না করিলে, আগ্রার প্রাসাদ দুর্গ আমার হস্তে বিনাযুদ্ধে অর্পণ করিলে এ সকল বিড়ম্বনা কিছুই ঘটিত না, আপনি যেরূপ সুখে ও সম্মানে প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন তাহাই করিতে পারিতেন। আপনি স্বয়ং রুগ্নাবস্থায় সাম্রাজ্য-শাসনে অক্ষম হইয়া প্রকাশ্যে দারাকে একরূপ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তাহারই দ্বারা শাসন কার্য্য চালাইতেছিলেন, ইস্লামের প্রতি বিরূপ দারার উচ্ছৃঙ্খল শাসনে সাম্রাজ্যে অশান্তি উপস্থিত হইয়াছিল, উহারই সংশোধন জন্য আমার এই সমরায়োজন, নতুবা আপনি বর্ত্তমানে আমি সিংহাসনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতাম না। আর পিতার প্রতি পুত্রের দুর্ব্ব্যবহারের কথা যাহা বলিয়াছেন, সে জন্যও আপনি দায়ী। আপনার স্মৃতির উদ্বোধনের জন্য, পিতামহ জাহাঙ্গীর বাদশাহের প্রতি আপনার ব্যবহারের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। তৈমুর বংশে হিন্দুস্থানের সিংহাসন লইয়া পুত্র কিংবা ভ্রাতা কর্ত্তৃক পিতা এবং জ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আজ নূতন নহে; মির্জ্জা কামরণ ও হিন্দালের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। পিতামহের বিরুদ্ধে আপনাকে অস্ত্রধারণ করিতে না দেখিলে, ভ্রাতৃহত্যা দ্বারা সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক করিতে আপনাকে না দেখিলে, হয়ত আমরা এ শিক্ষা পাইতাম না, শান্তি-বিরাজিত বিশাল হিন্দুস্থানে আজ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিত না। এই ভগ্নস্বাস্থ্য জীবন-সন্ধ্যায় আপনি যে অশান্তি ও ক্লেশ আজ ভোগ করিতেছেন, সে জন্য আমি নিরতিশয় দুঃখিত, কিন্তু এ জন্য যদি কেহ দায়ী হয়, তবে সে আপনি স্বয়ং। যে মুহূর্ত্তে আপনার শরীররক্ষী সেনাগণ অস্ত্র ত্যাগ করিয়া প্রাসাদ দুর্গ আমার সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করিবে, তৎক্ষণাৎ প্রাসাদে স্নান পানাদি সমুদয় কার্য্যের জন্য জলের সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়া যাইবে, তৎপূর্ব্বে নহে।"

শাহজাহানের মস্তকে বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। বারিব্যবস্থা-বিহীন প্রাসাদ-দুর্গ শত্রু কবল হইতে রক্ষা করিবার উপায় আর রহিল না, স্বল্পসংখ্যক শরীররক্ষী সেনা নিদারুণ তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িল, যুদ্ধ অসম্ভব হইয়া উঠিল। রোগ-কাতর স্থবির বাদশাহ অসহ্য পিপাসায় বারম্বার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। অপর দিকে ঔরঙ্গজীবের সেনাদল হইতে মুহুর্মুহু অগ্নিময় লৌহপিণ্ডের অজস্রবর্ষণ হইতে লাগিল। প্রাসাদের সামরিক ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ 'বাদশা বেগমসাহেবা' রাজনন্দিনী জাহানারার সহিত পরামর্শ করিয়া ঔরঙ্গজীবের হস্তে দুর্গ সমর্পণের সংবাদসহ দূত প্রেরণ করিয়া দিলেন।

যুদ্ধের নিবৃত্তি হইল, কর্ণবধিরকারী অবিরাম তোপধ্বনি নীরব হইয়া গেল, প্রাসাদে অগ্নিপিণ্ড বর্ষণের পরিবর্ত্তে পয়ঃপ্রণালী পথে জল আসিয়া পিপাসাতুর নরনারীর তৃষাক্লেশ নিবারণ করিয়া দিল। আগ্রার জনসঙ্ঘ সপ্তাহকাল পরে নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতে লাগিল। কিন্তু সেই দিন যে প্রাসাদ ঔরঙ্গজীবের হস্তে সমর্পিত হইল, তাহা আর শাহজাহানের নিকট প্রত্যর্পিত হইল না, ভারতবর্ষের রাজমুকুট সেই দিন যে শাহজাহানের মস্তক হইতে খসিয়া পড়িল, তাহা আর সে মস্তকে পুনঃস্থাপিত হইল না, বৃদ্ধ শাহজাহানের শিথিল দুর্ব্বল হস্ত হইতে যে রাজদণ্ড সেইদিন স্খলিত হইয়া পড়িল, সে দণ্ড তাঁহার স্বল্পাবশিষ্ট জীবন-কালের মধ্যে আর তিনি পুনর্গ্রহণ করিবার অবসর পাইলেন না।

অল্পদিন পূর্ব্বে সামুগড়ের রণক্ষেত্রে বিজয়লক্ষ্মী ঔরঙ্গজীবের কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করিয়া তাঁহাকে ভারতের ভাবী সম্রাট্ রূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন; আজ সম্রাট শাহজাহানের হস্ত হইতে আগ্রাদুর্গ অধিকার করিবার পর প্রকৃতিপুঞ্জ যথার্থই তাঁহাকে হিন্দুস্থানের একাধীশ্বর রূপে সভয়ে স্বীকার করিয়া লইল; ভাগ্যবিধাতার প্রসন্ন দক্ষিণ দৃষ্টিপাতে অঘটন ঘটিয়া গেল।

দুর্গজয়ের পর পিতা শাহজাহান মনে করিয়াছিলেন, পুত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, এবং চারি চক্ষুর মিলন হইলে এই অস্বাভাবিক নাটকের শেষ অঙ্কের উপর যবনিকা রাজাদেশে পড়িয়া যাইবে, পূর্ব্বে যেমনটি ছিল, পুনরায় তাহাই হইবে, রাজাদেশে ঔরঙ্গজীব দাক্ষিণাত্যে তাঁহার সুবায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, নয়নপুত্তলী জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা পুনর্ব্বার তাঁহার সিংহাসনের পাদপীঠতলে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতিনিধিরূপে সাম্রাজ্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন, সাম্রাজ্যে পূর্ব্ববৎ অখণ্ড শান্তি বিরাজ করিবে, সকলেই নিজ নিজ স্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালনে তৎপর হইবে, রাজ্যের উপর দিয়া যে ঝঞ্ঝা বহিয়া গেল, তাহা যেন বহে নাই এমনই অবস্থা হইবে। হায় রে মানবের কল্পনা! বাসনা যদি বাস্তবে পরিণত হইত, তবে জগতের কত দুঃখই না প্রশমিত হইতে পারিত, মানবের কত দীর্ঘশ্বাসই না নিবারিত হইত,—কত অসংখ্য নরনারীর নয়ন-নীরই না নিরুদ্ধ হইয়া যাইত!

এই ভয়াবহ বিপ্লবের পর আকাঙ্ক্ষিত পিতাপুত্রের মিলন হইল না। ঔরঙ্গজীবের পরিবর্ত্তে তাঁহার পুত্র মহাম্মদ, পিতার আজ্ঞাবহন করিয়া পিতামহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। শাহজাহানের পুরাতন স্নেহশীল পরিচারকবর্গের পরিবর্ত্তে ঔরঙ্গজীবের অর্থ এবং অন্ন পরিপুষ্ট সিপাহীর দল দ্বারা দুর্গ পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিলেন; এবং যেরূপভাবে পিতামহের গতিবিধি নিয়মিত হইল তাহার অর্থ এই যে, বাদশাহ শাহজাহান পরাভূত শত্রুর ন্যায়, স্বীয় আবাস দুর্গে ঔরঙ্গজীবের বন্দী। তুষারশীতল 'বক্ষু' নদীর তীর হইতে কৃষ্ণা গোদাবরীর তটভূমি এবং সিন্ধুনদের সমুদ্র সঙ্গম হইতে লৌহিত্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের একদা অধীশ্বর শাহজাহানকে যে এরূপ ভাবে তাঁহার জীবনের অবসানকাল অতিবাহিত করিতে হইবে, একথা জগতে সম্ভবতঃ কাহারই কল্পনায় কখনই উদয় হয় নাই। মনুষ্যকল্পনার অতীত যাহা, তাহাই ঘটিল জগতের ইতিহাস অন্বেষণ করিলে বোধ করি তুলনার জন্য দ্বিতীয় ঘটনা এরূপ আর পাওয়া যাইবে না। বাদশাহের গতিবিধি সংযত করিয়াই ঔরঙ্গজীব ক্ষান্ত হন নাই; পাদুকার ন্যায় নিতান্ত প্রয়োজনীয় নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলিও বাদশাহ চাহিয়া সকল সময় পান নাই। যাহা পাইয়াছেন, তাহা নিতান্ত দীন অকিঞ্চনেরও ব্যবহার্য্য নহে, হিন্দুস্থানের বাদশাহের ত কথাই নাই।

পিতাকে বন্দী করিবার পর ঔরঙ্গজীব আগ্রার যেরূপ যাহা ব্যবস্থা করিতে হয়, অতিমাত্র ক্ষিপ্রতার সহিত সে সকল সমাধা করিলেন। এখন তাঁহার প্রধান কার্য্য হইল জ্যেষ্ঠভ্রাতা দারার পশ্চাদ্ধাবন করা, যাহাতে তিনি কোথাও স্থির হইয়া পুনরায় যুদ্ধসজ্জার সময় না পান, এবং দারার পুত্র সোলেমান সেকো পিতার সহিত তাহার বাহিনী লইয়া যোগদান করিতে না পারে। কিন্তু কনিষ্ঠভ্রাতা মুরাদবক্স সসৈন্যে আগ্রায় ঔরঙ্গজীবের সঙ্গেই রহিয়াছে। তাহাকে আগ্রায় রাখিয়া ঔরঙ্গজীব দারা, সুজা এবং সোলেমান কাহারই সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা নিশ্চিন্ত মনে করিতে পারেন না। সুতরাং মুরাদের ব্যবস্থা করাই সর্ব্বাগ্রগণ্য হইল। মুরাদের সহিত প্রকাশ্য বৈরতা করিয়া যুদ্ধে তাহাকে পরাস্ত করা এক্ষেত্রে ঔরঙ্গজীব সঙ্গত মনে করিলেন না, কারণ যদিও ধরমৎ ও সামুগড়ের যুদ্ধে জয় এবং আগ্রাদুর্গ অধিকার করিবার পর রাজ্যের বহু সম্ভ্রান্ত আমীর ওমরাহ এবং সেনাপতিগণ ঔরঙ্গজীবের বুদ্ধি এবং রণপাণ্ডিত্যের পক্ষপাতী হইয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, তথাপি কেহ কেহ কার্য্যকালে মুরাদের পক্ষও অবলম্বন করিতে পারে, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে মুরাদের শৌর্য্যও অনন্যসাধারণ, যুদ্ধফল-সর্ব্বদাই অনিশ্চিত। সেইজন্য গোপনে, কৌশলে তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারিলে আপদের শান্তি হইবে, এবং মুরাদকে একবার বন্দী করিতে

পারিলে তাহার পক্ষভুক্তগণও ঔরঙ্গজীবের আজ্ঞাবহ হইবে, এ আশা তাঁহার ছিল। উদীয়মান সূর্য্যের দিকে চাহিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সকলেই তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া থাকে ইহা তিনি পিতাকে বন্দী করিবার পরও বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্য কৌশলে মুরাদকে বন্দী করিবার ব্যবস্থাই হইল। অসীম বলশালী রণদুর্ম্মদ মুরাদবক্স সর্ব্বত্র নির্ভীক; ঔরঙ্গজীব তাহাকে স্বীয় শিবিরে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া মহাসমারোহে এবং একান্ত স্নেহভরে আহ্বান করিলেন। মুরাদও আসিল। নিঃসন্দিগ্ধচিত্ত মুরাদ শরীররক্ষী মাত্র দুই একজনকে সঙ্গে লইয়া ভ্রাতার শিবিরে আহারার্থ আসিয়াছিল। সুরাসেবনে যখন তাহার চিত্ত বিহ্বল এবং মস্তিষ্ক চেতনাহীন, সেই সময়ে সুন্দরী বাঁদী দ্বারা তাহার কটিবন্ধ হইতে তরবারি খুলিয়া লইয়া ঔরঙ্গজীব স্বীয় অনুচরদ্বারা তাহার হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করাইয়া সেই রাত্রিতেই হস্তিপৃষ্ঠে তাহাকে গোয়ালিয়রদুর্গে আবদ্ধ করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কোন্‌পথে মুরাদকে কোথায় পাঠান হইল তাহা কেহ বুঝিতে না পারে, সেই জন্য অপর তিনটি হস্তী অপর তিন দিকে পাঠান হয়।

শাহজাহান

মুরাদের বাহিনী নিরুদ্বিগ্নমনে নিজ নিজ শিবিরে

নিদ্রা যাইতেছিল, এই দুর্ঘটনার বিন্দুবিসর্গও তাহারা জানিতে পারে নাই। প্রাতঃকালে নিদ্রোত্থিত হইয়া শুনিল, ঔরঙ্গজীব তাঁহাকে নিরুদ্দেশযাত্রায় পাঠাইয়াছেন। সেকালে ভারতবর্ষের চিরন্তন প্রথা ছিল যে, সম্রাট বা সেনাপতি হত বা ধৃত হইলে তাঁহার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িত; অনেকে বিজয়ীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া জীবিকার্জ্জনে মন দিত। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। মুরাদের সৈন্য সেনাপতিগণ ঔরঙ্গজীবের পক্ষাবলম্বন করিল। ইন্দ্রিয় সম্ভোগনিরত মদ্যপায়ী মুরাদ একাকী জীবনের অবশিষ্ট কাল বন্দীভাবে কাটাইবার জন্য হস্তিপৃষ্ঠে বাহিত হইয়া গোয়ালিয়র দুর্গের পথে যাত্রা করিল। ঔরঙ্গজীব এখন নিশ্চিন্ত মনে দারা, সুজা এবং সোলেমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সময় পাইলেন। আজ্ঞাবহ সৈন্যসামন্ত ও সেনাপতিবর্গের অভাব এখন নাই, নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় তিনি এখন সমগ্র ভারতভূমির হিন্দুমুসলমান রাজা ওমরাহ সেনাপতিগণের একমাত্র পূজার্হ হইয়া উঠিলেন; দারা সুজা সোলেমান এখন গৃহতাড়িত। এদিকে অপরিমিত ধনরত্নে পরিপূর্ণ আগ্রা দিল্লীর রাজভাণ্ডার ঔরঙ্গজীবের করায়ত্ত হওয়ায়, জনবল ধনবল এখন কিছুরই তাঁহার অভাব নাই। এবং এপর্য্যন্ত যদিও তাঁহার রাজ্যাভিষেক সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয় নাই, তথাপি সম্রাট্ শাহজাহানের কারাবরোধের দিন হইতেই তিনি সম্রাটরূপে ভারতে আপামর সাধারণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ সম্রাট্ যে তিনিই এবিষয়ে কাহারও মনে কোনরূপ সন্দেহ ছিল না। দারা সুজা কেহই তাঁহাকে তাঁহার অধিকৃত সিংহাসন হইতে আর বিতাড়িত করিতে পারিবে না, এই ধারণা সাধারণের মনে দৃঢ় হইয়া যাওয়ায়, তাঁহার আজ্ঞানুসারে গৃহতাড়িত বিজিত রাজকুমারগণের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাদিগকে বন্দী করা, বা ভারতভূমি হইতে চিরতরে বিতাড়িত করিবার লোকের অভাব হইল না। দিলির খাঁ, তহওয়ার খাঁ, মিরজুমলা, শায়েস্তা খাঁ, জয়সিংহ, যশোবন্তসিংহ প্রভৃতি মহাবলসম্পন্ন রণপণ্ডিত দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতিগণ—যাঁহারা শাহজাহানের অনুজ্ঞায়, দারা এবং সোলেমানের আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিল—আজ দুর্দ্দিনে সকলেই সেইপক্ষ ত্যাগ করিয়া নবীন সম্রাট্ ঔরঙ্গজীবের মনস্তুষ্টির জন্য সৈন্যসামন্তসহ কেহ বা দারা কেহ বা সোলেমানের পশ্চাদ্ধাবনে তৎপর হইল, কেহবা সুজার গতিরোধের জন্য সসৈন্যে আগ্রার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল

নবীন সম্রাট্ ঔরঙ্গজীবের আদেশে যখন ভারতের বীরবৃন্দ পলায়নপর রাজকুমারগণের প্রাণবিনাশার্থ নিষ্কাশিত অসিহস্তে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনে নিরত, দীর্ঘকালের শান্তিপরিপূর্ণ ভারতসাম্রাজ্যের উপর দিয়া ঔরঙ্গজীবের আদেশে যখন ভীষণ শোণিত-তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে, বৃদ্ধ সম্রাট্ শাহজাহান তখন আগ্রার আবাসদুর্গে নিতান্তই দীনভাবে বন্দীর জীবন যাপন করিতেছিলেন। যাঁহার বিন্দুমাত্র প্রসাদ আকাঙ্ক্ষায় ঔরঙ্গজীব প্রভৃতি রাজকুমারগণ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র ভারতের ত্রিংশৎ কোটি হিন্দু মুসলমান যোড়করে সভয়ে দরবারে দিনযাপন করিত, আজ তাঁহার কারাজীবনের সঙ্গিনী প্রিয়তমা দুহিতা জাহানারা ভিন্ন আর কেহ নাই। হায় রে মানবের অদৃষ্ট! হায় তোর-তরঙ্গভঙ্গ-চপলা কমলা!

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

মনের মানুষ

(উপন্যাস)

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ইন্দুবালার পত্র।

"কি দিদি, বসে বসে ভাবা হচ্চে কি ?"

"ভাবচি, কবে নিমতলার ঘাটে যাব।"

"কেন, বিলেতের জাহাজ কি আজকাল নিমতলার ঘাট থেকে ছাড়ছে নাকি ? আগে ত প্রিন্সেপ্‌স্ ঘাট থেকে ছাড়ত, জানতাম।"

বেলা তখন দশটা। কলিকাতায়, ডাক্তার সরকার সাহেবের গৃহের একটি কক্ষে, ইন্দুবালা ও মণিমালা দুই বোনে উক্ত প্রকার কথোপকথন হইল। সম্প্রতি যোগেন্দ্রনাথের মাতা আসিয়া, ডাক্তার সরকার ও তাঁহার পত্নীর নিকট, নিজ পুত্রের সহিত ইন্দুবালার বিবাহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে গৃহিণী গিয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার এ সম্বন্ধে সম্মতি আছে কি না। ইন্দু বলিয়াছিল, "তোমাদের মত যদি থাকে, তা হলেই হল।"—মেয়ের মনটি যে যোগেন্দ্রনাথের প্রতি বিশেষ ভাবে ঝুঁকিয়াছে, ইহা জানিতে মা'র বাকী ছিল না; তথাপি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিয়া তার পর সম্বন্ধ পাকা করাই তিনি ভাল বোধ করিয়াছিলেন। গত কল্য অপরাহ্নকালে ডাক্তার দম্পতী যোগেন্দ্রনাথের মাতার নিকট নিজেদের সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। মণিমালা জানিত, তাহার দিদি মনে মনে যোগেন্দ্রকে খুবই ভালবাসিতেছে। কিন্তু দেখিল, বিবাহে সম্মতি দিয়া অবধি, তাহার মনটি কেমন বিষণ্ণ হইয়া রহিয়াছে। মণিমালা যতবার ইহার কারণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছে, ততবারই বিফল হইয়াছে। এ বারেও দিদির মনের ভাবের কোনও হদিস পাইল না।

ডাক্তার গৃহিণী আজ যোগেন্দ্র ও তাহার মাতাকে মধ্যাহ্ন ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। অন্যান্য দিন যোগেন্দ্র আসিবার সময় নিকটবর্ত্তী হইলে ইন্দু ছটফট করিয়া বেড়াইত, কতবার গাড়ী বারান্দার ছাদে গিয়া, ফটকের পানে চাহিয়া থাকিত। আজ এখন তাঁহাদের আসিবার সময় হইয়াছে; আজ কিন্তু ইন্দু সেরূপ কোনও উদ্বেগ অথবা চঞ্চলতার লক্ষণ দেখাইতেছে না।

দশমিনিট পরে মণিমালা একটা কাগজ হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিল। বলিল, "বাবা এই ফর্দ্দ আমায় দিলেন। তোর বিয়েতে কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করা হবে, তাদের নামের এই ফর্দ্দ বাবাতে মা'তে মিলে তৈরি করেছেন। আমায় বল্লেন, দেখ, কোনও নাম বাদ পড়েছে কি না; তোমাদের কোনও বন্ধু বান্ধবের নাম যদি বাদ পড়ে থাকে ত বসিয়ে দিও।"

"দেখি"—বলিয়া ইন্দু কাগজখানি হাতে লইয়া পড়িতে লাগিল। পড়া শেষ হইলে বলিল, "কৈ, কারও নাম বাদ পড়েছে বলে ত আমার মনে হচ্চে না।"

মণিমালা সরলতার ভান করিয়া অত্যন্ত অমায়িক ভাবে বলিল, "আচ্ছা ভাই, কুঞ্জ বাবু ত তোর একজন বিশেষ বন্ধু, তাঁর নাম ত এতে নেই! তাঁকেও ত নিমন্ত্রণ করা উচিত, কি বলিস্? নইলে, এবার যখন তিনি আসবেন, হয়ত বলবেন, হুঁাঃ—বিয়ে হয়ে গেল আমায় একটা খবরও দিলে না!"

ইন্দু, মণিমালার দিকে চাহিয়া ক্ষীণভাবে একটু হাসিল। বলিল, "তিনি হিন্দু মানুষ, তাঁকে নিমন্ত্রণ করে' কি হবে?"

মণিমালা বলিল, "হিন্দু মানুষ ত কি হয়েছে? তোর বিয়েতে ইংরেজি খানা ত হবে না, হিন্দু মতেই

আয়োজন হচ্চে। তাঁর নামটা বসিয়ে দেবো কি? তাঁকে সস্ত্রীক আসতে লিখে দেওয়া যাক্ না!"

ইন্দু বলিল, "তার আবার স্ত্রী কোথায়?"

"কেন, সেই কিরণ মেয়েটা! তার কথা শুনে বুঝেছিলাম, শীগ্‌গিরই তাদের বিয়ে হবে। তখনই ত সে কুঞ্জকে বল্‌ত 'উনি'—নাম করত না। এমন মজা লাগ্‌ত আমার শুনতে! তুই জানিসনে, এতদিন বোধ হয় তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। তাদেরও নিমন্ত্রণ করা যাক্, কি বলিস্?"

ইন্দু বলিল, "ও সব হাঙ্গামায় দরকার নেই। তুই এখন যা, আমায় বিরক্ত করিস নে।"

মণিমালা ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সে মনে করিয়াছিল, বিবাহে সম্মতি দিয়া, কুঞ্জলালের সহিত সেই বাল্য-প্রণয়ের কথা বোধ হয় দিদির মনে নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, তাই মুখখানি সে এমন বিষণ্ণ করিয়া আছে। দিদির মন বুঝিবার কৌশল স্বরূপেই কুঞ্জলালের প্রসঙ্গের অবতারণা মণিমালা করিয়াছিল; কিন্তু তাহার কথাবার্ত্তা হইতে কিছুই সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

বেলা দশটা বাজিল। মণিমালা ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার দিদির ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। দেখিল, ঘরের কোণে টেবিলের নিকট বসিয়া সে এক মনে একখানি চিঠি লিখিতেছে। মণিমালাকে কাছে আসিতে দেখিয়াই ইন্দু চিঠিখানির উপর ব্লটিং কাগজ চাপা দিয়া, যেন একটু বিরক্তির স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কি?"

মণিমালা পূর্ব্ববৎ সরলতার ভান করিয়া কহিল, "কাকে চিঠি লিখ্‌ছিস্ দিদি? কুঞ্জবাবুকে নিমন্ত্রণ করছিস?"

ইন্দু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "সে যাকেই লিখি না কেন! তোর কি দরকার তাই তুই বল্‌না বাবু!"

মণিমালা বলিল, "আমি তোকে একটা ভাল খবর দিতে এলাম, আর তুই আমার উপর বিরক্ত হচ্চিস্। একেই বলে কলিকাল রে!"

"কি ভাল খবর।"

"যোগেন বাবু এসেছেন, তাঁর মা এসেছেন, মা তোকে ড্রয়িং রুমে ডাকলেন।"

"আচ্ছা যাব এখন আমি,—তুই যা।" বলিয়া ইন্দু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

"আহা, আমারই যেন বর! না এলি ত বয়ে গেল!" বলিয়া মণিমালা খরখর করিয়া চলিয়া গেল।

চিঠিখানির উপর হইতে ব্লটিং কাগজখানি ইন্দু তুলিয়া লইল। প্রায় এক পৃষ্ঠা লেখা হইয়াছে। একবার ঘড়ির পানে চাহিয়া আবার চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল। দুই তিন ছত্র লিখিয়া, আবার ঘড়ির পানে চাহিল। তাহার পর, কি ভাবিয়া, চিঠিখানি দেরাজে বন্ধ করিয়া, চাবি দিয়া, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আয়নার সামনে গিয়া দাঁড়াইল। কেশ বেশ একটু গুছাইয়া লইয়া, মৃদু মন্দ পদে ড্রয়িং রুমে গিয়া প্রবেশ করিল।

আহারাদির পর, অতিথিগণ বিদায় লইবার পূর্ব্বে, ডাক্তার গৃহিণীর কৌশলে, ইন্দু ও যোগেন্দ্র কিছুক্ষণের জন্য নিভৃত আলাপের সুযোগ লাভ করিল। ছোট একটি বসিবার ঘরে, একখানি টেবিল, একখানি সোফা, খান দুই চেয়ার। সেই ঘরে গিয়া, দ্বারে পর্দ্দা টানিয়া দিয়া উভয়ে বসিল। যোগেন্দ্র ইন্দুর মুখপানে ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "আজ তোমার মনটি এমন খারাপ কেন? আমাকে বিয়ে করবে সম্মতি দিয়ে এখন কি তোমার আপশোষ হয়েছে?"

ইন্দু মুখখানি নত করিয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "না।"

যোগেন্দ্র বলিল, "আমাকে যথার্থই তুমি চাও কি না, সে বিষয়ে তোমার মনে কোনও দ্বিধা হয়েছে কি?"

ইন্দু দৃঢ় অথচ কোমল কণ্ঠে কহিল, "কিছুমাত্র না। তোমাকেই আমি চাই।"

যোগেন্দ্র এইবার কাছে সরিয়া আসিয়া, ইন্দুর হাতখানি ধরিয়া বলিল, "তবে আজ সারা বেলাটা তুমি এমন মন খারাপ করে রয়েছ কেন?"

ইন্দু বলিল, "আমার মনে হচ্চে, আমি তোমার যোগ্য নই, তাই আমার মন খারাপ হয়ে গেছে।"

যোগেন্দ্র অঙ্গুলি দ্বারা ইন্দুবালার গালে আঘাত করিয়া কহিল, "পাগলী! এ ভুল ধারণা তোমায় মনে হল কেন?"

ইন্দু একটু হাসিল মাত্র, কিছু বলিল না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

একটু অপেক্ষা করিয়া যোগেন্দ্র বলিল, "কি ভাবছ আমায় বলবে না?"

ইন্দু বলিল, "বলতে ত চেষ্টা করছি, পারচিনে যে!"

"একটু আভাস দাও।"

"সে আরও শক্ত।"

শুনিয়া, যোগেন্দ্রের মনটিও একটু বিষণ্ন হইল। নারী-হৃদয়ের রহস্য সম্বন্ধে তাহার কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না; কি হইল, কেন এমন হইল, তাহা সে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মুখখানি ম্লান করিয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া বলিল, "কিন্তু, তোমার মনে কি হচ্চে, আমি জানতে পারলে ভাল হত ইন্দু। আমার মনের কোনও অংশ তোমার কাছে তালাবন্ধ থাকে, অথবা তোমার মনের কোনও অংশ আমার কাছে খিলবন্ধ থাকে, এটা আমি অনুচিত মনে করি।"

যোগেন্দ্রনাথের মুখপানে চাহিয়া, ইন্দু বলিল, "আমিও তাই মনে করি। কিন্তু তোমায় আমি মুখে তা বলতে পারবো না ভেবে, তোমায় একখানি চিঠি আজ আমি লিখ্‌তে আরম্ভ করেছিলাম। সে চিঠি এখনও শেষ হয় নি।"

চিঠির কথা শুনিয়া যোগেন্দ্র শঙ্কান্বিত হইয়া উঠিল। ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না, কি এমন কথা যাহা মুখে বলা যায় না, চিঠি লিখিয়া জানাইতে হয়। বলিল, "বেশ, তুমি কেন গিয়ে সে চিঠি শেষ কর না; আমি বসে থাকি।"

ইন্দু বলিল, "মা কি এতক্ষণ থাকবেন?"

"তাঁকে আমি পৌঁছে দিয়ে আসবো।"

ইন্দু একটু ভাবিল। বলিল, "না, তাতে কাষ নেই। তুমি এখানে চিঠির জন্যে বসে আছ জানলে, আমি ভাল করে লিখতে পারবো না। আমি রাত্রে নিরিবিলিতে বসে চিঠি লিখ্‌বো। কাল সকালে বাবা বেরিয়ে গেলে পর, ছুকরীলালের হাতে আমি সে চিঠি তোমায় পাঠিয়ে দেবো।"

"আচ্ছা, তাই দিও। একটি কথা আমায় বল ইন্দু, সে চিঠি পড়ে, আমায় কি বিশেষ রকম আঘাত পেতে হবে?"

ইন্দু বলিল, "তাতো জানিনে। কিন্তু লিখতে আমারই কষ্ট হচ্চে।"

"তবে কেন লিখচ?"

"ঐ যে বল্লাম, তোমার যা মত আমারও তাই মত, আমার জীবনের কোনও অংশ তোমার কাছে লুকানো থাকে তা আমি অনুচিত বলে' মনে করি।"

ইন্দুর মুখের ভাবে ও কণ্ঠস্বরে, যোগেন্দ্র মনে মনে বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিল, নিজ জীবনের কি সর্ব্বনেশে কথাই না জানি ইন্দু তাহাকে লিখিয়া জানাইবে!

ইহার অল্পক্ষণ পরেই যোগেন্দ্রের মাতা, পর্দ্দা ফেলা দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "যোগেন, আমি বাড়ী যাচ্চি, তুমি কি এখন থাক্‌বে?"

"না মা, আমিও আসছি"—বলিয়া যোগেন্দ্র উঠিয়া দ্বারের কাছে গিয়া পর্দ্দা সরাইয়া দিল। ইন্দুও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া আসিল।

"তা হলে চল। এখন তবে আসি মা!"—বলিয়া তিনি ইন্দুবালার চিবুক স্পর্শ করিয়া, নিজ করাঙ্গুলি চুম্বন করিলেন।

সেদিন বিকাল বেলা, সারা সন্ধ্যা, সমস্ত রাত্রি যোগেন্দ্রনাথের যে কি ভাবে কাটিল, তাহা সেই জানে। নানারূপ দুশ্চিন্তা তাহার মনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল।

পরদিন প্রাতে যোগেন্দ্র কম্পিত হৃদয়ে ইন্দুবালার পত্রের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বেলা ৮টার সময় ছুরকীলাল আসিয়া পত্র দিল। নিম্নে তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, নিজ শয়ন কক্ষে গিয়া যোগেন্দ্র কম্পিত হস্তে পত্রখানি খুলিল। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল:—

প্রিয়তম,

আজ সন্ধ্যা হইতে অনেকগুলি বড় বড় চিঠি তোমায় লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। আমার জীবনের যে অংশটি তোমাকে আমার জানানো দরকার, তাহা সংক্ষেপেই লিখিব স্থির করিয়া আবার এই পত্র নূতন করিয়া আরম্ভ করিলাম।

আমার বয়স যখন ১৪।১৫ বৎসর মাত্র, সংসারের কিছুই জানিতাম না, তখন বাবার কলেজের একজন ছাত্রের সহিত, আমি প্রেমে পড়িয়াছিলাম—অন্ততঃ আমার মনে সেই ধারণা তখন জন্মিয়াছিল। তাহার নাম কুঞ্জলাল দত্ত। নিভৃত সাক্ষাতের সুযোগ আমাদের বড় হইত না; তাই কুঞ্জলাল তাহার মেসের বাসায় বসিয়া বড় বড় প্রেমপত্র লিখিয়া আনিয়া, সুযোগ মত আমার হাতে গুঁজিয়া দিত। আমিও ইংরাজি বাঙ্গালা নানা উপন্যাস ঘাঁটিয়া, সেই পত্রের উপযুক্ত জবাব লিখিয়া রাখিতাম, পরের দিন কুঞ্জ আসিলে তাহার হাতে সুযোগ মত সেখানি দিতাম। পত্রযোগে কুঞ্জ আমায় বলিয়াছিল, জীবনে আমি ছাড়া আর কাহাকেও কখনই সে ভালবাসিবে না, বিবাহ করিবে না; আমিও উত্তরে তাহাকে ঐরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম। সে ডাক্তারি পাস করিয়া বাহির হইয়া, আমার পিতামাতার নিকট আসিয়া আমাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তাহার পর সে দেশে চলিয়া যায়, সেই অবধি তাহার সহিত আমার দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ। প্রথম প্রথম এ জন্য আমার মনে কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু আমার বয়োবৃদ্ধির সহিত, তাহার স্মৃতিও আমার মনে দিন দিন বিলীন হইতে লাগিল। ছেলেবেলার সেই কথা মনে পড়িলে তাহাকে ছেলেখেলা বলিয়াই আমার মনে হইত—নিজের সে সময়ের মূঢ়তায় হাসিই পাইত।

তাহার পর, একবার মাত্র তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অর্থাৎ উপর্য্যুপরি দুই দিন। প্রথম মণিমালার জন্মদিনে মা বাবা প্রভৃতির সহিত শিবপুরের বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে। তাহার সহিত কিরণ নামে একটি মেয়ে ছিল। সেদিন সেই মেয়েটিকে আমি সঙ্গে করিয়া বাড়ী লইয়া আসি। তাহার কাছে শুনি যে কুঞ্জলালের সঙ্গে তাহার বিবাহ স্থির; শীঘ্রই বিবাহ হইবে। পরদিন, কিরণকে সঙ্গে লইয়া, কুঞ্জকে লইয়া আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখিতে যাই। সেদিন কুঞ্জ আমাকে চিঠিপত্র লিখিবার জন্য আমার অনুমতি চাহিয়াছিল; আমি সম্মত হই নাই।

আমার জীবনের এই অংশ তোমার অজ্ঞাত ছিল, তাই সকল কথা খুলিয়া তোমায় লিখিলাম। যদিও যাহা হইয়াছিল, তাহা অতি অল্প দূর মাত্র অগ্রসর হইয়াছিল; এমন কি তাহা আমি প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলাম, তথাপি তাহা যে হইয়াছিল সেটা আমার পক্ষে নিতান্তই আক্ষেপের বিষয়। কিন্তু এ আক্ষেপ, তোমার সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে এক দিনও আমার মনে হয় নাই। তোমার ভালবাসা পাইয়া, তোমায় ভালবাসিয়া, যখন বুঝিলাম সত্যকার ভালবাসা কি পদার্থ, তখন হইতে আমার মনে এই আক্ষেপ আসিল যে, ছেলেবেলায় সেই ব্যাপারটা না হইলেই ভাল ছিল। তবে, এই পর্য্যন্ত তোমাকে আমি বলিতে পারি, যদিও আমি যাহা করিয়াছিলাম সে সময় তাহা ছেলেখেলা বলিয়া মোটেই মনে করি নাই, তথাপি, ক্রমে তাহা সম্পূর্ণ ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। আজ তোমার ভালবাসা পাইয়াছি, তোমায় ভালবাসিয়াছি বলিয়া নহে—তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার বহু পূর্ব্বেই আমার মন হইতে সে ভাব কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল; অন্যান্য পরিচিত অর্দ্ধপরিচিত যুবকগণ আমার পক্ষে যেমন, কুঞ্জও আমার পক্ষে তেমনই হইয়া গিয়াছিল।

সকল কথা তোমায় খুলিয়া লিখিলাম। সমস্ত জানিয়া শুনিয়া, তুমি যদি আমায় গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে কর, তবে আমি চিরজীবন তোমার দাসী হইয়া, তোমার সেবা করিয়া আমার নারী-জীবনকে সার্থক ও সুখময় করিব। আর, যদি তোমার মন এ কারণে অপ্রসন্ন হয়, আমায় যে চোখে তুমি দেখিয়াছ সে চোখে যদি আর না দেখিতে পার, তবে আমি তোমার জীবনের পথ হইতে

সরিয়া যাইব, আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে।

তোমার
ইন্দু।

পত্রখানি পড়িতে পড়িতে, সংশয়ের যে কালো মেঘখানা যোগেন্দ্রনাথের মুখে চক্ষে ছায়া ফেলিয়া ছিল, তাহা সরিয়া গেল; তাহার বুকে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিল। সে একখানি ছোট চিঠির কাগজ লইয়া, এই কয়টি কথা মাত্র লিখিল :—

প্রিয়তমাসু

পত্রখানি পাইয়া, দেহে প্রাণ ফিরিয়া আসিল। তুমি যে ব্যাপারকে অত বড় মনে করিয়াছ, আমি ত তাকে ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছুই মনে করিতে পারি না। অতএব তুমি নিশ্চিন্ত হও।

তুমি লিখিয়াছ, তুমি আমার দাসী হইয়া চিরজীবন আমার সেবা করিতে পাইলে জীবন সার্থক মনে করিবে। আমার অন্তরের কথাও তোমায় বলি। তোমার মত রত্নকে চিরদিন বুকের ধন করিয়া রাখিতে পাওয়া, আমিও আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিব।

পত্র পাঠাইয়াই আমি স্নান করিতে যাইব। স্নান করিয়াই তোমার নিকট যাইতেছি। মাকে বলিও, আমিও ওখানে খাইব। তুমি বেলুড়মঠ দেখিতে চাহিয়াছিলে, আহারাদির পর, মা বাবার অনুমতি লইয়া, তোমায় সেখানে লইয়া যাইব মনে করিতেছি।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে তোমায় লইয়া যখনই কোথাও বাহির হইয়াছি, মণিমালা আমাদের সঙ্গে গিয়াছে। তখন, অবশ্য ইহাই উচিত ও সঙ্গত হইয়াছিল। এখন, যদি তোমার মা বাবা এটা আপত্তিজনক বা অশোভন না মনে করেন, তবে আমরা দুজনে একলাই যাইব। বেলুড় মঠ দেখা হইয়া গেলে, নানা স্থানে দুজনে একটু বেড়াইব। পুরা দিনের জন্য ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া লইয়া যাইব। ইতি

তোমারই
যোগেন।

যথা পরামর্শ আহারাদির পর বাহির হইয়া, বেলুড় মঠ দেখিয়া, "নানা স্থানে" বেড়াইয়া যখন এই নবীন প্রণয়ী-যুগল গৃহে ফিরিয়া আসিল, তখন সন্ধ্যা হইতে আর বেশী বাকী ছিল না।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শাঁখ বাজিল।

মাসখানেক পরে কুঞ্জলাল একদিন অপরাহ্ণে তাহার বাহিরের শয়নকক্ষে বসিয়া সংবাদপত্রে পাঠ করিল—

"আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি, গত কল্য সন্ধ্যায় এই সহরের সুবিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ ক্ষেত্রমোহন সরকার মহাশয়ের দুইটি বিদুষী কন্যার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উভয় বিবাহই হিন্দুমতে হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী ইন্দুবালার সহিত, ঢাকা জিলার সাতবেড়িয়া গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ মহাশয়ের এবং কনিষ্ঠা মণিমালার সহিত ব্যারিষ্টার মিষ্টার যতীন্দ্রনাথ সিংহের বিবাহ হইয়াছে।

"সহরের তাবৎ গণমান্য লোক নিমন্ত্রিত হইয়া বিবাহ সভায় উপস্থিত ছিলেন। পান ভোজন, আদর আপ্যায়ন চূড়ান্ত রকমেরই হইয়াছিল।

"কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যোগেন্দ্র বাবু দর্শন শাস্ত্রে এম এ পরীক্ষা দিয়া উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাহার পর এ কয় বৎসর তিনি হিন্দু দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনায় কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম, শীঘ্রই তিনি তাঁহার নবপরিণীতা স্ত্রী সহ ইউরোপ যাত্রা করিবেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় উচ্চাঙ্গের হিন্দুধর্ম্ম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য।"

পড়িয়া, কুঞ্জলাল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, মোদক খাইয়া সেই স্বপ্ন দেখার সময় লাল কালীতে ছাপা সেই বিবাহ পদ্ধতিতে কি যোগেন্দ্রনাথ দত্ত নামটিই দেখিয়াছিল? নিশ্চিতরূপে কিছুই স্মরণ করিয়া উঠিতে পারিল না।

সংবাদটি দ্বিতীয়বার কুঞ্জ পাঠ করিল। পাঠ করিয়া হঠাৎ একটা কথা তাহার মনের মধ্যে উদয় হইল। উঠিয়া, টেবিল হইতে পঞ্জিকা লইয়া শুভদিনের নির্ঘণ্ট দেখিতে লাগিল। আগামী ৫ই জ্যৈষ্ঠ বিবাহের দিন আছে।

পাঁজি রাখিয়া, তখন সে ডাকঘর সেভিংস্ ব্যাঙ্কের পাসবহিখানি বাক্স হইতে বাহির করিল। দেখিল এখন তাহার ছয় শত টাকার উপর জমা আছে। টেবিল চাপড়াইয়া বলিল, "কুছ পরোয়া নেই, হয়ে যাবে এখন একরকম করে।"

বহিখানি বাক্সে বন্ধ করিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া "জেঠাইমা! জেঠাইমা!" বলিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিল। কিন্তু জেঠাইমার সাড়া পাইল না। কিরণ আসিয়া বলিল, "তিনি মিত্তিরদের বাড়ীতে বড়ি দিতে গেছেন। কেন গা, কি দরকার বলই না।"

কুঞ্জ তক্তপোসের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "দরকার একটু ছিল রে! আচ্ছা তোকেই বলি। দ্যাখ্, কলকাতায় সেই যে তোর ইন্দুদিদি আছে, আর তার বোন মণিমালা, ডাক্তার সাহেবের মেয়েরা, তাদের দুজনেরই সেদিন বিয়ে হয়ে গেছে। তাই ভাবলাম, সবাই বিয়ে করছে, আমরাও কেন বিয়েটা সেরে ফেলি না?"

শুনিয়া কিরণ মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল, "তুমি যে ছেলেমানুষের বেহদ্দ হলে দেখছি!"

"কেন?"

"ওরা সন্দেশ খাচ্চে আমি কেন খাব না!"

কুঞ্জ বলিল, "নেনেঃ, তোর গিন্নেপনা রাখ্। জেঠাইমা কখন আসবেন বলতে পারিস?"

"একটু পরেই আস্‌বেন।"

"তবেই ত মুস্কিল! চারটের পর যে আবার ডাকঘর বন্ধ হয়ে যাবে রে!"

"কেন, ডাকঘরে কি?"

"কিছু টাকা বের করতে হবে। জিনিষপত্রসব কিনতে কালই ভোরেই কলকাতা যেতে হবে। সামনে ৫ই জ্যৈষ্ঠ ভালদিন আছে। বেশী সময় ত নেই! আজ হল সাতাশে—এমাসের তিন দিন ও মাসের পাঁচদিন এই আটদিনের মধ্যে সব যোগাড়যন্ত্র করে ফেলতে হবে ত! আমি চল্লাম ডাকঘরে। টাকা বের করে নিয়ে আসি; সন্ধ্যাবেলা জেঠাইমাকে জিজ্ঞাসা করে' জিনিষপত্রের ফর্দ্দটা করে ফেলতে হবে। ৫ই কি তাঁর মত হবে না? হবে বোধ হয়, কি বলিস, অ্যাঁ?"

কিরণ বলিল, "আমি কি করে জান্‌বো! বা রে!"

"আচ্ছা, আমি চল্লাম টাকা আনতে। জেঠাইমা যদি এর মধ্যে এসে পড়েন ত তাঁকে বলিস, বুঝেছিস্?"

কিরণ বলিল, "কি যে বল তার ঠিক নেই! আমি ওসব কথা কি তাঁকে বলতে পারি? সে আমি বলতে পারবো না।"

কুঞ্জ পাস বহি লইয়া বাহির হইয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই গৃহিণী ফিরিয়া আসিলেন। কিরণ ভাবিয়াছিল, ও সংবাদটা তাঁকে জানানো তাহার পক্ষে বড়ই বেহায়াপনা হইবে; কিন্তু মনের আনন্দ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া, ঠারে ঠোরে অবশেষে তাঁহাকে বলিয়াই ফেলিল।

জেঠাইমা সহজেই সম্মতি দিলেন। পরদিন কুঞ্জ কলিকাতায় গিয়া, অত্যাবশ্যক দ্রব্যগুলি কিনিয়া আনিল। জেঠাইমাকে দিয়া, ডাক্তার সরকার সাহেবকে একখানি নিমন্ত্রপত্র লিখাইল; কিরণকে দিয়া ইন্দুকেও (তাহার পিতার কেয়ারে) একখানি চিঠি লিখাইয়া পাঠাইয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। সেইদিন ডাকে ডাক্তার সাহেবের পত্র আসিল। অনেকগুলি সাংঘাতিক রোগের "কেস" তাঁহার হাতে থাকায়, বিবাহে উপস্থিত হইতে অক্ষম বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। তবে তিনি ও তাঁহার স্ত্রী, নবদম্পতীকে তাঁহাদের অন্তরের শুভ কামনা প্রেরণ করিয়াছেন।

ইন্দুকে প্রেরিত কিরণের নিমন্ত্রণ পত্রের কোনও জবাব কিন্তু আসিল না। সন্ধ্যা হইল। বিবাহ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া বরকন্যা বিবাহ-মণ্ডপে আসিয়া বসিল। শাঁখ বাজিতে লাগিল।

এমন সময় বাহিরে একটা গণ্ডগোল শুনা গেল। এক ব্যক্তি চিৎকার করিয়া বলিতেছে—“মহাশয়গণ, আমাকে অযথা বাধা প্রদান করিবেন না। একে বিলম্বে বাষ্পীয় শকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার উপর ঠিকানা খুঁজিয়া পাইতে বহু বিলম্ব হইয়া গেছে! আমি বিশেষ প্রয়োজনে আসিয়াছি আমায় ছাড়িয়া দিন।”

লোকটি ঠেলাঠেলি করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে মশায় আপনি? জবরদস্তি বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লেন কেন? একটু আক্কেল নেই?”

সে বলিল, “আমার নাম শ্রীঅমূল্যচরণ দত্ত, নিবাস ঢাকা জিলার অন্তর্গত সাতবেড়িয়া গ্রামে। তত্রত্য সাত আনা হিস্যার জমিদার মহাশয়ের আমি আত্মীয় ও কার্য্যকারক। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী---সাধারণ সমাজের সভ্য। স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথাকে নিতান্ত বর্ব্বরোচিত বলিয়া গণ্য করি, সুতরাং কাহারও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে আমি দ্বিধা বোধ করি না।”

দুই তিন জনে জিজ্ঞাসা করিল, “ভাল মুস্কিল! কি চান আপনি?”

অমূল্য বলিল, “আমি কিছুই চাহি না। আমার মনিব-পত্নী শ্রীযুক্তেশ্বরী ইন্দুবালা দত্তজায়া মহাশয়া এই বিবাহোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, উপস্থিত হইতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া কিরণনাম্নী কন্যাকে পত্র লিখিয়াছেন এবং তাঁহাকে কিছু স্বর্ণালঙ্কার উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন।”

এই কথা শুনিয়া সকলে তখন অমূল্যকে খাতির করিতে লাগিল। আত্মীয় কুটম্বগণ যেখানে বসিয়া ছিলেন সেইখানে তাহাকে বসাইল। তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া সকলেই তাহার মুখপানে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, “মশায়, আপনাদের দেশে কি সকলেই এই রকম সাধুভাষায় কথা কয়?” অমূল্য উত্তেজিত হইয়া বলিল, “কহে না; কিন্তু কহা উচিত। যাঁহারা বলেন, গ্রন্থাদিতে লেখ্য ভাষার পরিবর্ত্তে কথ্য ভাষা চালাইতে হইবে, তাঁহারা কাণ্ডজ্ঞানহীন গণ্ডমূর্খ। আমি বলি এবং অকাট্য যুক্তিসহকারে প্রমাণও করিয়াছি, বাঙ্গালীর কথ্য ভাষা সাধু ভাষার অনুরূপ না হইলে বাঙ্গালীর মঙ্গল নাই। সব কথা বুঝাইয়া বলিবার এখন সময় নহে। আমি এ বিষয়ে একখানি পেমফ্লেট ছাপাইয়াছি। সঙ্গে কয়েক খণ্ড আছে, আপনারা অবসর মত পড়িয়া দেখিবেন।” বলিয়া অমূল্য তাহার পকেট হইতে কয়েকখানি বহি বাহির করিয়া সভামধ্যে বিতরণ করিল।

ঘণ্টাখানেক পরে কন্যা সম্প্রদান কার্য্য শেষ হইল। বাসরঘরে যাইবার জন্য বর কন্যা উঠিল। অমূল্য তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলিয়া কুঞ্জলালের নিকট অগ্রসর হইয়া চিঠি এবং একটি ভেলবেট কেস তাহার হস্তে দিল। কুঞ্জ বাক্সটি খুলিয়া দেখিল, তাহার মধ্যে তিনটি মাথার কাঁটা রহিয়াছে। জালফাঁস কাঁটা, প্রত্যেকটির উপরে পালিসপাতের চিড়িতন টেক্কা; একটিতে “কি একটিতে “র” এবং একটিতে “ণ” ক্ষোদিত আছে।

বিবাহের পর যখন নিমন্ত্রিত সকলে খাইতে বসিল, কর্ম্মকর্ত্তাগণ অমূল্যকেও আলাদা বসাইয়া খাওইয়া দিলেন। আহারান্তে উপস্থিত ভদ্রলোকগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া এবং বাঙ্গালীর কথ্যভাষা সাধুভাষা হওয়া উচিত কি না তাহা বিশেষরূপে চিন্তা করিতে অনুরোধ করিয়া, রাত্রি এগারোটার গাড়ী ধরিবার জন্য সে তাহার দীর্ঘ পদযুগল ষ্টেশন অভিমুখে ধাবিত করিয়া দিল।

সমাপ্ত

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা।—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জন প্রণীত। কলিকাতা, ৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌-এর পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৷৹

এই গ্রন্থখানিতে হিন্দুসমাজের মঙ্গলামঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া লেখক মহাশয় বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের গতিনির্ণয় ও সমালোচনা করিয়াছেন। কিছুকাল হইতে দেখা যাইতেছে, উপন্যাস ও গল্পাদি-জাতীয় সাহিত্যসৃষ্টিতে একটা সাড়া পড়িয়াছে এবং পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যেও ঐ-জাতীয় সাহিত্য পাঠ করিবার জন্য একটা অদম্য উৎসাহ ও প্রবল আবেগ জন্মিয়াছে। লেখক ও পাঠকের এই পরস্পর সহযোগিতায় উপন্যাস ও গল্পসাহিত্য অল্পদিনের মধ্যেই বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে। সুতরাং সেই সাহিত্য সমাজের পক্ষে কিরূপ ফলদায়ক ইহা ভাবিয়া দেখিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। যতীন্দ্রমোহন যথাসময়েই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, বলিতে হইবে।

বাঙ্গালা উপন্যাস-সাহিত্য যে ভাবে এখন চলিতেছে, বঙ্কিমচন্দ্রই তাহার প্রবর্ত্তক। বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য উপন্যাস-সাহিত্যকে আদর্শ ধরিয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং উপন্যাস-সাহিত্যের প্রাণ-বস্তু যে প্রেম, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সেই প্রেম-লীলায় পাশ্চাত্যের প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট ভাবে বিদ্যমান দেখা যায়। তিনি অমৃতময় ফলের আশা করিয়া বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিষবৃক্ষে অমৃত ফলিবে কেন? যাহা ফলিবার, তাহাই ফলিয়াছে। এবং তাঁহার পরবর্ত্তী উপন্যাস-লেখকেরা (কদাচিৎ দুই একজন ছাড়া) সেই পাশ্চাত্য-আদর্শে ও অনুকরণে প্রবৃত্তি-মার্গে নানাবিধ উদ্দাম প্রেমের আমদানি করিতে থাকিলেন এবং মুখরোচক বলিয়া সেগুলি দেশময় ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এখন বাঙ্গালা উপন্যাস-সাহিত্যের গতি পূর্ণমাত্রায় প্রবৃত্তিমার্গে এবং লক্ষ্য "স্বাধীন" প্রেম। তাহাতে উপন্যাস-সাহিত্য নানাবিধ প্রেম-বিকারে কলুষিত হইতেছে এবং নিরন্তর নূতন-নূতন ঐ সব উপন্যাসের সাহায্যে এখনকার যুবক-যুবতীবৃন্দ উদার প্রেম-সাগরের তরঙ্গাঘাতে আপাত-মধুর এক প্রকার আনন্দ অনুভব করিতেছেন। কিন্তু ইহার ফল যে বিষময়, তাহা হিন্দুসমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। যতীন্দ্রমোহন তাঁহাদের অন্যতম। হিন্দুসমাজের গতি নিবৃত্তিমুখী। উহাকে প্রবৃত্তিমুখী করিতে গেলেই কুফল অবশ্যম্ভাবী।

হিন্দুসমাজের সংস্কার ও উন্নতি আবশ্যক, কিন্তু তাহা যদি হিন্দু 'কাল্‌চার' অনুসরণে অর্থাৎ নিবৃত্তি মার্গে হয়, তবেই প্রকৃত সংস্কার ও স্থায়ী উন্নতি হইবে। নতুবা সেজন্য প্রবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন করিলে সমাজধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। প্রবৃত্তির পথ নাকি বড়ই সুগম, লোভনীয় ও নিষ্কণ্টক, তাই এই সব উপন্যাসে দেশ ছাইয়া যাইতেছে এবং নিরীহ পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ তাহা গো-গ্রাসে গলাধঃকরণ করিতেছে। এ অবস্থায় যতীন্দ্রমোহন ভীত হইয়া এই যে বিপদের লালনিশান তুলিয়াছেন, তাহাতে হিন্দু-সমাজের প্রকৃত হিতকামীর কার্য্যই করা হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও শরচ্চন্দ্রের উপন্যাস হইতে উদাহৃত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে তাহাতে কিরূপ কলুষিত চিত্র উজ্জ্বলবর্ণে আর্টের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। বিধবার প্রেম, সধবার প্রেম (কোথাও বিবাহের পূর্ব্বে জাত, কোথাও বিবাহের পরে জাত) গণিকার প্রেম—এই সব উন্মার্গগামী প্রেমের কাহিনী মোহিনী ভাষায় সজ্জিত হইয়া কোমলপ্রাণ পাঠক-পাঠিকাদের মনোহরণ করিতেছে। ইহার ফল যে বিষময়, সে সম্বন্ধে সন্দেহই থাকিতে পারে না।

এখন কঃ পন্থা?—যতীন্দ্রমোহন বলিতেছেন:—

"এখন কথা হইতেছে, বাঙ্গালা উপন্যাসে যদি বিধবার প্রেম, সধবার প্রেম, বারবনিতার প্রেম না আসিল—এক কথায়, যদি সকল রকমের প্রেমচিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে বর্জ্জন করা হয়, তবে বাঙ্গালী কবিগণ কোন্ উপাদান লইয়া কাব্যরচনা করিবেন? তাঁহারা কি কেবল Moral text book রচনা করিলেন? না, আমি তাঁহাদিগকে কেবল হিতোপদেশ রচনা করিতে বলি না। তাঁহারা বাঙ্গালী জীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করিবেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীকে মনুষ্যত্ব লাভের পথ দেখাইবেন। বাঙ্গালী জীবনের সুখ-দুঃখ আমোদ-আহ্লাদ, অভাব-দৈন্য, অত্যাচার-অবিচার, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্নেহ-প্রীতি প্রভৃতি তাঁহাদের কাব্যের বিষয় হইবে। বাঙ্গালী জীবনের সাধনা কি, সিদ্ধির পথ কি, সিদ্ধি কতদূরে, ইহা তাঁহারা দেখাইবেন।...Love বড় ethereal আকাশশরীরী, তাহা কাহাকেও ধরাছোঁয়া দেয় না, তাহা নর-নারীর ইচ্ছাধীন নহে, তাহা নর-নারীর ইচ্ছাশক্তির অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। "It is a capricious passion and generally comes without the knowledge, against the will." আমাদের উপন্যাস-লেখকগণ আর্টের সাহায্যে এই বিলাতী প্রেমকে আমাদের সমাজে আমদানি করিতেছেন। বিলাতী

আলু, বিলাতী বেগুন প্রভৃতির ন্যায় এই বিলাতী প্রেমেরও চাষ এখন আমাদের সমাজে তাঁহারা চালাইতে চান। "চোখের বালি"র বিনোদিনী, "বড় দিদি"র মাধবী, "পল্লীসমাজে"র রমা, "নষ্টনীড়ের" চারুলতা, "ঘরে বাইরে"র বিমলা, "চরিত্রহীনে"র কিরণময়ী, "দেবদাসে"র পার্ব্বতী, "স্বামী"র সৌদামিনী ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। আমাদের সমাজে প্রচলিত স্বামি-স্ত্রীর ভালবাসার একটা ব্যভিচারী ভাব ছিল এবং এখনও আছে, যাহাকে ইতর ভাষায় বলে "পিরীত"। ইহা চিরদিনই ঘৃণার বস্তু ছিল, এবং এক বৈষ্ণব সাহিত্য ভিন্ন ইহা কখনও সৎসাহিত্যে মাথা তুলিতে পারে নাই। আমাদের উপন্যাস লেখকগণ ইহাকেও প্রেম নাম দিয়া ভদ্র বেশে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্তও সেই কিরণময়ী; আর "দেবদাসে"র চন্দ্রমুখী, "শ্রীকান্তে"র রাজলক্ষ্মী ও অভয়া। আমার বিশ্বাস, এই সকল বিলাতী প্রেম ও ব্যভিচারী প্রেমের আমদানি না করিলেও বাঙ্গালী জীবনের সুখ দুঃখময় কাব্য কাহিনী রচিত হইতে পারে।"

যতীন্দ্রমোহনের কথাগুলি গম্ভীর ভাবে প্রণিধান করিয়া দেখিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। লেখকদের লেখনীমুখে যখন সমাজের মঙ্গলামঙ্গল অনেকটা নির্ভর করিতেছে, তখন লেখনী কোন্ পথে চালনা করা উচিত বা অনুচিত, তাহা নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। সেই জন্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির বহুল প্রচার এবং বক্ষ্যমান বিষয়ে গম্ভীর আলোচনা হওয়া প্রার্থনীয়।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই গ্রন্থখানির একটী নাতি-দীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়াছেন। সেই সুলিখিত ভূমিকাটী উহার শিরোভূষণ স্বরূপ হইয়াছে।

শ্রীদীননাথ সান্যাল।

সাহিত্য-সমাচার

শোক-সংবাদ

স্বনামখ্যাত সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়, মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে, বিগত ১০ই আষাঢ় রাত্রি ২॥ টার সময়, তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে, জ্বর ও পৃষ্ঠব্রণ রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এ দুঃসংবাদে আমরা নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াছি। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের একটা অংশ সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল, সুতরাং তাঁহার তিরোধানে বঙ্গসাহিত্যের যে বিশেষরূপ ক্ষতি হইল তাহা বলাই বাহুল্য। যে সকল উদ্যমশীল নবীন সাহিত্যসেবীর একান্ত যত্ন ও উদ্যোগে, চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এই পত্রিকা "মানসী" নামে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। আগামী ভাদ্র সংখ্যায়, শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র লিখিত "বঙ্গসাহিত্য সত্যেন্দ্রনাথ" শীর্ষক একটি সচিত্র প্রবন্ধ আমরা প্রকাশ করিব।

১৪শ বর্ষ ১ম খণ্ড সমাপ্ত

ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের প্রতি

বর্ত্তমান সংখ্যার সহিত আমাদের ১৪শ বর্ষের প্রথম ছয় মাস পূর্ণ হইল। ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণ দয়া করিয়া বাকি ছয় মাসের মূল্য ২।০ মনি অর্ডারে পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইব। নচেৎ ভাদ্র সংখ্যা তাঁহাদের নিকট ভি পিতে পাঠাইব, উহা যেন অনুগ্রহ করিয়া তাঁহারা ২।৵ দিয়া গ্রহণ করেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, "মাসসী ও মর্ম্মবাণী।"

কলিকাতা
১৪ এ রামতনু বসুর লেন, "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত